CUL-H04563-18-P30631

18

আদেশ হইল। এমন সময় নীলাম্বরের মাথার উপরে পক্ষুনি ডা
এবং সে জ্যেঠির ডাকও শুনিতে পাইল। মস্তকের উপরে বাধা পা
সে কূল ভুলিতে যাইতে চায় না। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পিতার
পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক পুরাণ প্রমাণ শুনাইলেন।

নাহি নিয়োজিনু রণে, দুরন্ত শত্রুর সনে,
নাহি পাঠাইনু দূর দেশ।
সবে চারি দণ্ড যাবে, কুলম আনিয়া দিবে,
ইথে কেন মনে ভাব ক্লেশ।
বিষম আরতি নয়, সবে যাবে দণ্ড ছয়,
এ নন্দন কানন ভিতরে।
নিকটে কুসুম আছে, ইষ্টিতে না হবে গাছে,
আরাধনা করিব শঙ্করে।

অগত্যা নীলাম্বর 'পান' লইল, এবং হরপার্ব্বতীর যুক্তিস্থলে পড়িয়া ব্যা
কালকেতু রূপে মর্ত্ত্যে চণ্ডিকার পূজা প্রচার করিল। কালকেতুকে চণ্ডি
অনেক ধন দিলেন। সে কলিঙ্গদেশের নিকটে গুজরাট নামে এক ন
নির্ম্মাণ করাইল, অনেক প্রজা বসাইল। বিপদের সময় চণ্ডিকা তা
সহায় থাকিতেন; কেন না, চণ্ডিকা তাঁহার মন্দিরে পূজা পাইতেন। কা
রাজও বেশ শিক্ষা পাইলেন। তিনিও চণ্ডিকার ভক্ত হইলেন। "গুজর
কালকেতু খ্যাত হইল রাজা। আর যত ভুঞা রাজা করে তাঁর পূজা।"

কিন্তু এইরূপে কতকাল চলে? নীলাম্বরের শাপের কাল ফুরা
সে জায়া সঙ্গে পুষ্পক বিমানে চাপিয়া ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া গেল। কা
পার্ব্বতী আবার পদ্মাবতীর সহিত যুক্তি করিলেন। শঙ্করও অবশ্য
দিলেন। এবার রত্নমালা নামে ইন্দ্রের এক নর্ত্তকী অভিশপ্ত হইল। ইচ্ছা
নগরে ধনপতি নামে এক ধনশালী গন্ধবণিক্ ছিল। তাহার স্ত্রীর গ
খুল্লনা নামে রত্নমালা জন্মগ্রহণ করিল। উজানি নগরে ধনপতি নামে এ
সাধু (সওদাগর) ছিল। লহনা তাহার প্রথম বনিতা ছিল। বৃদ্ধ
ধনপতির দ্বিতীয় বনিতা হইল।

খুল্লনাকে চণ্ডী স্বপ্ন দিয়াছিলেন, এবং নানা কষ্ট হইতে রক্ষা করিব
ছিলেন। সে চণ্ডিকার ভক্ত হইয়াছিল। কিন্তু খুল্লনার স্বামী ধনপতি
মনসার দেখা পাইতে পারিত না। এমন কি, যখন ধনপতি উজানি নগরের
রাজার আদেশে সিংহলে সাত ডিঙ্গা ভরিয়া বাণিজ্য করিতে যায়, খুল্লনা

কালিকার কথা নাহি হইল গোচর।
অবশেষে বাহা দিল এবে করিমু।
আমার ভিক্ষার ঝুলি পাতি দুই বার।
গরেশের যুচিত করিল কল্যাণ।
আরিকার মত যদি রাজা দেও শুল।
তবে সে পারিব বাঘ আনিতে তুলল।

এখন পশুপতি নক্কোধে বলিলেন, 'আমি ছাড়ি ঘর, যার রেশান্তর, কি মোর ঘর করবে।" পার্বতীও খেদ করিতে লাগিলেন,

ঘি আদি তপের ঘরে পাইয়াছি হর।
[illegible] নাহি আছে দেবে দিগম্বর।
[illegible] হর চিতাভূমি বাস।
ছাড়িলে শিঙ্গের মাটী অবনী মোটার।
[illegible] মাথি গলের নিবাসে।
[illegible] বাঘছালবাসে।
[illegible] গোরের মধ্যে লাই করে খেলি।
গলার মুণ্ড কাটে তুলি আনি খাই গালি।

18

মা বাপের বাড়ী যাইবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু পূজা গৌরীকে ভরিয়া শুনাইয়া মর্ত্তদেশে যুগে যুগে তাঁহার অর্চনা প্রচার করিতে বলিলেন। গৌরীর অন্নবস্ত্রের অভাব আর থাকিবে না।

এই উদ্দেশ্যে প্রথমে চণ্ডিকা দ্বাপর যুগের শেষে কুলিঙ্গরাজার দেশে তাঁহাকে এক দেউল নির্মাণ করিতে বলিলেন। এবং রাজাকে স্বপ্নে বলেন, "করি বহু পরামর্শ, আইনু ভারতবর্ষ, নইব তোমার পূজা আগে।" তাহাতে রাজা হৈমবতীর পূজা করিলেন। পূজার পরে চণ্ডিকা ঘরে ফিরিতেছিলেন, পথে সিঙ্গাণিরির পশুগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং বনফুল আর আম শেহাকুল কাল চিতাফল দিয়া পূজা করিল।

এখন ভবানী কলিঙ্গদেশে গেলেন, তখন মহেশের দিন চলা ভার হইল। তিনিও নর্ত্তের পূজা-সংগ্রহে বাহির হইলেন। পরে হরপার্বতী উভয়ে [illegible] আবার একত্র হইলেন। এবার উভয়ের মধ্যে যুক্তি হইল যে, [illegible] পুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্তলোকে পাঠাইতে হইবে। "তবে [illegible] প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি।" নারদের উপদেশে ইন্দ্র শিবপূজা আরম্ভ করিলেন। শিবপুত্র নীলাম্বরের উপর নন্দনকাননে ফুল তুলিবার আদিষ্ট

তস্তিত চণ্ডিকার ঘট পায়ে ফেলিয়া দেয়। ধনপতি [illegible]
। স্কল দিক্ ভাবিয়া হরপার্শ্বর্তী আবার যুক্তি করিল।
কুমার মালাধরকে শাপ দিলেন। সে ও তাহার দুই স্ত্রী
। জন্মগ্রহণ করিল। মালাধর গুলনার পুত্র শ্রীমন্ত, এব
তাঁর এক জন সিংহল-রাজকন্যা, এবং অপর জন উজানি র
মন্তের পিতা ধনপতিকে পার্বতী নগরার মোহানার নাকের এ [illegible]
নে করিয়াছিলেন। একটি ডিঙ্গী লইয়া ধনপতি কোন রূপে প্রাণে
সিংহলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিংহলের নিকটে কালীদহে মায়া পাতিয়া
চণ্ডিকা তাহাকে অপরূপ রূপের কামিনী প্রদর্শন করান। ধনপতি কর্ণধারকে
দেখিতে বলিল, কিন্তু [illegible] পাইল না।

[illegible] আর, [illegible] কর্ণধার,
[illegible] কমলে অবতরি।
ধরি [illegible] করে, উগরস্তে করিবরে,
[illegible] করয়ে সংহার।
কমল কুলকরচি, যাহা সখা কিবা পচী,
মদন সুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
প্রামাণিক যোজন গভীর বহে জল।
ইথে উপায়ে ভাই কেমনে যাইব॥
কমলিনী নাহি সহে ভরতে [illegible]র।
তরঙ্গহিল্লোলে বামা করে [illegible]র॥
নিবসে রমণী তাহে ধরিয়া [illegible]
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলায় কামিনী উগরে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি তায় রামা করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥

সিংহলের রাজার নিকটে এমন অসম্ভব কথা বলিয়া ধনপতি কারাগারে
হইলেন। পরে শ্রীমন্ত চণ্ডিকার কৃপায় নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার
সিংহলের রাজাকে কমলে [illegible]মিনী [illegible], এবং রাজকন্যা বিবাহ
পিতাকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত [illegible] ও সেই বিপত্তি। উজানী

নগরের রাজা অস্তক কমলে কামিনীর কপাল শ্রীমন্তকে বধের [illegible] দিলেন। শ্রীমন্ত এখানেও রাজার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন, এবং জয় সৃষ্টি করিয়া তাহাতে কমলে কামিনী রূপে উজানীর রাজাকে ছিলেন। ফলে সিংহল ও উজানী নগর চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল।

এইরূপে মোটা গল্প গড়া হইয়াছে। এই গানের নায়ক নায়িকা [illegible] —ধনপতি ও লহনা। উপনায়ক উপনায়িকা অনেক আছে। যাহারা প্রধান, তাহারা ইন্দ্রের কুমার, উহার পুত্রবধূ ইন্দ্রের মন্ত্রিণী। সংসারে যদি কোনও ব্যক্তি প্রধান হন, গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস তাহাতেই পরমেশ্বর কোনও দেবতা। ভক্ত গাবতীর মনস্কামনা যেমন আছে, তেমনই তাহাদের দেবভাবও আছে। এই দুই ভাবে উপন্যাস [illegible] করিতেছেন, এই দুই ভাব লইয়া ভারতী ভারত পথে [illegible] করিয়া আছেন, এবং এই দুই ভাব দেবমন্দিরে ও দেবালয়ের [illegible] আছে। প্রতিমা-পূজক হিন্দুর মনে এই দুই ভাব বেদের [illegible] করিতেছেন। ইহাই হিন্দুর জাতীয় ভাব।

এই ভাব লইয়া কবিরা আমাদিগকে ভাব্য শাস্ত্রের সারভূত ন পূর্ণমাত্রায় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবিকৃতচক্ষু, তাঁহার শব্দযো তাঁহার মানব-চরিত্র-জ্ঞান, সংসারের সহস্র খুঁটিনাটির জ্ঞান চণ্ডী ও প্রতি কাব্যরসগ্রাহীর চিত্ত চিরকাল আকর্ষণ করিবে।

মুকুন্দরাম দরিদ্র গ্রাম্য কবি। তাঁহার জাতি তাঁহারই মত গ্রাম্য লো তাহাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক ছিলেন, কোনও নাগরিক কবি সুখ শান্তির শীতল ছায়ায় বসিয়া কদাপি অনুভব করিতে পারিতেন না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কবিবর লিখিয়াছেন,—"কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু যে সমাজের চিত্র করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর।" বোধ হয়, চণ্ডীতে ব্যাধ "ব্যাধি বেনিয়া বেনিয়ানী, গোধের বালাই মন্তক, ও তার উঁচু দন্ত, দুর্ব্বলা নারী গ্রাম্য লোকের সুখ দুঃখের কাহিনী বিবেচনা দেখিয়া উক্ত মন্তব্য হইয়া তাহা হউক। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী—ইহা প্রকৃতির ইচ্ছানুসারে বিভা গ্রাম্য লোক এই বিভাগ মান্য করুন, এবং প্রকৃত শক্তিকে যথা ছা দেউন। এই জন্যই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ছাড়িয়া তাহারা কবিকঙ্ক আদর করে। বর্ণনায়হিত গ্রামে বসিয়া গ্রাম্য দীন কবি গ্রাম্য চিত্র [illegible] করিয়াছেন। তিনি কি অপূর্ব্ব সৃষ্টিশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

যার তাহার কি অনুকরণীয় অধিকার ছিল। গর্ভবতী নারী কি ব্যঞ্জনের সাধ করে, অকণ্টকচারী ব্যক্তির লোললালসার সীমা কি,—ইহা তিনি যেমন জানিতেন, তেমনই সন্তানপ্রসবের পর কি কি কার্য্য করিতে হয়, বিবাহের সময় কি কি বিধি পালন আবশ্যক, তাহাও তিনি তেমনই জানিতেন। বঙ্গে কয় পক্ষী সর্পের নাম জান, কবিকঙ্কণকে জিজ্ঞাসা করুন। ফুলের নাম, আরণ্য বৃক্ষের নাম, অষ্ট অলঙ্কার, ব্যাস্লিশ বাজনা, যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র জানিতে চাও, কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তীকে ধরুন। অভাগী নারী পতিসোহাগ-বাসনায় কি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কি গাছের গন্ধে সর্প পলায়ন করে, কোটে কি ফলে কি ঘর, কি সংযোগে কি ব্যঞ্জন রাঁধিতে হয়, পাড়া-য়ে মালা লইয়া কেমন বলা হয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবসায় কি, জাতি রত্নই বা কি, ইত্যাদি এমন কোন গ্রাম্য ব্যাপার নাই, যাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানিতেন না, এবং সুযোগমত আমাদিগকে বলেন নাই। গ্রাম্য শ্রোতা এই সকল বিষয় যেমন বুঝে, তেমন কি প্রকৃতির শোভা কি বিশেষ দেখিয়া কবির বক্তোচ্ছ্বাস বুঝিতে সমর্থ?

বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন,—"কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসোদ্দীপক, পূর্ণ ও সুমধুর হইলেও আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ নয়; ইহার কোন স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে, এ ছাড়া এত অপভ্রংশ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় যে, তাহাদের অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। সুতরাং সেই স্থানে রসভঙ্গ দোষ ঘটে।"

এ কথা সত্য যে, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে; কিন্তু তাহাও সভা. সে সকল শব্দ হইতেও গ্রাম্য শ্রোতা ভঙ্গ দোষ হতে পারে কবিকঙ্কণ কি সে সকল শব্দের পরিবর্ত্তে গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না? কবিকে কি অক্ষর মিলের ভাবনা ভাবিতে হয়? আমাদের বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই এবং কবিত্বের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য যুক্তমত স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা সকল অর্থ নাই বুঝুক, কিন্তু শব্দের ঝঙ্কার অনুভব করিতে পারে। স্বর্গগোধিকা-পক্ষী অভয়ার নিজমূর্ত্তি ধারণ পড়ুন।—

ঝঙ্কারে চিড়িয়া বড়ী, ১ পাটের পাড়ী,
ষোড়শ বৎসরের ঝিয়া সমা।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, [illegible]
কিবা তিল ফুলের উপমা।

শুচারু নিতম্ব সাজে, চরণে পঙ্কজ রাজে,
মণিময় কাঞ্চন নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার শোভা,
রবির কিরণ করে দূর॥
ত্রিবলি বলিত মাঝে, সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে,
উরুযুগ রম্ভার সমান।
জিনিয়া কুম্ভের-কুম্ভ, কুচযুগ করে দম্ভ,
কেবা দিতে পারে উপমান।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন গন্ধ, অঙ্গদ বলয় শঙ্খ,
বাহু বিভূষণ সুশোভন।
সরুল অঙ্গুলি ভরি, মাণিক্য অঙ্গুরী পরি,
[illegible]
মুখচন্দ্র অনুপাম, বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম,
সিন্দুর-তিলক তিমিরারি।
অধরে বিদ্যুৎ-ছটা, তাম্বূলের রাগ ঘটা,
নাসাগ্রে মাণিক মনোহারি॥

বিশ্বকোষকার যাহাকে অপভ্রংশ শব্দ বলিয়াছেন, সেই প্রকার শব্দের বাহুল্যেই কবি রাঢ়ের,—বিশেষতঃ পশ্চিম রাঢ়ের লোকদিগের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন। তা ছাড়া অপভ্রংশ শব্দ ব্যতীত তিনি কি শব্দ দ্বারা দুই সতীনের কোন্দল, গ্রাম্য লোকের কথা, গ্রাম্য কলা প্রভৃতি গ্রাম্য ব্যাপারে জীবন্ত মূর্ত্তি ধরিতে পারিতেন? শিষ্ট ও অশিষ্ট শব্দ লইয়া চিরকালই বিবাদ চলিবে।

বিশ্বকোষকার আরও লিখিয়াছেন,—"চণ্ডী গ্রন্থে যে দুইটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটি স্থান কলিঙ্গদেশে, এবং দ্বিতীয়টি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়িনী নগরী। কলিঙ্গদেশ কবিকঙ্কণের বাসস্থল হইতে বহুদূরবর্ত্তী, বোধ হয়, তিনি সেই দেশে কখন গমন করেন নাই, তাই এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক হয় নাই।"

কি আশ্চর্য্য! বিশ্বকোষকার এ কথা লিখিয়াছেন। তিনি কলিঙ্গদেশের যে মানচিত্র দিয়াছেন, সে দেশের সীমা হইতে কবিকঙ্কণের বাসভূমি আরড়া গ্রাম কি নিকটে নহে? তা ছাড়া, তাঁহার জন্মগ্রাম দামুন্যা হইতে আরড়া যাইতে যেখানে যে গ্রাম ও নদী পড়ে, সেগুলির ভৌগোলিক অবস্থানে ভুল

আছে কি? আর কবিকল্পিত কাব্যে কি ভূগোলপরিচয় করিতে হইবে? তথাপি বোধ করি, আরড়া হইতে গোলাহাট বেশী দূরে নহে, গুজরাট আর গূর্জ্জর এক স্থান নহে। কালকেতু ব্যাধে আমরা কোল সাঁওতাল দেখিতে পাই, কালকেতুর বন কাটাইয়া নগর-স্থাপনে বনবিষ্ণুপুরের ন্যায় কোনও রাজার নগর-নির্মাণ দেখিতে পাই। কালকেতু ভূঞাদের রাজ্য-গণের রাজা হইয়াছিল। অদ্যাপি ওড়িশার কেওঝড়-অধিপতি ভূঞাদের রাজা আছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ মুকুন্দরাম অজয়নদতীরবর্ত্তী উজানী নগরে কেন গিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি; হয় ত তিনি তাঁহার প্রতিপালক রঘুনাথ রায়ের সহিত গিয়াছিলেন, হয় ত তাঁহারই সঙ্গে গঙ্গা দিয়া সাগর-সঙ্গমে ও শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। যে গ[illegible]ারণ গ্রাম দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছিলেন, যাহার উচ্চ মৃৎপ্র[illegible]রি ভেদ করিয়া ক্ষীণস্রোত আমোদর প্রাচীন প্রস্তর অট্টালিকা ভগ্নস্তূপ ধৌত করিয়া প্রবাহিত আছে, যে মান্দারণে বাহার গড় ছিল বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধি আছে, সেই মান্দারণের তুল্য কত কত রাজদুর্গের চিহ্ন হুগলী জেলার পশ্চিমাংশ হইতে মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে অতীত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর মৃত সাক্ষ্য রূপে বর্ত্তমান আছে, এবং ভবিষ্য অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই সকল গড়ের কোনও কোনটি নিশ্চয়ই মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। এত উপকরণ থাকিতেও কবিকঙ্কণকে, বোধ হয়, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় নাই।

কবিকঙ্কণের বিশেষত্ব অনেকে অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। একটির উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে। তিনি তাঁহার কাব্যে একই প্রকার ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। দারিদ্র্যের কথা, ঘরোয়া কোন্দলের কথা, ভোজনের কথা, গর্ভবতীর সাধ খাওয়ার কথা, বিবাহের কথা, যুদ্ধের কথা, সিংহল-যাত্রার-কথা একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছেন। আরও দেখা যায়, একই বিষয়ের বর্ণনায় ভাষাও প্রায় একরূপ, এমন কি, কোনও কোনও স্থলে একই কবিতা বাহির হইয়াছে। হঠাৎ পড়িবার সময় পুনরুক্তিদোষ মনে পড়ে। মনে হয়, কবিকঙ্কণের বৈচিত্র্যজ্ঞান ছিল না, হয় ত কবিতা-রচনা তাঁহার সহজ ছিল না। কিন্তু যখন মনে করি, তাঁহার অভয়া-মঙ্গল ঘোল পালায় গাহিবার গান, যখন মনে করি, বর্দ্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ চণ্ডী-গায়ক জগাই সেকরা একই ভাবের গান, একই কবিতা

আবৃত্তি দ্বারা কত দিন ধরিয়া শ্রোতাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত, তখন কবিকঙ্কণের উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারি, এবং ভাবি যে, পুনরুক্তি দোষের না হইয়া গুণের কারণ হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, কবিকঙ্কণ গান গাহিয়াছেন, কোনও কাব্য লেখেন নাই। শ্রোতা উন্মুখ হইয়া থাকে, কি আসিতেছে, তাহা সে পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে, এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে কবিতা শুনিয়া তাহার পূর্ণরস গ্রহণ করে। দীনেশবাবু যাহা নাটকীয় কৌশল বলিয়া কবিকঙ্কণের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ যে গানের গুণে আসিয়াছিল, তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। চণ্ডীর গান নিরবচ্ছিন্ন গান নহে। কোন্ গান কিংবা যাত্রা নিরবচ্ছিন্ন গান? গানের মধ্যে মধ্যে কথা আছে, কবিত্ব-আবৃত্তি আছে; যমজ পুত্র দুই পার্শ্বে লইয়া যখন জগা সেকরা কবিতা কেবল আবৃত্তি করিয়া যাইত, তখন তালে তালে আবৃত্তির ঠমক, বোধ হয়, তাহার গানকেও পরাজিত করিত। বোধ হয়, গোবিন্দ অধিকারীর গান অপেক্ষা তাহার কথায় শ্রোতার মন অধিক আকৃষ্ট হইত। কথার এক ইঙ্গিতে বহু কাব্য লুক্কায়িত থাকিত। এইখানেই কবির গুণপণা। সে গুণপণা কবিকঙ্কণ প্রচুর দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার চণ্ডী কাব্যালঙ্কারিকের নিকট বাঙ্গলা ছন্দের দৃষ্টান্তের আকর, ভাষাশিক্ষার্থীর নিকট শব্দকোষ, ইতিহাসবিদের নিকট রাঢ়ের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস। ক্রমশঃ।

ঋণ-পরিশোধ।

১

এমন আপদেও মানুষে পড়ে! ধর্ম্মতলার মোড়ে ট্রামের অপেক্ষায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল উমেদারী করিতেছি; গাড়ীর দেখা নাই। ফাল্গুন মাসের শেষ; রোদ্র কোনওরূপেই উপভোগ-সুখদ নহে। এ দিকে দুইটা বাজিল; শনিবার—আফিসের ছুটী হইল; সুতরাং দলে দলে কর্ম্মচারীরা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন,—দেহে অকাল জরার লক্ষণ—নয়নে হিসাব-পরীক্ষার উপযোগী [illegible] ও ক্ষুধা [illegible] কোথায় বিশ্রামের

ছুঁড়ে ছিঁড়িয়া দিয়াছে। ট্রামের তবলা ত্যাগ করিয়া গাড়ী ভাড়া করিতে যাইব—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—"নলিনি, না?"

আমার নাম নরেন্দ্রনাথ। নলিনী তাহার অপভ্রংশ। এ নামে আজ বার বৎসর কেহ আমাকে ডাকে নাই। তাহার পূর্ব্বেও অবশ্য সকলের এ নামে সম্বোধনের অধিকার ছিল না। বিশেষ কলিকাতায় আমি আপনাকে পরিচিতজনশূন্য বলিয়াই জানি। এখানে আমাকে এ নামে কে ডাকিল? এত দিন পরে—পরিবর্ত্তিতবেশে কে আমাকে চিনিল? ফিরিয়া দেখিলাম;—এলাহাবাদে আমার বাল্যকালের সতীর্থ ব্রজেশ বলিয়া বোধ হইল। ভাল করিয়া দেখিলাম;—আর সন্দেহ রহিল না। মনে যে আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

ব্রজেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে?"

আমি বলিলাম, "ব্রহ্ম হইতে। তুমি?"

সে সম্মুখে একটা বড় দোকান দেখাইয়া বলিল, "ঐ দোকানে হিসাব বিভাগে কাজ করি।"

"কত দিন পরে দেখা হইল! বাল্যবন্ধুরা সব কে কোথায়! তুমি থাক কোথায়?"

ব্রজেশ ঠিকানা বলিল। আমি পকেট হইতে খাতা বাহির করিয়া তাহা লিখিয়া লইলাম; বলিলাম, "এখানে কয়টা বড় আড়তের সঙ্গে ব্যবসার কথার জন্য আসিয়াছিলাম। আজ এখনই যাইয়া আফিসে সংবাদ দিতে হইবে। আগামী কল্য রবিবারে মধ্যাহ্নে বাড়ীতে থাকিবে ত?"

"থাকিব। তুমি সকাল করিয়া যাইও। আমার ওখানে খাইবে। মা কত আনন্দিত হইবেন।"

এ আহ্বান অবহেলা করিতে পারিলাম না। বাল্যকালে কত বার ব্রজেশদের গৃহে গিয়াছি; মা কতবার আমাদিগকে আহার্য্য দিয়াছেন। তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন! ব্রজেশকে ভাগ্যবান মনে হইল।

আমি বলিলাম, "ভাল। তোমার ছেলে মেয়েরা সব কাছে আছে ত?"

ব্রজেশ বলিল, "হাঁ।"

"তবে আমি কল্য বেলা এগারটার মধ্যেই যাইয়া উপস্থিত হইব।"

ইহার পর একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলাম। কলিকাতায় আমি অপরিচিত;—নূতন; তাই গাড়োয়ানে উঠিয়াছিলাম।

সাহেবদের সহিত বেশপরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাষার কথা সব ব্রহ্ম আফিসে লিখিয়াছি; তাহার পর সিংহ ভাঙিতে লাগিলাম।

২

সব কথা মনে পড়িতেছে না।—

আমার পিতা এলাহাবাদে ওকালতী করিতেন। আমাদের বাড়ি বাঙ্গালী ছিলাম। তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্তঃ ভাল ছিল না; তাই বাবা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে লইয়া এলাহাবাদে গিয়াছিলেন। সেখানে মার পরীর ভাল হইল দেখিয়া তিনি এলাহাবাদে ওকালতি পরীক্ষা দিয়া সেই স্থানেই বাবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন। কলা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়াছিল। দিদিমা পিতামহী এলাহাবাদে স্বর্গারোহণ করেন; তাহার পর বাবা দেশের বাড়ী জ্ঞাতিদের দান করিয়া সংসারের ব্যয় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন, এবং এলাহাবাদবাসী হইয়া পড়েন।

এলাহাবাদে আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের চারি বৎসর পরে আমার ভগিনী সুরমা ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার তিন বৎসর পরে আমার একটি ভাইয়ের জন্ম হয়। সে বিকল শরীর লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় তাহাকে মানুষকে রক্ষা করা যায় নাই। তাহার মৃত্যু হইতেই মার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায়; বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে এক দিন তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ের ক্রিয়া রহিত হইয়া গেল। তিনি আপনিও কিছু বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বে মৃত্যু সন্তানশোকতপ্ত মাতৃ-হৃদয়ের সকল বেদনা দূর করিয়া দিল। নয় বৎসর বয়সে আমি মাতৃহীন হইলাম।

মা যখন পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, সেই সময় হইতেই সুরমা প্রায় আমার কাছে থাকিত। আমরা দুই জনে খেলা করিতাম, ঝগড়াইতাম, বাবার কাছে যুরিতাম। এখন সুরমার খেলার সাথী ও সুখ-দুঃখের ভাগী আমি ছাড়া আর কেহ রহিল না। আর আমাদের উভয়ের—মাতৃহীন সন্তানদ্বয়ের পিতা ব্যতীত আর কেহ রহিলেন না। আমরা যেমন বাবাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না, বাবাও তেমনই আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না।

তিন বৎসর কাটিয়া গেল, বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটিল না। তৃতীয় বর্ষে আমার এক মাতৃ-স্বসার বিধবা পত্নী একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণব্যপদেশে এলাহাবাদে আসিলেন। আমাদের বাড়ীতে উঠিলেন।

পুত্রের বয়স পঞ্চদশ হইবে। দুই তিন দিনের মধ্যেই আমার সহিত বিভূতির মিশামিশি হইয়া গেল। এই সময় এক দিন দেখিলাম, যে বৃদ্ধা দাসী সুরমাকে মানুষ করিয়াছিল, সে অন্য দাস দাসীদের সহিত কি তর্ক করিতেছে। অন্তরাল হইতে শুনিয়া বুঝিলাম, বাবা বিভূতির সহিত সুরমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। আরও শুনিলাম, বিভূতির জননীর তীর্থভ্রমণের পর এই পথে ফিরিবার সময় প্রস্তাব স্থির হইবে।

ইহার কয় দিন পরেই বিভূতির মাতা পুত্রকে লইয়া যাত্রা করিলেন;—যাইবার সময় সুরমাকে আদর করিয়া অনেক খেলানা ও কি কি অলঙ্কার দিয়া গেলেন। কয় দিন পরে বাবার নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিল,—বিভূতির মাতা বিসূচিকায় আক্রান্তা। বাবা ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠাইলেন; তাহার সঙ্গে মাতৃহীন বিভূতি আসিল। সেই হইতে বিভূতি আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া গেল; আমি গৃহে এক জন সঙ্গী পাইলাম।

বিভূতি এত দিন বাঙ্গালার একটি জেলা-স্কুলে পড়িত। বাবা দেখিয়া শুনিয়া তাহাকে আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়িতে দিলেন। এই সময় ব্রজেশের পিতা এলাহাবাদে বদলি হইয়া আসিলেন। ব্রজেশ আমাদের সহপাঠী হইল। নিকটেই তাহাদের বাসা। সে সর্ব্বদা আমাদের বাড়ী আসিত; আমরাও সর্ব্বদা তাহাদের বাসায় যাইতাম। তাহার স্নেহশীলা জননীর ব্যবহারে আমাদের দুই জনের হৃদয়ে মাতৃশোক-বেদনা বাজিয়া উঠিত।

তাহার পর সুরমার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন বিভূতির সহিত তাহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। বিভূতি ও আমি এক বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তাহার পর আমি এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, বিভূতি পারিল না; কিন্তু সে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, আমি বিফলশ্রম হইলাম। সেই বৎসর আমি কনগ্রেস উপলক্ষে বোম্বাই গমন করিলাম।

তথায় এক জন গুজরাটী বণিকের সহিত আমার পরিচয় হইল। তিনি কয় জন অংশীর সহিত একটা কারবার স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন। আমার এই কারবারে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা হইল। সব কথা লিখিয়া বাবার কাছে কয় হাজার টাকা চাহিলাম। তিনি আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। নবীন উৎসাহে আমি সে কথা শুনিলাম না। মাতৃহীন পুত্র

স্বভাবতঃ পিতার কিছু আড়ম্বর হয়; তিনি শেষে আমার প্রার্থিত কয় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার কথার অবাধ্য হইয়া,—তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে কি বেদনাই দিয়াছিলাম! হায়! তখন যদি স্বপ্নেও মনে করিতে পারিতাম, সে বেদনা দূর করিবার অবসর এ জীবনে আর পাইব না!

অংশী হইয়া সোৎসাহে কাজ করিতে লাগিলাম। কারবারে লাভও হইতে লাগিল। কাজ বাড়াইতে লাগিলাম। দুই বৎসর বাড়ী যাওয়া ঘটিল না। তাহার পর, বিভূতির পত্র পাইলাম;—মফঃস্বলে মোকর্দ্দমায় যাইয়া জ্বর লইয়া বাবা গৃহে ফিরেন,—তিন দিনের জ্বরে সব ফুরাইয়াছে। মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বিভূতি এলাহাবাদে যাইতে লিখিয়াছিল। আর যাইতে ইচ্ছা হইল না। হৃদয়ের যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টায় দ্বিগুণ শ্রম করিতে লাগিলাম। কারবারের শাখা-সংস্থাপনের জন্য করাচি বন্দরে গমন করিলাম। তিন বৎসরে সে স্থানে কারবার ফলাও করিয়া ব্রহ্মে শাখা সংস্থাপন করিতে যাইলাম। সাত বৎসরে ব্রহ্মের শাখা মূলধন অতিক্রম করিয়াছে; সেই ব্যবসায়ব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়াছি। এখন আমি কারবারে প্রধান অংশী।

আজ একে একে সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। সুরমার শেষ পত্রখানি নিকটে ছিল; আবার পাঠ করিলাম। মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল; স্থির করিলাম, ব্রহ্মে ফিরিবার পূর্ব্বে একবার এলাহাবাদে যাইব। জগতে আমার আপনার বলিতে যাহারা আছে, তাহাদের দেখিয়া যাইব। এ দশ বৎসরে সুরমা কতবার আমাকে যাইতে লিখিয়াছে!

৩

পর দিন যথাকালে ব্রজেশের গৃহে উপনীত হইলাম। ব্রজেশ গৃহে ছিল না; ভ্রাতাকে লইয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য একটি পাত্র দেখিতে গিয়াছিল। সে পূর্ব্ব দিনই তাহার জননীকে আমার কথা বলিয়াছিল; আমি গিয়াছি সংবাদ পাইয়াই তিনি আসিলেন। আমি প্রণাম করিলাম। তিনি একে একে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কত খুঁটিনাটি, সুরমার কথা, বিভূতির কথা, তাহাদের ছেলেদের কথা প্রভৃতি। আমি বিবাহ করি নাই শুনিয়া অনেক দুঃখ করিলেন। ব্রজেশের ছেলে মেয়েরা আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল।

ব্রজেশ ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, তাহার মুখ ভার। আমরা একত্রে আহারে বসিলাম। মা কাছে বসিয়া রহিলেন, এটা খাও ওটা খাও, বলিয়া কত যত্ন করিতে লাগিলেন। এমন আদরে এ ভাবে আহার বহু দিন অদৃষ্টে ঘটে নাই। রমণীহৃদয় স্বভাবতঃ স্নেহময়, আমি যে সকল ব্যঞ্জন ভালবাসিতাম, তিনি মনে করিয়া সে সকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

আহারের পর ব্রজেশ ও আমি বাহিরে আসিলাম। ব্রজেশ বড় অন্যমনস্ক। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্রজেশের দুশ্চিন্তা আজ অলঙ্কারের মত তাহার হৃদয়ে বদ্ধ ছিল; আমার জিজ্ঞাসায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে পাত্রে কন্যাকে অর্পণ করিতে পারিলে সে সুখী হইতে পারিত, সে পাত্রের পিতা প্রচুর অর্থ যৌতুক চাহেন। তত অর্থ দরিদ্র সে কোথায় পাইবে? আর যে দুইটি পাত্র উপস্থিত, তাহাদের কাহাকেও কন্যা দিতে পিতৃহৃদয় অনিচ্ছুক। বলিতে বলিতে ব্রজেশের গলা ধরিয়া আসিল।

আমারও মন কেমন হইয়া গেল। প্রথমে মনে হইল, যে ঘরে কন্যার সহিত ওজন করিয়া টাকা দিতে হইবে, সে ঘরে কন্যাদানই অপমান। তাহার পর বুঝিলাম, চোখের উপর রাগ করিয়া ভূমিতে অন্নাহার সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। পাত্রের পিতা অর্থপিশাচ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার উপর রাগ করিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ-সম্ভাবনা অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত নহে। যে চিন্তায় পিতৃহৃদয়ে যে বেদনার সঞ্চার হয়, তাহা অনাস্বাদিত-অপত্যস্নেহ আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

ভাবিতে ভাবিতে পাঠশালায় ফিরিলাম।

৪

আমার মনে কেবল ব্রজেশের কথাই উঠিতে লাগিল। আমার ব্যর্থজীবনে যদি তাহার কিছু উপকারও করিতে পারি! আমিনি সঞ্চয় অভ্যাস করি নাই, অভাবও অনুভব করি নাই। টাকা পাইলেই কারবারে ঢালিয়াছি। মনে হইল, বিভূতি বহুবার আমায় পিতৃত্যক্ত অর্থের কথা লিখিয়াছে। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলাম, এলাহাবাদে যাইয়া ব্রজেশকে টাকা সংগ্রহ করিয়া দিব।

পরদিন প্রাতে পুনরায় ব্রজেশের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাহাকে সব কথা বলিলাম। কৃতজ্ঞতায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু সে অর্থগ্রহণে কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আমি অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম;—শেষে বলিলাম, যখন পার, টাকা শোধ করিও!

আমার পরামর্শে অনেক চেষ্টার ফলে ব্রজেশ আফিসে এক সপ্তাহের ছুটী পাইল। উভয়ে এলাহাবাদে যাত্রা করিলাম।

৫

এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া সুষমার আনন্দ ও যত্ন, বিভূতির আপ্যায়ন, ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদিগের উল্লাস, এই সকলের ধাক্কা সামলাইতেই এক দিন কাটিয়া গেল। সুষমার যে আনন্দে আমার হৃদয়ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বালকবালিকাদিগকে দেখিয়া মনে হইল, আমারও পক্ষে সংসার মরুভূমি নহে।

পরদিন বিভূতিকে গোপনে ব্রজেশের কথা ও আমার সঙ্কল্প জানাইলাম। বিভূতি হিসাবের খাতাপত্র বাহির করিবার উদ্যোগ করিল। আমি বলিলাম, "ভাই, এই বার বৎসর ঐ সব লইয়াই আছি। যে দুই দিন এখানে থাকি, ও দায় হইতে অব্যাহতি দাও। ব্যাপারটা কি, বল।"

বিভূতি জানাইল,—আমার পিতৃত্যক্ত অর্থ তাহার চেষ্টায় দ্বিগুণ হইয়াছে। অল্প দিন পূর্ব্বে আমার নামে একটী সম্পত্তি ক্রীত হইয়াছে। সহস্রাধিক নগদ টাকা হাতে নাই।

আমি বলিলাম, "ভাল। তাহাই দেওয়া যাউক। কি বল?"

তাহাই স্থির হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, অবশিষ্ট টাকাটার কি করি?

আমি এলাহাবাদে আসিয়াছি শুনিয়া আমাদের আর এক জন বাল্যবন্ধু সেই দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ভগবানদাস এলাহাবাদের উকীল, এবং অতি প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল; লোকে বলাবলি করিত, তাঁহার কাছে যে একবার টাকা ধার করিত, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়াইয়া তিনি তাহার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতেন। রামশরণ তাঁহার একমাত্র পুত্র। আমাদের পাড়ী পাশাপাশি, এবং আমরা সহপাঠী, তাই রামশরণের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। আজ রামশরণকে দেখিয়া আমার মনে হইল, তাহার নিকট আমার দায়িত্বে এক হাজার টাকা ধার করিয়া ব্রজেশকে দিব, এবং যাইবার সময় টাকা শোধ করিবার ভার বিভূতির স্কন্ধে চাপাইয়া যাইব।

সেই দিন অপরাহ্নে আমি রামশরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; সুর কথা বলিয়া আমি স্বয়ং আমার দায়িত্বে এক হাজার টাকা ধার চাহিলাম। রামশরণ

কয় মিনিট ইতস্ততঃ করিল; আমি ভাবিলাম, বেনে-বুদ্ধি প্রবল হইতেছে। তাহার পর সে উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে গেল, এবং অল্পক্ষণ পরে আমাকে হাজার টাকার একখানি চেক আনিয়া দিল।

আমি বলিলাম, "তোমার খাতা আন; লিখিয়া দিব। একটা লেখা পড়া থাকা ভাল।"

রামশরণ বলিল, "আমি কেবল তোমার অনুরোধে ও আর এক জন বাল্যবন্ধুর উপকারের জন্য এ টাকা দিলাম। কিছু লিখিতে হইবে না। ব্রজেশের যদি সুবিধা হয়, টাকা শোধ করিবে। আমি দাদনের কাজ তুলিয়া দিয়াছি।"

অত বড় কাজ তুলিয়া দিয়াছে শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন?"

"বাবার এক জন খাতক যে ভাবে ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল, তাহাতে আর কাজ চালাইতে পারিলাম না।"

আমি ভাবিলাম, একটা মোটা লোকসান হইয়া গিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি?"

৬

রামশরণ বলিতে লাগিল,—আমাদের বিদ্যালয়ের পথে মুন্সী নন্দকিশোরের সেই বড় বাড়ী তোমার মনে আছে?—সে-ই হরিণ, ময়ূর ও পারাবত দেখিতে আমরা যে বাড়ীতে প্রবেশ করিতাম? নন্দকিশোর সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহাদের সরিকে সরিকে মোকদ্দমা বাধে। বাবাই নন্দকিশোরের উকীল ছিলেন। কয় বৎসর মোকদ্দমা চলিল;—জলের মত অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। মুন্সীজীর সঞ্চিত ধন ফুরাইয়া গেল। বাবা প্রথম জনেই, জমে সম্পত্তি ও বাড়ী আবদ্ধ রাখিয়া, টাকা ধার দিতে লাগিলেন। কয় বৎসরে সুদে আসলে টাকা আসলের দ্বিগুণ হইয়া গেল। এই সময় মোকদ্দমাও শেষ হইল, মুন্সীজীরও মৃত্যু হইল।

বাবা নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইলেন। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া আপনি কিনিয়া লইলেন। গৃহমাত্র অবশিষ্ট রহিল, টাকাও পাওনা হইল। অল্প দিন পরে বাবা বাড়ীখানিও বিক্রয় করাইয়া কিনিলেন। কিন্তু বাড়ী দখল লইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে সংসারের বাস উঠাইতে হইল।

আদালতে সেলামী দিয়া পিতৃসম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার পাইলাম। আমি

দেখিলাম, বাড়ী দখল লইতে হইবে। মুন্সীজীর সন্তান ছিল না। অজস্র সুখে পালিতা তাঁহার বিধবা সেই গৃহে কোনওরূপে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। কেমন করিয়া গৃহ অধিকার করি?

কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া উকীলের পরামর্শ লইলাম। উকীল বলিলেন, দখল না লইলে সব বৃথা। আর অধিক সময় নাই; ইহার মধ্যে দখল না লইলে সব বিফল হইবে। আমি মুন্সীজীর পত্নীর নিকট সংবাদ পাঠাইলাম। সুখদিনসহচর দাস দাসীরা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। কেবল জগতে অন্য কোনও আকর্ষণহীনা এক বৃদ্ধা দাসী পুরাতন প্রভুপত্নীকে ত্যাগ করে নাই। সে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল; বলিল, বিধবাকে ভিটা হইতে তাড়াইলে তাঁহাকে পথে মরিতে হইবে। আমার অভাব নাই। তিনি যে কয় দিন আছেন, আমি যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে ভিটাচ্যুত না করি। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সব শুনিয়া আমি কিছু টাকা ছাড়িয়া দিতে চাহিলাম। দাসী বলিল, "তাঁহার দিবার ক্ষমতা থাকিলে সব টাকাই দিতেন। ক্ষমতা নাই। সকল দিন আহার জুটাও কষ্টসাধ্য হইয়াছে।"

আরও এক মাস গেল। আর চার দিন মাত্র সময় আছে। আমি আবার সংবাদ পাঠাইলাম; আবার সেই দাসী আসিল। আবার সেই কথা। কিন্তু আমি ত আর অপেক্ষা করিতে পারি না!

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আমি সংবাদ পাঠাইলাম, পর দিন প্রভাতে যাইয়া বাড়ী দখল করিব।

পর দিন প্রভাতে পরোয়ানা ও লোক লইয়া গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম। দ্বার মুক্ত। আমরা প্রবেশ করিলাম। বাহিরের মহল শূন্য,—অপরিচ্ছন্ন; ঝাঁকে ঝাঁকে পারাবত আমাদের অপরিচিত পদধ্বনিতে শঙ্কিত হইয়া উড়িতে লাগিল।

আমরা সে মহল অতিক্রম করিলাম।

অন্দর-মহলের দ্বারে সেই দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নয়নে কি পৈশাচিক দীপ্তি! সে বলিল, "আইস; তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।"

আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কয়টি কক্ষ অতিক্রম করিয়া আমরা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম।

দাসী প্রাঙ্গণমধ্যস্থলে তুলসীবেদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আমি চাহিয়া দেখিলাম,—সেই বেণীমূলে মরণাহতা রমণী,—মৃত্যুযাতনায় চঞ্চল। বুঝিলাম, সৌভাগ্যগৌরবচ্যুতা রমণী ভিখারিণীর লাঞ্ছিত জীবনের যাতনা-ভোগ হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। গৃহ-অধিকারের প্রমাণ কাগজপত্র চুড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত চিকিৎসকের সন্ধানে বাহির হইলাম।

অল্পক্ষণ পরে চিকিৎসক লইয়া ফিরিলাম।

তখন রমণীর মৃত্যুচাঞ্চল্য শেষ হইয়াছে; তিনি দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশার সকল যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

* * * * * * *

আমি রমণীর সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

সেই ঋণ-পরিশোধের পর আমি দাদনের কাজ বন্ধ করিয়া দিলাম। বিস্তৃত জাল ক্রমে গুটাইয়া তুলিলাম।

সে গৃহ অধিকৃত হইল। কিন্তু হায়!—সে গৃহ লইয়া আমি কি করিব? অনেক ভাবিয়া পিতার নামে একটি অনাথ-আশ্রম সংস্থাপন করা স্থির করিলাম। সে আশ্রমের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য এক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দিয়াছি। অনাথ-আশ্রম সেই গৃহে সংস্থাপিত হইয়াছে।

যদি আর কোথাও যাইবার না থাকে, চল, সে আশ্রম দেখিয়া আসি।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভাষা ও আদিরস।

৫

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাধারণতঃ যে সকল জীবের কাম-ভাব নাই, তাহারা মূক; এবং যে সকল জীবের কাম-ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা বাচাল। নিম্ন প্রাণিগণের মধ্যে অনেকেই কেবল কাম-কালে মুখর, অন্য সময়ে নহে। কামজ দৈহিক উত্তেজনা হইতেই প্রথমে ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে, পরে উহার উপকারিতা অনুভূত হইলে মস্তিষ্কের উন্নতি সহ উহা ক্রমে ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ভাষার বিকাশের নিমিত্ত মস্তিষ্কে অন্ততঃ

তিনটি স্নায়ু-কেন্দ্রের উৎপত্তি আবশ্যক হইয়াছিল :—শব্দ-কেন্দ্র, ভঙ্গী-কেন্দ্র ও বুদ্ধি-কেন্দ্র। শব্দ-কেন্দ্র ও ভঙ্গী-কেন্দ্রের সাহায্যে ভাষা উৎপন্ন হইয়া বুদ্ধি-কেন্দ্রের সাহায্যে উহা উন্নত হইয়াছে। বুদ্ধির উন্নতির সহ ভাষার উন্নতি সংঘটিত। শিশুরও যেমন, মানবজাতিরও তেমনই,—বুদ্ধির যতই উন্নতি হইয়াছে, ভাষারও ততই উন্নতি হইয়াছে। উচ্চারণের সমস্ত যন্ত্র থাকিতেও নিম্নপ্রাণিগণ কেবল বুদ্ধিহীনতাবশতঃই ভাষার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু মানবীয় ভাষা বংশপরম্পরাগত বৃত্তি নহে। পশু, পক্ষিগণ স্বভাবতঃই স্বীয় ভাষা উচ্চারণ করে। যদিও সঙ্গীতের ভাষা তাহারাও মাতার নিকট শিক্ষা করে, তথাপি কেহ শিক্ষা না দিলেও, গৃহপালিত একটিমাত্র পক্ষী আপনা হইতেই স্বীয় জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে। কামজ উত্তেজনা ও বংশপরম্পরাগত কামিক নির্ব্বাচন (sexual selection) প্রভাবে উহা তাহার জীবনের একাংশরূপে পরিণত হইয়াছে।* কিন্তু মানব-শিশুর তদ্রূপ নহে। সে একা একটিমাত্র মানবশিশু এক স্থানে থাকিলে মানবীয় ভাষা উচ্চারণ করিতে শিখিবে না। সে মানবসমাজে প্রতিপালিত হয় বলিয়াই মানবীয় ভাষা শিক্ষা করে। একজাতীয় মানব-শিশু অন্যজাতীয় মানবসমাজে বাস করিলে, অনায়াসে শেষোক্তের ভাষাই শিক্ষা করে। জাপানী বালক বাঙ্গালী-সমাজে পালিত হইলে বাঙ্গালাই শিখিবে। এই সকল হইতেই বুঝা যায় যে, মানবীয় ভাষা বংশগত নহে। উহা আপনা হইতে প্রস্ফুটিত হয় না। উহা অন্য বিদ্যার ন্যায় চেষ্টা দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়। উহা বুদ্ধিসাপেক্ষ। বুদ্ধি যেন এক এক জাতির (Race) এক এক ভাবে গঠিত হইয়াছে; এক এক জাতির ভাব, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা

* The bird speaks, even when untaught, the language of its species, Sexual Selection, as we may suppose, has made this language, an essential part of its being.

Wiesmann on Heridity vol. II. p. 49—50.

† His (man's) language does not Exist as a perfected faculty + but only as a possible expression of it, which only becomes actual when the individual preserves Communication with those who preceded him. Viz. when he is taught to speak. Hence it is that every human child can learn any language; hence it is that there is not one single human language, but hundreds of them. Wiesmann on Heridity. vol. II. 150.

যেন এক এক স্বতন্ত্র ভাবে বিকশিত হইয়াছে। তাই মানবীয় ভাষাও পৃথক পৃথক। পশু পক্ষিগণেরও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভাষার কিছু-কিছু ইতর-বিশেষ আছে; ইহা এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে। মানবীয় ভাষা সহজ বৃত্তি নহে, উহা শিক্ষালব্ধ। কিন্তু যে শিশু শিক্ষা করিবে, তাহার শিক্ষণীয়তা না থাকিলে শিখিতে পারে না। এই শিক্ষণীয়তা তাহার মস্তিষ্কের ও বাক্‌যন্ত্রের অবস্থারই নামান্তরমাত্র। বাক্‌যন্ত্রের কি মস্তিষ্কের কোনও অংশে অনুপযোগিতা থাকিলে, শিক্ষার সেই পরিমাণ বিঘ্ন হয়। এতদুভয়ের উপযোগিতা বংশপরম্পরাগত হয়। উপযোগিতা ও শিক্ষণীয়তা,—ইহারা বংশাগত ধর্ম্ম; অবশিষ্ট সকলই চেষ্টালব্ধ। যাহা বংশাগত-ধর্ম্ম, তাহা মানব জাতি প্রাথমিক জীবগণ হইতে বিবর্ত্তন-প্রভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। জীব-রাজ্যে যখনই প্রথমে ধ্বনির উদয় হইয়াছে, সেই হইতে ক্রমে বংশপরম্পরাগত নিয়মানুসারে মানব ভাষার অধিকারী হইয়াছে। নিম্ন প্রাণিগণের কামজ উত্তেজনাই ধ্বন্যাত্মক ভাষার মূল ছিল; ইহার চরম উৎকর্ষ বিহগ-সঙ্গীত। আর মানবের ভাষা বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার চরম উৎকর্ষ বুদ্ধির উৎকর্ষের সহিত জড়িত।

আদিকাল হইতে ধ্বনি, শব্দ ও ভাষার ইতিহাস এইরূপেই গঠিত হইয়াছে। দেহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে ভাষা ক্রমে বিবর্ত্তিত হইতেছে। দৈহিক উত্তেজনা * হইতে ধ্বনির উৎপত্তি হইয়াছে। তৎপরে তাহার উপকারিতা উপলব্ধি হইলেই তাহা ভাবগত হইয়াছে। তখন মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পরে ক্রমে বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া ভাষা এক্ষণে বহু পল্লবিত হইয়াছে। ভাষার দ্বিতীয় অবস্থা সঙ্গীত; ধ্বন্যাত্মক সঙ্গীত। তৃতীয় অবস্থা বর্ণাত্মক; সুতরাং এ অবস্থায় সঙ্গীতও তাহাই। দ্বিতীয় অবস্থার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ পক্ষীতে; আর তৃতীয় অবস্থার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ মানবে। সঙ্গীত মানবীয় ভাষার আদি ও শেষ বিবর্ত্তন। এই ভাবে ভাষার ইতিহাসের আলোচনা করিলে সমস্ত জীবজগৎ এক অপূর্ব্ব নিকট সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া যায়। ভাষাও বিবর্ত্তনবাদের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

---

* কামজ।

P3063

বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ সভার এক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিবিধ যুক্তিপ্রয়োগে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষার লক্ষণগুলি আমরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাকে পৈশাচিক প্রাকৃতের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। বঙ্গভাষাকে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে রাজেন্দ্র দাস, যদুনন্দন দাস, লোচন দাস, রামচন্দ্র খাঁ প্রভৃতি অনেকেই 'প্রাকৃত ভাষা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে যে উচ্চাদের কোনও ভাব লিপিবদ্ধ হইতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। 'সহজে পাঁচালী গীত, নানা দোষময়', 'পাঁচালীতে নহে যোগ্য বাদ' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের রচনায় অনেক সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এখন বিচার্য্য এই যে, কোন্ সময় বাঙ্গালা ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হইল? ইহার উৎপত্তিস্থল এবং ভাষার উদ্ভব—উভয়ই দুর্জ্ঞেয়, তাহার যথা-সন্ধান করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কি কারণে কোন সময়ে এই দেশের সংস্কৃত পণ্ডিতগণের উপেক্ষিত, পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বাঙ্গালা ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়া শিক্ষিতসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং তৎপূর্ব্বে সাহিত্য গঠনোপযোগী ইহার কি কি উপকরণ বিদ্যমান ছিল, ইহাই প্রথমতঃ আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত উপকরণগুলি বাঙ্গালা ভাষার আদিকালে বিদ্যমান ছিল।—

(১) বৌদ্ধধর্ম্মসূত্র ও বৌদ্ধরাজন্যস্তুতিগাথা।

(২) ডাক ও খনার বচন।

(৩) পল্লীর প্রেম-গীতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সপ্রমাণ করিয়াছেন, ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি ও ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যগুলি প্রথমতঃ বৌদ্ধ প্রভাবেই রচিত হয়; উহাতে বৌদ্ধ-ভাব সুস্পষ্ট। এই কথা এখন নানাপ্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রচনাগুলি নিম্নশ্রেণীর মুখে মুখে চলিত ছিল, কিংবা স্থলবিশেষে লিখিত আকারেও বিদ্যমান ছিল, বলা যায় না। যে ভাবেই থাকুক, বাঙ্গালা ভাষার আদি যুগে উহারা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই।

একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে রামাই পণ্ডিত একখানি ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন, রামাই বাইতি-জাতীয় ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীমান বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, রামাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ধর্ম্মপূজায় যোগ দান করিবার জন্য উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়; উহাতে 'ওঁ বুদ্ধায় নমঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আগেতে ছিলেন প্রভু নিরঞ্জন অবতার' এবং 'সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজের বহুত সম্মান' প্রভৃতি বৌদ্ধ-ভাবের অনেক অকাট্য তত্ত্ব উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ্ধতি ও ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মসূচক আরও অনেক কথার সমাবেশ দৃষ্ট হয়। 'ধর্ম্মরাজ জন্ম নিন্দা করে' একথা যখন রামাই পণ্ডিত রচনা করেন, তখন বোধ হয় জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই সকল পুঁথিতে মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধু ও হাড়ি পা, কালু পা প্রভৃতি ডোম্বাচার্য্য ও 'নিরঞ্জন', 'শূন্যমূর্ত্তি' প্রভৃতি ধর্ম্মরাজের বিশেষণ,—এই সকলের উল্লেখও বৌদ্ধভাব-সূচক! দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্র রাজার গানে দৃষ্ট হয়, উক্ত রাজা তদীয় গুরু ডোম-বংশ-তিলক হাড়ি পাকে প্রকৃত ধর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"হাড়ি পা বলেন বাছা শুন গোবিন্দাই,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম যার পর নাই।"

যোগী পাল, গোপী পাল, মহী পাল প্রভৃতি রাজন্যবর্গের স্তুতিগাথা সম্ভবতঃ ঐ সকল সম্রাটের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই—দশম, একাদশ ও দ্বাদশ খৃষ্টাব্দীতে রচিত হইয়াছিল; তৎকালে উহারা যে আকারে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে উহাদিগকে লিখিত সাহিত্যের অন্তর্গত না করিয়া উহার উপকরণ বলিয়াই পরিচয় দেওয়া উচিত। এই সকল গানের ভাষা ক্রমে ক্রমে অনেক পরিশুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তথাপি উহারা যে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্ব সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। মানিকচাঁদের গানে কড়ি দ্বারা লাজকর দিবার প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। উহা হিন্দুরাজত্বের সময় সূচক। মানিকচাঁদের স্ত্রীর শুভ্র দশন-পংক্তির সঙ্গে কবি মোক্তার উপমা দিয়াছেন। যে কালে পল্লীকবি দাড়িম্ব-বীজ ও মুক্তাফলের উপমা অবগত ছিলেন না,—তাহা নিতান্ত আধুনিক সময় নহে। পাল রাজগণের স্তুতি-গান এখনও রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। একদিনে ঐ গান বঙ্গদেশে

সর্ব্বত্র এত অধিক অঞ্চলে প্রচলিত ছিল যে, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত চৈতন্যভাগবত নায়ক পুস্তকে গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, হরি-কথার কোনও আদরই নাই ; কিন্তু

"ঘোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"

ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথি পূর্ব্বে ডোম, বুগী প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তিগণের করায়ত্ত ছিল। এই সকল বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত পুস্তক হাতে লইতে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইতেন, কিন্তু যখন তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, জনসাধারণ এই সকল গান ও পূজার নিতান্ত অনুরাগী, তখন এই ব্যাপারটা নীচ জাতির হাতে ফেলিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। কিন্তু ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ণ সম্বন্ধে লেখনী চালনা করিতে তাঁহারা অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করিতেন। ঐ সনে মাণিক গাঙ্গুলী ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিতে যাইয়া প্রাণে গুরুতর আঘাত অনুভব করিয়াছিলেন। প্রত্যাদেশকারী ঠাকুরের নিকট তিনি যুক্তকরে বলিয়াছিলেন,—

"জাতি যায় প্রভু যদি ইহা করি গান।"

পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। তাহাতে অজস্র সংস্কৃত শব্দ, এমন কি, চৈতন্য-বন্দনা পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রাচীন কোনও কোনও মসজিদের পশ্চাৎ দিকের আস্তর উঠাইয়া ফেলিলে অনেক সময় হিন্দু দেব দেবীর চিত্রযুক্ত ইষ্টক দৃষ্ট হয়। তখন বহির ভাগিয়া যে মসজিদ গঠিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথিগুলিরও সম্মুখের দিকটা ফিরাইয়া দেখিলে লুপ্ত-প্রায় বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন গোচরীভূত হয়।

(২) ডাক ও খনার বচন বহু প্রাচীন রচনার নিদর্শন। শেষোক্ত বচনগুলির সর্ব্বত্র অধিক প্রচলন নিবন্ধন উহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়াছে। ডাকের বচনের দুরূহতা অনেক স্থলে এখনও লক্ষিত হয়। 'আদি অন্ত যেহ পুছসি', 'সরণের যদি ডর বাসসি', কিংবা 'বুঝা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড। আগম হইলে পনিবারিব তুণ্ড" প্রভৃতি রচনা স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ। এই সকল বচন বহুকাল যাবৎ পল্লীর বেদব্যক্তি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মানিয়া আসিয়াছে। ইহাতে কৃষিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রন্ধন-নীতি, স্ত্রীচরিত্র প্রভৃতি পল্লীজীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় তত্ত্ব সংগলিত আছে।

উদাহরণ সংক্ষিপ্ত, সরল ও সত্য। দুই এক স্থলে ডাকের বচনে চার্ব্বাকের নীতিও প্রচারিত দৃষ্ট হয়। যথা,—

"ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকারে তুলিয়া না থোব॥
ঘরি ঘৃত করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ডাকার্ণব নামক বহু প্রাচীন বৌদ্ধ-তন্ত্র তিব্বতে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ডাকের বচনের অনেক কথা কঠিনতর ভাষায় তন্মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার মতে ডাকিনী-তন্ত্র, যোগিনী-তন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় ডাকার্ণবও একখানি তন্ত্র; এবং ডাক শব্দ ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ-বাচক।

(৩) পল্লীতে প্রেম-গীতি। মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বত্রই প্রেমের গান প্রচলিত আছে। কৃষকেরা মেঠো সুরে এ দেশে সেইরূপ গান অনেক গাহিয়াছে। তাটদিগের মুখে, কথকদিগের মুখে শত শত বৎসর যে সকল কথা উচ্চারিত হইয়াছে, এ দেশের প্রতি রাখালের স্থলে তাহার রেশ পাওয়া যাইত। জয়দেবের সংস্কৃত গানের ভাব এ দেশ মাতাইয়া রাখিয়াছিল; নতুবা গোবিন্দচন্দ্রের বিরহের গানে উক্ত অঙ্গের ভাবুকতা কেমন করিয়া আসিল? উহার অজ্ঞাত-নামা রচক সংস্কৃত কিংবা অন্য কোনও বিদ্যার ধার ধারিতেন না। রাজা সন্ন্যাসী হইবেন শুনিয়া মহিষী উদনা 'রাজার চরণে পড়ে জড়্যারে কুণ্ডল।' তাঁহার আর্ত্তনাদে পাষাণ গলিয়া গিয়াছিল, অশ্বশালে অশ্বগুলি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের চক্ষে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু পড়িয়াছিল। নারী ও শুক আহার ছাড়িয়া দিয়াছিল। ময়নামতীর স্ত্রী স্বামীর পাদ-পদ্ম বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল,—

"তুমি বড় বৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাজা চরণ বেড়িয়া কম্ পাইয়া যাবু কোথা।"

এই শোক-মুহ্যমানা বিরহিণীর কথা কৃষকেরা হলকর্ষণের সময় শস্যশ্যামল ক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিয়া যাইত। পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠতম কবি চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ এই সকল গানের ভাষা ও ভাব সবযত্নসম্পন্ন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব গীতাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলি উপেক্ষিত অবস্থায় বঙ্গদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

ছিল। ইহারা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আদরণীয় হইয়া উঠিল, তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

(১) বৌদ্ধধর্ম্মের বিলয়।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে পালী (পল্লী শব্দের অপভ্রংশ) ও অপরাপর প্রাকৃত ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। এই সকল প্রাকৃত বিশেষরূপ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল; ইহাদের নিয়ম-প্রচারের জন্য বহুসংখ্যক ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশ হইতে প্রাকৃতভাষার চর্চ্চা তিরোহিত হইল। সংস্কৃত ও উক্ত প্রাকৃত—এই উভয়বিধ ভাষাই সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত সংস্কৃতাপেক্ষা অনেকপরিমাণে সহজ থাকাতে, উহাই অল্পশিক্ষিত সাধারণের প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিতে ডুরি বাঁধিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রয়াণ করিলেন। মধ্যবর্ত্তী ভাষার আসন শূন্য হইল। সুতরাং অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর কথিত প্রাকৃতকে (বাঙ্গালা) লিখিত ভাষায় পরিণত করিয়া লোকশিক্ষার উপযোগী করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল।

(২) নবোত্থ হিন্দুধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপের পরে নবোত্থ হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল। চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবতাদিগের সংক্ষিপ্ত ব্রত-কথা এই ভাষায় রচিত হইল। সাহিত্যের হিসাবে সেই আদি যুগে ইহাদের স্থান অতি নগণ্য ছিল, কিন্তু কালসহকারে এই সামান্য ব্রত-কথা কতকগুলি বিচিত্র শোভাসম্পৎযুক্ত কাব্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

(৩) মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়।

কিন্তু বঙ্গভাষা যে সহসা শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আদরণীয় হইয়া উঠিল, মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ই তাহার একটি সর্ব্বপ্রধান কারণ।

হিন্দু রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলে বঙ্গভাষাকে বহুকাল অনাদৃত অবস্থায় থাকিতে হইত। পাল ও সেন রাজগণের যুগে এই ভাষার কোনও শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এই পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বাঙ্গালা ভাষাকে একান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পূজার যে ব্রত-কথা রচিত হইত, তাহা অনেক সময় যাজনশীল ব্রাহ্মণ নিজে পাঠ করিতেন না; গৃহস্থ তাহা

নিজে পড়িতেন। পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পাঠ করিয়া চলিয়া যাইতেন। হিন্দু রাজা ও হিন্দু জমীদারগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল মলয় সমীরের ন্যায় পদাবলী প্রতিধ্বনিত হইত। সেখানে 'ভৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল' প্রভৃতি ন্যায়ের দুই সীমাংসিত হইত; এবং বৈষধাদি কাব্যের অলঙ্কার-রহস্য ও দর্শনের সূক্ষ্মগ্রন্থি-মোচনের জন্য বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত ছিলেন। এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষার প্রবেশলাভ অসম্ভব কল্পনা। ব্রাহ্মণগণ ইহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা পরবর্ত্তী কালের শ্লোক ও প্রবাদবাক্যে সূচিত হইতেছে। একটি প্রবাদ এই,—'স্ত্রীতিবেসে, কাশীবেসে, আর বামুন ঘেসে। এই তিন সর্ব্বনেশে॥' একটি শ্লোক এই,—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

এ প্রকার উপেক্ষিতার রাজ-সম্মানলাভ অসম্ভব কল্পনা; কিন্তু মুসলমান সম্রাটগণের সাহায্যে এই অসম্ভব সম্ভব হইল।

গৌড়ের তক্তে মুসলমান সম্রাটগণ আসীন হইলেন। তাঁহারা ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এ দেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে এ দেশীয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ইদ্, সবেরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এ দিকে দীর্ঘকাল এ দেশ বাস নিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল।

গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্ত্তনায় হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরব্ধ হইল। গৌড়েশ্বর নসির খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁহার রাজ্য-কাল ৪০ বৎসর ব্যাপক ছিল। এই মহাত্মা মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সেই মহাভারতখানি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কিন্তু পরাগল খাঁর আদেশে অনুদিত পরবর্ত্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।* কবি বিদ্যাপতিও এই নসিরা শাহ † এবং গৌড়েশ্বর 'প্রভু

* "শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী সে তাহার নিদান।"—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

† "সে যে নসিরা সাহ জানে। তার হুসেন মরম বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।"

গয়াসউদ্দিন সুলতানের প্রশংসা করিয়াছেন। নসিরা খাঁ যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাষ আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ ছিলেন, কিন্তু ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মুসলমান সম্রাটগণের দৃষ্টান্তানুযায়ী। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাব-চিহ্নিত ছিল; অমাত্যের খাঁ উপাধিতেই তাহা দৃষ্ট হয়। হুসেন শাহ কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন, এবং উক্ত কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায় সুচারুরূপে অনুবাদ করিলে তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট হুসেন শাহের প্রশংসাসূচক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কাব্যে পাওয়া যায়। * হুসেন শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁ পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় করিতে প্রেরিত হন। ইনি চট্টগ্রামে আসিয়া মগদিগকে দমন করেন, এবং নোয়াখালী জেলায় একখানি গ্রাম পত্তন করিয়া তাহাতে বসবাস করেন। এই গ্রামের নাম পরাগলপুর। পরাগলপুরে খাঁ সাহেবের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি দ্রৌপর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী নামক অনেক কবি অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকে ছুটি খাঁর প্রতাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্ব্বতগহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥"

এই সকল অনুবাদ পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকার্য্যাবসানে মুসলমান সম্রাটগণ পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শুনিতে আগ্রহ দেখাইতেন। কবি আলওয়াল আরাকান-রাজের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের আদেশে তাঁহার বিখ্যাত পদ্মাবতী কাব্যের অনুবাদ

* (১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ইঁহাকে 'কৃষ্ণের অবতার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।
(২) চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, ইনি চৈতন্যের এক জন ভক্ত হইয়াছিলেন।
(৩) "সনাতন হুসেন সাহ নৃপতিতিলক।"—বিজয় গুপ্ত।
(৪) "সাহ হুঁসেন, জগৎভূষণ, সেই এহি বন জানে।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভনে যশোরাজ খানে।"

রচনা করেন। মাগন ঠাকুর নাম দেখিয়া জাতি ভুল করিবার আশঙ্কা আছে, সুতরাং বলা উচিত, মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন। হোসেন নামক অপর জনৈক মুসলমান বড়লোকের আদেশে একখানি পার্শী গল্প-পুস্তকের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন; দৌলত কাজি নামক অপর এক জন কবি পূর্ব্বোক্ত ভাবের আশ্রয় লাভ করিয়া 'লোর চন্দ্রাণি' নামক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্যই দীনা হীনা বঙ্গভাষার রাজদ্বারে প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন, হিন্দুরাজগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সম্রাটগণের দৃষ্টান্ত পল্লীর জমীদারগণ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা ভাষা এই ভাবে হিন্দু রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অনন্যগতি হইয়া ইহার পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন। সুতরাং আমরা রাজা রঘুনাথ রায়ের ও বাঁকুড়া রায়ের সঙ্গে মুকুন্দরাম কবির, যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে রামেশ্বরের, বর্দ্ধমানাধিপ কীর্ত্তিচন্দ্রের সঙ্গে কবি ঘনরামের, কৃষ্ণনগরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের নাম একত্র জড়িত পাইতেছি। রাজমালায় উল্লিখিত আছে যে, ত্রিপুরেশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশে সমগ্র মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছিল। চলিত একটি শ্লোকে আছে, 'বিদ্যাশ্রয়ে ন শ্রীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।' প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ কবিই কোন না কোন আশ্রয়দাতা রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। উক্ত সাহিত্যাতিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ধারণা এই যে মুসলমান দরবার হইতেই এই প্রথা দেশময় সংক্রামিত হইয়াছিল; নতুবা বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্রকে ঠেলিয়া এবং পণ্ডিতগণের প্রাচীরপ্রমাণ নস্যাধারের বাধা অতিক্রম করিয়া কত কালে যে রাজধানীতে প্রবেশলাভ করিত, তাহা বলা যায় না।

শুধু কয়েকখানি ব্রতকথা ও মুসলমান সম্রাটগণের এই সামান্য আদর,—ইহাই কি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির যথেষ্ট কারণ ছিল? কোনও অসামান্য প্রতিভা লাভ করিতে হইলে তদুপযোগী সাত্ত্বিকী প্রাণশক্তি চাই। বঙ্গভাষার

একটা স্থানে সেই প্রাণশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। অচিরাৎ তাহা অপূর্ব্ব প্রেম-সঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

রঙ্গদেশে প্রেম-লীলার অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন, এই শুভ সংবাদের আভাষ চণ্ডীদাস শুনাইলেন। অশিক্ষিত পল্লীকবি প্রেম-বীণার যে উচ্চ তন্ত্রীতে করস্পর্শ করিয়াছিলেন, স্বয়ং জয়দেব বা বিদ্যাপতি তাহা পারেন নাই। তাঁহার কবিত্বের উৎস,—রজকিনী রামীর প্রেম। তৎসম্বন্ধে চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—'এই প্রেম নিকষিত হেমতুল্য, ইহাতে কামগন্ধ নাই—ইহা তাঁহার "উপাসনা-রস"।' পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ ও গায়ত্রীর পবিত্রতা * তিনি এক তীর্থে মিলাইয়াছিলেন, তাহা রজকিনীর গৃহে। পঙ্কে জন্মিয়াছে বলিয়া পঙ্কজ অশুচি হইয়া যায় নাই, বরং পঙ্কের নামেই পদ্ম নিজের পরিচয় দিতেছে। চণ্ডীদাস রজকিনীর প্রেমের কথায় আপনার পরিচয় দিয়াছেন; সেরূপ লেখা আর কোনও ব্রাহ্মণ কবির সাহসে কুলাইত কি না সন্দেহ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম তিনি ভাবের যে উচ্চ গ্রামে কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভাব-সম্মিলনের পদে একমাত্র বিদ্যাপতি তত ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনাকালে আমরা তাহার বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মুসলমান সম্রাট ও রাজনশীল পুরোহিতদিগের উপেক্ষা-মিশ্র সামান্য আদরই বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন নহে। ইহার এক নিভৃত কক্ষে রাজভাণ্ডার প্রোথিত ছিল। আকবরের সমস্ত অমূল্য হীরক-খণ্ডের ন্যায় পল্লীর অমার্জ্জিত ভাষায় রচিত চণ্ডীদাসের পদ এ দেশকে সেই রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দিল। বাঙ্গালার আদি কবি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠতম কবি; ইহাতে বুঝা যায়, সংস্কৃত-চর্চ্চা এ দেশকে যত বড় করিয়াছে, ইহার স্বদেশীয় আভ্যন্তরীণ শক্তি ইহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর গ্রামে পৌঁছাইয়াছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, বাঙ্গালা ভাষা পণ্ডিত ও ধনী মুরুব্বীর আশ্রয় পাইলেও, কেহ ইহাকে গায়ে পড়িয়া বড় করিতে পারে নাই। ইহা সম্রাজ্ঞীর ন্যায় সম্রাটে সৌভাগ্যচিহ্ন লইয়া পল্লী হইতে নগরে আসিবার জন্য যান বাহনের প্রতীক্ষা করিতেছিল মাত্র।

---

* তুমি রজকিনী.....
তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসংধ্যা যাজন, তোমার ভজন।
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।

প্রাচীন বঙ্গ।

—:০:—

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৬২৯-৪৫ খৃঃ) চিরখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎকালে বঙ্গ নামে কোনও দেশ বা রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে প্রদেশ বঙ্গ-দেশ নামে পরিচিত, তাহা হুয়েনসাঙের সময়ে পাঁচটি স্বতন্ত্র দেশ বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

১। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন;—বর্ত্তমান মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা এই রাজ্যভুক্ত ছিল।

২। কামরূপ রাজ্য;—এই রাজ্য করতোয়া নদীর তীর হইতে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মণিপুর, জন্তিয়া, কাছাড়, পশ্চিম আসাম ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায় যে, কামরূপ রাজ্যের রাজধানীর নাম প্রাগ্-জ্যোতিষ ছিল।

৩। সমতট;—সমতট শব্দের অর্থ তীরবর্ত্তী, বা সমতল দেশ। পূর্ব্ববঙ্গ; বরাহমিহিরের গ্রন্থে সমতটের নাম-উল্লেখ দেখা যায়।

৪। তাম্রলিপ্তি;—বর্ত্তমান মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া এই রাজ্য গঠিত ছিল।

৫। কর্ণসুবর্ণ;—পশ্চিম বঙ্গ। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্তর্গত রাঙ্গামাটী কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

হুয়েনসাঙ এই সকল রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে বিবরণ কৌতুকাবহ, এবং তৎকালের অবস্থার সুন্দর চিত্রপট। আমরা উক্ত বিবরণের সারসঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য চক্রাকারে ৮ শত মাইল (৪০০০ লি); রাজধানী চক্রাকারে ৬ মাইল (৩০ লি)। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন জনাকীর্ণ দেশ। রাজধানীতে জলাশয়, রাজকার্য্যালয় ও পুষ্পোদ্যান সকল ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থিত-

ভক্ত। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের ভূমি সমতল, চিক্কণ ও উর্ব্বরা; এখানে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে সর্ব্ববিধ শস্য উৎপন্ন হয়। পনস ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়; এবং এই ফল অতিশয় লোকপ্রিয়। দেশের জলবায়ু অতিশীতোষ্ণ। জনমণ্ডলী বিদ্যানুরাগী। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে প্রায় বিংশতিসংখ্যক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক তিন সহস্র আচার্য্য অধ্যাপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এখানে নগণ্য দেব-মন্দির দেখা যায়; এই সকল দেব-মন্দিরে নানা-সম্প্রদায়-ভুক্ত যাত্রিবৃন্দ মিলিত হন। অসংখ্য উলঙ্গ নিগ্রন্থ এই রাজ্যে বাস করেন।

রাজধানী হইতে পশ্চিম দিকে ৪ মাইল দূরে রাশিভা সঙ্ঘারাম অবস্থিত। বিদ্যালয়-ভবন আলোকপূর্ণ ও প্রশস্ত; চূড়া ও মণ্ডপসমূহ অমুচ্চ। এই বিদ্যালয়ে আচার্য্যের সংখ্যা নাত শত। পূর্ব্ব-ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার্য্য এইখানে বাস করেন।

এই বিদ্যালয়ের অনতিদূরে অশোক-রাজ-নির্ম্মিত স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে তথাগত (বুদ্ধদেব) পুরাকালে তিন মাস ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সময় সময় উপবাসদিনে ইহার চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হয়।

ঐ স্থানের পার্শ্বেই আর একটি স্থান। এই স্থানে প্রাচীন বুদ্ধ-চতুষ্টয় পরিভ্রমণ ও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই সকলের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

ইহার অল্প দূরে একটি বিহারে বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। তাঁহার দৈবজ্ঞতার নিকট কিছুই অজ্ঞাত নহে; তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রগতি ভ্রমশূন্য। দূর ও নিকট, নানা স্থানের লোক সকল আসিয়া তাঁহার প্রত্যাদেশলাভের জন্য হত্যা দিয়া থাকে।

হুয়েনসাঙ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কামরূপে গমন করেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লি পশ্চিমে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত ছিল। হুয়েনসাঙ পথিমধ্যে একটি সুবৃহৎ নদী (সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্র নদ) উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কামরূপ।

কামরূপ রাজ্য চক্রাকারে ২ হাজার মাইল (১০ হাজার লি)। রাজধানীর পরিমাণ চক্রাকারে ৬ মাইল। কামরূপের ভূমি নিম্ন, উর্ব্বরা ও রীতিমত কর্ষিত। কামরূপে পনস ও নারিকেল ফল জন্মে। এই সকল ফলের

সংখ্যা বহু, তথাপি উহার মূল্য অনেক। নগরসমূহের পার্শ্বে নদী বা কৃত্রিম জলাশয় বর্ত্তমান। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও প্রীতিকর। কামরূপ-বাসিগণের আচার ব্যবহার সরল ও ভদ্রতা-সম্পন্ন। তাহারা ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণাভ পীতবর্ণ। তাহাদের স্বভাব উগ্র ও রুক্ষ। তাহাদের স্মৃতি-শক্তি তীক্ষ্ণ; তাহারা বিদ্যার্জ্জনে বদ্ধশীল।

কামরূপবাসীরা দেব দেবীর উপাসক। তাহারা উপাস্য দেবতার প্রীত্যর্থ বলি প্রদান করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাহাদের আস্থা নাই। এ কারণ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে আজ পর্য্যন্ত আচার্য্যগণের মিলন জন্য কোনও সঙ্ঘারাম এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাঁহারা পবিত্র ধর্ম্মে বিশ্বাসী, তাঁহারা গোপনে প্রার্থনা করেন। এক শত দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল দেব-মন্দিরে নানা-সম্প্রদায়ভুক্ত সহস্র সহস্র শাস্ত্রবিদ্ বাস করেন। কামরূপের বর্ত্তমান অধিপতি ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত। এই বংশের আদিপুরুষের নাম নারায়ণ দেব। বর্ত্তমান রাজার নাম ভাস্কর বর্ম্মণ। তাঁহার উপাধি কুমার। অদ্য পর্য্যন্ত নারায়ণি বংশের এক সহস্র (?) পুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। কামরূপের অধিপতি জ্ঞানানুরাগী; তাঁহার আদর্শে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যেও জ্ঞানানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে। দূরবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে ভীক্ষ্ণদর্শী বিচক্ষণ লোক সকল রাজকার্য্য অন্বেষণে অপরিচিতের ন্যায় রাজধানীতে উপনীত হন। যদিও রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহেন, তথাপি বিদ্বান শ্রমণগণকে তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। সুদূর চীন হইতে বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য এক জন পরিব্রাজক (হুয়েনসাঙ) নালন্দের সঙ্ঘারামে আগমন করিয়াছেন, কামরূপের অধিপতি এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দূত প্রেরণ করেন। কামরূপ রাজ্যে গমন জন্য তিনি রাজদূত কর্ত্তৃক তিন-বার অনুরুদ্ধ হয়েন; কিন্তু তথাপি নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। তখন ঐ দূত তাঁহাকে বলেন, "আপনি বুদ্ধ দেবকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে অভিলাষী, অতএব সত্য ধর্ম্ম প্রচার করাই আপনার কর্ত্তব্য। পথ সুদীর্ঘ বলিয়া আপনি ভীত হইবেন না। ভাস্কর রাজপরিবার অপধর্ম্মে (হিন্দুধর্ম্ম) বিশ্বাসী, এখন তাঁহারা এক জন শ্রমণকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, ইহা সুলক্ষণ। আমাদের অনুমিত হইতেছে যে, কামরূপের অধিপতি মত-পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এবং জনসাধারণের হিতার্থ নিজে পুণ্যসঞ্চয় করিতে

ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আপনার বন্ধুবান্ধবগণ [illegible] যাপনি জীবন তুচ্ছ করিয়া পৃথিবীর বহুদেশে শাস্ত্র-অন্বেষণের জন্য নানা দেশে ভ্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। স্বদেশ ভূমিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবেন; প্রশংসা বা নিন্দা কিছুতেই বিচলিত না হইয়া পবিত্র ধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) বিস্তৃতির জন্য পথ পরিষ্কার, মিথ্যা শিক্ষার ভ্রান্ত মতসমূহকে সুপথে পরিচালন ও পরহিতে আত্মহিত বিসর্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত করা আপনার কর্ত্তব্য। যশের চিন্তা বিস্মৃত হইয়া কেবল কার্য্যে নিরত থাকিবেন।" ইহা শুনিয়া ঐ ভ্রমণে আর কোনও আপত্তি না করিয়া রাজদূত সহ রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কুমাররাজ বলিলেন, "আমি নিজে বিদ্যাবুদ্ধিহীন, তথাপি ন্যায়ধর্ম্মী বিদ্বজ্জনের অনুরাগী; এই কারণ আপনার যশঃ ও প্রতিষ্ঠার বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনাকে আগমনের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছি।" শ্রমণ উত্তর করিলেন, "আমার বিদ্যা বুদ্ধি পরিমিত, আমার এই সামান্য খ্যাতির বিষয় মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে, ইহাতে আমি লজ্জিত হইয়াছি।" কুমাররাজ বলিলেন, "এখন শিলাদিত্য (ইনি দ্বিতীয় শিলাদিত্য; শিলাদিত্য উপাধিমাত্র; প্রকৃত নাম হর্ষবর্দ্ধন। প্রথম শিলাদিত্যের রাজত্বকাল খ্রীষ্টেনব্দের আগমনের বহু বৎসর পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল। ইঁহারা উভয়েই কান্যকুব্জ দেশের অধিপতি ছিলেন।) কান্যকুব্জ দেশে বাস করিতেছেন। তিনি সত্য, জ্ঞান ও পুণ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিপুল অর্থ দান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন; পঞ্চনদ প্রদেশের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ অবশ্যই এক সঙ্গে মিলিত হইবেন। শিলাদিত্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি প্রার্থনা করি, আপনি আমার সমভিব্যাহারে গমন করিবেন।" অতঃপর উভয়ে এক সঙ্গে যাত্রা করেন।

কামরূপ রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় পর্ব্বতমালা অবস্থিত। এই রাজ্যে কোনও সুবৃহৎ নগর দেখিতে পাওয়া যায় না। সীমান্তে চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশবাসী-অসভ্য-জাতির বাস। এই সকল অসভ্যের আচার ব্যবহার মাল জাতির তুল্য। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এই স্থান হইতে দুই মাসে (চীনের) সুহ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পঁহুছিতে পারি। কিন্তু পর্ব্বত ও নদী এই পথের বিঘ্ন, এবং দুষিত বায়ু, বিষাক্ত ঘাস, ভয়ঙ্কর সর্প ও ভীষণদর্শক গাছ পাহাড় প্রভৃতি মৃত্যুর কারণসমূহ বর্ত্তমান।

এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে দলে দলে হস্তী পাওয়া যায়। এই জন্য হস্তী বিশেষভাবে যুদ্ধকালে নিয়োজিত হয়।

১২০০ কি ১৩০০ লি দক্ষিণে সমতট রাজ্য অবস্থিত।

সমতট।

সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৬০০ মাইল (৩০০০ লি) এবং সমুদ্রের উপকূলে। ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। রাজধানী চক্রাকারে ৪ মাইল। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে শস্য জন্মে। সর্ব্বত্র ফল ও ফুল পাওয়া যায়। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার-ব্যবহার প্রীতিপ্রদ। সমতটবাসীরা সভাবতঃ কষ্টসহিষ্ণু, ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী সকলে যত্নসহকারে বিদ্যা উপার্জ্জন করে। সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) ও অপধর্ম (হিন্দুধর্ম) উভয় ধর্ম্মের আচার্য্যগণই বাস করেন। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় দুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি করেন। ইহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-ভুক্ত। সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক এক শত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেব-মন্দিরেই নানা-সম্প্রদায়-ভুক্ত পাষণ্ডিগণ বাস করেন। নির্গ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

নগর হইতে অনতিদূরে অশোকনির্ম্মিত স্তূপ। এই স্থানে পূর্ব্বকালে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারি শত বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান।

ঐ স্তূপের অনতিদূরে একটি সঙ্ঘারামে হরিত-প্রস্তর-নির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তি আট ফিট উচ্চ।

সমতট হইতে ৯০০ লি পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ।

তাম্রলিপ্তি।

তাম্রলিপ্তি চক্রাকারে ৩০০ মাইল (১৪০০ বা ১৫০০ লি); ইহার রাজধানীর পরিমাণ মাত্র দুই তিন মাইল। ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং নানাবিধ ফল ফুল যথেষ্টপরিমাণে জন্মে। তাম্রলিপ্তি প্রধানতঃ জলপথ। লোক সত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী ও চঞ্চল। তাহারা

পরিশ্রমী ও সাহসী। এখানে সত্যধর্ম্ম ও অপধর্ম্ম, উভয়বিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই বাস। সমতট রাজ্যে প্রায় দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল সঙ্ঘারামে ন্যূনাধিক এক সহস্র আচার্য্য বাস করেন। দেবমন্দিরের সংখ্যা ৫০; দেবমন্দিরগুলিতে নানা-সম্প্রদায়ভুক্ত শাস্ত্রবিদ্‌গণ বাস করিতেছেন। তাম্রলিপ্তি রাজ্যের তটভূমি সমুদ্রের সহিত মিলিত; বস্তুতঃ তাম্রলিপ্তি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এখানে যথেষ্টপরিমাণে মণি মুক্তা সংগৃহীত হয়; এবং এই কারণে তাম্রলিপ্তিবাসীরা সাধারণতঃ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী।

তাম্রলিপ্তির রাজধানীর পার্শ্বে অশোক-রাজ-নির্ম্মিত স্তূপ। ইহার পার্শ্বে চারি জন প্রাচীন বুদ্ধের অবস্থান ও ভ্রমণের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাম্রলিপ্তির সাত শত লি উত্তর-পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ।

কর্ণসুবর্ণ।

কর্ণসুবর্ণ রাজ্য চক্রাকারে ৩ শত মাইল (১৪০০ বা ১৫০০ লি); রাজধানী চক্রাকারে ৪ মাইল। কর্ণসুবর্ণ জনাকীর্ণ দেশ। অধিবাসীরা বলশালী ও সুখী। ভূমি নিম্ন ও চিক্কণ। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে ফুল ও নানাজাতীয় মূল্যবান পদার্থ জন্মে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর; লোকের আচার ব্যবহার মনোরম ও সাধুতাসম্পন্ন। তাহারা অতিশয় জ্ঞানানুরাগী, এবং অভিনিবেশসহকারে জ্ঞানার্জ্জনে নিরত। এই দেশে সত্যধর্ম্মাবলম্বী ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, উভয় শ্রেণীর লোকই দেখা যায়। এখানে ন্যূনাধিক দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। প্রায় দুই হাজার আচার্য্য এই দশটি সঙ্ঘারামে অবস্থিতি করেন। এখানে পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। কর্ণসুবর্ণ দেশে অপধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অসংখ্য।

রাজধানীর পার্শ্বে রক্তমৃত্তিকি নামক সঙ্ঘারাম। এই সঙ্ঘারামের কক্ষ সকল আলোকপূর্ণ ও প্রশস্ত; ধবল চূড়া সমুচ্চ। এই স্থানে রাজ্যের সমস্ত খ্যাতনামা বিদ্বান্ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত হয়েন। তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পরস্পরের উন্নতিসাধন ও চরিত্রের পূর্ণতা-বিধানে যত্ন করেন। প্রথমতঃ কর্ণসুবর্ণবাসীরা সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তৎকালে দক্ষিণ-ভারতের এক জন অপধর্ম্মাবলম্বী উদরের উপর তাম্রপাত্র ও মস্তকে প্রজ্বলিত মশাল ধারণ করিতেন। এই ব্যক্তি দণ্ডহস্তে সগর্ব্বে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিপক্ষের সহিত তর্ক করিবেন বলিয়া ঘোষণা

প্রচার করিলেন। এক জন লোক তাঁহাকে বলিল, "আপনার শরীর ও মস্তক এরূপ অদ্ভুত ভাবে সজ্জিত কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার জ্ঞান অপরিমিত; তাহার ভরে আমার উদর বিদীর্ণ হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করি; আমি অজ্ঞান ব্যক্তি সকলের দুঃখে বিচলিত হইয়াছি, ইহারা অন্ধকারে রহিয়াছে, এই জন্য আমি মস্তকে আলোক ধারণ করিয়াছি।"

দশ দিনের মধ্যেও কেহ তাঁহার সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হইল না। সমস্ত জ্ঞানী ও বিদ্বৎকুলে এরূপ ব্যক্তি এক জনও ছিলেন না, যিনি তাঁহার সহিত তর্ক করেন। ইহাতে রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "হায়! আমার রাজ্যে অজ্ঞানান্ধকার এত দূর পরিব্যাপ্ত যে, এক জন লোকও এই আগন্তুকের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। ইহা আমার রাজ্যের পক্ষে বড়ই অযশের বিষয়। কোনও উপযুক্ত লোকের সন্ধান পাওয়া যায় কি না, তাহা আমরা অতি নগণ্য স্থানেও সন্ধান করিয়া দেখিব।"

তখন এক জন লোক বলিল, "মহারাজ! নিকটবর্ত্তী বনে এক জন শ্রমণ বাস করেন। তিনি অধ্যয়নে অতিশয় যত্নপর। তিনি এখন নির্জ্জনে গোপনে বাস করিতেছেন। তিনি দীর্ঘজীবী; তিনি আপন উৎকর্ষ বলে ইহার ন্যায় অধার্ম্মিকের সহিত তর্ক করিবার উপযুক্ত।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রমণকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য নিজে গমন করিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শ্রমণ উত্তর করিলেন; "দক্ষিণ-ভারতে আমার নিবাস; আমি দেশভ্রমণোপলক্ষে এখানে আগমন করিয়া কিছু দিনের জন্য অপরিচিতের ন্যায় বাস করিতেছি। আমার ক্ষমতা সামান্য ও সাধারণ। আমার বিশ্বাস যে, মহাশয় ইহা অবগত নহেন। যাহা হউক, যদিও কোন্ বিষয়ে তর্ক করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু অবগত নহি, তথাপি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে গমন করিব। যদি আমি তর্কে অপরাজিত থাকি, তবে মহারাজকে একটি সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধনের জন্য প্রচারকগণকে আহ্বান করিতে অনুরোধ করিব।" রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। আমি আপনার গুণবত্তা বিস্মৃত হইতে অসমর্থ।"

অতঃপর শ্রমণ রাজ-নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক বিচারক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। অপধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত স্বীয় শাস্ত্র হইতে ত্রিশ হাজার শব্দ আবৃত্তি করিলেন।

তাঁহার যুক্তি প্রগাঢ় ও প্রমাণ প্রচুর; বস্তুতঃ সমস্ত বিচারপদ্ধতি মনোহর হইয়াছিল।

শ্রমণ সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিলেন; কোনও তর্ক বা মন্ত্র তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারিল না। তিনি কয়েক শত মন্ত্রের সাহায্যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন; এবং তার পর পণ্ডিতকে তদীয় ধর্ম্মের মূল সূত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতের বাক্য-স্ফূর্ত্তি রুদ্ধ হয়, এবং তর্কসমূহ অসার হইয়া পড়ে। তিনি উত্তর দিতে অসমর্থ হন। এইরূপে তাঁহার যশঃপ্রভা মলিন হইয়া যায়; এবং তিনি পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন।

অতঃপর রাজা শ্রমণকে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া এই মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি এই রাজ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে।

ঐ সঙ্ঘারামের পার্শ্বে অনতিদূরে অশোক রাজার নির্ম্মিত স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তথাগত এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, তখন তিনি উক্ত স্থানে উপদেশ প্রদান করিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও জীবনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। এই সঙ্ঘারামের পার্শ্বেই একটি বৌদ্ধ বিহার। এই-খানে চারি জন বৌদ্ধের ভ্রমণ ও অবস্থানের চিহ্ন দেখা যায়। নানা স্থানে আরও অনেকগুলি স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল স্থানে বুদ্ধদেব প্রকৃষ্ট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সমস্ত স্তূপও অশোক রাজার নির্ম্মিত।

কর্ণসুবর্ণ দেশের ৭০০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে উড্র (উড়িষ্যা) রাজ্য।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

উপমা।

অনেকের যেন একটা ধোঁয়াটে রকম বিশ্বাস আছে যে, অনেকগুলি লাগসই উপমা দিতে পারলেই কবিতা হয়। তা হয় না।

এরূপ বিশ্বাস থাকবার কারণ যে একেবারে নাই, তা আমি বলতে প্রস্তুত নই। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস একটি উপমার সাগর। সেক্সপিয়রের নাটকেও উপমার প্রাচুর্য্য দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় মাইকেলও

এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু যদি এই কবিগণ কেবল উপমা-বর্জ্জনই হতেন, তা' হ'লে তাঁরা কবি হতেন না।

তবে কবিতায় উপমার সার্থকতা কি? কেন কবিগণ এত উপমাপ্রিয়? অথচ প্রবন্ধ-রচয়িতারা সেরূপ ন'ন। অন্ততঃ যারা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখক, (যেমন এমার্সন, স্পেন্সার, মিল, রস্কিন ইত্যাদি; কার্লাইল গদ্যে কবি ছিলেন।) তাঁরা মোটেই উপমাপ্রিয় ন'ন। আমাদের দেশে দুই এক জন প্রবন্ধ-রচয়িতা প্রবন্ধে বড়ই অধিক উপমা ব্যবহার করেন। তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, তর্কে উপমা লেখককে পদে পদে প্রমাদপূর্ণ যুক্তিতে টেনে নিয়ে ফেলে, আর এই উপমাপূর্ণ যুক্তি বালককেই বোঝাতে পারে, বিজ্ঞকে বোঝাতে পারে না। উপমা প্রায় কখনই একটা যুক্তিস্বরূপ গ্রাহ্য হ'তে পারে না; অতএব প্রবন্ধে যত উপমা বর্জ্জন করা যায়, তত তার নির্প্রমাদ হ'বার সম্ভাবনা। কথাটা একটু ভেবে দেখা যাক। উপমার কাজ তিন রকমের:—

প্রথমতঃ, উপমা ভাব-প্রকাশের একটি অন্যতম উপায়। কথাবার্ত্তায়ও যখন সোজা কথায় ভাবটা সম্যক প্রকাশ করতে পারছি না, তখন আমরা উপমার সাহায্য গ্রহণ করি। যেমন, যখন আমরা বলি যে, অমুকের মুখখানি পদ্মফুলের মত, তখন আমার মানে এই যে, তার মুখখানি দেখতে অতি সুন্দর,—কিংবা যখন বলি যে, সে যখন গান গায়, সে গাধার মত চীৎকার করে, তখন তার মানে যে, তার স্বর তখন অত্যন্ত কর্কশ শোনায়;—উভয় স্থানেই একটা সকলের জানা জিনিস দিয়ে—মনের ভাবটা বুঝিয়ে দিলাম। তবে উপমা মনের ভাবটা ভালো করে' প্রকাশ করবার একটা উপায়। অর্থাৎ, উপমা অনেকটা উদাহরণের কাজ করে। মনের ভাবটা স্পষ্ট-তর করে। এই উদ্দেশ্যে উপমা গদ্যেই অধিক ব্যবহৃত হয়। তবে পদ্যেও এরূপ উপমা ব্যবহৃত হয়; আমরা প্রচলিত ভাষায় সাধারণতঃ এত বেশী ছোটখাটো উপমা ব্যবহার করি যে, তা ভেবে দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। 'মাথা ধরা', 'পা কামড়ানো', 'গা বা মেজাজ আগুন হওয়া', 'কণা ওজোন করে' নেওয়া', 'হুকুম চালানো', 'ঘুমিয়ে পড়া',—এ রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। উপমা-বর্জ্জন করে' কথা বলার যদি একটা আইন প্রচলিত হয়,—তা হলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হয়। কারণ, পদ্যের ভাষার মূল ঐ গদ্যেরই ভাষা।

উপমার আর একটি কাজ হচ্ছে,—প্রাকৃতিক নিয়মের একটা সামঞ্জস্য

দেখানো। এর উদ্দেশ্য দেখানো যে, প্রাকৃতিক নিয়ম সব জায়গায়ই এক রকম ধারায় কাজ করছে। যেমন, যদি বলি, "রমণীর রূপের মোহে পড়ে পুরুষ তাতি মারা যায়, যেমন বহ্নিতে পতঙ্গ পুড়ে মরে।" এ উপমা এ স্থানে বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে একটা সম্বন্ধ দেখিয়ে দেয়। একটা প্রাকৃতিক সত্য উভয় জায়গায়ই আছে; সেটা হচ্ছে এই যে, একটা বড় রকম আকর্ষণ আছে, যার ক্রিয়ায় মানুষ ফলাফল বিবেচনা না করে' তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে; ভাববার অবসর পায় না, অথবা তখন ভাববার শক্তি থাকে না। এরকম উপমার পদ্যেই অধিক ব্যবহার হয়, গদ্যে কম ব্যবহার হয়। প্রবন্ধে প্রায়ই যুক্তি দিয়ে এ-সব প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করে। উপমা তা'তে সামান্য সাহায্য করে মাত্র।

আর এক রকম স্থানে উপমায় ব্যবহার হয়,—অর্থাৎ শুদ্ধ সৌন্দর্য্য হিসাবে। একটা সুন্দর বিষয় বর্ণনা করতে করতে আর একটা সুন্দর বিষয় মনে এসে পড়লো। এক রকমের দুটি বা ততোধিক সৌন্দর্য্য এক জায়গায় এনে ফেলে একটা সৌন্দর্য্যরাজ্যের সৃষ্টি করা গেল। যেমন অমুক শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লো; কেমন, না, যেমন বায়ুর উচ্ছ্বাস দমকে দমকে এসে শেষে মিলিয়ে যায়;—কি বাঁশীর তান পুনঃ পুনঃ আরোহণের পরে স্তব্ধ হয়ে যায়। এখানে প্রধান উদ্দেশ্য,—এক রকম কতকগুলি সৌন্দর্য্যের একটা সমষ্টির সৃষ্টি করা। এরূপ উপমার স্থান কেবলমাত্র কবিতায়।

কবিতায় অবশ্য তিন রকমের উপমারই সার্থকতা আছে। তবে শেষোক্তরূপ উপমাই কবিতাকে সর্বাধিক সুন্দর করে। Shelleyর Skylark, বা শিবনাথ শাস্ত্রীর "পুষ্প" বোধ হয় অনেকেই পড়েছেন। উভয় কবিতায়ই উপমার পর উপমা কতকগুলি সৌন্দর্য্যের একটি গুচ্ছ তৈরি করে দিয়েছে! তার উপর আরো একটি ভাব এর মধ্যে আছে যে, কবির ঐ গানটি বা ফুলটি এতই ভালো লেগেছে যে, কি দিয়ে যে তাকে বোঝাবেন, তিনি বলতে পাচ্ছেন না। উপমার উপর উপমা দিয়েও তৃপ্তি হচ্ছে না। তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে, আসল জিনিসটি এতই সুন্দর যে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কিন্তু বিনা উপমায়—অন্ততঃ গদ্যে ব্যবহার্য্য কেবলমাত্র সাধারণ উপমার নামতঃ সাহায্যেও অতি উচ্চদরের কবিত্ব হতে পারে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অনেক কবিতাই এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য অনুভূতিকে জাগ্রত করা। এই উপমাবিরহিত কবির অভিব্যক্তি এক বড় কবির হাতে পড়ে' একটা মহা কবিতায় পরিণত হয়। কবি যদি বিনা উপমায় সেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে পারেন, যা অন্য কবি উপমার সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করতে পারেন না, তাতে বরং পূর্ব্বোক্ত কবির অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ পায়, এবং তাঁর সে কবিতাটির মানের মূল্য সেখানে অনেক অধিক।

আর একটি কথা হচ্ছে, রূপক। রূপকের ঠিক সংস্কৃত অর্থ না ধরে' আমি এর অর্থ ধরছি এই যে, যে কবিতা সমস্তটাই উপমা, তাহাই রূপক। যেমন, একটা ঘটনা বর্ণনা করে' তা থেকে একটা অন্তর্নিহিত গূঢ় মানে বোঝানো।" এটার মূল্য তত অধিক নহে। একটা ধারণা মনে ধরে' নিয়ে তা গল্পচ্ছলে বল্‌লে প্রায় সেটা ইসফের গল্প বা হিতোপদেশ হয়ে দাঁড়ায়, —কবিতা হয় না। তার উপর অনেক সময়েই সে কবিতাটার মানে দুর্ব্বোধ্য হয়ে সে প্রায় একটা হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়ায়। তাতে অনুভূতির উদ্রেক করার ব্যাঘাত হয়। উপরন্তু এরূপ কবিতা থেকে আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করায় অনেক সময়ে কবির বাহাদুরী অপেক্ষা ব্যাখ্যাকারের বাহাদুরীই অধিক প্রকাশ পায়। শুনতে পাই যে, ব্রাউনিং এই ধরণের কবি। শেলীর এলেষ্টর ইত্যাদি এই ধরণের কবিতা (সৌভাগ্যের বিষয়, শেলী এলেষ্টরের দুর্ব্বোধ্যতা বুঝে নিজেই তার মানে করে' ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।)

কাব্যে উপমার একটি প্রয়োজনীয়তা এই যে, উপমা কবির মনের ভাব প্রকাশের সহায়তা করে, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হয়েছে। রূপক যদি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় ত অধিকাংশ সময় সে নিজের উদ্দেশ্যকে নিজে ব্যর্থ করে। উপমার বক্তব্যটি জানি;—তা'র এত রকম, অর্থাৎ বিনা উপমায় যত দূর সম্ভব তত দূর, বর্ণনাও পেয়েছি; যেটুকু অসম্পূর্ণ রইল, উপমা সেটুকু পূর্ণ করে মাত্র। কিন্তু রূপকে বক্তব্যটি আমাকে বাহির করতে হবে সেই রূপক থেকেই, তার উপর সেই রূপক ভিন্ন তার অন্য বর্ণনাও পাই নাই। কাজেই রূপক বক্তব্যটি স্পষ্টতর করা দূরে থাকুক, সে নিজেই একটা হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়ায়। আর পাঠকগণের মধ্যে তার অর্থ বিষয়ে অনেক বিবাদ বিসংবাদ হ'তেও দেখা যায়।

অনেক ব্রাউনিংএর শিষ্য এই রূপক লিখবার জন্য বড় ব্যস্ত। ইচ্ছা

করলে বেশ সোজা কথায় বক্তব্যটি প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু করবেন না। তাঁরা কবিতাকে দুরূহ করে' একটা আমোদ উপভোগ করেন। এমন কি, কবিতার নামটিও তাঁর আসল নাম দিবেন না, পাছে টক্ করে' পাঠক তার অর্থ ধরে' ফেলে। তার নামও দেবেন এমনি যে, নামের সঙ্গে তার পংক্তিগুলো মিলিয়ে নেওয়া পাঠকের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা যা রূপক (যা নারকেলের ছোবড়ার মত শাঁসটিকে সযত্নে ঢেকে রাখে) লিখতে বেশী চাইবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি? তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, সেক্সপীয়র কালিদাস, বাইরণ, কীটস্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইত্যাদি মহা-কবিগণ একেবারে রূপক না লিখেও এমন কবি হয়েছিলেন, ব্রাউনিং যাঁদের কাছে দাঁড়াবার বা যাঁদের ছায়া মাড়াবারও যোগ্য হন নি!

তবে রূপক যদি সুবোধ্য হয়, তা হ'লে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য দেখাবার হিসাবে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। কারণ, উপমা আংশিক সামঞ্জস্য দেখায়, আর রূপক পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখায়। সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি আর একটা অনুরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেও তার একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সে সাধন করে কখন?—যখন মূলভাবটি বোঝা গিয়েছে;—আর তা যত শীঘ্র বোঝা যায়, ততই ভালো।

তবে এটি নিশ্চিত যে, একটা নিখুঁত রূপকের সৃষ্টি করতে পারলেই কবিতা হয় না। সে বিজ্ঞান হ'তে পারে, দর্শন হতে পারে, কিন্তু কবিতা হয় না। মাইকেল একটা জায়গায় ঝড়ের সঙ্গে শোকের দীর্ঘ উপমা দিয়ে প্রায় তাকে রূপকের মত করে' ফেলেছিলেন; সে জায়গাটার উপমাটি বাদ দিলে মেঘনাদ-বধ কাব্যের কোনও সৌন্দর্য্যহানি হোত না।

সাধারণতঃ এইটি বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, কবিতা যত সহজ ততই মর্ম্মস্পর্শী হয়, আর যে নিজে সুন্দরী তার তত আভরণের দরকার হয় না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বীণা।

—:০:—

"ঘোমটার ভঙ্গি দেখ!"

শাশুড়ী ঠাকুরাণীর জ্বলন্ত তীব্র দৃষ্টিপাতে বীণা ঝলসিয়া গেল। বীণা নববধূ; দ্বাদশ বৎসরের মেয়ে। বীণা সভয়ে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

গহন বনের মত শ্বশুরালয়। অরণ্যচারী নরশার্দ্দূলের মত শ্বশুরালয়ের লোক। জালবদ্ধা হরিণীর ন্যায় বীণা চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া সভয়ে চক্ষু মুদিয়া থাকিত। চক্ষু মুদিয়া বীণা অন্ধকার দেখিত।

বীণা পিতামাতার সাধের কন্যা। পিতা বড় ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়া শান্ত-চিত্তে সংসারধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীণা তার পর আর আবদার করে নাই। পিতা বাঁচিয়া থাকিতে বীণা তাঁহার আদরের মাত্রায় আবদার করিত।

বীণা রাগ অভিমান শিখিয়াছিল। বীণা জানিত, রাগ ও অভিমান করিলে সকলে সাধিবে; কাঁদিলে কোলে লইবে। বীণার পুতুল রাগ অভিমান করিত, কাঁদিত। বীণা সাধিত, সাধ করিয়া চুম্বন করিত।

কিন্তু শ্বশুরালয়ের তীব্র কুঠারাঘাতে সে পুতুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বীণা ভাবিত, "কোথায় গিয়াছে? বোধ হয় পিতার সহিত পরলোকে গিয়াছে।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী আবার বলিলেন, "মেয়েটা বড় বেহায়া। বাস্তবিকই বেহায়া। প্রাতঃকাল হইলেই জলখাবার চায়, সন্ধ্যা হইলেই ছাতে উঠে। সকলের মুখের দিকে চায়। গুরুজন বলিয়া জ্ঞান নাই। আমাদের বংশে এমন মেয়ে আসে নাই।"

দাসী মাতঙ্গিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ছোট ঘরে বিয়ে দিলে এই রকমই হয়ে থাকে।"

বড় নন্দ আসিয়া বলিল, "হিঁদুর ঘরে ত এমন মেয়ে থাকা ভাল নয়, ওর চুলের মুঠী ধরিয়া মার।"

দাসী মাতঙ্গিনী বলিল, "আর ভাঁড়ারঘরে বন্ধ কর।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহা অনুমোদন করিলেন না।—"ভাঁড়ারঘরে বন্ধ করিলে সব খাইয়া ফেলিবে।"

ননদ বলিল, "যার কত বুদ্ধি দেখেছ ?"

বীণা সকলের দিকে সভয়ে দেখিতেছিল। বুদ্ধির দৌড়টা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী অতিশয় জ্বলিয়া উঠিলেন, "না, মেয়েটার কোনও পদার্থ নাই।"

ননদ নগেন্দ্রবালা বলিল, "বাস্তবিকই মেয়াড়া, বেহায়া। ওকে মাসি বুধা; ওর খাওয়া বন্ধ কর।"

জিক্কী যথাক্রমে জারি হইল। খাইবার সময় কেহ বীণাকে ডাকিল না। সাত বৎসরের বালক ননী বীণার ছোট দেবর। সে বীণাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বৌদিদি খেতে আসবে না ?"

বড় দিদির বিরাট চাপড় খাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

বীণার শ্বশুর মহা ধনী। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বহু দাস দাসী। বীণার স্বামী নরেন্দ্র সম্প্রতি করিয়া কলেজে বি. এ. পড়ে। বংশের প্রথাক্রমে এখনও তাহার নববধূর সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিবার দাবী দাওয়া জন্মে নাই। নরেন্দ্র সকালে সকালে খায়। সকালে সকালে কলেজে যায়। মধ্যে মধ্যে ননী আসিয়া 'বৌদিদি'র সংবাদ দেয়। আজ কিন্তু ননী আসিল না।

গভীর রাত্রি। আকাশ ভরা মেঘ। প্রকাণ্ড অট্টালিকায় সকলে সুখ-নিদ্রায় সুষুপ্ত। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দাসী, দরওয়ান, ঘোড়ার সহিস, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল,—সকলেই পেট ভরিয়া খাইয়াছে। কেবল বীণা সুধাতুরা। উচ্চ ছাদের কার্নিশে বসিয়া পেচক ডাকিতেছে।

বীণা একটি ঘরে একাকিনী। দামের খাট, নখারি ও কোমল শয্যা। পুতুল ভরা আলমারি, তোরঙ্গ ভরা শাড়ী, গহনা ভরা বাক্স। তবে কিসের অভাব ? তথাপি বড়ই নির্জ্জন। তথাপি কোমল দেহলতা অবসন্ন। বীণা ভয় পাইয়াছে, কাঁদিয়াছে। কেহ নাই। সহায়হীনা, পিতৃহীনা মাতৃহীনা। বীণা বড়ই অন্ধকার দেখিল। ভগ্নস্বরে ডাকিল, "বাবা !"

তখন ধীরপাদবিক্ষেপে চোরের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ঘরে প্রবেশ করিতেছিল।

২

সে ননী। ননীর হাতে একটি ঠোঙ্গা, তার মধ্যে দুটি সন্দেশ।

কেন না, বিশ্বরাজ্যে অন্ধকারময়ী মায়ার সঙ্গে কখনও কখনও আলোকময়ী

মায়াও দেখা দেয়। ঘাতকের কুঠারের মধ্যেও করুণা থাকে, দস্যুর মধ্যেও দুঃখকাতরতা থাকে।

ননী ঘুমায় নাই। সে অনেক বুদ্ধি যোগাইয়া, মাতার অঞ্চল-হইতে চাবি চুরি করিয়া, চেয়ারের উপর টুল রাখিয়া, অন্ধকারে নানাবিধ আঘাত খাইয়া, বিলক্ষণ ক্ষিপ্রহস্ততা প্রকাশ করিয়া, ভাঁড়ার-ঘর হইতে দুইটি সন্দেশ সংগ্রহ করিয়াছিল।

কি সুন্দর দুইটি মূর্ত্তি! যেন স্বর্গ-ভ্রষ্ট কুমার আসিয়া স্তিমিত তারকার নির্ব্বাণোন্মুখ জ্যোতি রুদ্ধ করিল:—"তুমি নিভিও না।"

"বৌদিদি, কেঁদ না; আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি।"

পুরস্কারের দাবী স্বরূপ ননী কোলে বসিল। বীণা ধীরে ধীরে ননীকে বুকে টানিয়া লইল, কিন্তু সন্দেশ খাইল না। বীণা বলিল, "ছি! শ্বশুর-বাড়ী চুরি করিয়া সন্দেশ খাব? তাহা কখনই হইবে না; না হয় মরিব।"

আবার সেই অভিমান! যেখানে স্নেহ নাই, প্রেম নাই, যত্ন নাই, মমতা নাই, সেখানে রমণীর স্থান নাই। সেখানে জীবনের কোনও অর্থ নাই।

ননীর চক্ষু বহিয়া জল আসিল।

ননী বলিল, "কেন খাবে না?"

বীণা বলিল, "তুমি যখন স্বাধীন হইবে, তখন তোমার দাসী হইয়া দুই মুষ্টি খাইব, কিন্তু এ সন্দেশ ত তোমার নয়, কি করিয়া খাই?"

ননী বলিল, "অর্দ্ধেক আমার।"

বীণা। তবে আর অর্দ্ধেক কা'র?

ননী। দাদার। সে দিন বাবা বলেছিলেন, অর্দ্ধেক সংসার আমার।

বীণা। তবে একটা সন্দেশ ফেলিয়া দাও।

ননী গম্ভীরভাবে ভাবিয়া দেখিল, সে নিজেও পেট ভরিয়া খায় নাই। একটি সন্দেশ নিজে খাইল। অন্যটি বীণার মুখে তুলিয়া দিল।

ননী বলিল, "এটা আমার।" বীণা খাইল।

উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

দুঃখ-কীট বালিকার হৃদয় আক্রমণ করিয়াছিল। জীবনের বৃন্ত ভাঙ্গিতেছিল। বীণার সুন্দর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। মুখের হাসি আঁখি-জলে ভাসিয়া গেল। শরীর শীর্ণ হইল; বীণার জ্বর হইল।

জ্বর ছাড়িতে চাহে না।

বিবর-রত্ন কর্ত্তা ও গৃহিণী ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার হুকুম দিলেন।

ননদ নগেন্দ্রবালা বলিল, "ম্যালেরিয়ার দেশের মেয়ে, বোধ হয় পিলে হয়েছে। চিরকালটা জ্বালিয়ে যাবে।"

সুখা পাইলে সাবুদানার বাটী হস্তে ননী আসিত। কিন্তু যে খাইবে, সে বীণাকে ছাড়িতে বসিয়াছিল।

কথাটা নরেন্দ্রনাথের কর্ণে গেল। কলেজ ফেরতা নরেন্দ্রনাথ দীনু ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে স্বদেশী সিগারেট টানিতেছিল। কম্পাউণ্ডার যদুনাথ ধীরে ধীরে নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, "বড় বাবু! বৌমার কঠিন ব্যারাম।"

নরেন্দ্র। কে বলিল?

যদুনাথ। আজিকার প্রেস্ক্রিপ্সনটা একটু নূতন ধরণের। বোধ হয়, শরীর বড় ক্ষীণ। ষ্টিমুল্যাণ্ট অনেকটা আছে। একটু যত্নের দরকার।

নরেন্দ্র এ বিষয় পূর্ব্বে বড় ভাবে নাই। যত্ন? এত টাকা যাহার, তার যত্নের অভাব কি? দাস দাসী কি করিতে?

নরেন্দ্র চিন্তামুক্ত হইয়া বাটীতে গেল। ইচ্ছা হইল, একবার লুকাইয়া দেখিয়া আসে, কিন্তু তাহা প্রথা-বিরুদ্ধ। সকলে বলিবে কি? হিন্দু-শ্রেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী বংশে ইহা নূতন।

তবে উপায় কি?

ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্র স্থির করিল যে বীণার দাদাকে এ সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। নরেন্দ্র লিখিল, "প্রিয় সুরেশচন্দ্র! বোধ হয়, তোমার ভগ্নীর জ্বরটা কিছু কঠিন; একবার দেখিয়া যাও। আমায় ভরসা ছাড়িয়া দাও, কেন না, আমি বাহিরেই বসিয়া থাকি, অন্দর-মহলে বড় একটা যাই না।"

৪

বীণার পিত্রালয় কলিকাতায়। বীণার পিতার মৃত্যুর পর বিধবা মাতা পুত্র সুরেশচন্দ্রকে লইয়া সেই বাটীতে থাকিতেন।

বিধবা চ'খে ভাল দেখিতে পাইতেন না। পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই মানস-পটে আঁকিয়া সংসারের শুভাশুভ বুঝিয়া আলোচনা করিতেন।

বীণার পিতা বীণাকে একটি ছোট-খর করিয়া দিয়াছিলেন। গৃহস্থের কিছুরই অনাটন ছিল না। কিন্তু সে ক্ষুদ্র গৃহ এখন শূন্য। তাহার মধ্যে এখন আবদার অভিমান, খেলা ধূলা কিছুই নাই। কেবল বীণার একটি

ছোট ফটো আছে। স্নান করিয়া প্রত্যহ সেই ছোট ফটোখানি লইয়া বিধবা দেখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বীণাকে তাহার মধ্যে না পাইয়া কাঁদিতেন। সংসারের চির-অজ্ঞাত পথ দিয়া চারিটি পথিক ক্রমে ক্রমে সেই গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল। পিতা, মাতা, পুত্র ও কন্যা; একটি ফিরিয়া গিয়াছে। সতী তাহার অনুসরণ করিবেন। কিন্তু পুত্র কন্যা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সে কয় দিনের জন্য? কন্যাকে একটি পথে বিদায় দিয়া পুরাতন গৃহে বিধবা মাতা পুত্র ও স্মৃতি লইয়া দিনযাপন করিতেন।

সুরেশচন্দ্র এম. এ. পড়ে। স্বদেশীর মহা আন্দোলনে যোগ দিয়া অবধি তাহার গৃহ সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর ছিল না।

পিতার শেষ বাক্য স্মরণ করিয়া সুরেশ মধ্যে মধ্যে বীণার সংবাদ লইত। কিন্তু বীণা আর পত্র লেখে নাই। বিধবা মাতা প্রত্যহ বেলা দশটার সময় একখানি পত্র পাইবার প্রত্যাশায় দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কিন্তু সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পিয়ন কেবল বলিয়া যাইত, "পত্র নাই।"

সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত সুরেশচন্দ্রের নিকট বিধবা আর একবার গেলেন; "বাবা! একখানা টেলিগ্রাম কর।"

সুরেশচন্দ্র রাগে জ্বলিয়া উঠিল, "তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি নাই মা। বুদ্ধি থাকিলে বড়লোকের ঘরে বিবাহ দিতে না। সেই দূর দেশে যখন তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছ, তখন তাহার ফল ভুগিতে হইবে। তবে সেখানে ভাত কাপড়ের ভাবনা নাই; রোগ হইলে ডাক্তার দেখিবে, কাঁদিলে গহনা গড়াইয়া দিবে। ভাবনা কি?"

মাতা। বাবা! গহনা, ভাত, কাপড়ে কি কচি মেয়ে বাঁচে?

সুরেশ। তবে কি দুধে বাঁচে? যদি দুধেই বাঁচে, তবে বনবাস দিলে কেন?

এই রূপে মাতাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া সুরেশচন্দ্র লাঠী ও চাদর লইয়া মিটিং করিতে গেল।

সভায় খুব জমাট বাঁধিয়াছে। বঙ্গের যত্রিশটা জেলা অক্ষুণ্নভাবে একটক বজায় রাখিয়াছে। উৎপীড়িত প্রজাগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। সংবাদপত্র উচ্চ স্তম্ভে উচ্চৈঃস্বরে নব্য বঙ্গের জীবন-ইতিহাস প্রচার করিতেছে।

কলিকাতা উদ্বেলমান। জাতীয় জীবন ঘরস্রোতে প্রবাহমান।

সভার মন্তব্য একে একে স্থিরীকৃত হইল। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ আলোচিত হইল। দেশের টাকা দেশে রাখিবার নূতন বন্দোবস্ত স্থির হইল। সকলেই উদ্যমপূর্ণ, সকলেরই নূতন আশা।

চারি জন বন্ধু মিলিয়া সুরেশচন্দ্র গোলদিঘীর দিকে গেল। সেখানে পোষ্ট-পিয়ন আসিয়া সুরেশের হস্তে দুইখানি পত্র দিল। একখানা নরেন্দ্রের, অন্য পত্র বীণার।

বীণা লিখিতেছে, "দাদা! আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন বাবার কাছে যাই। তোমাদের ছাড়িয়া এক দেশে আসিয়াছি; আবার বোধ হয়, অন্য দেশে যাইব। সেখানে যেন বাবাকে দেখিতে পাই। সেই আমার স্বদেশ।"

সুরেশ স্তম্ভিতভাবে আবার পাঠ করিল। নরেন্দ্রের পত্রখানিও পড়িল। ভাবটা বুঝিতে বেশী সময় লাগিল না।

৫

ধীরভাবে সুরেশচন্দ্র বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ গোপাল! বিবাহ করাটা বড় বিঘ্নজনক।"

গোপাল। ভয় কি, তোমার ত হয় নাই।

সুরেশ। কিন্তু আমার ভগিনীপতির হইয়াছে। সে গাধা। তাহার দ্বারা স্বদেশের কোনও উপকার হইবে না।

গোপাল। তাহার টাকার দ্বারা হইবে।

সুরেশ। কিন্তু ভবিষ্যতের বাঙ্গালা দেশ টাকার দ্বারা উদ্ধার হইবে না। বরকট একটা বল্লা। বল্লা পুরাতন হইয়া গেলে, স্বদেশ আবার মুখে কালি মাখিবে।

গোপাল। আমাদিগের বংশধর?

সুরেশচন্দ্র। সে বংশধরের মা কই? মা কি সিগারেটের ধুমে উড়িয়া আসে, না স্বদেশী কাপড়ের অঞ্চলে বাঁধা থাকে? যেখানে স্বামী নাই, সেখানে সতী নাই; যেখানে স্নেহ নাই, সে দেশে শক্তি নাই।

গোপাল।—এই শত কোটী সন্তানের মা কোথায়?

সুরেশচন্দ্র তীব্রভাবে বলিল, "তিনি পদদলিতা। কল্পিত মূর্ত্তিকে আবাহন করিয়া আমরা অসুর দলিতে চাই, কিন্তু আমরাই অসুর। ইহার ফলে আমারাই চূর্ণ হইয়া যাইব। এ দেশে রমণী পীড়িতা, রুগ্না ও পদদলিতা। তাহার দেহ হইতে বীর সম্ভবে না। শত কোটী সন্তানের মাতা, কন্যা ও

হা এখনও অতল জলে, গভীর অন্ধকারে। এ বাঙ্গালার দেশের এখনও অনেক দুর্দ্দশা আছে।

সুরেশ চলিয়া গেল। বন্ধুগণ সুরেশের এই অসাধারণ পরিবর্ত্তনের কঠিন সমালোচনা করিতে লাগিল।

বাড়ী গিয়া সুরেশচন্দ্র মাতাকে ডাকিল। "মা! বীণার অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন।" বিধবা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন।

"বাবা! তুমি দেখ; আমার ভাবিবার শক্তি নাই।"

মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

৬

বীণা! বীণা! আমার পিতার সাধের বীণা! যাহাকে দশ বৎসর ধরিয়া কোলে করিয়াছি, কখনও মুখ তুলিয়া ভর্ৎসনা করিতে পাই নাই; যাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট আমি লজ্জা পাইতাম; যাহাকে অনেক সময় গৌরীর সহিত তুলনা করিয়াছি;—তাহার এই দশা?

কি কঠিন মায়া! মায়া এড়াইতে গেলে দেশ উচ্ছিন্ন যায়। মায়াতে অধীর হইলেও দেশ থাকে না। এক দিক মহা শূন্য, অন্য দিক তমসাচ্ছন্ন!

ইহার মধ্যে কর্ত্তব্য কি?

সুরেশচন্দ্র রাত্রিতে ঘুমাইল না। অনেক বিভীষিকা দেখিল। বীণা আর নাই। বীণা যথার্থই কি স্বদেশে গিয়াছে? সকলেই ত যাইবে; কিন্তু স্নেহ না থাকিলে তুমি আমি যাইতে পারিব কি? কি ধরিয়া যাইব?

মোহে ভুলিও না। সবই মায়া। যাহাতে দুইটি হৃদয় একত্র হয়, তাহাই মায়া নহে। যে রাখি দুইটি হাত বাঁধে, সেই রাখিই কোটী হাত বাঁধে।

নরেন্দ্রের সহিত বীণার হাত বাঁধিয়াছিলাম। বীণার হাত ফিরিয়া আসিয়াছে! অবলম্বন না পাইয়া সে হাত শূন্যে পূর্ব্বস্মৃতি আশ্রয় করিতে যাইতেছে।

এরূপ অনেক হাত ফিরিয়া যাইবে; অনেক রাখি টুটিবে।

তবে করিলাম কি?

সুরেশচন্দ্র রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া পোর্টম্যাণ্টো বাঁধিল। মাতাকে ডাকিয়া বলিল, "না! আমি আজই এলাহাবাদ চলিলাম। তুমি ভাবিও না। আমি গেলেই বীণা ভাল হইয়া যাইবে।"

মাতা ধীরভাবে বলিলেন, "সাবধানে যাইও; আমি যাহা ভাবিবার, তাহা ভাবিয়া পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি!"

৭

তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি সুরেশ আসিল না দেখিয়া নরেন্দ্র চিন্তিত হইল।

নরেন্দ্র দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বউ কেমন আছে?"

মাতঙ্গিনী দাসী বলিল, "বোধ হয় ভাল আছে।"

নরেন্দ্র। বোধ হয়? কেন, তুমি কি জান না?

মাতঙ্গিনী। সকালে দেখিয়াছিলাম।

নরেন্দ্র। সমস্ত দিন কে দেখিয়াছে?

মাতঙ্গিনী। খোকা বাবু।

নরেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গের শোণিত উষ্ণ হইল। চক্ষু দিয়া অগ্নি ছুটিল।—"কি? এত বড় সংসারে আমার স্ত্রীকে রুগ্ন শয্যায় দেখিবার জন্য খোকাবাবু ছাড়া আর কেহই নাই! আচ্ছা, তুমি চলিয়া যাও।"

মাতঙ্গিনী অন্দর-মহলে গিয়া বড় বাবুর অভিনব উচ্ছ্বাসটা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা ও কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট বিশেষ নিপুণতাসহকারে প্রকাশ করিয়া দিল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন, "তুই সদরের দিকের দুয়ার বন্ধ করিয়া দে।"

বীণা যে ঘরে শুইয়াছিল, তাহার সম্মুখেই বৃহৎ বাগান। বাগানের উপর আকাশ। সেটা পূর্ব্ব দিক। পূর্ব্ব দিকে কলিকাতা, তাই বীণা সেই দিকে চাহিয়া থাকিত।

বীণার সব তারই ছিন্ন হইয়াছিল। কেবল একটি তার ক্ষীণভাবে তাহাকে ইহলোকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

"ননী! তোমার দাদা ঘুমাইয়াছেন?" ননী দাদার নাম শুনিয়া একটু আনন্দিত হইল।

"বৌদিদি! তাঁকে ডেকে দেব?"

বীণা। না—না—না। আমি তা বলি নাই। ননী! তুই ভুল বুঝিয়াছিস।

ননী কিন্তু ভুল বুঝে নাই। নরেন্দ্র অন্দর-মহলের কবাট রুদ্ধ দেখিয়া মনে করিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সহজ উপায় বাগানের দিক। বড় আম্রবৃক্ষের ডাল হইতে ছাতের উপর উঠা যাইত। সেই পথ অনুসরণ করিয়া নরেন্দ্র বীণার শয়নগৃহের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

নরেন্দ্র ডাকিল, "ননী! ভাই! দুয়ার খুলিয়া দে।"

ননী এক লম্ফে বারান্দার দিকে গিয়া বাতায়ন খুলিয়া দিল। সেই পথে উদ্বেলিতহৃদয়ে নরেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিল।

ননী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বাটীর মধ্যে শুইতে গেল।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে ডাকিল, "বীণা!"

অন্য সময় হইলে বীণা অভিমান করিত। কিন্তু সে তার ছিঁড়িয়াছে। শক্তির তিন অংশ শূন্য। এক অংশ দিয়া বীণা কাঁপিতেছিল।

নরেন্দ্র বীণাকে কোলে লইল।

"বীণা! আমি নরাধম। আমি মন্ত্রে দীক্ষিত; কিন্তু আমি মন্ত্রের অর্থ জানিতাম না। আমি শক্তি অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আধার কোথায়, জানিতাম না। বীণা! আমি তোমার স্বর্গীয় পিতার দূত, আমি তোমার সখা।"

বীণাকে হৃদয়ে লইয়া নরেন্দ্র ধ্যানস্থ হইল। অনাথ দেশের অনাথিনী বালিকা! আজ তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া দেশ কলঙ্কিত হইতেছিল। দেখিবার কেহই ছিল না?

৮

স্বামীর পরশে, স্নেহের পরশে, শুষ্ক লতায় জীবন সঞ্চারিত হইল। বীণা ধীরে ধীরে বলিল, "ভুলিবে না?"

নরেন্দ্র। না।

বীণা। আর কাঁকি দিবে না?

নরেন্দ্র। না।

নরেন্দ্র ভুলিল না। স্বর্গ হইতে স্বদেশ মর্ত্ত্যে লইয়া আসিল। নরেন্দ্রের মোহ রূপের নয়। তাহার হৃদয়ে কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। নরেন্দ্র বীণাকে লইয়া বাগানবাড়ীতে রাখিল। নূতন সংবাদ সকলেরই প্রিয়। শাশুড়ী, ননদ ও মাতঙ্গিনী দাসীর 'স্বরাজ' ভগ্ন হইলেও, তাহারা এই বিপ্লবের মধ্যে একটু নূতনত্ব পাইল। দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। ও মা! কি লজ্জার কথা!

সুরেশচন্দ্র আসিবে শুনিয়া ননী গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল; এবং মিলন-সংবাদটাও সুরেশকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। সুরেশ বাগানবাড়ীতে গিয়া নরেন্দ্রের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হইল।

"নরেন! মিলনই শক্তির আধার। আজ বীণা না থাকিলে তোমাকে খুন করিতাম। এই দেখ, ছোরা আনিয়াছিলাম!"

নরেন্দ্র ঘোরতর রকম হাসিল।

ননীও হাসিল।

সুরেশ বলিল, "নরেন! ননীকে কোলে লও। এই সাত বৎসরের শিশু যদি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ থাকে, তবে দেশ অনেকটা স্বদেশের মত হইতে পারে।"

* * * * *

অর্থ কি? সম্পদ কি? গৌরব কি? জীবনের ঔষধি, স্বাধীনতার ঔষধি, রোগের ঔষধি, কুটীরে ও বনে পাওয়া যায়। বনৌষধি খুঁজিয়া লও। রোগ শোকের মধ্যেও জীবন থাকে, জীবন বাড়ে, শক্তি আসে। আকর বাহিরে নাই, গভীর স্তরে। আজিকার শৃগাল-জীবনের মহা-স্তরে কল্যকার শার্দ্দূল। ভারত শ্মশানের অমানিশায় শৃগাল ডাকিতেছে। তোমরা টিট্‌কারী দাও, কিন্তু জানিও, যে দিন শৃগাল শব লইয়া অন্য শৃগালের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিবে না, যে দিন শ্মশানে অসার কোলাহল স্তব্ধ হইয়া প্রেমের জ্যোতি আসিবে, সেই দিন স্বদেশের মুখ দেখিবে। তাহার অনেক বিলম্ব আছে।

শ্রীরাধা।

তব রূপ-পূর্ণিমায় হাসে দশ দিক্,
নিখিল-বন্দন-গীতি চরণে নূপুর,
ঝলমল কেশে কণ্ঠে নক্ষত্র মাণিক;
শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে মত্ত বিশ্ব ব্রজপুর!
প্রফুল্ল সরোজ নেত্র প্রেমে ঢলঢল,
অশোক-অধরে ঝরে আনন্দ জ্যোৎস্না,
মধুর মিলন-স্বপ্নে হৃদয় বিহ্বল,
শ্যামের সোহাগ-গীতি গাহিছে কল্পনা।
চল তবে প্রেমময়ী! চল ত্বরা করি'
কাল-কালিন্দীর কূলে কেলিকুঞ্জবনে

মদনমোহনে মুগ্ধা বাহুবন্ধে ধরি,
জুড়াও অন্তর-তৃষ্ণা প্রেমসুধা ধনে।
শ্যামসুন্দরের বুকে আনন্দে শিহরি'
নিভাও বিশ্বের তৃষ্ণা হে বিশ্বসুন্দরী!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রেম-বিজ্ঞান। (কবিতা)

—:০:—

প্রেম কি? বিশদরূপে তাহার উত্তর প্রদান করা সুকঠিন। ইহার লক্ষণ অনেকটা মাদক দ্রব্যের মত। 'প্রেমে মাতোয়ারা', 'প্রেমেতে বিহ্বল' ইত্যাদি কথা স্মরণ করিলে, প্রেমিকের একটা নেশার অবস্থা অনায়াসে প্রতীয়মান হয়।

প্রেমের উন্মাদিনী শক্তি স্বীকৃত। অতএব নেশাটা যে ছোটি খাট নয়, এবং চট্ করিয়া ছাড়ে না, তাহাও বুঝা যায়।

একটা মাদক দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, প্রেমের অর্থ দুরূহ হইয়া পড়ে। তবে জিজ্ঞাস্য যে, কোন পদার্থ এই মাদকতা শক্তি প্রাপ্ত হয়? যদি মদ হয়, তবে চোলাই হয় কোথায়?

প্রেম কি ধান্যেশ্বরী?

খাটি নং ১ ও ২? কিংবা 'রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট'?

দেহ-মধ্যে কি একটা ভাঁটি-খানা আছে?

এ নেশার উদ্দেশ্য কি?

প্রেম যদি আবগারী বিভাগের দ্রব্য, তবে ইহার উপর শুল্ক (Duty) বসান হয় না কেন?

আমরা ইহার সম্পূর্ণরূপে উত্তর প্রদান করিতে অক্ষম। তবে ইঙ্গিতে যতটা পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা যাউক।

মাদক দ্রব্যের মধ্যে মদই অনেকটা প্রেমের মত। অর্থাৎ, সাধারণ প্রেমের লক্ষণ বরং মদের নেশার মত, গাঁজা কিংবা আফিং-এর মত নয়। প্রেমে শরীর টলে; মনও টলে।

ভবে অনেক প্রেমের লক্ষণ আছে, গীতা, কিংবা সিদ্ধির মত দেখা গিয়াছে। এ সকল অসাধারণ।

কাহারও মতে প্রেম তিন ভাগে বিভক্ত :—

১। দেহের প্রেম—(মদের মত)।

২। মানসিক প্রেম—(আফিংএর মত)।

৩। আধ্যাত্মিক প্রেম—(গাঁজা প্রভৃতির মত)।

এ সকল মত কত দূর সত্য, তাহা দেখা উচিত। কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেহের প্রেমকে হঠাৎ 'কাম' বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারও তথ্য অনুসন্ধান করা উচিত। মদ চোলাই করিতে গেলে তিনটি ক্রিয়া আবশ্যক :—

১। রস-পরিপাক। (Brewing)

২। রসোদ্গার, অথবা মাদকতা প্রাপ্তি (Fermentation)

৩। রস-সংশোধন বা চোলাই (Distellation)

শর্করা কিংবা শর্করা-বিশিষ্ট পদার্থ,—যেমন মহুয়া ('মধ্ব' চরক-সংহিতা দেখ) কিংবা ধান্য, গোধূম, ব্রীহি প্রভৃতি মদের 'গোড়া'। যিষ্ট কিংবা মধু-বিশিষ্ট না হইলে তাহা হইতে মদ হয় না। জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধু কিংবা গুড় একটা পাত্রে রাখিয়া দিলে অল্প দিনের মধ্যেই তাহা মাতিয়া যায়। ইহাতে বুঝিতে হইবে, তাহা পাক হইয়া গিয়াছে, এবং চোলাই করিবার উপযুক্ত হইয়াছে।

পাক কার্য্য সম্পন্ন হইবামাত্র উদ্গার উঠিতে আরম্ভ হয়। গুড়ের জালা হইতে অঙ্গারাম্ল (Carbonic acid gas) উঠিতে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু মাদকতা-সঞ্চার 'ইয়েষ্ট' (Yeast) নামক জীবাণুর দ্বারা হয়। ইহারা বায়ুতে থাকে, এবং রস পরিপাকযোগ্য হইলেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। ভাঁটি-খানার রসের জালার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে রস-পাকের সময় ফেনসদৃশ একটা আবরণ দৃষ্টিগোচর হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে জীবাণু আছে।

পরিপক্ক ও মাদকতা-প্রাপ্ত রস সময়মত চোলাই না করিলে তাহার বিকার উপস্থিত হয়, এবং টক হইয়া যায়।

আমরা দেখিয়াছি, পশুদিগের প্রেমের সঞ্চার আবশ্যক বোধ হইলে, তাহারা পরস্পরের গাত্রলেহন করে, অর্থাৎ সাধু ভাষায় গা চাটিয়া থাকে। মনুষ্য

জাতি ঠিক গাত্রলেহন করে না, কিন্তু (অনেকটা তাহারই অনুরূপ) চুম্বনাদি করে। সন্দেহ হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা পরস্পরের দেহ হইতে 'ইয়েষ্ট' নামক পদার্থের কিংবা জীবাণুর সঞ্চার হইয়া পরস্পরের দেহস্থ রসকে মাতাইয়া তুলে। ইহা আদি-রস, মধ্য-রস, কিংবা অন্ত-রস, তাহা ঠিক বুঝা যায় না ; কিন্তু রস হইতে প্রেম হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ। রস হইতেই মাদকতা, মাদকতা হইতে রসোদ্গার, এবং কখন কখন প্রেমের বিকারও দেখা গিয়াছে।

থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় দেহ-তত্ত্বের বিশ্লেষণে চোলাইয়ের রহস্যটা বুঝিবার একটা সোজা পথ করিয়া দিয়াছেন।

১। ভাণ্ড-দেহে রসের পাক হয়।

২। কাম-দেহে সেটা ভাঁটিতে (Still) বোঝাই হইয়া অগ্নির সংযোগে চোলাই হয়।

৩। মন-দেহে সেটা সঞ্চিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ গুদামজাত হয়। ইহা দোবারা চোলাইয়ের নিমিত্ত। অর্থাৎ, ভাণ্ড-দেহ জালার মত ; সেখানে রস পরিপক্ক হইলে কাম-দেহের ভাঁটির মধ্যে প্রবেশ করে। খুব সম্ভবতঃ 'ইয়েষ্ট' কাম-লোক (astral plane) বাহিয়া আইসে। কাম-দেহে অগ্নির তাপে চোলাই আরম্ভ হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভাঁটির মাথায় একটা আবরণ আছে (Still head)। সেটা নরকপাল, অর্থাৎ তান্ত্রিকগণের খুলির মত ; তাহার উপর আবগারী বিভাগের দেবতাগণ ক্রমাগত শীতল জল সেচন করিতেছেন। উদ্দেশ্য যে, মাদক রস বাষ্পাকারে উঠিলে, দৈব-শীতলতা-সংস্পর্শে জমাট বাঁধিয়া মদ্য-রূপে পার্শ্বস্থিত চোঙ্গ দিয়া বাহির হইবে। চোঙ্গটা টিকীর মত।

চোঙ্গের মধ্যে মহিমা আছে। যাহারা স্থূল-রসগ্রাহী, অর্থাৎ, চারি আনা বোতল ব্যবহার করেন, তাঁহারা কাম-দেহেই মদ্যের প্রথম ধার সংগ্রহ করিয়া পান করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ উচ্চ-দরের খাঁটি—অর্থাৎ নং ১ কিংবা ২ ব্যবহার করেন, তাঁহারা উক্ত মদ্যে অন্য একটা চোঙ্গ দ্বারা মন-দেহে লইয়া যান ; এবং দোবারা চোলাই করিয়া অভিলষিত ফল লাভ করেন। তাহারও উপর উঠিতে গেলে, বিজ্ঞান-দেহ ও আনন্দ-দেহ প্রভৃতিতে চোঙ্গ লাগাইতে হয়, এবং মদ্যটা 'রেক্‌টিফায়েড্' অর্থাৎ ক্রমাগত সংশোধিত হইয়া শেষটা অতি সূক্ষ্ম অথচ তীব্র আকার ধারণ করে।

তন্ত্রে ইহার নাম 'শোধন'। ইহা হইতে অনেকটা বুঝা যাইতে পারে যে, প্রেমের নানাবিধ স্তর আছে। যেমন,—

প্রথম (চারি আনা বোতল হইতে আট আনা)—দৈহিক কিংবা পাশবিক প্রেম।

খাঁটি। নং ২। অশুদ্ধ প্রণয় প্রভৃতি।

ঐ। নং ১। বিশুদ্ধ প্রণয়।

অতিশয় খাঁটি। (Rectified spirit) ভক্তি, বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি। তাহারও উপর আর জ্ঞান থাকে না।

বেদান্তের কোষের মধ্যে রস পরিপূর্ণ করিয়া মধ্বাচার্য্য উল্লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। রামানুজ স্বামী নং ১ পান করিতেন। আমরা নং ২ কিংবা সুবিধা না হইলে আট আনা বোতলের প্রার্থী; তান্ত্রিকগণ অতিশয় খাঁটিরও উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ভক্তিমার্গটা মধুর উপর সংস্থাপিত। ওঁ মধু।

প্রেমের মাদকতার অন্য একটা প্রমাণ এই যে, ইহার উপর কর ধার্য্য হইয়াছে। বোধ হয়, প্রেমের বহুল প্রচার বিশ্বের কোনও বিধানের বিরুদ্ধ। তথাপি প্রাণ পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া লোকে প্রেম করিয়া থাকে। ঘটি, বাটি, বস্ত্রাদিতে চারি আনা বোতলের মূল্যও কুলায় না। মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বিকাইয়া দিলে হয় ত আট আনা বোতল পর্য্যন্ত। সব ছাড়িয়া মস্তকমুণ্ডন করতঃ, কিংবা জানু পাতিয়া অনিমেষনয়নে,—

"মম শিরসি মুণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং"

ইহাতে নং ১ পাওয়া যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, উত্তরোত্তর প্রেমের কর (Duty) বাড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে অনেক মহাজন ইহার ঠিকা লইয়াছিলেন, কিন্তু ফেল মারিয়াছেন। ইতিহাস, বিশেষতঃ বঙ্গের ইতিহাস, ইহার সাক্ষ্য দিবে। প্রেমে Distillery System চলে না। রসার গুদামের মত নদীয়ায় একটা প্রকাণ্ড গুদাম খোলা হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহা পরিত্যক্ত হইল। খোলা ভাঁটিই প্রেমের পক্ষে প্রশস্ত।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেমন মদ্য পান করিতে করিতে সর্ব্বস্বহারা হইয়া লোকের জ্ঞানের উদয় হয়, প্রেমেও তাহাই হয়। প্রেমের অনেক দুরবস্থা ইতিহাস প্রতিপাদন করিয়া থাকে। রাজ্যনাশ, বনবাস, ঘোর যুদ্ধ, খুন, আত্মহত্যা প্রভৃতি ইহাতে সচরাচর ঘটে। অনেকে কানা, খোঁড়া

হইয়া গিয়াছে, মূক বধির হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের ভুক্তা মিটে নাই।

পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থন ব্যাপারে বিষ্ণু স্বয়ং মোহিনীবেশে প্রেম-সুধা বণ্টন করিয়াছিলেন।

পুরাণ, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি একত্র করিয়া সামঞ্জস্য করিলে দেখা যায় যে, প্রেমের যাদকতাশক্তি পুরুষ ও প্রকৃতির সংমিশ্রণে হয়। শিবসংহিতার টীকা অনুসারে, এবং বৈষ্ণবী মতে, পুরুষের 'আনন্দ' নামক অংশ জড়-প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া পরমাণুবর্গের মধ্যে এরূপ একটা গতির উৎপত্তি করে, যাহাতে জীব নামক পদার্থ মাত্রেরই হয়। অনুভব হয় যে, 'ইয়েষ্ট' (yeast) নামক তত্ত্ব আত্মা হইতে আসে।

ধর্ম্ম-ইতিহাসে ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কলহ হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর-চার্য্যের মতে মায়াবশে; অর্থাৎ উপরি-উক্ত নেশার চোটে, জীব নামক যে দ্বিতীয় পদার্থ অনুভূত হয়, তাহা মায়ারই বিকার মাত্র।

ভক্তগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, এরূপ তর্কও নেশার দ্বারা হয়; কিন্তু সেটা গাঁজার। জ্ঞানবাদী ভক্তিবাদ ও দ্বৈতবাদকে মাঙ্গামি বলিয়া থাকেন। ভক্তগণ অদ্বৈতবাদকে গাঁজাখুরী বলিয়া থাকেন। গাঁজা তিন প্রকার,—চুর, গোজ ও চ্যাপ্টা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মদ ও গাঁজার সংমিশ্রণ, কেবল নেশার তারতম্যমাত্র। ইহার সামঞ্জস্যে গীতার কালাচাঁদ, অর্থাৎ অহিফেন। আমাদিগের ব্রজগোপাল দা' তিনটাকে ত্রিবিধা খাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাস্তবিক নেশা নামক অবস্থা একই; কিন্তু ইহার দুরবস্থা বহু। নেশার ফলে জ্ঞান হয়, ইহা সত্য। অতএব নেশা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না।

সকলের পক্ষে এক নেশা খাটে না। সকল পদার্থ হইতে মদ হয় না। কাটখোট্টাগণ গাঁজা খায়। রসিক জীব মদে বিহ্বল হয়। অহিফেন চলিতের পর প্রশস্ত। ইহা 'অধিকারী' বিভাগের অন্তর্গত।

তবে নেশা হয় কেন? ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, নেশাতে যখন মনের সিংহাসন উলিয়া উঠে, তখন আপনাকে অর্থাৎ আত্মাকে ঠিক রাখা পুরুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। নেশার আনন্দ ভাল, নিরানন্দ ভাল নয়। প্রেমেতে যেন বিরহ না ঘটে, জ্ঞানে যেন অহঙ্কার না ঘটে।

টিয়া।

—:০:—

[লা-ফঁটেন হইতে।]

টিয়া বলে, গাইতে কেহই—কিছুই না জানে।
দোয়েল-চোকিল আমা খুব যখন ধরে তানে,
টিয়া কাছে গিয়ে করে বিষম কিচিমিচি,
এবং দুটো ডানা তুলে, তারে বলে,—"ছি ছি।"
একদিন পাখীরে দলে মিলে, অনেকখানি ভেবে,
কাছে গিয়ে করযোড়ে কহে গুরুদেবে,—
"এ'ভুর আলোচনা যেরূপ গুণের পরিচায়ক,
প্রভু নিশ্চয় নিজে একটা উঁচুদরের গায়ক;
প্রভু একবার দয়া-করে' গেয়ে দেখান দিখি
ওদের অধম শিষ্য হয়ে শুনে একটু শিখি।"
টিয়া মাথা চুল্‌কে, ভেবে পায় না বলবে কি যে;—
শেষে বল্লে,—"মহাশয়গণ! আমি—অর্থাৎ—নিজে
বড় একটা গাইনে; তবে—বলতেই বা কি হানি—
মহাশয়গণ! —আমি শুধু 'ছি ছি' কর্ত্তে জানি।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

—:০:—

ভারতীয় উপকথা।

মায়া-পালক।

আমাদের ভবদীয়ারের বীরদর্পে ভয়-কম্পিত, বিদ্রোহ-বিভীষিকায় উদ্ভ্রান্ত 'ইংলিশম্যান' পত্রের কার্য্যালয় হইতে 'মর্য্যাল' নামক একখানি পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। Magic Feather—যাহাকে আমরা 'মায়া-পালক' নামে অভিহিত করিতেছি,—ইতিনামধেয় একটি ভারতীয় উপকথা এই পত্রে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

লেখক বলিতেছেন, গল্পটি তিনি এক জন শিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছেন। ভারত-গবর্মেণ্টের শাসন-পদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ না কি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, গবর্মেণ্টের সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী,—ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিচারে সমভাবে শিক্ষা-বিস্তার। এই শিক্ষার ফলে অধুনা যাহারা গবর্মেণ্টের বিশ্বাসভাজন ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, তাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে মনুষ্য নয়,—বিবেক-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত পশু। এই উক্তির সমর্থনের জন্য বক্ষ্যমাণ গল্পের অবতারণা।

ব্রাহ্মণের উক্তির সমীচীনতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংলণ্ডের অধ্যাপনায়, ঋষির বনাশ্রমে, অধ্যাপকের টোলে, এমন কি, গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালার পাতড়াড়ির মধ্যে যে শিক্ষার বীজ নিহিত ছিল, তাহাতে মনুষ্যত্বের মহীরুহ জন্মিতে পারিত,—জন্মিত; কিন্তু ইংরেজের প্রবর্ত্তিত মোলামখানার শিক্ষার বীজে যে পাদপ জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহার বিষে আজ ভারত জর্জ্জরিত, অবসন্ন। ইংরেজের শিক্ষাবিতরণের ব্যবস্থা দেখিয়া আজ আমাদের বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, 'ভিক্ষা সে বাজ আমা কুত্তিয়া বোলাও।' যে শিক্ষায় স্বদেশ স্বধর্ম্ম জানিবার চিনিবার অবকাশ নাই, যে শিক্ষা জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় গৌরব, জাতীয় মর্য্যাদা সযত্নে সংগোপন করিয়া রাখিতে কৃতসঙ্কল্প, যে শিক্ষা শক্তি সংবর্দ্ধিত করে না, শক্তির সংহার করে, সে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন কি? শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-গঠনের জন্য,—বিদ্রূপের জন্য নহে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং আমরা উপকথাটিকে ভাষান্তরিত করিয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিতেছি।

কোনও এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সচরাচর যেমন বিদ্যাবারিধী বাণীর বর-পুত্রেরা কমলার করুণায় বঞ্চিত থাকেন, এই ব্রাহ্মণের ভাগ্যেও সেই সনাতন সত্যের ব্যত্যয় হয় নাই। মনুষ্যত্বের যে মহাবীজ তাঁহার হৃদয়ে নিহিত ছিল, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাহা আর বিকাশের অবকাশ পাইল না। পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগের পর ব্রাহ্মণ ভিক্ষাই আপনার জীবনোপায়রূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যদোষে ভিক্ষা মিলাও দুর্ঘট হইয়া উঠিয়া। 'অর্থ-প্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ'—ঘটকর্পরের এই উক্তির সারবত্তা ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করিতে লাগিলেন। নিরুপায়, ব্যথিত ব্রাহ্মণ অবশেষে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে জনসমাগমশূন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। সেই বৃক্ষের শাখায় এক চকা, আর এক চকী বসিয়া ছিল।

চকা বলিল, 'দেখ চকী! এই যে ব্রাহ্মণ,—এ পণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রাণ। আজ অন্নের অভাবে এখানে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছে; ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।'

চকী ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, 'তাই ত; তুমি ইহার কোনও প্রতিকার করিতে পার না?'

চকা বলিল, 'আচ্ছা, চেষ্টা করিয়া দেখি।'

এই বলিয়া চকা ব্রাহ্মণের উদ্দেশে বলিল, 'হে ব্রাহ্মণ! কেন তুমি এখানে এমন ভাবে পড়িয়া আছ?'

সেই জনবিরল অরণ্যমধ্যে এই করুণ সম্ভাষণ শুনিয়া ব্রাহ্মণ চকিতদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, বৃক্ষোপরি দুইটি পাখী বসিয়া আছে।

এমন সময়ে চকা বলিল, 'হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে ডাকিয়াছি; দেখ, এই পালকটি

তুমি নাও। এই পালকের সাহায্যে তুমি তোমার সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।' এই বলিয়া স্বীয় পক্ষ হইতে একটি পালক উৎপাটন করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট ফেলিয়া দিল।

এতদিন এত চেষ্টা করিয়া তিনি যে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন নাই, আজ সামান্য একটা পাখীর পালকের সাহায্যে সেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, ইহা ব্রাহ্মণের প্রত্যয় করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া চকা বলিল,—'তুমি কি জান, কেন সংসার তোমার প্রতি এত বিমুখ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'না, বোধ হয় অদৃষ্ট আমার প্রতি অপ্রসন্ন।'

চকা বলিল,—'তা নয়; সংসারে তুমি যাহাদের দেখিয়াছ, তাহারা মনুষ্যাকার বটে, কিন্তু মানুষ নহে। প্রকৃত মনুষ্যের সংখ্যা সংসারে অতি অল্প। তুমি প্রকৃত মানুষের কাছে গেলে, সাহায্য পাইতে পারিবে।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'এই মানুষ ও পশুর প্রভেদ আমি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব?'

'এই পালক তোমাকে সেই পার্থক্য বুঝাইয়া দিবে; এই পালকটি তুমি দক্ষিণ কর্ণে গুঁজিয়া রাখিও, তাহা হইলেই তুমি সব দেখিতে পাইবে।' এই বলিয়া পাখী দুইটি উড়িয়া গেল।

বিস্ময়-বিহ্বল ব্রাহ্মণ পাখীর বাক্যের সত্যাসত্য-পরীক্ষা-মানসে ধীরপদে জনপদাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক সভার তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তোরণদ্বারে দ্বারী বসিয়া আছে। ব্রাহ্মণ পালকটি দক্ষিণ কর্ণে স্থাপিত করিলেন। অমনই তাঁহার বিস্ময়ের মাত্রা সবিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। দেখিলেন, দ্বারপালের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হুবহু মানুষের মত, কেবলমাত্র মুখটি শৃগালের অনুরূপ। যে লোক নগরে যাতায়াত করিতেছে, তাহাদের কাহারও মুখ কুক্কুরের ন্যায়, কাহারও বা মার্জ্জার, শৃগাল, শার্দ্দূলাদির ন্যায়। বিস্ময়ে অভিভূত ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, হয় তাঁহার মস্তিষ্কের কোনও গোলযোগ ঘটিয়াছে, অথবা তিনি কোনও অতিপ্রাকৃত জগতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার চিত্তে শঙ্কার সঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ কান হইতে পালকটি তুলিয়া লইলেন; দেখিলেন, সকলেই মনুষ্যাকৃতি।

পালকটি পুনরায় কর্ণোপরি স্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণ নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, —সেখানেও সব ঐ রকম। কাহারও সাপের মত মুখ, কাহারও কাক, চিল, হাঁস, পায়রার মত, কাহারও বা শৃগাল, গর্দ্দভ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর মত। কিন্তু মানুষের মত মুখশ্রী তাহাদের কাহারও নাই।

ঘুরিতে ঘুরিতে কুতূহলী ব্রাহ্মণ নগর-প্রান্তে এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণে তিনি এক জন প্রকৃত মানুষের সাক্ষাৎ পাইলেন। সে ব্যক্তি এক জন চর্ম্মকার। এক জীর্ণ ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া পাদুকা নির্ম্মাণ করিতেছে।

বিস্ময়ে আনন্দে ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আঃ! এতক্ষণে এক জন মানুষ দেখিতে পাইলাম।' আগন্তুকের কথা শুনিয়া চর্ম্মকার কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং ব্রাহ্মণের এই উক্তির তাৎপর্য্য কি, জিজ্ঞাসা করিল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'দেখ, আমি এক জন ব্রাহ্মণসন্তান। পেটের দায়ে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। শুনিয়াছি, এখানে নিশ্চয়ই কোনও একটা সামান্য কর্ম্মের যোগাড় করিতে

পারিব। কিন্তু কাজ কর্ম্ম দূরের কথা, সামান্য কিছু ভিক্ষাও আমি কাহারও কাছে পাই নাই। এখনে ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। তুমি যদিও নীচজাতীয়, তথাপি এই অবস্থায় তোমার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আমি গত্যন্তর দেখিতেছি না।'

'ঠাকুর! আমি গরীব মুচী; ঘরে স্ত্রী আছে, চার পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। রোজ দুই আনা পয়সা পাই; তাতেই কোনও রকমে আধপেটা চলে। তা হলেও আপনি যখন আমার কাছে এসেছেন, তখন—আমার ত বেশী সাধ্য নাই,—দুই আনার পয়সা আমি আপনাকে দিতে পারি। আর, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিব, যাহাতে আপনার কোনও একটা কাজ কর্ম্মের যোগাড় হয়।'

ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারের বদান্যতার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন; এবং সেই দুই আনার পয়সা আপনার জঠরজ্বালা নিবৃত্ত করিলেন।

চর্ম্মকার সেইখানকার রাজার জন্য এক জোড়া জুতা তৈয়ার করিয়াছিল। সে পর দিন প্রাতে সেই জুতাজোড়াটি লইয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা সেই সূচীকর্ম্মখচিত পাদুকা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং চর্ম্মকারকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিতে আদেশ করিলেন।

চর্ম্মকার সবিনয়ে সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল যে, তাহার একটি প্রার্থনা আছে। মহারাজ তাহার সেই প্রার্থনাটি পূর্ণ করিলে সে আপনাকে সমধিক পুরস্কৃত ও অনুগৃহীত মনে করিবে।

রাজা তাহার প্রার্থনা অবগত হইতে চাহিলেন। চর্ম্মকার তখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুরবস্থার কাহিনী রাজসকাশে নিবেদন করিল; এবং রাজসরকারে তাঁহাকে কোনও একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করিল। রাজা দরিদ্র চর্ম্মকারের এই পরোপকারপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করিলেন।

পর দিন ব্রাহ্মণ পালকীতে চড়িয়া চর্ম্মকারের সঙ্গে রাজদরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ! স্বয়ং রাজার মুখটিই শৃগালের মত। রাজপারিষদদিগের মুখও বিভিন্ন প্রকার ইতর প্রাণীর ন্যায়। মানুষের মুখ তাহাদের এক জনেরও নাই।

রাজা ব্রাহ্মণের শিক্ষার পরিচয় লইয়া দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ হিসাবপত্রে বিলক্ষণ পটু। তিনি তাঁহাকে খাজাঞ্চিখানার প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণও এই সৌভাগ্যলাভে অতিশয় পুলকিত হইলেন, এবং উপকারী চর্ম্মকারকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ দিলেন।

ব্রাহ্মণ পরিশ্রমী, কর্ম্মপটু ও সুচতুর। অল্প দিনেই তিনি রাজার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

কিছু দিন এই ভাবে কাজ কর্ম্ম চলিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি রাজার অত্যধিক অনুগ্রহ দেখিয়া ক্রমশঃ অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ব্রাহ্মণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে অপদস্থ ও বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার ষড়যন্ত্র করিল।

রাজার নিয়ম ছিল, প্রতি মাসেই তিনি স্বয়ং হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণের শত্রুরা ইত্যবসরে কতকগুলি অপ্রকৃত খরচ হিসাবপত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়া দিল।

পর মাসে নিকাশের সময় সেই সমস্ত অপ্রকৃত খরচের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া

রাজা ব্রাহ্মণকে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আদেশ করিলেন। মতবুদ্ধি ব্রাহ্মণ কোনও সঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

সেই রাত্রেই ব্রাহ্মণ যে বৃক্ষে চকা চকীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, চকা চকী শাখায় উপবিষ্ট। ব্রাহ্মণ কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'হে ধীমান! আজ আমি বড় বিপন্ন হইয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি।'

চকা বলিল, 'আবার কি বিপদ? তুমি উচ্চপদ পাইয়াছ, রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছ, তোমার আবার বিপদ কি?'

ব্রাহ্মণ আপনার বিপদের কাহিনী বিবৃত করিলেন। শুনিয়া চকা বলিল, 'আচ্ছা, এইবার যদি কেহ তোমাকে বিপন্ন করিবার জন্য উক্তরূপ উপায় অবলম্বন করে, তবে তুমি রাজাকে বলিও যে, তাঁহার কর্ম্মচারীরা সকলেই পশু। তোমার প্রতি রাজার বিশেষ অনুগ্রহ-দৃষ্টি আছে বলিয়া তোমার সততা ও সুনাম কলঙ্কিত করিবার জন্য তাহারা হিসাবপত্রে ঐ সকল অপ্রকৃত ব্যয় সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রমাণস্বরূপ ঐ পালকটি রাজাকে তাঁহার দক্ষিণ কর্ণোপরি স্থাপন করিতে বলিও।'

পর মাসে রাজা পুনরায় যখন হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তখনও সেই সকল ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল। ক্রুদ্ধ রাজা ব্রাহ্মণকে অকৃতজ্ঞ, জালিয়াৎ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া তাঁহার স্কন্ধে তছবিল তছরূপাতের অভিযোগ আরোপিত করিলেন।

ব্রাহ্মণ সভয়ে বিনীতভাবে চকার নির্দ্দেশমত সমস্ত কথা রাজসমীপে নিবেদন করিলেন। শুনিয়া রাজা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন; চীৎকার করিলেন,—'কি! আমার কর্ম্মচারী সকলেই পশু!'

ব্রাহ্মণ সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, মহারাজ! আপনার কর্ম্মচারীরা সকলেই পশু। এমন কি, মহারাজের মুখটিও শৃগালের অনুরূপ।'

বিস্ময়ে, ক্রোধে, অপমানে কম্পিতকলেবর রাজা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'যদি তোমার উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিতে তুমি অসমর্থ হও, তাহা হইলে তোমার কি শাস্তি হইবে, জানো?' ঘাতকের কুঠারাঘাতে তোমার মস্তক দেহচ্যুত হইবে।'

ব্রাহ্মণ কম্পিতহস্তে পালকটি রাজ-করে অর্পণ করিয়া, দক্ষিণ কর্ণোপরি তাহা স্থাপন করিতে বলিলেন। স্থাপন করিবামাত্র বিস্ময় বিমূঢ় রাজা দেখিলেন, রাজমন্ত্রীর মুখটি কুকুরের ন্যায়। দর্পণের প্রতি চাহিয়া দেখেন যে, তাহার নিজের মুখটিও শৃগালের অনুরূপ, এবং তাঁহার পারিষদবর্গের মুখাবয়বও বিভিন্ন ইতর প্রাণীর ন্যায়। রাজার বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হইল। তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ করিয়া রাজা উঠিয়া গেলেন; এবং শীঘ্রই তীর্থযাত্রা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যাহাতে আমি মনুষ্যের মুখশ্রী পাইতে পারি, তাহার কোনও উপায় কি তুমি করিতে পার না?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমি স্বয়ং ইহার কোনও প্রতীকার করিতে পারিব না; কিন্তু যে চকা চকীর অনুগ্রহে আমি এই অদ্ভুত তত্ত্ব জানিয়াছি, সেই চকা চকীর নিকট আপনাকে লইয়া যাইতে পারি।'

পৌষ মাসে যখন সমস্ত নগরবাসী সুখনিদ্রায় অভিভূত, মন্দভাগ্য রাজা তখন ব্রাহ্মণের

সঙ্গে লইয়া সেই নির্জ্জন বনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেই পবিত্র বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বৃক্ষোপরি পাখী দুইটি বসিয়া আছে।

আগন্তুকদ্বয়কে তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবা[illegible] না দিয়াই চকা বলিল, 'আমরা তোমাদের আগমনের কারণ অবগত আছি।' রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'যাও, তোমার সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে দূর করিয়া দাও, এবং এই ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মানিত ও পুরস্কৃত কর। তাহা হইলেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।'

পর দিন রাজতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। ব্রাহ্মণ সম্মানিত হইলেন, এবং রাজপুরে গণদেবতার অর্চ্চনা প্রবর্ত্তিত হইল। রাজার লোভের বা আক্ষেপের কোনও কারণ রহিল না।

বৌদ্ধধর্ম্মে রমণীর স্থান।

বিগত ১৫ই জুন দার্জ্জিলিঙ্গের 'লুইস্ স্যানিটেরিয়মে' 'ভারতীয় অনুসন্ধান-সমিতি'র এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে রায় শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর 'বৌদ্ধধর্ম্মে রমণীর স্থান' শীর্ষক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমরা নিম্নে তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের মতে, পুরুষ ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে রমণীত্ব লাভ করিয়াছে। রমণী স্বর্গের দান। বিধাতা প্রথমে পুরুষকে গড়িয়াছিলেন। তার পর পুরুষের বক্ষঃপঞ্জর লইয়া রমণীর সৃষ্টি করেন। নারী হইতেই আবার পুরুষের অধঃপতন সংঘটিত হয়।

হিন্দুর পুরাণে মানবজাতির উৎপত্তি-রহস্য সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকার কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নারীজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুর কল্পনা হিব্রুজাতির কল্পনা অপেক্ষা বহু উচ্চ। প্রজাপতি ব্রহ্মা মানবের আদি জনক-জননীকে এক-দেহাত্মক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দক্ষিণাংশ জনক বা পুরুষ, বামভাগ জননী বা নারী। দক্ষিণাংশ অপেক্ষা বামভাগ গৌরবর্ণ ছিল। এই যুগলমূর্ত্তির নাম 'গৌরী-শঙ্কর'। স্বর্গ হইতে ধরাতলে আসিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করেন। 'গৌরী-শঙ্কর' রূপক। কিন্তু জীব-সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় সত্য এই রূপকে নিহিত আছে। 'গৌরী' অর্থে প্রকৃতি, বা জননী; 'শঙ্কর' অর্থে পুরুষ, বা জনক। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মানব জাতির অভ্যুদয়। এই 'গৌরী-শঙ্করে'র রূপক-কল্পনায় পবিত্র বিবাহ-বন্ধনের কি সুন্দর বিশ্লেষণ! কিন্তু পরিণয় ব্যাপার ত্রিদিবধামে সংঘটিত হয় নাই, মর্ত্ত্যলোকেই সম্পাদিত হইয়াছিল। এই দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে নর-নারীর আত্মায় আত্মায় যে মিলন হয়, স্বর্গলোকে গমনের পর তাহা আর স্বতন্ত্রভাবে থাকে না। তখন উভয়ের একই দেহ, একই আত্মা। স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পায়। খৃষ্টানের বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান প্রথমে পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সুখ ও সুবিধার জন্য পরে নারীর উৎপত্তি। কিন্তু হিন্দু তাহা বলেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে, প্রজাপতি ব্রহ্মা একই সময়ে নর-নারীর সৃষ্টি করেন। তাই তিনি উভয়কে স্বামী স্ত্রী রূপে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রীর সখা, স্ত্রী স্বামীর সখী।

বিস্ময়ের বিষয় এই, নারীজাতি সম্বন্ধে হিন্দুর এই মতের সহিত ইংরাজের মতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অর্দ্ধাঙ্গের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি না করিয়াও ইংরেজ পত্নীকে শ্রেষ্ঠার্দ্ধ (better

half) সংজ্ঞা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সকলের শ্রেষ্ঠাংশ অর্থাৎ উত্তরতর অংশ গৌরী (সুন্দরী)। আর্য্যগণ রমণীর মর্য্যাদা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্য বিবাটি আর্য্যবংশের শাখা প্রশাখা হইতে যে যে জাতির উদ্ভব হইয়াছে, সকলেই রমণীকে সম্মান করিতেন, এবং তাহাকে পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতেন। আদিমকালের মিশরবাসী, গ্রীক্, রোমক, ইরাণী ও ভারতবাসী, সকলেই জাতীয় উন্নতির যুগে রমণীকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। ইরাণী জাতির বর্ত্তমান বংশধরগণ এখনও রমণীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। জাতীয় অধঃপতনের যুগে ভারতবাসী বৌদ্ধদিগের সংস্কার ও সেমিটিক জাতির ভাবরাশির অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহারা ক্রমশঃ রমণীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশে কুণ্ঠিত হইলেন, নারীকে পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। নারী যে পুরুষের সমকক্ষ, তাহা বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে যে আদর্শের কল্পনা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীর মস্তিষ্কে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা হারাইতে বসিয়াছেন। নারীজাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনে, অর্থাৎ তাহার কোমল সুন্দর প্রকৃতির উৎকর্ষ-সাধনে ভারতবাসী ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যসমাজ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্ম রমণীকে পুরুষের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিদান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের মতে নারীসংস্পর্শ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে প্রসব-বেদনাক্লিষ্ট অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বুদ্ধত্বজ্ঞান লাভ করেন। বুদ্ধ হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি, পুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে, এই মত প্রচার করেন। নির্ব্বাণ মানবের চরম লক্ষ্য, উহা লাভ করিতে হইবে। তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিয়াছিলেন, প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ পত্নী ও সন্তান ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুক, স্ত্রী পুত্রের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, সে বিষয়ে কাহারও চিন্তা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ৪৬ বৎসর ধরিয়া বুদ্ধ এই মত জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন।

রমণীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল ও দুর্ব্বল বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতে নারী পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব জন্মান্তরে পুরুষ-দেহ-প্রাপ্তির জন্য তাহাকে তপস্যা অর্থাৎ পুরুষোচিত গুণের অনুশীলন করিতে হইবে। নারীজন্মে সে কখনই পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইবার তাহার কোনও অধিকার নাই। যদি সে নির্ব্বাণ লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে পরজন্মে পুরুষ হইবার ঐকান্তিক চেষ্টা তাহাকে করিতেই হইবে। নহিলে নির্ব্বাণের পথ তাহার পক্ষে রুদ্ধ। এই কারণে প্রথমতঃ বুদ্ধ রমণীকে ভিক্ষু-সম্প্রদায়-ভুক্ত করিতে চাহেন নাই; কেবল পুরুষকে ভিক্ষু হইবার অধিকার দান করিয়াছিলেন।

মগধ রাজ্যের জনসাধারণ ব্রাহ্মণধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধের প্রচারিত নবধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কয়েক বৎসর পরে তিনি মঠ বা সন্ন্যাসাশ্রমসমূহের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি জন্মভূমি কপিলাবস্তু নগরে গমন করেন। তখন তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নী ও ধাত্রী মহাপ্রজাপতি ভিক্ষু-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবার প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেব প্রথমতঃ তাঁহাদের এই সানুনয় প্রার্থনা

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিত হয় নাই ; কিন্তু পরিচ্ছেদের আরম্ভের অব্যবহিত পরেই নারীজাতিকে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকার দান করিয়াছিলেন। রমণীর পক্ষে মঠের দ্বার উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু সন্ন্যাসিনীদিগের পক্ষে কঠোরতম নিয়মপালনের ব্যবস্থা হইল। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর আনন্দকে এই জন্য বড় নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। আনন্দের অনুরোধেই বুদ্ধদেব নারীজাতিকে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস অবলম্বনের অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, মহাভারতের প্রকাশ্যভাবে আনন্দকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি কয়েক বৎসরের জন্য অর্হত-পদ-লাভে বঞ্চিত ছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসাশ্রম কোনও কালে ভগ্নিভোগ্য হয় নাই। অদ্যাপি ব্রহ্মদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষে বা অন্য কোনও স্থলে এই প্রথা আদৃত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে সিংহল ধর্ম্মের প্রধান তীর্থস্থান। এখানে অসংখ্য মঠ বিদ্যমান ; বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংখ্যাও গণনাতীত। কিন্তু এখানেও সংসারত্যাগিনী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা সহস্রাধিক নহে। চীন, [illegible] বা শ্যামদেশে হয়ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে লোপই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল লক্ষ্য, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান দেশে সন্ন্যাসিনী [illegible] সামঞ্জস্য হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ! ভারতীয় আর্য্যগণ বুদ্ধের প্রচারিত এই মত প্রথমে সম্মত হন নাই। নারী যে পুরুষের অপেক্ষা হীনবুদ্ধি, নিকৃষ্ট,- ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। নারীর প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিতৃষ্ণা দেখিয়া আর্য্যগণ উহা পরিত্যাগ করিলেন। কালক্রমে জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করিল, সুতরাং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম ভারতবর্ষে স্থায়ী হইতে পারিল না। নিম্নশ্রেণীর লোক এই ধর্ম্ম কিছুদিন সুবিধাজনক দেখিয়া তাহা বরণ করিয়া লইয়াছিল ; কিন্তু তাহারা ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মণধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজকগণের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রকাশেও তাহাদের সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত কিছুকাল নিষ্ফল প্রতিযোগিতা করিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ম্লান হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে কতিপয় বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজক ইহাকে লোকপ্রিয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক প্রকার নূতন মত ও সাধনপদ্ধতি এই সময়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। যাঁহারা এই সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা মহাযানপন্থী বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মমতের ভিত্তির উপর মহাযান প্রতিষ্ঠিত হইলেও, এই সংস্কৃত ধর্ম্মের মূলে নিষ্কাম পরোপকার প্রচ্ছন্ন ছিল। নূতন রূপে আবরণে বৌদ্ধধর্ম্ম কিছু শতাব্দী ধরিয়া বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়মের কঠোরতা হ্রাস হওয়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের মধ্যে দুর্নীতি সংক্রামিত হইতে লাগিল। ইহাতে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইলেন ; তাহাদিগকে গৃহে [illegible] কাহাকে দেওয়া দূরে থাকুক, নিজের পর্য্যন্ত আনিতে দিতেন না।

বৌদ্ধধর্ম্মযাজকগণ অবশেষে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। নিম্নশ্রেণীর লোক অলৌকিক ব্যাপারের পক্ষপাতী। বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আবরণে তান্ত্রিক মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তান্ত্রিক মতে অল্প সাধন করা যায়, ইত্যাদি বিদ্যা আশায় তাহারা তাহাদের গ্রহণ করিলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে মদ্য রমণী-সঙ্গই নির্ব্বাণলাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে (কাপালিক) সুরাপান ও রমণীসংসর্গ করিতেই হইবে। তাহার সাধনা সম্পূর্ণ নির্ব্বাণলাভ না হউক অন্ততঃ অমরত্ব তান্ত্রিকের মতে এই উপায়ে [illegible] অনায়াসলভ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ ঋষিদের অবিদ্যা ও [illegible] আনয়ন করিবার উপযুক্ত মনে করিয়া এই কার্য্য করেন। সেই জন্য স্থূল [illegible] তাঁহারা তান্ত্রিকের স্থাপন করিয়াছেন ; "উহার জন্য এক একটী ঋষিদ্বারা হয়ে গেছে, তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইলে স্বাধি, ভোগ ও মদের প্রভৃতি যতি নীচ জেণীর হিন্দুর মধ্যে হইবে [illegible] শক্তিশালী ঋষির আবির্ভাব হইতে [illegible]। তাহাদের ঐক্যবদ্ধ [illegible]

[illegible]

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

—:০:—

[illegible]

হয় নাই। তিনি যেটি করিয়াছেন তাহাকে কেবল সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। লোকের তাহা মন্দ লাগে নাই। তাহা ভিন্ন, তিনি ঐতিহাসিক বিষয়-নির্ব্বাচনে যাহাদের নিকট হইতে এই বিপুল বিষয়ের ঐতিহাসিক চিত্রগুলি কত ফুল ফুটিয়াছে, তাহাদিগকে বাঙ্গালী কবি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত প্রেমের কোটোগ্রাফ তোলাইয়া মুখ ভার, এবং আর অগ্রসর না হইয়া সেখানে থমকিয়া দাঁড়ান। তাহাদের পক্ষে সুখ দুঃখ গভীর পরিমাণে ফুটিয়া উঠে নাই; তাহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি সে সব স্থলের কোনও সন্ধান পায় না। এই সব এখনকার সাধারণ গল্প আখ্যায়িকার ও সমালোচনার এত অভাব, ইহাদিগকে সেখানে খুঁজিতে হয় না। আমাদের মনস্তত্ত্ব-চিত্রের খানিকটা ঐতিহাসিক নহে। নগেন্দ্রনাথের যৌবনস্বপ্ন কিছু বিশেষ ঐতিহাসিক চিত্র নহে। ঐতিহাসিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস গল্পের কুল ফোটে চাষা যেখানে বেশ রস পায় সেখানে চাষ করিতেছেন এবং ফুলের নাম দিয়া তাহাই তবেই সেটে বিক্রয় করিতেছেন। সমাজের কোনও উচ্চস্তরের তাহা করিতে পারে না। ঐতিহাসিক, দার্শনিক, কবিতা, বাক্তি, গার্হস্থ্য প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ও দেশব্যাপী উচ্ছ্বাসে তাহারা তাহের বস্তু সাধারণ। সাধারণতঃ প্রেমের প্রেত ও বাসনার প্রেতিনীই যাহারা সাধারণ করিয়াছে। ইহা—সাহিত্যে পরিধির দোষ নহে; মানব-জীবনের প্রসার এত সঙ্কীর্ণ নহে। যেসব সাহিত্যিক মানব-জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া আরম্ভ করিতে পারেন, তাহারা কুলের ফুটিয়া ফিরিয়া মানবকে, তার বিপুল বিচিত্র সুখ দুঃখের সহিত পরিচিত করিতে পারেন। ঐতিহাসিক বিষয় মানব-সাহিত্যের উপাদান নহে। "শিল্পবিজ্ঞানিক আবশ্যকীয়-কেবল ইতিহাস ঘাটে" সমস্তোচিত ও তথ্যপূর্ণ বটে, কিন্তু যাহারা পাঠকের উপযোগী নহে, কিন্তু তাহা সেখানেই প্রকৃত ও তত চালান উচিত, এই প্রবন্ধে আমরা বলি। বিষয়ে এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "ফোয়ারা" নামক প্রবন্ধটি পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। "ফোয়ারা"—লেখক লিখিয়াছেন, পৃথিবীর কোন দেশে ঐতিহাসিক প্রেমের উদ্ভব হয়। এখন আমি যাইয়া ফুলগাছ করিবার ইচ্ছা হয়; পরে আর সেখানে যাবার শক্তি থাকে না। এই বোধ করি বাঙ্গালী অবস্থা। আমি করিতে পারিতেছি না—কেবল পড়িয়া যাইতেছে, মাটি হইতেছে। মৃত্যুক্ষণে পরিতাপ শোচনীয়,—এক সময় সেখানে মৃত্যু, এই বাঙ্গালীর অনিবার্য্য ফল।" শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়ের "উদ্ভিদের কথা" ও সেইরূপ। আমাদের নবীন শিক্ষার্থীদের সুখের আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র। ভৈরব। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সাহিত্যে বিজয়ে" [illegible] তাহা আমরা জানিতাম। রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—সকল দেশেই [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার একটা বড় কাজ পাইয়াছেন, সেখানে যা [illegible] তিনি [illegible] চলিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা, [illegible] প্রভৃতি [illegible] বিষয় [illegible] আজ বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] মনে [illegible] আগে করিয়াই সে সকল দেশে সভ্যতার এই [illegible] [illegible] ও ফরাসীর [illegible] ইংরাজ, [illegible] ফরাসী, আমেরিকা [illegible] হইয়া তাই যে একমাত্র বড় কাজ তাহা নহে, তাহার [illegible] [illegible] [illegible] পাঠকের মুখরুচি, [illegible] সন্ধান [illegible] [illegible] [illegible]

জানিলে দেশের কাজ করা যায় না। শুধু তাই নয়—এই জানিবার চর্চ্চাই ভালবাসার চর্চ্চা। দেশের ছোট বড় সমস্ত বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই তবে সে আবার আপন ও আমার পক্ষে সত্য হইয়া উঠে। নহিলে দেশহিতসম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা লইয়া আমরা যে সকল বড়-বড় কথা বাংলাদেশের ভাষায় আবৃত্তি করিতে থাকি, সেগুলো বড়ই বেসুরো শোনায়। তাই দেশের ভাষা, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়া দেশকে জানিবার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ প্রস্তুত হইয়াছেন। বাংলাদেশের সকল জেলাই যদি তাঁহার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দেন, তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। সফলতা দুই দিক্ দিয়াই হইবে—এক, যোগের সফলতা, আর এক সিদ্ধির সফলতা।" শ্রীযুত শারদানন্দ স্বামী "স্বদেশী ব্রত" নামক সুলিখিত সুচিন্তিত আন্তরিকতাপূর্ণ প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"যদি আমরা আমাদের হৃদয়কে আমাদের সাতীয় ধর্ম্ম—সত্য, পুণ্য ও নিষ্কামকর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি, তবেই আমাদের মধ্যে আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। পৃথিবীতে আমরা স্বাধীন, মহান, ও পূজনীয় হইব, এবং পূর্ব্বে যেমন আমরা জগতের আদর্শস্থানীয় ও গুরু ছিলাম, সেইরূপই হইয়া উঠিব। অন্যথা আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।" শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের "প্রাদেশিক সমিতি" সাময়িক রচনা, অসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "রাজতপস্বিনী" উপভোগ্য, কিন্তু মাত্রা বড় অধিক। শ্রীযুত বনমালী বেদান্ততীর্থের "ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা" বিশেষজ্ঞের উপযোগী। মাসিক পাঠকের দরকার করিবার উপায় নাই। "রাইবনী দুর্গ" উপন্যাসের দুই পৃষ্ঠা পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। লেখক নাম প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু প্রাঞ্জল মধুর স্বচ্ছ ভাষায় লেখকের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত দেখিতেছি; শ্রীযুত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের "মুক্তকণ্ঠ" কবিতায় ভাষার ঝঙ্কার আছে, কিন্তু পুরাতন ভাবের নূতন প্রতিধ্বনি।—মামুলী প্রেম-তন্ময়তার উচ্ছ্বাস এই কবিতার সর্ব্বস্ব নয়।

জাহ্নবী। চৈত্র। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন বিশ্বধাত্রীকে 'রাঙ্গা মেয়ে' কল্পনা করিয়াছিলেন,—

"ঝিনুকের দাগে দাগে, অরুণের রাগে,
রাঙ্গা মেয়ে! ঐ তোর রাঙ্গা মুখ জাগে!"

কবি "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই মহাবাক্য কমনীয় কবিতায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশধর রায় "স্বপ্ন" প্রবন্ধে বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক মূলের অনুসন্ধান করিতেছেন। কবি বলিয়াছেন—"সকলই বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড, গোড়া নাই আগা!" বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, স্বপ্নের আদি ও অন্ত বিজ্ঞানের প্রমাণে ধরা পড়িতে পারে। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের "ভালোবাসা" নামক সুন্দর কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

"হে ধরণী! কোথা তোর সে সুষমারাশি, শুধু নিমেষের স্বপ্ন। হে চির-ব্যথিতা!
চারুহাসে বিশ্ব-দীপ্ত নিখিলরঞ্জন? তুমি গড়িতেছ নিজ সরবস্ব দিয়া
কোথা শ্যাম-আবণের চল-চল হাসি, কাননের স্বর্ণ-স্বর্গ দিবা-অপরূপ।
বিহগ গীত-গন্ধ চিত্ত-সম্মোহন? অলকো সংহরি-দও পলিয়া ঘুমিয়া
আজি মনে হয়, হায়! তোর মাতৃকোল মৃত্যু রাচিতেছে-তাহে মৃদু ভস্ম-স্তূপ।
উষ্ণ-অশ্রুতে সমাকীর্ণ অতীতের চিতা। তাই তোর বক্ষে বহে অকূল পাথার
নব্যঃপালীর সুষমা—জীবন-হিল্লোল অনন্ত লীলাময়-নিধি—মাতৃ-অঞ্চলে।"

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্তের "মৃত্যু-বধূ" নামক চৈনিক গল্পটির আখ্যানবস্তু সুন্দর,—মর্ম্মস্পর্শী।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

২

দুঃখের বিষয়, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অদ্যাপি অবিকৃত আকারে মুদ্রিত হয় নাই। ইহার সম্পাদককে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইবে, পশ্চিম রাঢ়ের বর্ত্তমান ভাষা ব্যতীত ওড়িয়া ও হিন্দী শব্দ শিখিতে হইবে, নানাবিধ গ্রাম্যকথা জানিতে হইবে, পশু ও পক্ষী, বন ও উপবনের বৃক্ষ চিনিতে হইবে। দুই পাঁচখানি পুঁথী মিলাইয়া পাঠ উদ্ধার করিলেই সম্পাদকের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। প্রাচীন পুস্তকের টীকা আবশ্যক, এবং টীকা করিতে গেলেই প্রচুর যত্ন আবশ্যক। কবিকঙ্কণের যে দুই ভিন্ন সংস্করণ ছাপা হইয়াছে, তাহার কোনখানিকে আধুনিক কালের উপযুক্ত পরীক্ষাত্মক সংস্করণ বলিতে পারা যায় না। একখানি সন ১২৭৫ সালে নীলমণি চক্রবর্ত্তী দ্বারা 'সংশোধিত' এবং কলিকাতার আহিরীটোলায় মুদ্রিত হইয়াছিল। আমাদের বক্তব্যের নিমিত্ত এইখানিকেই আশ্রয় করা গেল। এই সংস্করণে ছাপার ভুল বিস্তর আছে, কিন্তু সম্পাদকের কারিকরির লক্ষণ নাই। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই যথেষ্ট মানিতে হইবে।

কত প্রচলিত বাক্যে কবিকঙ্কণকে দেখিতে পাই, তাহার ইয়ত্তা হয় না: 'নিশিতে জাগিয়া থাক, প্রহরে প্রহরে ডাক, হবে তুমি শিয়াল প্রহরী।' 'এ বিরহ জ্বরে, পতি যদি মরে, কোন ঘাটে যাবে পাণি।' 'পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।' 'মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন।' 'আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চস, তিন সন বই দিও কর।' 'দুই চক্ষু জিনি নাটা। 'কুমারের চাক যেন ফিরে।' 'এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই।' 'কি জানি দৈবের মায়া, আসি কোন পথ দিয়া, নাবিকেরে সাধাইল পাণি।' 'অলকা তিলকা পর মোহন কাজল।' 'আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুণ্ডে।' 'আপনি রাখিলে রহে মান।' 'দেখয়ে শরিষা ফুল।' 'নদী নালা একাকার।' 'বসে খেতে নাহি আঁটে।' ইত্যাদির অংশবিশেষ প্রায় কবির ভাষায় গ্রাম্য লোকেরা অদ্যাপি বলিয়া থাকে।

স্থলে কয়েকটি দুরূহ সংস্কৃত শব্দ আছে। 'পৌষেতে প্রবল শীত সুখী ... তুলা তনুনপাৎ তৈল তাম্বূল তপন॥ পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস ... নী। কলশৌত, মঙ্কর, শালভঞ্জী, পরিকর, তোক, আখেটী', ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দ এক্ষণে বাঙ্গলায় চলিত নাই, কিন্তু হিন্দী ও ওড়িয়াতে চলিত আছে। যথা, পুখরি আড়া—পুকুর আড়া বা পাড় (ওড়িয়াতে পোখরি হড়া)। জোহার—প্রণাম, প্রাচীন কৃত্তিবাসে ও হিন্দীতে আছে, ওড়িয়াতে জুহার। কাতি—কর্ত্তরী, কাটারী; কৃত্তিবাস, হিন্দী ও ওড়িয়াতে আছে। পাকাস—প্রক্ষালিত অন্ন, পূর্ব্ব রাত্রির ধোয়া ভাত (ওঃ পথাম)। আওয়াস—আবাস, বিশেষার্থ রাজবাড়ী। উসাস—লাঘব; খরা—রৌদ্র; নেউটিয়া বাহুড়িবা—ফিরিয়া; বিউনী—ব্যজনী, পাখা; তোরানি—আমানি; উবার—ধার; পানের বীড়া—পানের গোছা; বায়ান্ন পউটা—পশ্চিম রাঢ়ে নাই, নদীয়া ও ওড়িয়ায় আছে। স্থানভেদে পরিমাণভেদ হইয়াছে। ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দ পশ্চিম বঙ্গে অপ্রচলিত হইয়াছে। 'পসরা'—বিক্রেয় দ্রব্য। কিন্তু দোকানী পসারী কথা আছে। বেকনিয়া—মুনিষজন—এখন মানভূমে চলিত আছে। তূলী—তোষক, লেপ। সাঁপুড়া—সম্পুট, ছোট পেঁড়া। বেহান বিকাল—এখন রাঢ়ে সকালে বিকালে, পূর্ব্ববঙ্গেও হিন্দীতে বিহান শব্দ চলিত আছে। ওড়ফুল—জবাফুল। আরতি—আদেশ, নিয়োগ। পাছড়া—বর্ত্তমান চাদর। ইহা পাট কিংবা কাপাসের সুতায় বোনা হইত। পাছড়া—দুই প্রকার; একপাটা—প্রায়ই ধুতীর সঙ্গে বোনা হইত, কাজেই দুই ধারে পা'ড থাকিত। দোপাটা—পৃথক্ বোনা হইত। দুইখানা মাঝে শেলাই করিলে চাদর হইত। তড়প—শাদা পা'ড় লম্বা ধুতী। ধুতী শব্দ কিংবা ধুতী বলিলে আজ কাল যাহা বুঝি, পূর্ব্বকালে তাহা ছিল না। ওড়িশার গ্রামে এখনও তাহা অজ্ঞাত আছে। খদি—ছোট ধুতী, শাড়ী আঁচলা যুক্ত ধুতী ইত্যাদি।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কবিকঙ্কণে শত শত গ্রাম্য শব্দ থাকিলেও পারসী আরবী কিংবা ফারসী শব্দ অধিক নাই। যেখানে মুসলমান প্রজার কথা বলিতে হইয়াছে, সেখানে অবশ্য আছে। তদ্ভিন্ন, অন্যত্র অল্প। 'বেগর কোন্দলে ভাব নাহি হয় খেলা।' 'বদল আনে আনাধন এনেছি নিংহলে।' 'কুলেতে উঠিতে দেই রাজার দোহাই।' 'কেহ লোণ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল।'

পাঠান্তরে উহাকে এক ভোজ-রাজ-কুলও বলা হইয়াছে। যাহা হউক, যাহাকে যাহা লাগে, ধনপতিরা ব্রাহ্মণ। রাজা বুদ্ধিপ্রতিবে রাজা হইলেও, অর্থে ছোট ঘরে বিবাহ দিবেন। এই অর্থে পণ্ডিত নাড়ের কোনও লোকও জানে কদাচিৎ এখনও ঘরে সম্বন্ধ করিতে আছে। হরিনাথ মজুমদার ভাই প্রায়ই বলে থাকেন।

কবিকঙ্কণ তিন শত বৎসর পূর্বের যে সামাজিক চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ অমূল্য বিবেচিত হইবে। পূর্বে বলিয়াছি, কবিকঙ্কণ জন্মান্ধ কবি, তাঁহার শ্রোতা তাঁহারই ন্যায় প্রায় সকলে। যেমন, তখনও গর্ভিণী নারীর সন্তানপ্রসবে বিলম্ব হইলে তাহাকে অন্নপড়া (অন্নপূর্ণা জল) খাওয়ান হইত। প্রসবের পর পাঁচুড়-ঘরের দুয়ারে গরুর মাথার খুলি রাখা হইত, এবং তিন দিন, দুই দিন, সাত দিনে নয় দিনে, ও একুশ দিনে এক একটি উৎসব হইত। এখন অনেক ভাবে একত্রিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া একুশ দিনেই এই পাঁচুড়-ঘর হইতে বাহির হইয়া থাকে। ষাণ্মাস বিধি অনুসারে পুত্রের ছয় মাসে, এবং কন্যার সাত মাসে অন্নপ্রাশন হইত। পাঁচ বৎসর বয়সে গন্ধবণিকের পুত্রেরও কর্ণবেধ হইয়া বিদ্যারম্ভের নিমিত্ত পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের নিকট অর্পিত হইত। সাত বৎসর বয়সে কন্যারও কর্ণবেধ হইত, কিন্তু সকলে বিদ্যা শিক্ষা করিত না। শ্রীমন্তের মা খুল্লনা পত্র পড়িতে জানিত, কিন্তু লিখিতে সংখ্যা পারিত না। অথচ দুই জনেই এক পাঠশালে গিয়াছিল।

বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এখানে বাল্যকালে কন্যার বিবাহ হইত। বর পরাধ রঙ্গশালা ও হাতে মৌরলা তরবারি পরিয়া, গালে কুঙ্কুম মেখিয়া, ঘোটকে (ঘোড়ায়) চড়িয়া কোনও সময়ে বিবাহ করিতে যাইত। সঙ্গে নানাবিধ বাদ্য ও শুভ্র পুষ্পে সজ্জিত (বরণডালা) চলিত। বিবাহের পর বরকন্যা শ্বশুরবাড়ী রহিত। অর্থাৎ এখন যে প্রথা হইতে এখন উঠিয়া গিয়াছে। বলিবার প্রয়োজন নাই, দরিদ্রেরা এ নিয়মে বিবাহ করেন, কিন্তু ধনিকেরা শীঘ্রাতিশীঘ্র পুত্রবধূ দেখিতে চান। স্বাভাবিক, বাল্যে শ্বশুরবাড়ীর স্নায়ু আবহাওয়ায় কিছু দিন না করিলে, পরে সেখানে এই অর্থ হিন। কন্যার শুভ কামনা করিয়া জ্যোতিষী, বিবাহের পূর্বে কড়ী ঘড়ী উৎস করিয়া দিতেন। নক্ষত্রের মুহূর্ত হইতে

... ...

ধনী ছিল যে, তাহাদের রথ সাত ঘোড়ায় দিন রাত বহিত; কাহারও বাড়ির মহলে সাত মরাই টাকা থাকিত। কিন্তু 'ধন হইতে হয় কি বা কুলের প্রকাশ।' ধনপতি আগে কার কপালে চন্দন ও গলায় মালা দিবে, তাহা লইয়া তুমুল বিবাদ আরম্ভ ও ঘরের কুচ্ছা বাহির হইল। কারও ঘরে দুয় বউ পতির সহমৃতা হয় নাই, কারও বাপ হাটে আমলা (আমলকী) বেচিত, বারবনিতার সনে হাতাহাতি করিত, এবং স্নান না করিয়া খাইতে বসিত। শেষে ধনপতির নিজের বরের কথা বাহির হইল। যখন সে রাজার কাজে বিদেশে ছিল, তখন তাহার বড় স্ত্রী কোন্দল করিয়া মারিয়া ধরিয়া ছোট খুল্লনাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে, অভাগী খুল্লনাকে বনে বনে ছাগল চরাইতে হইয়াছিল। তখন তার বয়স সবে বার তের বৎসর। কিন্তু বনে শতেক মাতাল বেড়ায়; কে জানে, খুল্লনার সতীত্ব ছিল কি না। সে সতীত্বের পরীক্ষা না দিলে সেহই তার রান্না খাইবে না। ধনপতি বিষম ফাঁপরে পড়িল; তাহার শ্বশুর রাজার দোহাই দিল। কিন্তু জাতিকে রাজবল দেখান মিছা। রাজা ধন ও প্রাণ লইতে পারেন, কিন্তু 'জ্ঞাতি বন্ধুজন' * জাতি লইতে পারে। ধনপতি লক্ষ টঙ্কা দিয়া বান্ধব বশ করিতে ইচ্ছা করিল। খুল্লনা বুদ্ধিমতী। সে বলিল, 'আজি ধন দিলে দিবা বৎসরে বৎসরে'; অথচ তাহার কলঙ্ক ঘুচিবে না। সে পরীক্ষা 'লইবে'। গঙ্গাজলে স্নান করিয়া সে সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিল। অভয়া অভয় দিলেন। সভার সাত পণ্ডিত একবুদ্ধি হইয়া পরীক্ষার বিধি স্থির করিলেন। অশ্বত্থপত্রে মন্ত্র লিখিয়া দুই পথিকের মাথায় দিয়া সরোবরের জলে ডুবান হইল। পথিক-দুয় পাতা লইয়া উঠিল, খুল্লনার জয় হইল।

কিন্তু জলের পরীক্ষা কিছু নয়। হয় ত পথিক দুজনের সঙ্গে ধনপতির সাঁট ছিল। যাহা হউক, এক নূতন ঘটের ভিতরে বিষধর সাপ ও সোনার অঙ্গুরী রাখা হইল। খুল্লনা সেই ঘটে হাত প্রবেশ করিয়া সাতবার অঙ্গুরী তুলিল।

এই পরীক্ষাও কিছু নয়। সাপের মুখ বাঁধা যায়। তখন কামার আগুনে শাবল তাতাইয়া লাল করিল। অশ্বত্থপত্রে বীজমন্ত্র লিখিয়া খুল্লনার

* এখন বাঙ্গালায় জ্ঞাতি কুটুম্ব। কবিকঙ্কণে বন্ধু শব্দ সংস্কৃত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত কুটুম্ব অর্থে পরিবারবর্গ, এবং বন্ধু অর্থে মাতৃবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু। অর্থাৎ, বাঙ্গালা কুটুম্ববর্গ বুঝায়। ওড়িয়া কুটুম্ব। বাঙ্গালা=পরিজন ও জ্ঞাতি। ওড়িয়া বন্ধু=বাঙ্গালা কুটুম্ব।

হাতে দিয়া সেই জ্বলন্ত মাথা হইল। খুল্লনা পাতল করিয়া দুধে দুধের উপরে ফেলিয়া দিল। তুষ পুড়িয়া গেল।

এখনো বিপক্ষ কাহার মন উঠিল না। কে না জানে, আগুনে ভাজিলে হয় খৈ। আগুনে কি পরীক্ষা হইল! খুল্লনা সেই আগুন সমান ছিদ্র লৌহ ফেলিয়া তাহা তুলিয়া লইল। কিন্তু সে আগুনও ত জ্বলে যায়! যাহা হউক, এত দ্বন্দে কাজ নাই, এক লক্ষ ভঙ্গা দিলেই সকল পাপ ঘুচিয়া যায়। তখন ধনপতি রোষযুক্ত হইয়া ভুণ্ডা পরীক্ষা করাইলেন। ইহাতেও মণিমুক্তা হারিল, কিন্তু তাহাদের কানাকানি থামিল না। তখন ধনপতির এক পিতভক্ত ভাই সীতার সৌগৃহপরীক্ষার কথা তুলিল। সে উচিত কথা কহিতে চায়, ভাইবউ সৌগৃহ করুক, সবাকার মনে সন্তোষ হউক!

নগরে নগরে লোক ছুটিল। বাঁশের মাথায় পাটের পাছড়ায় শত শত সোনালি চেলেক্কা (টাপা) বাঁধিয়া নগরে নগরে বিমান হইল। যে সৌধর নির্ম্মাণ করিবে, সে সেই সোনা পাইবে। কিন্তু যা কারিগর মাথা হেট করিল। দেবতায় পরীক্ষা দেবতাই জানেন, তাহারা সৌগৃহের কথা কেমন শুনে নাই। এমন সময়ে চণ্ডী আকাশ-বিমানে যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার দাসী খুল্লনাকে লোক-গঞ্জনা হইতে উদ্ধার করিবার মানসে বিশ্বকর্ম্মাকে সৌধর বিমাণ করিতে বলিলেন। বিশাই ও তাহার ছেলে হনুমান্ মানুষের আকারে আসিয়া ধনপতির চেলড়া ধরিলেন। সৌধ (সতুর) প্রকাণ্ড ঘর নির্ম্মিত হইল। খুল্লনা অভয় পদ ধ্যান করিয়া সেই ঘরে ঢুকিলে তাহাতে আগুন লাগান হইল। প্রথমে নীল ধুঁয়া আকাশে উঠিল, উত্তর পবন আসিয়া জুটিল, যোজন প্রমাণ আগুন উঠিল, আগুনের ঝলকে আঁড়ের গর্জ্জন শোনা গেল, গগনবাসী মেঘের আড়ে লুকাইল। কিন্তু সতীর অঙ্গে আগুন মৃণালশীতল, ভুঙ্গারশীতল হিম বোধ হইল।

কলিযুগে এমন কর্ম্ম কেহ করে নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। খুল্লনা জ্বলন্ত আগুন হইতে বাহির হইল, বণিকসমাজ সতীর পাপের ভয়ে তাহার পায়ে পড়িল। কেহ বলিল, আমি তোর ভাই; কেহ বলিল, আন ভাই না, চট অন্ন খাও, খেয়ে ঘরে যাই; কেহ বলিল, তুমি মানুষ নও তা আমি জানি, কিন্তু বলি কারে। খুল্লনা যাইবার আজ্ঞা পাইল, জ্ঞাতি-গোত্র কুটুম্বেরা প্রেমালিঙ্গন করিয়া তার পর কেহ দোলা, কেহ ঘোড়া, কেহ ছত্রমালা, কেহ পাটের পাছড়া, কেহ ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া গেল।

আজ কাল সতীত্ব-পরীক্ষার না হউক, চৌর্য্য-পরীক্ষার চা'ল-পড়া আছে। চোর ধরিবার নিমিত্ত নল-চালা, এবং অপহৃত ধন পাইবার নিমিত্ত হাত-চালা, বাটী-চালা ইত্যাদি নানা বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। সাঁওতালদের মধ্যে তাতে ভেলা ও আগুনপাতা লইয়া পরীক্ষা আছে। আজ কাল বাণ রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাটি একবারে লোপ পাইয়াছে, বলিতে পারা যায় না।

আজ কাল জীবন-সংগ্রাম বাড়িয়াছে; বারবেলা কালবেলা না মানিয়া লোকেরা রেল ইষ্টীমারে দূর দেশান্তরে যাত্রা করিতেছে। অগত্যা লোকের যাত্রিক জ্ঞান ক্ষীণ হইতেছে। সেকালে পথে গোসাপ, কচ্ছপ, গণ্ডার, শজারু, শল্লক দেখিলে লোকের যাত্রা ভঙ্গ হইত। মাথার উপরে ডোম-চিল ফিরিলে, পথে কাঠের বোঝা দেখিলে, টিকটিকির ডাক শুনিলে, পায়ে হুচোট খাইলে, কাপড়ে শেয়াকুল কাঁটা বিঁধিলে, শুক্‌না ডালে কাক কু কু শব্দ করিলে, যোগিনী আধখানি লাউ ভিক্ষা করিলে, তেলী তেল বেচে, তেল পড়ে, কন্যা বেড়াইলে, বামে সাপ, দক্ষিণে শিয়ালী বেড়াইলে, অমঙ্গলের আশঙ্কা হইত। এখনও যে হয় না, তা নহে। এখনও দৈবজ্ঞ পাঁজী খুলিয়া রাশিচক্র পাতিয়া যাত্রার শুভাশুভ গণনা করে। তখন তাহারা শতানন্দের গোশ্বতী ও শ্রীনিবাসের দীঘিকা দেখিয়া বালকের জন্মপাতি লিখিত। বোধ হয়, কবিকঙ্কণের সময়ে রাঢ়ে রঘুনন্দনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

সে কালের বসন ভূষণ এ কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ যত প্রকার নারী-ভূষণের নাম করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশ আজকাল আর নাই। পুরুষের হাতে তাড়বালা, কানে কড়ী বঙ্গদেশে আর নাই। বস্ত্রের ত কথাই নাই। ধুতী তখনও কেবল পুরুষের বসন হয় নাই। পার্ব্বতী ও রম্ভাবতী বিবাহের সময় হরিদ্রাযুক্ত ধুতী পরিয়াছিলেন। ধুতী মহার্ঘ ছিল। কোটালেরা লোকের নিকট উৎকোচস্বরূপ ধুতী খাইত। দরিদ্রেরা খাটী (ছোট ধুতী), এবং ছোট খুঞ্চা (বোধ হয় ক্ষৌমবস্ত্র,—তিসীর আঁশের কাপড়), ছেঁড়া কানি, মুড়া কাপড় (ধুতী কিংবা শাড়ীর ছেঁড়া অংশ) ও ধোকড়ী (মোটা কাপড়) পরিত। শীতকালে দোপাট্টা ও গাছুড়ী গায়ে দিত। খুঞ্চা (ফেঁড়ারী) পরিলে গা ঢাকা পড়িত না। এই সব দরিদ্র স্ত্রীলোকে উড়নী বা ওড়না স্বরূপে খোসলা (কোনও গাছের খোসা বা ছালের মোটা কাপড়? যেমন খুঞ্চা) ব্যবহার করিত। ধনবান্

লোকের জোড় (দুটী সুতার) কাপাস ও পাটের মোটা শাড়ী ছিল। শীতকালে তসর ও বিচিত্র পাছরী নামক রেশম বস্ত্র ও শালের জোড়া ছিল। রমণীরা তসরের ও পাটের, শাদা ও নেতের শাড়ী পরিত। আজ কাল হাওয়া শাড়ী হইয়াছে; পূর্ব্বকালে পাটের নেত ছিল। এ জন্য তাহারা দোছটী করিয়া শাড়ী পরিত, এবং নানা চিত্র-বিচিত্র বিনোদ কাঁচলী গায়ে দিত। তাহারা মেঘডম্বুর কাপড়ের (বোধ হয় যাহাকে ময়ূরকণ্ঠী বলে) ভক্ত ছিল। ধনবানেরা বাড়ীতেও জুতা পরিত, এবং পাটের দোলায় চড়িয়া এখানে ওখানে যাইত।

রাজাদের গড় ও গড়ের চৌদিকে বেউড় বাঁশের (এক জাতীয় ছোট বন কাঁটা বাঁশ) বন থাকিত। পুরীর চারি দিকে উঁচা পাঁচীর, পাঁচীরে খড়ের ছাওনী থাকিত। সাতানই বন্দে নানাবিধ আবশ্যক ঘর নির্ম্মিত হইত। অন্তঃপুরে সরোবর, সপ্তম মহলে দেবদেবীর মন্দির, পাষাণের নাচ-বাট, পাষাণের চতুঃশালা, পাকশালা। উত্তরে খিড়কী, পূর্ব্বে সিংহদ্বার। আওয়াসের পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুর দেউল, বামভাগে দুর্গামেলা, এবং সিংহদ্বারের পূর্ব্বে জলাশয়। নগর-চাতর মাঝে শিবের মন্দির, অনাথমণ্ডপ ও অন্নশালা। বাসাড়ো জনের নিমিত্ত দীর্ঘ মন্দির। এখানে প্রবাসী লোকেরা থাকিত। রাজা নগর বসাইবার নিমিত্ত বাছিয়া বাছিয়া প্রজাদিগকে ভূমি ইনাম দিতেন। নানা জাতি নগরে বাস করিয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিত। অন্য দেশ হইতে চন্দন, শঙ্খ, লবঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, নীলা, মাণিক, মতি, পলা, চামর, পামরী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য আনা হইত। বাজার সদাগর থাকিত। তাহারা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে সিংহল ও অন্যান্য দেশজাত দ্রব্য আনিত।

রাজাকে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। রাজপুত মল্ল, বান্দী, ইহারাই সৈন্য হইত। স্থানবিশেষে মুসলমান সৈন্যও থাকিত। পায়ে দৌড়াইয়া ঘোড়া, হাতী ও রথ চালাইয়া চতুরঙ্গ দলে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাল্লিশ বাজনা বাজিত। হাতীর পিঠে শূল শক্তি লাঠ লইয়া মাহুত যুদ্ধ করিত, হাতীর শুঁড়ে লোহার মুগুর বাঁধিয়া দেওয়া হইত। গাড়ীতে কামান যাইত। সৈন্যের হাতে তীর ধনুক, খাঁড়া ঢাল, ভিন্দিপাল, ভুষণ্ডি, ডাবুস, ফলা, তাক, বেলক (বন্দুক) থাকিত। এই সকল অস্ত্র শস্ত্র দেশেই নির্ম্মিত হইত।

বনী সোকেরা পাঠশালার বন্ধুদিগের সহিত পাশা খেলিত। স্ত্রীরাও পাশা খেলিতে ভালবাসিত। বারবনিতা ও যাতায়াত ছিল, কিন্তু তাহারা নগরের প্রান্তে বাস করিত। সমস্ত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে কেবল যোগেশ্বর মহেশকে সিদ্ধি খাইতে দেখি। গুলী, গাঁজা, আফিম-খোরের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এমন কি, তামাকও নাই। পান খাওয়া, পান দেওয়া অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। কাহাকেও সম্মান করিতে হইলে পাদ্য অর্ঘ্য পান, এবং কাহাকেও কোনও কাজের ভার দিতে হইলে তাহাকে পান দিয়া 'পোয়াতি' করা হইত।

কপর্দ্দকশূন্য কুটুম্ব বন্ধুজনকে খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া বাড়ীর ছেড়ী দুর্ব্বলাকে পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়া হাটে পাঠাইল। আর বলিয়া দিল যে, সে কড়িতে না আঁটিলে অমুক খেয়োর কাছে দুই চারি টাকা লইবে। দুর্ব্বলা ভদ্রলোকের শাড়ী পরিয়া লম্বাতে চওড়ায় দুহাত কোঁচা করিয়া হাতে গামছা লইয়া হাটে গেল। সঙ্গে দশ জন ভারী গেল। ঐ কড়িতে দুর্ব্বলা শাক, পাতা, মাছ, শালুক, কচ্ছপ, ঘাসী, দুধ, দই, ঘৃত, নারিকেল, ঘোল, নবাত চিনি, খাড় ভড় আটা, হাঁড়ী প্রভৃতি রন্ধনের আবশ্যক উপকরণ কিনিয়া আনিল। একটা খাসীর দাম আট কাহন, শ্রীমন্ত শশকের দাম আট পণ, এক পণ পানের দাম এক পণ, এক সের তেজের দাম দশ কড়ী, ভারীর বেতন জন প্রতি এক পণ। সেকালে গোল আলু ছিল না, মরিচের নাম লঙ্কা হয় নাই। হাটে বাস দাসীও বিকিতে পাওয়া যাইত। রাজার কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ মণ্ডল হাটে তোলা তুলিত। কোটাল ও মোড়লের দু' পয়সা বেশ রোজগার ছিল। তাই সেয়ানা লোকে মোড়লীর নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিত। শ্রীমন্ত সিংহলে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বাজনা বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিল। নাগরার ধ্বনি শুনিয়া পশুপক্ষিসহ রাজা চমকিত হইলেন। তখন 'কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘন ঘন। আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন। শুন কোটাল বেটা দেশের বিবাতা। ভাল মন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা।' কোটাল গিয়া বাজনা বাজাইবার নিমিত্ত শ্রীমন্তকে এক মকে বেশ বকাইল। তার পর উভয়ের ভাব হইল। কোটাল বলিল, 'ঘোর পিরে দায় যদি হয়, ডাকাচুরী। পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারী॥" শ্রীমন্ত ঐ কড়ি দিতে স্বীকার করিলে কোটাল শ্রীমন্তের রাজাকে সংবাদ জানাইল।

সেকালে ময়রারা চিনি, নবাত ঘাড়ু ও সন্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইত। ছানা

কচুরী ছিল না। দুর্ব্বলা হাটে কলার-মাজ কিনিয়া আন করিল। তার পর দই, গুড়, কলা তখন করিল, এবং ভাবীদিগকে ডিঙ্গা দই কিনিয়া দিল। প্রবাসে যাইবার সময়ে রাঁধিবার অসুবিধা হইলে ধনবান্ পথিক ক্ষীর, গুড়, দই, কলা ভোজন করিয়া থাকিতেন। ধনপতির জাতিকুটুম্ব ভোজনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত অন্ন রান্ধন হইয়াছিল।

১। বেগুন, কুমড়া, কলা, মোচার বেসার (বেসন) পিঠালি দিয়া এবং ঘৃতে সন্তোলিয়া হিঙ্গ জীরা মেথি দিয়া সুকুতা।

২। ফুলবড়ী দিয়া নটাশোক্ত।

৩। কাঁঠাল বিচি দিয়া চিলাড়ি মাছ।

৪। ঘি-এ ভাজা নালিতা শাক।

৫। সরিষা তেলে ভাজা বেতুয়া শাক।

৬। ফুলবড়ী ঘি-এ ভাজিয়া গুড়ের রসে ফেলা (ফুলরী)।

৭। দুধ ও গুড় দিয়া গাউন্টি, মইরী দিয়া সাঁতলানা।

৮। আমের রস দিয়া মুগের সূপ। (সেকালে কি দালমাম হয় নাই?)

৯। আদার রস ও মরিচ গুঁড়া দিয়া কই মাছ ভাজা।

১০। হিঙ্গ জীরা দিয়া যত্নে মিশ্রিত মান কলাইর সূপ।

১১। চিতল মাছের কোল (পেটী) ভাজা।

১২। রুই মাছের কোল।

১৩। মরিচ দেওয়া মানকচু।

১৪। তেলে সম্বরা বেসর দেওয়া বোয়াল মাছ ও হিঙ্গচা শাক।

১৫। রাই খাড়া ও খরসুলা মাছ ভাজা।

১৬। চিঙ্গড়ী মাছের বড়া।

১৭। আমের সঙ্গে শৌল মাছ।

১৮। তেঁতুল দিয়া পাকাল মাছ।

১৯। অন্ন জ্বালে ক্ষীর।

২০। কলা বড়া, মুগ সাউলী, ক্ষীর-পুলী প্রভৃতি পিঠা বিবিধ। (মুগ সাউলী—এক প্রকার সুরপিঠা। চাউলের আটার লেচি করিয়া ভিতরে মুগসিদ্ধ দেওয়া হয়।)

২১। সকলের শেষে ভাত।

দরিদ্রের দিন চিরকালই দুঃখে কাটে।

সেকালে দরিদ্রের সম্বল ছিল, মেটে পাথর ও বাসি পান্তা। তাহারা অন্যের ধান ভানিত, হাটে নিজের চরকা-কাটা সুতা বেচিত। ছেঁড়া কানি বা যুড়া বা খুক্সা পরিত, কুঁড়েতে থাকিত।

মুকুন্দরাম নিজে ভুক্তভোগী ছিলেন। ধনীলোকের খাওয়ালেও তিনি পাকাল মাছ দিয়া তেঁতুলের অম্বল আনিয়াছেন। পাঠশালায় পাশা খেলিয়া কাল কাটাইতে পারিলে সুখী মনে করিতেন। তাঁহার আদর্শ রাজা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা বলিতেছেন,—

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর,
কানে দিব সোনায় কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চস,
তিন সন বই দিও কর।
হাল পিছে এক ভঙ্কা, না কর কাহার শঙ্কা,
পাটায় নিশানি মোর ধর॥
মোর গ্রামে কর বাড়ি, রয়ে বস্যে দিও কড়ি,
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামি কি বাঁশগাড়ি, নানা বারে যত কড়ি,
না লইব গুজরাট বাসে॥
পার্ব্বণী পঞ্চক জাত, গুয়া লোণ সোনা তাত
ধানকাটি কমির কসুরে।
যত বেচ চালু ধান, তার না লইব দান,
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥
যত বৈসে দ্বিজবর, কার না লইব কর,
চাষী জনে বাড়ি দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণদাস, পুরাব সবার আশ,
প্রতিজনে সাধিব সম্মান।

মুকুন্দরামের নিজের অবস্থা স্মরণ করিলে তাঁহার বর্ণিত আদর্শ রাজ্যে প্রজার সুখ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার ছয় সাত পুরুষ বর্দ্ধমান জেলায় দক্ষিণে দামুন্যা গ্রামে কবিজাত শস্যে জীবন কাটাইয়া গিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের সময়ে প্রজার পাপে মামুদ সরিফ নামে কোনও ব্যক্তি দামুন্যার

ডিহিদার হইল। যেমন ডিহিদার, তেমনই উজীর। তাহারা বাকীর বৈকুণ্ঠের শত্রু হইল। জমীর কোণে কোণে দড়ী ফেলিয়া মাপিতে লাগিল, এবং তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া পনর কাঠায় বিঘা ধরিয়া কর বসাইল। প্রজার গোহারি শুনিল না, পতিত জমী উর্ব্বরা বলিয়া লিখিয়া কর আদায় করিতে লাগিল। পোদ্দার ৮/১০ আনায় টাকা ধরিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে, এবং প্রত্যহ এক পয়সা সুদ লইতে আরম্ভ করিল। ধান গরু কিনিবার লোক নাই। দামুন্যার এক জন মহাজনকে ডিহিদার বন্দী করিয়া লইয়া গেল। প্রজারা কোথাও পলাইয়া যাইতে পারিল না, তাহাদের দুয়ার জুড়িয়া পেয়াদা থানা দিতে লাগিল। কেহ কেহ ব্যাকুল হইয়া ॥৵০ আনায় টাকা হিসাবে ধান গরু বেচিতে লাগিল। ক্লেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া মুকুন্দরাম ভাই রামানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর পুরুষের বাস ত্যাগ করিলেন। পথে এক দস্যুর হাতে পড়িয়া তিনি এমন নিঃসম্বল হইলেন যে, অন্নের নিকট প্রাণের পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে হইল। মুকুন্দরাম স্ত্রী পুত্র ভাই লইয়া নানা গ্রাম ও নদী পার হইয়া চলিতে লাগিলেন। এক দিন কিছুমাত্র সম্বল ছিল না। তাঁহাকে তৈল বিনা স্নান করিতে হইল, এবং কেবল উদক পান করিয়া প্রাণ রাখিতে হইল। কিন্তু শিশুপুত্র ত বুঝে না; সুধায় কাঁদিতে লাগিল। তিনি এক পুকুর ঘাড়ায় (পাড়ে) শালুক নাড়া (কুমুদ ফুলের নাল) নৈবেদ্য দিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিলেন। ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে সেই পুকুরঘাড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই সময় চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া অভয়া-মঙ্গল-গীত রচনার আদেশ করিলেন। তার পর মুকুন্দরাম মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূমি খড়্গপুর আরড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপনীত হইলেন, কবিত্ববাণী শুনাইয়া রাজাকে সন্তোষ করিলেন। রাজা বাঁকুড়া রায় দশ আড়া ধান দিলেন, এবং তাঁহাকে পুত্র রঘুনাথ বর্ম্মের গুরু (গুরুমশায়) এবং নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করিলেন।

এখানে মুকুন্দরাম নির্ব্বিঘ্নে ছিলেন বটে, কিন্তু মামুন্যার তরে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কারণ, তিনি বুঝিতেন, 'যেই জন পরাধীন, সে জন অবশ্য দীন, সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ।'

কি দুঃখেই মুকুন্দরাম এই গান রচনা করিয়াছিলেন!

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরে ভক্তমন্দিরে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন; মহাশুভদিন; এখন বেলা প্রায় ৩টা হইবে। বিনোদ, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া আছেন। ছোট নরেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ মঙ্গলবার, ২৮শে জুলাই, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ; আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ; ঠাকুর বলরামের বাড়ীতে সকালে আসিয়াছেন ও ভক্ত সঙ্গে আহারাদি করিয়াছেন। বলরামের বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা আছে, তাই ঠাকুর বলেন, "বড় শুদ্ধ অন্ন।"

মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা বলিয়াছিলেন, ইযুক্ত নন্দলাল বসুর বাটীতে অনেক ঈশ্বরীয় ছবি আছে। আজ তাই ঠাকুর তাঁহাদের বাড়ী গিয়া অপরাহ্ণে ছবি দেখিবেন। একটি ভক্ত ব্রাহ্মণীর বাড়ী নন্দ বোসের বাটীর নিকট; সেখানেও যাইবেন। ব্রাহ্মণী কন্যা-শোকে সন্তপ্তা; প্রায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান। তিনি অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে ও আর একটি ভক্ত মহিলা গরুর মার বাটীতেও যাইতে হইবে।

ঠাকুর বলরামের বাটীতে আসিয়াই ছোকরা ভক্তদের ডাকিয়া পাঠান। ছোট নরেন মাঝে বলিয়াছিলেন, "আমার কাজ আছে বলিয়া সর্ব্বদা আসিতে পারি না, পরীক্ষার জন্য পড়া"—ইত্যাদি; ছোট নরেন আসিয়া উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন;—

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ছোট নরেনের প্রতি) তোকে ডাকতে পাঠাই নাই।

ছোট নরেন। (হাসিতে হাসিতে) তা আর কি হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বাপু তোমার অনিষ্ট হবে; অবসর হলে আসবে।

ঠাকুর যেন অভিমান করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

পাল্কী আসিয়াছে। ঠাকুর নন্দ বসুর বাটীতে যাইবেন।

ঠাকুর ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে পাল্কীতে উঠিলেন। পায়ে কামদা করিয়া করা চটি জুতা, পরণে লাল ফিতাপাড় ধুতি একখানি, উত্তরীয় নাই। জুতা জোড়াটি পাল্কীর এক পাশে মণি রাখিয়া দিলেন।

পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার যাইতে লাগিলেন। ক্রমে—পরেশ আসিয়া জুটলেন।

পাল্কী নন্দ বসুর গেটের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্রমে বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত ভূমি পার হইয়া পাল্কী বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে চটী জুতা যোড়াটি দিতে বলিলেন; পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া উপরের হল-ঘরে উপস্থিত হইলেন। অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হল-ঘর। দেব দেবীর ছবি ঘরের চতুর্দ্দিকে।

গৃহস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন। ক্রমে পাড়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভক্তেরা এই উপরের হল-ঘরে জুটিলেন। গিরিশের ভাই অতুল আসিয়াছেন। প্রসন্নর পিতা নন্দ বসুর বাটীতে সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করেন; তিনিও উপস্থিত আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীনন্দ বসুর বাটীতে আগমন।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার ছবি দেখিতে গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও আর কয়েক জন ভক্ত। গৃহস্বামীর ভ্রাতাও সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ছবিগুলি দেখাইতেছেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন; দেখিয়াই ভাবে বিভোর হইলেন। দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় ছবি, শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তবৎসল মূর্ত্তি।

শ্রীরাম হনুমানের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। হনুমানের দৃষ্টি শ্রীরামের পাদপদ্মে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবি দেখিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "আহা! আহা!"

তৃতীয় ছবি, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদম্বতলায় দাঁড়াইয়া আছেন।

চতুর্থ রামায়ণের ছবি। ছাতি মাথায় দিয়া বলির যজ্ঞে গমন করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—বামন! এবং এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।

এইবার নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঠাকুর গোষ্ঠের ছবি দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সহিত বৎসগণ চরাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন। মণি বলিয়া উঠিলেন,—চমৎকার ছবি!

সপ্তম ছবি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,—"ধূমাবতী!" অষ্টম, ষোড়শী; নবম, ভুবনেশ্বরী; দশম, তারা; ১১শ কালী। এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,—

"এ সব উগ্রমূর্ত্তি! এ সব মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌তে নাই। এ মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্‌লে পূজা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে, আপনারা রেখেছেন।"

ঠাকুর অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ভাবে বলিতেছেন,—"বা! বা!"

তার পর রাই রাজা। নিকুঞ্জবনে সখীপরিবৃতা হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বসিয়া আছেন।

তার পর দোলের ছবি। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মূর্ত্তি দেখিতেছেন। গ্লাস্‌কেসের ভিতর বীণাপাণির মূর্ত্তি; দেবী বীণাহস্তে মাতোয়ারা হইয়া রাগ রাগিণী আলাপ করিতেছেন।

ছবি দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন,—"আজ খুব আনন্দ হ'ল। বা! আপনি ত খুব হিন্দু! ইংরাজী ছবি না রেখে যে এই সব ছবি রেখেছেন—খুব আশ্চর্য্য!"

নন্দ বসু বসিয়া আছেন। তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—"বসুন!—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ। (উপবিষ্ট হইয়া) এ পট-গুলো খুব বড় বড়। তুমি বেশ হিন্দু।

নন্দ বসু। ইংরাজী ছবিও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) সে সব অমন্ নয়। ইংরাজির দিকে তোমার তেমন নজর নাই।

ঘরের দেওয়ালের উপর কেশব সেনের নববিধানের ছবি টাঙ্গান ছিল। সুরেশ মিত্র ঐ ছবি করাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের এক জন প্রিয় ভক্ত। ঐ ছবিতে পরমহংস দেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, সব ধর্ম্মাবলম্বীরা ভিন্ন পথ দিয়া ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন। গন্তব্য স্থান এক, শুধু পথ আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও যে সুরেন্দ্রের পট!

প্রসন্নের পিতা। (সহাস্যে) আপনিও ওর ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) ওই এক রকম; ওর ভিতর সবই আছে।—ঈষানীং ভাব।

এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ঠাকুর ভাবে বিভোর হইতেছেন। তাঁহার জগন্মাতার গৃহে কথা কহিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আতালের ন্যায় বলিতেছেন,—"আমি বহুঁস হই নাই। বাড়ীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, বড় বাড়ী! এতে কি আছে? ইঁট, কাঠ, মাটী।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,—"ঈশ্বরীর মূর্ত্তি সরল দেখে বড় আনন্দ হ'ল।"

আবার বলিতেছেন,—"উগ্রমূর্ত্তি, কালী, তারা, (শব শিবা মধ্যে শ্মশান-বাসিনী) রাখা ভাল নয়; রাখ্‌লে পূজা দিতে হয়।"

গৃহস্বামীর ভ্রাতা। (সহাস্যে) তা তিনি যত দিন চালাইবেন, তত দিন চল্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বটে; কিন্তু ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল; তাঁকে ভুলে থাকা ভাল নয়।

নন্দ বসু। তাঁতে মতি কই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর কৃপা হ'লে হয়।

নন্দ বসু। তাঁর কৃপা কই হয়? তাঁর কি কৃপা কর্‌বার শক্তি আছে?

['ঈশ্বর কর্ত্তা', না 'কর্ম্মই ঈশ্বর?']

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) বুঝেচি তোমার পণ্ডিতদের মত; যে যেমন কর্ম্ম কর্‌বে, সে সেরূপ ফল পাবে; ও গুলো ছেড়ে দাও! ঈশ্বরের শরণাগত হ'লে কর্ম্ম ক্ষয় হয়। আমি মার কাছে ফুল হাতে করে বলেছিলাম,—মা! এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য; আমি কিছুই চাই না। তুমি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ; আমি ভাল মন্দ কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা, ভক্তি দাও।

নন্দ বসু। আইন তিনি ছাড়াতে পারেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন; তিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদলাতে পারেন।

[চৈতন্যলাভ ভোগান্তে, না তাঁর কৃপায়?]

তবে তুমি ও কথা বলতে পার। তোমার না কি ভোগ করবার ইচ্ছা আছে, তাই তুমি অমন্ কথা বলছ। ও এক মত আছে বটে, ভোগ শান্তি না হলে চৈতন্য হয় না। তবে ভোগই বা কি করবে? কামিনী কাঞ্চনের সুখ,—এই আছে, এই নাই; ক্ষণিক। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর আছে কি? আমড়া, আঁঠী ও চামড়া; খেলে অম্বশূল হয়। সন্তোষ, যাই গিলে ফেলে, আর নাই।

[ঈশ্বর কি পক্ষপাতী?]

নন্দ বসু একটু চুপ করিয়া আছেন; তার পর বলিতেছেন,—ও সব ত শুনে বটে! ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? তাঁর কৃপাতে যদি হয়, তাহা হলে বলতে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই নিজেই সব;—ঈশ্বর নিজেই জীব জগৎ সব হয়েছেন। যখন পূর্ণজ্ঞান হবে, তখন ঐ বোধ। তিনি মন বুদ্ধি দেহ,—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর করবেন?

নন্দ। তিনি নানা রূপ কেন হয়েছেন? কোনখানে জ্ঞান, কোনখানে অজ্ঞান?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর খুসী।

অদুরে। কেদার বাবু (চাটুর্জ্জে) বেশ বলেছেন। এক জন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বর সৃষ্টি কেন করলেন? তাতে কেদার বাবু বলেছিলেন যে, যে মিটিং-এ তিনি সৃষ্টির মতলব করেছিলেন, সে মিটিং-এ আমি ছিলাম না!

[অবিদ্যা কেন? তাঁর খুসী।]

(সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর খুসী।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতে লাগিলেন:

গান।

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি!
পলে বধ কর কত্তী, পলকে লক্ষ্যও গিরি।
কারে দাও মা! ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমন চলি॥

তিনি আনন্দময়ী। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা কর্‌ছেন। অসংখ্য জীব, তার মধ্যে দুই একটি মুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে;—তাতেও আনন্দ—

ঘুড়ির লক্ষ্যের দুই একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি,
কেউ সংসারে বদ্ধ হচ্ছে, কেউ মুক্ত হচ্ছে,
(ভব সিন্ধু মাঝে মন উঠ্‌ছে ডুব্‌ছে কত তরী)

নন্দ বসু। তাঁর খুসী! আমরা যে মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা কোথায়? তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে জান্‌তে পাচ্চ, ততক্ষণ আমি আমি কর্‌চ।

সকলে তাঁকে জান্‌তে পার্‌বে,—সকলেই উদ্ধার হবে; তবে কেহ সন্ধ্যা সকাল থেতে পার, কেহ দুপুর বেলা, কেউ-বা সন্ধ্যার সময়, কিন্তু কেহ অভুক্ত থাক্‌বে না। সকলেই আপনার স্বরূপকে জান্‌তে পার্‌বে।

গৃহস্বামীর ভাই বলিতেছেন,—আজ্ঞা হাঁ, তিনিই সব হয়েছেন বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি, এটা খোঁজো দেখি। আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভুঁড়ি? আমি খুঁজতে খুঁজ্‌তে 'তুমি' এসে পড়ে; অর্থাৎ, অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই! 'আমি' নাই—তিনি।

[ঐশ্বর্য্য ও অহংকার।]

(নন্দ বসুর প্রতি) তোমার অভিমান নাই! এত ঐশ্বর্য্য। 'আমি' এক বারে ত্যাগ হয় না; তাই যদি যাবে না, তবে থাক শালা ঈশ্বরের দাস হয়ে। (সকলের হাস্য) ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস, এ অভিমান ভাল।

যে 'আমি' কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়, সেই 'আমি' 'বাচা' আমি, সে 'আমি' ত্যাগ করতে হয়।

অহংকারের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া গৃহস্বামী ও অন্যান্য সকলে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ, ১ম অভিমান থাকবে না; দ্বিতীয়, শান্ত স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে। অতএব তোমার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে।

[ঐশ্বর্য্য ও মত্ততা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেশী ঐশ্বর্য্য হলে, ঈশ্বরকে ভুল হয়ে যায়; ঐশ্বর্য্যের স্বভাবই ঐ।

"যদু মল্লিকের বেশী ঐশ্বর্য্য হয়েছে; সে আজ কাল ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে আগে বেশ ঈশ্বরের কথা কইত।

"কামিনীকাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া জ্যাঠা বোধ থাকে না; তা'দেরই ব'লে ফেলে, তোর গুষ্টির—; মাতালের গুরু লঘু বোধ থাকে না।

নন্দ বসু। তা বটে।

[THEOSOPHY.]

ভ্রাতা। মহাশয়! এগুলা কি সত্য—Spiritualism, Theosophy?

সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক? নক্ষত্রলোক?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জানি না বাপু! অত হিসাব কেন?

"আম খাও: কত আম গাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটী পাতা, এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।

চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জান্‌তে পারে, তা হ'লে ও সব হাবজা গোবজা বিষয় জান্‌তে ইচ্ছাও হয় না। বিকার থাকলে কত কি বকে;—'আমি ৫ সের চালের ভাত খাবো রে!'—'আমি এক জালা জল খাবো রে!' বৈদ্য বলে, খাবি? আচ্ছা খাবি।—এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকারে যা বল্‌বে তাই শুনতে হয়।"

ভ্রাতা। আমাদের বিকার চিরকাল বুঝি থাকবে?

[ক্ষণকাল যোগ ও মুক্তি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, ঈশ্বরেতে মন রাখো,—চৈতন্য হবে।

ভ্রাতা। (সহাস্যে) আমাদের ঈশ্বরের যোগও ক্ষণিক। তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হোক; ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হলেই মুক্তি।

অহল্যা বলে,—রাম! শূকরযোনিতেই জন্ম হউক, আর যেখানেই হউক, যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে। যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

নারদ বলে,—রাম! তোমার কাছে আর কোনও বর চাই না, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, এই আশীর্ব্বাদ করো।

আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তাঁ'তে মন হয়,—ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

[পাপ ও পরলোক।]

'আমাদের কি বিকার যাবে'!—'আমাদের কি আর হবে'—'আমরা পাপী'—এ সব বুদ্ধি ত্যাগ করো।

(নন্দ বসুর প্রতি) আর এই চাই—'এক বার রাম বলেছি, আমার আবার পাপ!

নন্দ বসু। পরলোক কি আছে? পাপের শাস্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি আম খাও না! তোমার ও সব হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কি না—তা'তে কি হয়—এ সব খবর। আম খাও। 'আম' প্রয়োজন;—তাঁ'তে ভক্তি—

নন্দ বসু। আম গাছ কোথা? আম পাই কোথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। গাছ! তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম। তিনি আছেনই,—তিনি নিত্য!

তবে একটি কথা আছে,—তিনি 'কল্পতরু'—

"কালী কল্পতরু মূলে রে
চারি ফল কুড়ায়ে পাবি!"

কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়,—

তবে ফল তরুমূলে পড়ে—তখন কুড়িয়ে খাওয়া যায়। চারি ফল,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

জ্ঞানীরা মুক্তি (মোক্ষফল) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়—অহেতুকী ভক্তি। তা'কে ধর্ম, অর্থ, কাম চায় না।

পরলোকের কথা যোল্‌চ। গীতার মত,—মৃত্যুকালে যা ভাবিবে, তাই হবে। ভরত রাজা 'হারিণ' হরিণ' করে শেষে প্রাণ ত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হ'ল। তাই ত জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাত দিন অভ্যাস করতে হয়;—তা' হলে মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা আসে,—অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়।

কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকেও বল্লুম, 'এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার?' তার পর আবার বল্লুম, 'যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়; ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয়, তা হ'লে তইরি লাল হাঁড়িগুলা ফেলে দেয়, কাঁচাগুলা কিন্তু আবার নিয়ে কাদা মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থের মঙ্গলকামনা।]

এ পর্য্যন্ত গৃহস্বামী ঠাকুরকে মিষ্টমুখ করাইবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন,—

"কিছু খেতে হয়। বড়র মাকে তাই সেই দিন বল্লুন,—ওগো কিছু (খেতে) দাও। তা না হ'লে পাছে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

গৃহস্বামী কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর খাইতেছেন। মাষ্টার বসু ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন: দেখিতেছেন তিনি কি কি করেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও রজোগুণ।]

ঠাকুর হাত ধুইবেন, চাদরের উপর রেকাবি করিয়া মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছিল; সেখানে হাত ধোওয়া হইবে না। হাত ধুইবার জন্য এক জন ভৃত্য পিকদানি আনিয়া উপস্থিত করিল।

পিতৃব্যনি-বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর। ঠাকুর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নিমে যাও, নিয়ে যাও।"

গৃহস্বামী বলিলেন, 'হাত ধুন।'

ঠাকুর অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। বলিলেন, 'কি?—হাত ধোবো?'

ঠাকুর দক্ষিণে বারাণ্ডার দিকে উঠিয়া গেলেন। মণিকে আজ্ঞা করিলেন, 'আমার হাতে জল দাও।' মণি ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিলেন।

ঠাকুর নিজের কাপড়ে হাত পুঁছিয়া আবার বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

ভদ্রলোকদের জন্য রেকাবি করিয়া পান আনা হইয়াছিল, সেই রেকাবির পান ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়া হইল, তিনি সে পান গ্রহণ করিলেন না।

[ইষ্টদেবতাকে নিবেদন।]

নন্দ বসু। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) একটা কথা বলব?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কি?

নন্দ বসু। পান খেলেন না কেন? সব ঠিক্ হ'ল; খ্রীষ্ট অমায় হ'য়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইষ্টকে দিয়ে খাই;—ঐ একটা ভাব আছে।

নন্দ বসু। ও ত ইষ্টতেই পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান-পথ একটা আছে; আর ভক্তি-পথ একটা আছে। জ্ঞানীর মতে সব জিনিস-ই ব্রহ্মজ্ঞান করে নেওয়া যায়। ভক্তি-পথে একটু ভেদবুদ্ধি হয়।

নন্দ বসু। ওটা দোষ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) ও আমার একটা ভাব আছে। তুমি যা বলছ ও ঠিক বটে,—ও ও আছে।

ঠাকুর গৃহস্বামীকে মোসাহেব হইতে সাবধান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর একটা সাবধান! মোসাহেবরা নিজের স্বার্থের জন্য বেড়ায়।

(প্রসন্নের পিতার প্রতি) আপনার কি এখানে থাকা হয়?

প্রকাশের পিতা।—আজ্ঞে না, এই পাড়াতেই থাকা হয়। আমাকে ইচ্ছা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (অতি বিনীতভাবে) না থাক, আপনি যান,—আমার এখন ইচ্ছা নাই।

ঠাকুর নন্দ বসুর বাড়ীটি খুব বড়, তাই বলিতেছেন,—

"বসুর বাড়ী এত বড় নয়;—তাই তা'কে সে দিন বলাম।"

নন্দ বসু। হাঁ তিনি (যোড়াসাঁকোতে) নূতন বাড়ী করিয়াছেন।

ঠাকুর নন্দ বসুকে উৎসাহ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নন্দ বসুর প্রতি) তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে এত মন রেখেছ, এ কি কম কথা?

[জ্ঞানভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি।]

যে সংসারত্যাগী, সে ত ঈশ্বরকে ডাক্‌বেই। তা'তে আর বাহাদুরী কি? সংসারে থেকে যে ডাকে, সেই ধন্য। সে ব্যক্তি সিংহ মশা পালায় সরিয়ে তবে দেখে।

একটী ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাক্‌তে হয়। হনুমানের জ্ঞানভক্তি, নারদের শুদ্ধাভক্তি।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হনুমান! তুমি আমাকে কি ভাবে অর্চনা কর? হনুমান বলিলেন, 'কখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখন দেখি তুমি প্রভু, আমি দাস; আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি,—আমিই তুমি!'

রাম নারদকে বলিলেন, 'তুমি বর লও'। নারদ বলিলেন, 'রাম! এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।'

ঐবার ঠাকুর গাত্রোত্থান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নন্দ বসুর প্রতি) ঈশ্বর সত্য,—অনেকে যা'কে গায় মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। তোমাতে ঈশ্বরের শক্তি খুব আছে।

নন্দ বসু। শক্তি সকলে মানুষেই মানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিনত হইয়া) ঐ এক তোমাদের কথা;—সকল লোকের শক্তি কি সমান হতে পারে? বিভূরূপে তিনি সর্বভূতে এসে রয়েছেন বটে, কিন্তু শক্তিবিশেষ।

বিদ্যাসাগরকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন,—তিনি কি কখনও কোন শক্তি কাহাকে কম শক্তি দিয়েছেন?' তখন আমি বলিলাম,—যদি শক্তি ভিন্ন না হয়, তা হলে তোমাকে আমরা কেন দেখিতে এসেছি? তোমার আমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে?

ঈশ্বরের গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। গৃহস্বামীর মাতাও সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যালোক করিয়া বাটীর দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিলেন।*

চন্দ্রশেখর-চরিত্র।

—:০:—

পৌরাণিক যুগে ব্যাস ও বাল্মীকি প্রমুখ ঋষিগণ যেমন অপূর্ব্ব আদর্শ-চরিত্র-রত্নমালার সৃষ্টি করিয়া সমাজের কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তিনি সমাজের সম্মুখে নব নব আদর্শ ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল আদর্শ চিত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ বর্ণের সংমিশ্রণে লিখিত হওয়ায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয় সমাজের সমধিক উপযোগী হইয়াছে। পাতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রাচীন আদর্শ-স্থল সীতা ও সাবিত্রী, পিতৃ ভক্তির আদর্শ-স্থল রামচন্দ্র, ভ্রাতৃ-প্রেমের আদর্শ-স্থল লক্ষ্মণ, শৌর্য্য ও বীর্য্যের আদর্শ-স্থল অর্জ্জুন ও ভীম প্রভৃতি, সত্যব্রত পালনের আদর্শ-স্থল দেবব্রত ভীষ্ম, এবং দাস-ভাবের আদর্শ-স্থল হনুমান। প্রাচীন যুগের এইরূপ আরও নানা আদর্শের উল্লেখ করিতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল আদর্শ-চরিত্রের কার্য্যকারিতা কাল ও পাত্রভেদে অল্পাধিকের খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। এই সকল আদর্শের মূল সমাজমধ্যে চির দিন অক্ষুণ্ণ থাকিলে সমাজের যে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান অবস্থাধীনে, সমাজের সম্যক পরিপুষ্টিসাধনের জন্য যে নব নব আদর্শের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাবলী হইতে সমাজের এ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ়

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ: ৩৭৪ পৃষ্ঠা।

বিশ্বাস। তিনি পিতৃ-ভক্তির আদর্শ ব্রজেশ্বরে অঙ্কিত করিয়াছেন, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত আদর্শ,—সূর্য্যমুখী, মৃণালিনী, শান্তি ও প্রফুল্ল প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বীর-ধর্ম্মের আদর্শ প্রতাপে ও স্বদেশ-প্রেমিকতার আদর্শ সত্যানন্দে অঙ্কিত করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরে বঙ্কিম-চন্দ্র আদর্শ মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখাইয়াছেন। মনুষ্যত্বের দিক হইতে, বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত কোনও চরিত্রই চন্দ্রশেখরের সমতুল্য নহে। এই অশেষশাস্ত্র-বিৎ পরহিতব্রত-রত মহানুভব চন্দ্রশেখরের চরিত্র-আলোচনায় আজ আমরা প্রবৃত্ত হইব।

এই শোক-জরা-পূর্ণ নশ্বর জগৎ হইতে যদি অনন্ত আনন্দময় চিরযৌবন-সম্পন্ন অবিনশ্বর জগৎ পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া বিভিন্নশ্রেণী-বিভক্ত মনুষ্যকে উপযুক্ত সোপানপরম্পরায় অবস্থিত করান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, কঠোর তপস্যারত সংযমশীল আর্য্য ঋষিগণ অপেক্ষা চন্দ্রশেখর স্থান নিম্নে নহে। হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ-ক্ষেত্রের নাম শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিলে চিত্তের যে বিশুদ্ধি ও পরিতৃপ্তি সাধন হয়, চন্দ্রশেখরের নাম শ্রবণ করিলেও চিত্তের তদনুরূপ বিশুদ্ধি ও পরিতৃপ্তি ঘটিয়া থাকে। বঙ্কিম বাবুর অমর লেখনী এতই উচ্চ ভাবে এই পবিত্র চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছে যে, পার্শ্বে ধবলগিরি অথবা কাঞ্চনজঙ্ঘার চিত্র অঙ্কিত করিলেও মনে হইবে, প্রথমোক্ত শেষোক্ত হইতে উচ্চতর। মানসপটে ধবলগিরির শুভ্র শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তুষার-শুভ্র পর্ব্বত-চূড়া গগন-স্পর্শী সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত। চন্দ্রশেখরের হৃদয়ও তেমনই অনন্ত কাল ধরিয়া তুষার-শুভ্র, জ্ঞান-কিরণে সেই শুভ্রতা সমধিক উজ্জ্বল।

বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত প্রণয়-রাজ্যে রমণী-মধ্যে মৃণালিনীর যে স্থান, পুরুষমধ্যে চন্দ্রশেখরেরও সেই স্থান বলা যাইতে পারে। অভিমানশূন্যতা, অর্থাৎ প্রেমাস্পদের প্রতি ক্রোধশূন্যতা আদর্শ প্রেমের একটি লক্ষণ। এ লক্ষণ মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখর উভয়েরই প্রণয়ে চির-বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত অন্য রমণী-চরিত্রে এ লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও, মৃণালিনী-চরিত্রেই ইহার সার্ব্বাঙ্গীন বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যত দূর স্মরণ হয়, তাঁহার রচিত অন্য পুরুষ-চরিত্রে এ লক্ষণ বর্ত্তমান নাই। গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, সীতারাম, অরুকুমার, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই দুরন্ত অভিমানের বশবর্ত্তী। এই দুরন্ত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রত্যেককেই প্রাণান্তকর কঠোর যন্ত্রণা ভোগ

করিতে হইয়াছিল। নিরভিমানিনী রমণীর দৃষ্টান্ত অন্য সমাজে বিরল হইলেও হিন্দুসমাজে বিরল নহে; কিন্তু অভিমানশূন্য পুরুষের দৃষ্টান্ত হিন্দুসমাজে নিতান্ত বিরল। এই কারণে, আশা করি, মৃণালিনীর চরিত্র অপেক্ষা চন্দ্রশেখরের চরিত্রের আদর্শেই সমাজের অধিক উপকার সাধিত হইবে।

প্রণয়ের বিভিন্ন স্তর বিভাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তরে চন্দ্রশেখরকে স্থাপন করিয়াছেন। এই স্তরদেশ স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত। প্রণয়ের নিম্নতন স্তরে 'বিষবৃক্ষে'র দেবেন্দ্রনাথ অবস্থিত। এই স্তরদেশ অনন্ত তমসাচ্ছন্ন। অসহ্য নরক-যন্ত্রণা এই স্তরদেশে অনুভূত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, হেমচন্দ্র ও পশুপতি প্রভৃতির প্রেমের স্তরবিন্যাসের এ স্থল নহে।

মনুষ্য-হৃদয় কত দূর উদার ও উন্নত হইতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য বঙ্কিম বাবু চন্দ্রশেখর-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সংসারের কুটিলতা এতটুকুমাত্র চন্দ্রশেখর-চরিত্র কলঙ্কিত করে নাই। প্রত্যুত, চন্দ্রশেখরকে সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু তাঁহাকে সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বলিলে, কেহ তাঁহার জীবনের সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। তিনি সংসারে জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি সূর্য্য তুল্য বিরাজ করিতে জানিতেন, মনুষ্য-কীটের সহিত পঙ্কিল পূতিগন্ধময় কর্দ্দমে তিনি নিমজ্জিত থাকিতে জানিতেন না,—সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে। মনুষ্যমধ্যে দেবতা তুল্য তিনি বিরাজ করিতে জানিতেন। মনুষ্যমধ্যে যে সহস্র সহস্র প্রভু বিরাজ করিতেছে, সে শ্রেণী হইতে তিনি অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেন। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া জগতে তিনি কোলাহল করিতে জানিতেন না। গভীর চিন্তারাজ্যে আড়ম্বরশূন্য জীবনযাপনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু পাপিষ্ঠা শৈবলিনী এ রত্ন চিনিতে পারে নাই। প্রজ্বলিত বহ্নিদৃষ্টে পতঙ্গ যেমন মুগ্ধ হয়, শৈবলিনী প্রতাপের রূপে তেমনই মুগ্ধ হইয়াছিল। মুগ্ধ হইলেও, শৈবলিনী ঘোর স্বার্থপর রমণী; প্রতাপ স্বার্থত্যাগের জলন্ত প্রতিমা; চন্দ্রশেখর দূরে থাক্, শৈবলিনী প্রতাপেরও যোগ্যা ছিল না। এইরূপ পাপিষ্ঠার সহিত চন্দ্রশেখর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; লেখক এই সূত্রে চন্দ্রশেখরের মহত্ত্বের পরিচয় দিবার সুন্দর অবসর পাইয়াছেন। পাপের সঙ্গে পুণ্যের স্পর্শে এক দিকে পাপ যেমন প্রকট

হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই অপর দিকে পুণ্যের আলোক সমধিক জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রশেখরের প্রথম দ্বাত্রিংশ বৎসরের জীবনেতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—'দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সেও তিনি গৃহস্থ অথচ সংসারী নহেন।' অর্থাৎ, এত অধিক বয়সেও তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। জ্ঞানার্জ্জনে বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কায় তিনি দারপরিগ্রহে নিরুৎসাহ ছিলেন, এ কথাও গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের এই জ্ঞান-পিপাসা প্রাচীন শাস্ত্রবর্ণিত বরতন্তু-শিষ্য কৌৎসের জ্ঞান-পিপাসার সমতুল। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যও অতুলনীয়। সে ব্রহ্মচর্য্য সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে যে প্রচুর ছিল না, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়; বর্ত্তমান যুগের কথা স্বতন্ত্র।

বোধ হয়, শৈশবেই চন্দ্রশেখরের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, এবং জননী তাঁহাকে তাঁহার স্নেহ মমতায় পালন করিয়াছিলেন। পিতা মাতা উভয়ের যত্নে পালিত সন্তানের পক্ষে চন্দ্রশেখরের ন্যায় গম্ভীরাত্মা হইবার সম্ভাবনা অল্প বলিয়াই আমরা মনে করি। নিতান্ত স্বাধীনভাবেই এ বনস্পতি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; যত্ন-বর্দ্ধিত ক্ষুদ্র উদ্যানবৃক্ষ ইহার সমতুল হইতে পারে না। বনান্তরবর্ত্তী তড়াগেই পদ্ম বিকশিত হয়; গোলাপের জন্যই উদ্যান-স্বামীর যত্ন আবশ্যক।

সে যাহা হউক, সম্প্রতি মাতৃবিয়োগবশতঃ চন্দ্রশেখরের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল কার্য্যে বিশৃঙ্খলা আসিয়া জুটিল। শুধু কার্য্যে নহে, চন্দ্রশেখরের অন্তরমধ্যেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই অন্তরমধ্যে বিশৃঙ্খলার কথা লেখক কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় কোথাও উল্লেখ করেন নাই; কুশলী লেখক কৌশলে সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার লেখনী-মুখাগ্রে ছদ্মবেশে সে কথা নির্গত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের মাতৃবিয়োগের পর যখন গ্রন্থরাশি ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর দ্বিতীয় অবলম্বন রহিল না, তখন তাঁহার চিত্ত ঈষৎ উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় তাঁহার পুস্তকাদি হারাইয়া যাইত, খুঁজিয়া পাইতেন না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখিতেন, কাহাকে দিতেন, মনে থাকিত না। এ উদ্ভ্রান্ত ভাব কেন? এ উদ্ভ্রান্ত ভাব চন্দ্রশেখরের হৃদয়ের প্রেম-বিকাশের সঙ্কেতমাত্র। তাঁহার অন্তরমধ্যস্থিত বিশৃঙ্খলাভাবের লক্ষণমাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র, এই স্থলে অসাধারণ নিপুণতার সহিত ব্রহ্মচারীর হৃদয়মধ্যে

শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রণয়ের পরিচয়, উল্লিখিত পরিচ্ছেদে অতি সুন্দরভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। সত্য বলিতে কি, এই পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখরের হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন একত্রে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই পরিচ্ছেদেই তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে শৈবলিনীর সুপ্ত সৌন্দর্য্যসুধারাশি পান করিতে করিতে চন্দ্রশেখরের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইত, যাহাকে তিনি অপ্রত্যাশিত কালে নয়নগোচর করিলে 'অনময়ের বিদ্যুৎ' বলিয়া রহস্য করিতেন, সেই শৈবলিনীর বিরহে তাঁহার হৃদয় দারুণ-ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; সহসা স্থির সমুদ্রমধ্যে যেন বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। পত্নীর প্রতি স্বীয় চিত্তভাবকে চন্দ্রশেখরের ন্যায় মহাজ্ঞানী ব্যক্তি মোহ ভিন্ন অন্য কি আখ্যা দিতে পারেন? বিনয়-কাতর চন্দ্রশেখর সেই মোহ লক্ষ্য করিয়া বিক্ষুব্ধহৃদয়ে কহিলেন, "যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।" এই উক্তির পর চন্দ্রশেখরের গভীর ও অকৃত্রিম প্রণয় সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কবি কিন্তু এ স্থলে নিরস্ত হইলেন না; তিনি আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া চন্দ্রশেখরের প্রণয়-চিত্র সুন্দরতররূপে অঙ্কিত করিলেন। সেই চিত্র আঁকিতে গিয়া একদিকে চন্দ্রশেখরের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, অপর দিকে তাঁহার হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই দৌর্ব্বল্যপ্রকাশেই চন্দ্রশেখরকে যেন আমরা সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হই। আজ চন্দ্রশেখরের গৃহ শূন্য; তিনি দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন; ঘন মেঘ উষার রক্তিম গগন যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে। শৈবলিনী-পরিত্যক্ত গৃহে তিলার্দ্ধকালযাপনও চন্দ্রশেখরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। যে চন্দ্রশেখর বলিয়াছিলেন, "এই ক্লেশ-সঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আমিয়া রমণীর মুখপদ্ম কি জীবনের সারভূত করিব?" তিনি "সায়াহ্নকালে আপনার অধীত অধ্যয়নীয় শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সমস্ত একে একে আনিয়া একত্র করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন, * * * সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

"অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ক্রমে ক্রমে সকলই জ্বলিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ একে একে সকলই অগ্নি

হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহু যত্নে সংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।"

এক্ষণে সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে,—চন্দ্রশেখর এই গ্রন্থরাশি ভস্ম করিলেন কেন? পত্নীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া চন্দ্রশেখর গ্রন্থরাশির প্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি কি গ্রন্থরাশি ভস্ম করিলেন? নগেন্দ্রনাথ যেমন সূর্য্যমুখীর জন্য কুন্দের চিতা সাজাইয়া স্বহস্তে তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখরও শৈবলিনীর জন্য কি সেইরূপ তাঁহার গ্রন্থরাশির চিতা সাজাইয়া স্বহস্তে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন? কুন্দের জন্য সূর্য্যমুখীকে হারাইয়াছিলেন বলিয়া নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ত্যাগ করিয়াছিলেন; গ্রন্থরাশির জন্য শৈবলিনীকে হারাইয়াছেন, এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখর কি গ্রন্থরাশিকে ত্যাগ করিলেন? না, তাহা নহে। গ্রন্থ-ভস্মের এরূপ অর্থ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। শৈবলিনী স্বেচ্ছায় যে বেদগ্রাম ও স্বামী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, চন্দ্রশেখর সে কথা তখনও জানিতে পারেন নাই। তিনি জানেন, তস্করে তাঁহার প্রেমোদ্যানের কুসুমটিকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনীর গৃহত্যাগের সহিত তাঁহার গ্রন্থরাশির প্রতি অত্যধিক অনুরাগের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, এ ভাব চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে উদিত হইবার অবসর সুদূরপরাহত।

তবে এই গ্রন্থ-ভস্মের প্রকৃত অর্থ কি? অর্থ এই, যখন শৈবলিনী নাই, তখন অরণ্যতুল্য সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হউক। যখন তস্করে উদ্যানের শোভাবর্দ্ধনকারী একমাত্র পুষ্পটি অপহরণ করিল, তখন উদ্যানের সকল বৃক্ষ লতা উপাড়িয়া ফেল, উদ্যানের বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেল, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দাও। দৃঢ়-চিত্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির হৃদয়ে এ ভাব কিন্তু অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না; তাই চন্দ্রশেখর আবার সংসারী হইয়াছিলেন। পরে আমরা সে কথার আলোচনা করিব।

এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। যখন কোনও কারণাধীনে অন্তরমধ্যে তীব্র কষ্ট অনুভূত হয়, তখন যে কোনও প্রকারেই হউক, সেই অন্তরনিহিত কষ্টের বহির্বিকাশ ঘটিয়াই থাকে। আমরা চন্দ্রশেখরের 'শোণিত-তুল্য প্রিয়' গ্রন্থরাশির অগ্নিসৎকার কার্য্য, তাঁহার তীব্র মনঃকষ্টের বিকাশস্বরূপ মনে করি। প্রিয়তমার বিরহ-হেতু চন্দ্রশেখরের চিত্ত-মধ্যে

যে অনল জ্বলিতেছিল, এই গ্রন্থ-প্রজ্বালিত অনল তাহার প্রতিনিধিমাত্র। এই অনল-শিখায় চন্দ্রশেখরের প্রেম লিখিত হইয়াছে। মনুষ্য-হৃদয়ের প্রেম এরূপ জলন্তভাবে আর কোথাও লিখিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

কেহ বলিতে পারেন, শৈবলিনীর বিরহে চন্দ্রশেখরের চিত্ত যে সহসা এতটা উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মচারীর পক্ষে তাহা নিতান্ত অশোভন; মনুষ্যত্বের হিসাবেও তাহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা কিন্তু এ কথার প্রতিবাদ করি। রামচন্দ্র সীতাহারা হইয়া অরণ্যের বৃক্ষলতা ও পশু পক্ষীর নিকট সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের ন্যায় দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি, যিনি লোকরঞ্জনার্থ প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অনায়াসে বনবাসে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তিনিও পত্নী-বিরহে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কাতর হইয়াছিলেন; চন্দ্রশেখরও সেইরূপ কাতর হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের চরিত্র মলিন হয় নাই, বরং মহিমান্বিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের জীবন-নাটককে দুই অঙ্কে বিভক্ত করিলে, উল্লিখিত গ্রন্থ-রাশির ভস্মাবশেষকেই সেই অঙ্কদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যবনিকা-স্বরূপ মনে করিতে পারা যায়। সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না বলিয়া তিনি যে সংকল্প করিয়াছিলেন, সে সংকল্প তাঁহার গ্রন্থরাশির সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হইল; তাঁহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্যও আরব্ধ হইল; তাঁহার মনুষ্য-জীবন চরম সার্থকতা-লাভের পথে সদ্যঃ অবতীর্ণ হইল। অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইলেই যে মনুষ্য-জীবনের সফলতা সাধিত হয় না, চন্দ্রশেখরের জীবনের প্রথমাংশ হইতে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। সংসার-ক্ষেত্রে শাস্ত্রলব্ধ পাণ্ডিত্যের প্রয়োগেই যে জীবনের সার্থকতা ও শাস্ত্রালোচনার সার্থকতা সূচিত হয়, ইহাই চন্দ্রশেখরের জীবনের দ্বিতীয় অংশের মূল মর্ম্ম। মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা-সাধনের উপায়-উদ্ভাবনই সকল শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য; সেই চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যত দিন চন্দ্রশেখর কেবলমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন, তত দিন তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যর্থ হইয়াছিল। অবশেষে যে দিন তিনি সকল শাস্ত্রগ্রন্থের অগ্নিসংস্কার করিয়া ক্ষুদ্র বেদগ্রাম হইতে বাঙ্গলা দেশের সুবিশাল প্রাঙ্গণে পরোপকার-ব্রত-রত ব্রহ্মচারীর বেশে প্রকৃত সংসারী রূপে অবতীর্ণ হইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়নের সার্থকতা আরব্ধ হইল।

দুঃসহ ক্লেশে চন্দ্রশেখর বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। শৈবলিনী

উদ্ধারসাধনই যে এই বেদগ্রাম-ত্যাগের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর অশান্তচিত্তে গভীর রজনীর তিমিরমধ্যে পথে পথে বিচরণ করিতেন, এবং তৎকালে তিনি আপনাকে জগৎপরোনাস্তি হতভাগ্য বিবেচনা করিতেন। ঠিক এমনই সময়ে চন্দ্রশেখরের জীবন-পথে একটি কর্ত্তব্য উপস্থিত হইল। এ কর্ত্তব্য শৈবলিনী-সংক্রান্ত নহে, মীরকাসিমের বেগম দলনী বিবি সংক্রান্ত। চন্দ্রশেখর কর্ত্তব্য পায়ে ঠেলিলেন না। চন্দ্রশেখর দলনী বিবির উপকারসাধনে যত্নবান হইলেন। এই স্থলে গ্রন্থকার চন্দ্রশেখরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি পুড়াইলে কেন! সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, কিন্তু হৃদয় ভস্ম হয় না।" ইহার অর্থ এই, তুমি মনে করিয়াছিলে, গ্রন্থ পুড়াইয়া সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিবে, কিন্তু যে হৃদয় পরের হিতসাধনের জন্য সতত উন্মুখ, সে হৃদয় এই অনন্ত শোকপূর্ণ সংসারকে কি পরিত্যাগ করিতে পারে!

চন্দ্রশেখর, তাঁহার নবীন জীবনের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তাঁহার গুরুদেব রামানন্দ স্বামীর নিকট হইতে অর্জ্জন করিলেন। পরোপকারে পুণ্য আছে, পরোপকারসাধন মনুষ্য-জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য, এ শিক্ষা চন্দ্রশেখর পূর্ব্বেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই শিক্ষার ফলে, চন্দ্রশেখর প্রতাপের উদ্ধারসাধনের জন্য গঙ্গার সলিলরাশি-মধ্যে অবলীলাক্রমে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বার্জ্জিত শিক্ষার উপরে চন্দ্রশেখর আজ রামানন্দ স্বামীর নিকট নূতন শিখিলেন যে, পরোপকারেই সুখ, সুখার্জ্জনের উপায়ান্তর নাই।

এই শিক্ষার পর, চন্দ্রশেখর পরোপকারসাধন জীবনের সারব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। শাস্ত্রাধ্যয়নের যে সার্থকতা আরব্ধ হইয়াছিল, এত দিনে তাহার পরিসমাপ্তি হইল। চন্দ্রশেখরের জীবন ধন্য হইল। তাঁহার দেহে ও মনে যেন অপরিমিত বল সঞ্চারিত হইল। সমস্ত গ্লানি তাঁহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইল। শৈবলিনীর বিরহজনিত যে চাঞ্চল্য এত দিন তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল। অসাধারণ ধৈর্য্য আসিয়া চাঞ্চল্যের স্থল অধিকার করিল।

যখন চিত্ত এমনই স্থির, সংযত ও অবিকৃত, তখন চন্দ্রশেখর জীবনেই সহসা নরক-যন্ত্রণায় উৎপীড়িতা শৈবলিনীকে দর্শন করিলেন। শৈবলিনীর মানসিক যন্ত্রণায় চন্দ্রশেখর যারপরনাই ব্যথিত হইয়া অশ্রুমোচন করিলেন, কিন্তু

শৈবলিনীর পতন-সংবাদেও তাহার চিত্ত বিকৃত হইল না। শৈবলিনী যে স্বইচ্ছায় কুলত্যাগিনী, এ কথা যে আত্মমুখে স্বীকার করিয়াও, চন্দ্রশেখর হৃদয়ের স্থৈর্য্য হারাইলেন না। এ স্থলে আপনারা একবার হেমচন্দ্রের চরিত্র স্মরণ করুন; তাহা হইলে চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব সহজেই উপলব্ধি হইবে। চন্দ্রশেখর রামানন্দ স্বামীর শিক্ষাগুণে সর্ব্বসন্তাপকে চিত্ত হইতে দূর করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহার চিত্ত সুখ দুঃখের অতীত; কিন্তু তথাপি তিনি শৈবলিনীর উন্মাদ অবস্থা দেখিয়া রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ কি? দুইটি কারণ; প্রথম,—শৈবলিনী পতিতা হইলেও চন্দ্রশেখরের পরিণীতা ভার্য্যা; দ্বিতীয়,—চন্দ্রশেখর আপনার সুখ দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন কিন্তু অন্যের সুখ দুঃখ তিনি আত্মজীবনের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রশেখর শুধু তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, তিনি হৃদয়বান পুরুষ। যিনি তত্ত্বজ্ঞ অথচ হৃদয়হীন, তিনি মনুষ্যকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেখিলে রোদন করিবেন কি না সন্দেহের বিষয়।

চন্দ্রশেখর উন্মাদ-গ্রস্ত শৈবলিনীর সহিত রামানন্দ স্বামীর সম্মুখীন হইলেন। রামানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে শৈবলিনী সমভিব্যাহারে বেদগ্রামে ফিরিতে আদেশ করিলেন। চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশ পালন করিলেন। তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিকারচিত্ত পুরুষ ভিন্ন আর কে পতিতা পত্নী সমভিব্যাহারে লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিত? চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বগৃহে আনিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না; কেন না তাহা লোক ও সমাজধর্ম্মের বিরুদ্ধ বোধ হইল। পরে যখন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর জীবন-সংক্রান্ত সকল তথ্য অবগত হইলেন, তখন তাঁহার আক্ষেপের আর সীমা রহিল না; তখন তিনি শৈবলিনীকে পুনরায় পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। চন্দ্রশেখর ভিন্ন কে এমন পতিত?

কিন্তু এ স্থলেই চন্দ্রশেখরের মহত্ত্বের শেষ নহে; তাঁহার মহত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর এখনও প্রদর্শিত হয় নাই। চন্দ্রশেখর হৃদয়ের শোণিতশোষী শত্রুর অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্র কৃষ্ণবক্ষে ক্ষমা করিয়াছিলেন; চন্দ্রশেখর ক্রোধশীল হইলে, তাঁহার শরীরে যে অপরিমিত শক্তি ছিল, তাহাতে তিনি একাধিক নরেন্দ্র কৃষ্ণকে পদতলে টিপিয়া মারিতে পারিতেন। আজীবন বৃদ্ধা তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন নাই।

নরেন্দ্র কৃষ্ণকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাহাই বা বলি কেন

যিনি সর্ব্বরিপুদমনকারী মহাপুরুষ, যিনি অক্রোধ, তাঁহার আবার শত্রু মিত্র কি? তিনি আবার ক্ষমা করিবেন কি? প্রত্যুত লরেন্স ফষ্টরকে চন্দ্রশেখর ক্ষমা করিয়াছিলেন বলিলেও চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব খর্ব্ব করা হইবে। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে ক্ষমা শিখাইয়াছিলেন। কিরূপে শিখাইয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রতাপ ফষ্টরের বধে চলিয়াছেন; চন্দ্রশেখর প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন; কহিলেন, "ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই! যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সেই শত্রুকে ক্ষমা করে।"

সংসারে অনেক সময়ে মনুষ্য-হৃদয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তিমূলক বিষম উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। শত্রুর অনিষ্টসাধন অপেক্ষা শত্রুকে ক্ষমা করায় যে অধিক বীরত্ব, এ কথা অনেক শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু জগতে কয় জন এই নীতি-বাক্য পালন করে? কর্ত্তব্যের অনুরোধে কখনও কখনও শত্রু কেন, মিত্রেরও অনিষ্টসাধন করিতে হয়। কিন্তু যে হৃদয়ের ঘৃণ্য প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অন্যের অনিষ্টবিধান করে, সে অধম।

মনুষ্যের ক্ষণস্থায়ী জীবনে নিজেরই সম্পূর্ণ ইষ্টসাধন করিবার অবসর নাই; তাহার উপর সেই মহামূল্য জীবনের কোনও অংশ যদি অন্যের অনিষ্টসাধনে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? অন্যের অনিষ্টে নিজের পারমার্থিক ইষ্ট অসম্ভব, এই জন্যই চন্দ্রশেখর বলিয়াছিলেন, "তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা?" ফষ্টর সম্বন্ধে চন্দ্রশেখরের এই উক্তি যে কত মহত্ত্বব্যঞ্জক, তাহা হৃদয়ে অনুভব করাও আমাদের ন্যায় মনুষ্য কীটের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই ক্ষুদ্র উক্তির মধ্যে চন্দ্রশেখরের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন নখদর্পণে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থমধ্যে চন্দ্রশেখরের ইহাই শ্রেষ্ঠ উক্তি এবং শেষ উক্তি বলিলেও বিশেষ ভ্রম হইবে না। মহত্ত্বের মধ্য দিয়া চন্দ্রশেখর আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মহত্ত্বের মধ্য দিয়া তিনি আমাদের সম্মুখ হইতে বিদায় লইলেন। চন্দ্রশেখরের সমস্ত জীবন মহত্ত্বময়।

আমরা চন্দ্রশেখরের চরিত্র সাধ্যমত বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে সেই চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

সর্ব্ব প্রথমেই চন্দ্রশেখরের সমগ্রজীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের কথা উল্লেখযোগ্য। এ ব্রহ্মচর্য্যের বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই। শৈবলিনী-হারা হইয়া চন্দ্রশেখর যখন মুঙ্গেরের পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন তিনি যেমন ব্রহ্মচারী ছিলেন, যখন তিনি শৈবলিনী সহধর্ম্মিণীরূপে বেদগ্রামে আত্মকুটীরে বসবাস করিতেন, তখনও তিনি তেমনই ব্রহ্মচারী ছিলেন। উদয়নালার যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে শৈবলিনীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার এ ব্রহ্মচর্য্যের অবসান ঘটে নাই। অথচ তাঁহার এই সমস্তজীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে তিনি নানাপ্রকারে সংসারের কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। এই স্থলেই চন্দ্রশেখরের চরিত্রের মহত্ত্ব। সংসারকে অগ্রাহ্য করিয়া কাহারও জীবন ধন্য হইতে পারে না। চন্দ্রশেখর জীবনের প্রথম চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারকে কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার জীবনের এই অংশ কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ। শেষ জীবনে তিনি সংসারের সহিত বৃহৎ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি সংসারক্ষেত্রে এক জন সুমহান কর্ম্মিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই-কারণেই তাঁহার শেষ জীবন এত উজ্জ্বল। চন্দ্রশেখর সততই আপনার বিচারশক্তি প্রবুদ্ধ রাখিতেন; তিনি ঈশ্বরে সতত নির্ভরশীল ছিলেন; তিনি দুঃখকে জয় করিতে ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিতে জানিতেন। সহস্র সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও এরূপ ব্যক্তিকে নির্ব্বিবাদে ব্রহ্মচারী আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। এই কারণেই আমরা চন্দ্রশেখরের সমস্তজীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে আমরা চন্দ্রশেখরের প্রেম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। চন্দ্রশেখরের প্রেম কতকটা বিশ্বজনীন। তাঁহার প্রথম জীবনে এ প্রেম বিশেষ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। শৈবলিনী-বিচ্ছেদের পর রামানন্দ স্বামীর উপদেশবারিসেচনে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে এই বিরাট বৃক্ষ আপনার পত্রবহুল প্রকাণ্ড শির ঊর্দ্ধে উন্নমিত করিয়াছিল। চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী-সম্পর্কিত প্রণয়ের কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রেম সাধারণ মনুষ্য-হৃদয়ের প্রেমের ন্যায় সংকীর্ণ হইলে, শৈবলিনীর হৃদয়স্থিত নরকানল কখনও নির্ব্বাপিত হইত না।

তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পতিতা শৈবলিনীকে তিনি পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন নাই। লরেন্স কষ্টরকেও তিনি ক্ষমার অযোগ্য বিবেচনা করেন নাই।

চন্দ্রশেখরের কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা শুধু একটি উক্তি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিব। চন্দ্রশেখর গণিয়া জানিয়াছিলেন, দলনী বিবির ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। তথাপি বিপন্না দলনীর উদ্ধারসাধনে যত্নবান হইয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন; "ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? ঘটিবার যাহা, তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।"

চন্দ্রশেখর নির্লোভী পুরুষ; ধনাকাঙ্ক্ষাকে কখনও তিনি হৃদয়ে প্রবল হইতে দিতেন না। তিনি কখন ভিক্ষা অথবা দান গ্রহণ করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর কটাক্ষপাত করিয়া চন্দ্রশেখরকে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

চন্দ্রশেখর বিনয়ী, বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান পুরুষ বলিয়া লোককে অপ্রিয় কথা শুনাইতে পরাঙ্মুখ। গণিতে অপারদর্শিতার দোহাই দিয়া তিনি দলনী-বিবির ভবিষ্যৎ কাসেমালি খাঁর নিকট গোপন করিয়াছিলেন।

তিনি নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানপিপাসু। গভীর রজনী পর্য্যন্ত তিনি সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন সকলের মীমাংসায় রত থাকিতেন। চন্দ্রশেখর আরও অন্যান্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তাহার কোনও কোনওটি পূর্ব্বেই হয় ত প্রবন্ধমধ্যে বিবৃত হইয়াছে। অনবধানতাবশতঃ কোনও কোনওটি হয় ত এখনও লক্ষ্যের বাহিরে পড়িয়া আছে।

যাহা হউক, সর্ব্ব-শেষে আমরা চন্দ্রশেখর-চরিত্রের সারসঙ্কলন না করিয়া কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারি না। তাঁহার সমগ্র চরিত্র আলোচনা করিলে মনে হয়, লেখক তাঁহার পাঠকবর্গকে নিম্নলিখিত শিক্ষা প্রদান করিবেন বলিয়াই চন্দ্রশেখরের ন্যায় আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন,—

প্রথম,—কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে প্রকৃষ্ট জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব।

দ্বিতীয়,—শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই,—যদি সে জ্ঞান সংসারক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারা না যায়। যত দূর সম্ভব, অনাসক্তভাবে সংসার কর, সংসারকে উপেক্ষা করিও না। উপেক্ষা করিয়া কাহারও জীবন ধন্য হইতে পারে না।

তৃতীয়,—যদি সকল দুঃখ দূর করিতে চাও, তাহা হইলে পরোপকার ব্রত গ্রহণ কর।

চতুর্থ,—ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ বীরের ধর্ম্ম।*

শ্রীপ্রমথনাথ সেন।

* ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

কমলা।

—:০:—

১

যখন কোদালিয়ার জমীদার-পুত্র নন্দীগ্রামের অনুরূপ চাটুর্য্যের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঢাক ও মোশনচৌকির বাদ্যে ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে সরগরম করিয়া চলিয়া গেল, তখন পল্লীর স্ত্রী-সমিতিতে দু' একটা ছোটখাট সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী দুই বৎসর পূর্ব্বে অনুরূপের ভীতিপ্রদ স্ত্রী কমলার বিবাহঘটনার উল্লেখ করিয়া কমলায় পিতৃব্য নামক জীবের আক্কেল রূপ পদার্থটির অস্তিত্বের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া যখন শ্রীমতী জগৎতারিণী উক্তরূপ পূজ্যপাদ পিতৃব্য দেবের মুখে অগ্নিসংযোগের সারবত্তা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন, তখন ক্ষমতাপন্ন ক্ষুদ্র সমিতিটির আলোচনা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল।

রিপোর্টটা যত সংক্ষেপে সারিলাম, ঘটনাটি তত সংক্ষিপ্ত নহে। সে কথাটি এই,—স্বরূপচন্দ্র যখন জমীদার সরকারে নায়েবী করিয়া অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন কনিষ্ঠ অনুরূপচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্নপরিপাক তিন্ন অপর কোনও কার্য্যে বিন্দুমাত্রও পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। সহসা এক দিন প্রাতঃকালে বিপত্নীক স্বরূপচন্দ্রের মৃত্যু হইল। স্বরূপচন্দ্র যে মৃত্যুশয্যায় আপনার অনাথা কন্যা কমলাকে নিঃস্ব অবস্থায় কনিষ্ঠের হস্তে অর্পণ করিয়া যান, তাহা নহে। প্রতিবেশিগণ বলেন, কমলার সহিত বিস্তর রজতকাঞ্চন রত্নাদিও না কি অনুরূপচন্দ্রের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল; এবং বিষয়-বুদ্ধিতে অনুরূপ অপেক্ষা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রবেশলাভটা অনায়াসেই ঘটিত। সেই জন্যই একটি দরিদ্র স্কুলমাষ্টারের সহিত কমলার বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময় স্ত্রীবুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া অনুরূপ পরিজনবর্গের নিকট বলিয়াছিলেন যে, "স্বরূপচন্দ্র ত কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই! তিনি দরিদ্র, সম্বলহীন; ধনী পাত্র সংগ্রহ তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য, এবং তাঁহার আপনার কন্যা অন্নদাকিনীও বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল; সুতরাং এ ক্ষেত্রে—"ইত্যাদি। এক্ষণে মন্দাকিনীর বিবাহে অনুরূপচন্দ্রকে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে দেখিয়া পল্লীর দুই একটা নিন্দুক ও ধনের ঈর্ষ্যাবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বলবতী হইয়া গ্রামে

একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সেই জন্যই দু' একটা ছোটখাট সভানমিতিতে অনুরূপচন্দ্রের অদ্ভুত মূর্খতা ও তদীয় পত্নী বিন্দুবাসিনীর অপূর্ব্ব মন্ত্রিত্বের আলোচনা করিয়া প্রতিবেশিবীগণ উভয়ের সুখে অগ্নিপ্রয়োগ করিবার নিমিত্ত ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দরিদ্র স্বামীর গৃহে কমলার সুখের অভাব ছিল না। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র পরিবার। স্বামীর বৃদ্ধা পিতৃষসা ভিন্ন সংসারে আর কেহ অভিভাবক ছিল না। বধূকে গৃহে আনিয়া অবধি বৃদ্ধা আপনার ক্ষুদ্র সংসারটিকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। আর গৃহে ছিল অতি পুরাতন ভৃত্য—বেহারী।

স্বহস্তে স্বামীর জন্য রন্ধন করিয়া, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া, বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিয়া, নিশীথে কমলা যখন শয্যাগৃহে প্রবেশ করিত,—শয়নমন্দিরে স্বামী যখন সপ্রেম-বস্তাসনে কমলাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিতেন, তখন তাহার সমস্ত শ্রান্তি নিমেষে ঘুচিয়া যাইত। তাহার পুলক-কম্পিত হৃদয় হর্ষের বিমল তরঙ্গপ্লাবনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। স্বামীর সোহাগে কমলা আপনাকে কনকসিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী রাজ্যেশ্বরী অপেক্ষা এতটুকু ভিন্ন ভাবিত না।

২

কমলার স্বামী যোগেশচন্দ্র চাকদাঘির জমীদার বাবুদের এণ্ট্রান্স-স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষকতা করিতেন, এবং জমিদারবাটী হইতে একখানি "দীপালী" নামক মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করিতেন। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেগুলি প্রকৃতই তাঁহাকে ভালবাসিত। এমন মাষ্টার মহাশয় আর হয় না;—কখনও কাহাকে বকেন না, অথচ স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে অত্যাচার বা দৌরাত্ম্যের কোনও ভয়াবহ প্রসিদ্ধি দেশের মধ্যে বিস্তারলাভ করে নাই। কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী এই পল্লীগ্রামে শান্ত অথচ বলিষ্ঠ মাষ্টারটির শিক্ষাগুণে বালকেরা চপল না হইয়াও পাড়াগেঁয়ে নিরীহতা হইতে মুক্ত ছিল, এবং ক্রিকেট, ফুটবল না খেলিলেও লাঠিখেলা ও অন্যান্য ব্যায়ামক্রীড়ায় সমধিক তৎপরতা প্রদর্শন করিত। ডিবেটিং ক্লবে ক্রমাগত স্বদেশ ও গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্যাদি বুঝাইয়া বুঝাইয়া যোগেশচন্দ্র ছাত্রদিগকে অতিরিক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার একটা দরিদ্র পল্লীতে কয়েকখানা খড়ের বাড়ীতে অগ্নিদেবের প্রবল তেজে ভস্মসাৎ হইবার উপক্রম হইলে, কয়েকটি বয়স্ক

ছাত্র-অধ্যাপকের অভিভাবকগণের সম্পূর্ণ নিষেধ সত্ত্বেও যোগেশচন্দ্রের অন্তর্ধানে প্রতিবেশিগণের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা যোগেশচন্দ্র নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতেন; মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণকেও সঙ্গে লইতেন। তখন পল্লীর দু' এক জন বৃদ্ধ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিত,—"এই যে যোগেশ-মাষ্টারের ফৌজ বেরিয়েছে!"

জমীদার বাবুর নিকটও যোগেশের আদর অল্প ছিল না। জমীদার তারিণীশঙ্কর চৌধুরীর বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল; তাই তিনি যোগেশচন্দ্রকে ভৃত্য হিসাবে না দেখিয়া বন্ধুর ন্যায় স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। যোগেশচন্দ্র গদ্যরচনাগুলি এমনই ভাষা কেনাইয়া লিখিতে পারিতেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি দাঁড়াইয়াছিল! সাহিত্যসমাজে তাঁহার বল, তাঁহার সমালোচনার একটা রীতিমত মূল্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল! প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষমতাপন্ন মাষ্টার লেখকটি তাঁহার লেখনীর অব্যর্থ লিপিচাতুর্য্যে চাকদালি গ্রামের নাম বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর নিকট বিশেষভাবে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের লেখনীর আর-একটি প্রধান গুণ ছিল, গুপ্ত বিদ্রূপ! তাঁহার রাজনীতিক বা সামাজিক প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া বিদ্রূপের ফুরধারা ফল্গুনদীর ন্যায় বহিয়া যাইত,—সে ফুরধারার বিপুলস্রোত যে হতভাগ্য বিপক্ষের শিরে আঘাত করিত, তাহার লোচনীয় দুরবস্থা দেখিলে অতিবড় গম্ভীরপ্রকৃতি মহাত্মারও হাস্যসংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিত! কলিকাতার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মাসিকের স্বত্বাধিকারী যোগেশচন্দ্রকে সম্পাদকের আসনে বরণ করিয়া লইবার আশায় বিস্তর ধূপধুনা ও পুষ্পচন্দনের আভাষ দিতেন; কিন্তু কোনরূপ প্রলোভন তাঁহাকে তারিণীনগরের স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই!

যোগেশচন্দ্রের সংসর্গগুণে তারিণীশঙ্কর রায়বাহাদুর খেতাব-গ্রহণের জন্য লালায়িত হওয়া অপেক্ষা সাহিত্যচর্চ্চায় সময়ক্ষেপ করাটা অধিকতর লাভজনক মনে করিতেন, এবং তৈলদানে তৎপর হওয়া অপেক্ষা বিপন্ন ও দরিদ্র বাঙ্গালী-লেখকগণকে অর্থসাহায্য করিতে অধিকতর ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেন।

বিবাহের পর কমলার অদৃষ্টে অপরূপ তেমন প্রফুল্লভাবে না ফুটিলেও, স্বামি-সুখটা পূর্ণমাত্রায় মিলিয়াছিল। নিরক্ষরা স্মিতমুখী কমলা একমাত্র স্বামিপ্রেমের অনুজ্জ্বল মহিমায় আপনাকে সর্ব্বাধিক সম্পদশালিনী বুঝিয়া বর্ষে

আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। কিন্তু হায়! অভাগিনীর এ আত্মপ্রসাদটুকু—এ সম্পদটুকুও তাহার কঠিন হৃদয় অপ্রসন্ন ভাগ্যদেবতার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। তাই সেই বিরাট কর্ম্মপুরুষ তাঁহার অনতিক্রমণীয় বজ্রমুষ্টি লইয়া কমলার এই সুখ তরুর মূলে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন।

৩

এক দিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে বন্ধু-গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া যোগেশচন্দ্র গৃহে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটা ক্ষেত্রে গোরাদের 'টারগেট' অভ্যাস করিবার একটা স্থান ছিল; এই স্থানটি যোগেশচন্দ্রের গৃহে ফিরিবার পথের উপর। এই স্থানটির নিকটে আসিতেই একটা অস্পষ্ট চীৎকারধ্বনি যোগেশচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইল। একটা পলায়মান কৃষককে বিস্তর আশ্বাস দিয়া তাহার নিকট হইতে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সংগ্রহ করিলেন, তাহা এইরূপ;—আজ মধ্যাহ্নের পর দুইটা গোরা এ দিকে আসিয়াছিল। হারাধনের জমীতে তরমুজ দেখিয়া গোরা দুটো সেগুলা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলে, হারাধনের পুত্র গোবর্দ্ধন তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। গোরা দুইটা ইংরাজীতে গালি দিতে দিতে বন্দুকের বাট দিয়া তাহাকে এমনই আঘাত করিয়াছে যে, তাহার একখানা পা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গোরারা ইহাতেও সন্তুষ্ট হয় নাই। এখন তাহারা নিকটস্থ ক্ষেত্রসমূহে প্রবেশ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। সে বাধা দিতে গিয়াছিল, সাহেব বন্দুক উঠাইয়া গুলি করিতে উদ্যত হইল দেখিয়া সে পলাইতেছে। ক্রুদ্ধ যোগেশচন্দ্রের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা একটা আগুনের গোলার মত ঘুরিতে লাগিল। কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কোথায় সে গোরা দুটো?" শঙ্কিতচিত্ত কৃষক হাত বাড়াইয়া কহিল, "ঐ হানিফের ক্ষেতে ঢুকেছে!" "তুই আয় আমার সঙ্গে, দেখি পাজীগুলো কত বড় পালোয়ান!" এই কথা বলিয়াই যোগেশচন্দ্র হানিফের ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিলেন। অল্প অগ্রসর হইয়াই তিনি একটা গোরাকে লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যস্ত দেখিলেন; তাড়াতাড়ি রোষদীপ্তস্বরে কহিলেন, "তোমার এ ভারি অন্যায় হচ্ছে! গরীব চাষাদের এরূপ ক্ষতি করা Downright robbery"। গোরা অবজ্ঞার স্বরে বলিল, "তুমি কে গো বাবু, হুকুম দিতে আসিলে? এখনই শিক্ষা পাইবে।" যোগেশচন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "চুপ রও বেয়াদব্! ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখ সামলাইয়া কথা কহিস্!" "ভদ্রতা শিখাইতে আসিয়াছ, ইউ রাস্কেল!" বলিয়া

যোগেশচন্দ্রের শরীরে গোরা একটা বুটের ঠোক্কর দিল। যোগেশ তখন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গোরার উপর পড়িয়া তাহাকে প্রচণ্ডরূপে প্রহার করিতে লাগিলেন। গোরাটা প্রায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় তাহার সঙ্গী গোরা ছুটিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটা পতিত বংশদণ্ড লইয়া যোগেশচন্দ্রের মস্তকে আঘাত করিল। যোগেশ তখন প্রথম গোরাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়ের মস্তকে প্রচণ্ড ঘুঁসি মারিলেন। সে "By jove, beaten to jelly" বলিয়া ঘুরিয়া সশব্দে ভূতলে পড়িয়া গেল। ক্রুদ্ধ যোগেশ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "Rogues! নিজেদের হাতে প্রতিকারের ভার নাই না বলিয়া তোদের আস্পর্দ্ধা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে।"

ধনঞ্জয় লাভ করিয়া প্রথম গোরা চুপ করিয়া গেল। কিন্তু দ্বিতীয় গোরা গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তারিণীশঙ্করের অল্প বন্ধুত্ব ছিল। তিন চারি দিনের মধ্যেই তারিণীশঙ্করও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন।—"অপরাধীকে ধরিয়া দিতে হইবে; নচেৎ ভারী অন্যায় হইবে!" তারিণীশঙ্কর উত্তর দিলেন। পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার আরও পাঁচ ছয়খানি পত্র ব্যবহার চলিল। অবশেষে একদিন যোগেশচন্দ্র তারিণীশঙ্করের সহিত সাহেবের নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিলেন। তখন স্কুলের কার্য্য আবার পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। "দীপালী" পত্রিকা আবার প্রবন্ধগৌরবে সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিল। জমীদারে মাঠারে রীতিমত সাহিত্যচর্চ্চা হইতে লাগিল। কেবল যোগেশের সংসারে দু' একটী ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল;—যোগেশের বৃদ্ধা পিতৃষসা ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, এবং কমলা একটি মৃতসন্তান প্রসব করিল।

বিধাতা যখন প্রসন্ন হন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের দানগুলি যেমন বর্ষার ধারার ন্যায় অজস্রভাবে ভাগ্যবানের শিরে বর্ষিত হয়, তখন যেমন ভাগ্যবানের ভস্মের মুষ্টিও কনকের মুষ্টিতে পরিণত হয়, তেমনই বিধাতা অপ্রসন্ন হইলে বিপদগুলি যেন বিষধর সর্পের ন্যায় মানবজীবনের শতসহস্র ছিদ্রপথ দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষ ফণা উদ্যত করিয়া বাহির হইয়া হতভাগ্যকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে! কোনও দিকে সামলাইবার অবসরটুকুও তাহার দুরদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না! জানি না, ইহাতে এই দুর্ভেদ্য

অটল বিধাতা পুরুষটির কোন্ শুভ উদ্দেশ্য সাধিত হয়! কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই উত্তরোত্তর দুর্ঘটনা আসিয়া হতভাগ্য যোগেশচন্দ্রকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এই ক্ষমতাপন্ন অদৃশ্য দেবতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবে, বলহীন মানব-সন্তানের এমন কি ক্ষমতা আছে?

উক্ত ঘটনার দুই তিন মাস পরে কয়েকটি সাহেব চাকদালিতে শিকার করিতে আসিল। সাহেবদের বিরাট তাম্বুর চারি পার্শ্বে গ্রাম্য নরনারীর কৌতূহলদৃষ্টি তাহাদের নিকট বেশ কৌতুককর মনে হইল। নিরীহ গ্রামবাসীদিগের লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইয়া দুই একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলে যখন তাহারা তাহাদিগের পলায়নশক্তির পরিচয় প্রদান করে, তখন সাহেবরা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের ভীতি বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করে! ব্যাপারটা যদি এই অবধি আসিয়া থামিয়া যায়, তাহা হইলে সকল দিকেই মঙ্গল হয়, এবং কোনও পক্ষেরই উদ্বেগ বা অভিযোগের কোনও কারণ ঘটে না। কিন্তু হায়! এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনাচক্রগুলির সঙ্গে যোগেশচন্দ্র ও কমলার অদৃষ্টচক্রও যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য গতির বশে ঘুরিতেছিল, তাহা ত কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না; তাই এক দিন সন্ধ্যার সময় ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ ভীষণ ভাব ধারণ করিল।

সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুইটি কৃষক-রমণী নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহারা যখন নদীর জলে গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল, তখন পীটার ধীরে ধীরে নদীতীরবর্ত্তী বাবলাগাছের ঝোপের পাশে আসিয়া লুকাইল। সরলা গ্রাম্য-নারী দু'টি তাহা দেখে নাই, তাহারা তখন নির্জ্জন ঘাটে আপনাদের সুখ দুঃখের আলোচনাতেই একান্ত ব্যস্ত ছিল। সহসা একটি রমণীর পীটারের দিকে দৃষ্টি পড়িলে সে চুপি চুপি তাহার সখীর কাণে কাণে কহিল, "ওলো শশী! দেখিচিস—সাহেব রয়েছে!" স্বামিগৃহ-প্রত্যাগতা কিশোরী শশী বড় শঙ্কিতা হইল; সে কহিল, "কি হবে বৌ?" "কি আর হবে? তাড়াতাড়ি 'দুর্গা' নাম করে পালাই চ'!" তাহারা জলের কুম্ভ কক্ষে করিয়া আপনাদিগকে যথেষ্টপরিমাণে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া কম্পিত ও ত্রস্তচরণে গ্রামের পথে চলিতে লাগিল। শশী ভয়ে তাড়াতাড়ি চলিতে পারিতেছিল না। খানিকটা পথ অতিক্রম করিতেই সে তাহার পৃষ্ঠদেশে করস্পর্শ অনুভব করিল। ভয়ে কুম্ভ ফেলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ভ্রাতৃবধূ যখন পশ্চাতে

ফিরিয়া দেখিল, সে সাহেবটা শশীর হস্তধারণ করিয়াছে, তখন সে ভয়ে চীৎকার করিয়া অদূরবর্ত্তী কৃষকের বাড়ীর অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। সাহেব শশীর হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল,—"My darling! ডর করিয়ো না,—হামি কি বাঘ আছে যে টুমারে খাইয়া ফেলিবে? হামি টুমারে ভালবাসিবে!" শশীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তখন সাহেব তাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, শশী সবলে তাহার বস্ত্র সংযত করিয়া আক্রোশে সাহেবের হাতে দংশন করিল। "O You * *—you bitch" বলিয়া সাহেব তার হাত দুটা ধরিয়া প্রবলবেগে ঝাড়া দিয়া সজোরে তাহার উদরে বুট পদাঘাত করিল। শশী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওগো বাবা গো, মা গো, সাহেবে মেরে ফেল্‌লে গো!" পীটার তাহার চীৎকারে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া যেমন তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবে, অমনই পশ্চাৎ হইতে কে তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া সবলে আকর্ষণ করিল। সাহেবকে তাহার এই আকস্মিক শত্রুটির মুখ চোখ দেখিবার অবসরমাত্র না দিয়া আগন্তুক সাহেবের নাকে মুখে ভীষণভাবে ঘুঁসি চড় মারিতে লাগিল। সাহেবের নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পরে আগন্তুক তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া বক্ষে ও পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "You are rightly Served to-day, you devil." পরে শশীর দিকে চাহিয়া কহিল,—"শশী, কোনও ভয় নাই,—আমি এসেছি!" "কে যোগেশ দা'?"—শশীর তেমন চৈতন্য ছিল না; সে তখন অত্যন্ত কাঁদিতেছিল। নদীর ধারে বেড়াইতে আসিয়া যোগেশচন্দ্র সহসা রমণীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া দৌড়াইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন। উঃ, খুব সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি! যদি এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইত!—একটা অমূলক আশঙ্কায় যোগেশের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সাহেবকে তদবস্থায় রাখিয়া যোগেশ শশীকে বাড়ী রাখিয়া আসিলেন।

এ সংবাদ প্রচ্ছন্ন রহিল না। পর দিন গ্রামময় রাষ্ট্র হইল,—একটা সাহেব ছিদামের কন্যার উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল, এবং মাষ্টার মহাশয় তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিয়াছেন!

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তারিণীশঙ্করের তলব হইল। তারিণীশঙ্কর তাহার চাপকান জোব্বা আঁটিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রুষ্টস্বরে কহিলেন, "এরূপ অত্যাচারে আর প্রশ্রয় দিতে পারি না।" ম্যাজিষ্ট্রেট

আরও দুই একটা রূঢ় কথা বলিলেন। তাহার উত্তরে তারিণীশঙ্কর কম্পিত-স্বরে কহিলেন, "সার! আমিও বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াছি; এরূপ অপরাধীকে আমার এলাকায় আর স্থান দিব না। তাহার জন্য আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারি না। আমি নিজে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ!" "দোষী কে?" "যোগেশ মাষ্টার!" "The Scoundrel! the rogue!"

গম্ভীরমুখে বাড়ী ফিরিয়া তারিণীশঙ্কর একখানি পত্র লিখিলেন, এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীরতরকণ্ঠে ভৃত্যকে কহিলেন, "যোগেশ বাবুকে দিয়া আয়।"

খোলা জানালার ধারে বসিয়া যোগেশচন্দ্র তখন ছাত্রদের অনুবাদ-পত্র সংশোধন করিতেছিলেন। ভৃত্য বেহারী পত্র দিল। পত্রপাঠ করিয়া যোগেশচন্দ্র জড়পুত্তলীর ন্যায় নিঃস্পন্দভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঘন কালো মেঘে তখন আকাশের আপ্রান্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখে জানিবিড় বনখানা নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। ক্বচিৎ দূর হইতে কৃষকের কর্কশকণ্ঠের তানলয়হীন গ্রাম্যগীতির স্বর শোনা যাইতেছে। আজ সহসা যোগেশের চিত্তাকাশ একটা সুনিবিড় কৃষ্ণ মেঘে ভরিয়া উঠিয়াছে! তারিণী লিখিয়াছেন,—"আমি আর সহ্য করিতে পারি না। তোমার এইরূপ অন্যায় স্পর্দ্ধায় আমার জমীদারী নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সাহেবকে মারিবার কি এত প্রয়োজন ছিল? তোমাকে গ্রাম ও চাকরী পরিত্যাগ করিতে হইবে। আজ হইতে তোমার সহিত আমার সমস্ত সৌহৃদ্যবন্ধন ছিন্ন হইল।" সমস্ত স্নেহ, সমস্ত ভালবাসার বন্ধন এক কথায় ছিন্ন করিতে হইবে? কেন? কি অপরাধে? যোগেশের চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সহসা কক্ষের বাহিরে মৃদু পদশব্দ শুনিয়া যোগেশ তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। কমলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "তারিণী বাবুর চাকর চিঠির জবাব চাচ্ছে!" যোগেশ কথাটা শুনিয়াও শুনিলেন না। কমলা নিকটে আসিয়া কহিল, "চিঠির জবাব দেবে না?" যোগেশ তবু নিরুত্তর রহিলেন। কমলা তখন যোগেশের নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া তুলিল। যোগেশ অর্থহীন দৃষ্টিতে কমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে কোনও ভাব ছিল না; যেন পুতুলের চিত্র করা চোখের মত! কমলা কহিল, "এ কি? মুখ এত ভার কেন? কি ভাবছ?" "কিছু না।"—"কিছু নয় কি? হাঁ—তুমি ভাবছ। বলবে না আমাকে? লক্ষ্মীটি বল, আমার

বড় প্রাণ কেমন কচ্ছে! কি ভাবছ বল?" কমলার চোখ দুটি ছল ছল করিতেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যোগেশ কহিলেন, "অনেক দিনের স্নেহের বন্ধন আজ ছিন্ন কর্‌তে হবে কমল! মনিবের হুকুম হয়েছে।" "সে আবার কি? আমি বুঝতে পারছি না!" তখন যোগেশচন্দ্র কমলার নিকট আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া তারিণীর পত্রখানি দেখাইলেন। পত্রপাঠান্তে রুদ্ধকণ্ঠে কমলা কহিল, "এখন কি কর্‌বে?" "তুমি কি কর্‌তে বল?" "অত্যাচারী সাহেবকে মেরে ত তুমি জেলায় কর নি। তার জন্যে যদি চাকরী ছাড়তে হয় ত এখনই ত্যাগ কর।" "তার পর?" "তার পর কি?" "পেটটা চালাতে হ'বে ত?" "নিশ্চয়! রাণীহাটের বাড়ীতে চল,—তুমি চাষ কর্‌বে, আমি পৈতে বেচিব, মুড়ি বেচিব, তাতেও ঢের সম্মান, ঢের সুখ!" "কমল! তোমার মত যার স্ত্রী, কে তা'কে আশ্রয়হীন করে? তুমি সত্যই আমার কমলা!" বলিয়া সজলনয়নে যোগেশচন্দ্র কমলার অধরে চুম্বন করিলেন। তারিণীশঙ্কর উত্তর পাইলেন, "কাল বিকালে আপনার গ্রাম পরিত্যাগ করিব;—এত কালের বাস উঠাইতে একটু সময়ের প্রয়োজন হয়, তাই এই অবকাশটুকু শুধু ভিক্ষা চাহি!" পত্রপাঠ করিয়া তারিণীশঙ্কর রুমালে চোখ মুছিলেন। বেদনার গুরুভার তাঁহার বুকখানাকে চাপিয়া ধরিল। সে রাত্রে তারিণীশঙ্করের ভাল নিদ্রা হইল না; সমস্ত রাত্রি নিতান্ত অধীরভাবে তিনি কক্ষসম্মুখস্থ বারাণ্ডায় পায়চারী করিয়া বেড়াইলেন;—চিঠিখানা বড় রূঢ় হইয়াছে, কিন্তু হায়, উপায় নাই!

পর দিন বাহির হইতে আসিয়া যোগেশ কহিলেন, "কমল! এইবার তোমাকে একটা কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে!" "কি কষ্ট?" "তোমাকে বেহারীর সঙ্গে রাণীহাটে যেতে হবে!" রাণীহাটে যোগেশের জন্মভূমি। "আর তুমি?" "আমার ত এখন যাইবার যো নাই।" "কেন?" "মকদ্দমার জন্য আমাকে জেলায় যেতে হবে!" বিস্তর অশ্রু, আবেগ ও অনুনয়ের পর কমলা যোগেশের প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন বেহারীকে সব কথা বুঝাইয়া দিয়া যোগেশ কহিলেন, "বেহারী! তোমার মাকে দেখো, আর কেউ নেই!" চোখের জল মুছিতে মুছিতে বেহারী কহিল, "সে জন্য ভেবো না বাবা,—যত দিন আমি আছি, তত দিন কিছু ভেবো না। আমার মাকে দেখ্‌বো, এ আর বেশী কথা কি বাবা? কিন্তু তুমি কবে ফিরছো?" মলিন হাসি হাসিয়া যোগেশ কহিলেন, "ভগবান যে দিন ইচ্ছা কর্‌বেন, বেহারী! সেই

দিনই আমি বাড়ী ফিরিব। বাড়ী ছাড়া আর কোথায় আমার মাথা গোঁজবার জায়গা আছে, বেহারী?"

৪

মকদ্দমায় যোগেশের হার হইল। সাহেবের ব্যারিষ্টার বেশ করিয়া বুঝাইল যে, মিষ্টার পীটার শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন; তাঁহার কোনও প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না। সেখানে এই গ্রাম্য অশিক্ষিতা 'নেটিভ' স্ত্রীলোক দুটিকে ভয় পাইতে দেখিয়া কেবল বলিয়াছিলেন, "আমি ত বাঘ নহি—ভয় কেন?" আপনারা নির্ভয়ে পথ দিয়া চলিয়া যান।" এমন কি, সাহেব তাঁহাদিগকে 'সিষ্টার' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরক্ষর রমণীগণ তবু ভয় পাইয়া চীৎকার করে। তখন আসামী আসিয়া সাহেবকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। সাহেব ব্যাপার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্বৃত্ত শিক্ষাগর্ব্বিত বাঙ্গালীটা কোনও কথায় ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সাহেবদের মারিবার জন্য লোকটার একটা 'ম্যানিয়া' আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে নির্দ্দোষ গোরাকে মারিয়া সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। লোকটা বন্য ভল্লুকের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে।" যোগেশের স্বপক্ষে যতগুলি যুক্তিতর্ক ছিল, সমস্তই ব্যারিষ্টার সাহেবের বক্তৃতা ও আস্ফালনের স্রোতে ভাসিয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন যোগেশচন্দ্রকে এক বৎসরের কারা-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। যোগেশচন্দ্র কহিলেন, "পাপীকে শাস্তি দিয়াছি; সে জন্য যদি জেলে যাইতে হয়, তবে হে ভগবান! তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না। কিন্তু কমল—" অসীম বলে যোগেশ অশ্রুসংবরণ করিলেন।

সমগ্র বাঙ্গলা দেশ এই মকর্দ্দমার ফল জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। কমলা অচিরেই এই সংবাদ অবগত হইল। সে তখন পাগলিনীর ন্যায় তাহার পিতৃব্যের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। পিতৃব্য কহিলেন, "আমি এত টাকা এখন কোথায় পাব! ছিঃ! অমন গোয়ার্ত্তুমি করতে আছে! সাহেবের গায়ে হাত! মনে করতেও গায়ে কাঁটা দেয়! দুর্গা শ্রীহরি!"

বেহারী স্বোপার্জ্জিত যাহা কিছু সমস্তই বাহির করিয়া দিল। কমলা নিরলঙ্কারা হইল।—বিস্তর অর্থব্যয়ে আপীল হইল। কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ ধনী স্বব্যয়ে এটর্ণী নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু প্রথম বিচারকের রায় অবিচলিত রহিয়া গেল। এক দিন অপরাহ্ণে যোগেশচন্দ্রকে কারা

প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কারারক্ষক সশব্দে লৌহের ফটক বন্ধ করিল।

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস,—অবশেষে বারটি মাস কাটিয়া গেল। নানারূপ দুর্ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়া শ্রাবণ মাসের একটি মেঘমুক্ত প্রভাত স্নিগ্ধ অরুণ-রশ্মির মুকুট পরিধান করিয়া দেখা দিল। এই দিন প্রাতঃকালে যোগেশচন্দ্র হরিণবাড়ীর জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দীর্ঘ এক বৎসর পরে আজ প্রকৃতির মুক্ত আনন্দের মধ্যে যোগেশচন্দ্রের দুশ্চিন্তার ভার অনেক কমিয়া গেল। কিন্তু হায় রে মানব-জীবন! যদিও এ জগতে তাহার সকল সাধ, সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার উপক্রম ঘটে, তবু বুকের এক কোণে যে একটি ক্ষুদ্র 'কিন্তু'র মেঘ দেখা দেয়, সে মেঘটুকু কিছুতেই ঘোচে না রে, কখনও ঘোচে না! আজ স্বাধীনতা পাইয়া বাহিরের মুক্ত বায়ুতে আসিতেই যোগেশচন্দ্রের নয়নসমক্ষে অনশনক্লিষ্টা, প্রতীক্ষা-কারিণী, চিন্তাপীড়িতা, স্বাধ্বী পত্নীর দীন অথচ লক্ষ্মীশ্রীবিচ্ছুরিত মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল! অমনই তাঁহার সমস্ত প্রাণ মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় রাণীহাটে উড়িয়া যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়! বেলা দুইটার পূর্ব্বে ত ট্রেণ নাই!

সহসা একটা পাগ্‌ড়ী-পরা দরোয়ান আসিয়া কহিল, "বাবু আপনাকে ডাকছেন।" "কে বাবু?" "ঐ গাড়ীতে।" যোগেশ দেখিল, পথের অপর পার্শ্বে কিয়দ্দূরে একখানি 'লাণ্ডো'তে একটি বাবু বসিয়া। যোগেশ নিকটে আসিতেই বাবু গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার করকম্পন করিয়া কহিলেন, "আপনারই নাম যোগেশ বাবু? আপনই 'দীপালী'র সম্পাদক?" "আজ্ঞে, আমারই নাম শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।" "আমাকে আপনি বোধ হয় জানেন না; আমার নাম শ্রীহেমন্তকুমার মল্লিক।" ইনিই সেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী হেমন্ত মল্লিক। অভিবাদন করিয়া যোগেশ কহিল, "আপনিই আমার জন্য এটর্ণী নিযুক্ত করিয়াছিলেন?" মৃদু হাসিয়া হেমন্ত বাবু কহিলেন, "কোনও ফল হয় নি! যাক্ আপনার সঙ্গে একটি বিশেষ কথা আছে।" "বলুন।" "আমি একখানা মাসিকপত্র বাহির করিব; আপনার ন্যায় তেজস্বী সম্পাদকের হাতেই সেখানি অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। আর—" "আর কি!" "আমার পুত্র দুটির শিক্ষা প্রভৃতির সম্পূর্ণ ভার আপনার উপর ন্যস্ত করিতে চাই। তাদের মানুষ করে' তুলতে হবে। এই

সঙ্কোচ করে আপত্তি করিবেন না।" গদ্গদকণ্ঠে কৃতজ্ঞ যোগেশ কহিলেন, —"আপনি আজ বুভুক্ষুকে অন্নদান করিলেন। দেশে আমার স্ত্রী আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসা—" "নিশ্চয়! তাঁকে এখানে নিয়ে আসবেন। ক'টায় ট্রেন?" "বেলা দু'টায়!" "এখন তা' হলে আমার কুঁড়েতে গিয়ে স্নানাহার করতে হচ্ছে। আর একটি কথা,—আপনার বাড়ী আমি বন্দোবস্ত করে দেব, আর আপনার খরচের জন্য যা আবশ্যক—" কৃতজ্ঞতায় যোগেশের চক্ষে জল আসিল। তিনি কহিলেন, "হেমন্ত বাবু! আমাদের বিপন্ন পরিবারকে কিনিয়া রাখিলেন।" "আপনাকে বন্ধু লাভ করে আজ আমার কত আনন্দ, তা' প্রকাশ করে বলতে পারি না। বাঙ্গালীর ভিতরে যে মনুষ্যত্ব এখনও লোপ পায় নাই, আপনি তা'র সুন্দর প্রমাণ। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার নির্ভীকতা ও সৎসাহসের প্রশংসা করি।" সপ্রীতিসম্ভাষণে হেমন্ত বাবু যোগেশচন্দ্রের হাত ধরিয়া গাড়ীতে বসাইয়া নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন; কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

৫

যোগেশচন্দ্র যখন রাণীহাটের পথ ধরিয়া আপনার জীর্ণ অট্টালিকার দিকে চলিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। সুষুপ্ত গ্রামখানি নিস্তব্ধ। শ্রাবণ মাসের রাত্রি। একটু পূর্ব্বেই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতা হইতে টুপ টাপ করিয়া জলের ফোঁটা পড়িতেছে। গ্রামের ডোবাগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে অসংখ্য ভেকের কর্কশ স্বর উত্থিত হইতেছে। কালো মেঘের পর মেঘের স্তর আসিয়া জমিতেছে। চারি দিক যেন মসীলিপ্ত। আকাশে তারা নাই, চাঁদ নাই। বড় বড় গাছের ঝোপগুলির চারি পার্শ্বে দুই-তিনটি জোনাকীওলা কালো মখমলে খচিত চুমকির ন্যায় ঝিকমিক করিতেছে। সুগভীর ঝিল্লী-ধ্বনিতে আড়ম্বরহীন গ্রামের সরল সঙ্গীতরাশি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে।

গৃহের সম্মুখে আসিয়া যোগেশ ডাকিলেন, "বেহারী!" কোনও উত্তর পাইলেন না। যোগেশের বুকের রক্ত সোঁ সোঁ শব্দে মাথায় উঠিতে লাগিল। রক্তের এই সবেগ গতির শব্দটা যেন যোগেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। পায়ের কাছ দিয়া একটা সরীসৃপ সর্ সর্ শব্দে সরিয়া গেল। আশঙ্কা ও উদ্বেগে যোগেশের বক্ষঃস্পন্দন রহিত হইবার উপক্রম হইল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া যোগেশ আবার ডাকিলেন, "বেহারী!" "বাই" বলিয়া প্রদীপহস্তে

একখানা বুক টানিয়া বাক্স খুলিয়া দিল। একি বেহারী! এক রাত্রিতে এত পরিবর্ত্তন! বেহারীকে যে মোটে চেনা যায় না! যোগেশ কহিলেন, "বেহারী! আমি এসেছি।" মুখ তুলিয়া বেহারী কহিল, "কে? বাবা! এসেছ?" বেহারীর মুখ ফুটিল না। সে মস্তক নত করিয়া প্রদীপহস্তে চলিল; যোগেশও নির্ব্বাক স্তম্ভিতভাবে তাহার অনুসরণ করিলেন। যোগেশ কহিলেন, "বেহারী! বাড়ীর সব ভাল ত? কমল ঘুমুচ্ছে বুঝি?" কথাটা বলিতেই যোগেশের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততালে সম্পন্ন হইতে লাগিল। যোগেশ তাঁহার অভ্রান্ত সুলোচন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কত দিন, কত দিন পরে সজ্জিত কক্ষ, সজ্জিত শয্যা দেখিয়া যোগেশ যেন গৃহের সজ্জাকর্ম্মনিরতা লক্ষ্মী প্রতিমা কমলাকে দুই চক্ষে দেখিতে পাইলেন; এবং তাহার হাতের চুড়ির টুং টাং শব্দটাও না কি শুনা যায়! আজ যোগেশ গৃহে ফিরিয়াছেন,—পত্নীর অনুমতি লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন.—কমল কত সুখী হইবে! যোগেশ ভাবিলেন, "আঃ! এ কি বিরাট অপূর্ব্ব আনন্দ! কি অসহ্য হৃদয়প্লাবী সুখ!" যোগেশ কহিলেন, "বেহারী! কমল কোথায়?" বেহারী প্রদীপের শিখাটা একটু বাড়াইয়া দিয়া বাষ্পজড়িতকণ্ঠে কহিল, "স্বর্গে!" "সে কি কথা বেহারী! আমার কমল—?" যোগেশের মনে হইল, কে যেন তাঁহাকে অনেকখানি উর্দ্ধে তুলিয়া সহসা সবেগে একটা বিপুল অন্ধকারময় অতল গহ্বর-মধ্যে নিক্ষেপ করিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া যোগেশ কহিলেন, "কবে হল?" "আজ তিন দিন! কোনও মতে মাকে ধরে রাখতে পারলুম না,—কোনও মতে না,—উঃ!" কি যে মতে মরলে—ওঃ! আজ তিনটে দিন শুধু!" বেহারী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; তাহার হাত হইতে প্রদীপ পড়িয়া গেল। কক্ষ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। যোগেশও মাটিতে বসিয়া পড়িল।

আজ দীর্ঘকাল পরে যোগেশ গৃহে ফিরিয়াছেন। তাঁহার যে আনন্দে মহাদুর্ভাগ্য লক্ষ্মীর জন্য, তাঁহাকে আনন্দপূর্ণ মনের সহিত বিদায় দিবার জন্য, কেন তাহার প্রাণে সহিত আঘাত করিয়া লইবার জন্য, কেন তাহার প্রাণে আঘাত করিয়া বসিয়া নাই! আজ তাহার প্রতীক্ষাপরিপূর্ণা অন্তর-লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যোগেশের বাহুদ্বয় যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু হায়! সে ত নাই!—কাছে নাই, গৃহ আজি কোলাহল নাই!

সে অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আর ফিরিবে না—যোগেশচন্দ্রের সহস্র কাতর অনুনয়েও সে ফিরিবে না! একরাশি দীর্ঘনিশ্বাস আসিয়া যোগেশের অস্থিপঞ্জরগুলা চূর্ণ করিবার উপক্রম করিল।

তখন বাহিরে কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া বিদ্যুতের রোষদীপ্তি গৃহমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মত্ত পবন প্রলয়-হুঙ্কারে বিশ্ব-সংহারে উদ্যত হইল। সেই প্রবল ঝড়ে গাছের পাতা ও শুষ্ক ছোট বৃক্ষশাখাগুলি ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসিতে লাগিল; এবং বাহির হইতে যেন একটা তীব্র মর্ম্মান্তিক পরিহাসচ্ছলে যোগেশের নিষ্ফল আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বিস্মিত করিয়া উৎকট আনন্দে "হা, হা" করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে বিদীর্ণ হৃদয়ের সমস্ত বেদনা, সমস্ত শোক, সমস্ত হাহাকার করুণ-কম্পিত-স্বরে ঝঙ্কৃত করিয়া বিষাদ-কাতর যোগেশচন্দ্রের মর্ম্মের ভিতর হইতে একটিমাত্র বিলাপ-ধ্বনি উচ্চলোকবাসিনীর উদ্দেশে উত্থিত হইল,—"হা কমল!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্য।

—:*:—

রাজদরবারে প্রবেশলাভ করিয়া বঙ্গভাষা অনুবাদ-গ্রন্থগুলির দ্বারা নবশক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত এই ভাবে ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে ইহা এরূপ বিশুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, এখন ভারতীয় সকল কথিত ভাষার মধ্যে বাঙ্গালাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সংস্কৃতের অধিকতর সন্নিহিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এমন কি, বীমস্ সাহেব ইহাকে "তদ্ভব" আখ্যা প্রদান করিয়া হিন্দী প্রভৃতি ভাষা হইতে ইহার পৃথক পংক্তিতে আসন স্থাপন করিয়াছেন। "তদ্ভব" শব্দটি তিনি দণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দী প্রভৃতি ভাষা "তৎসম", কিন্তু বাঙ্গালা "তদ্ভব," অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গলা আদিকালে হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ন্যায়ই ছিল। কিন্তু গত ৪।৫ শত বৎসর কাল যাবৎ এই ভাষা উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ হওয়াতে, ইহা এখন অনেকপরিমাণে সংস্কৃতানুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আভিধানিক সংশোধনে ভাষার মূল তত্ত্ব রূপান্তরিত হয় না। যে নিয়ম হিন্দী,

পঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষায় লক্ষিত হয়, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য সত্ত্বেও বাঙ্গালা সেই নিয়মেরই বশবর্ত্তী। প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত ভাষাগুলি উত্তরকালে বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, গ্রীয়র্সন্ সাহেবের শ্রেণীবিভাগ আমাদের অনুমোদিত নহে। সমুদায় চেষ্টাই বাঙ্গালা ভাষার গতি সংস্কৃতের দিকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিল। অনুবাদ-সাহিত্য আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয়, বাঙ্গালা ভাষা কি ভাবে ক্রমে ক্রমে পরিশুদ্ধ হইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদ, মাণিকচন্দ্র রাজার গান, ডাকের বচন প্রভৃতি অতি প্রাচীন রচনায় গ্রাম্য ভাষাই প্রথমতঃ অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রাচীন পুঁথিতে এরূপ বহু শব্দ দৃষ্ট হয়, যাহা এখন আর লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। অনুবাদকারিগণ যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে চয়ন করিয়া বাঙ্গালার ভাণ্ডারে উপহার দিলেন, তাহা শুধু আর্দ্ধ মূলধনের ন্যায় উচ্চ সাহিত্যের অঙ্গীয় হইয়া রহিল না, কথিত ভাষায় তাহাদের প্রভাব অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। বাঙ্গালা ভাষা এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার সংস্কৃতমুখী গতি এখনও থামে নাই, বরং বর্ত্তমান সময়ে তাহা এত প্রবল হইয়াছে যে, এই ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের আয়ত্তাধীন করাইবার চেষ্টায় অনেকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

প্রাচীন পুঁথিতে কাতি (কার্ত্তিক মাস), পখা (পক্ষ), বিভা (বিবাহ), পুনি (পুনঃ), বিনি (বিনা), আই (মাতা), পইতায় (প্রত্যয় হয়), সিনেহ (স্নেহ), উমতি (উন্মত্ত), মিয়ঙ্ক (মৃগাঙ্ক), বাসা (বালক), লো (লঘু), ববিয়াতি (বরযাত্রী), আগুনারী (অগ্রসর হইয়া), আগল (অগ্রসর), জেঠি (জ্যেষ্ঠী), আগুনি (অগ্নি), গাবী (গাভী) প্রভৃতির প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়; এই সকল অপভ্রংশ শব্দ ক্রমে পরিশুদ্ধ হইয়া যুগোপযোগ সংস্কৃত শব্দে পরিণত হইয়াছে;—প্রাচীন অনুবাদ-সাহিত্যে এই শব্দ-বিশুদ্ধির চেষ্টা বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। কবীন্দ্র-রচিত মহাভারতে "কৌণী কম্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ। পুণ্যকীর্ত্তি গুণাধারী পরাগল খান।" কিংবা, "সূর্য্য সমান জ্যোতিঃ সহস্র বদন। চান্দি-প্রাণে কুরতেজঃ যেন কাল যম।" প্রভৃতি ভাবের সংস্কৃতাত্মক পদ প্রথম লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীধরদাসী মহাভারতে এই চেষ্টা বিশেষ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল;—"চলৎচ্ছশিসারূপ কিবা বরকণ্ঠী" "বিকচকমল, কমলাভিরতন" "নিরন্তর ইন্দুজ্যোতিঃ পীনঘনস্তনী।" "পদ্মপত্র

মুগ্ধমনের পরাণের শ্রুতি" প্রভৃতি পদ প্রায় খাঁটী সংস্কৃত। জয়দেবের গীত গোবিন্দের অনুবাদক গিরিধর-কৃত পদগুলি বাঙ্গালা না জানিলেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। বেনারস অথবা লিখিলে কাশী ও পুণার ব্রাহ্মণ-সভায় অনুবাদের রসাস্বাদনে কোনও বিঘ্ন হইবে না। একটি অংশ এইরূপ :—

"অমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ।
কর অভিলাষ, করি রতিরস, মদন মনোরথ বেশ,
গমনে বিলম্বন, না কর নিতম্বিনী, চল চল প্রাণনাথ-পাশে

* * * * *

অলি তমগুল, কুসুমে মিলি চল, নীল গুঞ্জনি নেহ অঙ্গে।"

কিন্তু এই অনুবাদ-সাহিত্যে কবি আলওয়াল যতটা সংস্কৃত-মূলক ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্য কোনও প্রাচীন কবি তাহা পারেন নাই। "প্রফুল্লিত কুসুম মনোহর, ঝঙ্কৃত, গুঞ্জিত পরভৃত কুঞ্জ রত রাসে। মলয় সমীর, সুগন্ধিত সুশীতল, বিকোলিত পাঁচ অতি রসভাষে। প্রফুল্লিত বনস্পতি কুটিল তমাল তরু, মুকুলিত চুতলত, কোরকজালে। যুবজন-হৃদয় আনন্দে পরি পূরিত অঙ্গ মালিকা মালতী মালে।" প্রভৃতি রচনায় সৃষ্টি হয়, সংস্কৃত-সাহিত্যজ্ঞ অনুবাদকগণ গ্রাম্য বাঙ্গালাকে এক নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আলওয়াল-রচিত সংস্কৃতাত্মক পদ্মাবতী গ্রন্থখানি পারসী অক্ষরে চট্টগ্রামে লিখিত পাওয়া গিয়াছিল।

কবিগণ অনুবাদকল্পে সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচর্য্যা করিতে যাইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে যে নূতন আদর্শ প্রদান করিলেন, তাহা অনুবাদ-সাহিত্যে সীমাবদ্ধ রহিল না, সমস্ত সাহিত্য-রাজ্যে সেই আদর্শ গৃহীত হইল। আনন্দময়ী দেবীর রচনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা বঙ্গভাষায় যে আকার লক্ষ্য করি, তাহা যদি সংস্কৃতের মত ললিত বলিয়া আমরা অঙ্গীকার করিতে নাও পারি, অন্ততঃ তাহার প্রতি ছত্র বুঝিতে যে ২।৩ বার করিয়া শব্দকল্পদ্রুম কি অপর কোনও সংস্কৃত অভিধান দেখিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং আনন্দময়ীর সমকালে ভারতচন্দ্র যখন কৃষ্ণনগরে বসিয়া "জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর মৃগাঙ্কশেখর হিমেশ্বর। জয় শ্মশান নাটক, বিষাণবাদক হুতাশভালক মহত্তর। জয় সুরারিনাশন, বৃষেশবাহন, ভুজঙ্গভূষণ জটাধর। জয় ত্রিলোকতারক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক,

মহেশ্বর লিখিয়াছিলেন, তখন উহা সংস্কৃত কি বাঙ্গলা, তাহা বুঝিয়া যায় নাই। বাঙ্গালা পুঁথিতে পাইয়া শ্লোকগুলিকে আমরা বাঙ্গালা বলিয়া পরিচয় দিতেছি।

কৃত্তিবাস ও কবীন্দ্রের মহাভারতের সময় হইতে ভাষার গতি সংস্কৃতের দিকে ফিরাইয়া শব্দ-শোধন করিবার যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এখনও কার্য্যকরী রহিয়াছে। প্রতি বৎসরই প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে তর্ক উঠিতেছে, এবং যে সকল শব্দ ব্যবহারসিদ্ধ হইয়া বাঙ্গালার চিরাগত-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক হইয়া গিয়াছে, এমন সুপ্রতিষ্ঠ শব্দগুলিরও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উৎপত্তি-স্থলে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। জুয়নাকের ছেটার বন্যাই এই উজান স্রোত প্রথম বহাইয়াছিল। ইহা কত কাল চলিবে, বলা যায় না।

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে অনুবাদ-গ্রন্থের সংখ্যা এত বেশী যে, সেকালের শাস্ত্রোক্ত উপদেশ ও আখ্যান কি ভাবে এত প্রচারলাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এই সকল অনুবাদ-পুস্তকে উচ্চশ্রেণীর কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই; তাঁহারা সংস্কৃত, পারসী ও আরবী পাঠ করিতেন; ভাষা-গ্রন্থের লেখক, পাঠক অনেকস্থলেই নিম্নশ্রেণীর লোক। আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির প্রায় সকলগুলিই সমাজের অধস্তন স্তর হইতে উদ্ধার করিয়াছি। সদ্গোপ, তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতির গৃহে প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের উপাদান সযত্নে রক্ষিত ছিল; মধুসূদন সাধিক্ত রচিত নলদময়ন্তী, গোবিন্দ কর্ম্মকারের করচা প্রভৃতি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন দেখা যায়, ইঁহাদের সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কালীচরণ গোপ, ভাগ্যবন্ত খুপী, রামলোচন গোপ, মাধব কাইত প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি-লেখকগণের সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসনীয়।

অনুবাদ গ্রন্থে বহুলনিবদ্ধ শাস্ত্রোক্ত কাহিনী যুগে যুগে প্রচারিত হইয়াছিল। অশিক্ষিত কাদম্বেকুল ব্যাধ যখন কলে নদীর তীরে মুক্তাফল আহার করিতে প্রলোভিত চিত্তে আপনাকে সংযম দিতেছে, কিংবা ফুল্লরা যখন ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে বিবিধ পুরাণ হইতে নজীর উদ্ধৃত করিয়া স্বামি-ভক্তির উপদেশ দিতেছে, অথবা খুল্লনা ও রঞ্জাবতী যখন নিজের দুঃখ জানাইবার জন্য ঠাকুরাণীর যে প্রাচীন পাত্র হইতে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছে, তখন তাহা কবিগণের অতিরঞ্জন বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি নাই।

সাহিত্যভাবে আমাদের পল্লীগুলি এখনও পরিপূর্ণ; ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কোনও দেশের অধঃস্তর সৎ সাহিত্যের সহিত এরূপ পরিচয় করিতে পারে নাই, এই জন্য অপর দেশের নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করিলে তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অতীব প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইবে। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদই অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে; দর্শন সম্বন্ধেও দুই একখানি বাঙ্গালা প্রাচীন পুস্তক দৃষ্ট হইয়া থাকে; সেগুলি অনুবাদ বলিয়া ঠিক স্বীকার না করা গেলেও, সংস্কৃত-গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতিরও প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদের কথা আমরা বিক্ষিপ্তসূত্রে শুনিয়াছিলাম, তাহা হস্তগত করিতে পারি নাই। স্মৃতিগ্রন্থ-সমূহের বাঙ্গালা অনুবাদ কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে; পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র তাঁহার গৌরীমঙ্গল কাব্যের মুখবন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের যে তালিকা দিয়াছিলেন, তাহাতে স্মৃতি-অনুবাদক মাধবল্লভ শর্ম্মার নামে উল্লিখিত আছে। সুতরাং অনুবাদ-চেষ্টা যে নানা দিকে প্রসারিত হইয়া বাঙ্গালার পল্লীসমাজের অধস্তন স্তর পর্য্যন্ত হিন্দু-সভ্যতায় আলোকে আলোকিত করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুসংখ্যক গ্রন্থের উদ্ধার হইয়াছে; কিন্তু যে সকল পুঁথি গত ৪।৫ শত বৎসরের মধ্যে নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের তুলনায় প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা নগণ্য। আমরা এখানে সংক্ষেপে প্রসিদ্ধ অনুবাদ-গ্রন্থগুলি ও তাহাদের রচকগণের বৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি।

রামায়ণ।

রামায়ণের প্রথম অনুবাদ-প্রণেতা কৃত্তিবাস ১৪৪১ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ-সংক্রান্তির দিন ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সে দিন শ্রীপঞ্চমী, চারি দিকে পূজার কাঁসর বাজিতেছিল; সেই উৎসবের দিনে নবাগত শিশুটির প্রতি সরস্বতী যে কৃপা-হাস্যের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী। পিতামহ মুরারি ওঝা দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ সাধু ব্যক্তি ছিলেন। কবি অনেক-স্থলেই ভণিতায় আপনাকে মুরারি ওঝার নাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন। তিনি পিতামহের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"মদয়হিত ওঝা সুন্দর মুরতি। মার্কণ্ডেয় ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি।" কবি তাঁর সুদীর্ঘ আত্মপরিচয়ে তাঁহার পারিবারিক যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহারা বয়াল কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম "শ্রীহর্ষে"র বংশধর, কুলিয়ান অধিত হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ। ভবানন্দের মহাবংশাবলী গ্রন্থে এই ছত্রটি পাওয়া যায়,—"কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সাধ্যো শান্তজনপ্রিয়ঃ।" কবি গৌড়েশ্বরের যে রাজ-সভার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা কৌতুকাবহ। সোনার মোঠা হাতে রাজদূত নয় মহল পার করিয়া রাজ-সভায় উত্তীর্ণ করিয়া দিল; তখন মহা-ধুম। কেদার খাঁ, জগদানন্দ প্রভৃতি পাত্র মিত্রে বেষ্টিত হইয়া গৌড়েশ্বর রৌদ্র পোহাইতেছিলেন; আঙ্গিনায় বিস্তৃত রক্তবর্ণ মাদুর প্রসারিত; পট্টবস্ত্রের চাঁদোয়া খাটান ছিল; তন্নিম্নে সিংহাসনারূঢ় গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে হস্তের ইঙ্গিতে সম্মুখে আসিতে আদেশ দিলেন; কৃত্তিবাস এই উপলক্ষে যে পাঁচটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া রাজসভা মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং কেদার খাঁ কবির মস্তকে চন্দনের ছড়া বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে ইচ্ছানুরূপ দান যাচ্ঞা করিতে বলিলেন। কৃত্তিবাস বলিলেন, তিনি কাহারও দান গ্রহণ করিবেন না,—"যথা তথা নাই গৌরব যাত্র সার।" রাজাজ্ঞায় তিনি সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনুবাদ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। সভা হইতে বাহির হইয়া আসিলে; "চলনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। সবে বলে ধন্য ধন্য কুলিয়া-পণ্ডিত।" রামায়ণ তিনি যৌবনে আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ কাণ্ড পর্য্যন্ত পহুছিতে বোধ হয় তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, এক খানি পুঁথির শেষ-কাণ্ডের ভণিতায় এই ছত্রটি দৃষ্ট হয়,—"রচিলা কৃত্তিবাস শ্রীশশীকলেবর।"

কবি নিজে কোনও দান বা পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে যে মহা দান দিয়া গিয়াছেন, তাহার অমৃত-ফল সমস্ত বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে পাঁচ শত বৎসর যাবৎ পরিবেশন হইতেছে। তাহাতে কখনও লোকের অরুচি হয় নাই। অন্যান্য যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী লেখকগণের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকগণের নাম উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে আদি অনুবাদকগণের নাম ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু কৃত্তিবাসের পরে আরও বহু লেখক রামায়ণানুবাদে হস্তক্ষেপ করিলেও, কেহ আদি কীর্ত্তিকে ছাপাইয়া উঠিতে পারেন নাই;—ইহা দ্বারাই তাঁহার রচনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধ হইবে।

কৃত্তিবাসের প্রাচীন পুঁথিগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার অনুবাদে মূল-বহির্ভূত, তরণীসেন, বীরবাহু, মহীরাবণ প্রভৃতির যুদ্ধ ও

রামচন্দ্রের চণ্ডীপূজা, রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন, অঙ্গদের রায়বার, এ সকল কিছুই গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই; এ সকল অংশ পরবর্ত্তী কবিগণের রচনা; তাঁহার কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যবিষয়ক অধ্যায়ে আমরা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। কৃত্তিবাস অনেকাংশে মূলের অনুগামী হইয়া অনুবাদ নূতন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সাধারণ পাঠক বাল্মীকির কবিত্ব যতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তিনি তাহাদিগকে ততটা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন; যাঁহাদের কূপোদকেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাঁহাদের জন্য বৃহৎ সরোবর-খনন নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণের উচ্চ-কবিত্ব বঙ্গের সাধারণ পাঠক আয়ত্ত করিতে পারিবে না বুঝিয়া, তিনি রত্নাকরের কাব্য-সিন্ধু হইতে বিন্দুকে সেঁচিয়া কয়েকটি লহরী আনিয়া দিয়াছিলেন মাত্র; তাহাতেই এদেশের পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার অমর-কমনকার পড়িয়া গিয়াছে।

মিলন।

—:০:—

এ কি রূপ,—এ কি রূপ, অপরূপ সুন্দর!
নব নব সৌন্দর্য্যের কি লীলা-নির্ঝর!
ওঙ্কার-ঝঙ্কারে পূরি' অসীম অম্বর,
গম্ভীর মধুর মন্দ্রে বাজে কি বাঁশরী!
এ কি দীপ্তি—এ কি তৃপ্তি সুধা-প্রস্রবণ,
এ কোন নন্দন-গন্ধ জুড়াইল প্রাণ!
এ কি স্পর্শ—অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পবরিষণ,
অগ্নি-সাগর-মাঝে এ কি পুণ্য-স্নান!
শত ব্যর্থ অভিসার—বিরহ-বেদন
কি বিস্ময়! সে কি ভ্রান্তি—উন্মত্ত স্বপন!
তব আলিঙ্গনে বদ্ধ রহি' অনুক্ষণ
দেখিনু কি দুঃস্বপন,—সহিনু যাতনা?
সেই তুমি—সেই আমি, হে প্রাণবল্লভ!
এই সে চরণস্বর্গ—নিখিল-দুর্লভ!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

—:o:—

ভারতের পরী-কাহিনী।

Morning Post-এর এক জন লেখক, সম্ভবতঃ ইংরেজ, ভারতীয় উপকথা যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়া একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সুসম্বদ্ধ মত এবং যে উপকথার উল্লেখ করিয়া লেখক এই মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার সারসঙ্কলন করিলাম।

লেখক বলিতেছেন, ভারতবাসিগণ উপকথা-বর্ণনে তাঁহাদের উচ্চতম কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। উপকথার ভাণ্ডার পৃথিবীর অন্য জাতিরও যেমন, ভারতবাসীদিগেরও তেমনই। কিন্তু তাঁহারা এই বিষয়ে অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ঘটনার পর ঘটনা এক নিশ্বাসে এমন হুহু করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, গল্পের উপসংহার করিবার পূর্ব্বেই নূতন ঘটনার স্রোত আসিয়া পাঠকের কৌতূহল বর্দ্ধিত করে। তাহারা গল্পের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ধীরে ধীরে এমন কৌশলে গ্রথিত করিয়াছেন যে, উত্তরোত্তর গল্পের ভাব ও মাধুর্য্যই বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহারা ঘটনা সকল শুধু নীরস ঘটনারূপে বর্ণনা করেন নাই; সেই সকল ঘটনা লইয়া একটি বেশ সুসঙ্গত পরিণতিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই সকল ঘটনা মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনে লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা এই সকল ঘটনা এক দিকে যেমন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, তেমনই আবার তাহার সরলতা ও নিগূঢ় ভাব দেখিয়া কেবল উপকথামাত্র বলিয়া স্বীকার করিতেও ইচ্ছা হয় না।

ভারতবাসীরা তাঁহাদের উপকথায় দৈবশক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এই সকল উপকথায় দৈব-শক্তি লইয়া মানুষ মানুষকে অভিভূত করিবার বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষে যে সেই অমানুষিক শক্তির পেষণে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহারও বর্ণনা দেখিতে পাই। ভারতীয় উপকথা-ব্যতীত অন্যান্য জাতির উপকথায় এত নিগূঢ় ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাধারণের অবগতির জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দুই চারিটি উপকথার উল্লেখ করিব। সকল জাতিই যাদুকরকে নানা মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে সক্ষম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সকলেই বলেন যে, এই যাদুকরেরা পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য নানা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শক্তির পরীক্ষা করিয়া থাকেন। 'ঋগ্বেদ' ও ইউরোপের 'এডা'র গল্পসমূহে বস্তু-যুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়।

ভারতবাসীরা এই সকল গল্প এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—প্রথমতঃ দু' জন যাদুকর সাথী হইয়া পরস্পরকে পরাস্ত করিবার জন্য দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিবার পর, এক জন রাজ-কন্যার হাতের অঙ্গুরী হইল; আবার মানুষের আকার গ্রহণ করিয়া সেই রাজ-কন্যার নিকট হইতে অঙ্গুরী ক্রয় করিল। তখন সেই অঙ্গুরী ঘরের বীজ হইল। আবার মোরগ হইল, এবং সেই ঘর খাইতে আরম্ভ করিল। শেষে ঘরের রাজটি ঘুরাণ হইয়া মোরগটিকে মারিয়া ফেলিল। এই সকল উপকথায় এমন আশ্চর্য্য রূপান্তর-প্রকরণের নিদর্শন পাওয়া যায় যে, পাঠক নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পান না।

এই যাদুকরেরা সর্ব্বদাই পরস্পর পরস্পরের হস্তে জীবনসঙ্কট করিয়া প্রস্তুত হইতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত পাঠক নিশ্চিত হইতে পারেন না যে, কে বিজয়ী, বা কে বিজিত হইবে। অবশেষে যখন শেষের পাতা উল্টাইয়া যায়, তখন দেখিতে পাই,—সেই আমার উল্টিয়া তাহার বিজয়ী শত্রুর জীবনসংহার করিয়া আপনাকে মুক্ত করিল! এই প্রকার উপকথা পৃথিবীর এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। আর একটি আশ্চর্য্য উপকথা এই:—এক ব্যক্তি কতকগুলি কৃষকদের মাঠে চাষ করিতে দেখিয়াই অস্থির হইয়া পড়িল, এবং তাহার এই দুঃখের কথা আর এক জনের নিকট বলিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল যে, তাহার মুখে এই কথা শুনিয়াই তাহার পেটে কামড়ানি ধরিল।

ভারতীয় সাহিত্যে এই মর্ম্মের একটি অতি আশ্চর্য্য গল্প আছে। এক দিন একটি গল্প এক রাণীর কোলের উপর পড়ে। তাহাতেই রাণী আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার কিরণে আর এক রাণীর গায়ে দেওয়া হইল। এক রাজ-রাণীর হাসানবিস্তার শব্দ শুনিয়া ছোড়া হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, এই তিন রাণীর মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা কোমলাঙ্গী? যে রাণীর নাম শুনিয়াই ছোড়া হইল, তিনিই প্রথমা। কেন না, অপর রাণীরা স্পর্শজ্ঞান হইতে ক্লিষ্ট হইলেন: কিন্তু তৃতীয়া রাণী শ্রবণমাত্রেই কুণ্ণা হইলেন। ভারতীয় উপকথার সৌন্দর্য্য এই যে, ইহাতে এক সঙ্গে তিনটি গল্পের অবতারণা করা হইল; কিন্তু অন্যান্য দেশের উপকথায় একটিমাত্র গল্প লইয়াই কথা।

গ্রীস দেশে এই প্রকার গল্পের অভাব নাই। এক জন গোলাপের শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। যখন তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই কাহিনীর অতি আশ্চর্য্য পরিণতি দেখা যায়। এক যুবক সাতটি পরী উপর্য্যুপরি পাতিয়া তাহার উপর শয়ন করিলেন; কিন্তু সেই সাতটি পরীর নীচে এক খাড়া চুল ছিল; সেই চুল তাঁহার পিঠে ফুটিতে লাগিল। এই যুবকের আর দুটি ভাই ছিল। এক ভাই এক দিন এক রাজবাড়ী ভাত খাইতে বসিয়া ভাতে মড়াপচা গন্ধ পাইলেন। বস্তুতই সেই রাজ্যের সন্নিকটে সেই চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। আর এক ভাই একটি সদ্যঃপ্রসূতা বালিকার গায়ে ছাগ-গন্ধ অনুভব করিলেন। এই বালিকাটি শৈশবে ছাগদুগ্ধ পান করিয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, এই তিন ভ্রাতার মধ্যে কাহার অনুভব-শক্তি অধিক? ভারতবর্ষে প্রথম ভ্রাতারই শ্রেষ্ঠ নির্ণয় পুরস্কৃত হইয়াছে; কেন না, প্রথম ভ্রাতার অনুভব শক্তি তাহার শরীরের সূক্ষ্মতম প্রমাণ দিয়াছে।

আর একটি আশ্চর্য্য ভারতীয় পরী-কাহিনী আছে।—এক ব্যক্তি একটি বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে খুদিয়া একটি রমণী-মূর্ত্তি প্রস্তুত করে। দ্বিতীয় এক জন সেই মূর্ত্তি ভূষিত করিল; তৃতীয় ব্যক্তি তাহাতে ভাব-ভঙ্গীর যোজনা করিল; চতুর্থ ব্যক্তি প্রাণদান করিল। এখন প্রশ্ন, যে এই সুন্দরী রমণী পাইবার অধিকারী?

ইয়ুরোপীয় এই কাহিনীর উপর তুরস্ক দেশের লোকে আরও মসলা চড়া করিয়াছেন। তাঁহারা পাঁচজনের জন্য এক জন দরজেশ, পুলিস ও কাজীকে ডাকিয়াছেন। তাহারা সকলেই সেই রমণীকে আত্মীয় বলিয়া লইয়া যাইতে চান, এবং বলেন যে, কেহ কিসের দাবী

আসিয়া আশ্রয়াছে। তখন তাহাকে চিনিয়া বাহির করিবার কোন উপায় ছিল না। আমিকা যে গাছের ডালে ঝুলিতে দোলিত হইয়াছিল, সেই গাছ কাঁক হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মঙ্গোলিয়ানেরা এই গল্পের আর একটি গল্পের সহিত মিশাইয়াছে। একটি রাজ-কন্যা মরা কেহ না। তাহাকে কবর দিতে হইবে। তখন এক রাজা আসিয়া সেই রাজ-কন্যার নিকট ভাই-গন্ধ করিলেন। কিন্তু রাজ-কন্যা কোনও কথাই কহিলেন না। তখন রাজা এমন অসম্ভব কথা বলিলেন যে, রাজ-কন্যা হাসিয়া উঠিলেন,—মেয়ের বাপ মেয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, মেয়ের মা তাহাকে ভূমিত করিয়াছে; তাহার শিক্ষক তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে, এবং তাহার স্বামী তাহার জীবন দান করিয়াছে।'

ভিক্টর হুগোর অপ্রকাশিত পত্র।

"লে মিজরেবল্" গ্রন্থপ্রণেতা উপেক্ষা।

সম্প্রতি "লেক্চুর্ স্যাগাজিন" নামক সাময়িক পত্রে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচনায়,—ইতিপূর্ব্বে এই পত্রখানি আর কোথাও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। হুগো ইতালীয়ান কোনও বন্ধুর নিকট পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ "Les Miserables" নামক উপন্যাসখানির রচনা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এই পত্রে অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কতিপয় ইতালীয় সমালোচক মত প্রকাশ করেন যে, এই উপন্যাস-খানি ফ্রান্স ও ফরাসী জাতির তদানীন্তন অবস্থায় প্রকৃত চিত্র বটে, কিন্তু ইতালীর সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য নাই। ভিক্টর হুগো তদুত্তরে বলেন যে, গ্রন্থখানি কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নহে। উহা সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব লোকের উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছে।'

তিনি লিখিয়াছেন, "সামাজিক নিয়মের সীমান্তপ্রদেশের বাহিরেও বিদ্যমান। নরক পাতিয়া ভূগর্ভ-স্তর,—যে বিরাট ভূগোলীর কক্ষ সমগ্র বিশ্বমানবের হৃদয়ে বিরাজিত, তাহার পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্কিত নীল ও রক্ত রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। যে দেশের মনুষ্য মূর্খ, অত্যাচারে-নিষ্পেষিত ও আধাপেটা, যে দেশের নারী অন্নের জন্য আত্মবিক্রয় করে, সতী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, যে দেশের শিশু পাঠ্যপুস্তকের অভাবে মূর্খ, যুদ্ধের সুখনীড়চ্যুত, সেই দেশ, সেই সমাজের কুটীরে কুটীরে রক্ত-ধারে করাঘাত করিয়া "Les Miserables" বলিয়া চেঁচায়, 'দ্বার খোল, আমি তোমার সুখই এখানে আসিয়াছি।' সভ্যতার যে স্তরে এখন আমাদের স্থান,—উহা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে স্তরের স্থানে চিরদুঃখী, চির-হতাশার। সর্ব্ব দেশের সর্ব্বত্রই যে অনন্ত কষ্ট সৃষ্টি করিতেছে, সমাজ তাহার সমাধি যন্ত্রণার তীব্র আলা সহ্য করিতেছে।"

"ইতালীর আকাশে যে সূর্য্যদীপ্তি পাইতেছেন, তিনি সুন্দর, তাঁহার রশ্মিজাল মনোরম, স্বীকার করি; কিন্তু আকাশের নীলিমায় রাত্রির ছিন্ন বসনের অভাব কি ঘুচে?"

"আমাদের ন্যায় তোমাদের মধ্যেও অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অত্যাচার, ধর্ম্মোন্মাদ বিদ্যমান। তোমাদের দেশেও অন্ধ বিধানের বলে ভিত্তিহীন রীতি নীতির উদ্ভব হইতেছে। অতীতের সুবাসে ও সুগন্ধে চর্চ্চিত না হইলে তোমরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কোনও বস্তুই স্পর্শ করিতে চাহ না। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও নাই। তোমাদের মধ্যেও অসভ্য মঠধারী সন্ন্যাসী ও বর্ব্বর ধর্ম্মযাজক বিদ্যমান। আমাদের ন্যায় তোমাদের দেশের সামাজিক সমস্যাও জটিল। তোমাদের দেশের জনসাধারণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে, ক্ষুধার জ্বালায় কম মরে, কিন্তু ব্যাধির যন্ত্রণায় মৃতের সংখ্যা অধিক। আমাদের অপেক্ষা তোমাদের দেশের জলবায়ুর অবস্থাও অধিক উন্নত নহে। প্রোটেষ্টাণ্ট-রূপে যে গাঢ় মেঘমালা ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-গগনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ইতালীতে তাহাই ক্যাথলিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত। কেবল সংজ্ঞায় পার্থক্যমাত্র। বিশপ ও ভেন্‌কোভো (Vescovo) মধ্যে অন্য কোনও পার্থক্য নাই। উভয়েই সংস্কারের বিরুদ্ধবাদী। বাইবেলের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা ও ভগবদ্বাক্যের ভিন্ন অর্থ,—এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য।

"তোমাদের দেশে দরিদ্র নাই? তোমাদের মধ্যে পরান্নভোজীর সংখ্যা অল্প? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ দেখি, দেখিতে পাইবে, চক্ষের সম্মুখে মানবও দুলিতেছে, উহার এক অংশে দারিদ্র্য-পীড়িত মুমূর্ষু, অপরাংশে পরান্নভোজী,—উভয়েরই পরিমাণ সমান।

"আমাদের ন্যায় তোমাদের দেশেও কি সমর-ব্যয়ের বিরাট তালিকা, শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্পে কৌতুকোদ্দীপক ব্যয়ের বর্দ্দ প্রস্তুত হয় না? তোমাদের নিষ্ঠেষ্ট বন্ধুতাবীকারের ফলে কি অনায়াসে বর্ব্বর ক্ষাত্র-নীতির উদ্ভব হয় নাই? তোমাদের দেশের সামরিক-বিধান-যন্ত্রে সৈন্যগণ মহামতি গারিবল্ডীর উপরেও অগ্নিবর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল,—তখনও শাসন-শৃঙ্খলা অভগ্ন ছিল না কি? গারিবল্ডীর প্রতি অগ্নিবর্ষণ করা আর ইতালীর মূর্ত্তিমান গৌরবস্তম্ভ চূর্ণ করিবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করা, একই কথা নহে কি?

"তোমাদের সামাজিক শৃঙ্খলার বিষয় আলোচনা করা যাক্। তোমাদের দেশের রমণী ও শিশুদিগকে লইয়া প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে। এই দুই দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য, উহাদের রক্ষাকল্পে সমাজের মনোযোগ প্রভৃতিতে সভ্যতার ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্যারী নগরীর স্বাধীনতাদিগের অবস্থা কি নেপল্‌সের অধিবাসীকুলের অপেক্ষা শোচনীয়? আমাদের ন্যায় তোমাদেরও কি দুইটি বিষয়ে ধর্ম্মযাজকের প্রচারে ধর্ম্ম ও বিচারকের দ্বারা বিচারিত সামাজিক ব্যবস্থা, এই দুইটি বিষয়ের কি নিদারুণ অধঃপতন সংঘটিত হয় নাই? হে ইতালীবাসিগণ! ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ জনসাধারণের সহিত তোমাদের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। হায় বন্ধু! হায় ভ্রাতঃ! তোমরা আমাদেরই ন্যায় হতভাগ্য, আমাদেরই ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত।"

অতঃপর ভূগো লিখিতেছেন,—'Les Miserables' আমাদের ন্যায় তোমাদেরও অবস্থার দর্পণস্বরূপ। অবশ্য কেহ কেহ এই গ্রন্থের প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিয়া থাকেন সত্য; তাহার কারণও আমি অবগত আছি। দর্পণে সত্য-প্রকটিত স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। তাই দর্পণ অনেকের ঘৃণার সামগ্রী। কিন্তু তথাপি সে মানবের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ, সেজন্য তাহার ব্যবহারে পরাঙ্মুখ নহে। আমার বক্তব্য এই যে, আমি জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের ফলে

মর্ত্যলোকের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। কেবল সন্ন্যাসীদিগের কথাই তখন আমার মনে ছিল না। যৌবনের পথে আমি যতই অগ্রসর হইতেছি, সমগ্র মানবজাতির প্রতি আমার ভালবাসার প্রতি ধীরে ধীরে তত্তই বর্দ্ধিত হইতেছে।"

পত্রের শেষাংশে হুগো দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে লিখিয়াছেন,—"আমাদের সকলেরই সহিত দুঃখের সম্বন্ধ। যখন ইতিহাস প্রথম রচিত হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র যখন সর্ব্বপ্রথম মানব-মস্তিষ্ক হইতে আবির্ভূত হয়, তখন হইতেই চিরন্তন দুঃখ মানবজাতির ভূষণ হইয়াছে। হায়! সে দিন কবে আসিবে, যে দিন মানবদেহ হইতে এ ধের ছিন্ন জীর্ণবাস খসিত হইয়া পড়িবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আনন্দের নবীন স্বর্ণউষার উজ্জ্বল বসনে মানবদেহ সুশোভিত হইবে!"

এরূপ পত্র সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহা না বলিলেও চলে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারত-মহিলা।—বৈশাখ। এই সংখ্যায় 'ভারত-মহিলা' তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। 'ভারত-মহিলা'র ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীমতী হেমলতা সরকারের 'নারীজাতির শিক্ষা' আলোচনার যোগ্য। 'বীরকুমার-বধ'-রচয়িত্রীর 'পাপাবসান' নামক কবিতাটি চলনসই। শ্রীযুত হারিদেব শাস্ত্রীর 'দয়াময়ী বৌদ্ধমহিলা' উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীযুত রজনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রৌঢ় বয়সে কবিতা-কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন;—'কাশীবাসী-দর্শনে' তাহার প্রমাণ। শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'প্যারী-সুন্দরী' মুখবন্ধ বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। প্যারীসুন্দরী কুক্ষিগত করিয়া অমলে নীলকর-বিষয়ের বিষদন্ত চূর্ণ করিয়াছিলেন। এই দুর্দ্দিনে প্যারীসুন্দরীর অন্তর্ধান বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন পরিতাপের বিষয়, তেমনি 'আইন্‌-বিজ্ঞান' গৃহলক্ষ্মীদের উপযোগী ও উপকারী। 'ঐতিহাসিক বীরত্বান' প্রবন্ধে প্রকাশ 'সোনাবিবি'র কাহিনী কথিত হইয়াছে। শ্রীমতী রাজকুমারী বসের 'পৌরোহিত্য কর্ম্মবাদ' ও শ্রীযুত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর 'সতীত্ব-ব্রহ্মচারিণী ও হকতলী মাতা' উল্লেখযোগ্য। এবারকার 'ভারত-মহিলা' চারিখানি চিত্রে সুশোভিত;—১ম,—বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, জাপানী সুবর্ণমূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি। ২য়,—কাশী। ৩য়,—মৃত খ্রীষ্টমূর্ত্তি। ৪র্থ,—মহিলা-কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। চিত্রগুলি প্রশংসনীয়।

ভারতী।—বৈশাখ। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ভারতী' নামক কবিতাটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। 'ভ্রান্তি' ও 'প্রভাতে', 'প্রতিধ্বনি' ও 'উদ্‌গিরণ', 'তাপস' ও 'তমসে' মিল অত্যন্ত কষ্টকল্পনা,—এত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কবিতা লিখিতে নাই। 'কর্ম্মফলোচনা'র বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত গঙ্গানাথ দেবশর্ম্মার 'পূর্ণানন্দগিরি ও শঙ্করাচার্য্য মহাশয়' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত দুর্গাদাস ঠাকুর 'শক্তিতত্ত্বে' অন্নের রহস্য'

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত' উল্লেখযোগ্য,—প্রাদেশিক 'মাসিকে'র উপযোগী। মফঃস্বলের মাসিকে আমরা এইরূপ স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতি দেখিবারই আশা করি। দুঃখের বিষয়, মফস্বলের সহযোগীরা এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। শ্রীযুত পাঁচকড়ি দের 'গোবিন্দরামের কীর্ত্তি' নামক উপন্যাসের সূচনায় কোনও বিশেষত্ব নাই।

জাহ্নবী।—বৈশাখ। তৃতীয় বর্ষে 'অশ্রুকণা'র কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'জাহ্নবী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 'জাহ্নবী'র সৌভাগ্য; কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের সৌভাগ্য কি না, বলিতে পারি না। সম্পাদকের গুরু-ভার কবি-কল্পনার সখা নহে; বরং শত্রু;—ইতিপূর্ব্বে কবি-সম্পাদকের জীবনে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। প্রুফ্, প্রবন্ধ, গ্রাহক ও পাঠকের তাড়ায় 'মানসী' স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হন। তথাপি আশা করি, সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'জাহ্নবী'র পূত ধারায় বাঙ্গালা সাহিত্য সরস উর্ব্বর ও পবিত্র হউক। শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর 'মাঙ্গলিক' পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অন্নপ্রসঙ্গে' লিখিয়াছেন,—'দেশের অন্ন দেশে থাকুক; দেশের লোক দু'বেলা দু'মুঠা উদরপূর্ণ করিয়া আহার পাউক।' পবিত্র কামনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের অন্ন দেশে রাখিবার উপায় কি? অবাধ-বাণিজ্য রহিত হইলেই নিরন্নের অন্নসংস্থান হইবে, এমন আশা করা যায় না। নিরন্ন যাহাতে অন্ন ক্রয় করিতে পারে, তাহার তদুপযোগী অর্থ-সংস্থান আবশ্যক। মহাজনের গোলায় ধান মজুদ থাকিলে নিরন্নের ক্ষুধা মিটিবে না। শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'গীতায় ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে হীরেন্দ্র বাবুর 'গীতায় ঈশ্বর-বাদে'র সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'কেন্দ্রবিন্দু' সঙ্ক্ষিপ্ত, কিন্তু সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন,—'পুংকীট ও স্ত্রীডিম্বের কেন্দ্রবিন্দু যদিও অতীব ক্ষুদ্র, তথাপি উপরি-উক্ত বংশানুক্রমিক উপাদানের তুলনায় উহাও কত বৃহৎ! উহারই মধ্যে বহু পুরুষের দৈহিক উপাদান সঞ্চিত আছে; সুতরাং সে উপাদান এত ক্ষুদ্র, এত সূক্ষ্ম যে, কল্পনাই করা যায় না। বৈজ্ঞানিক স্থূলদেহের অভ্যন্তরে এক সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইহা কি তাহাই?' শশধর বাবুই এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন। শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি মন্দ নহে। শ্রীযুত জলধর সেনের 'সুষমা' নামক গল্পটি চলনসই,—সুপাঠ্য। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বৌদ্ধযুগের ধর্ম্মপ্রচারকগণ' নামের তালিকা। শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'সাহজাহানের অবরোধ' সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। সর্ব্বশেষে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বদেশ' নামক একটি কবিতা,—'মধুরেণ সমাপয়েৎ'।—

'আমার ভারতভূমি!
ডালা ভরি' লয়ে ষড় ঋতুদল
অঞ্চলে তব ঢালে ফুলফল,
নীরবে আশিষ করে হিমাচল
তব মস্তক চুমি।
তব কোলে বাস মম।
ধন্য সে কোল ঋষির পরশে
দেবতা পূজার পুষ্প বরষে,
গঙ্গাধারায় পুলক হরষে,
সে কোল পুণ্যতম।

সিন্ধু তোমার পায়ের ধুলায়, হেমন্তদেবের আশিস্ধারা
নিত্য তাহার ললাট বুলায়, যে তোমে তুমি নন্দিত্রছে নাম,
চরণে মলয় চামর দুলায়,— যে তোমে তীম লভিলা বিরাম
আমার জননী তুমি সেই তোমে নমোনমঃ—
হে মোর ভারতভূমি! সেই তোমে বার বার।'

কিন্তু 'হিমালয় ভারত-ভূমির মস্তক চুম্বিয়া আশিষ করিতেছে—এমনটি সুন্দর হইলেও এটুকু উক্তি—প্রস্তাব। হিমালয় যেদিন ভারতভূমির মস্তক চুম্বন করিবে, সে ওক্ত মহা প্রলয়ের দিন আসিবে? তখন ভারতে 'স্বরেশী' থাকিবে না, গোমেলাও থাকিবে না; 'আফিমী' থাকিবে না, সাহিত্যও থাকিবে না; কীর্তনের অধীনতা থাকিবে না, বিদেশীর স্বেচ্ছাচার—ন্যায় মানবও থাকিবে না। হায় দেবতা, ভারতভূমির সে শুভদিন কবে আসিবে, যে দিন চুম্বনলোলুপ হিমালয়-রূপ হাবান-বিস্তার ভারতভূমির সব গুঁড়া হইয়া যাইবে!—আমরা নির্বাণমুক্তি লাভ করিব। কিন্তু 'সিন্ধু তোমার পায়ের ধুলায়, নিত্য তাহার ললাট বুলায়, চরণে মলয় চামর দুলায়, অতি সুন্দর, মহাকবির উপযুক্ত।

বঙ্গদর্শন।—ইহাতে। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য' বড় কঠিন। লেখক 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব' ও 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধের ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ত্তমান-প্রবন্ধের রচনা করিয়াছেন; কিন্তু এ প্রবন্ধেও তাঁহার বক্তব্য বিষয় হয় নাই। শ্রীযুত বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লেখকের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে। আর স্বভাব-কবির স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসে এবারটিও গুরু কারিগরী-সাহিত্যও সরস ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের 'স্বরের জমিদার' প্রবন্ধ আলোচনার যোগ্য। লেখক বিশেষজ্ঞ, দূরদর্শী ও চিন্তাশীল। তাঁহার পরামর্শ জমীদারমণ্ডলের চিন্তনীয়। প্রবন্ধটি অবশ্য প্রত্যেক পরামর্শে কর্ণপাত করিবেন না। অতএব, সে আশায় উৎফুল্ল হইব না। 'রাজ-তপস্বিনী' ও 'হরিমতির অন্বেষণ' চলিতেছে। শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। প্রতিভার বন্দনা—ভক্তির উচ্ছ্বাসে পবিত্র হইয়াছে। 'বাজকুমার' গল্পটি এত অসাধারণ যে, বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়া কুত্রিমতার রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে। স্বচ্ছ সুন্দর সরল ভাষায় চিরপ্রিয় লেখকের পরিচয় পাইয়া আশার আনন্দে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম, কিন্তু পাষাণের নিতান্ত-পর কৃত্রিমের দেশে মানব-হৃদয়ের পবিত্র ভাব-গঙ্গা-প্রবাহানুভূতির সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি। যে গল্পে সত্য-বিশ্বাস ও ওজস্বিনী সহানুভূতির অভাব, তাহাতে কৌতুক উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু তৃষাতুর তৃপ্তির পিপাসা কোনও মতে নিবারিত হয় না। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'প্রাচীন সাময়িক চিত্রের' 'অভিষেক-সপ্তদশীর' উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

ভারতীয় পুরাবৃত্ত।

—:০:—

আমাদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ স্বদেশের ইতিহাস অপেক্ষা বিদেশের ইতিহাসে অধিক অভিজ্ঞ। স্বদেশের ইতিহাসের কথা হইলেই তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন, "আমাদের দেশের পাঠোপযোগী ইতিহাস নাই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন।" কিন্তু আমরা সে ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টামাত্র করি না! অথচ এ কথা আর তাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, কোনও জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহার অতীত ইতিহাসের মত পথ-নির্দ্দেশক আর নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে পরিমাণ উপকরণ বিদ্যমান, তদপেক্ষা অনেক অল্প উপাদান লইয়া মিশরের, গ্রীসের ও রোমের লুপ্ত ইতিহাস পুনর্গঠিত হইয়াছে। অত্যল্প দিন পূর্ব্বেও বাইবেলে বর্ণিত 'হেটিট' সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও শিক্ষিত জনসাধারণ সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু সুধীজনের অধ্যয়নের ফলে অত্যল্প উপাদানের সাহায্যে আজ তাহার ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে; আজ সে সাম্রাজ্য কল্পনার স্বপ্নলোক হইতে বাস্তবের রাজ্যে উপনীত।

জগতে কোন্ প্রাচীন জাতি ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জন্য আপনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে? সকল প্রাচীন জাতিই শিল্পে ও সাহিত্যে ইতিহাসের উপকরণমাত্র রাখিয়া গিয়াছে। ভারতে সেরূপ উপাদানের অভাব নাই; বরং তাহার প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়। যখন কোনও বহুকালব্যাপী সভ্যতা বিলুপ্ত হয়, তখন তাহার সকল চিহ্ন পবনহিল্লোলের মত শেষ হইয়া যায় না, পরন্তু শিল্পে ও সাহিত্যে, এমন কি, নিত্যব্যবহার্য্য গার্হস্থ্য দ্রব্যাদিতেও তাহার বিশেষত্বব্যঞ্জক চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। আবার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যে ভাবে মিশরের, গ্রীসের ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার বিলোপের কথা বলেন, সে ভাবে দেখিলে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আজও জীবিত।

ভারতের ধূলি শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষসমষ্টি; ভারতে সর্ব্বত্র ইতিহাসের উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ভারতের সাহিত্য বিরাট—বিপুল, তত্ত্ব পুঁথি

অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কত পুঁথি এখনও অনাবিষ্কৃত; কিন্তু যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কত! আর কোনও দেশে এরূপ বিপুল প্রাচীন সাহিত্য ছিল না। আবার ভারতে স্তূপ ও মন্দিরের সংখ্যা করা যায় না। ইতিহাস-রচনা বিষয়ে স্থপতি-শিল্পের সাক্ষ্য সাহিত্যের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক আদরণীয়, অধিক প্রামাণ্য। প্রক্ষেপের ও সংশোধনের ফলে বহু গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। সাহিত্যে প্রক্ষেপ ও সংশোধন সহজে বোধগম্য হয় না; কিন্তু সুশিক্ষিত দর্শকের দৃষ্টি স্থপতির কৃত কার্য্যে প্রক্ষেপ বা সংশোধন অতি সহজে বুঝিতে সমর্থ হয়। পুরাতত্ত্ববিৎ স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম সত্যই বলিয়াছেন যে, লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাবে পুরাবস্তুরাজিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রামাণ্য উপকরণ। এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইতিহাসের হিসাবে যে সকল জাতি আপনাদের বিবরণ ক্ষণবিধ্বংসী গ্রন্থপত্রে রক্ষা না করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী প্রস্তরে বা প্রাসাদে রক্ষা করে, সে সকল জাতি সৌভাগ্যবান। পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ অনুশাসনসমূহ অক্ষয় অক্ষরে ভারতের ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে। উড়িষ্যার গুহামন্দিরের কথায় হাণ্টার বলিয়াছেন, "ইতিহাসের এই সকল উপকরণ পর্ব্বতেরই মত অক্ষয়।" ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ উপাদান বিদ্যমান। ভারতের কোথায় মন্দির, স্তূপ, গুহামন্দির বা অনুশাসন নাই? বর্ষার বারিধারা, শীতের শিশির, নিদাঘের তপন-তাপ সে সকল নষ্ট করিতে পারে নাই; ঝঞ্ঝাবাত, করকাপাত, বিজাতীয়ের বা বিধর্ম্মীর অত্যাচার সে সকল লুপ্ত করিতে পারে নাই। তাহারা কাল-জয়ী।

স্থপতিবিদ্যানুরাগী ফার্গুসন বলিয়াছেন, "ভারতে যেরূপ বহুবিধ স্থাপত্য-প্রণালী লক্ষিত হয়, সেরূপ আর কুত্রাপি হয় না; আর কোথাও স্থাপত্য-প্রণালী এত পরিবর্ত্তনশীল, এত স্থির নিয়মের অনুবর্ত্তী নহে। এই নিয়মানুবর্ত্তিতা হেতু তাহাদিগকে সহজলক্ষিত বিশেষত্ববিশিষ্ট বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা কষ্টসাধ্য নহে। তাহাদের পরিণতিও অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়; এবং একবার এক বিভাগের কালনির্ণয় করিতে পারিলে, অন্য সকল বিভাগের কাল-নির্ণয়ে আর কালবিলম্ব হয় না।"

অন্যত্র ফার্গুসন বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ হইতে আসিবার পূর্ব্বেই স্থাপত্যের শ্রেণীবিভাগ স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম। ভারতীয় স্থাপত্যের পারম্পর্য্য ও আনুমানিক কালনির্ণয়ও তৎকালে স্থির হইয়াছিল। তাহার

চিত্রের সহায়তায় ও অধুনা-আবিষ্কৃত অনুশাসনাদির সাহায্যে আমি তৎকালের জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এখন ভারতের যে কোনও প্রাচীন সৌধের চিত্র পাইলে আমি তাহার যে স্থান নির্ণয় করিতে পারি, তাহা সে স্থান হইতে ২৫ ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত হইবে; এবং আমি তাহার যে কালনির্ণয় করিব, তাহা সেই সময় হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রচিত হইবে।"

সত্যই ফার্গুসন, কানিংহাম প্রভৃতি অতি যত্নে ভারতীয় পুরাবৃত্তের আলোচনা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের চেষ্টায় ভারতের ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি সেই সকল উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়া ভারতের ইতিহাস রচনা করিবার উপযোগী লেখকের আবির্ভাব হয় নাই। আদি "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত কয়টি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণকালে বঙ্কিমচন্দ্র বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন,—"অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক, যা না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি কিন্তু কৈ, আমি কুলি-মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোনও সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না!"

প্রাচীন ভারতের শিল্পনৈপুণ্য লোকপ্রসিদ্ধ। যদিও বহুশতাব্দীব্যাপী পরাধীনতা, বিদেশীয় ভাবের ও আদর্শের প্রচলন, শান্তি ও সমৃদ্ধির অভাব প্রভৃতি কারণে দেশের শিল্পের অবনতি হইয়াছে, তথাপি এখনও লোকের শিল্পানুরাগ ও শিল্পনৈপুণ্য বিনষ্ট হয় নাই। তাই আজ ভারতে শিল্প যেরূপ জাতীয় জীবন অধিকার করিয়া আছে, তেমন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

এই সময় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কয় জন জ্ঞানপিপাসু ইংরাজের যত্নে বাঙ্গালায় এসিয়াটিক সোসাইটী সংস্থাপিত হইল। এসিয়াখণ্ডের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা এই সভার মূল উদ্দেশ্য স্থির হইল। সার উইলিয়ম জোন্স এই উদ্দেশ্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, সভ্যগণ এসিয়াখণ্ডে প্রাকৃতিক বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিবেন; অনুসন্ধান ও আবিষ্কার দ্বারা ভৌগোলিক ভ্রম অপনীত করিবেন; যে সকল জাতি কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই ভূখণ্ড অধ্যুষিত বা নিপীড়িত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস ও কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিবেন; তাহাদিগের শাসনপ্রণালীর ও অনুষ্ঠানের তত্ত্ব নির্ণয় করিবেন; নানা শাস্ত্রে তাহাদিগের অভিজ্ঞতার বিষয় ও নীতি হইতে সাহিত্য পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়ে তাহাদিগের জ্ঞানের পরিমাণ বিচার করিবেন; এবং চিকিৎসা ও রসায়নাদিতেও তাহাদিগের কৃত কার্য্যের তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইবেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রবিদ্যা, কবিতা প্রভৃতি হইতে মানব-জীবনের অতি সাধারণ আরামবিধায়ক বিষয়ও অনুসন্ধানের বিষয় হইবে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই সভা সংস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তখন প্রাচ্যতত্ত্ব মুষ্টিমেয় ইংরাজের চর্চ্চার বিষয়মাত্র রহিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী সংস্থাপিত হইল, তখনও সাধারণ ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষ অজানা রাজ্য—দীর্ঘ চারি মাসের পথ, সে স্থানে যাহারা যায়, তাহারা অনেকে আর ফেরে না; যাহারা ফেরে, তাহারাও সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয়! এমন কি, এই সভা রাজানুগ্রহলাভ করিলেও, অতি সাধারণ ব্যবহারজীবী বা ধর্ম্মযাজকের ভাগ্যে যে সম্মান বা সাহায্যলাভ ঘটে, জোন্স, কোলব্রুক, বা উইলসনের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তখনও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ এমনই অজ্ঞ ও উদাসীন!

যাহা হউক, বঙ্গদেশীয় সভা অদম্য উদ্যমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া উৎসাহ-সহকারে আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কানিংহাম তাঁহার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানবিবরণীর মুখবন্ধে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতি উপাদেয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, সে কার্য্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলশ্রম, তাঁহারা কেহই সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

সভা-সংস্থাপনের দশ বৎসর পরে সভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যোগী সভ্য

সার উইলিয়ম জোন্সের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। তৎকালে অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রজ্বালিত দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। কিন্তু কাহারও আন্তরিক চেষ্টা নিষ্ফল হয় না। জ্ঞানমন্দিরে তিনি যে আলোকশিখা জ্বালিয়াছিলেন, কোলব্রুক তৈলদানে তাহার ঔজ্জ্বল্য অনাহত রাখিবার ভার লইলেন। তখনও কোলব্রুক গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই; কিন্তু তিনি জোন্সের আরব্ধ হিন্দু-বিধি-সম্বন্ধীয় অসমাপ্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার ভার লইলেন।

কোলব্রুক ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই হোরেস হেমান উইল্‌সন সভার সম্পাদক-পদে বৃত হইয়াছিলেন। উইল্‌সনের পর ডাক্তার মিল সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

এই সময় ভারতীয় পুরাবৃত্তের আলোচনায় নূতন যুগের আরম্ভ হয়। পণ্ডিতমণ্ডলীর অজস্র চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের যে বর্ণমালার রহস্য অনাবৃত হয় নাই, কুশাগ্রবুদ্ধি প্রিন্সেপ তাহার তত্ত্ব-নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতের ইতিহাসে এই ব্যাপার বিশেষভাবে স্মরণীয়। একান্ত দুঃখের বিষয়, চল্লিশ বৎসরমাত্র বয়সে আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই প্রিন্সেপের মৃত্যু ঘটে। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে যে ভারতের ইতিহাসের অনেক জটিল তত্ত্ব সরল করিতে পারিতেন,—অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার নিকট ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার ঋণ শত গুণে বর্দ্ধিত করিতে পারিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের মধ্যে উত্তর-ভারতে জেমস্ ফার্গুসনের, মার্কহাম কিঁটোর, এডোয়ার্ড টমাসের ও সার আলেকজাণ্ডার কানিংহামের; দক্ষিণ-ভারতে সার ওয়ালটার এলিয়টের; পশ্চিম-ভারতে কর্ণেল মিডোস টেলাযের, ডাক্তার ষ্টিভেন্সনের ও ডাক্তার ভাউদাজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছিলেন,—অন্যান্য বিষয়ের মত পুরাতত্ত্বেও উৎসাহী ব্যক্তিদিগের আদর্শে গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট কখনই সহজে কোনও বিষয় শিক্ষা দেন না; এ ক্ষেত্রেও গবর্মেণ্ট ধীরে ধীরে কর্ত্তব্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। জোন্স, কোলব্রুক, উইল্‌সন, প্রিন্সেপ প্রভৃতি এই সভার অনুষ্ঠাতৃবর্গ প্রথমে সাহিত্যিক তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। বর্ণমালার পুনর্গঠনে, পাণ্ডুলিপির অনুবাদে ও অনুশাসনের অর্থসংগ্রহে তাঁহাদের কার্য্য নিবদ্ধ ছিল। ক্রমে

সংস্কৃতচর্চ্চা বিশেষ অদৃত ছিল। ইঁহারা কিরূপ গুরুশ্রম করিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অতিশ্রমে চল্লিশ বৎসরমাত্র বয়সে, প্রিন্সেপ্ ও কিটো, উভয়েরই মৃত্যু হয়। ইহার পর গৃহ ও স্মৃতিস্তম্ভ-বিষয়ক অনুসন্ধান আরব্ধ হয়। বর্ণনা, রেখাচিত্র, চিত্র, ফটোগ্রাফ ও ছাঁচ ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয়দিগকে ভারতের সম্পদবিষয়ে জ্ঞাত করাইয়া দেয়। এই বিভাগে ফার্গুসনের ও কানিংহামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফার্গুসনের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার কয় বৎসর পরেই কানিংহাম ভিলসা স্তূপে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। ইঁহাদিগের কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। কিন্তু এরূপ কার্য্য ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যাতীত; কাযেই তাঁহাদিগের কার্য্য অনেকস্থলে আংশিক, বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। রচনা-প্রসাধন-নিপুণ কোলব্রুক তাঁহার অত্যন্ত মধুর গম্ভীর ভাষায় প্রথম রচনা পাঠ ও সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন।

ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনা যেমন সুখদ, তেমনই শিক্ষাপ্রদ ও আবশ্যক। উপকরণের অভাব নাই—উৎসাহী, জ্ঞানলিপ্সু কর্ম্মীরই অভাব। যাঁহারা ভারতীয় পুরাতত্ত্বালোচনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। ভারতবাসীদিগের পক্ষে স্বভাবতঃ এই আলোচনায় আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ, তাঁহারাই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার স্বরূপনির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারেন; কিন্তু পুরাতত্ত্বালোচনায় ব্রতী ভারতবাসীদিগের নাম অঙ্গুলিপর্ব্বে গণনা করা যায়। এই সম্পর্কে বাঙ্গালীর কলঙ্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বলা বাহুল্য রাজা রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অসাধারণ, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়। কিন্তু তাঁহার পর আর কেহ বাঙ্গালীর কলঙ্কমোচনে প্রয়াসী হয়েন নাই। সময় সময় কেহ কেহ ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই তাদৃশ ক্ষমতা, নৈপুণ্য, উৎসাহ বা উদ্যম সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। অনেকেই শ্রম-পরাঙ্মুখ হইয়া আবশ্যক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। জটিল বিষয় সরল করিতে সচেষ্ট হয়েন নাই; কিন্তু অত্যল্প কৃতকর্ম্মের জন্য অত্যধিক যশের আশা করিয়া হতাশ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-দ্বয়ের অকালমৃত্যুজনিত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষতির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমোক্ত লক্ষ্মণাদেবের ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস

আলোচনার পথ সুগম করেন; হিউয়েন্‌সাঙ্গ পাটলিপুত্রে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে অন্তরায় অধিক নাই; উপকরণের অভাব নাই। পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-বিবরণীগুলি আবশ্যক বিষয়ে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই সকল বিবরণীতে বর্ণিত বিষয়গুলি স্থান-বিভাগানুসারে বিভক্ত; কারণ, এক একখানি বিবরণী এক একটি স্থানের পুরাবস্তুসম্বন্ধীয় সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণে পূর্ণ। এখন এই সকল বর্ণনা হইতে বর্ণিত দ্রব্যগঠনপ্রণালী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রচনার ক্রম বিকাশের পরিবর্ত্তনের ও অবনতির কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক। এক প্রণালীর উপর অপরের প্রভাব ও এক হইতে অন্যে পরিণতি লক্ষ্য করাও কর্ত্তব্য। যে সভ্যতায় একের উদ্ভব ও যাহাতে তাহার বিকৃতি, তাহা বুঝিতে হইবে। সার উইলিয়ম মার্টিন কনওয়ে সত্যই বলিয়াছেন, "প্রাচীন মিশরের সামাজিক, রাজনীতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত পিরামিডের নির্ম্মাণের কারণ, দ্বাদশ বংশের ক্ষোদিত সমাধি-রচনার আবশ্যকতা, বা টলেমীদিগের স্মৃতিমন্দিরের তাৎপর্য্য বুঝিবার উপায় নাই। বাবিলোনিয়ার স্তরবিভক্ত মন্দির, আসীরিয়ার ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদ, হেটিট ও ফোনিসীয়দিগের কীর্ত্তির অবশেষ, এ সকলই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার ফল। সেই সভ্যতার ইতিহাস অনুসারে তাহাদের অর্থ বুঝিতে হইবে; আবার তাহাদের সহায়তায় সেই সভ্যতার গুপ্ততত্ত্ব স্বপ্রকাশ হইবে। দক্ষিণ-ভারতের ভীমকায় মন্দির-নির্ম্মাণের কারণ, গুহামন্দির-রচনার তাৎপর্য্য, হিন্দুস্থাপত্যের প্রারম্ভ ও তাহার দৃশ্যমান আদর্শের মধ্যে পঞ্চ শতাব্দীর ব্যবধানের হেতু, পশ্চিম-ভারতের গুহামন্দিরে চিত্রের ও পূর্ব্ব-ভারতে গুহামন্দিরে ভাস্কর্য্যের প্রাধান্য কেন, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিহার-মধ্যবর্ত্তী বৌদ্ধচৈত্যের প্রতিমার আধারে পূর্ণ প্রতিমামন্দিরে পরিণতি—এ সকল বুঝিতে হইলে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের আলোচনা আবশ্যক; ভারতের রাজনীতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস অবশ্যজ্ঞেয়।

এখন বহু যুগের বিস্মৃতিগর্ভগত উপাদানের পুনরুদ্ধার করিয়া অতীত ইতিহাসের রচনা করিবার যোগ্যপাত্রের আবির্ভাব অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় সভ্যতায় ভারতবাসীরই স্বত্বাধিকার। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসীদিগকেই এ কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখা যায় না। ইহা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফল।

বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর শত-বার্ষিকী সমালোচনীতে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন যে, প্রারম্ভে দুষ্ট-শিক্ষার ফলে যে অনুসন্ধানের ফল ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে হয়, ভারতবাসীরা সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবাসী কখনও ইংরাজী ভাষায় ভাবপ্রকাশ অলঙ্ঘনীয় বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করেন নাই। পুরাতত্ত্বের মত বিষয় সম্বন্ধীয় রচনায় রচনাসৌন্দর্য্য অত্যাবশ্যক নহে। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় সুধী সমাজে ভারতবাসীর রচনায় মৌলিক-তত্ত্ব-প্রাপ্তির আশায় অনেক ক্রটী অবহেলা করিয়াছেন এবং করিতে প্রস্তুত আছেন। দুঃখের বিষয়, এই বিষয়েই তাঁহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই। তবে এ কথা বলা বাহুল্য যে, দুষ্ট শিক্ষাই ভারতবাসীদিগের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে অপ্রবৃত্তির কারণ। তাহারা যে শিক্ষা পায়, তাহাতে মানসিক বৃত্তির বিকাশ হয় না; জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত হয় না, পরন্তু বিলুপ্ত হয়; তাহাতে শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে না। সুখের বিষয়, দেশবাসীরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সে বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই শিক্ষা প্রকৃতপথে পরিচালিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, ইহাতে যে সুফল ফলিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ইহার দুর্ব্বল প্রারম্ভকে সযত্নে রক্ষা করা দেশবাসিমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। আমরা ইহার পরিণতির আশায় আশান্বিত। ভারতীয় পুরাবৃত্ততত্ত্ব ও প্রকৃতত্ত্ব জাতীয় শিক্ষাগারে অধীত হইবার পক্ষে কারণ-নির্দ্দেশ অনাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যে বর্ব্বরতার অভিযোগ আনীত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভকালের কথায় লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছেন,—কর্ম্মচারীদিগের মনে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অভাবের ও বর্ব্বরতার প্রাধান্যের বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনসময়ে মূল্যবান মর্ম্মরের মোহে তাজমহল ভাঙ্গিবার উদ্যোগ হইয়াছিল! লর্ড হেষ্টিংস ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ্জকে উপহার দিবার জন্য আগ্রার প্রাসাদের শাহজাহানের মর্ম্মর-স্নানাধার উৎপাটিত করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহা প্রেরিত হয় নাই। বেণ্টিঙ্ক তাহা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করান। তাঁহারই শাসনকালে কৃষি-পরীক্ষার জন্য আগ্রার ইঞ্জিনীয়ারকে সেকেন্দ্রার উদ্যান ব্যবহারার্থ দিবার প্রস্তাব হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের পর দিল্লীর লোকপ্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদ ভূমিসাৎ

করিবার প্রস্তাব হয়; সার জন লরেন্সের চেষ্টায় সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় সাঁচির স্তূপ-তোরণ রক্ষা পায়। আলিগড়ে নগরের উন্নতির জন্য ছয় শত বৎসরের প্রাচীন একটি মুসলমান-যুগের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যে বিপণী-গৃহরাজি নির্ম্মিত হয়, সে সকলের অধিবাসী জুটে নাই! একবার বড়লাটের আজমীর-গমনকালে তোরণ-রচনার জন্য সেখানকার স্থানের হিন্দু-মুসলমান মসজিদের স্থাপত্যসৌন্দর্য্যশালী স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া আনা হয়।

এই সকল বর্ব্বরোচিত কার্য্যের প্রধান কারণ এই যে, তখনও ভারতে চিরস্থায়িভাবে অবস্থান ইংরাজের নিকট সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় নাই। তাহার পর, একবার এক প্রকার কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহা আর সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। সুখের বিষয়, এখন গবর্মেণ্ট পুরাবস্তুর সংরক্ষণ প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করেন; এখন কোনও কোনও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী অট্টালিকা-রচনায় যথাসম্ভব ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করেন, এবং কোনও কোনও ইংরাজ স্বজাতীয়দিগের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাদিগকে বর্ব্বর আখ্যান আখ্যাত করেন।

যৎকালে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষে নূতন সাম্রাজ্যের সংস্থাপন ও বিস্তার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালেও সময়ে সময়ে কোনও কোনও শাসনকর্ত্তা পুরাবস্তু-সংরক্ষণকল্পে অর্থব্যয় করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টো তাজমহলের সংস্কারের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। লর্ড হেষ্টিংস ফতেপুরসিক্রীতে ও সেকেন্দ্রার সংস্কার করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। লর্ড আমহর্ষ্ট কুতব-মিনারের সংস্কারের চেষ্টা করেন। লর্ড হেষ্টিংস ভারতের প্রধান প্রধান পুরাবস্তুর পরীক্ষা ও লিপিবদ্ধকরণে ডিরেক্টরদিগকে সম্মত করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ কার্য্য সময়ে সময়ে ঘটিত, তাই কখনও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় নাই। সামান্য সংস্কার ও কয়েকখানি চিত্রসংগ্রহেই সকল চেষ্টার শেষ হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং উত্তর-ভারতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন, এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জেনারল কানিংহামকে পুরাবস্তু-পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ মন্তব্যে তিনি বলেন, পূর্ব্ব বৎসর উত্তর-ভারতের পুরাবস্তু সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্ণেল কানিংহামের কথা হয়। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পুরাবস্তুর বিষম অবহা

দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ এই সকল পুরাবস্তুর অধিকাংশই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। এই অবহেলা অর্থে, সংস্কার বা পুনর্গঠন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা নহে। সেরূপ কার্য্যের ব্যয়ভার বহন করা অনেক স্থলে গবর্মেণ্টের সাধ্যাতীত। কিন্তু গবর্মেণ্ট তদপেক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য কর্ত্তব্যের পালনেও পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। গবর্মেণ্ট ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জন্য এই সকল পুরাবস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করাইতে পারেন। তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনার উপায় হইবে; এবং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ভারতবর্ষ সুগম হইলে, সেই ইতিহাসের চর্চ্চায় বহু কোবিদ রত হইবেন। বিহার, কনোজ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বিরাট ধ্বংসাবশেষের সবিশেষ অনুসন্ধান না করা সভ্য গবর্মেণ্টের কলঙ্কের কথা। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যাহা কিছু সাধিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল। ভারতে ইংরাজের মত অবস্থাপন্ন হইলে অন্য য়ুরোপীয় গবর্মেণ্ট এ কার্য্যে এরূপ অবহেলা করিতেন না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর নিবেদনে ও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মেজর হার্ডিপের বিশদ মন্তব্যে কোর্ট অব ডিরেক্টারস্ কতকগুলি পুরাবস্তুর পরীক্ষা ও বর্ণনের ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু যাঁহার উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহার অন্য কার্য্যের বাহুল্য ও অকালমৃত্যু প্রভৃতি কারণে সে কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। অল্প কিছু ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন ও কতকগুলি চিত্র ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং মেজর কিটো ও জেনারল কানিংহাম এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। বৎসর দুই কাল মধ্যেই গবর্মেণ্ট এ বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

এই মন্তব্যে প্রকাশ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তুর বর্ণন ও চিত্রাঙ্কন, অনুশাসনের অনুলিপি-প্রকাশ, পুরাবস্তুর যথাসম্ভব ইতিহাস-উদ্ধার ও তৎসম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীর সংরক্ষণই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য।

এই সময় হইতে পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-বিবরণী প্রকাশ আরব্ধ হয়। এই সকল বিবরণী প্রচুর শ্রমের ফল জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পূর্ণ। বিংশ বর্ষেরও অধিককাল জেনারল কানিংহাম এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-বিবরণী তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র পুরাবস্তুর সংরক্ষণ ও তালিকা-প্রণয়নসম্বন্ধে আদেশ প্রদত্ত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ডাক্তার বার্জ্জেস এই ভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি কানিংহামের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও দেশীয়-শাসিত রাজ্যেও এই কার্য্যের

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্য।

—:০:—

কৃত্তিবাসের রামায়ণানুবাদের কিঞ্চিন্ন্যূন শতাব্দীকাল পরে আসামবাসী শঙ্কর নামক কবি রামায়ণের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এই অনুবাদখানি আসাম ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে সমাদর লাভ করিয়াছিল; ভাষার দুরূহতা সত্ত্বেও, বলা উচিত, এই অনুবাদখানি সম্পূর্ণ মূলানুগ, কিন্তু সংক্ষিপ্ত।

শঙ্কর।

পূর্ব্ব-বঙ্গে এক সময় ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন কৃত রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অধিকতর প্রচলিত ছিল। ইহারা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত ঝিনারদি গ্রামে বৈদ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল "গুণরাজ"। গঙ্গাদাস সেন স্বীয় ভণিতায় অনেক স্থলেই পিতা ও পিতামহের গর্ব্ব করিয়াছেন,—"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর। যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর।" এই পিতা ও পুত্রের বিরচিত রামায়ণের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুন্দর; এবং ইহার বহুসংখ্যক পুঁথি পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীবর, জগদানন্দ নামক ব্যক্তির নামে স্বপ্রণীত রামায়ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—"শ্রীযুত জগদানন্দে, অহর্নিশ হরি বন্দে, কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্ব্ব।"

ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সেন মহাশয় এই কবির কৃত রামায়ণের অনুবাদখানির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং ইহার ভাষা অতি মধুর।

দ্বিজ দুর্গারাম।

১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামবাসী জগৎরাম রায় রামায়ণের আর একখানি অনুবাদ করেন। শিবচন্দ্র সেনের "সারদামঙ্গল" রামায়ণের একখানি সুখপাঠ্য অনুবাদ। কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। শিবচন্দ্র কাঁটাদিয়া গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন, এই গ্রাম ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত।

জগৎরাম রায়।

শিবচন্দ্র সেন।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে অদ্ভুতাচার্য্য নামক জনৈক কবি রামায়ণের একখানি অনুবাদ রচনা করেন। অদ্ভুতাচার্য্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। এরূপ প্রবাদ আছে, সাত বৎসর

অদ্ভুতাচার্য্য।

বয়সেই ইনি রাজপুত্রের আদেশ পাইয়া রামায়ণ-রচনা আরম্ভ করেন; তখন তাঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল না।" ভগবৎপ্রসাদে এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহার নাম হইয়াছিল, অদ্ভুতাচার্য্য।

শঙ্কর কবিচন্দ্র।

কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাতুয়া (পোঃ নেগো) গ্রামবাসী শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্রচলিত কৃত্তিবাসী কৃত বলিয়া যে রামায়ণখানি পরিচিত, তন্মধ্যে অনেকাংশ এই শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা। "অঙ্গদ রায়বার" কবিচন্দ্র-কৃত। শঙ্কর, বাল্মীকির মূল কাব্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে রামায়ণ-ঘটিত উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া, স্বীয় রামায়ণ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি শঙ্করের দৌহিত্র কুলোদ্ভব শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, এবং শীঘ্রই সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত হইবে।

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; ও লক্ষ্মন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী মেটেরী গ্রামবাসী রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি রামায়ণের অনুবাদ প্রণয়ন করেন; এবং প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্মন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক অপর এক জন কবির কৃত অধ্যাত্ম-রামায়ণের একখানি অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

রঘুনন্দন গোস্বামী।

কৃত্তিবাসের পরে যতগুলি অনুবাদ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত রঘুনন্দন গোস্বামীর "রাম-রসায়ন" খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রঘুনন্দন মূলের সঙ্গে সঙ্গে তুলসীদাস প্রভৃতি কবির হিন্দী রামায়ণ অবলম্বন করিয়া রামরসায়নের সঙ্কলন করেন। তাঁহার রচনা বিচিত্র ছন্দোময়; ললিত শব্দ-চয়নেও ইনি সিদ্ধহস্ত। রচনার নমুনা এইরূপ,—

"এথা রঘুবর করিতে সমর, সুখেতে রজনী হইয়া।
অতি সুকোমল, তরুণ অরুণ পরিলা কবচ আঁটিয়া॥
শিরে অবিকল, জটার পটল, বান্ধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া।
পরিলা বিচিত্র কঠিন কবচ শরীরে দৃঢ় করিয়া॥"

এই ছন্দটি ললিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা যুদ্ধারম্ভের সমর-সজ্জা-বর্ণনার উপযোগী নহে।

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদগুলি ব্যতীত দ্বিজ দয়ারাম, অকিঞ্চনরাম কবিভূষণ

ভিকন শুক্লদাস, দ্বিজ তুলসী, কাশীনাথ প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবির-কৃত রামায়ণের অংশানুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত রামায়ণের অনুবাদ কতক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে। অসামান্য প্রাঞ্জলতা ও কারুণ্যের উদ্দীপনার জন্য কৃত্তিবাসের যশোভাতি উজ্জ্বল হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী নক্ষত্ররাজির ন্যায় অপ্রকাশ রহিয়াছেন। রাজচক্রবর্ত্তীর প্রাসাদ হইতে কৃষকের কুটীর পর্য্যন্ত গত পাঁচ শত বৎসর কাল যে পুস্তক অবাধগতি লাভ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা প্রদান করিয়াছে, সে পুস্তক সমালোচনার প্রতীক্ষা রাখে না। সমালোচককে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের কথায় প্রণতি ও বিনয় জানাইয়া নীরব থাকিতে হয়ঃ—

"কর জোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস।
যাহা হইতে রামায়ণ হইল প্রকাশ॥

২। মহাভারত।

নসিরুদ্দিন খাঁর অ.দেশে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাভারতের যে অনুবাদ হইয়াছিল, তাহা পাওয়া যায় নাই। এ পর্য্যন্ত যতগুলি মহাভারতের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সঞ্জয়-কৃত "ভারত-পঞ্চালী"ই প্রাচীনতম। অতি অন্ধকার যে ভারত সাগর, পাঁচালী সঞ্জয় তারে করিল উজ্জ্বল।" প্রভৃতি ভণিতার পদ পাঠ করিলে প্রতীতি হয়, সংস্কৃতানভিজ্ঞ অসংখ্য নর-নারীর নিকট যে রত্নের আকর তিমিরাবৃত ছিল, সঞ্জয়ই সর্ব্বপ্রথমে সেই রত্নখনি আলোকিত করেন; তৎ-কৃত অনুবাদেই এই দুর্গম পথ সর্ব্বপ্রথম সুগম হয়। এই মহাভারতখানি অতি সংক্ষিপ্ত; অথচ ইহার প্রচার এক সময়ে অত্যন্ত অধিক ছিল। ত্রিপুরার সোনামুড়া, ময়নামতী প্রভৃতি পাহাড়ের বাঙ্গালী-জন-কণ্ঠলগ্ন পল্লীমালায়, বঙ্গসাগরের তরঙ্গ-চুম্বিত চট্টল রাজ্যে ও প্রাচীন শ্রীহট্ট ও বিক্রমপুরের শ্যামশস্যভারস্নিগ্ধ বিস্তৃত জনপদের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন সঞ্জয়-ভারতের পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। সঞ্জয়ের পরিচয় এই একটিমাত্র ছত্রে অতি যৎসামান্যই পাওয়া গিয়াছে,—

সঞ্জয়।

"ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম
সঞ্জয় ভারত কথা রহিলেক মর্ম্ম।"

কবীন্দ্র-পরমেশ্বর-কৃত মহাভারতের অনেকাংশের অনুবাদ ও শ্রীধরনন্দীর

কৃত অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদের কথা একবার উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহারা ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দ্বিজ অভিরামের অশ্বমেধপর্ব্ব, নিত্যানন্দ, ষষ্ঠীবর ও কবিচন্দ্রের রচিত সমগ্র ভারত, রাজেন্দ্র-রচিত আদিপর্ব্ব, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, মধুসূদন নাপিতের বনপর্ব্বের অনেকাংশ, দ্বিজ ভরতের অশ্বমেধপর্ব্ব, ভৃগুরাম দাসের সংক্ষিপ্ত ভারত; কাশীদাসের পুত্র নন্দরাম দাসের প্রণীত ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণপর্ব্ব প্রভৃতি ৩১ জন কবির-রচিত ভারত-প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ কবিই কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং এই সকল কাব্যের অধিকাংশই পুঁথির আকারে রহিয়াছে। যাঁহারা পল্লীভবনে বাস করিয়া বাঙ্গালা ভাষা পঠনের জন্য পড় কাঠ সংগ্রহ করিবার প্রাণান্ত চেষ্টায় জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের প্রযত্নে প্রাচীনকালে নিম্ন-শিক্ষা বহুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং আধুনিক সময়ে যাঁহাদের কাব্যবর্ণিত বিষয় ও গ্রন্থের ভাষা হইতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের প্রধান উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে, সেই সকল প্রাচীন কবিগণের বহুমূল্য গ্রন্থগুলির সমস্ত মুদ্রিত করিবার বিশেষ চেষ্টা বঙ্গবাসীর সর্ব্বপ্রধান জাতীয় কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত মহাভারত-রচকগণের মধ্যে কবিচন্দ্র ও ষষ্ঠীবরের কর্ম্মঠতা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা কত সংস্কৃত গ্রন্থের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রামায়ণ, মহাভারত, শিবায়ন, ভাগবত প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ কবিচন্দ্র রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাহার কোনও-খানিই ৪০০ পৃষ্ঠার ন্যূন নহে। ইহাদের সংবাদ শিক্ষিতসম্প্রদায় এখনও অবগত নহেন; কিন্তু ত্রিতলবাসীরা যেন ভুলিয়া না যান, গৃহের প্রধান অবলম্বন ভিত্তি, তাহা তুপ্রোথিত থাকিলেও, তাহার গৌরব সর্ব্বাগ্রে।

যাঁহারা মহাভারতের অংশবিশেষের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা-উপাখ্যানটি অতি সুন্দর হইয়াছে। কবি এই আখ্যানে ভট্টকাব্য ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটক হইতে অনেক ভাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার বর্ণনাগুলি সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার রচনার নমুনা এই প্রকার,—

"শীতল পবন বহে, সুগন্ধি বহে বাস।
ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ।
মন্দমন্দ বায়ুএ কুসুম সব নড়ে।
ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে।

নব নব শাখাগাছি অতি মনোহর।
খোপা খোপা পুষ্প-বড়ে গন্ধরে ভ্রমর।
নির্ম্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে।
লাক্ষ লক্ষে বানর বেড়ায় গাছে গাছে।
হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল।
হেন পশু না দেখিলুম নাহিক জনর।
হেন ভৃঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া।
কেবা মোহ না যায়ন্ত সে সব দেখিয়া।"

পূর্ব্ব-বঙ্গে সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, পশ্চিম-বঙ্গে নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত তদ্রূপ সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। পশ্চিম-বঙ্গের বহু স্থান হইতে এই মহাভারতের পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে; এমন কি, পূর্ব্ব-বঙ্গেরও স্থানে স্থানে এই মহাভারত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীদাসের জামাতা। কাশীদাসের জামাতার নাম 'নিত্যানন্দ' থাকা অসম্ভব নহে; কিন্তু তিনিই যে প্রসিদ্ধ ভারতানুবাদক, তাহা কিরূপে স্থির সিদ্ধান্ত হইতে পারে? বরং তিনি যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। একটি এই যে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র "গৌরীমঙ্গল" নামক একখানি কাব্যের রচনা করেন, তাহার ভূমিকায় তিনি 'প্রাচীন বাঙ্গালা' কবিদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে,—

অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ।

ইহা দ্বারা নিত্যানন্দকে কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জামাতার পুঁথি আদর্শ করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি লোপ করিবার চেষ্টায় কাশীদাস লেখনীধারণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না।

কাশীদাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্দ্ধমান জেলায় ইন্দ্রাণী পরগণাস্থ সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীদাসের পুত্র স্বীয় পুরোহিত-দিগকে যে বাস্তু-ভিটা প্রদান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহা ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কাশীদাস ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বিরাটপর্ব্বের রচনা করেন; একখানি প্রাচীন পুঁথিতে এই সালের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। সিঙ্গি গ্রামে এখনও তাঁহার বাস্তু-ভিটা ও তৎকর্ত্তৃক খনিত একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে; এই পুষ্করিণীর নাম "কেশে পুকুর"। কাশীদাসের পিতার

গ্রন্থ রচনাকাল ; অপর দুই ভ্রাতা গদাধর ও ভৃগুরাম। ইহারাও কাব্যরচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কাশীরাম দাসের পুত্র নন্দরাম দাসও মহাভারতের কোনও কোনও পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কাশীদাস আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কতক অংশ রচনা করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন ; একটি প্রাচীন কবিতায় এই কথা নির্দ্দিষ্ট আছে। [illegible] কারণে সেই দুই পঙ্‌ক্তি এত অধিক প্রমাণ বলিয়া মনে করি।—প্রচলিত বটতলার ছাপা কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্ব্বের শেষে তণিতায় এই দুইটি ছত্র দৃষ্ট হয়,—

ধন্য ধন্য কাশীদাসেতে কাশীরাম।
ভিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ।

অপরাপর পর্ব্ব সম্ভবতঃ গদাধর, নন্দরাম ও ভৃগুরাম প্রভৃতি তদীয় পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই বিভিন্ন কবিগণের রচিত সমগ্র মহাভারত এখন কাশীদাসের নামে পরিচিত হইয়াছে।

কাশীদাসের নামে যে মহাভারত চলিতেছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের নিকট বিশেষ ঋণী। নিত্যানন্দের রচনা অতি সামান্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া এই মহাভারতে গৃহীত হইয়াছে। উভয় মহাভারতের একটা অংশ পাশাপাশি রাখিয়া সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল—

গান্ধারীর বিলাপ।

নিত্যানন্দ ঘোষের স্ত্রীপর্ব্ব।

কৃষ্ণের পরাভববাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া।
পুনঃ যদি কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা।
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মমাবর।
ভীমের গদায় যাহে মরিল সকল।
দেখ কৃষ্ণ বধূসব উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
দেখিতে না পায় দুঃখে সূর্য্য আর চাঁদে।
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
যাহার দেখিয়া রূপ রথ রাখে ভানু।
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেত্রে।
ধূলাতেশ ধূসরেশ দেহ সাক্ষাতে॥

"কাশীদাসী" মহাভারত হইতে গৃহীত

কৃষ্ণের পরাভব বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া।
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্র-বীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা।
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মমাবর।
ভীমের গদায় যাতে মরিল সকল।
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
দেখিতে না পারে দুঃখে কভু সূর্য্য চাঁদে।
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু।
কেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেত্রে।
হিত কেন নহে যেন দেখ তুমি নেত্রে।

ঐ দেখ নৃত্য করে নারী পতিহীনা।
শ্রুতিশব্দ শুনি যার নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
মাএ এড়ি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
ওহে কৃষ্ণ হের দেখ পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় আজ দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র মায়ের একুই সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
কি মতে বুঝাহ মোরে মুকুন্দ মুরারি॥
পুত্রশোক শেল হেন বাজিছে হিয়ায়॥
দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মাঝে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রের সমান শোক নহে পরতেক॥
গর্ভধারী হয়্যা সেবা করাছে পালন।
সেই সে জানিতে পারে পুত্রের মরম॥

ওই দেখ নৃত্য করে পতিহীনা বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্কবিধু॥
ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীর বেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় আজ দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
এক কালে এত শোক সহিতে না পারি॥
বুঝাইবে কিরূপে হে আমারে মুরারি॥
পুত্রশোক সেল যেন বাজিছে হৃদয়॥
দেখাবার হলে দেখাতেম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে তার এক॥
গর্ভধারী হয়ে সেই করিছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥

ইহা ব্যতীত সঞ্জয়, কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী রচিত মহাভারতের অনেক স্থান কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যাইতেছে। প্রধান কবিগণ অনেক সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ভাব আত্মসাৎ করিয়া তাহাতে দখলী স্বত্ব স্থাপন করেন। সর্ব্ব দেশেরই শ্রেষ্ঠ কবিগণের সে অধিকার আছে;—কিন্তু অনুবাদ সম্বন্ধে এরূপ অধিকার স্বীকার করা যায় না। একে ত অনুবাদ জিনিসটা মৌলিক নহে, ভাষান্তরিত করিতে যাইয়া যদি পুচ্ছগ্রাহিতা করিতে হয়, তবে আর বাহাদুরী কি? তাহা ছাড়া কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতগুলির যেরূপ ভাষাগত মিল দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই ব্যাপারটিকে আহরণ না বলিয়া অপহরণ নাম দিলেও অসঙ্গতি হয় না।

যে কয়েক পর্ব্ব কাশীদাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনেক স্থলে

বিশেষ জ্ঞেয়ভাব পরিচয় আছে। তিনি সুগলিত সংস্কৃত শব্দ দ্বারা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি। গলদেশ বৃষ্ণলেক্ষ পরশয়ে প্রীতি।" "নিংলম্ব ইন্দুজ্যোতি পীনঘনস্তনী" প্রভৃতি রচনায় তিনি শব্দালঙ্কারে বঙ্গীয় কবির যে রুচি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা বহু সময়ের মধ্যে বঙ্গীয় কাব্যকাননে অনুপ্রাস ও যমক প্রভৃতির প্রাচুর্য্যে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে পদ্যগুলি তাঁহার রচিত নহে, অথচ তাঁহার নামে চলিয়া আসিয়াছে, সেই সকল পদ্যেই পুচ্ছগ্রাহিতা বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার রচিত অংশগুলির ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহাকেই মহাভারত-অনুবাদকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

৩। ভাগবতের অনুবাদ।

ভাগবত অনুবাদকগণের মধ্যে মালাধর বসু আদি কবি। সাত বৎসরের চেষ্টায় ১৪৭৩ খৃঃ অব্দে ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ শেষ করেন। মালাধর বসু কুলীন গ্রামনিবাসী ছিলেন। এই গ্রামখানি গড়ে বেষ্টিত ছিল, এবং তথাকার বসুবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন। জগন্নাথ তীর্থের যাত্রীদিগকে বসু মহাশয়দিগের নিকট 'ডুরী' লইয়া যাইতে হইত। মালাধরের ভ্রাতা গোপীনাথ বসু হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ করার পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট হুসেন শাহ "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দান করেন, তাহা একবার উল্লেখ করা গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন, বৈষ্ণবসাহিত্যে তাহার উল্লেখ আছে।

মহাপ্রভুর জনক মাধব মিশ্র ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ রচনা করেন। মাধব মিশ্রের পিতার নাম কালিদাস মিশ্র। ইনি বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পিতৃব্য ছিলেন। মাধব মিশ্র মহাপ্রভুর টোলে পাঠ করিয়াছিলেন। ভাগবতের অনুবাদ ইনি মহাপ্রভুর চরণে উৎসর্গ করেন।

বিষ্ণুপুরী-কৃত সংস্কৃত "ভক্তাবলী" বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত গ্রন্থ। ইহা ভাগবত-অবলম্বনে বিরচিত হয়। শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী লাউড় নামক স্থানের রাজা দিব্য সিংহ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া "কৃষ্ণদাস" নামে পরিচিত হন। ইনি ভক্তাবলীর একখানি বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। এই কবি "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" নামে বৈষ্ণবসমাজে বিদিত।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে গঙ্গার পণ্ডিতের শিষ্য ভাগবতাচার্য্য সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের নাম "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে রচিত কবিকর্ণপুরের "শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় ভাগবতাচার্য্য-রচিত "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাতিস্তবঃ॥" চৈতন্যচরিতামৃতেও এই গ্রন্থকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাগবতাচার্য্য উপাধি, নাম রঘুনাথ পণ্ডিত। সাহিত্য-পরিষৎ এই পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতের অনুবাদগুলির মধ্যে কবিচন্দ্র-কৃত অনুবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই অনুবাদের নাম "গোবিন্দমঙ্গল"। "গৌরমঙ্গল"-প্রণেতা পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন,—"কবিচন্দ্র গোবিন্দমঙ্গল বিরচন।" কাশীদাসের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন; তাহার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে সনাতন চক্রবর্ত্তী ভাগবতের একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত ভাগবতের বিশেষ বিশেষ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া অনেক কবি বাঙ্গালায় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। জয়ানন্দের ধ্রুব-চরিত্র, দ্বিজকংসারির প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি পুস্তক এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ক্রমশঃ

মুক্তি।

—:০:—

১

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। ললিতা প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া তখনও নিবিষ্টচিত্তে মহাভারতের পুণ্যকাহিনী পাঠ করিতেছিল। নিঃসঙ্গ জীবনে অন্য কাজ ছিল না।

শৈশবে সে মাতৃহীনা; স্নেহময় পিতার অঙ্কে পালিতা হইতা। যখন যৌবনে তাহার সীমন্তে সিন্দূরের পুণ্যরেখা কিয়ৎকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের দশ মাস পরে তাহার স্বামী শ্রীগোবিন্দ হরিদ্বারে মেলা দেখিতে গিয়া উক্ত গিরিশৃঙ্গ হইতে গঙ্গার স্রোতে নিক্ষিপ্ত হইয়া জীবন হারাইয়াছিল। তদবধি ললিতা বিধবা।

জন্মার্দ্দন মিশ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত। ললিতা তাঁহার একমাত্র স্নেহবন্ধন। সংসারে অর্থের অভাব ছিল না। অপত্যবৎসল পিতা মাতৃহীনা ললিতাকে বুকে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে

গৃহে রাখিবেন, এ সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। নিখিল বিশ্বে এক ললিতা ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিবার আর ত কেহ ছিল না। কিন্তু বিধাতার খেলা-ঘরে মানুষ যাহা গড়িয়া ভুলে, দেবতার নির্ম্মম কঠোর অলক্ষ্য হস্তস্পর্শে তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। ললিতার কপাল পুড়িল। পিতার স্নেহপ্রাণ হৃদয় এই নিদারুণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভগবানের নাম লইয়া ব্রাহ্মণ তখনই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। বালিকার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহাকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কাব্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ললিতা গীতাও পাঠ করিল। পিতার অবিচল পরিশ্রম ও যত্নে মেধাবিনী ললিতা সে গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিল; ধর্ম্মশিক্ষারও অনেক উন্নতি হইল। কিন্তু অধিক দিন পিতার স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয় তাহার অদৃষ্টে সহিল না।

বাইশ বৎসর বয়সে ভরা যৌবনের বোঝা লইয়া ললিতা বিশাল সংসার সমুদ্রে একাকিনী ভাসিয়া চলিল। পিতৃশোকাতুরা বিধবা শিক্ষা ও সংযম-বলে নিরাহার শয্যাঘাত সহ্য করিয়া ভূমিশয্যা ত্যাগ করিল। পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণও ত আবশ্যক। গৃহে প্রাচীনা পরিচারিকা ভিন্ন তাহার একমাত্র অভিভাবক, সহিসী, বা সহচরী স্বরূপ রহিল।

মহাভারতের পবিত্র কাহিনী ললিতা শতবার পাঠ করিয়াছে, কিন্তু তাহা চিরনূতন। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যের পুণ্য চরিত্র, অতীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, পবিত্র ধর্ম্মভাব এই মহা গ্রন্থের প্রত্যেক ছত্রে কি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। হিন্দুর অতীত গৌরব, বীর্য্য, সত্যনিষ্ঠার কাহিনী, মহত্ত্বের মহিমা ললিতার হৃদয়ে কি গভীর অপূর্ব্ব ভক্তির সঞ্চার করিয়া দিত। তাই বয়সে বারবেই পবিত্রা প্রত্যহ হিন্দুর গৌরবোজ্জ্বল অতীত কাহিনীর মহাগ্রন্থ পাঠ করিত।

ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, চিরকুমার ভীষ্মের পবিত্র কাহিনী পাঠ করিতে করিতে বিধবার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত। এমন বীর, এমন সাধু, এত উদার, এত মহান আর কে? কতবার সে ঋষিকল্প শান্তনুনন্দনের বিচিত্র রাজ্যত্যাগ, অনুপম সংযমের কথা পাঠ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি কখনও তাহা পুরাতন হইল না! মহাভারতের অনন্ত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের প্রান্ত, শান্তির অপরাহ্ণের আলোকে পরিবর্ত্তনশীল শোভন মেঘমালা ও আলেখ্যদীপ্তির ন্যায়, তাহা নূতন বর্ণরাগে রঞ্জিত।

পড়িতে পড়িতে সহসা ললিতা চকিতা হরিণীর ন্যায় মহাভারত উপযুক্ত বাতায়নের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ও কি! কিসের শব্দ?

ললিতা নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিল। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। সেই অনির্দ্দিষ্ট তিমিরগর্ভ হইতে কোনও দেববীণার মধুর ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর তান ক্রমশঃ উচ্চ সপ্তকে উঠিয়া নীরব নৈশ আকাশ মুখরিত করিতেছিল। এ কি সুর-সৃষ্টি! কি মর্ম্মস্পর্শী, করুণ, কোমল, উদার অভিনব রাগিণী বাজিতেছিল! কে বাজায়?

মহাভারত তুলিয়া রাখিয়া বিধবা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে চারি দিক নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বাতায়নের নিম্নে ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। তথা হইতে প্রত্যহ প্রভাতে ললিতার পূজার পুষ্প আহরিত হইত। উদ্যানের পার্শ্বেই স্বচ্ছসলিলা গোমতী। বীণার তান উদ্যানের বাহিরে অতিনিকটস্থ কোনও স্থান হইতে ঝঙ্কৃত হইতেছিল। বীণা কখনও উপলঘাতিনী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর ন্যায় অস্ফুটকলরবে নৃত্য করিতেছিল; কখনও বিশাল জলপ্রপাতের ন্যায় ঝর্ ঝর্ রবে যেন নিঃশব্দ প্রকৃতির বন্দনা করিতেছিল; কখনও ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনাকে বিদীর্ণ করিতে চাহিতেছিল। বাদকের অঙ্গুলিতে কি তাহার প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছিল? রাগিণীর প্রতি ঝঙ্কারে ললিতার হৃদয়ের এক একটি অপরিচিত অংশ যেন মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া আজ চিরপরিচিতের মত তাহার মানস-নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল।

এ কি কোনও দেবতার বীণাধ্বনি? মানব-হস্তে এরূপ বিচিত্র সুর-সৃষ্টি অসম্ভব। এত পবিত্র, মধুর, সুন্দর, শান্তিসুধাপূর্ণ বীণারব যদি কোনও মানবের অঙ্গুলিতাড়নে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তিনি পুরুষ বা নারী, যেই হউন না কেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন, তিনি পূজার যোগ্য।

বন্দনার রাগিণী, স্তুতির ঝঙ্কার সহসা পরিবর্ত্তিত হইল;—বীণা আর এক নূতন ছন্দে বাজিতে লাগিল। সে ছন্দ, সে রাগিণী ললিতার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। সে যেন আহ্বানের সুর, জাগরণের সুর। ললিতার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে রাগিণীর স্রোত যেন পুণ্য জাহ্নবীধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তাহার বোধ হইল, বীণা যেন ডাকিতেছে,—'উঠ, জাগ, আর কত ঘুমাইবে? এখন আর তন্দ্রাঘোরে মগ্ন থাকিও না। পূর্ব্ব গগনে আশার অরুণ দীপ্তি ফুটিয়াছে। নিদ্রার মায়া-আবরণ ফেলিয়া দাও। অন্ধকারের শেষ—নিদ্রার সমাপ্তি! এখন উঠ, জাগ; প্রাণ ভরিয়া দিব্য জ্যোতিঃ,—মুক্তির আলোক দর্শন কর!'

তুমি কে, কোন্ দেবতা, আজ কোন্ অদৃষ্ট শক্তিবলে ললিতার হৃদয়ে রাগিণীর সুরে এই অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ করিলে? সত্যই কি বীণায় নহে, বাদকের অঙ্গুলিস্পর্শে এই নবভাবের স্ফুরণ, না ললিতার অধ্যয়নক্লান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? বিধবা ভাবিতেছিল, কবে তাহার আশাশূন্য অন্ধকার, দীর্ঘ রজনীর প্রভাত হইবে? কবে সে নবীন আশার অরুণ রাগে মুক্তির পথ দেখিতে পাইবে! তাহার জীবনের কালরাত্রি ত প্রভাত হয় না!

বীণা নীরব হইল। ললিতার মানস-কক্ষের সমস্ত আলোকও যেন সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাহার বোধ হইল, এতক্ষণ যেন সে স্বপ্নঘোরে কোন ইন্দ্রলোকে, আলোকসমুজ্জ্বল পুষ্পগন্ধব্যাকুল নন্দনবনে বিচরণ করিতেছিল; স্বপ্নভঙ্গে আবার অস্থিকঙ্কালময় চিরপরিচিত শ্মশানে ফিরিয়া আসিয়াছে!

২

প্রাচীনলাটে সত্য সত্যই তখন উষার কনক-মুকুট উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল! কৃষক-ললনার গোধূম-পেষণযন্ত্রের শব্দ কুটীরে কুটীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। উষার বাতাস নিদ্রাশ্রান্ত নগরীর অঙ্গে নূতন জীবনপ্রবাহ বহন করিয়া আনিতেছিল।

সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

স্নানান্তে বিধবা পট্টবস্ত্র ধারণ করিয়া পূজায় বসিল। কিন্তু আজ ভগবানকে সে কোনও মতেই প্রাণ ভরিয়া একান্ত বিশ্বস্তভাবে ডাকিতে পারিতেছে না কেন? ডাকিতে গেলেই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। অন্তর আকাশেও যেন একখানি জলভরা মেঘ ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। পরলোকগত পিতার কথা মনে করিয়া ললিতা শেষে খুব খানিকটা কাঁদিল। এই ক্রন্দনের কোনও কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না বটে, কিন্তু মনের অনেক ভার লঘু হইল। তখন সে গৃহকর্ম্মে মন দিল।

সন্ধ্যার অঞ্চলস্পর্শে অপরাহ্ণের ম্লান আলোকরেখা মুছিয়া গেল। গোমতীর স্বচ্ছ সলিল কালো হইয়া আসিল। দূরে পথের রেখা আর দেখা যায় না। ললিতা তখন গৃহে প্রদীপ জ্বালিল। দিনের বেলা সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে আবার জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্য দিন ললিতা এমন সময় পড়িতে বসিত; কিন্তু আজ সে আগ্রহ কিছু শিথিল। তাহার মন যেন কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

এইরূপে সারাদিন কাটিল। রহিয়া রহিয়া ললিতার কি শ্রান্তিবোধ নাই?

দাঁড়াইয়া থাকিয়া আর ভাল লাগে না। যুবতী কোলের কাছে একখানি বই টানিয়া লইয়া, পড়িতে বসিল।

"আষাঢ়ের প্রথমদিবসে—" কই? আকাশের কোথাও এতটুকু মেঘের রেখাও ত দেখা যায় না। কেবল অবিচ্ছিন্ন নীল আকাশ, ছুটেমেলিত ছায়া। আষাঢ়ের মেঘমেদুর অম্বরে আলোর আলোক হয় ত প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু মুক্ত নির্মল আকাশ নিতান্ত নিষ্ঠুর। বিনা আবরণে তাহার কোনও অংশ অস্পষ্ট নহে। মেঘদূত খুলিয়া রাখিয়া ললিতা আবার চিন্তামগ্ন হইল।

কোথায়, তুমি কোথায়?—সে কে? যুবতী আমার কথা ভাবিতেছে? ললিতা? তাহা জানে না। কিন্তু তাহার কানের ভিতর হইতে প্রবেশ করিয়া কেহ যেন অতীতকালে বলিতেছিল,—তুমি কে, তুমি কোথায়? কবে তুমি আসিয়াছিলে, কখন ফিরিয়া গিয়াছ? আবার কখনও আসিবে কি না, জানি না। তুমি রমণী কি সুরভি, স্বপ্ন কি স্থূল, তাহাও জানি না। কিন্তু শুধু হৃদয়ে, শূন্য অন্তরে এ কি প্রলাপ, কি বুদ্ধিবিভ্রম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! কোথায় ইহার শেষ, কবে ইহার সমাপ্তি, কিরূপেই বা নিরাকরণ, তাহা কে বুঝাইয়া দিবে?

কোতোয়ালীতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। এত রাত হইয়াছে? বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঝনন্ ঝনন্ ঝন্! প্রলয়ওঙ্কনের ন্যায় বীণা-রব পূর্ব্বপ্রদোষের ন্যায় আজিও নৈশ সমীরণকে ব্যাকুল করিয়া বাজিয়া উঠিল। আবার স্বপ্ন! নূতন সুরে, অভিনব ছন্দে, বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, বীণা গ্রামে গ্রামে উঠিতে লাগিল। বিস্ময়মুগ্ধা যুবতী তন্ময়চিত্তে সুধাবর্ষণ রাগিণী শ্রবণ করিতে লাগিল। সুরের বিরাম নাই। ললিতারও ক্লান্তি ছিল না।

বাজিয়া বাজিয়া বীণা শেষে নীরব হইল।

প্রতি রজনীতে এইরূপ ঘটিতে লাগিল। নিত্যই বীণা বাজে, ক্রমশঃ শেষে মিলিয়া যায়। দিনের পর দিন এই বিচিত্র ব্যাপার চলিতে লাগিল। কিন্তু এই অদ্ভুত, অনাবিষ্কৃত বীণাবাদকের আবিষ্কার করিতে কোন আগ্রহ ছিল না। বীণার ঝঙ্কারটুকুই তাহার সর্ব্বস্ব।

[illegible] [illegible] [illegible] [

ললিতা সেইরূপ বীণাখানি বক্ষে করিয়া রুদ্ধ দুইদ্বার খুলিয়া গবাক্ষোদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিধবা ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল,—দূরে নক্ষত্রলোকেও যেন সেই বিচিত্র রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে। অটালিকার পানে দৃষ্টি ফিরিল। তাহার শূন্যবক্ষের ক্ষীণ দীপরশ্মিও যেন রাগিণীর তালে তালে নাচিতেছে। ক্লান্ত নয়নদ্বয় তুলিয়া ললিতা আশে পাশে, চারি দিকে চাহিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবীই কি রাগিণী-স্বপ্নমগ্ন!

ললিতা অনুভব করিল, চতুর্দ্দিক হইতে কাহারা যেন নীরবে কি ইঙ্গিত করিতেছে। কে ইঙ্গিত করিতেছে, কিসের ইঙ্গিত?

স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় বিধবা প্রাচীরসংলগ্ন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে গোমতী। অনতিদূরে একটি নিকুঞ্জ। বীণাধ্বনি তথা হইতে আসিতেছিল। ললিতা থমকিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রকিরণপ্লাবিত গোমতীর তটদেশে যোগমগ্ন প্রস্তরের ন্যায় শুভ্রবসন, রুদ্রাক্ষকেশ, ঋষিকল্প এক ব্যক্তি নিমীলিতলোচনে বীণাবাদন করিতেছিলেন। রজতশুভ্র যজ্ঞোপবীত তাঁহার স্কন্ধদেশে বিলম্বিত। নির্ব্বাক আনন কি শুভ্র পবিত্রতা! তাঁহার প্রশস্ত ললাট ও বিশাল বক্ষঃস্থল স্বাস্থ্য ও সংযমের পরিচয় দিতেছিল। বিস্ময়মুগ্ধ বিধবা অনিমেষনেত্রে সেই অপূর্ব্বদর্শন, দিব্যকান্তি মহাপুরুষের মহিমাব্যঞ্জক দেহে নিবদ্ধ হইল।

বহুক্ষণ বাজিয়া বাজিয়া বীণা নীরব হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাদক ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কবে সে দিন আসিবে? কবে তোমার ললাটে ঊষার প্রসন্ন হাসি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে? আমার আশা কি পূর্ণ হইবে না?"

অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টি সহসা ললিতার প্রতি পতিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

কি স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর! ললিতার হৃদয় কাঁপিতেছিল। হৃদয় কম্পিত হইলে অনেক সময় দেহেও তাহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিধবার মুখ কথা ফুটিল না।

পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে পুরুষ বলিলেন, "কে তুমি? অনুমানে বোধ হইতেছে, কোনও গৃহস্থকন্যা। কিন্তু এ সময়ে এখানে কেন?"

কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? যুগ যুগ ধরিয়া এই প্রশ্ন সৃষ্টির বক্ষে ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু তাহার উত্তর কোথায়?

রমণীকে নীরব দেখিয়া বীণাবাদক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বীণাযন্ত্রটিকে রক্ষা করিয়া স্নেহকোমলকণ্ঠে বলিলেন, "ভুমি যেই হও, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। গৃহস্থললনার পক্ষে এ সময়ে এ স্থান উপযুক্ত নহে। তোমার আত্মীয়েরা দেখিলে কি বলিবেন?"

অন্য সময় হইলে নারীসুলভ লজ্জাবশতঃ হয় ত ললিতা অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে ইতস্ততঃ করিত। কিন্তু সঙ্গীতের প্রভাবে, যামিনীর অন্ধকারে তাহার আত্মা ঐহিক সংস্কারের বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। সংসারবুদ্ধি বা বিবেচনাশক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বাঁধ ভাঙ্গিলে রুদ্ধস্রোত নদীর সঞ্চিত জলরাশি প্রবল উচ্ছ্বাসে ছুই কূল ভাসাইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। ললিতার পরিপূর্ণ হৃদয় সন্ন্যাসীর কোমলস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লজ্জা ও সঙ্কোচের ব্যবধান অন্তর্হিত হইল। সে তাহার আশাসম্পর্কশূন্য, সুখলেশহীন জীবনকাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। এই বিরাট বিশ্বে সে একাকিনী। যৌবনের দীপ্ত-মধ্যাহ্নে বিরাট চিতা হৃদয়ে জ্বালিয়া সংসারের এক প্রান্তে পড়িয়া আছে; তীব্র তাপ সহিয়া সহিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। শিক্ষা ও সংযমে কিছু শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু আগুন একেবারে নির্ব্বাপিত হয় না। ঐশ্বর্য্যে সুখ থাকিতে পারে, কিন্তু শান্তি কোথায়? অতৃপ্তির বোঝা বহিয়া বহিয়া যখন সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে দৈবপ্রেরণাবশে, ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদে হৃদয়ে তাহার শুষ্ক মানসে প্রস্ফুটপুঞ্জ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কি অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দ-প্রস্রবণ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে। অপরিচিত সাধকের বীণাধ্বনিতে তরুণ অরুণের উজ্জ্বল আলোকরেখা অনুভূত হইতেছে। তাই আজ ললিতা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; আনন্দ-নির্ঝরের মূলে ছুটিয়া আসিয়াছে।

কথা শেষ করিয়া ললিতা কম্পিতস্বরে বলিল, "আমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া হতভাগিনীকে ক্ষমা করিবেন।"

ব্রহ্মচারী স্থির, অবিচলিতভাবে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার বাক্যে বা ব্যবহারে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। প্রশান্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যুবতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "কল্যাণি! কাল হইতে বীণা আর বাজিবে না। এখন গৃহে যাও। যদি জানিতাম, বীণাধ্বনি শুনিয়া কোনও নারী অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে

সতর্ক হইয়াছি। নির্জ্জন স্থল ভাবিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, বিষম ভ্রম করিয়াছি।"

আর বীণা বাজিবে না?—কি মর্ম্মান্তিক মিথ্যা সত্য! ললিতার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। শান্তিধারাশীতল বীণাঝঙ্কার আর সে শুনিতে পাইবে না; হৃদয়ের দীপ্ত চিত্তানল যে রাগিণীর অমৃতধারায় ক্রমশঃ শান্ত দীনতেজ ও শীতল হইতেছিল, সে সুধালোত আর বহিবে না। অপূর্ব্ব তৃপ্তি, সুকোমল সান্ত্বনা মুহূর্ত্তের স্বপ্নস্বপ্নের ন্যায় ভাঙিয়া যাইবে?

সহসা কাতরকণ্ঠে ললিতা বলিল, "আমি আর আসিব না; আর আপনার নির্জ্জন আরাধনার ব্যাঘাত করিব না। এখানে বসিয়া বীণা বাজান; কেহ আপনাকে বাধা দিবে না। আমি চলিলাম। শুধু এই নিবেদন, বীণাবাদন বন্ধ করিবেন না। উহাই আমার জীবনশক্তি। বীণা বন্ধ হইলে আমি বাঁচিব না।"

যুবতী আর দাঁড়াইল না। বসন্ত বায়ুর মত ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কিন্তু ললিতা গতিরোধ করিতে পারিল না। আবশ্যিক একটা বালিলে ভক্ত যেমন অধীরভাবে দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষায় মন্দির দ্বারে ছুটিয়া যায়, পর দিবস বীণা বাজিবামাত্র ললিতাও তেমনই ব্যাকুলভাবে গৃহদ্বার বাহির হইল। কোনও ক্রমেই সে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না।

এত কালের শিক্ষা সংযম কোথায় ভাসিয়া গেল? যুবতীর হৃদয়-নদীতে হৃদি কূল ভাসাইয়া বান ডাকিয়াছিল; সে স্রোতোবেগ কে রুদ্ধ করিবে?

আলোকপ্লাবিত মুক্ত আকাশতলে, নদীতীরে—যেখানে বসিয়া অপরিচিত সাধক রাগিণী আলাপ করিতেছিলেন, ললিতা ব্যাকুলভাবে তথায় উপনীত হইল।

বোধ হয়, ব্রহ্মচারী আজ তেমন নিবিষ্টচিত্তে, একাগ্রভাবে সাধনা করিতে পারিতেছিলেন না, কিংবা ললিতার দ্রুত পদশব্দ বা ব্যাকুল নিশ্বাসপতনে বায়ুস্তরে অস্বাভাবিক স্পন্দন উৎপন্ন হইয়াছিল। যে কারণেই হউক, সাধকের যোগভঙ্গ হইল।

তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে শুভ্রবসনা দেবীপ্রতিমা। অপ্রসন্নভাবে সন্ন্যাসী বলিলেন, "আবার আসিয়াছ?"

সে মৃদু-তিরস্কারে ললিতার মর্ম্মস্পর্শ করিল; কিন্তু সে স্থানত্যাগ করিল

না। যে রাজনীতির মোহ পুরুষের হৃদয়ের এত দিন দূর হইয়াছে, তাহার আশা পরিত্যাগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সরিতা মনিবে, কিন্তু বীণাঝঙ্কারের প্রলোভন কখনই সম্বরণ করিতে পারিবে না। সে মুক্তকণ্ঠে মরিবে, আমায় বলিবার কিছু নাই, আমার সান্ত্বনা করার। বীণারবের অন্তর্ধান হইতে আমরক্ষা করিতে পারিব না। আমি অনুমতি করুন, আমি এখনই যেন উহা শ্রবণ করিতে পাই। উহার সঙ্গে আমি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।"

বিমলেন্দু নীরব বিস্ময়াভিভূতের ন্যায় কিয়ৎকাল এই অপূর্বচরিত্রা নারীর মুখ চাহিয়া রহিলেন। তার পর গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "কল্যাণি, তুমি কল্পনায় হৃদয় মুগ্ধ হইও না। সংসারে সকলেই কাজ করিতে আসিয়াছে, তোমার কি কোনও কাজ, কোনও কর্তব্য নাই?"

কাজ? সে কিরূপ? যাহার, স্বামী, সন্তান, সংসার? তাহাতে আনন্দ কই? কর্তব্য কর্ম কি, তাহা ত সরিতা জানে না! সে কেবল আজীবন রোদনই শিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া কখন উহা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা সে অবগত নহে। কেহ ত তাহাকে প্রয়োগবিধি শিখায় নাই! পিতার নিকট সে ধর্মশিক্ষা পাইয়াছিল বটে; কিন্তু ধর্ম ও কর্মের যে এতদূর সম্বন্ধ, সে তাহা কখনও শিক্ষা করে নাই। অবকাশও ঘটে নাই।

সংসারে যাহার পুত্র কন্যা, স্বামী, পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন আছে, সে তাহাদের সেবায়, আহারে সন্তোষ আনয়ে, সুখে দুঃখে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। কিন্তু যাহার কেহ নাই, সে এতবড় সংসারে থাকিয়া নিঃসঙ্গ দুর্বহ জীবনভার কেমন করিয়া বহন করিবে? তাই ভগবানকে ডাকিতে সরিতাকে কেহ শিখায় নাই। তাই অবজ্ঞানিত দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াও সরিতা তৃপ্তির জ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছে।

হতাশভাবে সরিতা বলিল, "তবে আমার উপায় কি হইবে? শুধু কাঁদিয়া কর্তব্যহীন জীবন কেমন করিয়া কাটাইব? যে আকর্ষণ আমার হৃদয়ের আবাল্য অধিকারের হৃদয়তন্ত্রিগুলির মধ্যে যে বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন আমার উপায় কি?"

নীহারনীরদ স্নেহে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কল্যাণি, অনুশোচনা ত্যাগ কর। কর্তব্যে মনোযোগ দাও। আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবে। প্রাণের তৃষ্ণা কখনও মরিবে না। তবে উহা সহজ, আমার ব্রত পালনে যোগদান করিবে।

[illegible] বিশ্বের ধ্বংস ডেকে আনবে। নিজে [illegible] ধ্বংস ডেকে আনবে না কেন?"

[illegible] তাই হউক। [illegible] ধ্বংস [illegible] পারে, তাহা হইলে তাহার আগে কিছু [illegible] সে [illegible] করিবে, নিশ্চয় করিবে।

সন্ন্যাসী বুঝিলেন, শিষ্য [illegible] নহে, [illegible]

অনেকের কতিপয় দিন ও রাত্রি [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] আলোক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বলিল, "আপনি কি?"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

নাই। সুতরাং হত্রমন্ত্রিণে এখন বেগমের একাধিপত্য। এই সুযোগে কেহ তাহাকে বিষপান করিবেন। বিষের অভাব নাই। বেগম বুদ্ধিমতী, উদারহৃদয়া। বিষের ইচ্ছামত সে সেখানে কার্য্যদান করিতে পারিবে। অতএব তোমার সেখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।"

তার পর ব্রহ্মচারী ললিতার কানে কানে অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন।

শুনিতে শুনিতে ললিতার সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। নয়নে অস্বাভাবিক আলোকরশ্মি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ললিতা বলিল, "এত বড় মহৎ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার একটা নারীর উপর দিলেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "নারীকে আমি মন্ত্রের সহিত সৃষ্টি করি। আমার বিশ্বাস, নারীর সাহায্য ব্যতীত কোনও মহৎ কার্য্য পৃথিবীতে সাধন করা যায় না।"

ললিতা সন্ন্যাসীর পদধূলি মাথায় দিল।

৫

অপরাহ্ণ হইতেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। অপরাহ্ণে গগনমণ্ডল নিবিড় নীরদজালে আচ্ছন্ন হইল। বায়ুর বেগও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। ঝটিকা আসন্ন। গোমতীর স্বচ্ছ সলিলরাশি মেঘের ছায়ায় কৃষ্ণচ্ছবি।

হত্রমন্ত্রিণের একটি কক্ষে দাঁড়াইয়া ললিতা আকাশের পানে চাহিয়া কি দেখিতেছিল। এক মাস ধরিয়া সে ব্রহ্মচারীর আদেশ পালন করিতেছে। প্রত্যহ অপরাহ্ণে তাঁহার নিকট হইতে বেগমের কাছে সে সংবাদ বহন করিয়া আনিত, এবং বেগমের কথা তাঁহাকে জানাইয়া আসিত। সে কার্য্যে তাহার একটা প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। এমন নূতনতর কাজের কথা সে পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। তাহা কল্পনারও অগোচর! কি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন! যজ্ঞ পূর্ণ হইলে, কি মুক্তি, কি আনন্দ! ললিতা দিবারাত্র এই মহান্ কর্ম্মযজ্ঞের কথা চিন্তা করিত; নবীন আশায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইত। এত বৃহৎ কর্ম্মের এতটুকু অংশ যে তাহার ভাগে পড়িয়াছে, তজ্জন্য সে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ওমরাকে ডাকিয়া যথার্থ অর্থ এত দিন পরে সে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এতদিন হত্রমন্ত্রিণে থাকিবার তাহার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে দিন লক্ষ্ণৌয়ে প্রলয়-ঝটিকা প্রবাহিত হইল, তাহার পর দিবস হইতে ললিতা ব্রহ্মচারীর আদেশে বেগমের

আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। নগরে ঘোর অশান্তি। প্রাসাদের চারিদিক হইতে কোলাহলধ্বনি শুনা যাইতেছিল। তাহা যে বিদ্রোহীদের জয়োল্লাসের মুহুর্মুহু গর্জন, আর্ত্ত চীৎকার, উন্মত্ত হেষাধ্বনি হইতে, আশার ও নিরাশার দ্বন্দ্ব!

ললিতাও এক স্থান হিন্দু একটী মেয়ার ঘোরে, প্রবল আশাময়ী কিন্তু ভীতা লোকে বসিতেছিল। বেগমের সকল আজ্ঞা ও নির্দ্দেশ, বিশ্বাস ও ভরসার একমাত্র তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ বে ভুলিয়াছিল।

নীরবতায় দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া। আকাশে দামিনী হাসিতে লাগিল। সহসা প্রেলয়কালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় একবারে শত শত ভীষণ স্বরে যোদ্ধগণ কাঁপিয়া উঠিল। বেগম কক্ষান্তর হইতে বাহিরে পার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন। আমেয়াস্ত্রের মৃত্যুলীলা আজ প্রভাত হইতে এত ভয়ঙ্কর হয় নাই; আবার সহসা অভিনব আরম্ভ হইল না কি?

অন্তঃপুররক্ষক খোজা খাবাস্ পদশব্দেই দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখমণ্ডলে উৎকণ্ঠার চিহ্ন।

বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত ঘোর কেন?"

খোজা উত্তর করিল, "প্রায় পাঁচ হাজার নূতন সৈন্য সিপাহীদিগকে বিদি মারিছে তোপের মুখে সিপাহীরা পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে মরিতেছে।"

বেগম জানু পাতিয়া ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। দুই হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "হে আশ্রয়দাতা ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এত দিনের সাধনা সব নিষ্ফল হইল, এই যা দুঃখ। শেষ রক্ষা হইল না!"

বেগমের কমলনয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ললিতা ইতিপূর্ব্বে বেগমের এরূপ চাঞ্চল্য দেখে নাই। তাহারও দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল।

বেগম আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কম্পিতকণ্ঠে ললিতাকে বলিলেন, "ভগিনী, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা ও সহায় কখনও ভুলিব না। এখন হইতে তোমায় ছুটী। তুমি গৃহে যাও। তোমার আর এখানে নিরাপদ নহে। তোমার কোনরূপ ক্ষতি হইলে আমার মৃত্যুর অধিক হইবে। এখনও সময় আছে। সিপাহীরা নিরাপদে তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসিতে পারে। তুমি যাও।"

ললিতা হাসিয়া বলিল, "বেগম সাহেব, বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এখানে আপনার আশ্রয়ে আছি। কিন্তু যুদ্ধে গেলে কে আমায় রক্ষা করিবে? আমার লোক জন সব এই দুর্দ্দিনে পলাইয়াছে। আমি এখানেই থাকিব। গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত কোথাও যাইতে পারি না।"

বেগম সে কথার কোনও উত্তর করিলেন না।

ললিতা তখন দূরে কি দেখিতেছিল। তাহার বোধ হইল, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী যেন ছত্রমঞ্জিলের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় ললিতার হৃদয় কম্পিত হইল। সে বেগমকে ডাকা দেখাইল।

খোজা আসাদ আবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ। সে সংক্ষেপে জানাইল, "বেগম সাহেবাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বহুসংখ্যক রাজসৈন্য আসিতেছে। এখন কি হুকুম?"

বেগমের মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কাপুরুষের মত ধরা দিব না; বরং মরিব। সমস্ত ফটক বন্ধ করিয়া দাও।"

ললিতা বলিল, "তার পর?"

বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাসাদে কত সিপাহী আছে?"

খোজা উত্তর করিল, "বিশ পঁচিশ জন হইবে। তাহারা সকলেই বেগম সাহেবার রক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প।"

"তাহাদিগকে বল, আমি প্রাণ থাকিতে ধরা দিব না।"

ললিতা তখন উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বেগম সাহেবের মান ইজ্জত রক্ষার ভার তোমাদের উপর। বীরপুরুষেরা কখনও নিমকহারামী করিবে না।"

সিপাহীরা খোজার আদেশে ফটকের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রাচীরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ললিতার কথা শুনিয়া তাহারা জয়ধ্বনি করিল।

ঝড়ের ন্যায় বেগে অসংখ্য রাজসৈন্য ছত্রমঞ্জিল অবরোধ করিল। তাহাদের হস্তে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ প্রতিমুহূর্ত্তেই অগ্নিনিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ললিতা দেখিল, শত্রুসৈন্যের নিক্ষিপ্ত অগ্নিতরঙ্গে মুষ্টিমেয় সিপাহী মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া যাইবে। ছত্রমঞ্জিলের একখানি ইষ্টকও অবশিষ্ট থাকিবে না।

বেগমের মুখ বিষণ্ণ, কিন্তু তাহাতে ভয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি মৃত্যুর

তত্ত্ব প্রদান করেন। তিনি আমাদের কল্যাণের প্রতিরূপ করিবেন। তাহাতে বিশ্বাস রহিলে এত আয়োজন। তিনি যেমনভাবে আমাদের রক্ষা করিবেন তাহার জন্য কোনরূপ অভ্যাচার হইবে না। মাজিস্ট্রেটের অধ্যক্ষ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বেগম অকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার মৃতদেহ লইয়া যাইতে পারে!"

মলিতা কি ভাবিতেছিল। সহসা বিহ্বাদিবাসের আর একটি কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। হায়! হায়! এতক্ষণ এ কথাটা তার মনে পড়ে নাই কেন? কিন্তু এখনও হয় ত সময় আছে।

ছত্রমঞ্জিল হইতে গোমতীর নিম্নভাগ দিয়া একটি সুড়ঙ্গ ছিল। ঐ অর্থব্যয়ে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেগমের মুখে সে সুড়ঙ্গের কাহিনী সে পূর্ব্বে শুনিয়াছিল। শ্মশানাগারের নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গের মুখ, এবং গোমতী পার হইয়া আর দুই ক্রোশ দূরে উহার শেষ। সুড়ঙ্গ-পথে গোপনে পলায়ন করিলে তখন দিন রক্ষা হইতে পারে।

মোল্লা মলিতার প্রস্তাবের সমর্থন করিল। সে বহুকালের পুরাতন ভৃত্য। সুড়ঙ্গের পথ যে বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছে। তেহ শাসিবার পূর্ব্বে পলায়ন করাই সঙ্গত।

বেগমের এ কথাটা আদৌ মনে হয় নাই। কিন্তু তিনি বলিলেন, "গোপনে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিব?"

মলিতা বলিল, "বৃথা মৃত্যুকে ডাকা কি? বাচিয়া থাকিলে পুনরায় চেষ্টা করিতে পারিবেন।"

"তবে তুমিও আইস।"

"আমি শুক্লকে সহিত দেখা না করিয়া যাইব না। আমার জন্য কোনও চিন্তা নাই। আমি ত বেগম নহি। শীঘ্র যান, শত্রুপক্ষ কামান তুলিতেছে।"

দুড়ুম্ করিয়া শব্দ হইল। ছত্রমঞ্জিলের উপর দিয়া একটা শিলাখণ্ড চলিয়া গেল। অগত্যা বেগম পলায়নের উপক্রম করিলেন। মলিতা বলিল, "এত দিন দাসীপনা করিলাম, কিছু ইনাম দিবিবে না? আপনার ঐ পোষাকটি আমি চাই।"

বেগম অবিলম্বে তাহার আবদার পূর্ণ করিলেন। তাহার পর নিজে বোরখা ও একটি পরিচারিকা সহ সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর কেহ যাইল না।

* * * * *

উভয়পক্ষের সেনাগণ সবিস্ময়ে দেখিল, রাজপ্রাসাদের অলিন্দের উপর এক মহীয়সী নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। তাহার মস্তকে মণিমণ্ডিত মুকুট। সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার। হস্তে তরবারি। এই বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তি দেখিয়া বেগমের সিপাহীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, বেগম স্বয়ং আজ রণ-বেশধারণ করিয়াছেন! তখন সেই রত্নালঙ্কারবিভূষণা নারী চীৎকার করিয়া বলিল, "নবাবের বেগম কখনও আত্মসমর্পন করে না; তাহার পূর্ব্বে বেগম মরিবে। কিন্তু শুধু মরিব কেন, অন্ততঃ দুই দশ জনকে মারিয়া মরিতে হইবে।"

বিশ জন ভক্ত সিপাহীর কণ্ঠে আবার জয়ধ্বনি শ্রুত হইল; একসঙ্গে বিশটি বন্দুক রাজসৈন্য লক্ষ্য করিয়া গুলিনিক্ষেপ করিল। তখন উভয় পক্ষে ঘোর-হুর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আসন্ন ঝটিকাও সময় বুঝিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বারিধারা নামিয়া আসিল। অন্ধকার চারি দিকে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

ললিতা তখন যুক্তকরে ভগবানকে ডাকিতেছিল। যুদ্ধের কোলাহল, মেঘের ও কামানের গর্জ্জন, কোনও শব্দই তখন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। আজ তাহার হৃদয় অসীম উল্লাসে নাচিয়া উঠিয়াছে;—আজ কি আনন্দ, কি তৃপ্তি! মুক্তির আলোক কোথায়?

সহসা বামপার্শ্বে ললিতা একটা নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নমূল লতার ন্যায় ললিতা ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আর এক ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ললিতার চৈতন্য তখনও তিরোহিত হয় নাই। অভ্রান্ত আলোকে সে ব্রহ্মচারীকে চিনিতে পারিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ললিতা, ললিতা, তুমিই সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে! কর্ম্মের উদ্‌যাপন তুমিই করিয়াছ! আজ আর তোমায় কিছুই লুকাইব না। ললিতা! তুমি বিধবা নহ! সতী সধবার উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা তোমার ললাট হইতে মুছিয়া যায় নাই। তোমার স্বামী হরিদ্বারের গঙ্গাসলিলে প্রাণ হারায় নাই। কোনও মহাত্মার কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সংসারের সুখনীড়ে রমণীর সুশীতল অঞ্চলচ্ছায়ায় শয়ন করিয়া সম্পাদন করা সুকঠিন। তাই এই আত্মগোপন। আমিই শ্রীগোবিন্দ।"

লতিতার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখকমল আবার প্রসন্ন হইল। ক্ষীণকণ্ঠে সে শুধু বলিল, "প্রভু! পায়ের ধূলা দাও।"

মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। প্রবলশব্দে ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছিল। কামান বন্দুকের শব্দ আর শুনা যায় না।

ব্রহ্মচারী লতিতার সংজ্ঞাশূন্য দেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার-রাশির মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সীমাচল।

—:০:—

অপ্‌লাণ্ড ওয়ালটেয়ারে আমরা এক মাস ছিলাম। আজ কাল অনেকেই ওয়াল্‌টেয়ার দেখিয়াছেন। কিন্তু ওয়ালটেয়ারের সন্নিহিত সীমাচল দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। স্বভাবের সৌন্দর্য্যের জন্যই হউক, অথবা পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াই হউক, সীমাচল একটি দেখিবার স্থান। যাঁহারা ওয়ালটেয়ারে আসিয়া সীমাচল দেখেন নাই, তাঁহাদের অত অর্থব্যয়, অত পরিশ্রম, আমার বিবেচনায় ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। সীমাচলের সুন্দর দৃশ্য একবার সন্দর্শন করিলে মনে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

অপ্‌লাণ্ড ওয়ালটেয়ার হইতে সীমাচলের মন্দির প্রায় ১০।১২ মাইল দূরে, উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। 'বাণ্ডি' ভিন্ন অন্য যানে যাওয়া সুবিধাজনক নহে। 'বাণ্ডি' একপ্রকার ঘোড়ার গাড়ী; কলিকাতার গাড়ীর ন্যায় এ গাড়ীর পার্শ্বে দরজা থাকে না। পশ্চাৎভাগটা কাটা, সেইখান দিয়া উঠিতে হয়। স্থূলকায় আরোহীর পক্ষে তেমন অসুবিধাজনক না হইতে পারে, কিন্তু স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে সে বিষম কষ্টকর, তাহার প্রমাণ আমি নিজেই যথেষ্ট পাইয়াছি; এবং ঈশ্বরকৃপায় যাঁহারা ঐ বিষয়ে আমা অপেক্ষাও দু' পা অধিক অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পদব্রজ ভিন্ন উপায় নাই।

আমি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সান্যাল ও অপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইন্দ্রনাথ মাইতি, আমরা এই কয় জনে যাইব বলিয়া একরূপ

ঠিক হইল। সঙ্গে এক জন চাকর ও সিপাহী যাইবে। খাবার মিছরির মধ্যে সামান্য লুচী ও কয়েকটি কমলা লেবু মাত্র লওয়া হইল। ভিন্ন বলিতে কি, আমি তাহাতে নারপরনাই ক্ষুণ্ণ হইলাম; তবে ভরসার বিষয় এই, শুনিলাম, সেখানে ৺নৃসিংহ দেবের প্রসাদ প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, এবং তাহা অতি উপাদেয়। যাহা হউক, শুনিয়া কতক আশ্বস্ত হইলাম; কিন্তু মনের সংশয় গেল না।

আমাদের জন্য দুইখানি গাড়ী ঠিক করা হইয়াছিল। গাড়ী যথাসময়ে উপস্থিত হইল। আমরা রাত্রি তিনটার সময় প্রস্তুত হইয়া 'ব্যাণ্ডি'তে চড়িয়া রওনা হইলাম। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত রাস্তা পথিকদিগের নিমিত্ত আপনার বিশাল বক্ষ পাতিয়া দিয়া দূরপ্রান্তে ঘুমের সহিত মিশিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে একটির পর একটি, তার পর আর একটি, এইরূপ সারি সারি শৈলমালা মস্তক উত্তোলন করিয়া গগন স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সুমন্দ মলয়মারুত কুসুমসৌরভ হরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের অশ্বযান উষার সেই আঁধার-আলোকমিশ্রিত রাস্তা দিয়া ঘড় ঘড় শব্দে চলিতে লাগিল। আমরাও প্রকৃতির অস্পষ্ট আবছায়া শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে মনের আনন্দে চলিলাম। ক্রমে উষার অন্ধকার তরল হইয়া আসিতে লাগিল; উষা সতী অন্ধকারের নীল শাড়ী অপসৃত করিয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। উষার সেই কাণ্ড দেখিয়া বনের ফুল, গাছের পাতা, মাঠের ঘাস, ঝরণার জল, সকলেই আনন্দহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আর বসন্তের প্রিয় সহচর প্রেমিক-প্রবর পিকরাজ, তিনিই বা চুপ করিয়া থাকিবেন কেন?—প্রাণ-মাতান কুহু-স্বরে চারি দিক মাতাইয়া তুলিলেন। এইরূপে প্রভাত হইল; জগৎ আলোকে পূর্ণ হইল।

আমাদের ব্যাণ্ডি কিন্তু সেই একঘেয়ে ঘড় ঘড় শব্দেই চলিতেছে। চলিতে চলিতে আমরা একটা ছোট পল্লীতে আসিয়া পঁহুছিলাম। ব্যাণ্ডি-ওয়ালাকে সে দেশে ব্যাণ্ডি-ম্যান (Bandi-Man) বলিয়া থাকে। এই লোকটি ইংরেজীতে বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত; কিন্তু আদৌ লিখিতে কি পড়িতে জানিত না। ব্যাণ্ডি-ম্যান বলিল, "বাবু! এই সীমাচল, এইখানে নামিতে হয়।" সে দেশের পল্লীগ্রাম দেখিবার নিমিত্ত বড়ই ব্যগ্র হইলাম; কিন্তু আর সকলের ইচ্ছা, অগ্রে ঠাকুর-দর্শন, তার পর অন্য কাজ। কাজেই আমার পল্লীদর্শনবাসনা সফল হইল না। তখন

বেলা চারটা কি পাঁচটা; পথশ্রমে সুবাদলও বিলক্ষণ প্রান্তক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ঠাকুর-দর্শন না করিয়া ত যাইবারও যো নাই; সুতরাং সে অনল শ্রমেতেই থাকিল, মিটিল না।

এই সময়ে কতকগুলি স্ত্রীলোক "বাবো বাবো!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা কি চায়, কিছুই বুঝিতে না পারায়, অগত্যা সেই Bandi-Man-এর সাহায্য লইতে হইল। সে বলিল, "এক পয়সায় তিনটি করিয়া English পাই, অর্থাৎ 'দামড়ি' দিবে; আপনারা এইগুলি লউন; নচেৎ কিছুতেই উপর হইতে সন্তুষ্টমনে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না। কারণ, এই সীমাচলে অনেক দুঃখী কাঙ্গালী জুটিয়া থাকে।" তাহার কথা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় কতকগুলি পাই লইয়া অগ্রসর হইলাম।

মন্দিরে উঠিবার জন্য পাথরের সোপানশ্রেণী আঁকিয়া বাঁকিয়া অতি উচ্চে উঠিয়াছে। তাহার আশে পাশে ঝরণার জল, নানা জাতি বন্য ফল ফুলের গাছ, মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য সুন্দর আসন, এবং তার পর আবার সোপান-শ্রেণী। নীচে থাকিয়া বোধ হয়, যেন স্বর্গের সিঁড়ি!

অত্যুচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত সিঁড়ি বাঁধান রাস্তা দেখিতে পাইলাম। এই সিঁড়ি দেখিতে অতি চমৎকার। ছয়টি করিয়া ধাপ, তার পর খানিকটা সমতল চত্বর, তাহাও পাথর দিয়া বাঁধান। মধ্যে মধ্যে সমতল স্থান থাকাতেই উঠিতে তত কষ্ট বোধ হয় না; তাহা না হইলে অত উচ্চে আরোহণ অতিশয় দুঃসাধ্য হইত। প্রথমে কয়েক ধাপ উঠিয়াই একটি বৃহৎ গেট (তোরণ-দ্বার) দেখিতে পাইলাম; সেই গেটের পার্শ্ব দিয়া বৃহৎ ধারায় অনবরত জল পড়িতেছে। এই আমার প্রথম ঝরণা-দর্শন। যে ঝরণার বিষয় কত পুস্তকে পড়িয়াছি, কত লোকের মুখে কত রকমের গল্প শুনিয়াছি, আজ সচক্ষে সেই ঝরণা দেখিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিল। মনে বড় আনন্দ হইল। মনে করিয়াছিলাম, এই গেটের নিকটেই বুঝি ভগবান নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি সংস্থাপিত। ছুটিয়া সকলের আগে আসিলাম; কিন্তু সেখানে শুধু সোজা রাস্তা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এ দিকে শরীরও ক্লান্ত হইয়াছিল; কাজেই হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম।

কিছু ক্ষণ পরে গেট পার হইয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। এই সময়ে

নানা প্রকারের খোস গল্প করিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিয়া সকলেই কিছু অবাক। এসিস্টাণ্ট ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "এত বেশী বেঁটে হইবার কারণ কি?" আমাদের মধ্যে অনেকেই বলিলেন, "পাহাড় পর্ব্বতের দেশ, পাহাড়ে উঠিতে গিয়া প্রায়ই হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়।" অথবা হইবে, তবে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারা গেল না। তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় ডাক্তার বাবু ও এসিস্টাণ্ট ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "আমরা আর উঠিতে পারিতেছি না, বুঝি আমাদের আজ ঠাকুর-দর্শন হইল না।" এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা আবার উঠিতে লাগিলাম। এই সময় দেখি, এক জন লোক পেটে করাঘাত করিতেছে, তাহার চারি দিকে দুই চারিটা পাই হড়ান রহিয়াছে; পরিধানে কেবল নেংটী, মাথার দিকটা কেশ বিহীন মাটীতে প্রোথিত, কাজেই মাথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই বিকট আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্য আমরা কিছুক্ষণ যাপন করিলাম। এক জন লোক উপর হইতে নামিয়া আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে বিশেষ কি তামাসা করায় সে বলিল, "এই ব্যক্তি সিদ্ধপুরুষ। দেখুন না সিদ্ধাসন করিয়া কতক্ষণ আছে; কিছু আহার করে না, যে যা দেয়, তাহা নিজে না খাইয়া সমস্তই ঠাকুর সেবায় ব্যয় করে; এরূপ লোক আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় না; আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা ইহার দর্শন পাইলাম।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাই না শুনিয়া আমাদের মাঝির মহাশয় ও এসিস্টাণ্ট ম্যানেজার বাবু ছাতার দ্বারা তাহাকে খোঁচা দিতে লাগিলেন; সুড়সুড়ী পেয়ে সে এ পাশ্ ও পাশ করিতে লাগিল ও ছাতা ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাতে সেই লোকটী বিশেষ বড়ই অসন্তুষ্ট হইল, এবং বলিল, "এইরূপ ব্যবহারে আপনাদের যে কত পাপ হইবে, তাহা কি আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না?" আমরা কিন্তু তাহার কথা না শুনিয়া আরও তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, একটুখানি বিড়ি ও দুই একটী দেশলাইয়ের কাঠি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে ভণ্ড বলিয়া ধারণা সন্দেহ হইল। কেহ কেহ বলিলেন যে, এ লোকটি নিশ্চয় বিড়ি খায়; তা না হইলে দেশলাইয়ের কাঠি ও বিড়ি পড়িয়া থাকিবে কেন?

এই বিষয়ে উপনীত হইয়া, আমরা তাহার যথেষ্ট মাটি সরাইয়া দেখি,

দৃষ্ট এমনই জড়িত-পরিচিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তাহার ভ্রূকুঞ্চনের এই স্থানে দেখিতে যে বিশ্রী আকার হয়, তাহা বোধ করি তাহারা বুঝিতে পারেন; সেজন্য তুলিবার দায় নাই। কিন্তু কুঞ্চনের বিষয়, নিজে নিজে দেখিবার উপায় ছিল না।

অভিনেতাদের মাথায় স্নান করিতে প্রায়ই হইত না; গলা কিছু নীচে নামিয়া আসিয়া এক চোপচোপ স্নান করা হইত। বিশেষ না করিয়া তাহাকে বলিতে হইয়াছিল। মাথার জল নীচে নামিবামাত্র, এবং স্নান উপর হইতে "ওয়েট চ মমুর্বৈ চৈব"—ইত্যাদি বচন শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখি, একটি মানুষ এই শ্লোক আওড়াইতেছে; এবং মাথা-ঝরা চাল, তিল নীচে ফেলিয়া দিতেছে; ত্রিবিধ স্নান করিয়া উপরে আসিলাম। বাসকটি বলিল "বাস্, আপনার অভিষেক হইল, পৌরোহিত্যিক ক্রিয়া" কিন্তু না বলিয়া দুই আনা দক্ষিণা দিলাম, সেও নিষ্কৃতি দিল। তাহার বাড়ির নীচে পরিচয় পূর্বক দুই একটি কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু সিনেমাতেই ছাড়িল না। কল্য রবিবার ছুটি থাকে, দুইটি পয়সা আদায় করিবার—তাহার এক কেরানীবাবু মহাশয়ের সাহায্যটি কিছু ওকতর। তিনি বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিয়া নীচে নামিলেন। কে কিন্তু নাছোড়বন্দা। আবার সেই গলে সে তুমুল বৈব। মাতার মহাশয় উপায় উদ্ভাবিত পুনরায় নিষেধ করিয়া নীচে নামিলেন। ফিরিলাম। পরদিন সেই ব্যক্তি; মাতার মহাশয় এবার ভাড়া করিলেন; সেও ভাড়া দুই দিন দেখিতে দেখিতে অনেক লোক জড় হইয়া গেল। সেদিন মাতার মহাশয়কে পরাস্ত হইতে হইল।

এইরূপে মাতাজিরা সকলে করিয়া সকলে নৃসিংহ দেবের বাড়ী চলিলাম। প্রথমে একটি দেউড়ী; তাহার দুই দিকে দুইটি ঘর। ঘরে দুজন পুলিস থাকে। এক জন হিন্দুস্থানী বাবুর সহিত কথা কহিল; তাহার সহিত ভিতরে গেল। বিশেষত: সে যখন শুনিল, সাহেবের বাড়ী ঐশ্বর্যদানে, তখন ত কোনও কথাই নাই, সে তো আমাদেরই চাকর হইয়া গেল। সুতরাং জুতা-বিভ্রাটের কোনও ভয় রহিল না। সে আরও বলিল, "বাবু! এই স্নান করিবার অভিপ্রায় আছে; এইখানে ও আসে পাশের যাহারা ইচ্ছা করেন, সেই স্নান করিতে পারেন।" একটি ভাল পুকুর দেখায় পাছে মত পুলিয়া পরিষ্কার করিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। সেউড়ী পার হইয়াই একটি প্রাঙ্গণ দেখায়; প্রাঙ্গণের পর

বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দেখি, সাদন ওয়াজিনির্দ্মিত সুবহৎ পাগড়ী হস্তে আমার নিকটের মাথায় প্রহার করিতেছেন। দেখাদেখি দেখিতে দেখিতে এক একজনের মাথায় প্রহার করা হইল,—অমনি উঠিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি এমন সময়ে ব্রাহ্মণ আমাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তথাকার অনস্তনীয় নিয়মের বিষয় বিবৃত করিলেন; এবং অবশেষে বলিলেন যে, যাঁহাদের মস্তক পাগড়ী প্রহারে চিহ্নিত হইবে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রোগ ও পাপ হইতে মুক্ত হইবেন; এবং তাঁহাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে। আমরা তাঁহার বাক্যে বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য্য করিলাম।

সাধ্যসাধনান্তে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কোথায় কি আছে সবিশেষ দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমরা মন্দির হইতে বিদ্রান্ত হইলাম। মন্দিরে প্রস্তরের নানারূপ কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চারি দিকে পরিনির্ম্মিত অত্যুচ্চ কৃষ্ণবর্ণ দেওয়া বারাণ্ডাগুলি আজিও "শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু" এই বাক্যের সার্থকতা সগৌরবে রক্ষা করিতেছে। এই সব দেখিতে দেখিতে বেলা-প্রায় উঠিল। এই ঘরটি বিতল। উহার ভিতরে একটী ছোট ঘর আছে। এইটি শ্রীনগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই ঘরে যাত্রিগণ অবস্থিতি করে। তাহাদের নাম ধাম প্রভৃতি টীকানা প্রাচীরে লিখিত আছে। বলা বাহুল্য, আমরাও স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া আসিলাম।

সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম গৃহে গমন করিলাম। ঘরটি অতি সুন্দর, নির্জ্জন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ও পথশ্রমে দেহ অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল; সুতরাং আহ্লাদে আটখানা হইয়া যেখানে জলাদি ছিল, সেইখানে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবামাত্র এক প্রকার উৎকট দুর্গন্ধ পাওয়া গেল। বহুসন্ধানে দেখিলাম, এবার আকাশগঙ্গা নহে, এবার চামচিকার পালা। এক ছাট্ ময়লা, এক মিনিট সেখানে তিষ্ঠান কাহার সাধ্য? তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বারান্দায় আসিয়া বসিলাম, এবং সেইখানে প্রসাদ লইয়া আসিতে বলিলাম। ব্রাহ্মণ প্রসাদ দেওয়া আরম্ভ করিলেন। প্রসাদ এতক্ষণ কলাপাতে ঢাকা ছিল, সুতরাং তাহার কোনরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ঘরে বসিয়া ব্রাহ্মণ দরজায় দাঁড়াইয়া সকলকে প্রসাদ দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

[illegible] আত্মীয়কুল ভাগাভাগি [illegible] নিজের নিজের [illegible] ছেলেরা ছুটির ও পূজা আসিবার আগে চাষীর মুহূর্ত এসে পড়িবে পড়ুক, আর এখন [illegible] ছুটি আসিয়া পড়িল। [illegible] ছুটির পর [illegible] মহাশয় বিদ্যালয়ে আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, এখানকার [illegible] রীতি এইরূপ। [illegible] ছুটির আগে [illegible] এবং দ্বিতীয় অঙ্ক; সুতরাং প্রসাদের [illegible] ছুটি [illegible] আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া [illegible] হাসিতে [illegible] কেহ কেহ বলিলেন, "এ ঠাকুরের জ্বালা [illegible] আমরা [illegible] প্রসাদ [illegible] কিন্তু [illegible] নীচের দিকে চাহিতে ইহা [illegible] ছুটির পূর্বদিনের কথা মনে পড়িল। শুনিয়াছিলাম, পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা কিছু অধিক পরিমাণে [illegible] থাকেন সুতরাং আমাদের সকলের লক্ষ্য ভাল ভাল [illegible] উপর পড়িল। দেখিলাম, আমাদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিলেন; আর [illegible] প্রসাদের আস্বাদ লইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। সেটি বুঝি অশ্বত্থ। অনেকটা মুখরোচক হইলেও [illegible] বিবেচনায়, [illegible] [illegible] ইহাদের [illegible] ভুলে নাই। আমাদের মধ্যে অনেকেরই [illegible] [illegible] [illegible] এই সময় আমার [illegible] সেই [illegible] বলে [illegible] যাহা হউক, দেবতার প্রসাদ মাথায় থাক; কিন্তু বলিতে কি, প্রসাদের কথা মনে হইলে এখনও গা শিহরিয়া উঠে, মনে আতঙ্ক হয়। [illegible] সেই [illegible] লুচি ও কমলা লেবু দ্বারা কাঞ্চিৎ [illegible] বিধান করিলাম। এইরূপে প্রসাদ-পর্ব সমাধা হইল।

আহারান্তে [illegible] সকলের প্রাণে [illegible] করিয়া [illegible] উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যখন আমরা নীচে নামিতেছি, সেই সময় আমাদের [illegible] সেই [illegible] একটি স্ত্রীলোকও নামিতেছিলেন। [illegible] স্ত্রীলোক আর পর্যন্ত দেখি নাই। [illegible] সকলের [illegible] মাথা। সে [illegible] [illegible] মোহ পুরুষ কথবর্ণ হইলেও [illegible] সে [illegible]। [illegible] হইয়াছে আমাদিগকে দেখিয়া তাঁহার কোনও [illegible] বা [illegible] হয় নাই। [illegible] তাঁহার ছেলে [illegible] যাই, সেই [illegible] [illegible]

আসিয়া পড়িল। পথিমধ্যে ইহার মালিক ইহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল, সে-ও অনেক লোকজন ডাকিয়া ইহাকে ধরিয়া লইয়া গেল।

তখন সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে এত বেশী ঘোড়া থাকিতে তুমি একটা খোঁড়া ঘোড়া কেন?" চতুরের মে বলিল, "বাবু! মালিকারা ঐ ঘোড়াকে যে দেখিতেছেন প্রকৃতপক্ষে তাহারা সকলেই খোঁড়া নহে। উহাদিগের মধ্যে যে সকল ঘোড়ার পায়ে টাকা-টিপ্পনী সাজিয়া বসিয়া আছে।" এইরূপ একটি কৃত্রিম খোঁড়া দেখাইয়া দিবার জন্য চতুরের অনুরোধ করিলাম। সে দূর হইতে কহিল, "বাবু! ঐ যে ঘোড়াটি বসিয়া আছে দেখিতেছেন, ও প্রকৃত ঘোড়া নহে, আপনারা এখনই উহাকে দেখিতে পাইবেন।" আমরা তাহার নিকটবর্তী হওয়ায় সে "বাবু বাবু" করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। সকলেই তাহাকে বেশ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু ভাব কিছুতেই বুঝিয়া বোধ হইল না। শেষ ইহা আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল। সে বলিল, "বাবু! আমি ঠিক বলিতেছি। বিশ্বাস না হয়, আপনারা দেখুন।" আমরা তাহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিলাম, সে কাকাকাটি আরম্ভ করায় অনেকেই বলিলেন, "এমন অকারণ গরীবকে কষ্ট দিতেছ?" আবার কেহ বা বলিলেন, "যদি ঠিক কথা বল, তবে তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।" সে কিন্তু কিছুতেই বলিল না। বলে, "আমার না নাই, আমি কি করিয়া বলিব যে আছে? আপনাদের ইচ্ছা হয়, কিছু দিবেন; না হয় দিবেন না; তাহার জন্য দরকার কি?" তাহার স্বাধুর বক্তৃতা শুনিয়া আমি একটু বিরক্ত হইলাম, এবং রাখালকে পা ধরিয়া টানিতে বলায় সে এমন জোরে পা টানিল যে, সেটি দাঁড়াইয়া উঠিল! পা হইতে কাঠের টুকরা আলগা আমনা ভাঙ দেখিয়া সকলে তাড়াতাড়ি যাইতে আসিলেন। স্ট্রেচারটি বাহির হইয়া পড়িয়া রহিল। এখানে অ্যাথেলেটের বলের অভাব। অ্যাথেলেটিগুলি অ্যাথলেটের দলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। অ্যাথলেটিক্স-এর যে দেশের এত আদর কেন। অনেকটা আমাদের দেশের ৭২ আইনের মত। এই অ্যাথলেটের দলগুলি ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহাদের, অধ্যক্ষগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। ইহারা যে সমিতিভুক্ত তাহার মত। সুতরাং চলিয়া যায় না।

ফিলাডেলফিয়ার এইরূপ দুইটা বেশী আছে যেখানে অনেক

নিজের পা দুখানি লইয়া একটা নীচে বসিয়া আমাদের আসিতে যাইবার পথে যে অসংখ্য ব্যবধান [illegible] উহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছিলাম, ট্রেনিং দেখাইতে [illegible] ছোট ছিলেন। [illegible] আমাদের [illegible] বুঝিয়া [illegible] কতকগুলি বাজনা বাজাইয়া [illegible] দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। [illegible] আমাদিগকে [illegible] করিতে [illegible] করিতে লাগিল।

[illegible] গভর্নমেণ্ট আলোচনা করিতে [illegible] নীচে কাটিয়া উদ্যানস্থ হইলাম। [illegible] একটি অত্যন্ত সুন্দর। আমাদিগকে [illegible] উদ্যানমধ্যস্থ [illegible] লইয়া গেল, সেই স্থানে অতিরিক্ত পরিচ্ছদ [illegible] হইয়া [illegible] হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তাহার [illegible] আমি আর [illegible] পথে সম্পূর্ণরূপে [illegible] হইলাম। তার পর [illegible] দিক বেড়াইয়া [illegible] আরোহণ করিলাম। [illegible] কন্টিনেন্টে [illegible] করিয়া আসিলাম।

[illegible] ও [illegible] সকলেই সাগ্রহে [illegible] শুনিতে [illegible]। আদ্যোপান্ত [illegible] শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া [illegible] যাইবার জন্য সকলে [illegible] হইলেন। এবং [illegible] তাঁহার আমোদিন [illegible] অনুমতি দিলেন। [illegible] বলিল শুনিলেন যে, "৺নৃসিংহ দেবের দর্শন পাইতে [illegible] হালার একুশ [illegible] অতিক্রম করিতে হয়, তখন [illegible] হইতে তাঁহার [illegible] নাম উচ্চারণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ [illegible] করিতে প্রবৃত্ত [illegible] হইলেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র [illegible]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(প্রথম-খণ্ড)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্ত-সঙ্গে।

[বুদ্ধদেব ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে আছেন।

আজ শুক্রবার, বেলা ৫টা বাজিয়া গিয়াছে; চৈত্র-শুক্লাপঞ্চমী তিথি। ৯ই এপ্রেল; ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

নরেন্দ্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার নীচে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

নিরঞ্জন। (মাষ্টারের প্রতি) বিদ্যাসাগরের নূতন একটা স্কুল কি হ'বে? নরেনকে এর একটা কর্ম্ম যোগাড় ক'রে—

নরেন্দ্র। আর বিদ্যাসাগরের কাছে চাকরী ক'রে কাজ নাই।

নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া হইতে সবে ফিরিয়াছেন। সেখানে বুদ্ধ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, এবং যেই মূর্ত্তির সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যে বৃক্ষের নীচে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটি নূতন বৃক্ষ হইয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন।

কালী বলিলেন, "এক দিন গয়ার উমেশ বাবুর বাড়ীতে নরেন্দ্র গান গাহিয়াছিলেন, মৃদঙ্গ সঙ্গে খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বঘরে বিছানায় বসিয়া আছেন। রাত্রি ৯টা ১০টা হইয়াছে। মণি একাকী তাঁহাকে পাখা করিতেছেন।

লাটু আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মণির প্রতি) একখানি গায়ের চাদর ও এক জোড়া চটী জুতা আনবে।

মণি। যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (লাটুর প্রতি) চাদর ॥৵০ ও জুতা, সর্ব্বশুদ্ধ কত দাম?

লাটু। এক টাকা দশ আনা।

ঠাকুর মণিকে রামের কথা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নরেন্দ্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে আরও দুই একটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে পায়ে হাত বুলাইতে দিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন,—তোর বিদ্যে ?

[বুদ্ধদেব কি নাস্তিক !]

রামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে) ওখানে (অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায়) গিছলে ?

মাষ্টার। (নরেন্দ্রের প্রতি) বুদ্ধদেবের কি মত ?

নরেন্দ্র। তিনি তপস্যার পর কি পেলেন, তা' মুখে বলতে পারেন না ব'লে, তাই ব'লে, নয় ব'লে নাস্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ইঙ্গিত করিয়া) নাস্তিক কেন ! নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই।

"বুদ্ধ কি জান ? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে,—তাই হওয়া ;—বোধ-স্বরূপ হওয়া।"

নরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ। এঁদের তিন শ্রেণী আছে ;—বুদ্ধ, অর্হৎ, আর বোধিসত্ত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ তাঁরই খেলা ;—নূতন একটা লীলা।

"নাস্তিক কেন হ'তে যাবে ! যেখানে স্বরূপতে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।"

নরেন্দ্র। (মাষ্টারের প্রতি) সে অবস্থায় Contradictions Meet. যে Hydrogen আর Oxygen এ শীতল জল তৈয়ার হয়, সেই Hydrogen আর Oxygen দিয়ে Oxyhydrogen-blowpipe (জ্বলন্ত অত্যুষ্ণ অগ্নি-শিখা) উৎপন্ন হয়।

"সে অবস্থায় কর্ম আর কর্মত্যাগ দুইই সম্ভবে ;—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম।

"যাঁরা সংসারী, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে রয়েছে, তাঁরা বলেছে, জগৎ 'অস্তি' ; আবার মায়াবাদীরা বলছে,—'নাস্তি' ; বুদ্ধের অবস্থা এই 'অস্তি' 'নাস্তি'র পারে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ছাড়া।

ভক্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

[নরেন্দ্র ও বুদ্ধদেবের দয়া ও বৈরাগ্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) তার (বুদ্ধদেবের) কি মত ?

নরেন্দ্র। ঈশ্বর আছেন কি না আছেন, এ সব কথা বুদ্ধ বল্‌তেন না। তবে দয়া নিয়েছিলেন।

"একটী বাঘ পক্ষী শীকারকে ধ'রে তা'কে খেতে যাচ্ছিল। বুদ্ধ পক্ষীটির প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের গায়ের মাংস তা'কে দিয়েছিলেন।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র উৎসাহের সহিত বুদ্ধদেবের কথা আরও বলিতেছেন।

নরেন্দ্র। কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হ'য়ে সব ত্যাগ ক'র্‌লে! যা'দের কিছু নাই—কোনও ঐশ্বর্য্য নাই, তা'রা আর কি ত্যাগ করবে।

"যখন বুদ্ধ হ'য়ে, নির্ব্বাণ লাভ ক'রে বাড়ীতে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে ছেলেকে রাজ বংশের অনেককে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বল্‌লেন। কি বৈরাগ্য! কিন্তু এ-দিকে ব্যাস দেবের আচরণ দেখুন;—শুকদেবকে বারণ করে' বলে, পুত্র! সংসারে থেকে ধর্ম্ম কর।"

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। এখন কোনও কথা বলিতেছেন না।

নরেন্দ্র। শক্তি ভক্তি কিছুই (বুদ্ধ) মান্‌তেন না।—কেবল নির্ব্বাণ!

"কি বৈরাগ্য! গাছতলায় তপস্যা ক'র্‌তে ব'স্‌লেন, আর বল্‌লেন,—

"ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরম্"

"যদি নির্ব্বাণ লাভ না করি, তা' হ'লে আমার শরীর এইখানে শুকিয়ে যাক্,—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা"

"শরীরই ত বদ্‌মাইস্!—ওকে জব্দ না করলে কি কিছু!—"

মণি। তবে যে তুমি বল, মাংস খেলে সত্ত্বগুণ হয়!—মাংস খাওয়া উচিত, এ-কথা ত বল।

নরেন্দ্র। যেমন মাংস খাই,—তেমনই (মাংস ত্যাগ ক'রে) শুধু ভাতও খেতে পারি,—নুন না দিয়েও শুধু ভাত খেতে পারি।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। আবার বুদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বুদ্ধদেবের) কি মাথায় ঝুঁটি?

নরেন্দ্র। আজ্ঞা না; রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে যা' হয়, সেই রকম মাথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। চক্ষু?

নরেন্দ্র। (চক্ষু) সমাধিস্থ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন—'আমিই সেই']

ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। মণি, ঠাকুরকে হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) আচ্ছা,—এখানে সব আছে; না? —নোকাদ্ মুখে ডাকা, ছোলার ডা'ল, তেঁতুল পর্য্যন্ত।

নরেন্দ্র। আপনি ও সব অবস্থা ভোগ করে' নীচে র'য়েছেন!—

মণি। (স্বগতঃ) সব অবস্থা ভোগ করে' ভক্তের অবস্থায় র'য়েছেন!—

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে যেন নীচে টেনে রেখেছে!

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির হাত হইতে পাখাখানি লইলেন; এবং আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই পাখা যেমন দেখ্‌চি, সাম্‌নে,—প্রত্যক্ষ—ঠিক অমনি আমি (ঈশ্বরকে) দেখেচি:

"আর দেখ্‌লাম—"

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া ইঙ্গিত করিলেন, আর নরেন্দ্রকে বলিলেন, "কি বল্লুম, বল দেখি?"

নরেন্দ্র। বুঝেছি কি না জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বল দেখি?

নরেন্দ্র। ভাল শুনি নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ইঙ্গিত করিলেন,—"দেখ্‌লাম তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে তিনি আছেন—এক বাক্তি।"

নরেন্দ্র। হাঁ, হাঁ; সোঽহং।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে একটি রেখামাত্র আছে—('ভক্তের আমি' আছে) সম্ভোগের জন্য।

নরেন্দ্র। (মাষ্টারের প্রতি) মহাপুরুষ নিজে উদ্ধার হ'য়ে গিয়ে জীবের উদ্ধারের জন্য থাকেন,—অহঙ্কার নিয়ে থাকেন,—দেহের সুখ দুঃখ নিয়ে থাকেন!

"যেমন মুটেগিরি; আমাদের মুটেগিরি On Compulsion (কাজে প'ড়ে)। মহাপুরুষ মুটেগিরি করেন সখ্ ক'রে।"

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুরুকৃপা]

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। অতঃপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন। আপনি কে, এই তত্ত্ব নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে আবার বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) ছাদ্‌ত দেখা যায়!—কিন্তু ছাদে উঠা বড় শক্ত।

নরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে, যদি কেউ উঠে থাকে, মই ফেলে দিয়ে আর সব লোককে তুলে নিতে পারে!

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার সমাধি।]

"হৃষীকেশের সাধু এসেছিল। সে (আমাকে) ব'ল্লে,—'কি আশ্চর্য্য! তোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখ্‌লাম!'—

"কখন কপিবৎ;—মহাবায়ু দেহ-বৃক্ষে বানরের ন্যায় যেন এ ডাল থেকে ও ডালে একবারে লাফ্‌ দিয়ে উঠে, আর সমাধি হয়।

"কখন মীনবৎ;—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ ক'রে যায়, আর সুখে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর চল্‌তে থাকে, আর সমাধি হয়।

"কখন বা পক্ষীবৎ;—দেহবৃক্ষে পাখীর ন্যায় কখনও এ ডালে, কখনও ও ডালে।

"কখন পিপীলিকাবৎ;—মহাবায়ু পিঁপ্‌ড়ের মত একটু একটু ক'রে ভিতরে উঠ্‌তে থাকে; তার পর সহস্রার বায়ু উঠ্‌লে সমাধি হয়।

"কখন বা তির্য্যক্‌বৎ;—অর্থাৎ মহাবায়ুর গতি সর্পের ন্যায় এঁকাবাঁকা; তা'র পর সহস্রায় গিয়ে সমাধি।"

রাখাল। (ভক্তদের প্রতি) থাক্‌ আর কথায়;—অনেক কথা হ'য়ে গেল;—অসুখ কর্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ, ৬ষ্ঠ খণ্ড। Gospel of Ramakrishna in English, to be shortly out.

প্রবাসী কবিতা।

—:০:—

গগন থেকে নেমে আসে যখন শ্যামল বসন্ত ভুবনে,—
কুঞ্জ জাগে সযুযাগে তাহার পানে নয়ন দু'টি তুলে ;
উষার রবির কিরণগুলি চয়ন করে' বয়ন করে ফুলে ;
ভুবন করে মুখরিত বিরহিত নবীন আগমনে।
মানুষ তারে চয়ন করে, মধুভরে নারী পরে চুলে ;
রহস্য তার জানে না কেউ, বোঝে না তার মর্ম্মরী ভাষা ;
দেখে না কেউ তাহার জন্ম-ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি খুলে,—
—বিজড়িত মর্ম্মমাঝে কত ভীতি—সুখ দুঃখ আশা ;
কি ব্যথায় বা কি আনন্দে ছন্দোবন্ধে শিউরে ওঠে কবি—
জানে না কেউ ;—রেখে শুধু, দেখে যখন তাহার আঁকা ছবি।

শ্রীবিজেন্দ্রলাল রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

—:০:—

বিলাতের রঙ্গমঞ্চ।

অভিনয়ে সাফল্য।

"থেস্পিস সাপ্লাইন" নামক সাময়িকপত্রে বিলাতের এক জন অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে কেন তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, লেখিকা এই প্রবন্ধে তাহার অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধটির সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

লেখক-রচয়িত্রী পরলোকগত ক্লেমেন্ট স্কটের ন্যায় স্পষ্ট বলেন নাই যে, 'নারীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেহ অভিনয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারেন না, অথবা রঙ্গমঞ্চে যে সকল অভিনেত্রী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।' তাঁহার বক্তব্য এই যে, যে সকল রমণী অভিনয়ে সফলকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই হয় কোনও অভিনেতা বা রঙ্গমঞ্চ-প্রদর্শকের পত্নী অথবা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অলৌকসামান্য রূপের প্রভাবে, অসাধারণ পরিচ্ছদের বলে, রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন। সিংহাসন ও তাহাদের সময়ে বর্ত্তমান নভ্যযুগের সুশিষ্ট প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। তাহা না হইলে উহারা কখনই সাফল্যলাভ করিতে পারিতেন না। লেখিকা বলেন যে, একটু সঙ্গীতজ্ঞান করিলেই সম্প্রতি তাঁহার উক্তির পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিতে পারেন। তিনি বলেন,—Musical Comedy!

অর্থাৎ হাসা-রস-বহুল গীতি-অভিনয়ে অভিনেত্রীর সাফল্যলাভ করিবার একটমাত্র পথ উন্মুক্ত। Pantomime অর্থাৎ পঞ্চরং (নক্সা) অভিনয়ে অভিনেত্রীর অধঃপতনের পথ সুপ্রশস্ত ও অধঃপতন দ্রুততর ও অপরিহার্য্য।

লেখিকা বলেন, শুভাদৃষ্টবশতঃ আমি যদি রূপসীরত্ন ও রসাবধি নীতিধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইতাম, তাহা হইলে এত দিনে অভিনয়ে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিতাম; অতুল ঐশ্বর্য্যেরও অধিকারিণী হইতাম। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য আমার নাই; নীতি-ধর্ম্মের নির্জ্জন করিতেও কখনও শিক্ষা করি নাই; সুতরাং বশঃরূপ মহাবৃক্ষের তলদেশে পঁহুছিবার জন্য যত্ন করিতেছি; বৃক্ষের তলদেশে কণ্টক-লতার অরণ্য। সেই লতার আলিঙ্গন-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেছি। দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল ধরিয়া আমি স্বপ্নোত্থের ন্যায়, মুগেন্দ্রি ভাব কল্পনা করিয়াছিলাম যে, ধর্ম্মপথে থাকিয়া সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে কোনও রমণী নাটক অভিনয় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ। কিন্তু এখন আমি ক্রমে ক্রমে বুঝিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন দূরের কথা, নারীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী সামান্য অর্থ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দ্বারা সংগৃহীত হওয়া কত অসম্ভব, তাহার স্বপ্ন দেখা অলীক! অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাক্ষী রমণীকে বাধ্য হইয়া পাপ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে হয়। বাকচাতুর্য্য-জালের অবগুণ্ঠনে প্রচ্ছন্ন হইলেও এই সকল ঘৃণিত প্রস্তাবের মর্ম্ম যে কোনও নারী অনায়াসে বুঝিতে পারেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। রঙ্গমঞ্চের অবস্থা এত শোচনীয়, এত ভীষণ!

সম্প্রতি একটি সাদ্ধ্য-গীতি-অভিনয়ে প্রবন্ধ-রচয়িত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে একটি বর্ষীয়সী প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের সহিত সুদীর্ঘ দিন তাঁহার সংস্রব ছিল না। নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় উপলক্ষে তিনি আসিয়াছিলেন। বৃদ্ধা দেখিলেন, যুবতীটি অভিনিবেশসহকারে অভিনয় দর্শন করিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার অনুমান করিলেন যে, এই যুবতী সম্ভবতঃ এক জন অভিনেত্রী। উভয়ের পরিচয় হইলে বৃদ্ধা তাঁহার অনুমানের কথা লেখিকাকে বলিলেন। প্রবন্ধ-রচয়িত্রী বলিলেন যে, সত্যই তিনি অভিনেত্রী ছিলেন; কিন্তু এখন আর অভিনয় করেন না। বৃদ্ধা বলিলেন, "বুঝিয়াছি, আপনি কেন রঙ্গালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। অভিনেত্রীর জীবন বড় কঠিন। আমাদের যৌবনাবস্থায় রঙ্গালয়ের উপর দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায়ের আদৌ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল না। তখনকার অভিনেত্রীগণ পরিশ্রমী ও সাধ্বী ছিলেন; এখন দেশের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতগণের দৃষ্টি রঙ্গালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, সেরূপ ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব এখন আর নাই। কিন্তু এখনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রী সেকালের লোকের মত সাধু ও সুশীল নহেন।"

লেখিকা যৌবনের প্রথম অবস্থায় রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিলে পিতা মাতার সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না এবং পিতার নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, জানিয়াও তিনি নিরস্ত হন নাই। দৃঢ় সংকল্পে ভর করিয়া নবীনা প্রফুল্লহৃদয়ে দুঃসাহস করিলেন।

বৈশিষ্ট্য, বৃদ্ধা ও তাহাতে নানা প্রকারের আমোদ প্রমোদ বর্ণনা লিখিত হইত। এক সপ্তাহ মধ্যে তাহার পত্র আসিবে ডাকযোগে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহাকে পত্রের উত্তর দিতে হইবে। যাহাকে ইহার তাহার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে উহা লিখিতে হয়। তিনি লিখিলেন। কোনও মনস্তত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসক না পাওয়া লেখিকা এক জন শিক্ষয়িত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "পত্রের উত্তর পক্ষে পাওয়াটি আরো উপযুক্ত নহে। ইহাতে আর সময় নষ্ট করিয়া চলে না। আপনি যদি বন্ধ করেন, তাহা হইলে লেখাটি পাইবেন আর কোনও অসুবিধা আপনার হইবে নহে। আমার বড় আমোদ হইতেছে,—আপনার ভাল লাগে আমি এর প্রত্যেকের পাঠ লইব।"

লেখিকা প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিয়াছেন—"গ্রন্থিটেলের ব্যবসায়ে নাট্যকলা ক্রমশই অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই উৎকৃষ্ট নাট্যকলার কোন প্রকার ব্যবচ্ছেদ একান্ত অনুচিত, তাহার নিষেধকল্পে অনুসন্ধান ইংলণ্ডের আমোদপ্রিয়তার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। গত ডিসেম্বরে বিধান অনুসারে যে সকল প্রমদীর বাসনায় ঘোষণা করিয়া দিয়াছে, তাহারাই এখন রঙ্গালয় পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। মোটের উপর তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য; রঙ্গালয়ের সংস্রবে তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি ও সুবিধা হয়। রঙ্গালয়ের হিতৈষিবিহ ন অধ্যক্ষগণও তাহাদের সাহায্যে বেশ দু' পয়সা উপার্জন করিয়া থাকেন।

প্রত্যায়ুর্বৈ পুরুষঃ।

'অটোগ্রাফ-বুক' নামক একখানি আমেরিকান্ পত্রে এল্ বেন্সন্ এক শত বৎসর বাঁচিবার উপায় নামক একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে ইনি বেন্সন্ সাহেব কিরূপে শতায়ু হইবেন, তাহা লিখিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রত্যেক পুরুষ এক শত বৎসর ও প্রত্যেক নারী এক শত বৎসরের বিধিত আয়ু কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ। প্রত্যেক বালককে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, সে এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে; এবং এই উদ্দেশ্যে তাহার শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা ও ব্যবহার হইতে দূরে থাকিতে হইবে। যদি কোনও বালক বা বালিকা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ণায়ু লাভের পথে যে সকল প্রতিবন্ধক ছিল, তাহাদিগকে তাহার মনে রাখিতে হইবে। এই সকল মধ্যে নিয়মিত আহার ও নিয়মিত বিহারের উল্লেখ করা যায়।

[illegible] অপেক্ষা দুই নিয়মের মধ্যে অধিক। আমার সেই চিরপুরাতন [illegible] মধ্যে [illegible] প্রধান। আর একটি নিয়ম এই যে, নিয়ত [illegible] অপরিহার্য্য। ইহার কারণ এই যে, নিদ্রা হইলেই শরীরের সমস্ত পরিশ্রম করিবার শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ [illegible] প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার বলিয়া রাখা উচিত যে, এই মতের বিরোধী প্রমাণ

পেরিত, তাহারা সকলেই অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, অর্থাৎ শতবর্ষব্যাপী জীবনের ভোগের উপভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই!

এক জন আমেরিকান চিকিৎসক এক অদ্ভুত ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার মতে ঔষধসেবন নিষিদ্ধ। (যদিও ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অল্প।) এবং অসুখ হইলে একেবারেই অনাহারে কক্ষের সমস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া শয়ন ও যথেষ্টপরিমাণে বায়ু উদ্ভিজ্জভোজন কর্ত্তব্য! তিনিস্বয়ং বৃদ্ধ করনার এক শত তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি জীবনের চল্লিশ বৎসর অমিত ভোজনে, মদ্যপানে ও অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; এবং বহু প্রকার ব্যাধি সত্ত্বেও, সে সকল পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ বেহিসাবী শিক্ষিত তিনি পরিশেষে মিতাচারী হইয়া উঠিলেন। ইহার পর তেত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেলে তিনি মিতাচারিতায় গুণগান করিয়া একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি প্রথমে অতি অল্পপরিমাণে রোগীর পথ্য আহার করিতেন। ফলে এক বৎসরের মধ্যে তিনি স্বাস্থ্যের অবস্থা হইতে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। খাদ্য সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন করিবার মানসে তিনি বিভিন্ন খাদ্য পরীক্ষা করিয়া জানিলেন, কি কি খাদ্য তাঁহার স্নায়ুর পক্ষে উপযুক্ত। তদনুসারে নির্ব্বাচিত খাদ্যই তিনি আহার করিতেন।

তাঁহার অনুসৃত নিয়মাবলী নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—তিনি একটু ক্ষুধা রাখিয়া খাইতেন; অত্যধিক শীত বা গ্রীষ্মের প্রকোপে যাহাতে স্বাস্থ্যের হানি না হয়, সে বিষয়ে সাবধানে থাকিতেন; অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন না; বায়ুসঞ্চারহীন কক্ষে অধিকক্ষণ থাকিতেন না; পরিমিত নিদ্রা ও বিশ্রামে যত্নবান হইতেন না। তাঁহার মতে, উল্লিখিত নিয়মগুলি পালনীয়। সপ্তর বৎসর বয়সে কোনও অজ্ঞানকৃত দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনসংশয় ঘটিয়াছিল। চিকিৎসক মস্তিষ্কোক্ষণ করিতে চাহেন; কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। ফলে তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। করনার বলিয়াছেন, এই বিশ্ব যে এত রমণীয়, তাহা রোগাক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ১৮৩৯ খ্রীঃ তিনি লোকান্তরিত হন। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও দীর্ঘজীবনলাভের উপায় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, তথাপি আহার, ব্যায়াম ও মিতাচারই যে দীর্ঘজীবনলাভের প্রশস্ত পথ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিশুপাঠ্য রচনা।

মিসেস্ মোলস্‌ওয়ার্থ 'দি কুক্ কুক্' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গল্প-পুস্তকের বিখ্যাত রচয়িত্রী। তাঁহার রচিত পুস্তক শুধু বালক বালিকার নয়, বয়স্কগণেরও প্রিয়বস্তু। বেড়া ইনিওার হ্যারিস ও শ্রীমতী মোলস্‌ওয়ার্থের শিশুপাঠ্য সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা 'গ্রেট থট্স' নামক পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

হ্যারিস জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বালকবালিকাদের জন্য পুস্তক লিখিয়া অসাধারণ সফলতা লাভ করিবার গূঢ় কারণ কি?' এই কথায় মোলস্‌ওয়ার্থ বলিলেন যে, আমার বিশ্বাস হয়, বালকবালিকাদের সহিত সহানুভূতি থাকিলে সাফল্যলাভ সম্ভব।

মোলসওয়ার্থ বলিলেন,—'আমি অনেক সময় বালক বালিকাদিগের সঙ্গে কাটাইয়াছি, এবং গল্পগুলিও প্রথমে আমার পুত্রকন্যাগণের জন্যই রচনা করিয়াছিলাম। সাধারণে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পূর্ব্বে আমার মনে আদৌ উদিত হয় নাই।'

হ্যারিস।—আমার বোধ হয়, পুত্রকন্যাগণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আপনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই আপনার পুস্তকের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে।'

মোলসওয়ার্থ।—এই অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আমার নিজের শৈশবের জ্বলন্ত স্মৃতির উপরই অধিক নির্ভর করি। আমার মনে হয়, যদি কেহ বালকবালিকা সম্বন্ধে যথাযথভাবে লিখিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে স্বীয় শৈশবস্মৃতির সাহায্য লইতে হইবে। কারণ, বালকেরা যে কি চিন্তায় বিভোর থাকে, তাহা আমরা শিশুদের নিকট প্রায়ই অবগত হইতে পারি না। অনেকে আবার শৈশব-স্মৃতি বিস্মৃত হন; সুতরাং শিশুদের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া লিখিতে পারেন না।'

তিনি আরও বলিলেন, 'আমি আপনাকে শিশুদিগের অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তার কথা অনেক বলিয়া যাইতে পারি। উহাদিগকে আনন্দিত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, লেখককে এইরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাব-সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু শিশুরা যে কি অনুভব করে, কি চিন্তা করে, তাহা জানা বড় সহজ নহে। সত্য কথা বলিতে কি, উহারা নিজের ভাব যথাযথ বর্ণনা করিতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি তেমন ভাল স্মৃতি-শক্তি থাকে, তবেই উহারা শৈশবের ভাবাদি অন্যের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে।'

শ্রীমতী মোলসওয়ার্থ অনুমান করেন, এ যুগের বালিকারা উপকথা ভালবাসে না। তাঁহাদের সময়ের বালক-বালিকা অপেক্ষা ইহারা আরও কবিত্বশূন্য।

'আমাদের শৈশবকালে শিশুরা যেরূপ কল্পনা-প্রিয় ছিল, এখনকার ছেলেরা সেরূপ নহে। ইহার কারণ, আমাদের সময়ে এত শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক ছিল না, এবং এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় বালকবালিকাদিগের মনেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।'

হ্যারিস জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ পরিবর্ত্তন ভাল না মন্দ?' মোলসওয়ার্থ বলিলেন,—'বলিতে কি, মন্দের দিকে। যখন উপকথা-গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল, তখন বালকবালিকাদিগকে একই কথা বারংবার পড়িতে হইত। কিন্তু পুস্তকের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইয়াছে, এবং সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে।—একই গল্প আর বারবার পড়িতে হয় না;—একখানা বই পড়িতে না পড়িতে, আর একখানা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আমাদের বাল্যকালে আমরা দুই চারিখানি গল্প এতবার পাঠ করিতাম যে, সেই সমস্ত গ্রন্থের চরিত্রাবলী মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত; এই জন্যই সেকালের ছেলেরা এখনকার ছেলেদের মত নমালোচনাপ্রিয় ছিল না।

মোলসওয়ার্থের কথাবার্ত্তা হইতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার মতে, শিশুদের জন্য রচনা ও শিশুদের সম্বন্ধে রচনা, এই উভয়ে পার্থক্য আছে। ছেলেদের সম্বন্ধে রচিত পুস্তকমাত্রই যে শিশুপাঠ্য, এমন নহে। যেমন 'মিসঅ্যাণ্ড্রষ্ট্'। তাঁহার মতে, নীতিশিক্ষাদান শিশুপাঠ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে; তাহা নীতিমূলক হওয়া উচিত। অর্থাৎ, নীতি যেন তাহাদের ভিত্তিস্বরূপ হয়।

'দি কেয়ার চাইল্ড ক্যামিলী', ল্যাম্বের [illegible]-গল্পাবলী, বিস্ এজোয়ার্থের রচনা, গ্রিম্ ও হান্স্ এণ্ডার্সনের উপকথা প্রভৃতি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি ভূতের গল্পের একান্ত বিরোধী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

—:০:—

প্রবাসী।—জ্যৈষ্ঠ। 'মাস-মাস ও পাঞ্জী' শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ; বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের উপযোগী। আমরা অনধিকারী, এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র সাধারণের অনধিগম্য। শ্রীযুত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন ভারতের অনার্য্য নৃপতি কনিষ্ক' উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। লেখক অনুসন্ধিৎসু, তথ্য-সংগ্রহে তৎপর, বিষয়-বিন্যাসে সুনিপুণ। ভাষা আরও একটু প্রাঞ্জল হইলে ভাল হয়। ললিত বাবু ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'শিল্প-সমিতির প্রবন্ধাবলী' আজের কথার পূর্ণ,—সময়োপযোগী। শ্রীযুত জগদানন্দ রায় 'উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈচিত্র্যে' পাঠকদিগকে আনন্দের সহিত শিক্ষা দান করিয়াছেন। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী বৌদ্ধজাতক হইতে প্রাচীন যুগের বিবিধ আচার ব্যবহার ও অদ্ভুত প্রথার পরিচায়ক নানাবিধ কাহিনীর সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বর্দ্ধিত করিতেছেন। এবার 'মাথায় ঘোল' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মাথায় ঘোল ঢালার প্রাচীন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।—'কোনও অপকর্ম্ম করিলে মাথায় ঘোল ঢালার কথা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ আছে। বৌদ্ধ জাতগ্রন্থে এ বিষয়ে একটি গল্প আছে।'—শাস্ত্রী মহাশয় সেই গল্পটির অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামধনের কীর্ত্তি' নামক ক্ষুদ্র গল্পটি মন্দ নহে। 'স্বদেশিত্ব ও বিদেশিবর্জ্জনের মাত্রা ও প্রকারভেদ' প্রবন্ধে লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'কাপড়, চিনি, কিংবা আর যাহাই বলুন, কেবল বর্জ্জন-নীতিতে সমস্ত কাজ হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ভাল-সস্তা জিনিস উৎপাদনও করিতে হইবে।' আমরাও তাহা অস্বীকার করিব না; এবং এ পর্য্যন্ত কোনও 'স্বদেশী' ভাবের প্রচারক এ বিষয়ে অন্য মত প্রকাশ করেন নাই। অধিকন্তু আমরা বলি, কেবল স্বদেশী বস্তুর ব্যবহার ও উৎপাদন 'স্বদেশী' নহে। মনে 'স্বদেশী' ভাবের প্রতিষ্ঠাই স্বদেশী তন্ত্রের মূলমন্ত্র। তাম্রপাতার 'স্বদেশী' হাট 'স্বদেশী'র বিড়ম্বনা,—বিষম বিদ্রূপ;—ইংরেজ-পালিত কুকুরের পক্ষে এরূপ স্বদেশী ভোজন হইতে পারে, কিন্তু সাধকের পক্ষে তাহা অধর্ম্মসিদ্ধ,—জাতীয় ভাবের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক। যে মনে বিদেশী, এবং ব্যবহারে স্বদেশী,—সে দেশের শত্রু,—ভাবের শত্রু; বন্দে মাতরম্ মহামন্ত্রের হিরণ্যকশিপু। 'ইংরেজীর ছিপ্ ভাল, 'স্বদেশীর ডিঙ্গা হিন্দুর জাতিনাশ'; ইংরেজীর ছাঁচে ঢালা মুন-চিনির 'স্বদেশী' মুক্তির পথে বিষম কণ্টক। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বক্তব্য,—ভাষায় 'স্বদেশী' হইলেও চলিবে না। 'স্বদেশী' ভাষাও আর একটু সহজ, স্বচ্ছ, রীতি-শুদ্ধ ও মনোরম হওয়া চাই।

বাঙ্গলা চুণো-গলীর বিশুদ্ধ গন্ধ বিকীর্ণ করিবা মাত্র-ভাষার মন্দনে বিদেশী রচনা-ভঙ্গীর প্রাধান্য স্বীকার করে, তাহাও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। যার মন্দিরে পলাণ্ডু লশুনের স্থান নাই,—সাহিত্যেও তাহা অগণীয়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'স্বদেশী ও বহিষ্কার' নামক বিস্তৃত প্রবন্ধটির বিশ্লেষণ এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। আমরা সকলকে পড়িতে বলি। শ্রীযুক্ত আবদুল হামিদ খান ইউসফজী 'হিন্দুর উপস্থিত বিপদে মোসলমানের সহানুভূতি' প্রবন্ধে হিন্দু মুসলমানকে ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া মিলন-মন্দিরে মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। লেখকের আশা পূর্ণ হউক।

বঙ্গদর্শন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'ক্লাইব-কীর্ত্তিস্তম্ভ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুদিত 'বারাণসী-অভিমুখে' রমণীয়, উপভোগযোগ্য;—ভ্রমণ-কাহিনী রচনার আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী 'পাটের চাষ ও দুর্ভিক্ষ' প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—পাটের চাষে দেশের ক্ষতি হইতে পারে না। তাঁহার পরামর্শ,—'পাট-চাষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া যাহাতে উপযুক্ত সার-প্রয়োগে ইহার ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, এবং যাহাতে পাটের বহির্বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার বিহিত চেষ্টা করিলে দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে।' বিশেষজ্ঞগণের বিচার্য্য ও চিন্তনীয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা' উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সন্দর্ভ। 'দেশের ব্যথায় ব্যথী' 'পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি'র যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক স্বদেশ-ভক্তের অবশ্যপাঠ্য। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন 'একখানা মিষ্টান্নের জন্য যে এক রাশি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা মন্দ হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালার যে মন্বন্তর, 'মিষ্টি'র এত বাহুল্য নিরাপদ নয়। মতিচুরের গানে মণিমুক্তার অভাব নাই বটে,—কিন্তু মিষ্টান্নের থালার এত রত্ন ছড়াইতে নাই। 'খেয়া-ডিঙি'র কর্ণধার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী 'তাদের চিত্র' অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু 'ঘাটের ডিঙা' 'পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে' যাইবার আবশ্যক কি, তাহা যিনি 'খিরা ওঠা ঘাটা ভাতে হালের গোড়া' ধরেন, তিনিই বলিতে পারেন, এবং সম্ভবতঃ কবিও স্বয়ং জ্ঞাত আছেন। আমরা অন্তর্যামী নহি, সুতরাং বলিতে পারিলাম না। আর 'কাঁচা হাতে' যে ব্যক্তি হালের 'গোড়া' ধরিতে পারে, সে কি 'আগা' ধরিতে অক্ষম? প্রকৃত ও কবিত্বের খেচরান্ন নূতন পদার্থ বটে, কিন্তু চালে ডালে না মিশিলে যে রূপ 'ওগরা'র উৎপত্তি হয়, সে অনায়াসে কৈফিয়ৎ দিতে পারে,—'কাঁচন-হারা কাবির কাব্যে বিধি' দেখি নাই।'

ভারত-মহিলা। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীমতী রাজকুমারী দাস 'অবরোধ-প্রথা' প্রবন্ধে অবরোধের নিন্দা করিয়াছেন। লেখিকা বলেন,—বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অবরোধ-প্রথা ছিল না। তাহা সত্য। কিন্তু পাশবিক কারণ না থাকিলে সমাজে কোনও প্রথার উদ্ভব অসম্ভব। লেখিকা, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। স্বাধীন আর্য্যাবর্ত্তে নারীর মহিমা, সম্মান ও স্বাধীনতা ছিল,—অধীন বিচ্ছিন্ন ভারতে নারীর সেই ঐশ্বর্য্য, অধিকার, স্বাতন্ত্র্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল। স্বাধীন যুগের আচার পরাধীন যুগে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। নানা

কারণে, প্রধানতঃ সমাজের কোনও বিবর্ত্তনে অবরোধপ্রথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে; হিন্দুর ইচ্ছায়, বা পুরুষত্বের এই প্রথার সৃষ্টি হয় নাই; এবং আমার বিশ্বাস, কেবল প্রবল ও বক্তৃতার বলে এ প্রথা সমাজ হইতে উন্মূলিত করিবার আশা নাই। যে দেশের পুরুষ ক্রীতদাস, আত্মরক্ষায় অক্ষম, অবরোধের দ্বার রক্ষা করিবার জন্যও যাহাদিগকে বিদেশী রাজার সাহায্য ভিক্ষা করিতে হয়,—সে দেশে কেবল নৈতিক ও মৌলিক উপদেশে অবরোধ চূর্ণ হইতে পারে না। আর যাঁহারা অবরোধের কঠোর কারা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উচ্চ ও উন্নত আদর্শেও অবরোধের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতেছে। পুরুষের উন্নতি, সংযম, সদাচার ও আত্মরক্ষার শক্তি পূর্ব্ববিকশিত না হইলে কোনও সমাজে অবরোধ প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পরিপন্থী কোনও আচার লুপ্ত হইতে পারে না। হু ও হু, উভয় প্রথাই সামাজিক বিবর্ত্তনের ফল। সেই বিবর্ত্তনের কারণ যদি লুপ্ত না হয়, তাহার কার্য্যও লুপ্ত হইতে পারে না। জামালপুরে ও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে সম্প্রতি যে বীভৎস নারকী লীলার অভিনয় হইয়াছে, তাহা দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, আমাদের—অর্থাৎ পুরুষের মধ্যে মজবুত জেনানা অত্যন্ত আবশ্যক। আমরা আমাদের জেনানা ছাড়িব, কি মহিলাদের 'জেনানা' ভাঙ্গিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যত দিন এই প্রহেলিকার সমাধান না হইতেছে, তত দিন প্রাচীন হিন্দু সমাজ অবরোধমুক্ত সমাজের আদর্শ সৃষ্টি রাখিবে। সেই স্বাধীনতার ফলাফলে হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ বিবর্ত্তন—অবরোধপ্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতি নির্ভর করিতেছে। আর, অবরোধ বলিলে রাজধানী অঞ্চলে যে বিষম বেয়াটোপ বা সাংঘাতিক কারাগার বুঝায়, বাঙ্গলার শ্যামল পল্লীর অন্তঃপুরে তাহার অস্তিত্ব নাই। বঙ্গমহিলার চরণের নিগড় যত কঠিন, যত কঠোর বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত-পক্ষে তাহা তত কঠিন কঠোর বর্ব্বর নহে।—প্রকৃত স্বাধীনতা, অন্তরের স্বাধীনতা, চিন্তা ও ভাবের স্বাধীনতা;—অবশ্য স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে,—বঙ্গমহিলার পক্ষে প্রকৃতপক্ষে 'নিদ্রার স্বপন' বা আকাশকুসুম নহে। মনে হয়, আশা করা যায়,—ভারতবাসীর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার সহিত নারীরাজ্যেও 'স্বরাজে'র স্বাভাবিক অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নহে। হু ও হু, দুই প্রথাই স্বাভাবিক পথেই তিরোধান করিতে পারে। পরাধীন পরপদদলিত সমাজের কোনও প্রথাই কৃত্রিম উপায়ে বিনষ্ট হইতে পারে না। মনুষ্যত্ব-সাধনে সফল না হইলে ভারতবাসীর আশা নাই। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার—কুপ্রথার উচ্ছেদ ও সুপ্রথার প্রতিষ্ঠা সমগ্র জাতির মনুষ্যত্ব-সাধনার উপর নির্ভর করিতেছে। যাহারা স্বয়ং মহাপাপে নিমগ্ন, ইংরেজের পিঞ্জরে চিররুদ্ধ, তাহারা অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনীদের মুক্তিদান করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার ফল—সার্ব্বজনীন অধীনতা, সর্ব্বপ্রকার যাতন্ত্র্যের বিলোপ; নারী জাতির অবরোধ তাহার অন্যতর অবান্তর ফল; প্রকৃতির এই অমোঘ শাসন অনতিক্রমণীয়; সুতরাং আক্ষেপ করিয়া কোনও ফল নাই। শ্রীযুত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে প্রেম ও ধর্ম্ম' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্তবন্ধু দাস কর্ত্তৃক হিন্দী হইতে অনূদিত 'ধনিতা-বিজ্ঞান' হিতকারী নিবন্ধ। আরও অধিকসংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

পরমাণু।

আজিকার প্রবন্ধের বিষয়টি অতি পুরাতন। অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ও গ্রীস দেশের পণ্ডিতেরা পরমাণুর কল্পনা করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত এই পরমাণু কল্পিত পদার্থই রহিয়াছে, উহা এখনও কোনও ব্যক্তির প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই, বা কখনও প্রত্যক্ষগোচর হইবে, এরূপ আশাও আপাততঃ দেখি না। অথচ বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এই কল্পনাটির মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই কল্পনা ব্যতীত আমরা জড় পদার্থের নিত্য প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারি না।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর যখন বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তখন এখানে কল্পনার বা অনুমানের স্থান আছে কি না? যদি থাকে, তাহার মূল্যই বা কি? এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়া পরমাণু সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিবার চেষ্টা করিব।

বিধাতা আমাদিগকে যে ইন্দ্রিয়-শক্তি দান করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে আমরা বিশ্ব-জগতের কিয়দংশমাত্রের সহিত পরিচয় লাভ করি। বিশ্ব-জগতের অধিকাংশই আমাদের অজ্ঞাত ও অপরিচিত। উহার যে ভাগ আমরা সম্মুখে দেখিতে পাই, উহার অন্তরালে কি আছে, জানিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই ব্যাকুল; আড়ালে কি আছে না জানিলে, সম্মুখে যাহা দেখি, তাহার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিতে পারি না। এই জন্য আমরা ক্রমাগত সেই অন্তরালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। অধিক দূরের জিনিস আমাদের নজরে পড়ে না; আমরা চোখে দূরবীণ লাগাইয়া দূরের জিনিসের ছবি নিকটে আনি ও সেই ছবিকে বড় করিয়া দেখিয়া লই। অতি ছোট জিনিস আমাদের নজরে পড়ে না; আমরা চোখের সম্মুখে খান দুই কাচ রাখিয়া ছোট জিনিসকে বড় করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া লই। সূর্য্যের আলো একঘেয়ে সাদা, আমরা তাহাকে একখানা কাচের কলমের ভিতর চালিত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলি, এবং ঐ শুভ্রবর্ণের আলোকের ভিতর কত বিচিত্র বর্ণের আলোক আছে,

তাহা বাহির করি, এবং সেই বিচিত্র বর্ণের আলোকের সহিত তপ্ত পার্থিব দ্রব্যসমূহে আলোক বিকীর্ণ করে, তাহা মিলাইয়া, সূর্য্যমণ্ডলে কি কি পার্থিব দ্রব্য আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করি। এইরূপে আমরা যাহা চক্ষুর অগোচর, যাহা কর্ণের অগোচর, যাহা ত্বগিন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাকে নানা কৌশলে ইন্দ্রিয়-গোচর করিয়া বিশ্ব-জগতের নিগূঢ় বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করি। এইরূপ চেষ্টার ফলে কত নিগূঢ় তথ্য এ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পরিসীমা নাই; কিন্তু তথাপি সেই রহস্যরাশির ইয়ত্তা হইল না। একটা রহস্য ভেদ করিবামাত্র আমরা বুঝিতে পারি, উহার অন্তরালে আবার কত বহুতর গূঢ়তর রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সেই রহস্যগুলির আবরণ উন্মোচন না করিতে পারিলে আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই ইহা একটা তৃষ্ণা; অন্য তৃষ্ণার সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, কিছুতেই ইহার পরিতৃপ্তি ঘটে না; তৃপ্তির জন্য যতই ব্যবস্থা করা হয়, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায় মাত্র।

তৃষ্ণার ইয়ত্তা নাই বটে, কিন্তু মনুষ্যের শক্তির ইয়ত্তা আছে। চেষ্টার ফলে প্রকৃতির রহস্য কতক উদ্ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু তাহারও অন্তরালে যাহা অবস্থিত থাকে, তাহা বাহিরে আসিতে চায় না। বৈজ্ঞানিকেরা মন্দিরের দ্বারদেশে হত্যা দিয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতি দেবতা আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন না। উপাসক তখন কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন; যাহা অগোচর, কল্পনা-নেত্রে তাহার মূর্ত্তি দেখেন; যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া, যাহা অপ্রকাশ, তাহার কাল্পনিক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।

কল্পনাবলে যে ছবি আঁকা যায়, তাহার মূল্য কতটুকু বলা কঠিন; হয় ত তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অথবা আংশিকভাবে সত্য; যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া, এই কল্পনার খেলা; প্রত্যক্ষের সহিত মিল রাখিবার জন্য, প্রত্যক্ষের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, প্রত্যক্ষকে ভাল করিয়া বুঝিবার প্রয়াসেই, এ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে এই চাতুরী! হয় ত এমন দিন আসে, যে দিন সহসা উহা প্রত্যক্ষগোচর হয়; তখন দেখিতে পাওয়া যায়, কল্পিত ছবি কতটুকু সত্য বা কতটুকু মিথ্যা। যেটুকু সত্য, সেটুকু গ্রহণ করিতে হয়। যেটুকু মিথ্যা, সেটুকু বর্জ্জন করিতে হয়। যেটা সত্য, সেটা লাভ; যেটা মিথ্যা, সেটা সম্পূর্ণ লোকসান বলিতে পারি না; কেন না, মিথ্যার কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভটা, এ জগতে অল্প লাভ নহে।

আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের একটা নিন্দা প্রচারিত আছে যে, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর কোনও ভদ্রলোক নির্ভর করিতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকেরা আজ এক কথা বলেন, কাল আবার অকস্মাৎ তাহা উল্টাইয়া দেন। বাস্তবিকই এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিজ্ঞান-শাস্ত্র একই ঘটনা সম্বন্ধে কত বিচিত্র মত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। সূর্য্য হইতে আমরা আলো পাই, ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য। সূর্য্য হইতে আলোক-কণিকা ছুটিয়া আসিয়া আমাদের চোখে আঘাত করে, তাহার ফলেই আমাদের আলোক-বুদ্ধি;—নিউটনের শিষ্য প্রশিষ্য সিউটনের এই মতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; কেহ ইহাতে সন্দেহ-প্রকাশ করিলে, তাঁহারা লাঠী তুলিয়া মারিতে আসিতেন। কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, সেরূপ আলোক-কণিকা অস্তিত্বহীন। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটা কিন্তুতকিমাকার পদার্থ আছে, তাহার ইংরাজি নাম Ether; বাঙ্গলায় বলা হয় আকাশ; এই কল্পিত আকাশের অন্য ধর্ম্ম কি আছে না আছে, জানি না; কিন্তু ইহাতে ঢেউ জন্মিতে পারে। জলে লোষ্ট্রনিক্ষেপে যেমন ঢেউ জন্মে, অথবা তন্ত্রীতে আঘাত করিলে বায়ুরাশিতে যেমন ঢেউ জন্মে, এই আকাশে সেইরূপ ঢেউ জন্মে। সূর্য্যমণ্ডল হইতে সেই ঢেউ প্রবলবেগে আসিয়া আমাদের নেত্রপথে আঘাত করিলে, আমাদের আলোক-বুদ্ধি হয়। এখন আর নিউটনের আলোক-কণিকাতে কেহ বিশ্বাস করে না, এখন কেবল ঢেউ আর ঢেউ। আর একটা উদাহরণ দিব; এই পরমাণুর কথাই ধরা যাক। এতকাল বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন, এই পরমাণু কেহ ভাঙ্গিতে পারে না, কেহ কাটিতে পারে না। অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অভেদ্যোঽয়ম্। আজকাল সেই বৈজ্ঞানিকেরাই বলিতে আরম্ভ করিতেছেন, পরমাণুকে ভাঙ্গার মত সহজ কাজ আর কিছুই নাই; আমাদের সম্মুখে পরমাণু সর্ব্বদাই টুক্‌রা টুক্‌রা হইতেছে, এতকাল আমরা চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধ থাকিয়া তাহা দেখিতাম না। যাঁহারা বাহিরের লোক, বৈজ্ঞানিকের মুখে বিজ্ঞানের কথা শুনিয়া অবিচারে তাহার গ্রহণে বাধ্য হন; তাঁহারা এরূপ ক্ষেত্রে দিশাহারা হইয়া পড়েন। বৈজ্ঞানিকের কোন্ কথাটা ধ্রুবসত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহার ঠাহর পান না, অবশেষে কেহ কেহ অধীর হইয়া বৈজ্ঞানিকের সত্য-নির্দ্ধারণপ্রণালীতেই সন্দেহ করিয়া বসেন। বস্তুতঃ ইহা বৈজ্ঞানিকের দোষ নহে। ইহা প্রকৃতি ঠাকুরাণীর দোষ; ঠাকুরাণী যদি প্রার্থনামাত্রে মুখের ঘোমটা খুলিয়া আপনার চন্দ্রবদন একেবারে প্রকাশ করিয়া দিতেন, তাহা

হইলে বৈজ্ঞানিকের কথায় এরূপ খেলাপ হইত না। কিন্তু তাঁহার সে ধরণই নয়। অনেক সাধনার পর তিনি অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ মোচন করেন, সেইটুকু স্পষ্ট দেখা যায়; বাকিটুকু দর্শনার্থীকে কল্পনা করিয়া লইতে হয়; আবার অনেক সাধনার পর আর একটু প্রকাশ পায়, তখন বাকিটুকুর জন্য আবার কল্পনার ক্ষুরে শান প্রয়োগ করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিকের অবস্থা এইরূপ; বিধাতা তাঁহাকে অসীম শক্তি যখন দেন নাই, তখন তাঁহার দোষ কোথায়? সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি অনেক বেশী দেখিয়া থাকেন, তাই বলিয়া তিনি মনুষ্যত্বের ঊর্দ্ধে অবস্থিত নহেন; তাঁহার যে ত্রুটী, তাহা মনুষ্যসাধারণ ত্রুটী; তাহার জন্য তাঁহাকে দায়ী না করিয়া তিনি অবিশ্রাম সাধনার ফলে যে সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দেওয়া উচিত। তিনি যাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা এখন মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি হইয়াছে; যাহা অনুদ্ঘাটিত আছে, তাহার জন্য ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক জীব দায়ী নহেন। ভগবতী মায়া যিনি মানবাত্মাকে পূর্ণজ্ঞানলাভে বঞ্চিত করিয়াছেন, তিনিই তজ্জন্য দায়ী রহিয়াছেন।

সকল বৈজ্ঞানিকের সকল বাক্যকেই বিসংবাদরহিত সত্য মনে করিয়া লওয়াটাই ঠিক্ নহে। যাহা প্রত্যক্ষগোচর, যাহা বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর, তাহাই সত্য; এবং যাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে, কেবল অনুমান-লব্ধ, তাহা পূর্ণ সত্য নহে; খুব সম্ভব, আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু যাহা আংশিকভাবে সত্য, বৈজ্ঞানিক তাহাকে একেবারে ফেলিতে পারেন না, কেন না, উহার সাহায্যেই তিনি সাধনার অবসর পান। কল্পনার ও অনুমানের সাহায্য লইয়াই তিনি আপনার গন্তব্য পথ স্থির করেন।

কোন্ পথে গেলে সত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে, বহু স্থলে তাহার তত্ত্ব নিহিতং গুহায়াম্; অন্ধকারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলে বহুকালে পথ মিলিতেও পারে, বা নাও পারে। কিন্তু অনুমানের সাহায্য লইয়া একটা পথ ধরিয়া চলিলে কাজ অনেক সহজ হইয়া পড়ে। কিছু দূর চলিলেই তখন বুঝা যায়, এ পথে সত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে কি না। যদি বোধ হয়, এ পথ ঠিক্ পথ হয় নাই, তখন সে পথ হইতে ফিরিলে ভবিষ্যতে অকারণ শ্রমের লাঘব হয়; আর যদি ক্রমে ধারণা দৃঢ় হয়, এই পথেই ফল মিলিবে, তখন সেই পথ ধরিয়া চলিলে কাজে অভীষ্টলাভ ঘটিতেও পারে।

এই পন্থার নাম অনুমানের পন্থা। প্রত্যক্ষ হইতে যাত্রা করিয়া অনুমানের পন্থা ধরিয়া লক্ষ্য অভিমুখে চলিতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই পথেই চলেন, এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র এই কয় বৎসরে যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, আপাততঃ নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

আমার গৌরচন্দ্রিকা এত বড় হইয়া গেল যে, প্রস্তাবিত গানের পালা সাঙ্গ করিতে পারিব কি না, সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিতেছে। অতএব আর বাক্যব্যয় না করিয়া প্রকৃতবিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

জড় পদার্থের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা পরমাণুর অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমানটা কিরূপ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একটা অট্টালিকার গঠন দুই রকমে সম্পন্ন হইতে পারে। মনে করুন, তাজমহল কিরূপে গঠিত হইয়াছে, তাহা আমাকে বুঝিতে হইবে। অনুমান করা যাইতে পারে, ঐ স্থানে একটা নিরেট মার্ব্বেলের পাহাড় ছিল, তাহাকে খুদিয়া, তাহার বাহির হইতে ও ভিতর হইতে পাথর কাটিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহাই হইল তাজমহল। এই পদ্ধতিতে মন্দির-নির্ম্মাণ কষ্টসাধ্য বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে। আমাদের ভারতবর্ষেই কত গিরিগুহা এইরূপে খোদাই করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মনুষ্য-কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে, বিশ্বকর্ম্মাকে আসিতে হয় নাই। আর এক পদ্ধতিতে তাজমহল নির্ম্মিত হইতে পারে। দূরে মার্ব্বেলের পাহাড় ছিল, সেই পাহাড় হইতে প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া আনিয়া তাহাতে ইষ্টক তৈয়ার করিয়া ইষ্টকের উপর ইষ্টক সাজাইয়া কারিগরে এই তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে পারে। অট্টালিকা-নির্ম্মাণের সাধারণ নিয়ম এই; এবং তাজমহলের নির্ম্মাণপ্রণালী এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কালে দুই রকম অনুমানই চলিতে পারে, কোন্‌টা সঙ্গত, তাহা তাজমহলের পার্শ্বে দাঁড়াইলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাজমহল নিরেট খুদিয়া বাহির করা জিনিস, কি পাথরের উপর পাথর বসাইয়া নির্ম্মিত, তাহার উত্তর তাজমহলের সম্মুখে দাঁড়াইলেই বুঝা যাইবে। যদি বা না বুঝা যায়, তাজমহলকে ভাঙ্গিয়া দেখিলেও বুঝা যাইতে পারে; তবে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানতৃষ্ণা-নিবারণের জন্যও এই অপকর্ম্মে কেহ সম্মত হইবেন না। একটুক্‌রা সোনা জড়পদার্থ; ঐ স্বর্ণখণ্ডের গঠনপ্রণালী কিরূপ, তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। উহা একেবারে নিরেট জিনিস, না উহা

টুক্‌রা টুক্‌রা স্বর্ণখণ্ডের সমবায়ে নির্ম্মিত, তাহার উত্তর দিতে হইবে। স্বর্ণখণ্ডকে নাড়িয়া, কাটিয়া, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করিয়াছেন; এবং স্থির করিয়াছেন যে, উহা টুক্‌রা টুক্‌রা ইষ্টক জোড়া দিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ ইটের টুক্‌রা অবশ্য ঐ স্থলে সোনার ইট, এবং ইহা এত ছোট যে, এ পর্য্যন্ত কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই; হইবে, তাহার ভরসাও অল্প। কাজেই উহা এখনও অনুমানলব্ধ পদার্থ। তাজমহল ভাঙ্গিয়া দেখান যাইতে পারে যে, মার্ব্বেলের ইট সাজাইয়া উহা তৈয়ার হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা স্বর্ণখণ্ডকে ভাঙ্গিয়া এ পর্য্যন্ত সেই সোনার ইট বাহির করিতে পারেন নাই, কেবল অনুমান করিয়া বসিয়া আছেন যে, হাঁ, কেবলই ভাঙ্গিতে থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত সেই সোনার ইট পাওয়া যাইতে পারিবে। যে ইটের সহিত ইট জোড়া দিয়া এই স্বর্ণখণ্ডের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ইটগুলি আর ভাঙ্গা চলিবে কি না, বলা কঠিন। ঐ অতি সূক্ষ্ম সোনার ইষ্টক, যাহা এ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই, তাহারই সোনার নাম পরমাণু। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, কেবল সোনা কেন, জগতের যাবতীয় জড়দ্রব্য এইরূপ পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। ইটের উপর ইট গাথিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে দুই ইটের মধ্যে চুন শুরকির মশলা দিতে হয়, অথবা বৃহদ্ব্যাপারে বিনা মশলাতেও বড় বড় পাথরের টুক্‌রা আপনার চাপে জমাট বাঁধিয়া পরস্পরকে ধরিয়া রাখে। পরমাণুর গায়ে পরমাণু কোনরূপও মশলা দিয়া জোড়া আছে, অথবা স্বধর্ম্মে পরস্পরকে আঁটিয়া ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে; সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কোনও স্পষ্ট কথা বলিতে সাহস করেন না। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বলেন যে, পরমাণু সকলের মাঝে অবশ্যই ফাঁক আছে, বা অবকাশ আছে; তবে সেই অবকাশ একেবারে শূন্য কি না, তাহা বিবেচ্য।

আপাততঃ এই ইটগুলিকে 'পরমাণু' না বলিয়া 'অণু' বলিব। কেন, তাহা পরে বুঝা যাইবে। আধুনিক মত এই যে, বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অণুর সমবায়ে যাবতীয় জড়পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই অণু নানাবিধ; বায়ুর অণুর সমষ্টিতে বায়ু, জলের অণুসমষ্টিতে জল, আর সোনা রূপার অণুর সমষ্টি সোনা রূপা। অণুগুলি ভাঙ্গা কঠিন, এবং অণুগুলির মধ্যে মধ্যে অল্প বিস্তর অবকাশ আছে।

অনেকগুলা ফাঁক আর এইরূপ সবকাশ থাকা প্রযুক্ত বালি একটু স্থান করিয়া লয় উচিত। এখানা পাথরকে আমরা নিরেট বলি না, কিন্তু এখানা পাথরের স্তূপকে নিরেট বলিয়া থাকি। একখানা ইটকে সরু নিরেট বলা চলিতে পারে, কিন্তু ইটের পাঁজাকে নিরেট বলা যায় না। ধান অথবা ঐরূপ অন্য কোন দ্রব্য স্তূপাকৃতি করিয়া রাখিলে, ঐ স্তূপকে নিরেট বলা চলে না; কিন্তু একখানা বৃহৎ কাঁসিকে আমরা নিরেট বলিতে পারি। সেই হেতুতে নিরেট বলা যায়, কিন্তু ইটকস্তম্ভ নিরেট নহে।

ধান চালের স্তূপ কিংবা বালুকাস্তূপ দূর হইতে নিরেট বলিয়া বোধ হয়। তখন তাহার এক একটি ধান, এক একটি চাল, এক একটি বালুকণা চোখে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বুঝিতে পারি যে, এই সকল স্তূপ কণিকার মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে; চোখে না দেখিয়াও বুঝিতে পারি, হাত গুঁজিয়া দিলে কণাগুলি পৃথক হইয়া যায়, হাত ঐ স্তূপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; অথবা জল ঢালিয়া দিলে, জল ঐ ফাঁকে অবাধে প্রবেশ করে। মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া লয়; ইহাতেও স্পষ্ট বুঝা যায়, মাটী নিরেট জব্য নহে, উহার কণিকাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হইলেও উহা সচ্ছিদ্র, সাবকাশ পদার্থ।

জল ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু বালুকাকণার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, উহার গায়ে লাগিয়া থাকে মাত্র। ফাঁকের ভিতর প্রবেশ করা সহজ। দেওয়ালের গায়ে গজাল বসাইতে হইলে হাতুড়ির ঘায়ে যেখানে ইটের মাঝে ফাঁক আছে, সেইখানেই গজাল বসান সহজ; ইঁদুরের গর্ত্ত সেইখানেই করা সহজ;—এবং টিকটিকি যখন দেওয়ালের ভিতর পোকা খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন ঐরূপ ফাঁক দেখিলেই খুসী হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা যে সকল জিনিসকে নিরেট বলি তাহা বস্তুতঃ নিরেট কি না; এবং তাহার ভিতরে ঐরূপ ছিদ্র আছে কি না। মাঝে মাঝে স্থানের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, তাহা নিরেট নহে, উহার গঠনপ্রণালী ইটে গাঁথা দেওয়ালের মত, অথবা বালুস্তূপের মত। কাচে মাটীর ছিদ্র সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু কোন মাটীর ছিদ্র ভেদ সহজে ধরা পড়ে না; কিন্তু উহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারি এমন দেখি, খোড়া মাটীর কলসীর ভিতরে জল রাখিলে এই জল বাহির হইয়া

কলসীকে সিক্ত করিয়াছে। কাঠ পাথরের সচ্ছিদ্রতাও ঐরূপে ধরা পড়ে; এমন কি, সোনা রূপা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য নিরেট বোধ হইলেও তাহার সচ্ছিদ্রতা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। লর্ড বেকন না কি একটা কাঁপা সীসার গোলায় চাপ দিয়া উহার ভিতর হইতে বিন্দু বিন্দু জল বাহির করিয়াছিলেন। ফলে পদার্থমাত্রই সচ্ছিদ্র, ইহা প্রতিপন্ন করা কঠিন নহে।

কিন্তু এই সকল ছিদ্রের অস্তিত্বে অণুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। এ সকল ছিদ্র মোটা ছিদ্র; যাহার ভিতর দিয়া জল বায়ু স্বচ্ছন্দে গড়াইয়া আসিতে পারে, সে ছিদ্র মোটা ছিদ্র। অণুসমূহের মাঝে যে ছিদ্র আছে, সে ছিদ্র নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম, যেমন বালুকাস্তূপে জল ঢালিয়া ঐ স্তূপের সচ্ছিদ্রতা প্রতিপন্ন হয় বটে, কিন্তু বালুকাকণাগুলির সচ্ছিদ্রতা প্রতিপন্ন হয় না; ঐরূপ সোনার পাতের ভিতর জলের যাতায়াত দেখাইলে স্বর্ণকণিকার মধ্যে ছিদ্রের প্রমাণ হয় বটে; কিন্তু সেই কণিকাগুলি যে সূক্ষ্মতর অদৃশ্য স্বর্ণাণুর সমবায়ে নির্ম্মিত, সেই অণুসমূহের মাঝে অবকাশ আছে কি না, তাহা প্রতিপন্ন হয় না।

তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। চাপ দিলে সকল জিনিসের আয়তন কমে; কঠিন, তরল, মারুত সকল জিনিসেরই আয়তন কমে। এই মারুত, শব্দটি ইংরেজি gaseous শব্দের অনুবাদে গ্রহণ করিলাম। ইংরেজি gas শব্দটির বাঙ্গলা তর্জ্জমা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সহরের রাস্তার গ্যাসের আলোর প্রসাদে, উহা আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গলাভাষার ধাতের সহিত উহার মিল হয় নাই। সাহিত্যের ভাষায় উহা চলিবে না। বিশেষতঃ gas না হয় গ্যাস হইল, gaseous কে গ্যাসীয় করিতে গেলে সরস্বতী নিতান্তই বিমুখ হইবেন! সেই জন্য অনেকে gasএর অনুবাদে বায়বীয় পদার্থ লেখেন; কিন্তু air is a gas, বায়ু হয় এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ—ইহা একালের ইংরেজি স্কুলে চলিতে পারে, কিন্তু সরস্বতীমন্দিরে উহার প্রবেশ নিষেধ। আজেই আমি প্রাচীন পঞ্চভূতের অন্তর্গত মরুৎ ভূতটিকে gas অর্থে ব্যবহার করিতে চাই। তাহাতে gaseousএর জায়গায় মারুত বলিলে কাহারও শ্রবণেন্দ্রিয়ে আঘাত লাগিবে না। মারুত, কঠিন, তরল, মারুত, জড়পদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থা; চাপ দিলে ত্রিবিধ পদার্থেরই আয়তনসঙ্কোচ ঘটে। মারুত পদার্থের খুব অল্প চাপেই প্রচুর সঙ্কোচন হয়; তরল ও কঠিন পদার্থকে প্রবল চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করিতে পারা যায়। এই সঙ্কোচনের অন্য উপায়ও আছে। তাপযোগে অধিকাংশ দ্রব্যই—দু একটা ছাড়া—অধিকাংশ দ্রব্যই প্রসারিত হয়।

ফলে জড় পদার্থ চাপে ও শীতে সঙ্কুচিত হয়, উত্তাপে প্রসারিত হয়, তাহা বহু কাল হইতে সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অণু-ঘটিত অনুমানের ভিত্তি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে খুব দৃঢ় ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে উহা অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে। কিরূপে হইয়াছে, বলিবার চেষ্টা করিব।

তরল পদার্থে ও মারুত পদার্থে একটা বিশেষ গুণ আছে, তাহা কঠিন পদার্থে নাই। উহাকে চাপ বলে। কঠিন পদার্থ যে আধারে থাকে, সেই আধারের উপর কেবল অধোমুখে চাপ দেয়। কিন্তু তরল ও মারুত পদার্থ অধোমুখে, ঊর্দ্ধমুখে, পার্শ্বমুখে, চারি দিকেই চাপ দেয়। একটা ঘটে জল পূরিয়া সেই ঘটের গায়ে যেখানেই ছিদ্র করা যায়, জল বাহির হইয়া আসে, কিন্তু ঘটে বালি পূরিলে সেরূপ হয় না। ঘটের তলে ছিদ্র করিলে সেই ছিদ্র দিয়া বালি বাহির হয়, কিন্তু পাশে ছিদ্র করিলে হয় না। আর এক কথা, কঠিন পদার্থের কোনও এক স্থানে চাপিলে সেই চাপ সেইখানেই পড়ে, কিন্তু তরল ও মারুত পদার্থের কোনখানে চাপ দিলে, উহা সর্ব্বত্র সংক্রান্ত হয়। দক্ষিণ কাঁধে বোঝা রাখিলে দক্ষিণ কাঁধেই চাপ পড়ে, বাম কাঁধে রাখিলে বাম কাঁধেই চাপ পড়ে; কিন্তু পিচকারিতে জল পূরিয়া সেই জলে যখন ঠেলা দেওয়া যায়, তখন পিচকারির সর্ব্বত্র সেই ঠেলা লাগে। পিচকারির গায়ে যেখানে ইচ্ছা, একটা ছিদ্র করিলেই, তাহার পরিচয় মিলিবে। তরল পদার্থের ও মারুত পদার্থের এই বিশেষত্ব থাকাতে উহাদের চাপল্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কঠিন পদার্থে চপলতা নাই, উহা স্থির ও গম্ভীর। জল ও বাতাসের চপলতা প্রসিদ্ধ। এই চপলতার জন্য ঘটির জল বাটিতে ও বাটির জল থালায় অক্লেশে ঢালিতে পারা যায় ও এমোনিয়ার শিশি খুলিবামাত্র তাহার গন্ধ আসিয়া নাকে লাগে। এই চপলতা না থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকায় "বৃষ্টিঃ পততি ও বায়ুর্বহতি" এই বাক্যদ্বয় স্থান পাইত না। "গৌঃ সন্ধায়তে" স্থান পাইত কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। কঠিন পদার্থে ও তরল পদার্থে কি প্রভেদ, যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি বলিব,-কঠিন পদার্থের পাহাড় হয়, তরল পদার্থের পাহাড় হয় না। ভূগোলবিবরণে বরফের পাহাড়ের উল্লেখ আছে, জলের পাহাড়ের উল্লেখ নাই। ধান, চাল, বা বালির মত জলকে স্তূপাকৃতি করিয়া রাখা চলে না।

জল ও বায়ু চারি দিকে চাপ দেয় ও উহার এক জায়গায় চাপিলে সেই চাপ সর্ব্বত্র সংক্রান্ত হয় বলিয়া উহার এই চপলতা। এই চপলতা বুঝিবার

জন্য উহাদের আণবিক গঠন অনুমান করিতে হয়। দুর্গের প্রাচীর চাপ দিয়া ভাঙ্গিবার দুই প্রকার ব্যবস্থা আছে। সে কালে হাতী লাগাইয়া তাহার চাপে ভাঙ্গা হইত। এ কালে কামানের গোলা মুহুর্মুহু ছুড়িয়া চাপ দেওয়া হয়। জলের চাপ বুঝিবার জন্য মনে করিতে হয়, জলের ভিতর বহুসংখ্যক জলের অণু ছুটাছুটি করিতেছে ও বায়ুর মধ্যে বহুসংখ্যক বায়বিক অণু ছুটাছুটি করিতেছে। কঠিন পদার্থের চাপল্য নাই; উহার অণু তেমন করিয়া ছুটাছুটি করে না। এই ঘরের ভিতর যে বাতাস আছে, তাহা এই ঘরের দেয়ালে, ছাদে, মেজের উপর চাপ দিতেছে, এমন কি, আমাদের বুকে পিঠে মাথায় সর্ব্বত্র চাপিয়া আছে। চারি দিকে সমান চাপ পড়ায় আমরা টের পাই না; নতুবা সেই চাপের পরিমাণ এত বেশী যে, কেবল একধারে চাপ পড়িলে আমরা সকলেই চপেটীকৃত হইয়া চিপীটকে পরিণত হইতাম। একটা গেলাসে মুখ লাগাইয়া উহার ভিতরের বায়ু চুষিয়া লইলে ভিতরের চাপটা কমিয়া যায়, বাহিরের বায়ুর চাপে গেলাস গালের উপর চাপিয়া ধরে। পিচকারির ভিতর যে জল উঠে, সে বাহিরের বায়ুর চাপে। এই চাপের হেতু বায়ুর চপলতা। বায়ু চপল, উহার অণুগুলিও চপল; এই ঘরের ভিতর যে কোটি কোটি বায়বিক অণু বর্ত্তমান, উহারা ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এ মুখে ও মুখে সে মুখে বেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; ছুটিতেছে ও ছাদে দেয়ালে ধাক্কা দিতেছে; ধাক্কা দিতেছে, আর ছটকিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। প্রতি সেকেণ্ডে কোটি কোটি অণু কোটি কোটি বার ধাক্কা দিতেছে। এক একটি অণু অতি ক্ষুদ্র দ্রব্য, উহার ধাক্কা নগণ্য; কিন্তু যখন কোটি কোটি অণু সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার বেগে ধাক্কা দিয়া আসে, তখন অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা হইয়া পড়ে; তখন সেই ধাক্কার ফল আর নগণ্য থাকে না। ছিপি দেওয়া বোতলের ভিতর যে বাতাসটুকু আট্‌কান থাকে, আপাততঃ মনে হয়, উহা স্থির; কিন্তু ঐ বাতাসের চাপ বোতলের গায়ে লাগিতেছে; এবং সেই চাপের কারণ সেই বায়বিক অণুর ছুটাছুটি।

এই ঘরের মধ্যে কত কোটি বায়বিক অণু আছে, এবং এক একটি অণুর ওজন কত, তাহা অনুমান করা কঠিন; কিন্তু কি বেগে উহারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার নির্দ্দেশ তেমন কঠিন নহে। এক একটা অণুর ওজন না জানিলেও সমুদয় অণুগুলির একযোগে ওজন কত, তাহা জানি; এবং সকলে মিলিয়া দেয়ালের গায়ে কতটা চাপ দিতেছে, তাহারও হিসাব আছে; কাজেই

কত বেগে ধাক্কা দিলে সেই চাপটা সম্ভব হয়, তাহা খড়ি পাতিয়া বলিতে পারা যায়। আমি এখানে খড়ি পাতিতে বসিতেছি না, সে ভয় আপনাদের নাই, তবে খড়ি পাতিলে দেখা যাইবে যে, অণুগুলির বেগ নিতান্ত সামান্য নহে। অন্ততঃ আপনাদের কাহারও সেরূপ বেগে ছুটিবার ক্ষমতা নাই। পদব্রজে ত নাই, তবে বাইসাইকলে ছুটিলে কতকটা তুলনা চলিতে পারে। রেলগাড়ীর বেগের সহিতও তুলনা চলিতে পারে। বায়ুর চাপল্য সর্ব্বজনবিদিত হইলেও, স্থির বায়ুর অণুগুলি যে এমন ভীমবেগে ছুটিতেছে, তাহা অনেকেই জানেন না; কিন্তু উহা না মানিলে উপায় নাই। এই অনুমান ভিন্ন স্থির বায়ুতে কেন এতটা চাপ দেয়, তাহা বুঝিবার উপায়ান্তর নাই। অন্ততঃ এখনও অন্য উপায়ে কেহ বুঝাইতে পারেন নাই। শুধু চাপ কেন, ঐ চাপ কেন বাড়ে কমে, তাহাও বুঝাইবার অন্য উপায় নাই। ঠাণ্ডা বায়ুর চেয়ে উষ্ণ বায়ুর চাপ বেশী। আবার একটা বড় বোতলের বায়ুকে ঠেসিয়া যদি একটা ছোট শিশিতে পুরিয়া ফেলি, তাহাতেও তাহার চাপ বাড়িয়া যায়; কতটুকু বাড়ে তাহাও জানি; কেন বাড়ে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেও ঐ অনুমানের আশ্রয়েই উত্তর দিতে পারি। উষ্ণ বায়ুর চাপ বেশী, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঠাণ্ডা বাতাসের অণুর চেয়ে উষ্ণ বাতাসের অণু অধিক বেগে ছুটে; অধিক বেগে ছুটে বলিয়া ধাক্কার জোরও বেশী হয়; চাপের মাত্রাও বেশী হয়। আর বোতলের বাতাসকে ঠেসিয়া শিশিতে পুরিলে ধাক্কার জোর বাড়ে না বটে, কিন্তু ধাক্কার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। আগে যে সময়ে যতবার ধাক্কা পড়িতেছিল, এখন সেই সময়ে তার চেয়ে বেশীবার ধাক্কা পড়ে। ফলে বহুতর ধাক্কার ফলে চাপের মাত্রা বাড়িয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ বায়ুর চাপের কথা বলিলাম। মারুত পদার্থমাত্রের চাপেই এই কথা খাটে। জলের মত তরল পদার্থের পক্ষেও ইহা অনেকাংশে খাটে। মারুত পদার্থকে ঠাণ্ডা করিলে ও ঠাণ্ডা করিয়া উহাকে ঠেসিয়া ধরিলে, উহা তরল পদার্থে পরিণত হয়। আজ কাল বোতলে করিয়া তরল বায়ু বিক্রয় হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে, মারুত বায়ু ও তরল বায়ু, উভয় বায়ুতে প্রভেদ কি?

প্রভেদ কতকটা এইরূপ। একটা বড় মাঠের চারি দিক প্রাচীরে ঘেরিয়া তাহাতে শতখানেক স্কুলের ছেলে ছাড়িয়া দেওয়া হউক; তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দিলে ভাল হয়; তাহারা মাঠের মধ্যে আনন্দে ছুটাছুটি করুক। ছুটিতে ছুটিতে তাহারা প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা দিবে ও ছুটকিয়া অন্য দিকে চলিবে। পর-

স্পর মাথা-ঠোকাঠুকি না হইবে, এমন নহে। এইরূপে তাহারা পরস্পর ঠোকাঠুকি করিবে ও এঁটীরে ধাক্কা দিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিবে। বোতলের ভিতরে বা এই বায়ুর ভিতর বায়ুরাশিতে যে অণুগুলি আছে, তাহাদের অবস্থা কতকটা এইরূপ। বোতলের ভিতর জলীয় বাষ্প পুরিয়া রাখিলে তাহার অবস্থাও কতকটা এইরূপ হয়। অণুগুলির মাঝে প্রচুর ব্যবধান বা অবকাশ থাকে; সেই খোলা মাঠে উহারা ছুটিয়া বেড়ায়, পরস্পর ঠোকাঠুকি করে ও দেওয়ালে ধাক্কা দেয়।

বায়ু বা জলীয় বাষ্প যখন তরল বায়ু বা তরল জলে পরিণত হয়, তখন উহার অবস্থা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়। মনে করুন, সেই ছেলে-গুলিকে ইস্কুলের ঘরের ভিতর পুরিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু মাষ্টার তখনও ক্লাসে আসেন নাই। তখনও তাহাদিগকে বেঞ্চিতে বসান যায়; তাহারা ঘরের মধ্যেই ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হওয়ায় তখন আর তেমন দৌড়াদৌড়ির অবকাশ পাইবে না। ঘর ছোট, ছেলের সংখ্যা অধিক, তখন ছেলের ছেলের মাথা-ঠোকাঠুকি বা গা-ঘেঁষাঘেঁষির ব্যাপারটা বাড়িয়া যাইবে। দেওয়ালের গায়েও ধাক্কাধাক্কি না হইবে, এমন নয়। স্থানাভাবে এবার স্বাধীনভাবে দৌড়ানর সুবিধা হইবে না। তরল পদার্থের অণুগুলির অবস্থা কতকটা এইরূপ।

তরল পদার্থ আরও ঠাণ্ডা হইলে কঠিন হইয়া পড়ে। জল দানা বাঁধিয়া বরফ হয়। কঠিন হইবার সময় অনেক তরল পদার্থ দানা বাঁধে। দানার ইংরেজি নাম crystal crystalএর গঠনে কারুকার্য্য আছে, শৃঙ্খলা আছে, নিয়ম আছে। এখন সেই কঠিন অবস্থায় অণুগুলির অবস্থা কিরূপ? এখন মাষ্টার মহাশয় ক্লাসে বসিয়াছেন। ছেলেরা সারি দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়াছে; কোথায় সেই চপলতা, কোথায় সেই ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি; কেমন শৃঙ্খলা; কেমন সংযম। বেঞ্চির পর বেঞ্চি, এ পাসে বেঞ্চি, ও পাসে বেঞ্চি; কেমন থাকে থাকে সারি দিয়া রহিয়াছে। বেঞ্চির উপর বালকবৃন্দ কেমন শোভা করিয়া উপবিষ্ট।

এখন সকলে স্বস্থানে উপবিষ্ট; দেওয়ালে ধাক্কাধাক্কি ত নাই; পরস্পর ঠোকাঠুকিরও অসদ্ভাব। তবে গা ঘেঁষাঘেঁষি আছে। পূর্ব্বের মত চপলতা নাই, তবে চাঞ্চল্য যে নাই, তাহা বলিতে পারিব না। এই সভাস্থলে যাঁহারা এই প্রবন্ধপাঠকের মত মাষ্টারির তথ্য অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন,

যে, মাষ্টার মহাশয়ের উপস্থিতি, এমন কি বেত্রদণ্ড পর্য্যন্ত ছেলেদের চঞ্চলতা নিবারণে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হয় না। উহারই মধ্যে কাহারো বসিয়াই, শিরঃকম্প, হস্তান্দোলন, পদান্দোলন প্রভৃতি কত কি হইতেছে, তাহা কি মাষ্টার মহাশয়ের গোচরে আইসে? অসম্ভব! কঠিন পদার্থের অণুগুলিতেও ত তাহাদের পূর্ব্বের মত চপলতা নাই; তাহারা ছুটিয়া বেড়ায় না, বা ছুটিতে পায় না। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজ্জিত হইয়া আপন আপন স্থানে বসিয়াই কাঁপে, বা নড়ে, বা দোলে। উহারা আধার পাত্রের সর্ব্বত্র চাপ দিতে পারে না। আশে পাশে উপরে চাপ দিবার আর ক্ষমতা থাকে না, তবে অধোমুখে অর্থাৎ বেঞ্চির উপর বা কিছু জোরাজুরি। কঠিনের সহিত তরলের ও মারুতের এইরূপ প্রভেদ। তিন অবস্থাতেই অণুর সংখ্যা সমান থাকে; তবে অণুর চপলতা সমান থাকে না। মরুতের অণু খুবই চপল, উহারা দৌড়ায়, বেগে দৌড়ায়, যে দিকে পায়, সেই দিকে দৌড়ায়, রেলগাড়ীর মত বেগে দৌড়ায়, দৌড়িয়া আধার পাত্রের গায়ে ধাক্কা দিয়া পিছু হটিয়া আবার অন্য মুখে ছুটে; ছুটিতে ছুটিতে পরস্পর ঠোকাঠুকি করে। তরলের অণুও চপল, খুবই চপল; কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থানে আটক পড়ায়, উহাদের ততটা স্বাধীনতা নাই। ঠোকাঠুকিটা এখন খুব বেশী। পাত্রের গায়ে ধাক্কাও আছে।

কঠিনের অণুতে সে চাপল্য নাই, তাহারা ছুটিতে পারে না; কেহই ছুটে না বলিতে পারি না। কোটি কোটি অণুর মধ্যে দু' দশ হাজার যদি ছুটিয়া বাহিরে যায়, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। ক্লাসের ছেলেরা কি পণ্ডিতকে ফাঁকি দিয়া বাহিরে যায় না? তবে তাহার অধিকাংশই স্বস্থানে আবদ্ধ। এখন পাত্রের গায়ে ধাক্কা দিবার উপায় নাই। তবে স্বস্থানে বসিয়া যে কিছু চাঞ্চল্যপ্রকাশ। এই চাঞ্চল্য-প্রকাশের ফল উষ্ণতা। বরফের উষ্ণতাও থার্ম্মোমিটারে মাপা যায়।

ফলকথা, কঠিন, তরল ও মারুত, জড়পদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থার যে যে বিশিষ্ট ধর্ম্ম, তাহা এইরূপে বেশ বুঝা যায়। ঐ সকল বিশিষ্ট ও সেখানে ধর্ম্ম ছাড়া আরও অনেক খুটিনাটি এই অনুঘটিত অনুমান হইতে বুঝা যায়। এবং অন্য কোনও উপায়ে বুঝা যায় না বলিয়াই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা আজ কাল এইরূপ ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, জড়পদার্থমাত্রই অণুর সমবায়ে নির্ম্মিত।

অণুকে ভাঙ্গা যায় কি না? পদার্থবিজ্ঞানবিশারদ এ বিষয়ে কোনও স্পষ্ট কথা বলিতে চাহেন না; কিন্তু আর এক দল বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁহাদের

নাম রসায়নবেত্তা; তাঁহারা বলেন, অণু না ভাঙ্গিলে আমাদের কাজ চলিবে কিরূপে? তোমরা বলিতে চাহ, "জলের অণু জলের সূক্ষ্মতম অংশ; উহার চেয়ে ছোট জলের কথা কল্পনীয় নহে। ঐ অণুকে ভাঙ্গিলে তাহা আর জলকণা থাকিবে না; উহা আর কিছু হইবে।" তা হউক না। আমরা ত সেই আর-কিছু-হওয়া ব্যাপারেরই তত্ত্ব অন্বেষণ করিতেছি। আমরা ত সদা-সর্ব্বদাই একটা জিনিসকে আর-কিছু-জিনিসে রূপান্তরিত করিতেছি। আমাদের কাজই এই,—আমরা হিঙ্গুল হইতে পারা বাহির করি, পারাকে রস-কর্পূরে পরিণত করি, তুঁতের ভিতর হইতে তামা বাহির করি, কঠিন গন্ধক পোড়াইয়া তরল গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করি, দস্তাতে সেই দ্রাবক ঢালিয়া এমন এক গ্যাস বাহির করি, তাহা দেখিতে ঠিক্ বাতাসেরই মত; কিন্তু তাহাতে আগুন ধরাইলে হুস্ করিয়া আওয়াজ হয়, অথবা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া যায়। ঐ গ্যাসের শাস্ত্রসঙ্গত নাম হাইড্রোজেন। আবার ছেলেরা যে কলেরাপটাসে পটকা তৈয়ার করে, উহাকে গরম করিয়া আর একটা গ্যাস বাহির করি, উহাও দেখিতে ঠিক্ বাতাসেরই মত, কিন্তু তাহাতে প্রদীপের শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তপ্ত লোহা কাগজের মত জ্বলিয়া যায়। এই গ্যাসের শাস্ত্রসঙ্গত নাম অক্সিজেন। আবার এই যে জল, যাহা মানুষের জীবন, তাহার ভিতর হইতে আমরা অক্লেশে সেই গ্যাস দুইটা, সেই হাইড্রোজেন ও সেই অক্সিজেন বাহির করিয়া জলটাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারি। ওজন করিয়া দেখিয়াছি, নয় তোলা জল হইতে ঠিক্ এক তোলা হাইড্রোজেন আর আট তোলা অক্সিজেন বাহির হয়। সে গঙ্গাজলই হউক, আর গোলদীঘির জলই হউক। এক তোলা হাইড্রোজেন, আর আট তোলা অক্সিজেন, এই অনুপাতের কখনও ব্যতিক্রম দেখি নাই। হাইড্রোজেন যেখানে এক ভাগ, অক্সিজেন সেখানে আট ভাগ; সাড়ে সাতও নয়, সওয়া আটও নয়, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা আট ভাগ। এ কি ব্যাপার! আর একটা তরল পদার্থ আছে, উহা জল নহে; দেখিতে কতকটা তেলের মত! তাহাকে হাইড্রোক্সিল বলে। উহার ভিতর হইতেও আমরা হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বাহির করিতে পারি; আর কোনও তৃতীয় পদার্থ বাহির করিতে পারি না। সেখানে অনুপাত কিরূপ? হাইড্রোজেন এক ভাগ, আর অক্সিজেন কত? আট নহে, দশ নহে, পোনের নহে, সতের নহে, অক্সিজেনের ভাগ এখানে ষোল—আট দু'গুণে ষোল। জলে অক্সি-

জেনের ভাগ আট, আর হাইড্রক্সিলে অক্সিজেনের ভাগ আট দু'গুণে ষোল। ব্যাপার কি? পোনের আর সতের কি দোষ করিল? আমরা আরও কত জিনিস হইতে অক্সিজেন বাহির করিয়াছি, ওজন করিয়া দেখিয়াছি, হাইড্রোজেনের ভাগ এক ধরিলে অক্সিজেনের ভাগ হয় আট, কিংবা আট দু'গুণে ষোল, কিংবা তিন আটে চব্বিশ, কিংবা চারি আটে বত্রিশ, সেল আটের ঘরের নামতা মুখস্থ করিতেছি! অক্সিজেনের সঙ্গে এই আটের কি সম্পর্ক আছে; অক্সিজেন যে জিনিসের ভিতর যায়, ঐ আট বা আটের কোনও গুণফল সঙ্গে লইয়া যায়, ইহার তাৎপর্য্য কি?

তাৎপর্য্য এইরূপে বুঝিতে পারি।—জলকে যখন আমরা অন্য পদার্থে—অক্সিজেনে ও হাইড্রোজেনে পরিণত করিতে সমর্থ, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, জলের অণুকে ভাঙ্গা চলে। তোমরা বলিবে, জলের অণু ভাঙ্গিলে উহাতে আর জলত্ব থাকিবে না, উহা আর একটা কিছু হইবে। আমরা ত তাহাই চাই। জলের অণু ভাঙ্গিয়া আমরা যাহা পাই, তাহা জল নহে, তাহা হাইড্রোজেনের আর অক্সিজেনের সূক্ষ্মতম অংশ, উহার নাম দেওয়া হউক পরমাণু। অণু ভাঙ্গিয়া আমরা পরমাণু পাই—দুই রকম পরমাণু পাই,—এক পরমাণু হাইড্রোজেনের, অন্য পরমাণু অক্সিজেনের। মনে কর অক্সিজেনের পরমাণু হাইড্রোজেনের পরমাণুর চেয়ে আটগুণ দমে ভারী। এখন বুঝা যাইবে, কেন হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের ঐ অনুপাত। জলের প্রত্যেক অণু হইতে যদি আমি হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু পাই, আর অক্সিজেনের একটা পরমাণু পাই, আর যদি অক্সিজেনের পরমাণু ওজনে হাইড্রোজেনের পরমাণুর চেয়ে আটগুণ ভারী হয়; তবে ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেন ঐরূপ অনুপাত হইবে। এক ফোঁটা জলে না হয় বহু কোটি জলের অণু আছে; যত কোটি অণু আছে, প্রত্যেক অণু ভাঙ্গিলে তত কোটি হাইড্রোজেনের পরমাণু, আর তত কোটি অক্সিজেনের পরমাণু পাওয়া যাইবে; আর প্রত্যেক পরমাণু ওজনে আটগুণ হইবে; অক্সিজেনের কোটি পরমাণুর ওজনও হাইড্রোজেনের কোটি পরমাণুর ওজনের আটগুণ হইবে। কাজেই উভয়ের অনুপাত এক ভাগ আর আট ভাগ। হাইড্রোক্সিলের বেলায় ষোল ভাগ কেন? তাহাও বুঝা সহজ। জলের অণু ভাঙ্গিয়া অক্সিজেনের একটা পরমাণু পাওয়া যায়; হাইড্রোক্সিলের অণু ভাঙ্গিয়া মনে কর অক্সিজেনের দুইটা পরমাণু পাওয়া গেল। এক পরমাণুর ওজন আট হইবে, দুই পরমাণুর ওজন ষোল হইবে। ঐরূপ

অন্য কোনও দ্রব্যের অণু ভাঙ্গিয়া যদি অক্সিজেনের তিন পরমাণু পাওয়া যায়, সেখানে অক্সিজেনের ভাগ তিন আটে চব্বিশ হইবে। চারি পরমাণু থাকিলে ভাগ চারি আটে বত্রিশ হইবে; ইত্যাদি।

এখন আটের ঘরের নামতার সঙ্গে অক্সিজেনের সম্পর্ক বুঝা গেল। অক্সিজেনের ভাগ আট হয়, আবার ষোল হয়, মাঝামাঝি কিছু হয় না; দশও হয় না, চৌদ্দও হয় না, এমন কি আট দেড়া বারও হয় না। ইহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই যে, অক্সিজেনের পরমাণু আর ভাঙ্গা চলে না। উহা ভাঙ্গিতে পারিলে আটের ভগ্নাংশ মিলিতে পারিত। একটা পরমাণুকে দ্বিখণ্ড করিতে পারিলে আধখানা পরমাণুর ওজন হইত চারি। দেড়খানা পরমাণুর ওজন হইত আট দেড়ে বার। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কত জিনিস হইতে অক্সিজেন বাহির করিয়াছি, আট পাইয়াছি, ষোল পাইয়াছি, কিন্তু আটের দেড়া যে বার, তাহা কখনও পাই নাই। অর্থাৎ অক্সিজেনের পরমাণু কখনও দু' টুকরা করিতে পারি নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, অক্সিজেনের পরমাণু একেবারে অবিভাজ্য; অচ্ছেদ্যোঽয়ং অভেদ্যোঽয়ং। অণু ভাঙ্গিলে পরমাণু পাওয়া যায়, কিন্তু পরমাণু ভাঙ্গা যায় না। আর শৈত্যযোগে উহারা সঙ্কুচিত হয়। এই প্রসারণ-ক্ষমতা আছে বলিয়াই তপ্ত লোহার বেষ্টনী কাঠের রথচক্রের গায়ে কাটিয়া বসে, ঘড়ির পেণ্ডুলম গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালে দ্রুত চলিয়া কালনিরূপণের ব্যাঘাত জন্মায়।

জড় পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে, বা ফাঁক আছে,—অনুমান করিলে, এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ ব্যাপার বেশ বুঝা যায়। অণুগুলি কাছাকাছি আসায় সঙ্কোচন ও দূরে দূরে গেলে প্রসারণ ঘটে, এই অনুমান খুব স্বাভাবিক সহজ।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, এই একই উদাহরণে জড় পদার্থের গঠনের প্রণালী বুঝা গেল। মাঝে মাঝে ঐরূপ ফাঁক না থাকিলে সঙ্কোচন ঘটিবে কিরূপে? যাহা একবারে নিরেট ও নিরবকাশ, তাহার সঙ্কোচন প্রসারণ অসম্ভব।

কিন্তু এই একটা উদাহরণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। বৈজ্ঞানিক যখন কল্পনা করিতে বসেন, তখন তাঁহাকে অনেক আপাততঃ-বিরোধী ব্যাপারেও কোন রকমে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। পূর্ব্বে যে আকাশের কথা বলিয়াছি, যে আকাশকে অবলীলা-

ভাগ না হইল, তার ভাগ, তার ভাগ, চের ভাগের সম্ভব হইত। অপিচ [illegible] হাইড্রোজেন পাই, কিন্তু হাইড্রোজেন হইতে হাইড্রোজেন ছাড়া আর পাই না। ইহাতে বোধ হয় যে, জলের অণুর ভিতর হাইড্রোজেনের পরমাণু আছে; কিন্তু হাইড্রোজেনের পরমাণু ভাঙ্গিয়া অন্য কোনরূপ ক্ষুদ্রতর পরমাণু পাওয়া যায় না। অতএব পরমাণু অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অবিনাশ্য।

এই প্রবন্ধ মধ্যে এই কথা তুলিবার প্রয়োজন আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। পরিমিত দ্রব্যের পরিমাণের দুইটি উপায় বর্ত্তমান আছে। এক উপায় গণনা, আর এক উপায় মাপা। গোয়ালে কত গরু আছে, পাঠশালায় কত ছাত্র আছে, সভায় কত সভ্য আছেন, পদ্মে কত দল আছে, থলিতে কতগুলি টাকা আছে, ইহা আমরা গণিয়া বলি। জিজ্ঞাসা করি, কত বড় গরু, কতগুলি ছাত্র, কয়টি দল, কতগুলি টাকা ইত্যাদি। কিন্তু এমন প্রশ্ন করা যায়,—এই [illegible] কতগুলি জল আছে, এই পাহাড়টিতে কতগুলি পাথর আছে, এই টাকাতে কয়টা রূপা আছে, তাহা হইলে প্রশ্ন হাস্যকর হইবে। তাহা; ওরূপ প্রশ্নের উত্তর হয় না। সভাপতি মহাশয়ের গোয়ালে বেশী গরু, আমরা গোয়ালে বেশী গরু, কি কলপদক মহাশয়ের [illegible] স্থানে পড়া যায়, তাহা অনায়াসে গণিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি; এবং যদি গোয়ালে [illegible] জল বেশী, কি ইহাতে কোনও ফলের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই গামলার [illegible] গণিয়া এ গামলায় জল বেশী, তাহা গণিয়া বলিবার উপায় নাই; তা [illegible] ভিন্ন বাহির হয়। আপনি এই কি দুই মনে করুন, এই গামলার জল মাপিতে হইবে। একটা বাটি লইলাম; সেই বাটিতে যে জল ধরে, তাহার নাম দিলাম এক সের জল, বাটিটার নাম দিলাম, সেরের বাটি। এমন গামলা হইতে বাটি বাটি জল তুলিয়া ফেলা গেল, দশ বাটি অর্থাৎ দশ সের জল তোলার পর কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিল, উহাতে বাটি পূর্ণ হয় না। তখন আর একটা ছোট বাটি লইলাম; উহার নাম দিলাম, ছটাকের বাটি। সেই ছটাকের বাটিতে তোলা জল ভরিয়া দেখিলাম, যে জল অবশিষ্ট থাকিল, উহা এক সেরের কম। তখন আরও ছোট একটা বাটি লইলাম। উহা কাঁচার বাটি। এই বাটি দ্বারা তিন কাঁচা জল তোলার পর দেখিলাম, এখনও কিছু জল রহিয়াছে, উহা ঠিক কাঁচার কম। এমন বিরক্ত হইয়া সেই জলটুকু পরিত্যাগ করিলাম, এবং বলিলাম, এই গামলার জল মাপা গেল,—এত সের, তত ছটাক, তিন কাঁচা। ইহার নাম জল মাপা। কিন্তু মাপটা ঠিক হইল কি?

যে জলটুকু পরিত্যাগ করিয়াছি, সেটুকুর পরিমাণ কত? মাপিতে হইলে আবার কাঁচার বাটির চেয়েও ছোট বাটি লইতে হইবে; তাহাতে মাপার পরও যদি একটু জল বাকি থাকে, সেটুকুর জন্য আরও ছোট বাটি দরকার হইবে। যতই ছোট বাটি লও, খুব সম্ভব শেষ পর্য্যন্ত একটু জল বাকি থাকিবে,—যাহা সেই অতি ছোট বাটির চেয়েও অল্প; কাজেই এক সময়ে না এক সময়ে বিরক্ত হইতেই হইবে; এবং সেই কিঞ্চিৎ জলকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। মাপেও একটু ভুল থাকিয়া যাইবে। সে ভুল হয় ত খুব সামান্য ভুল, অকিঞ্চিৎকর ভুল; কিন্তু তবু ভুল বটে। গণনা কার্য্যে এমন ভুলের আশঙ্কা নাই। গণিবার সামগ্রীর সংখ্যা যতই বেশী হউক না কেন, যদি সময় থাকে ও ফাঁকি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভুল না করিয়াও গণনা চলিতে পারে; নির্ভুল গণনা কষ্টসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু অসাধ্য নহে। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা দশ বৎসর অন্তর ঠিক্ হয়। উহাতে ভুল থাকে; কেন না যাহাদের উপর গণনার ভার, তাহারা হয় ফাঁকি দেয়, কিংবা যাহাদিগকে গণিতে হইবে, উহাদের সকলকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল ত্রুটিতে ভুল হয়; নতুবা নির্ভুল গণনা অসাধ্য নহে। কষ্ট স্বীকার করিলে পঙ্গপালের পতঙ্গসংখ্যা, সাগরবেলায় বালুকা-সংখ্যা ও আকাশের তারকা-সংখ্যাও নির্ভুল গণা যাইতে পারে। কিন্তু এক গামলা জল নির্ভুল করিয়া মাপা একেবারে অসাধ্য। সূক্ষ্ম মাপে কাঁচার সহস্রাংশ বা লক্ষাংশ পরিমাণের জলও হয় ত মাপিতে পারিব; কিন্তু তাহার নীচে গিয়া পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। কাজেই মাপে একটু ভুল থাকিবেই; গণনায় সে ভুল থাকিবার আশঙ্কা নাই।

এই প্রভেদের কারণ কি? কারণ এই;—যে সকল দ্রব্য অবিভাজ্য, যাহা ভাঙ্গা যায় না, তাহাই গণনার যোগ্য; আর যাহা বিভাজ্য, তাহার গণনা চলে না। মানুষকে দ্বিখণ্ড করা চলে না, করিলেও তাহার মনুষত্ব থাকে না; গাভীকে দ্বিখণ্ড করিতে আপনারা কেহ সম্মত হইবেন, আশা করি না; ফুলকে ছিঁড়িলে উহা আর ফুল থাকে না; টাকাকে দুই টুক্‌রা করিয়া কাটিলে উহা আর বাজারে টাকা বলিয়া চলিবে না; কাঁঠাল ফলকে খণ্ডিত করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা খাদ্য হিসাবে উপাদেয় বটে, কিন্তু তাহা কাঁঠাল ফল নহে। কাজেই যাহার খণ্ড নাই, ভগ্নাংশ নাই, তাহাই গণনাযোগ্য। বাজারে আমরা সাড়ে পাঁচ গণ্ডা আম কিনিতে যাই, কিন্তু সাড়ে পাঁচটা আম কিনিতে

পারি না। দেড়টা বাঙ্গালী বা আড়াইখানা হাতীর কথা কেহ কখনও পরস্পরে বলা বা লেখা দেখা যায় না, মাপা যায়, তাহার লক্ষণ বিভাজ্য। এক সের বা সে কোটা জল, শতখণ্ডে বিভাগ করিতে পারি; কাজেই গণিয়া দেখা সের বা আড়াই তিন ছটাক, বা পৌনে পাঁচ কাচ্চা। চাল, ডাল, হাতী, ঘোড়া, বিভাজ্য দ্রব্য নহে; সেই জন্য গণনাযোগ্য। আর, জল, তেল, দুধ, ঘি প্রভৃতি বিভাজ্য; এই জন্য গণনাযোগ্য নহে।

এইখানে প্রশ্ন উঠে যে, জল যদি বস্তুতই বহুসংখ্যক অণুর সমবায়ে নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে উহাকেও গণনাযোগ্য না বলি কেন? এক কোটি জলকে কোটি খণ্ড, কোটি কোটি খণ্ডে ভাগ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত যখন জলের অণুতে ঠেকে, তখন সেই অণুকে ত আর ভাগ করা চলিবে না; জলের অণুকে দু টুকরা করিলে তখন তাহার জলীয়ত্ব থাকিবে না; উহা অন্য পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হইবে। তাহা হইলে গরু, ভেড়া, বা ফুল, ফল, যে হিসাবে গণনাযোগ্য, জলের অণুও সেই হিসাবে গণনাযোগ্য; এবং আমরা এক ফোঁটা জলে যদি অণুর সংখ্যা গণিতে পারিতাম, তাহা হইলে জলের পরিমাণনির্দ্দেশেও ভুলের সম্ভাবনা থাকিত না।

ইহা ঠিক্ কথা। জল যদি অণুর সমবায়ে নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে উহার অণুর সংখ্যা গণনা করিয়া উহার পরিমাণ অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করা অসাধ্য নহে। তবে গণা হয় না কেন? অণুগুলি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। উহাদিগকে ধরিতে ছুঁইতে পারি না; যদি কখনও এরূপ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়, যাহাতে অণুগুলি ইন্দ্রিয়-গোচর হইবে, তখন যাহার সময় আছে ও ধৈর্য্য আছে, সমুদ্রের জলে কত অণু আছে, গণিয়া বলাও তাহার পক্ষে অসাধ্য হইবে না। বস্তুতঃ কিন্তু গণনার উপায় নাই; আন্দাজ করিয়া সংখ্যা-নির্দ্দেশের চেষ্টা হইয়াছে বটে, এবং সে আন্দাজেও বেশী ভুল নাই, কিন্তু একটি একটি করিয়া নির্ভুল গণনা সম্প্রতি অসাধ্য। কাজেই আমরা মাপিয়া জলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করি। তাহাতে একটু ভুল থাকে, সে ভুলটুকু আমরা গ্রাহ্য করি না।

গণনা যেখানে অসাধ্য, সেখানে মাপের আশ্রয় লওয়াই চলিত প্রথা। যাহার অসীম ধৈর্য্য আছে, সে চাউল কিনিতে গিয়া একটি একটি করিয়া গণিয়া চাউল কিনিলে, কোন দোকানদার তাহাকে ঠকাইতে পারিবে না; কিন্তু এত ধৈর্য্য কাহার আছে! আমরা চাউলের কণা গণিয়া লই না। মণ, সের, ছটাক, বা কাঁচা পর্য্যন্ত ওজন করিয়া বা মাপ করিয়া দেখিয়া লই।

কাঁচের নীচে রাখা কর্ত্তব্য বোধ করি না। কাচের নীচে গেলে ঠকিতে হয় কম বটে, কিন্তু সেখানে টাকার মূল্য অপেক্ষা সময়ের মূল্য অধিক হইয়া পড়ে। আকাশের তারা, নদীর বালি আর বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণার গণনা যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহারা এই কার্য্যে লিপ্ত থাকুন। সাধারণ মনুষ্য এর উপায়ে কাজ নাই।

এইখানেই পরমাণু-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া আপনাদিগকে অব্যাহতি দিতে পারিতাম, কিন্তু আজকাল যে নূতন কথাটা উঠিয়াছে, তাহা একেবারে উল্লেখ না করিলে আপনারা বলিবেন, কিছুই হইল না; কাজেই আরও একটু কষ্ট দিব।

রসায়নবেত্তারা যে সকল মূল পদার্থের পরস্পরের যোগে যাবতীয় পার্থিব পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহাদের সংখ্যা প্রায় আশীটি। কাজেই পরমাণুর মধ্যেও সম্ভব আশী রকমের জাতিভেদ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মানবসমাজে যেমন জাতিভেদ সকলের ভাল লাগে না, পরমাণু-সমাজেও সেইরূপ জাতিভেদ ভাল দেখায় না। "কৈলাস শিখরমধ্যে যত ধাতু ছিল, তার মধ্যে স্বর্ণ আসি গৌরীকে নিন্দিল"—কৈলাস পর্ব্বতে ভূতগণের মধ্যে এই যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, জাতিভেদ তাহার মূলে। এই জাতিভেদ উঠাইবার জন্য কোনও Social Conference বসিয়াছিল কি না, ইতিহাসে তাহা লেখে না। এই জাতিভেদ বিধাতাপুরুষের অভিপ্রেত, ইহা মনে করিতে ক্লেশ হয়। কাজেই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মধ্যে যাহারা সাম্যবাদী, তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেন, এই পরমাণুবাদে কোথাও কি একটা গলদ আছে। যে সকল পরমাণু একজাতির অন্তর্গত, তাহারা কেবল গোঁট করিয়া দল পাকাইয়া বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে, এইরূপ মনে করিলে বিধাতাপুরুষে কোনও দোষ স্পর্শে না। এই জন্য সাম্যবাদীরা আশা করিয়া বলিয়াছিলেন, এমন দিন আসিবে, যে দিন প্রতিপন্ন হইবে পরমাণু কেবল এক রকম—মূলে ব্রহ্মপদার্থে ভেদ নাই। পরমাণুকে একেবারে অবিভাজ্য মনে করিলে কিন্তু জাতিভেদ থাকিয়া যায়, অথচ জন্ম ভাঙ্গিলে যেমন পরমাণু হয়, সেইরূপ পরমাণু ভাঙ্গা চলে কি না, তাহার কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল না।

এ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল না; কিন্তু এখন উপস্থিত হইয়াছে। তিন বৎসর হইতে চলিল, স্যর উইলিয়াম ক্রুকস্ তাঁহার আবিষ্কৃত অতিপর নূতন তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন, যেই আসি এক নূতন

একার জড় কণিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ইহার নাম দিলাম Proton। এই জড় কণিকার সমবায়ে বিবিধ পরমাণু নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্রুক্‌সের কথায় তখন কেহ কাণ দেয় নাই। এখন কিন্তু আর না দিলে চলিতেছে না। নানা দেশের নানা পণ্ডিত নানা পথে চলিয়া সেই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছেন। সেই কাহিনী বিবৃত করিবার এই সময় নহে। এখন দেখা যাইতেছে, পরমাণু ভাঙ্গা খুব সহজ। এতকাল জানিতাম, হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ বুঝি আর কিছুই নাই। এখন দেখা যাইতেছে, হাইড্রোজেনের পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করা যাইতে পারে। এক এক টুক্‌রা আবার কত সূক্ষ্ম! সাত আট শত টুক্‌রা একযোগে হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান হয়। হয় ত এই কণিকাগুলির একত্র যোগেই হাইড্রোজেনের পরমাণু গঠিত হইয়াছে। কেবল হাইড্রোজেনের পরমাণু কেন, যাবতীয় পরমাণু—দ্বিজোত্তম স্বর্ণ হইতে কাণা নিগার লোহা পর্য্যন্ত—সকলের পরমাণু ভাঙ্গিয়াই সেই একই কণিকা বাহির হইতেছে। এই কণিকাগুলির চাল চলন বড় অদ্ভুত। এত দিন আমরা অণু পরমাণুকেই চপল বলিয়া জানিতাম। তাহারা স্থির থাকিতে চায় না, ছুটিতে চায়। এই ঘরের বায়ুরাশিতে যে সকল অণু আছে, তাহারা রেলগাড়ীর অধিক বেগে ছুটিতেছে। কিন্তু এই কণিকাগুলির চপলতার কাছে উহা কিছুই নহে। সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল চলা ইহাদের পক্ষে অসাধ্য নহে। বস্তুতই ইহারা ঐরূপ বেগে অনেক সময় ছুটিয়া চলে। রেডিয়ম্ প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত ধাতুর কথা আপনারা শুনিয়াছেন; উহার পরমাণুগুলি বড়ই ভঙ্গপ্রবণ, ঐ পরমাণু কেবলই ভাঙ্গিতেছে। তাহা হইতে ঐ সকল কণিকা কেবলই ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহারই বা আবার বেগ কত! পরমাণুমাত্রের ভিতর এই সকল কণিকা শতে শতে বা সহস্রে সহস্রে আট্‌কান আছে; কিন্তু তাহারা কি আট্‌কান থাকিতে চায়! তাহারা ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়াও কেবলই বেগে ঘুরিতেছে; আর আকাশের সমুদ্রে ধাক্কা দিয়া আলোকের ঢেউ তুলিতেছে। সুবিধা পাইলেই উহারা ছটকিয়া বন্ধনমুক্ত হইয়া বাহিরে আসে। বাহিরে আসিয়া মহাবেগে ঋজুপথে আকাশ ভেদ করিয়া চলে। নিকটে একটা চুম্বক ধরিলে তাহাদের পথ বাঁকিয়া যায়। নিরেট ধাতু পদার্থকে ভেদ করিয়া তাহারা চলিয়া যায়। এইরূপ তাহাদের বিচিত্র লীলা। আবার বিচিত্র এই যে, ঐ সূক্ষ্ম কণিকাকে জড় পদার্থ বলিব কি না, তাহাই বলা দুষ্কর। যাবতীয় জড় পদার্থের পরমাণু ঐ

সূক্ষ্ম কণিকাতে গঠিত; উহাই জড় পদার্থের উপাদান। ঐ কণিকাকে জড় বলিব কি না বিষম সমস্যা; উহাকে জড়-কণা না বলিয়া তড়িৎ-কণা বলাই সঙ্গত। যে তাড়িত বা Electricity লইয়া মানুষে এই শত বৎসর ধরিয়া এত কাণ্ড-কারখানা করিতেছে, অথচ তাহার স্বরূপ কি, কিছুই জানিতাম না। এখন দেখিতেছি, জড় পরমাণুর এই সূক্ষ্ম কণিকা সেই তাড়িতের সহিত অভিন্ন। তাড়িতের স্বরূপ লইয়া এতকাল একটা ঝগড়া ছিল; এককালে পণ্ডিতেরা বলিতেন, উহা এক রকম জড় পদার্থ। একালের পণ্ডিতেরা একবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; বলিতে লাগিয়াছিলেন, তাড়িত কি ধারার পদার্থ তাহা জানি না,—তবে উহাকে কাজে খাটাইতে পারি বটে। এখন উল্টাইয়া বলিতে হইতেছে, তাড়িত জড় পদার্থ হউক না হউক, জড় পদার্থ তাড়িত-কণায় নির্ম্মিত। জগতে কেবল তাড়িতই আছে; উহাই জড় পদার্থের উপাদান। কিন্তু আমার ভাষা ক্রমশঃ দুর্গম হেঁয়ালিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে; বিজ্ঞান যদি বুদ্ধির অগম্য হয়, তাহা হইলে উহা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আমি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িতে আসিয়াছি; অজ্ঞানের আলোচনার জন্য আপনারা আমাকে ডাকেন নাই। অতএব এইখানেই সমাপ্তি শ্রেয়স্কর। *

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সুকুমারী। *

ও মা কুলরেণু! মোহন বালিকা,
তুই যেন ক্ষুদ্র অকুট মল্লিকা,
কিংবা মনোহরা গোলাপকলিকা
ঋতুশ্রেষ্ঠ ফাল্গুনে,—ও তোর সৌন্দর্য্যে
কি যে যাদু আছে; ও তোর মাধুর্য্যে
কি যে শোভা আছে, পারি না বলিতে;
হেন দৃশ্য আমি হেরি নি মহীতে!
শ্রাবণ-বৈকালে নবীন-উজালা
একগাছি তুই বকুলের মালা!
দুর্গাপূজা-দিনে, শারদ উৎসবে,

* বরাহনগর শশিপদ ইন্‌স্টিটিউটে গত বৈশাখে পঠিত।

তোমার উষ্ণ কণ্ঠে হাসিছে নীরবে
যেন একগাছি পেটলার হার!
হৃদয়-আঁধারে তুই মা আমার
প্রফুল্ল জোছনা; বস্তায়ন দিয়া
তরল আনন্দ পড়িছে ঝরিয়া!
বল বল মোরে, লো সুষমাময়!
কোন্ পুণ্যরাজ্যে লো আনন্দময়ি!
ছিলি লুকাইয়া?—আমি ভাগ্যবান
হেরি তোরে আজি জুড়াইল প্রাণ!
কি মধুমাখানো কথাগুলি তোর!
আধ আধ ভাষে ফুলরেণু মোর!
কথা কস যবে, আনন্দ-ঝরণা
বহে যায় মরি!—সুন্দর মরমা,
কিম্বা জাল সুরী, টিয়, চন্দনা
হৃদি-পিঞ্জরের, তুই মা আমার!
মরি মরি কিবা সুষমা অপার!
—ফল-ফুল-পত্রে হৃদয়ের পাখী
ভরি যায়, ওরে বসন্তের পাখী!
তুই যবে বসি' পল্লবের মাঝে
গান গাস্ আহা কোকিলার সাজে!
আঁখি যায় ভরি আনন্দ-বারিতে
তোর হাসিমুখ হেরিতে হেরিতে!
আঁখি মুদি আসে, হ'য়ে যাই চুপ,
ওই চাঁদমুখে হেরি অপরূপ
বালিকা রাধার অনিন্দ্য মূরতি!
করি আদি ধ্যান, নেত্র-জলে তিতি,
কিশোরী রাধার কিশোর-বদন!
মা—মা—মা, বলিয়া বন্দি ও চরণ।
নারদের-মত, করে-লয়ে বীণা
করি তোর স্তুতি, অয়ি দেবাঙ্গনা!
চাহি ধরে মরি ফুটে উঠ ফুল,
যমুনা-তটের নাচিয়া কদম্ব!
চাহি ধরে মরি রম্য উপবন,
চাহি ধরে মরি নব বৃন্দাবন,
তারি মাঝে তোর মূরতি মোহন!

* "সুকুমারী" একটি দশ বৎসরের বালিকা, তাহার আদরের নাম 'ফুল রাণী'।

জাতিভেদ। (১৯১৮)

—:০:—

আমরা বেশ বুঝে দেখ্‌ছি যে, কোনও নৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নের কোনও একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। এক্‌টা দিকে কিছু বল্‌বার দেখা যায় যে, ঠিক উল্টা দিকে আর কিছু বল্‌বার আছে।

ধরুন, এই একটা প্রশ্ন—জাতিভেদ বা শ্রেণীবিভাগ। এই জাতিভেদ জিনিসটা, দেখা যায়, ইংরাজ সমাজেও আছে; মুসলমান সমাজেও আছে। তবে এ'কথা স্বীকার্য্য যে, ভারতবর্ষে এটা যে আকারে আছে, এবং পুরাকাল থেকে চলে আস্‌ছে, সে আকারে বোধ হয় এটা পৃথিবীর কুত্রাপি নাই।

এখন সে ঘটনাবলি কি, যার চক্রে পড়ে' ভারতবর্ষে এই ব্যাপারটা এই রকম আকার ধারণ ক'রেছে? তা নির্দ্ধারণ কর্ত্তে গেলে পুরাতত্ত্ব ও শাস্ত্র বেশ মনোযোগসহকারে অনেক বৎসর ধরে' পড়্‌তে হয়; তার পরে হয় ত এটা 'কষে' বাহির করা যেতে পারে। কিন্তু যখন আমার ঐ দুইটার মধ্যে একটাও ভাল করে' পড়া নাই, তখন সে বিষয়ে কথা কহিলে ভুল না হওয়ার চেয়ে ভুল হওয়াই বেশী সম্ভব।

তার পরে এই প্রথাটা কোন্ সময়ে কি ভাবে, এত দিন ধরে' কি সমাজের মধ্য দিয়া বহে' এসেছে, এবং কোন্ কোন্ ঘটনা দ্বারা প্রথাটা ক্ষুণ্ণ, দীর্ঘ, প্রশস্ত বা সঙ্কীর্ণ হয়েছে, তা বিচার করা সম্ভব হ'লেও, সে বিষয়েও কোনও একটা সিদ্ধান্ত, বিশেষ জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি না।

আমাদের আজ বিচার্য্য বিষয়, জাতিভেদটা ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আকারে বা অন্য কোনও সম্ভব আকারে রাখা উচিত, না একেবারে উঠিয়ে দেওয়া উচিত; যদি তা উঠিয়ে দেওয়াই উচিত হয়, তা হ'লে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব কি না?

প্রথমতঃ প্রমাথের ভার তাঁর উপর, যিনি প্রথাটাকে উঠিয়ে দিতে চান; তিনি একটা বহুপুরাতন প্রচলিত প্রথা তুল্‌তে চান। তিনি আঙ্কাতে চান। তিনি বাদী।

তাঁর পক্ষে কি কি বক্তব্য, তা বুঝে দেখা যাক্। তাঁর মতে, জাতিবিভাগ জিনিসটা মন্দ, এই জন্য কারণে:—

(১) এক জন মানুষ যে আর এক জন মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে, তা করবার কারও কোনই স্বত্ব নাই,—যদি তার নিজের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব না থাকে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজ্য নয়। যদি সে চোর, লম্পট, মিথ্যাবাদী হয়, সে ঘৃণার্হ। আর শূদ্র শূদ্র বলিয়াই নীচ নয়। সে যদি সাধু চরিত্র ও পরহিতব্রতী হয়, ত সে পূজার্হ।

(২) যে প্রথায় একটা শ্রেণীকে অবশ্যকার্য্যরূপে শ্রেষ্ঠ, আর একটা শ্রেণীকে অবশ্যকার্য্যরূপে হীন বলে' নির্দ্দেশ করে, সে প্রথায় শেষোক্ত শ্রেণীর একটা হতাশা ও প্রথমোক্ত শ্রেণীর একটা দম্ভ এনে দেয়। ইহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সকলেই যদি জানে যে, কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহার ও কার্য্যের উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, যে অত্যন্ত নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও নিজের চেষ্টায় সে প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড বা ওয়াশিংটন হ'তে পারে; আবার উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলেও সে নিজের কার্য্য দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষাও ঘৃণ্য জীব হ'তে পারে; তা হ'লে সকলের ভাল হ'বার চেষ্টা অধিক হওয়াই সম্ভব।

(৩) জাতিবিভাগ উঠে গেলে কার্য্য-নির্ব্বাচনের স্বাধীনতার পরিধি বর্দ্ধিত করা হয়। এক জনকে যতই বেশী সুবিধা দেওয়া যায়, ততই সেটা তার পক্ষে হিতকর হয়, এবং সে যদি কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, সেটা সমাজের পক্ষেও হিতকর হয়।

(৪) যদিই জাতিভেদ রাখনীয় হয়, তা হ'লে বর্ত্তমান আকারে সেটা রাখা উচিত নয়। কারণ, জাতিভেদের যদি কোন sound principle থাকে, তাহা এই যে, শ্রেণীবিশেষের নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলির ভিত্তির উপর সে গঠিত। কোনও শ্রেণীর নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলির বিরোধী কিন্তু যদি সেই শ্রেণীর কেহ করে, তা'কে সেই শ্রেণী হ'তে বর্জ্জন না করলে সে শ্রেণী নিত্য থাকে না। বর্ত্তমান সমাজে ব্রাহ্মণ মুর্গী খেলে পতিত হয়, কিন্তু চোর হ'লে পতিত হয় না। এরূপ নিয়ম সম্পূর্ণ artificial এবং এটা sound principle নয়। আবার নিম্নতর শ্রেণীর কেহ যদি উচ্চতর শ্রেণীর পক্ষে নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলি করবার যোগ্যতার কোনও প্রমাণ দেয়, তা হ'লে তাহাকে সেই উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিয়ে নেওয়া উচিত।

প্রতিবাদীর উত্তর।

প্রথমতঃ বাদীর যুক্তিখণ্ডন।

(১) বাদীর Sentiment মতে সব মানুষ সমান; এবং তার নিজের ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে যে, তাকে পূজা করব, কি ভাল বাসব, কি ঘৃণা করব। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, সত্যই কি সব মানুষকে ঈশ্বর সমান করে' সৃজন করেছেন? কি সমাজই (পৃথিবীর যে কোন সমাজ) সমান সুবিধা দিয়েছে? ঈশ্বর এক জন মানুষকে জন্মান্ধ, কদাকার, রুগ্ন, বা উন্মাদ করে' সৃজন করেছেন; আর এক জনকে শারীরিক ও মানসিক সব রকম সুবিধা দিয়াছেন। আবার জন্মগ্রহণের পরে, কোনও মানুষকে সমাজ দরিদ্র করে' কুসঙ্গের মধ্যে ফেলে রেখেছে। আর এক জনকে জন্মাবামাত্র প্রভূত অর্থ ও সুসঙ্গ যোগাড় করে' দিয়েছে। মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই এই সব বিষয় দ্বারা কতক গঠিত হবেই; কেবল তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের (excercise of the free will) এর উপর নির্ভর করবে না। তবে এটা বেশ দেখা যাচ্ছে যে—বাদী যে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের উপর মানুষের সম্মান স্থাপিত করতে চান, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজের অর্জ্জিত শ্রেষ্ঠত্ব নয়। অন্যরূপ সৃষ্টি হ'লে, বা অন্যরূপ ঘটনাচক্রে পড়্‌লে, যে আজ পূজার্হ, সে হয় ত ঘৃণার্হ হ'ত; আর যে ঘৃণার্হ, সে হয় ত পূজার্হ হ'ত। চোরের সংসর্গে পড়ে', বা দারুণ দারিদ্র্যে পতিত হ'য়ে যে চোর হ'য়েছে, সে হয় ত অন্যরূপ অবস্থায় সাধুপুরুষের ন্যায় সম্মান লাভ করত; যে উচ্চ-শিক্ষা পেয়ে এক জন বিদ্বান্ বলে আজ শ্রদ্ধেয়, সে তার পিতার দারিদ্র্যের দরুণ যদি শিক্ষা পা'বার সুযোগ না পেত, তা হ'লে হয় ত মূর্খ বলে' অবজ্ঞাত হ'ত। মানুষের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব কতখানি স্বোপার্জ্জিত আর কতখানি প্রাপ্ত, তা কি কেহ বিচার করে' তাহাকে মান্য করে বা করতে পারে?—তবে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব রইল কোথায়?

বাদী বল্‌বেন যে, হাঁ, ওটা একটু গোলমেলে ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল বটে; ঠিক বিচার সম্ভব নয় বটে! তবে একটা অবিচার অন্যটাকে বাধা দেবে বলে' কি আর একটা অবিচার তাহার উপরে চাপা'ব?

এখন এটা যে অবিচার, সেটা একটা প্রবৃত্তি (Sentiment) মাত্র। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, কি মানুষের একটা সহজাগত ধারণা, তা ঠিক বলা যায় না. তবে আপাততঃ এই রকম একটা প্রবৃত্তি দাঁড়িয়েছে

আছে। কিন্তু এখানেও বুদ্ধিমত্তার প্রশ্ন আসে; যার যতটা ক্ষমতা সে তত নম্রতা, তা হলে তিনি যাকে আকর্ষণ করেন, তার [illegible] হয়তো সর্বাঙ্গে কুরূপ একটা সাংঘাতিক প্রশ্নচিহ্ন। যদি তাঁর সে চিহ্নে চিহ্নিত দেখে যা অতীত মহাপুরুষের সভায়, তাহলেই তাঁর প্রতি একটা এমনের ভাব এসে পড়বেই। প্রাচীনগণের সেই ভুলে গেল, যাকে বাবে, থাকে কি, করিয়া, যৌতুক ইত্যাদি জন্মান্তর [illegible] তাতে প্রত্যেক ইংরা একটা, অক্ষিত ভাব আপনা হইতেই মনে পড়ে না কি? এ [illegible] ঘোর কলি বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্ক [illegible]। [illegible] এক ফন her solitary nobleness ঐশ্বর্য দেখে লোকে আসা যাওয়া করবে; কিন্তু যদি কেহ সে ঐশ্বর্য নিজের করায়ত্ত করিতে, তাহলে সে সমস্ত লোকের মনস্তাপের কারণ হবে, এবং upstart বলে ঘৃণিত হবে। কেহ বলেন যে, বুদ্ধিতে প্রকৃতি অপেক্ষা এই প্রকৃতিই [illegible] হইতেছে। কেন না, এ প্রকৃতি পুরুষোচিত প্রবৃত্তিকে প্রশমিত করিয়া [illegible] থাকে।

যে, যে যাহার নীচ কার্য্য করে, আর যে তাহার উচ্চ কার্য্য করে, তাদের দুজনেরই যে একই প্রকার মান পাইবার যোগ্য তাহা নহে, এমনটি নয়। শুধু এইটুকু বলা উচিত, যে প্রথম যে পরিমাণ নীচ কার্য্য করে, সে সেই পরিমাণে তাহার যথোচিত মর্য্যাদা হারায়। আর যে পরিমাণ উচ্চ কার্য্য করিবে, সেও সেই পরিমাণে সম্মানের [illegible] হইবে। কিন্তু তাই বলে তাদের সম্মানের [illegible] বংশ-পরিচয়ে যে একটা [illegible] নাই, তাহা নহে। এই initial disadvantage [illegible] পাশ্চাত্যে [illegible] যার ফলে যারা না পেতে পারে। [illegible] সেই, তাহাতে তাদের [illegible]। এই [illegible] যেমন, সমাজে [illegible] ছয়শত টাকা; সেটা আগে যারা অর্জনের [illegible] দান করে দিন, শক্তি যৌবনটি বৃদ্ধি, এ সব সকলকে সমান করে' [illegible] দিন, তার পরে তাদের সামর্থ্য বিচার এই [illegible] উপর যেন তিনি [illegible]।

২) [illegible] নিউটন [illegible] বলা যায় যে, এ কথা সত্য যে, এই [illegible] একটা লয়, তার [illegible] একটা অসংখ্য ক্ষুদ্র [illegible] [illegible] এই দুটোই এক হিসাবে [illegible] সঙ্গে, [illegible]

যদি মানে যে, সে মহৎ কিছু না করেও বা খারাপ কাজ করেও মঙ্গল, বা শূদ্র ভালো কাজ করেও অবজ্ঞেয়, তা হ'লে সেটা এক পক্ষে আলস্য ও অন্য পক্ষে হতাশা এনে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সেরূপ হয় কখন? না, যদি পরস্পরের প্রতি একটা বিরোধের ভাব থাকে। যদি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জানে যে, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোনও Competition নাই, তাহাদের Competition নিজের নিজের শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, তা হ'লে কোনও অশুভ ফল হয় না। তবে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের যেখানে সংঘর্ষ, সেখানে এক পক্ষে অনুচিত গর্ব্ব আর এক পক্ষে অশুভতর হতাশা এনে দিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণের এই গর্ব্ব সময়ে সময়ে আলস্যের হেতু না হ'য়ে তাঁর মঙ্গলের উপায় হ'তে পারে। ব্রাহ্মণ এরূপও গর্ব্ব করতে পারে যে, আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান—ব্রাহ্মণের অযোগ্য কাজ আমি কখনও করব না। তা'তে তাঁর বংশমর্য্যাদা তাঁকে অনেক সময় হীন কাজ থেকে রক্ষা করে। তাঁর একটা চক্ষুলজ্জা বেশী হয়। "আমি অমুকের সন্তান, আমি এই হীন কাজ করব? কখন না।" লোকে আবার গভীর দুঃখে সেই স্মৃতি তার সান্ত্বনার কারণও করতে পারে। হিন্দু জাতির যদি গৌরব করবার কিছুই না থাকত, সেটি কি তাঁর মঙ্গলের হেতু হ'ত?—শূদ্র সম্বন্ধে এ যুক্তি খাটে না।

(৩) বাদীর তৃতীয় যুক্তি প্রায়ই ঠিক। তার বিপক্ষে এইমাত্র বক্তব্য যে, এক দিকে যেমন পরিধি বৃদ্ধি করা যায়, অন্য দিকে পরিধি একটু কমানো হয়। বিশ্বনাথ কর্ম্মকার যদি কর্ম্মকারের ব্যবসা ছেড়ে কুম্ভকার হন, তা হ'লে বৈদ্যনাথ কুম্ভকার, বিশ্বনাথের নিষ্পেষণে হয় ত উত্তম কুম্ভকার হওয়া দূরে থাকুক—না খেতে পেয়ে মারা যেতে পারেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তম জিনিস; কিন্তু অত্যধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিষ্টের হেতু হ'য়ে দাঁড়ায়। তা'তে অনেক সময় একটা প্রতিভা প্রস্ফুটিত হ'বার যথেষ্ট উপায় পায় না। খুব ঘেঁষাঘেঁষি আলু পুঁতলে উৎপন্ন আলুগুলি পরস্পরের নিষ্পেষণে ছোট হয়। আর দূরে দূরে পুঁতলে তারা বাড়বার সুযোগ পায়। অনেক শূদ্র ব্রাহ্মণের কার্য্য করতে, অনেক ব্রাহ্মণ, যাঁরা নিজের পরিধির মধ্যে মস্ত হ'তে পারতেন, তাঁরা অত্যধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুষড়ে যেতে পারেন; অথচ যে শূদ্রেরা নিজেদের পরিধির মধ্যে 'কাজের' হ'তে পারতেন, তাঁরাও হয় ত এ চক্রের মধ্যে এসে কোনও সুবিধা করতে পারলেন না।

(৪) বাদীর চতুর্থ যুক্তির বিপক্ষে একটি কথাও বলবার নাই।

কথাটা একেবারে ঠিক্! ব্রাহ্মণ মুর্গী খেলে 'জাত' যায়, (যদিও সেটা আজ কাল বড় যায় না) কিন্তু সে চোর হ'লে জাত যায় না। ইহা আইন নয়, ইহা একেবারে উন্মাদের প্রলাপ। তবে তাঁর স্বপক্ষে একটা কথা বলা যায় যে, সম্ভবতঃ মুসলমান-রাজত্বকালে এ রকম বিধান ব্রাহ্মণেরা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা মুসলমান জাতিকে একটা অপর জাতি বিবেচনা করতেন, এবং তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া জাতির পক্ষে অনুচিত বিবেচনা করতেন। তাই তাঁরা যাবতীয় মুসলমান-প্রথা বর্জ্জন করে' হিন্দুকে মুসলমান হ'তে একেবারে পৃথক রাখবার জন্য এই আচারের আইনগুলি করে' সেগুলিকে শাস্ত্র বলে' ভাহির করেছিলেন। তাঁরা আর্য্য-রক্ত বিশুদ্ধ রাখতে যে বিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পুরাতন ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এখন বাহ্যিক যুক্তি সম্বন্ধে যা বক্তব্য, তা উপরে বলা গেল। বাহ্যিক উক্তির মধ্যে কতক কতক সত্য আছে নিশ্চয়। কিন্তু মিল বলেছেন যে, সামাজিক প্রশ্ন সব অঙ্কশাস্ত্র নয়। এ সবগুলির দু' দিকেই কিছু না কিছু বল্‌বার আছে। তা'দিগকে ওজন করে' বেছে নিতে হবে।

এখন দেখা যাক যে, জাতিভেদের পক্ষে কি কি যুক্তি।

জাতিভেদ বাঞ্ছনীয় এই এই কারণে ;—

(১) Principle of heredity. এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তর্কই নাই যে, বংশ-পরম্পরায় গুণ বা দোষ, পিতা হইতে পুত্রে বর্ত্তায়। এর উপরে principle of selection (বা principle of rejection) লাগিয়ে একব্যবসাবলম্বী বংশের বহু পুরুষ পরে, সেই ব্যবসা সম্বন্ধে সেই বংশজাত ব্যক্তির একটা উৎকর্ষ জন্মায়। বংশপরম্পরায় ক্রমাগত ব্যবসায়-পরিবর্ত্তনে সে উৎকর্ষ জন্মাবার সমান সুযোগ হয় না। এ বিষয়ে যদি কাহারও দ্বিমত থাকে, তা হ'লে এ বিষয়ে যুক্তি দেওয়া যেত। কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

(২) সন্তোষ। এই Systemএ আপন আপন শ্রেণীর মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রেখে পরস্পর শ্রেণী-সম্বন্ধে একটা সন্তোষ বা resignation এনে দেয়। যদি শূদ্র জানে যে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের barrier পার হ'বার নয়, তা'তে তার একটা resignationএর ভাব আসে, যা' সমাজের শান্তিরক্ষার জন্য হিতকর। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ, অশান্তি ও বিদ্রোহের ভাব, আর ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ সন্তোষ, এ যুক্তির

জ্বাজ্বল্যমান উদাহরণ। ইংলণ্ডে মফঃস্বলে এখন কৃষি মজুর (farm labourer) পাওয়া দুষ্কর। সব মজুররা উচ্চতর professionএ যা'বার জন্য রাজধানীতে বা কোনও অন্য বৃহৎ নগরে গিয়ে প্রায় উপবাস করতে প্রস্তুত, অথচ কৃষি মজুরের কাজ করতে স্বীকৃত নয়।

(৩) তৃতীয় যুক্তি এই যে, শ্রেণীবিভাগ পৃথিবীতে অনিবার্য্য। জাতি উন্নত হ'লেই এক একটা শ্রেণীকে সে এক এক রকম বিশেষ কাজে নিযুক্ত করে। জাতির আদিম অবস্থায় সকলেই নিজের নাপিত, ধোপা কর্ম্মকার ইত্যাদি থাকে। পরে এই সব ব্যবসায় পৃথক শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে যায়। amœba সমস্ত শরীর দিয়ে নিশ্বাস ফেলে, খায় ও গমন করে। কিন্তু উচ্চতর জানোয়ারের (ধরুন যেমন কুকুর) নিশ্বাস ফেল্‌বার, খা'বার ও যা'বার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। উন্নতির ধর্ম্মই ঐ। জাতি আরও অগ্রসর হ'লে এই কাজগুলি Heriditary হ'বার প্রবণতা জন্মে। তার একটা কারণ এই যে, পিতা পুত্রকে যদি শিক্ষা দিতে চান ত তাঁর নিজের কাজে পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও কম ব্যয়সাধ্য হয়। কারণ, সে শিক্ষা তিনি নিজে দিতে পারেন। তার উপরে পিতা যেরূপ আগ্রহে ও যত্নে নিজের সন্তানকে শিক্ষা দেন, এক জন অন্য শিক্ষক কখনই সেরূপ যত্নে ও আগ্রহে তাহাকে শিক্ষা দেয় না। ইহা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তার বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হ'লে অনেকখানি শক্তির প্রয়োজন। যতক্ষণ না প্রমাণ হয় যে, সে শক্তি-ব্যয় জাতির পক্ষে নিশ্চিতরূপে হিতকর, ততক্ষণ সে শক্তি অন্য দিকে অনর্থক ব্যয় করা বিধেয় নয়।

(৪) যদি জাতিভেদ উঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হয়, ত সেটা ভারতবাসীর পক্ষে একটা অসাধ্য ব্যাপার। সেটা জাতীয় characteristicএর সঙ্গে খাপ খায় বলেই সেটা এ দেশে এত বদ্ধমূল হয়েছে। সেটা এত বদ্ধমূল হ'য়েছে যে, এত শতাব্দীর বিদেশীয় শাসন, তা'কে বিনাশ করা দূরে থাকুক, তা'কে দৃঢ়তর করে'ছে। এই জাতিভেদই এতদিন হিন্দুকে হিন্দু রেখেছে, এর বিপর্য্যয়েও হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করতে পারে নাই।

এটা একটা হঠাৎ মনে আসে বটে যে, ইয়ুরোপীয়রা এই জাতিভেদ না রেখে যখন এত দূর উন্নত হ'য়েছে, এবং তাদের মধ্যে একটা জাতি (ইংরাজ) তাবত জয় করে' নির্ব্বিরোধে শাসন করছে, তবে বুঝি

তা'দের মত জাতিভেদের না থাক্‌লেই তাদের পক্ষে উন্নতি লাভ-কর্‌তে পারে। এ যুক্তি সব ইংরাজি-প্রথা সম্বন্ধেই খাটে। কে বল্‌বে যে, এ উন্নতি তা'দের জাতিভেদ না থাকারই ফল, তা'দের অন্য-কোনও প্রথার ফল নয়। কিংবা কে বল্‌বে যে, ইহা ইংরাজের কোনও সামাজিক প্রথার ফল, এবং এ উন্নতি ও এ সব প্রথা ইংরাজদের জাতিগত energyর ফল নয়। এখন কি তবে ভারতবাসীর এই কর্ত্তব্য যে, তা'দের সব প্রথা উল্টে দিয়ে ইংরাজদের সব প্রথাই নিজে হ'বে?

এক জাতির পক্ষে যা হিতকর, আর এক জাতির পক্ষে তা হিতকর নাও হ'তে পারে। বিশেষতঃ ইংরাজ ও হিন্দুর national characteristics এত বিভিন্ন যে, অনেক সময়ে সম্ভব যে, এক রকম প্রথা দু' জাতির পক্ষে হিতকর নয়। ইংরাজ-কবি-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না। তবে ইংরাজ সমাজিক প্রথাই হিন্দুসমাজের পক্ষে খাট্‌বে, তার প্রমাণ কি? এ প্রথা-বর্জ্জন করে' বিজাতীয় প্রথা অবলম্বন করা কি একটা প্রকাণ্ড পরীক্ষা নয়? লব্ধ ত যা ছিল, তাও হারাব; যা নাই, তাও পা'ব না। একটা জাতি নিয়ে experiment করা কি ভয়ঙ্কর!

তবে জাতিভেদ এখন যে ভাবে বর্ত্তমান আছে, সে ভাবে সে কখনই থাকতে পারে না। আর সেটা ক্রমে ক্রমে যাচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ধীরে ধীরে জাতিভেদকে সদ্‌তত্ত্ব ভিত্তির উপর দাঁড়া করা। একেবারে এমন একটা জাজ্বল্যমান জীবন্ত জিনিষকে উল্টিয়ে দেওয়া ভাল নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত reformation not revolution. আর ৪০০০ বৎসর ধরে' যে প্রথা চলে আস্‌ছে, যা'কে হিন্দুকে হিন্দু বলে' গৌরব কর্‌তে দিচ্ছে, যা'তে ভারতকে ব্যাস, বাল্মীকি, কপিল দিয়াছে, তা'কে বিনাশ করা revolutionও নয়, এ vandalism.

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

শাক্যবংশ ও কপিলবস্তু।

—:০:—

'মহাবস্তু-অবদান' নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়,—পুরাকালে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ মান্ধাতার বংশ-ধুরন্ধর মহারাজ সুজাত বা সঞ্জাত সাকেত-রাজধানী অযোধ্যা নগরে রাজদণ্ড পরিচালিত করেন। তাঁহার ওগুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তীশীর্ষ নামে পাঁচ পুত্র ও উল্কা, বিমলা, বিরীতা, জলা ও জলী নামে পাঁচটি কন্যা জন্মে। এতদ্ব্যতীত জেন্ত নামে তাঁহার এক অবৈধ পুত্র ছিল। কোনও সময়ে রাজা জেন্তের মাতার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অভিলাষানুরূপ বর দিতে চাহিলে, সেই বারবিলাসিনী-দুহিতা এক চতুরা ভিক্ষুকীর পরামর্শে রাজ-সমীপে নিবেদন করে, "মহারাজ! দাসীর প্রতি যদি যথার্থই সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার পুত্র-পঞ্চককে নির্ব্বাসিত করিয়া জেন্তকে আপনার রাজ্যাধিকারী করুন।" সত্যসন্ধ রাজা জেন্তীর প্রার্থনা-শ্রবণে মর্ম্মবেদনায় বিবশ হইয়া পড়িলেন; অপার পুত্রস্নেহে হৃদয় স্ফুটিত হইবার উপক্রম হইলেও প্রতিশ্রুতি-প্রত্যাহারের কোনও উপায়ই দেখিতে না পাইয়া মূঢ়তা-প্রণোদিত বরদান-সংকল্পকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে প্রজাবৃন্দ রাজকুমারগণের বিবাসন ও দাসী-পুত্রের সম্বর্দ্ধনবার্ত্তা শ্রবণে, কুমারবৃন্দের আভিজাত্যোচিত গুণগ্রাম ও উদারাশয়তায় মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহাদিগের অনুগমনে উদ্যুক্ত হইল। এই সমাচার রাজার গোচরীভূত হইলে, তিনি কথঞ্চিৎ চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিয়া, তাহাদিগের অভিলাষানুযায়ী অশ্ব, যান, বসন, ধন, রত্ন রাজকোষ হইতে উপঢৌকন দিয়া গুণ-পক্ষপাতিতাবশতঃ তাহাদিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিলেন। সন্নিহিত কাশী-কোশল রাজ্যের রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তদীয় রাজ্যে বাস করাইবার জন্য নির্ব্বাসিত কুমারগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে, কাশী-কোশলের অধিবাসিগণও তাঁহাদিগের গুণে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল দেখিয়া, রাজা অবশেষে স্বীয় প্রভুত্বনাশভয়ে প্রমাদ গণিলেন;

এবং পরিশেষে একান্ত অসহায়াবস্থায় হইয়া তাঁহাদিগকে সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এখান হইতেও অনেকে কুমারগণের অনুকরণ করে।—এইরূপে এই অনুচর প্রতিব্যাহারে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে, সর্ব্বশেষে হিমালয়-সন্নিহিত-গৌতম গোত্রীয় কপিল নামক পরব্রহ্মজ্ঞানী ও উগ্রতপা ঋষি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত রমণীয় আশ্রমের প্রান্তভাগে শাকবন বা শাক্য-বনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই বনপ্রদেশ ক্ষুদ্র উপনিবেশে পরিণত হওয়ায়, বংশবৃদ্ধিপ্রযুক্ত পুনরায় অযোধ্যাবাসীদিগের সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কুমারগণের বিবাহোচিত কাল উপস্থিত হওয়ায়, জাতিনাশভয়ে তাহারা ভিন্নদেশীয়গণের সহিত বিবাহ-বন্ধনে সংশ্লিষ্ট না হইয়া, সহোদর অনুজ-অগ্রজেই বিবাহের আদান প্রদান করিতে লাগিলেন;—অমাত্যগণ পরম্পরায় এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, সংকৃত-রাজসমীপে বিজ্ঞাপিত করিলে, মহারাজ স্বজাত জনগণের অসহনীয় বংশ-নিকৃষ্টত্ব-ধর্ম্মনাশভয়ে একান্ত বিমনা হইয়া পুরোহিত-প্রমুখ পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের মত জিজ্ঞাসু হইলেন,—এরূপ অবস্থায় এরূপ আচরণ 'শক্য' (অর্থাৎ করা যাইতে পারে,) তাঁহাদিগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তবাক্য অভিহিত হইলে, এইরূপ আচরণপরায়ণ কুমার ও তদ্বংশীয়গণ 'শক্য' বা 'শাকিয়' এই প্রাকৃত ও 'শাক্য' এই সংস্কৃত অভিধানে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

নির্ব্বাসিত কুমারগণের উপনিবেশটি ক্ষুদ্র জনপদাকারে পরিণত হইলে ব্রাহ্মণ বনপাতে পরিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার্থে রাজধানীরূপে একটি নগর-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায়, কুমারগণ তাপসপ্রবর কপিল সন্নিধানে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে মুনিবর উত্তর করিলেন, "যদি তোমরা আমার আশ্রম-সীমায় রাজধানী স্থাপন কর, তাহা হইলে আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহাতে অনুমতি দান করি।" কুমারগণ উদারহৃদয় ঋষির অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া তথাস্তু তাহাতে সম্মত হইলেন। সত্বানিষ্ঠ মুনিবর কমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণপূর্ব্বক, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তদীয় তপোবন রাজনগর-নির্ম্মাণার্থ কুমারগণকে সম্প্রদান করিলেন। প্রকাণ্ড শাল বা শাল বৃক্ষসমূহ ছেদন করিয়া, অচিরকালমধ্যে মহাসমৃদ্ধ রাজধানী নির্ম্মিত হইল। তদবধি কপিলের প্রসাদেই তাঁহাদিগের বাসার্থ এই সুশোভন নগর সংস্থাপিত হইল বলিয়া, মুনির প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয়স্বরূপ শাক্যরাজধানী 'কপিলবস্তু' এই নাম

আখ্যায় ভূষিত হইল। * অতঃপর জনসমূহ নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া শাক্যগণের ব্যবহার-মাধুর্য্য ও স্থানের মনোহারিত্বে আকৃষ্ট হইয়া, বসতি-স্থাপনপূর্ব্বক বহুজনাকীর্ণ নগরটিকে সম্পদের বাসভূমি, সুখের নিলয়, উৎসবের লীলাকেন্দ্র, বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র, সুতরাং বণিক্‌গণের প্রিয় নিকেতন করিয়া তুলিল। কালে কপিলবস্তুর শাসনপ্রণালী কতকটা প্রজাতন্ত্রমূলক হইয়া উঠিল। নৃপতি-নির্ব্বাচনের ভার অধিকপরিমাণে প্রজার উপর ন্যস্ত ছিল। রাষ্ট্রীয় বিষয় সকল সভাগৃহে সাধারণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়া নির্ব্বাহিত হইত। এই সভাগৃহ-সমূহ প্রাচীর-পরিশূন্য ও উপরে আবরণ-বিশিষ্ট থাকিত। † পশুপালন ও কৃষিই শাক্যগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল; সুতরাং ক্ষত্রোচিত কঠোরতা হইতে সে সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বিশিষ্টভাবে অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। পশুগণ গ্রামোপান্তস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বনভাবনের অংশবিশেষে বিচরণ করিত। এই চারণ ভূমির উপর সকলের সমান অধিকার ছিল, এবং গ্রামগুলি বহুসংখ্যক ধান্য-ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ওপুর-ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের প্রথম অধিপতিরূপে বৃত হন। তদনন্তর নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তীশীর্ষ প্রভৃতি কতিপয় রাজার পর, সিংহহনু কপিলবস্তুর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁহার শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, অমৃতোদন ও ধৌতোদন নামে চারি পুত্র ও অমৃতা (বা অমিতা) নাম্নী এক কন্যা জন্মে। শুদ্ধোদন রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া কোলীয়-বংশীয়া মায়াদেবী ও প্রজাবতী নাম্নী দুই ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই শুদ্ধোদনের ঔরসে, মায়াদেবীর গর্ভে

---

* শালবৃক্ষ ছেদনপূর্ব্বক বসতি স্থাপন করা হয় বলিয়াও কেহ কেহ এই বংশের শাক্য নামের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। গোরকপুরের সন্নিকটবর্ত্তী কোহানা নদী-তীরবর্ত্তী আধুনিক 'নগরগাঁস' নামক স্থানে প্রাচীন কপিলবস্তু নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল, —পুরাতত্ত্ব-বিভাগবিশারদগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

† বুদ্ধের সময়ে কপিলবস্তু নগরে এক সভাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথায় বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মৌদ্গল্যায়ন ধারাবাহিকরূপে অনেক রাত্রি নীতি উপদেশ দানে সভার প্রাথমিক পবিত্রতা বিধান করেন। এই ভাতীয় সভা কেবল কপিলবস্তুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বুদ্ধনির্ব্বাণের সংবাদ দিবার জন্য তদীয় খুল্লতাত-পুত্র ও প্রিয় শিষ্য আনন্দ মল্লদেশে উপস্থিত হইলে, এইরূপ রাজসভাতেই তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা মীমাংসিত হইয়াছিল। এমন কি, পরিনির্ব্বাণের বিবাহপ্রস্তাব ও অপরাহ্ণ কার্য্যসভার এইরূপ এই সভাগৃহেই উত্থাপিত হয়। বস্তুতঃ এই সভাগৃহ শুদ্ধোদনের পর তদ্বংশ বা তদ্বংশ কপিলবস্তুর রাজা নির্দ্দিষ্ট হন।

ভগবান বুদ্ধ শাক্যমুনি সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, শাক্যকুলকে জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। গোপা বা যশোধারার গর্ভে সিদ্ধার্থের সংসারত্যাগের পূর্ব্বে রাহুল বা রাহুল নামে একটি পুত্র জন্মে। ৫ কিন্তু ইহাদিগের ও বুদ্ধের খুল্লতাত পুত্রগণের সংসার-বিরক্তিতে শাক্যবংশ অচিরেই লোপপ্রাপ্ত হইল। কপিলবস্তু নগরীও কালবশে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া এখন কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া ধ্বংস-

সমূহ দুর্ভেদ্য অরণ্য প্রদেশে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিক, নির্ব্বাণোন্মুখ জগতের একটি ক্ষুদ্র উপদিষ্ট প্রদেশের একটি ক্ষুদ্রাংশের ধর্ম্মরক্ষা অনুষ্ঠের নিয়ন্তা ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনকারী ভগবান্ বুদ্ধদেবের লীলাভূমিরূপে পরিণত হইবে। আর বঙ্গ তারত! তোমারি বক্ষে যে মহৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কপিলবস্তু নগরের বিজন প্রদেশে উৎপত্তি, তাহা সিদ্ধ করিবার অব্যবহিত পরেই শাক্যসিংহ তোমার সেই নিভৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে যোগসমাধি লাভ করিয়াছে। ধন্য তুমি! তোমারই সন্তান অহিংসা-ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক, এবং বুদ্ধগুরুরও আদি উপদেষ্টা। তাহার জননী এত রত্ন প্রসব করিয়াছ, তবুও আমরা তোমাকে জানি না, মানিতে চাহি না; তোমাকে মায়ের মত ভালবাসি না! শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

রাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল। (ইতিহাস)

পালবংশীয় রাজগণের প্রদত্ত কতকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায়, এই বংশের অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। বুদ্ধদেবের পদ-নলকে নমস্কার করিয়া এই তাম্রশাসনের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের শ্লোক এই :—

ধর্ম্ম-ধীর-ক্ষমা-বীর্য্য-ধ্যান-প্রজ্ঞা-বলানি চ।
উপায়ঃ প্রণিধিস্তৎসিদ্ধিশ্চেতি বুদ্ধবলানি বৈ॥

তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক এই :—

সর্ব্বজ্ঞতাং শ্রিয়মিব স্থিরমাত্মনশ্চ
সম্ভাবনস্য বহুমানফলোপলব্ধ্যৈ।
দেব্যাঃ মহাকরণয়া পরিপালিতানি
প্রজ্ঞস্য যে পদনখানি নিশো জয়ন্তি॥

দ্বিতীয় শ্লোকে জানিতে পারি, শ্রীমতি-বিষ্ণু ঐ বংশের প্রবর্ত্তক। উঁহার পূর্ব্বে বা পরবর্ত্তী কোনও উপাধি দৃষ্ট হয় না। তাঁহাকে 'সর্ব্ববিদ্যাবদাত' বিশেষণে বিশেষিত দেখিতে পাই। দ্বিতীয় শ্লোক এই :—

শ্রিয় ইব মুক্তপাশাঃ নরবো বারিরাশিঃ
সাধব ইব ভদ্রশীলা বিমলাম্বরবন্ত্যাদ্যঃ।
প্রকৃতিভিরনিপায়ং সন্ততে কৃতযত্নাঃ
অজনি শ্রীমতি-বিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ॥

ক্ষত্রিয়-বিন্দু হইতে বপ্যট জন্মগ্রহণ করেন। বপ্যটের কীর্ত্তিমালা গিরির পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহারও রাজা বা মহারাজ বিশেষণ দেখিতে পাই না। তিনি রাজাই ছিলেন; নতুবা তাঁহাকে অভিষেচন করিতে হইবে কেন? রাজ্যস্থাপন-কালে বিরোধিগণের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। তৃতীয় শ্লোক এই;—

আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং ঊর্ব্বীভিঃ স্তুতিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ গণ্ডিতারাতিঃ সাধ্বাঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ॥

বপ্যটের পুত্রের নাম গোপাল দেব। গোপাল দেবকেই পাল-বংশের প্রথম রাজা বলা যাইতে পারে। পরিব্রাজক তারানাথের মতে, গোপাল দেব বঙ্গ ও মগধ জয় করেন। ইহাতে বোধ হয়, মগধ পালবংশের আদি বাসস্থান নহে। গোপাল দেবের পূর্ব্বে গৌড় সাম্রাজ্য কতকগুলি খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খৃষ্ট-বংশের রাজত্বের শেষভাগে দেশের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। রাজগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া প্রজাদের দুর্দ্দশার একশেষ ঘটাইতেন। গোপাল দেব তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া অত্যাচার নিবারণ করেন। এক রাজার অধীন হওয়ায় প্রজাগণের লক্ষ্মী-শ্রী বর্দ্ধিত হয়। চতুর্থ শ্লোক এই;—

সংস্তম্ভ্যায়মগোপিভূৎ প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করো গ্রাহিতঃ।
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ॥
ক্যাধুক্রিয়তে সনালনবপোরাপীর্দ্দামাসয়ে
যেভিয়া যদি পৌর্ণমাসী-রজনী জ্যোৎস্নাভিরাবর্ত্তিতা॥

গোপাল দেবের ভূপাল ও লোকপাল, এই দুইটি নাম দেখিতে পাই। আইন-আকবরিতে প্রথম ও দিনাজপুরের আমগাছির তাম্রশাসনে দ্বিতীয় নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। নালন্দায় গোপাল দেবের যে শাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, গোপাল দেব মগধ জয় করেন।

গোপাল দেবের মহিষীর নাম শ্রীদেদ্দ দেবী। দেদ্দ দেবী রাজার প্রণয়-পাত্রী ছিলেন। দেদ্দ দেবীর গর্ভে ধর্ম্মপালের জন্ম হয়। ধর্ম্মপাল অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার রণ-সেনার পরাক্রম সমুদ্র-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে আছে,—"ধর্ম্মপাল যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন, তখন সৈন্যগণের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইত। শেষদেব অতি কষ্টে পৃথিবী ধারণ করিতেন। বিন্ধ্যাচল পৃথু রায় মলয়কে একত্র দেখিয়া

ভক্ত ধর্ম্মপালের নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল সসৈন্যে যাত্রা করিলে, মহেন্দ্রের মনে হইত, মাদ্রাজই যাইতেছেন। গোপেরা গোষ্ঠে, সমরদেবেরা বলেন, শুকেরা পঞ্জরোদরে ধর্ম্মপালের মহিমা কীর্ত্তন করিত। তাহা শুনিয়া ব্রীড়ায় ধর্ম্মদেবের মুখ অবনত হইত,—ইত্যাদি।

ধর্ম্মপাল প্রায় সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন। ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, অবন্তি, যবন, গান্ধার, কীর অর্থাৎ কাশ্মীর পর্য্যন্ত তাঁহার পরাক্রম বিস্তৃত হইয়াছিল। কান্যকুব্জের বদ্ধগণ স্বর্ণময় উদকুম্ভে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। যথা ;—

ভোজৈর্মৎস্যৈঃ সমদৈঃ কুরুযদুযবনানর্ত্তগান্ধারকীরৈ-
র্ভূপৈর্নালোক্যমৌলিপ্রণতিপরিণতঃ সাধু সম্ভাব্যমানঃ।
হ্রদাৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জৈঃ সবলমভিচলিতো ভ্রাময়ন্ বিশ্ব যেন॥

ধর্ম্মপালের সময় আমরাজ কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। আমরাজের অপর নাম চক্রায়ুধ। আমরাজের সহিত ধর্ম্মপালের দীর্ঘকালের শত্রুতা ছিল। পরে উভয়ের বন্ধুত্ব হয়। আমরাজ আপনার দুর্দ্দান্ত পুত্র ইন্দ্ররাজ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন। ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজকে পরাজিত করিয়া আমরাজকে পুনরায় কনোজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে কনোজের বৃদ্ধগণ সন্তোষ লাভ করেন। তাম্রশাসনে লিখিত আছে ;—

যিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীন্সুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনাথ পিত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥

চক্রায়ুধ ধর্ম্মপালের নিকট আনতিবামন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ অবনত হইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জের অপর নাম মহোদয়। পাটলীপুত্র-নিবাসী প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত ভূরপাল আমরাজের সভা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূরপালের অপর নাম বপ্পভট্ট। বপ্পভট্ট সূরির সরস্বতী-স্তোত্রপাঠে জানা যায়, তিনি বীরনির্ব্বাণের তের শত বৎসর পরে এই সরস্বতী-স্তোত্র রচনা করেন। ৮৯৫ সংবতে বপ্পভট্টের মৃত্যু হয়। বন্ধু-কুঞ্জর নামক এক জন বৌদ্ধ-পণ্ডিত ধর্ম্মপালের সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রাকৃত ভাষায় রচিত "গৌড়বহ" নামক কাব্যের প্রণেতা কবিবর বাক্‌পতি, প্রথমতঃ যশোধর্ম্মদেবের সভায়, পরে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্যের সভায় কিয়ৎকাল থাকিয়া, শেষ বয়সে ধর্ম্মপালের সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল গঙ্গার বাম তীরে একটি পর্ব্বতের উপর বিক্রমশিলা নামক একটি বিহার স্থাপন করেন। এই বিহারের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর ভূমি দান করেন। বিক্রমশিলার অপর নাম দেববিহার। বর্ত্তমান শিলাও গ্রামে বিক্রমশিলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিহারের নিকট এক শত সাতটি প্রাকারবেষ্টিত দেবমন্দির ছিল। রাজা এখানে ছয়টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানার্থ এক শত আট জন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে এই বিদ্যালয়গুলি ছয়টি দ্বার-পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে অর্পিত হয়। জেতারি মুনি বিক্রমশিলায় একটি সত্র স্থাপন করেন। সেখানে ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে আহার পাইত। জেতারি বরেন্দ্রভূমির সনাতন নামক রাজার পুত্র। ইনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। মালদহের নিকটে একটি স্থানে সনাতনের বাটী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এ দেশের লোক রূপ-সনাতন ছাড়া অন্য সনাতনকে চেনে না; সেই জন্য সনাতনের রাজধানীকে গৌড়মন্ত্রী সনাতনের বাসস্থান বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। বিক্রমশিলার সঙ্ঘারামের ভিতর এইরূপ চারিটি সত্র (Boarding or Hostel) ছিল। প্রায় চারি শত বৎসর বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয় রাজশক্তির সাহায্যে সুন্দররূপে চলিয়াছিল। প্রধান পুরোহিত লইয়া ছয় জন দ্বার-পণ্ডিত যে মীমাংসা করিতেন, সঙ্ঘারামের শাসনকর্ত্তাকে তাহা মানিয়া চলিতে হইত। শাসনকর্ত্তা বিদ্যার্থিগণের নৈতিক উন্নতির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জিনরক্ষিত, বিক্রমশিলা-বিহারে রাজগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ধর্ম্মপাল হিমালয় প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হয়েন। ইনি রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের (প্রবলের) কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের পরমসৌগত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধি-রাজ বিশেষণ দেখিতে পাই। ধর্ম্মপাল গৌড় অধিকার করিয়া 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন। গৌড়েশ্বর, বিশেষতঃ পঞ্চগৌড়েশ্বর, তৎকালে সম্মানজনক উপাধি ছিল। পঞ্চগৌড়েশ্বর বলিলে আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাটকে বুঝাইত। পালরাজগণ যখন সাম্রাজ্যকে পূর্ণ অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মৌর্য্য, অন্ধ্র ও গুপ্ত সম্রাটগণের ন্যায় তাহারা পরাক্রমশালী হইতে পারেন নাই।

ধর্ম্মপাল পরমসৌগত হইলেও পরধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন না। মহাসামন্তাধি-

পতি নারায়ণবর্ম্মা নারায়ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ-সেবার ব্যয়-নির্ব্বাহের সাহায্যার্থ, যুবরাজ ত্রিভুবন পালের দ্বারা ধর্ম্মপালের নিকট প্রার্থনা করেন। ধর্ম্মপাল নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশে ভূমি দান করেন। সেই ভূমি-দানের বিবরণ আমাদের অবলম্বিত তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ভূমি-দানের সময় রাজা পাটলীপুত্র জয়স্কন্ধাবারে ছিলেন। সেখানে তাঁহার সেবার জন্য সমুদ্রীর হইতে রাজগণ সমাগত হইয়াছিলেন। গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। উত্তরদেশীয় সামন্তগণ মহারাজকে অনেক অশ্ব উপঢৌকন দিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা জম্বুদ্বীপ বলে কি বুঝিতেন, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ এই শব্দ দ্বারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর ভারতবর্ষ বুঝাইত। রাজা কোনও প্রয়োজনবশতঃ পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিংবা পাটলীপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ পাটলীপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। অশোকের সময়ের পাটলীপুত্র শোণের ভাঙ্গনে নষ্ট হইয়াছিল। উহার নিকটে এই সময়ে যে নব পাটলীপুত্র স্থাপিত হয়, ইহা সেই পাটলীপুত্র। ধর্ম্মপাল বর্দ্ধনভুক্তির সন্নিহিত মাইল উত্তরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কান্যকুব্জের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য, অথবা তাহাকে ভয়প্রদর্শনার্থ এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

এই সময়ে গৌড়রাজ্য কতিপয় ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। এ পর্য্যন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি, তীর ভুক্তি ও শ্রীনগর ভুক্তি,—এই তিনটি ভুক্তির নাম পাওয়া গিয়াছে। পাটলী প্রদেশ শ্রীনগর ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। হিন্দুদের রাজত্বকালে উড়িষ্যায় এইরূপ ভুক্তিকে দণ্ডপথ বলিত। ভুক্তিগুলি কতিপয় 'মণ্ডলে' ও মণ্ডলগুলি কতিপয় 'বিষয়ে' বিভক্ত ছিল। মুসলমানদিগের আমলে ভুক্তিগুলির সরকার, মণ্ডলগুলির পরগণা ও বিষয়গুলির মৌজা নাম হয়। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি 'বিষয়' হইত। ধর্ম্মপাল নারায়ণ দেবের সেবার উদ্দেশে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী ক্রৌঞ্চশত্র, গোপিপল্লী, মাঠাশাম্রলী ও পলিতক গ্রাম প্রদান করেন। এ সমুদায় স্থান কোথায় ছিল, এখন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বোধ হয়, এই সকল গ্রাম গৌড়ের নিকটবর্ত্তী ছিল; কারণ, গৌড়ের নিকটে এই তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাম্রশাসনে ধ্রুব, গঙ্গনিকা, যবনিকা, মানক, সীমাকোটী, অর্দ্ধস্রোতিকা, দীপিকা, খাটিকা, জোলক, গোমার্গ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

ক্ষুদ্র শব্দের ওড্রিয় অর্থ,—পর্ণ ; রাপিকা শব্দের অর্থ,—কুদ্র দীপ বা নদীক তীর ; আটিকা শব্দের অর্থ,—খাড়ী ; জোলক শব্দের অর্থ,—জোল। মালবদ্ধ দেশীয় নদীর বিস্তর অপিবর্ত্তন হইয়াছে। গঙ্গা হইতে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত এই বেলার সমুদায় পশ্চিমাংশে প্রবাহিত হইত। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতকে পূর্ব্বে গঙ্গনিকা বলিত। ধানিক, যানক ও অর্দ্ধস্রোতিকা শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না। জৈনস্থারিকা,—পবস্তর্শকৃৎ ও দেবযুলিকা সম্বন্ধেও কিছু বলা যায় না। প্রকৃতি চারিটি গ্রামের চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্থাণীকট বিষয়, আম্রমণ্ডিকা মণ্ডল ও উড্র মণ্ডল প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ও মণ্ডলের নাম পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু-রাজত্বকালে মণ্ডলগুলি খুব বড় ছিল। তৎকালে দশখানি গ্রাম লইয়া একটি বিভাগ হইত। দশ গ্রামের রাজস্ব-আদায়কারীকে দশ-গ্রামিক বলিত। কয়েকটি দশ-গ্রাম লইয়া একটি বিষয় হইত। রাজস্ব-আদায়ের সুবিধায় প্রতি বিষয় রাখিয়া এই সমুদায় বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিম্নলিখিত পদস্থ লোকদিগকে জানাইয়া ও তাঁহাদের সম্মতি লইয়া ভূমি দান করা হইয়াছিল।—

১। রাজা	৮। দণ্ডশক্তিক	১৫। নাকাধ্যক্ষ	২২। মহাসত্তর	
২। রাজনক	৯। দণ্ডপাশিক	১৬। বলাধ্যক্ষ	২৩। দশগ্রামাদি-	
৩। রাজপুত্র	১০। চৌরোদ্ধরণিক	১৭। তরিক	বিষয়-ব্যবহারিক	
৪। রাজামাত্য	১১। দোঃসাধিক	১৮। শৌল্কিক	২৪। জ্যেষ্ঠকায়স্থ	
৫। বিষয়পতি	১২। দূত	১৯। তদাযুক্তক	২৫। গৌল্মিক	
৬। মহাধিকৃত	১৩। গমাগমিক	২০। বিনিযুক্তক	২৬। গৌল্মিক	
৭। সেনাপতি	১৪। অভিত্বরমাণ	২১। ভোগপতি	২৭। মহাসামন্তাধিপতি	

উল্লিখিত পদ-সমূহের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও রাজভক্তির প্রতি তাহাদের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। সমুদায় পদের অধিকার স্পষ্ট বুঝা যায় না। রাজপুত্র ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, সুতরাং সমুদায় বিষয় তাঁহাকে জানান হইত, এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহার সম্মতি লওয়া হইত। রাজাগণের নিম্ন রাজনকের সম্মান ছিল। বোধ হয়, এখনকার জমীদারশ্রেণীর ন্যায় ক্ষমতাপন্ন তালুকদারদিগকে রাজনক বলা হইত। দণ্ডশক্তিক দণ্ড প্রদান করিতেন। দণ্ডপাশিক দণ্ডদানের অস্ত্রগুলির অর্থাৎ খুপ, খড়্গ প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক সংস্কৃত অভিধানের মতে, দোঃসাধিক শব্দের অর্থ,—দ্বারপাল। গমাগমিক ও অভিত্বরমাণ কিংবা সমাগমিকাত্বরমাণ

অশ্বারোহী বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ভৌরিক নৌ-সেনাবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। নাকাধ্যক্ষ ও গৌমাগুপ্তোত্তরমার্গ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থাপিত সেনাদলের অধ্যক্ষ ছিলেন. অদ্যাপি মালদহ জেলায় 'নাকা' শব্দটি প্রচলিত আছে। বিনিযুক্তক, কাচোরিদায়োগের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব রাখিবার জন্য যে কার্য্যালয় ছিল, বিষয়পতি তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। বিষয়-ব্যাপিসে জমীর পরিমাণ ও খাজনার হিসাব থাকিত। চিন্তাংজন্তজনে বিষয়ী বা বিষয়পতি রাজার নিকট খাদ্যদ্রব্য ও খাজনা আদায়ের জন্য দায়ী ছিলেন। নিম্নবর্ত্তী ভোগ রাজ্য যে সেইরূপ বন্দোবস্ত ছিল, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিষয়ীকে দেশমুখ বলিত। মুসলমান-আমলে বিষয়পতিদের বোধ হয় চৌধুরী নাম হইয়াছিল। মহাধিকৃত রাজস্ব-সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি মুসলমান-আমলের মজুমদার। উড়িষ্যার সামন্তেরা স্বয়ং রাজার সেনাপতিত্ব করিতেন। গৌড় রাজ্যেও সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। মহাসামন্তাদিপতি সামন্তদের রাজা ও সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কায়স্থেরা তৎকালে সোপস্তম্ভ কার্য্য করিত। জ্যেষ্ঠকায়স্থ লিখি-আফিসে থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর তত্ত্বাবধান করিতেন। দশগ্রামিক দশগ্রামের রাজস্ব-সংগ্রাহক ছিলেন।

যে রাজত্ব এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল, তাহার কার্য্য যে সুশৃঙ্খলরূপে চলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপালের মহাসামন্তের নাম—নারায়ণবর্ম্মা। তিনি ভ্রাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাম্রশাসনে রাজপুত্র দেবট-ভুক্ত জানীয় উল্লেখ আছে; এই দেবট কে, তাহা জানিতে পারি নাই। এই তাম্রশাসনখানি ধর্ম্মপালের রাজত্বের দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষে প্রদত্ত হয়। ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া হয় নাই। ভগবান্ নারায়ণ দেবের সেবা-নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হয়। ব্যাটগ্রাহী দ্বিজগণ বিগ্রহের সেবা করিতেন।

ধর্ম্মপালের সময় গাউসেনের অভ্যুদয় হয়। গাউসেন ময়নাগড়ের রাজা ও ধর্ম্মপালের সেনাপতি ছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল-মতে ৭০৩ খৃষ্টাব্দে গাউসেনের আবির্ভাব হয়। ময়নাগড় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। অধুনা নদের তীরে ঢেকুর বা জিয়ড়ীতে নূতন স্থানে ইহাই ঘোষ নামক এক ব্যক্তি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন; পালসেন বহু-যুদ্ধের পর তাঁহাকে নিহত করেন। বহরাল হইতে পশ্চিম রাঢ়ে যে প্রাচীন একটি রাজ্য

ছিল। উহারা সদ্গোপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উগ্র ও উগ্রক্ষত্রিয় জাতিদেরও একটি রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্য পাল-বংশীয়দের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কামরূপের রাজা কর্ণপুরধবল বা কর্ণসুবর্ণের রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মপালের মন্ত্রী কয়েকবার পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আইসেন।

ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞী ওঝাকে ভূমি দান করেন। প্রদত্ত গ্রামের নাম ধামসার। এই আদিগাঞী ওঝা ও রাঢ়ীয়শ্রেণীদিগের আদি বল্লালবল্য, উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। লাহেড়ী-বংশাবলীতে আছে,—

শ্রীধর্ম্মপালঃ সুতসুরবুনীতীরদেশে বিবাহং
নামাদিগাঞীবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকলকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥

এই শ্লোকান্তর্গত বিষয় যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, আদিশূর ধর্ম্মপালের পূর্ব্বেই রাজত্ব করেন।

শ্রীব্রজসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

দীক্ষা।

—:০:—

১

"দাদা! এ ফটোগ্রাফ্‌খানা তোমার পছন্দ হয়?"

প্রোফেসর কিরণচন্দ্র বহু হঠাৎ গভীর অধ্যয়নে বাধা পাইয়া শুষ্ক রুক্ষ কেশগুচ্ছ-যুক্ত মস্তকের দিকে কিঞ্চিৎ অপহৃত করিয়া দিলেন; কিরণচন্দ্রের অনুপম সুন্দর মুখখানি ক্ষীণ দেখিয়া স্নেহময়ী ভগ্নী হৃদয়ে ব্যথা পাইল।

"দাদা! তুমি রাত্রি জাগিয়া অত পড়িও না।"

কিরণ। কেন বল ত?

কুমুদিনী। তোমার চ'খের কোণে কালিমা পড়িয়াছে।

কিরণ। আর কিছু?

কুমুদিনী। কয় বৎসরে চুল পাকিতেছে!

কিরণ। কাহার কিসে?

কুমুদিনী। তুমি খাইতে পাও না। না খাইলে কয় দিন বাঁচিবে?

কিরণচন্দ্র কিছু সংকুচিতভাবে হাসিলেন; এবং ভগিনীর স্নেহের প্রতিদানে তাঁহার দিকে একটু বিষণ্ণ ভাবে চাহিলেন।

"কুমু! বয়সের কালিমা, দুর্ভাবেশ ও অনাহারের সহিত মানব-জীবনের উদ্বেগের কোনও সম্বন্ধ নাই। তুমি একখানা ফটোগ্রাফের কথা কি বলিতেছিলে?"

কুমুদিনী। ওঃ! সেটা ভুলিয়া গিয়াছি। এই দেখ।

কিরণচন্দ্র ফটোগ্রাফখানি হাতে লইয়া চিত্রকরের ন্যায় নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন।

"এটা কি মেম সাহেব?"

কুমুদিনী হাসিয়া খুন! "ও মা! সে কি? ও যে আমার সই ইন্দুমতী, খুব সুন্দরী; কেমন, না?"

কিরণ। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরীর চক্ষু বিড়ালের ন্যায় কটা, এবং মাথার চুল পাকা বিলাতী কুমড়ার ন্যায় লাল।

কুমুদিনীর মুখ শুকাইয়া গেল।

"দাদা! ওটা ফটোগ্রাফের দোষ বোধ হয়। উহার ন্যায় সুন্দরী বোধ হয় কেহই ছিল না। কিংবা বোধ হয়, বিলাতে গিয়া রং কালা হইয়া আসিতে পারে।"

কিরণ। তোমার সখী বুঝি ব্যারিষ্টার ঘোষের কন্যা?

কুমুদিনী। তা কি তুমি জান না?

কিরণ। জানিয়াছিলাম বটে; কিন্তু ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। আমরা দরিদ্র জনেক্ষ-ব্যাপক, ইতিহাসের কলিজার কোনও কিনারা-পরে-পক্ষে কিছু লিখি থাকে না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তোমার সখীর রুচি অতি জঘন্য।

কুমুদিনী। কেন কহি?

কিরণ। ঐ বিলাতী পাটনের গাউনটা সমুদ্রের বক্ষে নিক্ষেপ করিয়া ভাসিয়ে আসা হইত। ভারত-আকাশে আর পরী উড়িবার স্থান নাই।

কুমুদিনী। কেন?

কিরণ। সবই রক্তিম। সাধারণ পুরুষমন।

কুমুদিনী। তুমি ইন্দুকে দেখিয়ে কখনই নিন্দা করিতে না। জানি না,—কেন তাহার সজ্জা; কিন্তু ইন্দুর মন যে কত উচ্চ, তাহা তুমি জান না।

কিরণ। দেখ কুমু! পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, অনেকের মন চিলের ন্যায় উচ্চ দিকে উঠে, কিন্তু নজরটা থাকে ভাগাড়ের দিকে।

কুমুদিনী ঈষৎ রাগিয়া বলিল, "যদি গাউন এত নিন্দনীয় হয়, তবে শাস্ত্রের কথা 'ঠকে' জানাইও।"

'ঠকে' অর্থাৎ কুমুদিনীর স্বামী ব্যারিষ্টার অটলবিহারী দত্তকে। কিরণচন্দ্রের সামান্য পিতৃদত্ত বিষয়টুকু সম্বল রক্ষা করিয়া অটলচন্দ্র সোপার্জ্জন যে-পথে কিরণকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কলেজের প্রোফেসারি পদ প্রাপ্ত হইয়াও কিরণ অটলচন্দ্রকে ছাড়িতে পারেন নাই।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, কিরণচন্দ্রের মনটাকে সংসারের দিকে কোনও প্রকারে টানিয়া আনিতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হয়; এবং ইন্দুমতীকে দেখিলে কিরণচন্দ্র যে সেই সনাতন পথে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না।

কুমুদিনীর রাগ দেখিয়া কিরণচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

"কুমু! তুমি রাগ করিও না। সংসারটার মধ্যে অনেক গভীর কথা আছে। রূপ, যৌবন, বাহ্যসজ্জা, উচ্চহাস্য, সকলই ফলিক। আমাদিগের একটি মহৎ কর্ত্তব্যপালনের দিন আসিয়া পড়িয়াছে। এ সময়ে হৃদয়ের ব্যাকুলতা না দেখিলে তাহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়।

কুমুদিনী একটু ভাবিয়া বলিল, "সই আমাদের বাড়ীতে শীঘ্রই আসিবে। আর একটি শুভ সংবাদ তোমাকে দিতেছি। নারায়ণগড়ের জমীদার মিষ্টার সেনের বড় ইচ্ছা যে, সইয়ের সহিত আলাপ করেন।"

কিরণ। তোমার সখী তাঁহারই উপযুক্তা।

কুমুদিনী। যে সইকে দেখে, সেই ভুলিয়া যায়। কেবল তোমার চক্ষু দু'টি টিপু সুলতানের মত।

কিরণচন্দ্র। বোধ হয়, মহীশূরে টিপু সুলতান নারায়ণগড়ের বীরেন্দ্র সেন অপেক্ষা অধিকতর যত্ন গণ্য ও চিরস্মরণীয়। সে বেচারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিল।

কুমুদিনী। আচ্ছা, কে কাহার জন্য প্রাণ দেয় দেখা যাবে।

এবম্প্রকারে ভ্রাতাকে নামন করিয়া ও ক্ষুদ্র মুষ্টি উত্তোলন করিয়া মানিনী কুমুদিনী চলিয়া গেল। কিরণচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—কি জঞ্জাল! এই নীরব গৃহে শীঘ্রই একটা বিপ্লব ঘটিবে। মিষ্টার সেন, মিস্ ইন্দুমতী, পিয়ানো, গীত, বাদ্য, উচ্চহাস্য, কটাক্ষ, প্রেম!

বোধ হয় বাসাটা বদলাইয়া ফেলিলে ভাল হয়।

সম্মুখে কুমুদিনীর কৃত কার্পেটে জ্বলন্ত অক্ষরে,—

"হৃদয়ে ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর।"

যাহাদিগের হৃদয় নাই, তাহাদিগের উপায় কি?

চিন্তা ও হৃদয়ের উদ্বেগে কিরণচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলেন।

২

তাহার দুই দিন পরেই প্রকাণ্ড 'ফিটন্' আসিয়া ব্যারিষ্টার অটল দত্তের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত। 'ফিটন্' হইতে ইন্দুমতী বাহির হইল। বেশ মেম হইতে ডানাকাটা পরী।

অবাদ গণিয়া প্রোফেসার কিরণচন্দ্র স্বীয় অধ্যয়ন-গৃহে লুক্কায়িত হইলেন, এবং কপাট অর্গলবদ্ধ করিলেন।

ইন্দুমতী দ্রুতপদে নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে কে থাকে?"

গৃহাভ্যন্তর হইতে দৃঢ়স্বরে কিরণচন্দ্র বলিলেন, "আপনি উপরে চলিয়া যান।"

ইন্দুমতী ভাবিল, "কি কঠোর স্বর!"

"কুমু! কুমু! কুমুদিনী! সই!"

পাপিয়ার ন্যায় স্বর স্তরে স্তরে ত্রিতলে উঠিল!

তাহার পর দুইটি শব্দ। আরোহিণীর ও অবরোহিণীর। আরোহিণী অবরোহিণীর সহিত আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধা।

চুম্বনের ও আলিঙ্গনের উচ্ছ্বাস দেখিয়া মিষ্টার দত্ত ধীরে ধীরে গবাক্ষের পার্শ্বে গিয়া শিশ্ দিতে লাগিলেন। "ও ডিয়ার, ডিয়ার, স্ত্রীলোক মাত্রেই এক রকমের।"

"কুমু! মিষ্টার দত্ত কই? অটল বাবু! আপনি সোনা পাইয়াছেন। আপনার সুখ দেখিয়া আমার হিংসা হয়।"

অটল দত্ত মৎস্য-কণ্ঠ-বিদ্ধ বিড়ালের ন্যায় কাতরভাবে একটু কাশিলেন, একটু হাসিলেন, এবং রুমাল দিয়া বাম চক্ষু ঈষৎ মুছিলেন।

ইন্দু। 'দাদা'! কুমু, তোর 'দাদা'?

কুমু। হাঁ, প্রোফেসার কিরণচন্দ্র বসু।

ইন্দু। যাঁহার রচিত মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের আমেরিকার চইবার অনুবাদ হইয়া গিয়াছে?

কুমু। বোধ হয়।

ইন্দু। তুই এতক্ষণ বলিস্ নাই?

কুমু। কেন বল্‌ত?

ইন্দু। আমরা উঁহাকে 'শিবাজী' বলিয়া থাকি।

কুমু। আমি টপ্ করে জুগিয়ে দিতুম।

ইন্দু। আচ্ছা, দেখা যাউক কোন্‌টা।

উভয়ে ধীরে ধীরে কিরণচন্দ্রের দিকে গেল।

কুমু। দাদা! আমার সই ইন্দু।

কিরণচন্দ্র। অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

ইন্দু। আপনার নাম আমি 'শিবাজী' রাখিয়াছি।

কিরণচন্দ্র। কথাটা 'শিবজী'। শিবাজী অত্যন্ত ভুল।

ইন্দু। শিবা শব্দের অর্থ শৃগাল। শিবজী শ্মশানে থাকেন, শিবাও শ্মশানে থাকে। সুতরাং উভয়ে একই।

কিরণচন্দ্র। শিবজী মহারাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন।

ইন্দু। কিন্তু পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি করিতেন।

কিরণ। আপনার ইতিহাসপ্রিয়তা প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনি অনর্থক শিবজীর নিন্দা করিবেন না।

কিরণচন্দ্রের জ্বলন্ত চক্ষু দেখিয়া কুমুদিনী ভয় পাইল। "দাদা, শিবের সঙ্গে শিবা বোধ হয়।"

ইন্দু খুব হাসিয়া উঠিল।

'তবে কি শিবের সত্যিই শৃগালের বিবাহ হইয়াছিল?"

কিরণচন্দ্র উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী বলিল, "সই! তুই দাদাকে চটালি কেন?"

ইন্দু কুমুদিনীর কানে কানে বলিল, "সই! তোর দাদা আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এবারেই রাগ করিয়া কথাটি বিল বন্ধ করিয়াছিল। মানুষকে কখনও দেখিতে পারে না। তোর দাদা দিব্যি, উপ্ করা যায়।"

৩

যদিও কিরণচন্দ্র অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর রূপ সম্বন্ধে তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

"কুমু! আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার সখীর মত রূপ দুর্লভ। ফটোগ্রাফখানা নিতান্ত অবজ্ঞ হইয়াছিল। তবে ও রূপ জগতে না থাকাই ভাল।"

কুমুদিনী। তবে তোমার ইচ্ছা, সই জগৎ হইতে অন্তর্হিতা হয়? তুমি কি নিষ্ঠুর!

কিরণ। তুমি অতি সরলা; বুঝিতে পার না। রূপে মোহ হয়, অহঙ্কার হয়। প্রথমতঃ, অত সাহেবিয়ানা ভাল নয়। সাহেবিয়ানাতে হিন্দুসমাজ অধঃপাতে গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তোমার সখীর মত নির্লজ্জা, বেহায়া মেয়ে আমি কুত্রাপি দেখি নাই। আমার বোধ হয়, তোমার সখীর বিবাহ হইলেও আমাদের ক্ষুদ্র সমাজে তাঁহাকে অধিক মিশিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কুমুদিনী। কল্য তুমি চলিয়া গেলে মিষ্টার সেন আসিয়াছিলেন।

কিরণচন্দ্র। আমি কোর্টশিপের পক্ষপাতী নহি। তবে আমাদিগের বিলাতফেরত ও ব্রাহ্মসমাজে উহা অন্য রকম চলিয়াছে; সবই চলিবে। কিন্তু যেখানে স্ত্রীলোক, সেখানেই সরলের উৎপত্তি।

"আর যেখানে পুরুষ, সেখানেই মূর্খ।"

ইন্দুমতী ইতাবসরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কেহই দেখে নাই। তবে কি আমাদের কথা ইন্দু শুনিয়াছে? কুমুদিনীর অত্যন্ত ভয় হইল। কিন্তু ইন্দুর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝা গেল না।

ইন্দুমতী ধীরে ধীরে বলিল, "কিরণ বাবু! আপনি সাহেবদিগের উপর বড় চটা!"

কিরণ। বোধ হয় খানিকটা।

ইন্দু। কেন? তাহারা শত বর্ষ ধরিয়া অসভ্যদেহে বাঙ্গালী জাতি শাসন করিয়াছে বলিয়া?

কিরণ। বঙ্গের বিভাগই তাহার প্রমাণ।

ইন্দু। সে কেবল বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার গুণে।

কিরণ। আপনি বোধ হয় এই নরদীর নিকট ভারতের ইতিহাস সম্প্রতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন?

ইন্দু। পূর্ব্বে এখানেই কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলাম। মিউনিসিপ্যাল ইসকুলে চুরী আটকাইতে গিয়া বাবা বিতাড়িত হন; তাহার পর তিনি কলহছলে ইসকুলমাষ্টার ছাড়িয়া যান। পূর্ব্ববঙ্গ ও ব্রাহ্মসমাজের উপর নব্য যুবকদিগের কটাক্ষপাত তাহার পূর্ব্বে দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের শ্রাদ্ধ বিদ্বেষ ও বিদ্রূপও দেখিয়াছি।

কিরণ। আর মাহেবদিগের উৎপীড়নগুলি বোধ হয় দেখেন নাই।

ইন্দু। আমার ছোট পিসীর বিধবা কন্যা সুধাকে যখন ময়মনসিংহের একটি জমীদার কাছারী-বাড়ীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; তাহার পর আর তাহাকে পাওয়া যায় নাই। দেশের রাজা ও নবাবদিগের অনেক কীর্ত্তি আছে। কিন্তু বাহ্! খুনখারাবি, উৎপীড়ন ও ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবঞ্চনা কি কেবল বিলাতেরই একচেটিয়া? সমাজমাত্রেই পশু ও মানুষ উভয়ই আছে।

কিরণ। আপনার বিলাতী দীক্ষাকে ধন্যবাদ।

ইন্দু। আমেরিকার দীক্ষা ইংরাজের নিকট; বাঙ্গালীর শিক্ষা ইংরাজের নিকট। কিন্তু সমবেত গুরুর বিরুদ্ধে শিষ্য অস্ত্রধারণ করে। ইহা অধঃপতনের লক্ষণ!

উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রামের লক্ষণ দেখিয়া কুমুদিনী একটু হাসিয়া বলিল, "নই! তুই সাহেব বিয়ে করিস্।"

ইন্দু। মুর্খ! বাঙ্গালী যথার্থ সাহেব হইলে দেশের এত দুর্দ্দশা হইত না। বাঙ্গালী যথার্থ আর্য্য হইলেও দেশের এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। বাঙ্গালী সাহেব ও হিন্দু উভয়েরই অপকৃষ্ট ভাগ। যাহার নিজের উঠিবার শক্তি নাই, সে সমগ্র দেশকে উঠাইবে কি করিয়া? বাঙ্গালী একেবারে সাহেব হইয়া গেল না কেন?"

কিরণচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। এখন অবসর পাইয়া বলিলেন,—"আমাদের উপর দেশ উঠাইবার ভার অর্পিত হয় নাই; সুতরাং কোনও দোষের কারণ নাই। আমরা দরিদ্র, আমাদিগের পন্থা এক; আপনারা বিলাসিনী, আপনাদিগের পন্থা অন্য! তবে আমার মিনতি এই যে, আপনার পথে অন্যকে আহ্বান করিয়া নষ্ট করিবেন না। বরং অজ্ঞান অন্ধকারে থাকা ভাল; কিন্তু এ মর্ম্মনেশে জ্ঞান হইতে দরিদ্রের দূরে থাকা উচিত।"

[illegible] চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী পূর্ব্বাপেক্ষা হতাশা হইয়া পড়িল।

এমন সময় মিষ্টার সেনের একখানি পত্র আসিয়া উপস্থিত।

কুমুদিনী। সই! ইহার মধ্যে বোধ হয় ভাল সংবাদ আছে।

ইন্দু। বোধ হয়!

পত্রখানি ইন্দু কুমুদিনীকে দেখাইল। মিষ্টার সেন এক ঘণ্টার জন্য কলা ইন্দুর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কহিবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

ইন্দু। এটা একটু নূতন ধরণের নয়?

কুমুদিনী। সম্পূর্ণ বিলাতী।

ইন্দু। কিন্তু ইহার মধ্যে দেশী ও বিলাতীর পার্থক্য দেখা যাইবে। আমি মিষ্টার সেনের সহিত বাগানে সাক্ষাৎ করিব। তাহাই উত্তর দিই।

কুমুদিনী একথায় হতাশভাবে চাহিল।

"সই! তুই সাই করিস্ না কেন, আমার মনে হয় সে হৃদয়।"

ইন্দু কুমুদিনীর মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "ইহাই ভালবাসার লক্ষণ। ভালবাসায় দোষ দেখে না। কুমু! প্রাণের সই। আমি চিরজীবন তোর কাছেই থাকিব। আমার পিতা নাই, মাতা নাই, ভালবাসার কেহই নাই। তারা বিলাতেই বোধ হয় থাকিবেন। আমি কোথায় যাইব কুমু?"

কুমুদিনী। আমার বড় সাধ ছিল যে,—

ইন্দু। তোর দাদা আমাকে বিবাহ করিবেন না।

কুমুদিনী চমকিত হইয়া ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল। ঐ চক্ষু, ঐ স্বর, ঐ মুখের ভাব কি এ জগতের?

"সই! দাদা তোর পায়ের নখেও লাগে না।"

ইন্দু সুধা বর্ষাইয়া হাসিল।

"সই! আমি তাঁহার চরণপ্রান্তের যোগ্যা নই। তাহার পাশাপাশি কখন আমার জীবন গলিবে না। আমরা কেবল কাঁদিতে জানি; ভালবাসিতে জানি না।

"আর দেখ সই! এ কথা যেন তাঁহার কানে যায় না। আমার পিতৃদত্ত ঐশ্বর্য্য কষ্টস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অটলকে বলিস্, আমার ও বিভূতিকে বিতরণ করিয়া দিতে।"

কুমুদিনী। বিভূ?

ইন্দু। হাঁ, যাঁহাকে বলে পাগল! আসিস্ না, আমার একটু পাগলের ছিট্ আছে। উঃ! বড় মাথা ধরেছে।

৪

ইন্দুমতী স্বামী ভাবীর রূপোপকথন শুনিতেছিল বলিয়া, কিন্তুপক্ষে যে তাহারই প্রতিহিংসার দুই সখীর কথা শুনিতে পাওয়ার নিমিত্তই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা নয়। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, এবং তখন ও ভাবনা দূর হয় নাই।

বিপক্ষ ভাবই একত্তে পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

যে রাত্রিতে যোগ হয় ইন্দুমতীও ঘুমায় নাই। কিন্তুপক্ষও ঘুমান নাই। জগতে কেহই ঘুমায়, মন বোধ হয় ঘুমায় না। মন আকাশ পাতাল, ভেক ছাড়িয়া ভাবাই লইয়া থাকে। স্বপ্ন তাহার আভাস।

স্বপ্নের মধ্যে প্রেমের স্বপ্নই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর।

প্রেমের স্বপ্নের আধিকা রমণী। সংসার মায়ার আধার। সাহিত্যে রমণী। মায়া হইতে জীবনের উদ্ভব। উদ্ভব হইতে মায়া। মায়া হইতে সংসার, কর্ম্মক্ষেত্র, ধন, জন, দারা, সুত। এইরূপে মায়া বিশ্বসংসার জাল চক্র আবৃত করিয়া বিশ্ব প্রকটিত করিতেছে। আধারই সৃষ্টি সনাতন, ধ্রুব অবতীর ও সনাতীর।

ইতিহাসটী পুরাতন, কিন্তু চিরপ্রচ্ছন্ন ; অতএব নূতন।

মায়ার মধ্যে বিষ ও সুধা উভয়ই আছে ; অতএব দৈবত ও নিরাদৈবত আছে।

রাত্রি বড় গভীর। যে রমণীর প্রেমে মহেন্দ্র চির-উন্মাদ, যে প্রেমে মুগ্ধ ও প্রীত, দেশের জন্য হইয়াছিল ; সোমদত্ত, জাহিদ, মস্তক ও কাফিরের পাগল হইয়াছিলেন ; যে প্রেম আজানে চিরজাগরূকতা দেয় ও জাগিয়া থাকে ; সেই প্রেম আজ ধীর, ধীর, ধীর, কিন্তুপক্ষের বিষমিশ্রিত হৃদয়ে একটি নব সিংহাসনে বরণ করিতেছিল।

কিন্তুপক্ষে রমণীর ও সুন্দর। ইন্দুমতী রমণীয় ও সুন্দরী।

কিন্তু উভয়েরই চক্ষু নিমীলিত। স্বপ্ন সেই নয়নের উন্মুক্ত করিয়া দিল। একটি জগৎ অন্যটির দিকে যাইতেছিল। কেহ জানিতে পারিল না ; কেহ জানিয়া পুলকিত। বিধাতার বিধান, ভিন্নিই যোগে সাধী।

সেই স্বপ্ন-আভাসে ইন্দু কিন্তুপক্ষের সহিত যুক্ত হইল। কিন্তুপক্ষ এক নূতন জীবন পাইল। জীবনের সাথী পাইল। সংসার দেখিল, সংসারের ধর্ম্ম দেখিল।

সেতারে বাগানে খুব ফুটিয়াছিল। শিশির তাহার রস আকর্ষণ করিতেছিল। প্রভাত-বায়ু তাহা লইয়া ধীরে ধীরে জগতে বিতরণ করিতেছিল। কিন্তু তাহার মর্ম্ম কেহই জানিত না।

পাগলিনীর ন্যায়, স্বপ্নাচ্ছন্নার ন্যায়, ইন্দুমতী ধীরে ধীরে বাগানের দিকে গেল। বাগানের দ্বারে কুমার বীরেন্দ্র সেন একখানা ফিটন হইতে অবরোহণ করিয়া ইন্দুমতীকে অভিবাদন করিলেন।

ইন্দু হাসিল।

"আপনার সহিত আমার একটিমাত্র কথা আছে।"

মিঃ সেন। এ কি ভাব! এ কি বেশ!

ইন্দু। আমি আপনাকে ছলনা করিয়াছি। মার্জ্জনা করিবেন।

মিঃ সেন। কিসের ছলনা ইন্দু?

ইন্দু। আমি নির্লজ্জা, প্রগল্‌ভা, আমি বেহায়া। আমি কুমিকার বনবন্তী হইয়া আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম। ভ্রাতার ন্যায় ভগ্নীর উপর মমতা করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

মিঃ সেন। ইন্দু! ইন্দু! প্রাণের ইন্দু! তুমি কি পাগল?

"মিষ্টার সেন! আপনিই পাগল, আমার হাত ছাড়িয়া দিন।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইন্দুর রূপের তেজ অবমাননা পাইয়া আরও বাড়িয়া উঠিল। মিঃ সেন তড়িদ্বেগে ইন্দুকে স্বাংয়ের দিকে আকর্ষণ করিলেন।

ইন্দু উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমার অবমাননা করিবেন না?"

এমন সময়ে গম্ভীর স্বরে কে পশ্চাৎ হইতে বলিল,

"আপনার সহিত আমার কথা আছে, একবার গেটের বাহিরে আসুন।"

মিঃ সেন দেখিলেন, কিরণচন্দ্র!

"আপনার অসভ্যতা দণ্ডনীয়।"

কিরণচন্দ্র বীরেন্দ্রকে লইয়া বাহিরে গেলেন।

"আপনার যদি প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা থাকে, তবে ঐ মাঠে চলুন, নচেৎ কুক্কুরের ন্যায় দূর হইয়া যান।"

তাহার পর উভয় পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগ বর্ষণ হইল; কিন্তু কিরণচন্দ্রের রণপটুতা দেখিয়া সেন মহাশয় অবিলম্বে চম্পট দিলেন।

মূর্চ্ছিতা ইন্দুমতী শয্যায়। কুমুদিনী চিন্তাকুলা, শয্যার শিয়রে। কিরণচন্দ্র উপস্থিত।

"দাদা কি হইয়াছিস বল ত ?"

কিরণচন্দ্র : একটা বিলাতী অভিনয়।

ইন্দুমতীর চক্ষু উদ্ভাসিত হইল ; আবার পড়িয়া গেল। আর এত লজ্জা কেন ?

ইন্দু ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু স্বদেশীর হাতে ?"

ঠৈ ? ইন্দুর গাউন কোথায়, নেকলেস্ কোথায় ? আঙ্গি মসিন বসন কেন ?

কুমু। ছি ! ছি ! সই, তুই বীর কাপড় পরিয়াছিস্ ?

ইন্দু। নই ! তোরা বিলাতী, তোদের কাপড় কই ? তবে ঝাঁটা গাছটা অন্ধকারে খুঁজিয়া পাই নাই।

কিরণ : সেটা কি আমার জন্য ইন্দু ?

ইন্দু আবার লজ্জায় নয়নকমল দুটি নিমীলিত করিল :

"না, সে তাহার জন্য। ঝাঁটা স্বদেশী, মুষ্টিযোগটা বিদেশী। তুমি স্বদেশী হইয়া বিদেশী উপায় অবলম্বন করিলে কেন ? এটা শিবজী করিতেন না।"

কিরণ। ইন্দু ! ইন্দু ! ওটা তোমার নিকট দীক্ষা। শিবজী একবার দিল্লী হইতে বিদেশী পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

কুমুদিনী উভয়ের ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। সে কেবল আহ্লাদে মূর্চ্ছা যায় নাই।

ত্রিকাল।

—:০:—

১

ছিল ভক্তি, ছিল প্রীতি, ছিল সাধনার গীতি,
ছিল তপোবন,
ছিল বেদবিধি ধর্ম, উদ্ঘাটিত জ্ঞান-মর্ম্ম,
আধ্যাত্ম-জীবন।
নদী গিরি বৃক্ষবন কল্পিত মঙ্গল ক্ষণ
বেদোদাত্ত স্বরে,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠনীর পূজা দিত জননীর
লক্ষ-অসি-করে।

কি আনন্দ অভিনব সত্য-ছায়া ছিল তব
হে বিরাট ভূপ!
তাই আজি মনে হয় স্রষ্টা তুমি আনময়
হে অতীত-স্তূপ।

২

সে অতীত হ'ল শেষ, আজিকে ধরিয়া দেশ
আছ বর্ত্তমান;
ধর্ম্মহীন বিশ্বাসহীন দারিদ্র্য ঘুচিতে দীন
মনুষ্যহীন-প্রাণ।
স্বার্থ আর অজ্ঞানের বেঁধেছে বিষম ফের
রুদ্ধ গণ্ডী মাঝে,
দুর্ব্বল ভিক্ষায়-ভোগী নবকুল চিররোগী
দাসত্বের সাজে।
অন্নাভাবে ক্ষীণবীর ক্ষুব্ধ চক্ষু ভয়াতীর
জীর্ণ-চীর, দীন!
কালি নহ, কালি তুমি ঘৃণা তুমি, দুঃখভূমি
কলঙ্কমলিন।

৩

হে ভবিষ্য! এস তুমি আঁধার ভারতভূমি
প্লাবিয়া আলোকে,
আন তব বজ্রধ্বনি উদ্বোধিয়া প্রাণখনি'
এই জড় লোকে।
ভেঙ্গিয়া জড়শয্যা পাশবিব দৈন্য মুছ্যা
ঘৃণ্য বর্ত্তমান,
আপন সামর্থ্যভরে বহিব মায়ের তরে
ভক্তিযুক্ত প্রাণ।
হেরি আশা-মূর্ত্তি ধরি' নামিতেছ ত্বরাত্বরি'
বহি' অসি ঢাল,
এস,—লহ পূজা অর্ঘ্য, বহি আন চতুর্বর্গ
হে ভবিষ্য কাল!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সহযোগী সাহিত্য।

—:০:—

উপকথা।

ইংরেজ লেখকটি 'অভাবন' বিভিন্ন দেশে হিন্দুস্থানের গ্রাম্য উপকথা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আমরা একটির সারসংগ্রহ করিলাম।

কোনও নগরে সাত জন স্বর্ণকার বাস করিত। তাহারা খুব নিপুণ কারিগর; অলঙ্কার ও সীমন্তভূষণোচিত নানাবিধ স্বর্ণের গঠন এত সুচারুরূপে প্রস্তুত করিতে পারিত যে, তাহাদের নাম অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। উক্ত নগরের কিছু দূরে একটি গ্রামে এক জন প্রতাপান্বিত মনাধিপালী রাজপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হয়; এই জন্য তিনি ঐ সাত জন স্বর্ণকারকে তাঁহার গ্রামে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লোক পাঠান। তাহারা প্রচুর পুরস্কারের প্রত্যাশায় একটি নিবিড় বন অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট সেই গ্রামে আসিয়া রাজপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজপুরুষ তাহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া একটি গৃহে লইয়া গিয়া বলিলেন যে, এই গৃহে বসিয়া তোমাদের সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, অন্য কোথাও যাইতে পাইবে না। রাজপুরুষের প্রকাণ্ড শ্মশ্রুর মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা, এত ভীত হইয়াছিল যে, প্রথমে তাহারা কার্য্য করিতে অসম্মত হইল, কিন্তু প্রচুর পুরস্কারের লোভে অবশেষে সম্মত হইল। তখন সেই রাজপুরুষ তাহাদিগের কার্য্যোপযোগী সমস্ত যন্ত্রাদি (হাপর, ভাঁতা, হাতুড়ী ইত্যাদি) যোগাইয়া দিলেন। সোনা, রূপা তাঁরা, মুক্তা এগুলি তিনিই তাহাদিগকে দিলেন; এবং অন্য একটি ঘর দেখাইয়া বলিলেন,—'এই ঘরে তোমরা শয়ন করিবে, আর এই ছাগীর দুধ পান করিবে। এই দুধে তোমাদের সাত জনেরই পর্য্যাপ্ত হইবে; অন্য আহারের প্রয়োজন হইবে না; এমন দুধটি তোমরা কখনও পান কর নাই; ইহা অত্যন্ত বলকারক, এবং ইহাতে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকিবে। আর এই সন্ধ্যায় তোমরা রাত্রে বনে আরাম করিয়া শয়ন করিতে পারিবে; কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিও যে, সাত দিনের মধ্যে আমার কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া দিতে হইবে, অন্যথা এখনই তোমাদের মাথা কাটা যাইবে।'

স্বর্ণকারেরা রাজপুরুষের এরূপ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল; কিন্তু তাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাতে দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই কার্য্যগুলি শেষ করিতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া সম্মত হইল। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর সায়াহ্নকৃত্য শেষ করিয়া ঐ ছাগীর দুগ্ধ তোষপূর্ব্বক সকলে পান করিল। তাহারা এত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে, রাজপুরুষকে মনে মনে শত শত ধন্যবাদ দিল। এমন সুমিষ্ট দুগ্ধ তাহারা জীবনে কখনও পান করে নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দুগ্ধ পান করিবামাত্রই একটা নেশার মতন আসিল। শয়ন করিবার জন্য তাহারা শয্যায় নিদ্রিত শয়ন করিলে দেখিতে পাইল যে, ছয় জন মাত্র লোকের থাকিবার স্থান আছে, অথচ সপ্ত ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিয়া, তৎক্ষণাৎ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঐ ছাপ্পি ভূমিশয্যা ব্যক্তির পদ-সেবন করিতে করিতে ক্রমে ঐ [illegible] পার দেহের সমস্ত বড় পান করিয়া ফেলিল। রক্তাভাবে ঐ ব্যক্তি [illegible] মৃদু মুখে পতিত হইল। ঐ সময়ে একটি ভীষণ শব্দ হইল, এবং একটি প্রকাণ্ড [illegible] ঐ ঘরে দেখা গেল। তৎপরেই সে পুরুষটি মৃদু স্বরে বলিলেন,—'ভগিনী! কেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছ? ক্ষুধা কি মিটিয়াছে?' তখন স্ত্রী উত্তর করিল, 'দাদা ভাই! যত দিন তুমি আমায় মানুষের রক্ত দিবে, তত দিন আমার ক্ষুধা মিটিবে।' তখনই একটি ভীষণ শব্দ হইল, এবং সাধুপুরুষটি মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

স্বর্ণকারেরা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিল যে, তাহাদের মধ্যে এক জন নাই। তাহারা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। সাত দিবসের মধ্যে তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে; সুতরাং তাহারা অধিকতর পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় পুনরায় তাহাদের ছাগীর দুগ্ধ পান করায় তন্মধ্যে আবির্ভাব হইলে, শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখিল যে, শয্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়াছে; পাঁচ জনের অধিক শয়ন করিবার স্থান নাই। সুতরাং পাঁচ জন শয্যায় ও অবশিষ্ট ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিল। সে দিবসও সেই রাত্রে ছাগী ভূমিশায়ী স্বর্ণকারের পদসেবন করিতে আরম্ভ করিল, এবং অবশেষে সমস্ত রক্ত পান করাতে তাহারও মৃত্যু হইল। পূর্ব্ব রাত্রে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, আজও ঠিক সেইরূপ ঘটিল। পর দিন প্রাতে স্বর্ণকারগণ নিদ্রাভঙ্গে দেখিতে পাইল যে, তাহাদের এক জন বন্ধু তথায় নাই। অনেক সন্ধান করিল, কিন্তু কিছুই ফলদায়ক হইল না। তাহারা হতাশ হইয়া, উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিল। এইরূপে পাঁচ দিবসে পাঁচ জন স্বর্ণকার নিরুদ্দেশ হইল।

ষষ্ঠ দিবস প্রাতে অবশিষ্ট দুই জন স্বর্ণকার পরস্পর পরামর্শ করিয়া এই রহস্য-উদ্ঘাটনে কৃতসঙ্কল্প হইল। পাছে নিদ্রাই তাহাদের অনিষ্টের মূল; এই জন্য তাহারা এই উপায় উদ্ভাবন করিল যে, সে দিন রাত্রে তাহারা নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে পরস্পরের কেশ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে। সে দিনও সন্ধ্যাকালে তাহারা ঐ ছাগীর দুগ্ধ পান করিল, এবং যেমন তন্দ্রা আসিল, অমনই উভয়ে উভয়ের কেশ পরস্পর দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া শয্যায় বিকটে গিয়া দেখিল, যাহে এক জনমাত্র শুইবার উপযুক্ত স্থান আছে। সুতরাং ঐরূপ বন্ধন অবস্থায় অপর ব্যক্তি ভূতলে শয়ন করিল। অদ্যও পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় ঐ ছাগী আসিয়া যে স্বর্ণকার ভূতলে শুইয়াছিল, তাহার পা চাটিতে লাগিল। যখন ঐ ছাগী তাহার রক্ত পান করিতে উদ্যত হইল, কেশে কেশে বন্ধন থাকায় তাহার মস্তক যেমন টান পড়াতে সে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিল, এবং সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া, ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। বুঝিল যে, তাহারা নরশোণিতলোলুপ রাক্ষসের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে!

শয্যা হইতে মাদুরে স্বর্ণকার হইজন কোনওরূপ বল করিয়া বাহির হইয়া প্রাণরক্ষার্থে ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছাগী জানিতে পারিয়া এক অপূর্ব্বমূর্ত্তি অলোকসামান্যা রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল, এবং ভয়ঙ্কর-স্বরে কহিতে লাগিল

উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, 'হে স্বামিন্! আমায় ফেলিয়া কোথায় যাও? ওগো! আমায় ছাড়িয়া যাইও না, আমায় তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।' কিন্তু স্বর্ণকার রাক্ষসীর ছলনা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে আরও বেগে ছুটিতে লাগিল। পথিমধ্যে একটি বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ দেখিতে পাইয়া সে ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিল। বিল্ববৃক্ষ শিবের আবাসস্থল, তাই সে একমনে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'হে প্রভু! আপনি ভূত, প্রেত, রাক্ষসীর সংহারকারী, আমায় এই রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া প্রাণদান করুন।' মহাদেব তাহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। রমণী বিল্ববৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া গাছের উপর উঠিতে ও স্বর্ণকারকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সে গাছে উঠিতে পারিল না। অগত্যা সে বৃক্ষমূলে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল,—'হে নিষ্ঠুর! কেন তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? একবার নামিয়া আইস, এত বড় গাছে উঠিতে আমার সাহস হইতেছে না; নতুবা আমি তোমার কাছে যাইতাম। আমার জীবনসর্ব্বস্ব! হৃদয়ের দেবতা! তোমায় অনুনয় করি, একবার নামিয়া আইস!' এইরূপে বক্ষে করাঘাত করিয়া সে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনধ্বনিতে সমস্ত বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সেই সময়ে এক রাজা মৃগয়া করিতে করিতে ঐ বৃক্ষের মূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক পরমসুন্দরী রমণী ক্রন্দন করিতেছে। রাজা তাহাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণীর মুখে সমস্ত অবগত হইয়া তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পাষাণীন স্বর্ণকারকে ডাকিয়া বলিলেন,—'হে প্রিয় বন্ধু! তুমি কেন তোমার পরমসুন্দরী পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছ? নামিয়া আইস; ইহাকে গৃহে লইয়া যাও।' সত্য ঘটনা বলিলে রাজা তাহাকে বিশ্বাস করিবেন না, এই বিবেচনা করিয়া স্বর্ণকার উত্তর করিল,—'হে রাজন! আপনি উহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন; আমি উহাকে ত্যাগ করিয়াছি, কখনই গৃহে লইয়া যাইব না; উহার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই।' রাজা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'প্রজার নিকট হইতে কোনও দান আমরা বিনামূল্যে গ্রহণ করি না। দুই লক্ষ টাকা দিতেছি, নামিয়া আসিয়া গ্রহণ কর।' স্বর্ণকার বলিল, 'বৃক্ষমূলে রাখিয়া যান। আমি শপথ করিয়াছি যে, এই রমণী চক্ষুর অন্তরাল না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কোনও মতে বৃক্ষ হইতে নামিব না।' অগত্যা রাজা বৃক্ষমূলে টাকা রাখিয়া সেই রমণীর সহিত রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং মহাসমারোহে তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

রাজার একটি ঘোটক, একটি কুকুর ও একটি শিশু সন্তান ছিল। তাহাদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। এক দিবস রাত্রে চন্দ্রবেশিনী রাক্ষসী ঘোটকটিকে খাইয়া ফেলিল, এবং তাহার অস্থিগুলি অপর রাণীদিগের শয়নগৃহে নিক্ষেপ করিল। প্রভাতে যখন রাজা শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয় ঘোটকটিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার আদরিণী নব-মহিষীর নিকটে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দুষ্টা রাক্ষসী বলিল 'অপরাপর রাণীর গৃহে সন্ধান করুন, জানিতে পারিবেন।' রাজা তৎক্ষণাৎ

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১। প্রাচীন পুস্তক-প্রকাশ।

—:০:—

[illegible] প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে [illegible]

পুস্তকের সৃষ্টি হয়, তাহাদের [illegible] তাহা [illegible] পারে। [illegible] পত্র, [illegible] ও [illegible] নামে [illegible] পুস্তক [illegible] হইত। [illegible] পুস্তক [illegible] পুস্তক [illegible] ও [illegible] (১)

[illegible] পুস্তক রচয়িতা ও পুস্তক লিপিকারদিগের নাম পুষ্পিকা। পুষ্পিকাগুলি [illegible] পুস্তক [illegible] পুস্তকের [illegible] (২) [illegible] [illegible] [illegible]

বর্দ্ধনের নিকট পুণ্ডরীক নামক বণিক-শাখার সন্ধান জৈনদের কল্পসূত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত স্থানে এক সময়ে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হইত। এখানে যাহারা পলুর ব্যবসায় করিত, তাহাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর এক সম্প্রদায়ের পুণ্ডরীক নাম ছিল। বোধ হয়, পুণ্ডরীক বা পুণ্ড্র-শব্দ হইতে পলু-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও পুণ্ড্রজাতি আপনাদিগকে পুণ্ডরীক বলিয়া থাকে। মুসলমান-রাজত্ব-কালে বহু লোক মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করায় ইহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। রেশমকীট-পালন ও রেশমোৎপাদন ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। এই জাতির অধিকাংশ এখন বৈষ্ণবপন্থী। তেজস্বিতায় ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী জাতিনিচয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদের পূর্ব্বসংখ্যা বজায় থাকিলে, এই বীর-প্রকৃতি জাতি কর্ত্তৃক হিন্দুসমাজের বল বর্দ্ধিত হইত। মহানন্দা নদী এই জাতির বাসস্থানের পশ্চিম সীমা ছিল। বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" পৌণ্ড্র-বাসের উল্লেখ আছে;—সম্ভবতঃ উহা পুণ্ড্র-দেশীয় রেশমী বস্ত্র।

করতোয়া ও মহানন্দা পুণ্ড্র-রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থ নদী। মহাভারতে মহানন্দার নাম আছে। বন পর্ব্বে আছে,—পাণ্ডবেরা নন্দা ও অপরনন্দা পার হইয়া অধিবঙ্গ তীর্থে গিয়াছিলেন। নন্দা ও অপরনন্দার কোনওটি মহানন্দা হইতে পারে। অধিবঙ্গ, বোধ হয়, বঙ্গের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান। অনুশাসন পর্ব্বের ২৫শ অধ্যায়ে আছে—

পুণ্ড্রাবর্ত্তনদ্যাং চ মহানন্দায়াং চ সেবা বৈ।
নন্দনে সেবতে যাস্তত্ত্বপ্ সর্ব্বোড্রহিংসকঃ।
উর্ব্বরীং কৃত্তিকাযোগে গত্বা চৈব সমাহিতঃ।
লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা পুণ্ডরীক-ফলং লভেৎ॥

লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায়, আমরা উল্লিখিত মহানন্দাকে পুণ্ড্র-রাজ্যের মহানন্দা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মহানন্দা ও দেখিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালে ইহার তীরে ধন-জন-পূর্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল;—পুণ্ড্ররাজ্যই সেই রাজ্য। মহানন্দার পশ্চিম পারে সাধারণতঃ দ্র-বংশীয় ও পূর্ব্ব পারে অনার্য্য-বংশীয় লোকের বাস ছিল।

করতোয়া (১) পুণ্ড্ররাজ্যের একটি প্রধান নদী ছিল। হিমালয় হইতে

(১) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রীকগণিত 'পেরিপ্লুস্ অফ্ দি ইরিথ্রিয়ান' অর্থাৎ 'লোহিত-সমুদ্রবাহি-বাণিজ্য বিবরণ' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয়

বঙ্গদেশের উপরে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বহির্গত হইয়াছে, যে সকল বন্যোত্তের কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিতে না পারিয়া, উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে মিলিত হইয়া করতোয়া ও মহানন্দা নাম ধারণ করিয়াছিল। করতোয়া পূর্ব্বকালে অতি প্রকাণ্ড নদী ছিল। কোনও সময়ে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন দিকের প্রবাহ স্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে পতিত হইত। উত্তরের প্রবাহ শিবগঞ্জ হইতে ৭৫ ক্রোশ অন্তরে ছিল। করতোয়া তৎকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ দিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল। হরিণঘাটার নিকট সমুদ্র করতোয়াকে গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও সুন্দরবনে করতোয়া নামী একটি স্রোতস্বতী আছে। মাথাভাঙ্গা করতোয়ার দেহ বলিয়া অনুমিত হয়। করতোয়া হইতে কুমার, ইছামতী, নবগঙ্গা ও চূর্ণী বাহির হইয়াছিল। করতোয়া উপর দিক্ হইতে বিলুপ্ত হইলে, এই সকল নদী গঙ্গার সংস্রবে আসিয়াছে। এই সকল ঘটনা কোন্ সময়ে হয়, তাহা জানা যায় না। পূর্ব্বকালে গঙ্গার প্রধান জলস্রোত ভাগীরথী দিয়া প্রবাহিত হইত। কিংবদন্তী আছে,—কোনও দৈত্য গঙ্গাকে পদ্মার পথে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। পলমাটীকে ঐ দৈত্য মনে করিলে চলিতে পারে। ভৈরব পূর্ব্বকালে গঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছিল; ইহা অতি প্রকাণ্ড নদ ছিল। পদ্মা-জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা বাহির হইয়া ভৈরব-দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করিলে, ভৈরব মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। কোন্ সময়ে করতোয়া মাথাভাঙ্গা নামে ভৈরবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তাহা শুনা যায় না। এই সকল নদী হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বাহির হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিল। নদীয়া জেলায় বহুসংখ্যক গঙ্গা নদীর মৃত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোনও সময়ে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা করতোয়া বড় নদী ছিল। আর্য্য, পুরাণ-তন্ত্রাদিতে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা করতোয়ার উপরে অধিক

শকাব্দীতে টলেমি তাহার ভূ-বৃত্তান্ত লেখেন। 'পেরিপ্লুস' গ্রন্থে ও টলেমির পুস্তকে কিরাতের নামক গঙ্গেয় ও গাঙ্গি নামক সামুদ্রিক বন্দরের নাম আছে। কিরাতিয়া, বোধ হয় করতোয়া-তীরবর্ত্তী বঙ্গপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান। কিরাত জাতির—কিংবা করতোয়া নদীর—নাম কিরাতিয়া আর হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। আমার বোধ হয়, কিরাতেরা আসামপ্রদেশে কিরাতীয় রাজবংশপ্রবর্ত্তক হইয়াছিল। কিরাতীয় শব্দ হইতে ক্রমে উচ্চারণে কিরাত হইয়াছে। করতোয়া নদীর নামও, আমার বিবেচনায়, কিরাত-জাতির নাম হইতে হইয়াছে। পুরাণে আছে, গৌরী-বিবাহ-কালে, হর-কর-বিগলিত জলের হইতে করতোয়া নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। উহা হইতে কাহারও জন্ম হয়, তাহা বলা হয় নাই।

চীন পর্য্যটক হিউয়েন্‌সাং (চৈনিক নাম হেন্‌ৎসাং) ৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধনে উপনীত হন। (১) হিউয়েন্‌সাং পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নাম পুন-ফ-তন লিখিয়াছেন। হিউয়েনসাং-এর মতে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন গঙ্গাতীর হইতে ৬০০ লি অন্তর। ৬ লিতে ১ মাইল। কোন্ স্থান হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের দূরত্ব গণিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। হিউয়েন্‌সাংএর সময়ে উত্তর-বিহার বৃজি ও বৈশালী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উভয় রাজ্যই পুণ্ড্র-রাজ্যের পশ্চিম-সীমান্ত মহানন্দা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহানন্দার দক্ষিণে হিরণ্যপর্ব্বত রাজ্য ছিল; ইহার বর্ত্তমান নাম মুঙ্গের। তাই সময়ে চম্পারণ্য, সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম অঙ্গ-রাজ্যের অধীন ছিল। হিউয়েন্‌সাং লিখিয়াছেন,—"পুণ্ড্র-রাজ্যের পরিমাণ ৪০০০ লি; রাজধানীর পরিমাণ ২০ লি; রাজধানী ঘন-বসতি-সম্পন্ন। ভূমি সমতল, বালুকা ও কঙ্করময়; রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়; অপর্য্যাপ্ত কাঁঠাল জন্মে। জল-বায়ু মাতিশীতোষ্ণ। রাজধানীতে ২০টি সঙ্ঘারাম ধীরযানমতাবলম্বী ৩০০০ বৌদ্ধ-শ্রমণ বাস করে। এক শত হিন্দু-দেবালয় আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও কার্ত্তিকেয়-উপাসক অধিক ছিল। রাজধানীর ২০ লি পশ্চিমে একটি সঙ্ঘারাম, তাহার অদূরে একটি আশোক-স্তূপ ও একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।" বঙ্গ কামরূপ, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত রাজ্য সীমান্তে পাওয়ায় বুঝা যায় যে, তখন পুণ্ড্ররাজ্য খুব বড় ছিল না। পুণ্ড্ররাজ্যের পূর্ব্ব দিকে একটি বড় নদী পার হইলে কামরূপ রাজ্যে যাওয়া যায়। কামরূপে সে সময়ে ভাস্করবর্ম্মা নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। হিউয়েন্‌সাং সে সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের কোনও রাজার নাম করেন নাই। ইহাতে বোধ হয়, এই রাজ্য তৎকালে কান্যকুব্জ-রাজ হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। হিউয়েন্‌সাং সমতটের বিষয়ে লিখিয়াছেন,—"ইহার জলবায়ু কোমল; অধিবাসিগণের ব্যবহার মনোজ্ঞ। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায়, কষ্টসহিষ্ণু বিদ্যোৎসাহী।"

পুণ্ড্ররাজ্য দীর্ঘকাল মগধের প্রদ্যোতন, শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য, শুঙ্গ ও কণ্ব বংশীয়দের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রদ্যোতন-বংশ ১৩৮ বৎসর, শিশুনাগ-বংশ ৩৬২ বৎসর, নন্দ-বংশ ১০০ বৎসর। মগধে

(১) হিউয়েন্‌সাংএর মতে, গৌড়, বঙ্গ, হিরণ্যপর্ব্বত, চম্পা, কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন সমতট তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ—এই কয়েকটি রাজ্য বিভক্ত ছিল।

ভ্রাতৃত্ব করেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত কোটিবর্ষ নগরে বিখ্যাত গুপ্ত-কেশবী ভত্রপালের জন্ম হয়। ইনি ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন, দৈবক্রমে রাজবল করিয়া ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। ইহার পিতার নাম সোমবর্ম্মা, মাতার নাম সোমশ্রী। চন্দ্রগুপ্ত ভত্রপালকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। ৭৬ বৎসর বয়সে, মহীশূর-রাজ্যের অন্তর্গত হাসানপুর জেলায় শ্রাবণবেলা-গোলাস্থ ভদ্রবাহুর মৃত্যু হয়।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শাসনে লিখিত আছে,—তিনি সমতটজয়ী ছিলেন। সমতটজয়ীর সাম্রাজ্য যে পুণ্ড্রদেশকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। হূণদের কর্ত্তৃক গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বে, পুণ্ড্রবাসী তাঁহাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হইত। গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, ভারতবর্ষে কিয়ৎকাল কোনও সাম্রাজ্য ছিল না। তখন পুণ্ড্রবাসী কিয়ৎকালের জন্য স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল।

"কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের দেবসেন নামক রাজার কন্যা দুঃখলব্ধিকার স্বয়ংবরের কথা আছে। পুণ্ড্রদেশের স্থানে স্থানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, মহাক্ষত্রপস্বামী রুদ্রসেন প্রভৃতির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের তাম্রশাসনে পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চলের কান্তার ও রাজার নাম ব্যাঘ্র লিখিত আছে। কান্তারকে এখন কেয়ার বলে। মহাস্থানগড়ে মহেন্দ্রসিংহ পরাক্রমের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মুদ্রায় গুপ্তের নাম ক্ষোদিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, পুণ্ড্ররাজ্য তৃতীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মীনসার নামক আর একটি রাজার নাম পাওয়া যায়, ইনি গুপ্ত-সাম্রাজ্য-ধ্বংসকারী হূণজাতীয় লোক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

কোনও সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। সম্রাট অশোক মহাস্থানের নিকট একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ যে, বুদ্ধদেব এখানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসিয়াছিলেন। অশোকের ভ্রাতা বীতশোক পরিব্রাজক-বেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বাস করিতেন। কোনও সময়ে জৈনেরা বৌদ্ধদের অপমান করিয়াছিল বলিয়া অশোক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে অনুমতি দেন, এবং তাহাদের মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই ব্যাপারে সতর হাজার জৈনের প্রাণ যায়। পাণ্ডুয়ার গোপ-পল্লীর এক গোয়ালা জৈন-ভ্রমে বীতশোকের শিরশ্ছেদ করে। এই অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু, প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সমাজ পদ্ম-বঙ্গকে হীনচক্ষে দেখিতেন।

শীলবর্ষে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। বগুড়ার সন্নিহিত নাগর ও করতোয়ার বর্ত্তমান স্থানের প্রাচীন নাম শীলবর্ষ। অনেক প্রাচীন তাম্রশাসনে এই স্থানের শেলবর্ষ নাম দৃষ্ট হয়,—ইহা শীলবর্ষ নামেরই অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে কোনও সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ গুজরাটে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের ৮৫৪ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে আছে,—তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে সমাগত কৌশিক-গোত্রীয় শেলবর্ষীয়কিককে লেহগ্রাম দান করেন।

পুণ্ড্র-রাজ্যের অন্তর্গত পাটনাচণ্ডী ও চণ্ডীপুরের বণচণ্ডীর নাম পুরাণে দৃষ্ট হয়। পাটনাচণ্ডী এখন পাতালচণ্ডী নামে প্রথিত। (১) বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে, চণ্ডীপুর একটি পীঠস্থান; এখানে প্রচণ্ডা দেবী বিরাজ করেন। যথা,—"চণ্ডীপুরে প্রচণ্ডা চ চণ্ডা চণ্ডবতী শিবা" (বৃহন্নীলতন্ত্র, ৫ম পটল)। "প্রেমাবলী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থেও চণ্ডীপুরের নাম পাওয়া যায়। পুণ্ড্ররাজ্যের মধ্যে (এখন দিনাজপুর জেলায়) ধীবরদীঘী নামক একটি প্রকাণ্ড জলাশয় দৃষ্ট হয়; উহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বার শত ফুট। প্রবাদ যে, এখানে এক জন ধীবর রাজা রাজত্ব করিতেন। এই দীঘীর ভিতরে প্রায় তিন শত গজ-পরিমিত দীর্ঘ একটি প্রস্তর-স্তম্ভ প্রোথিত আছে। নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিয়া অনেকে উহাকে অশোক-স্তম্ভ বলিয়া অনুমান করেন। কোনও সময়ে পুণ্ড্র-রাজ্য যে অশোকের সাম্রাজ্যের অধীন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিউএন্‌সাংএর পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত গৌড় ও পাণ্ডুয়ার অধিপতি ছিলেন। লিখিত আছে, রাজা শশাঙ্ক গ্রহ-বৈগুণ্য হেতু ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া তাহার শান্তির জন্য সরযূতীরস্থ বাল্মীকি-সমাজ হইতে বিষ্ণু, সনাতন, সুবজ্ঞ, শঙ্কর, দেবধর, হুশর্ম্মা, বাসুদেব, প্রজাপতি, চতুর্ভুজ, লৌকেশ, চক্রপাণি ও মাধব, এই দশ জন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে গৌড়মণ্ডলে আনয়ন করেন। হিউএন্‌সাং শশাঙ্কের নাম কী-লো-না-সু-না-লা-না বলিয়াছেন। যখন তিনি কর্ণসুবর্ণে গমন করেন, তখন তথায় লো-টো-বী চি বা রক্তমৃত্তি নামক সঙ্ঘারামে বাস করেন। তখন এই রাজ্যে দশটি সঙ্ঘারামে দুই হাজার শ্রমণ বাস করিতেন। পঞ্চাশটি হিন্দু-দেবালয় ছিল। রাজ্যের অধিকাংশ লোক

(১) পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের ৫১৩ অধ্যায়ে ১০৮টি প্রধান তীর্থের নাম আছে। তাহার পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পাটলিতীর্থের নাম উক্ত হইয়াছে,—"বিপাশায়াং বিপাশে পাটলে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। রাজধানী প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত ও রাজ্যের পরিধি সেড় শত ক্রোশ ছিল। রাজধানীতে বুদ্ধদেবের আর্য্যীয় দেবদত্তের অনুযায়ী-দের তিনটি সঙ্ঘারাম ছিল। কর্ণসুবর্ণে কোনও রাজা এক জন দক্ষিণাপথবাসী পণ্ডিতের প্রার্থনায়, রক্তভিত্তি সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন। এখানে অশোক-স্তূপও ছিল। বুদ্ধদেব এখানে আসিয়া সাত দিন ধর্ম্মপ্রচার করেন,—লোকে এইরূপ বলিত।

শশাঙ্কের সহিত মালব-রাজের মিত্রতা ছিল। মালবরাজ বিদ্রোহী হইয়া কান্যকুব্জেশ্বর গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করেন। গ্রহবর্ম্মা থানীশ্বরাধিপতি রাজ্য-বর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মালব-রাজ রাজশ্রীকে কারারুদ্ধ করেন। রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া মালবপতির শাসন করেন। রাজ্যবর্দ্ধন মালবপতিকে পরাজিত করিলে, শশাঙ্ক নরেন্দ্র রাজ্যবর্দ্ধনকে স্ব-শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিহত করেন, (৬০৬ খৃঃ) এবং কান্যকুব্জ অধিকারপূর্ব্বক রাজ্যশ্রীকে গৌড়ে আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। ভণ্ড নামক কোনও ব্যক্তির সাহায্যে রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে পলায়ন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন কনোজ অধিকার করিয়া, ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধের জন্য, কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ ও অধিকার করেন।(১) হর্ষবর্দ্ধন গৌড়ে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ জয়ার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রদেশ অধিকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু উত্তর-ভারতের সমুদয় স্থান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।(২) মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী নামক স্থানে কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখন রাঙ্গামাটীর অধিকাংশ ভাগী-

---

(১) এ পর্য্যন্ত মহারাজাধিরাজ নরেন্দ্রগুপ্তের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি রোহিতাশগড় বা রোটাসগড়ের পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত আছে। অপরটি মাদারাসের গঞ্জাম জেলায় পাওয়া গিয়াছে। ইহা মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের সামন্ত মহারাজ সৈন্যভীতের নিয়মক লিপি। ইহা তিন শত ওপ্তাব্দে, অর্থাৎ ৬১৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হয়। সুতরাং জানা যাই ৬১৯ খৃষ্টাব্দেও শশাঙ্কের রাজ্য যায় নাই। হর্ষবর্দ্ধন ১৩ বৎসর চেষ্টা করিয়াও শশাঙ্ককে প-করিতে পারেন নাই।

(২) হর্ষবর্দ্ধনের পর, পাল-বংশ-গৌড় প্রভৃতি মগধরাজ্য আদিত্যসেনের অধীন হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিব্বতীয়গণ বঙ্গ ও মগধ আক্রমণ করে।

মধ্যে-মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। রাজবাড়ী-ডাঙ্গা, রাক্ষসীডাঙ্গা, সন্ন্যাসীডাঙ্গা, ঠাকুরবাড়ী-ডাঙ্গা প্রভৃতি কর্ণসুবর্ণের সমৃদ্ধির সাক্ষ্যদান করিতেছে। রাক্ষসী-ডাঙ্গা, বোধ হয়, অশোক-স্তূপের ভগ্নাবশেষ। গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ কত কাল ও কিরূপে রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না। ইহার পর, গৌড়ে শূর বংশের অভ্যুদয় আরব্ধ হয়। কর্ণসুবর্ণের ইষ্টকস্তূপময় ভূমিতে রবিগুপ্ত, জয়দ্বাবাক্ষ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, ক্রমাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি রাজগণের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

কোনও সময়ে পুণ্ড্র-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষরূপ প্রচার হইয়াছিল। এখনও অনেক স্থানে ভগ্ন বৌদ্ধমূর্ত্তিসমূহ পতিত রহিয়াছে। মাধাইপুরের কাছারীর উত্তরের প্রান্তরে বটবৃক্ষমূলে বিস্তর বৌদ্ধমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া মাধাইপুরের কালী-মন্দিরকে কোনও বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীর মন্দির বলিয়া বোধ হয়। এখন সে প্রাচীন মন্দির নাই; হিন্দুরা ইহার স্থানে কালী-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পাণ্ডুয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মাধাই-পুরের দিকের পশ্চিম-পার্শ্ব দিয়া মাঁড়গা, মাধাইপুর, ভটরা, শালিন্দুর প্রভৃতি ঘন-বসতিসম্পন্ন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। মাধাইপুর অতি বিখ্যাত স্থান ছিল। মাধাইপুরকে কখনও কখনও মাধাইসিংহের গড় বলা হয়। মাধাইসিংহ, বোধ হয়, পাণ্ডুয়ার কোনও রাজার সামন্ত বা দুর্গপাল ছিলেন।

পাণ্ডুয়ার পার্শ্বদেশে আইহোরাণী বা অহিহোরাণীর বেদী। আইহো রাণী এখন হিন্দু-দেবী। এ দেশের বহিলাগণ সৌভাগ্য-কামনায় এই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। লোকে বলে,—পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ যুবা পত্নী সহ শ্বশুরালয়ে নিজের বাড়ীতে যাইতেছিলেন; এই স্থানে উপস্থিত হইলে পিপাসার্ত্ত হন। পত্নী ও শিবিকা-বাহকগণকে রাখিয়া, তিনি জলান্বেষণে গমন করেন। এমন সময়ে পাণ্ডুয়ার এক রাজকুমার বেশ, ছেট ও কোদালি লইয়া সেই স্থানে উপনীত হন এবং ব্রাহ্মণ-পত্নীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার প্রতি বল প্রকাশে উদ্যত হন। শিবিকা-বাহকগণ পলায়ন করে। অগত্যা ব্রাহ্মণ-কামিনী ঐ শিবিকার প্রাচীর খোঁড়া হইতে ভগবতীর আবির্ভাব হয়; তিনি দুরাত্মগণের বিনাশ করেন। তদবধি এতদঞ্চলে ভগবতী আইহোরাণীর আরাধনা-প্রচার হইয়াছে।

যে বংশ, সকল,—পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ইক্ষ্বাকুবংশের উৎপত্তির মূল অনুসন্ধান

[illegible] পুত্রসন্তান [illegible] [illegible] [illegible]

রাঢ়ীয়-কৌণ্ডিন্যের মতে	৯১৪ শাকে	ব্রাহ্মণেরা গৌড়রাজ্যে	আগমন করেন।
ভক্ত-বংশমালা	৮০৪ „	„	„
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের	৮৮৬ „	„	„
কিতীশবংশাবলী	৯৯৯ „	„	„
রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যদের	৯৫৪ „	„	„

যথা,—"বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।" বৈদিক-কুলাচার্য্যদের, ৬৫৪ শাকে ব্রাহ্মণেরা গৌড়রাজ্যে আগমন করেন, বারেন্দ্র-পত্রিকামতে "শাকে বেদকলঙ্কবট্‌কবিমিতে" ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আগমন করেন। অনুমিত হয়, "বেদবাণাঙ্কশাকে তু-গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" পাঠটি ভ্রম-দূষিত, "বেদবাণাঙ্কশাকে তু-" হইবে; বারেন্দ্রকুল-পত্রিকার "শাকে বেদকলঙ্কবট্‌কবিমিতে"র স্থানে "শাকে বেদকলঙ্কবট্‌কবিমিতে" পাঠ হইবে। এইরূপ হইলে, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিককুলাচার্য্যদের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নকাল-সম্বন্ধে ঐকমত্য হয়। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিতে পারি যে, ৬৫৪ শাকে (৭৩২ খৃষ্টাব্দে) পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আনীত হইয়াছিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নামের সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক মত এই যে, ইঁহাদের নাম যথাক্রমে,—ক্ষিতীশ, ভিষিমেধা বা মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি। অন্য মত এই যে, ইঁহাদের পুত্রগণ আগমন করেন। ইঁহাদের নাম ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দর ও বেদগর্ভ। শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ-গোত্রীয়, দক্ষ কাশ্যপ-গোত্রীয়, বেদগর্ভ সাবর্ণ-গোত্রীয়, ভট্টনারায়ণ সাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ও ছান্দর বাৎস্য-গোত্রীয়। আদিশূর ইঁহাদের বসতির জন্য পঞ্চগ্রাম প্রদান করেন। "দক্ষকুল-নির্ণয়"কার বলেন,—শ্রীহর্ষকে ক্ষত্রগ্রাম প্রদান করা হয়; উহা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। অগ্রদ্বীপে শ্রীহর্ষের তীর্থবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল। দক্ষকে শাকটগ্রাম প্রদান করা হয়, উহা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। ভট্টনারায়ণের তীর্থবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল। ভট্টিপুর মালদহ জেলায় অবস্থিত; পোটীর নাম ভীমপুর। বেদগর্ভকে বটগ্রাম প্রদান করেন, উহা [illegible] জেলায় অবস্থিত। গুপ্ত-রাজত্বে বেদগর্ভের তীর্থবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল; গুপ্তপল্লীর বর্ত্তমান নাম গুড়িয়াড়া। ভট্টনারায়ণকে পঞ্চকোটিগ্রাম প্রদান করেন; উহা মানভূমের পঞ্চকোট। কাঁসাইতটে ভট্টনারায়ণের তীর্থবাস ও চতুষ্পাঠী ছিল। ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আদিগাঞী ভট্ট,

[illegible] [illegible] [illegible] [

বরেন্দ্রভূমের রাজত্বকালে পুণ্ড্রদেশের বরেন্দ্রদেশ নাম হয়। (১) পাল-বংশীয় রাজগণ পুণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিলে, পূরবংশীয়গণ দক্ষিণে গিয়া অন্য একটি পুণ্ড্রনগরের পত্তন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই নগর হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহিত রাঢ়দেশে গমন করিলেন; অনেকে বরেন্দ্রদেশেই থাকিলেন। যাঁহারা রাঢ়ে গমন করিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয়, এবং যাঁহারা বরেন্দ্রদেশেই থাকিলেন, তাঁহাদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আখ্যা হইল। দেশ-ভেদে এই নাম-ভেদ হইল; বাস্তবিক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ একই মূল হইতে উৎপন্ন। সে সময়ে, বোধ হয়, শূর-বংশীয় রাজগণের পক্ষে ও পাল-বংশীয় রাজগণের পক্ষে দুইটি দল হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা শূর-বংশীয়দের পক্ষে ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা পাল-রাজগণের পক্ষে ছিলেন। ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম প্রদান করেন; তাহা হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ছাপ্পান্ন গাঁই-এর উদ্ভব হয়।

মাধবাচার্য্যের "শঙ্করদিগ্বিজয়ে"র মতে, শঙ্করাচার্য্য অঙ্গ, বঙ্গ ও গৌড়দেশীয় পণ্ডিতদিগকে তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করেন। সম্ভবতঃ শূর-বংশীয়দের রাজত্বকালেই এই ঘটনা হয়। পাল-বংশীয়গণ গৌড় অধিকার করিলেও, শূর-বংশীয়গণ বহু দিন দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ রাঢ় ও বরেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, যে সকল ব্রাহ্মণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে এ দেশে আগমন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে প্রথিত হন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদচর্চ্চা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। নবাগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদ-চর্চ্চা ছিল; তজ্জন্য, ইঁহাদের বৈদিক সংজ্ঞা হয়। এই ব্রাহ্মণেরা পাল ও সেন-বংশের রাজত্ব-কালে ভূমিদান পান। এক এক দল এক এক সময়ে আসিয়া যে যে গ্রামে বাস করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে তাঁহাদের সমাজের নাম হয়। আদিশূর যখন পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তখন এ দেশে সাত শত

---

১ এই মতটি সর্ব্ববাদিসম্মত নয়। কূর্ম্মপুরাণের কূর্ম্মচক্রে আছে—"প্রাচ্যাং মগধ চ বারেন্দ্রী গৌড়নাটকাঃ বর্দ্ধমান-তমোলিপ্ত-প্রাগ্‌জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ আগ্নেয়্যাং সোপস্থা-ত্রৈপুরকোশলাঃ।" ইতি ভার্গবভাষ্যোক্তিস্তত্রান্তর্ভবতি কূর্ম্মচক্রম্। কূর্ম্মপুরাণ নিতান্ত আধুনিক নয় উহা পূর্ব্ববংশের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। অতএব বারেন্দ্র, গৌড়, রাঢ়, বর্দ্ধমান, তমোলিপ্ত, উদয়াদ্রি, বঙ্গ, ত্রৈপুর প্রভৃতি যে পূর্ব্বকালে পুণ্ড্রের অন্তর্গত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এরূপ জানা যায়। তাঁহাদিগকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রধান করা হয়। ইহাদের অনেকে বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। সুখ্যবর্জনের নিকট পুণ্ড্রক নামক স্থানে বহুসংখ্যক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা চিকিৎসা-বিদ্যায় ও বিশেষতঃ অস্ত্রচিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ প্রথমে বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিতেন। তাঁহারা যে স্থানে বাস করিতেন, পরে তাহার সপ্তশতিকা (সাতসইকা) পরগণা নাম হয়।

সুর-বংশীয়দের রাজত্বকালে আমাদি বা আমাই প্রকাণ্ড নগর ছিল। ইহা ও ইহার নিকটবর্ত্তী ঘোগীলুকা, পাহাড়পুর প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয়, এ সমুদয় একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঘটনায়, কোত্তলালী, দেবতলা, এই রাজত্বকালে বড় নগর ছিল। দিনাজপুর হইতে বগুড়া যাইবার পথের ধারে কোত্তলাল অবস্থিত; এখনও ইহাতে কতিপয় হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে।

তিস্তা, আত্রেয়ী, যমুনা, করতোয়া, পুনর্ভবা, তমল, মহানন্দা, ধর্ম্মরা, নাগর ও নাগদ,—এই রাজ্যের প্রধান নদ নদী ছিল। তিস্তা তিন বার নিজের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে; নিজের পূর্ব্ব পথ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। তিস্তা শব্দ হইতে ত্রিস্রোতা হইয়াছে; তিব্বতীয় বর্ম্মজ ভাষায় তি ও তি শব্দের অর্থ জল। পূর্ব্বে তিস্তার জলে পরিপুষ্ট আত্রেয়ী এখন সামান্য নদী। আত্রেয়ী স্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে পড়িত; এখনও দক্ষিণ বঙ্গে আত্রেয়ী নামক একটি নদী দেখা যায়। করতোয়া-তীরস্থ মহাস্থানে একটি দুর্গ ছিল। পুনর্ভবা-নদীতীরস্থ দেবকোট এককালে নগর ছিল; দেবভূতি নামক রাজা এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে এক জন রাজা রাজত্ব করিতেন। শূরবংশ এখন বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

যে সময়ে শূরবংশ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব আরম্ভ করেন, তাহার কিছি হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গ-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশের রাজা খড়্গোদ্যমের তাম্রশাসন আমবফপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খড়্গোদ্যমের পুত্র জাতখড়্গ ও জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গের নাম পাওয়া গিয়াছে। খড়্গবংশের রাজ্য পরে শূরবংশের অধিকৃত হয়। ইহার পর পালবংশীয়গণ বঙ্গদেশ অধিকার করেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

"দাঠাবংসো।" (ধর্ম, ধরমী)

—:০:—

[সিংহলে বুদ্ধদেবের দন্ত-পূজা-বিষয়ক ইতিবৃত্ত।]

বিদেহরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবি রাজগণ, কপিলবস্তুর শাক্য-সমূহ ও অন্যান্যপর ব্যক্তিবর্গ বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণলাভের পর তদীয় দাহের ভস্মাবশিষ্ট দন্ত প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক তদুপরি স্তূপাদি নির্ম্মাণ করাইয়া মহাপূজা ও মহোৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। (১) বুদ্ধদেবের অভাবে বৌদ্ধগণ তাঁহার দন্ত, কেশ প্রভৃতিকেই তাঁহার স্থানে স্থাপিত করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করে। সিংহলে কখন কি প্রকারে এই দন্তধাতু-পূজা প্রচলিত হয়, "দাঠাবংসো" (দংষ্ট্রাবংশ) নামক পালি-গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল ও মনোরম। সিংহলে এই গ্রন্থ অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিখিত হইয়াছে। এই সকল বর্ণিত ঘটনা বিনয়-পিটকের 'মহাবগ্গ' ও 'মহাপরিনির্ব্বানসুত্ত' হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। মহাপরিনির্ব্বানসুত্তের কথা গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন (২।৩৮)। এই গ্রন্থখানিকে ঠিক ইতিবৃত্ত বলা চলে না; অনেক অদ্ভুত কথা আছে, যাহা সর্ব্বতন্ত্র হিতোপদেশের ন্যায় অবিশ্বাস্য। তথাপি এই সমস্ত বর্জ্জনীয় অংশ পরিত্যাগ করিলে সিংহলে দন্ত-পূজা-প্রবর্ত্তনের একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে পারা যায়। নিম্নে গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া মূল গ্রন্থের সম্পূর্ণ বিবরণ নাতিসংক্ষিপ্ত ও নাতিবিস্তৃত ভাবে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে।

'দাঠাবংসো'র রচয়িতার নাম ধর্ম্মকীর্ত্তি। তিনি নিজের সম্বন্ধে যৎসামান্য বলিয়াছেন,—

কাশ্যপনগর' বংশালঙ্কার (২) পরাক্রম নামক মহীপতি 'পরাক্রান্তিভূজে'র

---

(১) মহাপরিনির্ব্বানসুত্ত; ৬।৫১-৭২,

(২) সিংহলের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য-গ্রন্থ। মহাবংশে ইহা বর্ণিত আছে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রজ্ঞাকর গুপ্তের প্রমাণবার্তিকালঙ্কার টীকা রচনা করেন। সিংহসেন পরার্থানুমানবাদ নামক গ্রন্থগুলির মধ্যে তিনি প্রথম টীকা রচনা করেন। প্রথম পরাক্রমশাহ খৃষ্টীয় ১১৫৬ অব্দ, অর্থাৎ বি ১২৩৩ অব্দে রাজত্ব করেন। অতএব গ্রন্থকার ধর্মকীর্তিও ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি যে সন্তিপুরুষকে নিজের গুরু-রূপে উল্লেখ করিয়া গেছেন, তিনি ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের শিষ্য নহেন; তিনিও প্রথম পরাক্রমশাহের সময়ে বর্তমান ছিলেন। ধর্মকীর্তি পরাক্রমবাহুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

যে ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দুর রচয়িতা, যিনি দিঙ্‌নাগাচার্যের 'প্রমাণসমুচ্চয়ে'র বিবৃতি, প্রমাণবার্তিক, প্রমাণবিনিশ্চয় ও সম্বন্ধপরীক্ষা নামক তর্ক-গ্রন্থ সমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া বহু পরিচয় পাওয়া যায়, (৮) যিনি তিন নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তার্কিকের পর তর্কশাস্ত্রের উন্নতি করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার কৃত গ্রন্থ Wu-hing প্রভৃতি করিয়াছিলেন বলিয়া চীন পরিব্রাজক ইৎসিং বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, (৯) তিনি আমাদের এই 'নাগার্জুন-কার' ধর্মকীর্তি হইতে ভিন্ন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কেন না, ন্যায়বিন্দু-কার ধর্মকীর্তি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৫-৬৫০) 'নাগার্জুন-কার' ধর্মকীর্তি দ্বাদশ শতাব্দীতে (১১৫৩) বর্তমান ছিলেন।

কুবলয়াবলী, পার্থসারথিভট্ট ও সদুক্তিকর্ণামৃত নামক কাব্য-গ্রন্থসমূহে এক-সময়ে 'ধর্মকীর্তি' ও 'ভদন্ত ধর্মকীর্তির' নামে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতে "নাদরবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহঃ" ইত্যাদি যে শ্লোকটি ধর্মকীর্তির নামে উদ্ধৃত, সাহিত্যদর্পণ-ধৃত [illegible] পরিচ্ছেদ, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক জ্ঞানেন্দ্রদর্শন স্বকীয় 'ন্যাসালোকে' (৭ম নিয়োগ) "অকর্মকপ্রবিভাগে ন খলিদং, ভোগে মনস্ খাদতঃ, ..." ইত্যাদি শ্লোক ধর্মকীর্তির নামেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ [illegible] তাঁহার ঔচিত্যবিচারচর্চার (কাব্যমালা, ১১:৭ পৃঃ) ধর্মকীর্তি

(৮) Vide K. B. Pathak's article on the authorship of Nyayabindu in the Journal of the Bombay Branch of R. A. S. 1894, vol. xx. No. [illegible], p. [illegible]; also G. A. Jacob's Note on the authorship of Nyayabindu in the Journal of the R. A. S. April 1896, pp. 361-362.

(৯) Vide Julien's A Record of the Buddhist Religion, by I-tsing, pp. [illegible], 172.

এ স্থলে এ বিষয়ের আর অধিক আলোচনা না করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। পাঠকগণ অবলোকন করুন, দার্জিলিং যে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোনও সময়ে ভগবান্ বুদ্ধ 'অমর' নগরীতে কোনও ধনী ব্রাহ্মণের বংশে 'সুমেধ' নামে অবতীর্ণ হইয়া জন্ম-জরা-মৃত্যুর অনতিক্রমণীয় কোনও কারণ-গণের অন্বেষণ করিবেন বলিয়া চিন্তা করেন। অনন্তর কয়েকবার বাক্তিবিশেষে বিবিধ ধন-ধান্য সম্পদ প্রদান করিয়া ও নিখিল বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের সন্নিহিত 'ধার্ম্মিক' নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন; তিনি তত্রত্য আশ্রমে তপস্যা-সাধনে প্রবোচিত ধ্যান সুখ লাভ করেন।

এক দিন সুমেধ 'ভগবদ্ভেয়োদবিপারঙ্গমী' ভগবান্ দীপঙ্কর বুদ্ধকে আগমন করিতে দেখিয়া পথিমধ্যস্থিত পঙ্কের উপর নিজের অস্থিরদেহই সেতু-রূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া শুইয়া পড়িলেন,—যাহাতে সত্বর ভগবান্ দীপঙ্কর বুদ্ধ কর্দ্দম স্পর্শ না করিয়াই ঐ পঙ্ক উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মহর্ষি দীপঙ্কর তাঁহার ঐ অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ সিদ্ধিলাভের উল্লেখ করিলেন; এবং তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলে সুমেধ পুনর্ব্বার ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (জাতক, ১ম খণ্ড, সুমেধ-কথা) অতঃপর তিনি বহুকল্প ও বহুকাল যাবৎ বোধি (জ্ঞান)-প্রাপ্তির বিবিধ উপায় অনুষ্ঠান করিয়া 'তুষিত' লোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে সে স্থান হইতে অবতরণ করিয়া 'কপিলপুর' (কপিলবস্তু) শাক্যকুলপতি শুদ্ধোদনের মহিষী মহামায়ার উদরে সিদ্ধার্থ নামে উৎপন্ন হন।

সিদ্ধার্থ একদা উদ্যান-পথে যথাক্রমে এক একটি জরাজীর্ণ, আতুর, মৃত ও প্রব্রজিত লোককে দেখিতে পাইয়া সংসারে নীরাগ হইয়া উঠেন; এবং তিনি 'কণ্ঠক' নামক স্বীয় অশ্বারোহণে প্রিয় 'ছন্দক'-নামধেয় সারথির সহিত রাজপুরী অতিক্রম করিয়া মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন। পরে তিনি 'অনোমা' নদীর (শাক্য-রাজ্যের পশ্চিম সীমা, যুক্তাক্ষল-ধৌত সিকতাসুন্দর তটদেশে উপস্থিত হইয়া, অশ্ব ও সারথি দ্বারা স্বীয় কৈশবন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার উষ্ণীষ ও অসি নিক্ষেপ করেন; তদনন্তর তাঁহা সুবর্ণ 'সংঘাটি' (সঙ্ঘাটি, কৌটা, চোগা) দ্বারা কায়া, কাষায় বস্ত্রে 'চূড়াযষ্টি' নামে এক কেশ নির্ম্মাণ করিলেন। তদনন্তর সিদ্ধার্থ ঘটোদ্ভবযোনি (ব্রহ্মা, কমণ্ডলু অর্থে) উপকরণাদি ধারণ করিয়া পূর্ব্ব-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] নামক [illegible] [illegible] [illegible]

এবং [illegible] বুদ্ধদেব [illegible] ঐ সম্বন্ধের মীমাংসার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া, যুদ্ধের নিবারণার্থ, (৩) নাগদ্বীপে গমন করেন। তিনি যে তিন লম্ফ-দ্বীপে উপস্থিত হন, তাহা তাঁহার বোধিলাভের পঞ্চম বর্ষে চৈত্র মাসের অমাবস্যায় উৎসর্গ দিবস। তিনি তাহাদের বিবাদ-ভঞ্জন-প্রসঙ্গে বহু নাগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বোধিলাভের অষ্টম বর্ষে বৈশাখ-পূর্ণিমায় 'নন্দ-উপনন্দ' নামক নাগেন্দ্র দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাহার গৃহে পঞ্চ শত ভিক্ষুর সহিত গমন করেন। তিনি সেখানে 'কল্যাণচিত্ত' সমীপে মহাই আসনে উপবেশন করিলে, নাগেন্দ্র তাঁহাকে দিব্য ভোজ্যে সন্তৃপ্ত করিলেন। বুদ্ধদেব সে স্থানে ধর্ম্ম-দেশনা করিয়া 'সুদর্শনকূটে' নিজের চরণচিহ্ন প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি বহু চেষ্টা সম্পন্ন করিয়া বোধিলাভের পর ৪৫ বৎসর জীবনধারণ করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ-সূত্রাদি উপদেশ প্রদান করিয়া, ভবসাগর হইতে অসংখ্য লোককে উদ্ধার করিয়া, মল্ল রাজগণের কুশীনারা নগরে, শালকুঞ্জে, শালবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে, মহাই মঞ্চে উত্তরশীর্ষে সিংহ-শয্যায় শয়ন করিয়া, বৈশাখী-পূর্ণিমার প্রথম প্রহরে দেবরাজগণকে, মধ্যম প্রহরে সুভদ্রকে ও পশ্চিম প্রহরে ভিক্ষুগণকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া, প্রত্যূষে ধ্যান-সমাপত্তিতে বিহার করিতে করিতে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে অনাবৃত বস্ত্র ও কার্পাস-তূল দ্বারা পঞ্চাশবার বেষ্টনপূর্ব্বক তৈল-পূর্ণ সুবর্ণদ্রোণীতে নিক্ষেপ করিয়া মল্ল রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ [illegible] হস্ত উচ্চ চন্দন দারুময় চিতা উপর স্থাপন করিলেন। তখন মহাকাশ্যপ স্থবিরাজকে (বুদ্ধকে) বন্দনা করিলে চিতায় অগ্নি জ্বলিবে না—দেবতাদের এই ইচ্ছা হেতু, মল্ল-রাজগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হন নাই। মহাকাশ্যপ স্থবিরের ইচ্ছায় বুদ্ধদেবের চরণযুগল বস্ত্র ও চিতা ভেদ করিয়া বহির্গত হইল; এবং তাঁহার বন্দনা শেষ হইলে, আবার যথাস্থানে চলিয়া গেল। চিতায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইল; কিন্তু বুদ্ধদেবের ইচ্ছায় তাহাতে

(৩) নাগদ্বীপ সম্বন্ধে কুমার স্বামী বলেন,—"Some islands near Jaffna [illegible] north of Ceylon are yet called Nagadipa, whose temples are dedicated to a *Naga Thampiran* or Snake-god. The images worshipped in [illegible] are those of Sankha. Nagadipa is, however, supposed to be an island near *Pavanthen*.

...ার ক্রমে ভাগ্যের ন... চক্রে ... ...

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক সকলের হৃদয়ে আনন্দোদয় করুক।' দন্তধাতু তৎক্ষণাৎ আকাশে উত্থিত হইয়া সকলকে নিঃসন্দেহ করিল। নিগ্রন্থগণ পাণ্ডু নরপতিকে বলিয়া উঠিলেন, 'মহারাজ! ইহা শ্রেষ্ঠি-পুত্রের বিদ্যার বল, দন্তধাতুর প্রভাব নহে।" নরপতি কহিলেন, 'সুভদ্র! তুমি অপর কোনও প্রভাব প্রদর্শন কর, যাহাতে সকলেরই ঐ দন্তধাতুর প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে।' সুভদ্র বুদ্ধের অদ্ভুত চরিত্র চিন্তা করিতে করিতে দন্তধাতুকে জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিল। তাহা রাজহংসীর ন্যায় উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিয়া দর্শকবৃন্দকে আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত করিয়া ফেলিল। অনন্তর পরিষধ্যে গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে দন্তধাতু নিক্ষিপ্ত হইল, এবং মৃত্তিকায় সেই গর্ত্ত পূর্ণ হইল; কতকগুলি হস্তী তাহা পদদলিত করিল, সেই ভূমি সহসা বিদীর্ণ হইয়া মণিময় কর্ণিকাযুত কাঞ্চন-পত্রশোভিত রৌপ্যকেশরমণ্ডিত ভাস্কর চক্রপ্রমাণ একটি পদ্ম উদ্গত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে দিগ্মণ্ডল প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া বুদ্ধদন্তধাতু সেই পদ্মের উপর পরিদৃষ্ট হইল। সমবেত জনগণ তদুপরি বস্ত্র ও আবরণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সাধুবাদে নগর পুণ্যময় করিয়া তুলিল।

কিন্তু সেই তীর্থিকগণ নরপতিকে ঐ ঘটনা বঞ্চনাকল্প বুঝাইয়া দন্ত-ধাতুকে এক আমধ্য পরিখা-মধ্যে নিক্ষেপ করিল। পরিখা তৎক্ষণাৎ হংস-মধুকরাদি-মুখরিত, কমল-পরিশোভিত সরোবরের ন্যায় হইয়া উঠিল। নরগণ এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া নরপতিকে নিবেদন করিল যে, যে ব্যক্তি মুনিপুঙ্গবের এতাদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ না হয়, তাহার প্রত্যয় প্রয়োজন কি? নৃপতি তাহাতে নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া দন্তধাতুর সৎকারে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি বিবিধ প্রকারে বুদ্ধদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজ মস্তকে দন্তধাতু স্থাপন করিলেন, এবং তদবস্থায় সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া মহোৎসবের সহিত অন্তঃপুরে (নগরাভ্যন্তরে) মহার্ঘ আসনে তাহা রক্ষা করিলেন। বিবিধ প্রকারে দন্তধাতুর পূজা হইতে লাগিল। মহীপতি তজ্জন্য এক বিবিধ-রত্ন-চিত্রিত মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন ও গুহসীবকে নিজের ন্যায় সম্মান প্রদান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অতঃপর পাণ্ডু যথোচিত রাজধর্ম্ম পালন করিতে আসিলে 'ক্ষীরধার' নৃপতি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে ক্ষীরধার পরাজিত হন।

পাণ্ডু রাজ্যভার নিজ পুত্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া গুহসীবকে দন্তধাতু প্রদান করিয়ে, তিনি স্বরাষ্ট্রে গমন করিলেন। পরে বহুকাল সাধন অন্তে করিয়া পাণ্ডু মহীপতি পরলোকে দেবসমাজে নিত্যস্থান লাভ করিলেন।

অনন্তর একদা উজ্জয়িনী-রাজকুমার 'দন্ত' কলিঙ্গাধিপতি গুহসীবের নগরে তাঁহার পণ্ডিত অষ্টাহকাল বিবিধ মহোৎসবে দন্তধাতুর বন্দনা করেন। গুহসীবের 'হেমমালা' নামে একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি কুমার দন্তকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া পরমাদরে তাঁহার সহিত হেমমালার বিবাহ দিয়া তাহাকে দন্তধাতুর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া যথাশক্তি বিনয় দান করিলেন।

ক্ষীরধার নৃপতি রণাঙ্গনে নিপতিত হইলে তদীয় ভাগিনেয় কুমারগুপ্ত বিপুল ধন সংগ্রহ করিয়া দন্তধাতু গ্রহণের জন্য নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং সংবাদ প্রেরণ করিলেন, "হয় বুদ্ধের দন্তধাতু অর্পণ কর, নয় 'শরগ্রী জননী' সংগ্রাম দেহি কর।" গুহসীব মন্ত্রণা করিলেন যে, তাঁহার দেহে প্রাণ থাকিতে দন্তধাতু অর্পণ করিবেন না; এবং কুমার দন্তকে বলিলেন যে, তিনি যেন ব্রাহ্মণের বেশে সমুদ্র পার হইয়া সিংহলে ঐ দন্তধাতু স্থাপন করেন। কুমার উত্তর করিলেন যে, সেখানে তাঁহাদের কাহারও কোনও বন্ধু, বা 'জিনচরণরবোজে' ভক্তিমান্ লোক নাই; অতএব জলনিধির পর পার ক্ষুদ্র দেশ সিংহলে কি প্রকারে তিনি দন্তধাতু লইয়া যাইতে পারেন। গুহসীব উত্তর করিলেন যে, সিংহলে বুদ্ধের শরীরধাতু পূর্ব্বেই রক্ষিত আছে, বুদ্ধের ভবভয়হারী ধর্ম্ম সেখানে বর্ত্তমান, এবং বহু ভিক্ষুসঙ্ঘ সেখানে বাস করিয়া থাকেন। সেখানে রাজা মহানাম পরম বৌদ্ধ ও অমাত্য অত্যন্ত ভাগ্যবান্। তিনি দন্তধাতুর যথোচিত সৎকার করিবেন। কুমার এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে যথোক্তরূপে দন্তধাতু গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিয়া দক্ষিণ দেশে আগমন করিলেন; এবং মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া বালুকাস্তূপে তাহা প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর নগরে পুনরায় গমন করিয়া স্ত্রীকেও গুপ্তবেশে সেই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক তথায়ই বাস করিয়া দন্তধাতুর পূজা করিতে লাগিলেন।

সহসা আকাশমার্গে যাইতে যাইতে কোনও মুনি সেই স্থানে ধাতুর অভিনব কিরণধারা নির্গত হইতে দেখিয়া, অবতরণ পূর্ব্বক দন্তধাতু বন্দনা করিলেন এবং সেই দম্পতির 'নরক' সমস্ত গমনাত হইলেন। তিনি

ইহা দর্শন করিয়া সপ্ত দিবস অহর্নিশি উৎসব করিতে লাগিল। এ দিকে দম্পতি সহসা সমুদ্র-মধ্যে নৌকাকে গতিহীন দেখিয়া আবার সেই সুগত-তনয় মুনিবরকে স্মরণ করিলেন। তিনিও সমাগত হইয়া বৈনতেয় মূর্ত্তি ধারণ করিলে, ভুজগগণ ভয়চকিত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর এই প্রকারে তাঁহারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কা পত্তনে উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহাসেনের পুত্র 'কিত্তিসিরিমেঘে'র (কীর্ত্তিশ্রীমেঘের) রাজ্যারোহণের নবম বৎসরে রাজদম্পতি সেই পত্তনে অবতরণ করিয়া এক দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন। কোনও ব্রাহ্মণবর পথিকযুগলকে দেখিয়া রাত্রিতে মধুর পান-ভোজনে তাঁহাদিগের সৎকার করিয়া, প্রভাতে অনুরাধপুরের পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা দুরতর মার্গ অতিক্রম করিয়া অনুরাধপুরের 'প্রদ্ধার গ্রামে' (উপমালা-সহরতলী) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যে ধার্ম্মিক নর-পতি মহাসেনের আশায় সেখানে আসিলেন, শুনিতে পাইলেন, তিনি পূর্ব্বেই ব্যাধি-পীড়িত হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কিত্তিসিরিমেঘের রত্নত্রয়ে (বুদ্ধধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) অনুরাগ জানিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাস লাভ করিলেন। পরে মহাগিরি নামক (অনুরাধপুরের উত্তর দিকে অবস্থিত) বিহারের কোনও ভিক্ষুর সহিত রাজার বন্ধুত্ব আছে জানিতে পারিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দন্তধাতুর বিবরণ নিবেদন করিলেন। সেই ভিক্ষুবর পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং লঙ্কাধিপতির নিকট ঐ সংবাদ বহন করিবার জন্য এক ভিক্ষুকে প্রেরণ করিলেন।

রাজা প্রমোদ-উদ্যানে স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন; প্রসন্নবদন সেই ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলেন; এবং সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি নৈমিত্তিকের নিকট পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, এক দ্বিজ-দম্পতি জিনের দন্তধাতু লইয়া সেখানে উপস্থিত হইবে; এখন তিনি সেই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গের সহিত মহাগিরি বিহারে প্রস্থান করিলেন। সেখানে দন্তধাতুর দর্শনে আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া বহু চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। 'ত্রিপিটক জাতক ভাণক' (কথক; এক্ষণে বাঙ্গালিপুর বুদ্ধিমান্ ভিক্ষুগণ

মুক্ত অম্বরে দন্তধাতু স্থাপিত করিয়া পূজার্চনা পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "হে মুনীন্দ্র! আপনি বোধিবৃক্ষের জন্য যেরূপ বোধিদ্রুমমূলে গিয়াছিলেন, স্ত্রীবিলম্ব গন্ধর্ব্বদিগের জন্য যেরূপ 'গন্ধার' রুক্ষ দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যেরূপ মৃগদাবে উপগত হইয়াছিলেন, আজিও সেইরূপ আপনার পূজানুরূপ স্থানে গমন করুন।" রথ বহির্গত হইল। চতুর্দ্দিকে উৎসব-স্রোত চলিতে লাগিল। মুনীন্দ্রগণ বাতায়নপথ হইতে কনকাভরণ নিক্ষেপ ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 'মহিন্দ' (মহেন্দ্র) মুনি যে স্থান ধর্ম্মকথায় পবিত্র করিয়াছিলেন, রথ নগর প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সঙ্ঘেন্দ্র সে স্থানে রত্ন-করণ্ড হইতে জিনদন্তধাতু বহির্গত করিয়া সকলকে দেখাইলেন। নৈগম-পাগস্বিক-জানপদ-গণ দর্শন করিয়া পরমানন্দ মগ্ন হইল। সকলেই সেই সময়ে স্বিমধর্ম্ম সম্বন্ধে স্ব স্ব বিরুদ্ধমত ত্যাগ করিয়া বস্তুজয় শরণ করিল। সঙ্ঘেশ্বর নয় লক্ষ এক ধারে পূজা করিয়া নগরমধ্যস্থ দন্তভবনকে আরও মর্দ্ধিত করিলেন, এবং প্রত্যহ তাহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহীপতি 'কিত্তিসিরিমেঘ' (কীর্ত্তিশ্রীমেঘ) অভিষেকের বৎসরই এইরূপ 'অভয়ুত্তর' * (অভয়োত্তর) বিহারে দন্তধাতু লইয়া গিয়া পূজা করিতেন। তিনি দন্তধাতুর ইতিবৃত্ত লিখাইয়াছিলেন। অনন্তর বুদ্ধদাস প্রভৃতি † বহু বসুধাধিনাথ এই প্রথা অবলম্বন করিয়া দন্তধাতুর সৎকার করেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

---

* মহাগিরি, অভয়গিরি ও ধর্ম্মরুচি—এই তিনটি বিহার লঙ্কায় সুপ্রসিদ্ধ। 'অভয়ুত্তর' বিহার পক্ষে অভয়গিরিকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

† বুদ্ধদাস (ইনি অপর নাম বিষ্ণু) বৌদ্ধ ৮৮২ (খ্রী ৩৩৯) অব্দে সিংহলের রাজা হইয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। ইনি আদেশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যে কেহ কখন হিংসা ও চৌর্য্যকর্ম্ম করিতে পারিবে না।

সন্ধ্যা তাহার বিবাহ দিতে কয়দিন হইতে প্রতিশ্রুত আছেন। সে সেই নলিনের নিদ্রাসমাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাম মহাশয়ও বন্ধুর প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়াছেন, পঞ্চদশ বর্ষ বিবাহ করিতে রাজী রহিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময় শরৎ, নগেন ও বিপিন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। নলিন তখন বাহিরের ঘরে বৈশাখের বিদ্যুৎভরা মেঘের মত স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। সমস্ত বিশ্বটাকে সে যদি তখনই ইচ্ছামত চূর্ণ করিতে পারিত!

শরৎ সমাগমে বন্ধুর পাণিপীড়ন করিয়া বলিল, "এ কি কথা শুনি আজি লোকমুখে বন্ধুবর?"

নগেন নলিনের পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "এক সঙ্গে নরপতি ও প্রজাপতির অনুগ্রহ খুব কম লোকের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে!"

বিপিন এক জন ক্ষুদ্র কবি। সে একখানা কৌচের উপর শুইয়া পড়িয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে বলিল, "বিশেষতঃ পঞ্চদশী সুকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক।"

অন্য সময়ে বন্ধুবর্গের ঈদৃশ তিরস্কারে নলিনবিহারীর অন্তঃকরণ উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু আজ তাহার হৃদয় জমিয়া যাইতেছিল; সমস্ত পৃথিবীর উপর সে অশ্রদ্ধায় চটিয়া গিয়াছিল। সে করযোড়ে বলিল, "দোহাই তোমাদের, ও কথা ছাড়িয়া দাও।"

নগেন বলিল, "মদ অধঃপতনোন্মুখের গন্ধ পাইয়াছে, সে বিবাহের পর লুচি ছাড়া অন্য কথা ভাবিতে পারে?"

পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বিপিন উৎসাহে বলিল, "আমি একটা কবিতাই লিখে ফেলেছি। 'মুখের মিলন'—শোন শোন।"

নলিন চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। বিপিনের হস্ত হইতে কাগজখানি কাড়িয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িল। বিপিনের আরব্ধ কবিতা অগত্যা অকালে যায়া পড়িল।

বন্ধুবর্গ নলিনবিহারীর অপূর্ব ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

বিপিন কাগজের ছিন্ন অংশগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, "নলিনের সব ছেলেমানুষী। আমার এত যত্নের কবিতাটির একেবারে সাপ্তীকরণ হইয়া গেল! ওটার যে আর কাপি নাই। বিবাহের দিন বেশ কাগজে ছাপাইয়া বিলি করিব ভাবিয়াছিলাম।"

নলিন অতি কষ্টে এতক্ষণ আত্মসংবরণ করিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল

না। সে বলিল, "তোমাদের কি অন্য কোনও কথা নাই? বিবাহের কথা শুনিয়া শুনিয়া আমার হাড় জ্বলিতেছে।"

নরেন বলিল, "কনে মনে ধরে নাই বুঝি?"

শরৎ এক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে একটু বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন দমন করিতে পারিল না; বলিল, "কনে মনে না ধরিবার কোনও কারণ ত দেখা যায় না। রায় মহাশয়ের কন্যাটি রূপে গুণে লক্ষ্মী। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র নহে, কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালী নলিনবিহারীর নিতান্ত অনুপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।"

শরতের বিদ্রূপে নলিন অত্যন্ত বিরক্ত হইল। উত্তেজিতভাবে সে বলিল, "হইতে পারে, এই কন্যাটি তোমাদের চক্ষে অপ্সরা। কিন্তু সকলের রুচি ত আর সমান নয়? বিশেষতঃ অপরের রুচি লইয়া আমার ঘর সংসার করাও চলিতে পারে না। যে হেমপুষ্পদানে বনরাই গোলাপেষ স্থান, তথায় ঘেঁটু ফুল সাজাইলে কি মানায়? ভুতার ধূলি পরিষ্কারের যে উপযুক্ত নয়, সে হইবে অঙ্কলক্ষ্মী।"

নরেন গম্ভীরভাবে বলিল, "অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিতেছি। তা এতই যদি ভাবিয়া থাক, কর্ত্তাকে স্পষ্ট খুলিয়া বলিলেই হয়। এখনও ত সময় আছে। তোমার বাবা ত আর জোর করিয়া বিবাহ দিতে পারেন না?"

"আর দিতে চাহিলেই বা কি, তুমি ত কচিখোকাটী নও! সাফ্ জবাব দাও—'বিবাহ করিব না'!"

শরৎ আবার শ্লেষভরে বলিল, "সেটি হইবার যো নাই ভায়া! তুই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ তাহা হইলে—যাক্ সে কথায় আর কাজ নাই।"

রুদ্ধ-বীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় নিষ্ফল আক্রোশে নলিন মনে মনে গর্জ্জন করিতেছিল। মনের মত কোনও উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া সে রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিল, "বাবা বিবাহ দিতেছেন; দিন; কিন্তু ইহার প্রায়শ্চিত্ত এক দিন হইবে। এর শাস্তি যদি না দি, তবে আমার নাম নলিনবিহারী নয়।"

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি পুরুষসিংহ, বাপ! জানি জানি, বাঙ্গালীর বীরত্ব অন্তঃপুরের বাহিরে কখনও প্রকাশিত হয় না। মূর্খই হউন, আর উচ্চশিক্ষিতই হউন, সবার ঐ পর্য্যন্ত!"

২

ভবিতব্যতার বিধান অখণ্ডনীয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রজাপতি নলিন ও সুরবালার

[illegible] [illegible] [illegible] [

বেশ, আজ থেকে রাত্রি-দিবাকে, স্বামি-সন্তানের প্রকৃত অবস্থা, পরিচয়ের সূচনা।

প্রথমতঃ লজ্জা আসিয়া তাহার গলা অধিকার করিল, তার পর সঙ্কোচ, বলেন্দ্র ও বিভীষিকার ছায়া ধীরে ধীরে অন্তর-আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সুরমা মুহূর্তেকে সতর্কভাবে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া। একটা সন্দিগ্ধ বাতায়নপথে উঁকি মারিয়া দেখিল, কেহ নাই।

দাসী চপলা উপরে উঠিতেছিল। সে বলিল, "বৌদিদি, দাদা আর এইমাত্র বাহিরে গেলেন। বন্ধুরা সব দেখা করতে এসেছে। খরচ আর কি! পোড়া কোলের আর সময় হয় না। দাদা বাবুকে ডাকিয়া দিব?"

সুরমা তাড়াতাড়ি চপলার হাত ধরিয়া টানিল; বলিল, "না, না, তোর কোথাও যাইতে হইবে না। ঠাকুরঝী তোকে ডাকিতেছেন।"

চপলা সুরমাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সে উহাদের বন্ধুদিগকে কোনও বিশেষ স্থলে পাঠাইয়া দিতে দিতে চলিয়া গেল। সুরমা মন্থরগতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বিদেশ প্রত্যাগত স্বামীর দ্রব্যসমূহ ঘর-মধ্যে পড়িয়া আছে। একটা বাক্সের গায় চাবি ঝুলিতেছে, ডালা উন্মুক্ত। সুরমা সসঙ্কোচে জিনিষগুলি ছড়াইয়া রাখিতে লাগিল। নলিনের কোট, পেণ্টুলেন, টুপি, ছড়ি, জুতা ইত্যাদি—সে একে একে স্পর্শ করিল; স্বামীকে সে আজ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার ত অবসর পায় নাই! দ্রব্যগুলি স্পর্শ করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয় কেন?

সুরমা চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ দেখিতেছে না। তখন সে উন্মুক্ত বাক্সটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কাগজ, খাম, সাবানের ফটো বাক্সের মধ্যে রহিয়াছে। সুরমা এক একটি করিয়া জিনিষগুলি দেখিতে লাগিল। নলিনের ফটোখানি লইয়া অনেকক্ষণ দেখিল। তত দিন সে তাহা করিয়া চোখের দেখাও দেখিতে পায় নাই।

এখানি কি? চমৎকার খাতা ত! সুরমা বাঁধান খাতাখানি খুলিয়া দেখিল, বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—"ডৌমিক ডায়েরী"

কৌতূহলী সুরমা খাতাখানি খুলিয়া ফেলিল। পড়িতে পড়িতে সে দেখিল, এক স্থানে লেখা রহিয়াছে, "জীবনের স্বপ্ন, সাধ, আশা সব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যাহার বলে লোকে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে, সে শক্তি আমার নাই। স্ত্রী সেই শক্তি; আমার স্ত্রী নাই। যাহার সহিত পিতা বিবাহ দিয়াছেন, তাহাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। মন যাহাকে চায় না, তাহাকে লইয়া সংসার করিব কিরূপে? তাঁরা আমার জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন; আর সেই হতভাগিনী হইতেই আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে। হৃদয়ে তেজ নাই, আনন্দ নাই, কিছু নাই। প্রাণ চুকিয়ে বাঁচিতাম ০ ০।"

যুবতীর হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। বক্ষঃস্থল ততোধিক বেগে কাঁপিতেছিল। চক্ষে জল দেখা যায় না; কিন্তু তথাপি সে পড়িয়া চলিল।

"ভালবাসা হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। অপাত্রে প্রণয় শুদ্ধ করা অসম্ভব। আদর্শের স্বপ্ন অকালে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চির অভিসম্পাত মস্তকে বহন করিয়া অবশিষ্ট দিনগুলি কোনও রূপে কাটাইতে হইবে, ইহাই বিভিষিকা দেখিতেছি। এমন অযোগ্য সংঘটন পৃথিবীতে কেন ঘটে? যন্ত্রণায় দিবানিশি জ্বলিতেছি। যাহার সংস্রব বিষাক্ত, তাহাকে পরিহার করাই কর্ত্তব্য। পাছে মিশিতে হয় বলিয়া এবার পূজায় দেশে গেলাম না। কিন্তু এরূপ নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিব কিরূপে? ভগবান্! যদি তুমি থাক, এই নাগপাশের বন্ধন হইতে আমায় উদ্ধার কর ০ ০ ০।"

সুখের কল্পনা মুকুলেই ঝরিয়া পড়িল; আশার ক্ষীণ আলোকরেখা একটা ফুৎকারে নিবিয়া গেল। একটু পূর্ব্বেই সে ভাবিয়াছিল, অদৃষ্টের গতি সে ফিরাইতে পারিবে।

চক্ষু ফাটিয়া জলধারায় বুকের রক্ত যেন অক্ষর আকারে প্রবাহিত হইল। এই সংসার? এই সুখ? ইহার জন্যই মানুষ এত ব্যাকুল?

সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। খাতাখানি যথাস্থানে রাখিয়া যুবতী বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইল। কক্ষ ত্যাগ করিবার আর সময় ছিল না।

নলিন দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিল। সে প্রথমতঃ অতটা লক্ষ্য করে নাই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি লইতে গিয়া সে দেখিল, কে এক জন বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

নলিন বুঝিল; বিরক্ত হইল। প্রকাশ্যে বলিল, "আলোর সোফের এই ঘর দরকার, একটু নির্জ্জনে থাকিবারও যো নাই; কি মহাবাতিক!"

যুবতী আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল। দুর্ব্বহ অভিমান

[illegible] [illegible] [illegible] [

গৃহে ফিরিতে হইল। বাসায় পঁহুছিয়া নলিন দেখিল, মাতার জ্ঞান ও বাক্য আসিয়াছে। নলিন শঙ্কিতহৃদয়ে মাতার বক্ষক কোড়ে মস্তক রাখিয়া বলিল; দুই চক্ষু দিয়া অবিরলধারে অশ্রু প্রবাহিত হইল।

ডাক্তার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী আসিলেও নিস্তার নাই। এ আভ্যন্তরিক রোগে হাজার করা এক জনকে রক্ষা করাও অসম্ভব।"

তাহার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়েও স্নেহময়ী মাতার রক্ষা অসম্ভব? হা ভগবান! কোন্ পাপে এ নিদারুণ শাস্তি! এক সঙ্গে পিতা মাতা—সংসারের একমাত্র শান্তির স্থান চিরবিস্মৃতির এক দুঃকারে উড়িয়া যাইবে?

অপরাহ্নের স্তিমিত আলোকে, সন্ধ্যামুহূর্ত্তে জননীও চিরবিরাম লাভ করিলেন। সৎকারশেষে শোকমুহ্যমান নলিন মুঙ্গেরে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেল।

শোকের প্রথম আঘাত একটু মন্দীভূত হইলে, নলিন আত্মীয় স্বজনকে পত্র দ্বারা এই শোক-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সেই সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্বশুর মহাশয়কেও সে সংক্ষেপে সংবাদ পাঠাইল। ওয়ালটেয়ার হইতে দশ দিন পরে রামমহাশয়ের নিকট হইতে উত্তর আসিল। বৈবাহিক ও বৈবাহিকার অকাল মৃত্যুতে তিনি যৎপরোনাস্তি শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সপরিবারে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ওয়ালটেয়ারে আসিয়াছেন। সুরমার দারুণ পীড়া। বাঁচিবার কোনও আশা ছিল না। ডাক্তারের পরামর্শে ওয়ালটেয়ারে আসিয়া একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে।

নলিনবিহারী ভাবিল, পিতা মাতা গিয়াছেন, ইহারও যাওয়া উচিত। এই হতভাগিনীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে হাড় জুড়ায়। এই অনর্থের সংস্রবে আসিয়াই ত তাহার সুখের নন্দনকানন ভস্মীভূত হইয়া গেল!

শ্বশুরের উপরেও নলিনের ক্রোধ হইল। ওয়ালটেয়ারে সুরমাকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার তাহার অনুমতি লওয়া উচিত ছিল। তিনি জমীদার হইয়া যথেচ্ছ কার্য্য করিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এই অহঙ্কারের উপযুক্ত প্রতিশোধ এক দিন দিতে হইবে; এখন থাক।

যথাসময়ে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমারোহে সম্পন্ন হইল। সকলেই আসিলেন; কেবল শ্বশুর মহাশয় সুরমার পীড়ার জন্য আসিতে পারিলেন না। নলিন উঁহার

[illegible]

[illegible]

২

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পরামর্শ দিতে লাগিল। বর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তাহার বৈঠকখানা গৃহে দুই বেলা সমবেত হইয়া তাম্রকূটরাশি ধ্বংস করিতে লাগিলেন। নলিন নিজেই পুনরায় বিবাহের ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছিল। এবার নিজে দেখিয়া পত্নী নির্ব্বাচন করিবে। নিঃসঙ্গ জীবন বহন করা সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ যাহারা তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিবার মূল কারণ, তাহাদিগকে উপযুক্ত-প্রতিফল দিতে না পারিলে তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই।

পাত্রীর সন্ধানে নানা দিকে লোক ছুটিল। নলিনও স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তিন মাস চেষ্টার পর, একটি অবসরপ্রাপ্ত সব-জজের দ্বিতীয়া কন্যাকে নলিন মনোনীত করিল। পাত্রীর বয়স দ্বাদশ বৎসর। সুন্দরী, শিক্ষিতা ও সুগায়িকা, শিল্প বিদ্যায় বিশারদ বলিয়া নাকি এই অল্প বয়সেই সে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নলিন ভাবিল, এইবার বোধ হয়, আদর্শের কতকটা পাওয়া গেল। বিবাহের সমস্ত কথা স্থির হইল।

দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সময়ে, নলিন আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিল না। শুধু রায় মহাশয়কে সংবাদ পাঠাইল। তিনি সস্ত্রীক তখনও ওয়ালটেয়ারে।

নলিনবিহারী কল্পনাবলে সুরমা ও রায় মহাশয়ের মানসিক কষ্টের পরিমাণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিল। কেমন শাস্তি!

নব বৈশাখের শুভ দিনে সদলবলে বেষ্টিত হইয়া নলিন বিবাহ করিতে গেল। তাহার গাড়ী ফটক অতিক্রম করিবার অভ্যল্পকাল পরে একখানি পাল্কী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

৭

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নববিবাহিতা পত্নীর সহিত উৎফুল্লহৃদয়ে নলিন গৃহে প্রবেশ করিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে এমনই সময়ে আর একটি অবগুণ্ঠনবতী বেপমানা বালিকার সহিত সে এইরূপে এই স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সে দিন যে উৎসবের ঘটা, আনন্দের উচ্ছ্বাস অনুভূত হইয়াছিল, আজ তাহার কোনও চিহ্ন নাই। ঘন ঘন শঙ্খনাদ, হুলুধ্বনি ও জননী ও পুরমহিলাবর্গের হর্ষোচ্ছ্বাস সমস্ত অট্টালিকাকে সে দিন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আজ নলিনবিহারী স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়া আসিয়াছে; এমন দিনে জননী কোথায়?

দুই চারিটি রমণী বর-বধূ বরণ করিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পল্লীর কতিপয় রমণীও নববধূ দেখিবার আশায় প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করিল। সে কি নলিন! তোমার সাধের পুষ্পশয্যা যে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, নবপরিণীতা পত্নী তোমার আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া আছে! এ সময়ে এখানে কেন? অন্তঃপুরে যাও। তোমার চক্ষুঃ নাই, অদৃষ্টাকাশের অন্তস্তল গ্রহটি কি নিদারুণ যন্ত্রণায় পুড়িয়া মরিতেছে, তাহাও একবার দেখিবে না? দেখিয়া আইস, এতক্ষণ হয় ত সুরমা বুক ফাটিয়া মরিয়া গিয়াছে!

নলিন বিবেকবাণী তথাপি শ্রবণ করিল না। দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল।

সুরমা ও সুশীলার তুলনা করিতেছ? ছিঃ ছিঃ! আবার তুলনা! নিটোল-যৌবন পুষ্পিতা সুন্দরী কি বালিকার তুল্য! সুন্দরী যুবতীর মধুর হাস্য কি বাদশবর্ষীয়া বালিকার হাস্যের সমকক্ষ! জমীদারনন্দিনী, সবজজের কন্যার পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য? আরে ছিঃ!

কি অপরাধে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছ? তা তুমিই জান। কিন্তু এতকাল পরে আবার সে সব কথার আলোচনা কেন? নীরবে কুসুম-শয়নে শয়ন কর; পুরাতন কথায় প্রয়োজন কি? চাঁদিনী রজনী নিষ্ফলে কাটাইতেছ কেন? প্রতিশোধের মাত্রা কম পড়িয়া যাইতেছে যে!

নলিনবিহারী উঠিল না। কাষ্ঠাসনের উপর শয়ন করিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, নিমন্ত্রিত সকলেই আসিয়াছেন।

তথাপি নলিন উঠিল না। বলিয়া দিল যে, তাহার শরীর বড় অসুস্থ; কেহ যেন এখন তাহাকে বিরক্ত না করে। নিমন্ত্রিতদিগের আহারাদির ব্যবস্থার কোনও ত্রুটী না হয়।

নলিন পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। অন্তঃপুরে এত আলোক জ্বালিবার কি প্রয়োজন? সানাই তখন মল্লারে ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, অন্দরে ডাক পড়িয়াছে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। নলিন সংক্ষেপে বলিল, "আমায় এখন বিরক্ত করিস্ না।" দাসী চলিয়া গেল।

নিমন্ত্রিতগণ আপ্যায়িত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। নলিনবিহারীকে দেখিতে না পাইয়া সকলে কিছু বিস্ময় প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রভুভক্ত ভৃত্য, বাবুর অসুখ করিয়াছে বলায়, সে বিষয়ে আর অধিক আলোচনা হইল না।

চন্দ্র মাথার উপর আসিয়া হাসিতে লাগিল। গ্রাম্যপল্লী তন্দ্রাজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অন্তঃপুরে আলোকমালা তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই।

কাহার মৃদু হস্তস্পর্শে সহসা নলিনবিহারী চমকিয়া উঠিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এক রমণীমূর্ত্তি। জ্যোৎস্নাধারা তাহার মল্লিকা-পুষ্পতুল্য শুভ্র বসনের উপর চরণাঙ্কিত হইতেছিল; অনাবৃত আননে, ঈষৎ-কম্পিত বক্ষের উপর নৃত্য করিতেছিল। নলিন মুগ্ধের ন্যায় নির্নিমেষে এই নারীমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তরলদীপ্ত মেঘরাশির মধ্য হইতে এই সুন্দরী কি আজ ধরাতলে নামিয়া আসিল? কুসুমপুঞ্জ সৌরভামোদিত কাননতলে, আলোকোজ্জ্বল নিশীথে এমন মূর্ত্তি নলিন ত কখনও দেখে নাই! কবির নিভৃত অন্তঃপুরে যৌবনের স্বপ্নালোকে যে আদর্শের সে কল্পনা করিত, ইহা কি তাহারই ছায়াঙ্গিনী? নলিন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের বিকার নহে—নারীমূর্ত্তি সুরমার।

এত সুন্দর? তবে এতদিন কেন সে অন্ধের ন্যায় এই সৌন্দর্য্য-সম্পদকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে? কেন? কেন?

হায় নলিন! দর্পে, অহঙ্কারে মানুষ যে সূর্য্যের দীপ্ত কিরণেও অন্ধকারের ছায়া অনুভব করিয়া থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় কি তোমাকে সে শিক্ষা দেয় নাই?

চারুহাসিনী সুন্দরী তখন অতি মৃদু অতি কোমলকণ্ঠে বলিল, "অনেক রাত হয়েছে, ছেলেমানুষকে একলা ফেলে রাখা কি উচিত? ভিতরে এস?"

কি সহানুভূতিস্নিগ্ধ আহ্বান! কণ্ঠস্বরে এতটুকু তিরস্কারের বা শ্লেষের ভাবও প্রচ্ছন্ন নাই! যে স্বামী পদে পদে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাহার জীবনের সকল সুখ সকল শান্তি অপহরণ করিয়াছে, তাহারই প্রতি এত স্নেহব্যবহার!

নলিন পূর্ব্বে কখনও সুরমার বাক্য শ্রবণ করে নাই। আজ তাহাদের এই প্রথম সম্ভাষণ!

নলিনবিহারীর সর্ব্বশরীরে একটা তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হইল। স্রোতোবেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া সে আছাড়িয়া উঠিল। সবলে সুরমার করযুগল ধারণপূর্ব্বক বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া

"সুরমা! সুরমা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি তোমাকে বুঝিতে পারি নাই, তাই কত অত্যাচার করিয়াছি। তুমি ক্ষমা—"

অশ্রুবাষ্পভারে নলিনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল! সুরমা ধীরে ধীরে স্বামীর আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

—:০:—

প্রাচীনভারতের চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য।

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে সম্প্রতি Modern Review পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, যবনাধিকৃত ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে চিত্রবিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। উত্তর-ভারতে দিল্লী ও লাহোর নগরের চিত্রকরগণ, এবং কাঙ্গড়া প্রদেশের আমেথা শৈলবাসিগণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের চিত্রসমূহে চিত্রকলার চরমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির শক্তি, যথাযথ বর্ণবিন্যাস, তুলিকা-চালনার সূক্ষ্ম জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল গুণ শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের লক্ষণ, তৎসমুদায়ই এই সকল শিল্পীর চিত্রাবলীতে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের ঐতিহাসিক চিত্রসমূহ লাহোর সহরের কৌতুকাগারে বিশেষ যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতার চিত্রবিদ্যালয়ে সাধারণ চিত্রগুলির সুন্দর সংগ্রহ আছে। জয়পুরের মহারাজের রাজপ্রাসাদেও উক্ত চিত্রাবলীর উৎকৃষ্ট সমাবেশ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় রাজাগণ ও সাধু মহাত্মাগণের চিত্রই অধিক। অতি প্রাচীন রাজাদিগের চিত্র কতকটা কাল্পনিক ও বংশানুগত কাহিনীমূলক। কিন্তু পরবর্ত্তী নৃপতিগণের আলেখ্য যথাযথ প্রকৃত প্রতিকৃতি।

দিল্লীর চিত্রকরগণ হিন্দুগণের নিয়ম-সংযত চিত্রপদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের চিত্রবিদ্যা পারস্যদেশ-সম্ভূত। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা ভারতবর্ষে থাকিবার সময় সুন্দর সুন্দর চিত্র-সম্বলিত অনেক পারস্য ভাষার গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাঠান মোগল সকল রাজাগণই চিত্রের অনুরাগী ছিলেন। অনেক মোগল বাদশাহ উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিতে জানিতেন। সকলেই জানেন, জাহাঙ্গীরের যাদুকরী নূরজাহান অদ্বিতীয়া চিত্রকরী ছিলেন। আকবর বলিয়াছিলেন,—'এমন অনেক লোক আছে, যাহারা চিত্রকলাকে ঘৃণা করে। এই সকল লোককে আমি ঘৃণা করি। আমার মনে হয়, চিত্রকরগণের ঈশ্বরকে মনে অনুধাবন করিবার এক বিশেষ সুযোগ আছে। চিত্রকর যখন আপনার চিত্রিত মানব বা জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সর্ব্বাবয়ব যথাযথ অঙ্কিত করিয়া তাহাকে জীবিতবৎ করিয়া তাহাতে জীবনসঞ্চার করিতে পারে না, তখন সেই একমাত্র জীবনদাতা ঈশ্বরকে তাহার মনে পড়ে; এবং এইরূপে তাহার জ্ঞানের উন্নতি হয়।' দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা আকবর বাদশাহের এই কথা শুধু দিল্লীর চিত্রকরগণের নয়—সমস্ত জগতের চিত্রকরগণের কার্য্য-গৌরবের শ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিল্লীর হস্তিদন্তের উপর অঙ্কিত চিত্রাবলীও অতি সুন্দর ও ভারতীয় চিত্রকলায় এক বিচিত্র বিশেষত্বের দৃষ্টান্ত।

কাঙ্গড়া প্রদেশের চিত্রকরগণের চিত্র দিল্লীর চিত্রকরগণেরও অপেক্ষা বিষয়ে অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। লাহোরের কৌতুকাগারে যে সকল ছবি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখ-

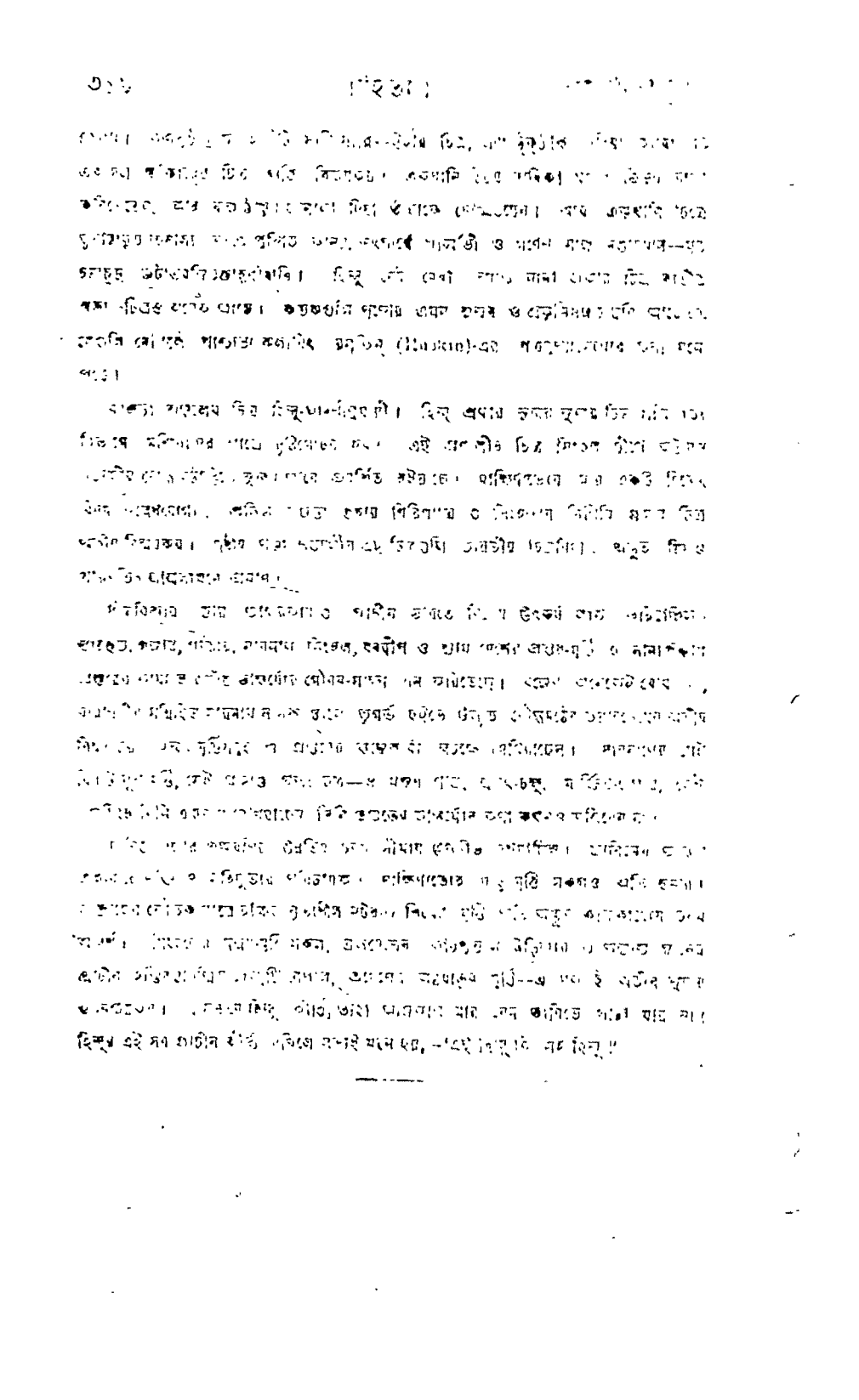

মিঠাই-বিক্রেয়।

—:+:—

[জাপানী গল্প।]

"বারটা যে বাজে, আর ঝাঁপতাড়া ফেলিবার
দেরী কেন?" কহে বুড়া বুড়ীরে ডাকিয়া;
"এত রাতে কার ছেলে জেগে আছে ঘুম ফেলে
পিতা নাতা 'এমি' (১) তার কিনিবে আশিয়া?"
দোকান করিল বন্ধ বুড়ী মন্দগতি;
বুড়া বুড়ী পল্লীপথে 'এমিয়া' (২) দম্পতী।

'জেঞ্জিরো' বুড়ার নাম, 'ফুসা' তার নারী।
বরফে আচ্ছন্ন বসুমতী, ঠাণ্ডা ভারি।
'হিবাচি'য় (৩) স্ফুলিঙ্গ অনিয়া শেষ ছাই,
হাড়ে হাড়ে ঠেকিতেছে, শীত কি বালাই!
বুড়া ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ে, পুনঃ রাখী তুলে
ঘুমন্ত, লোহার শিকে সে ছাই জাগায়;—
জ্যোতির্ম্ময় বদন সুচিন্তা-মহিমায়।
কত না ঘুমের ঘোরে ঝরু হিজিবিজি,—
বুড়ী বলে, "ঢোল, বোকোনাকো মিছিমিছি।"

প্রসন্ন জেঞ্জিরো কায করিত দোকানে;—
ছেলেরা বাঁচিয়া থাক, স্বর্ণগাত্রে অন্ন থাক,
তার ত রাত্রার হাল তাদের কল্যাণে।

---

(১) শিশুভোগ্য মিষ্টান্ন।

(২) 'এমি'-বিক্রেতা।

(৩) শীতনিবারণার্থ গৃহে ব্যবহৃত আগুনের আধার।

আঁধারে আকৃতি তার নহে বড় স্পষ্টাকার—
মুখে, চোখে, চুলে, বস্ত্রে, বরফ পড়িয়া
ক'রেছে শ্বেতাঙ্গী তায় ;—রমণী ছায়ার প্রায়
(হেঁটে নয়, ভেসে যেন,) পশিল দোকানে ;
কাতরদৃষ্টিতে চাহি' জেঞ্জিরোর পানে
অতি ক্ষীণকণ্ঠে কয়, "হে এমিয়া মহাশয় !
ক্ষমা কর মোরে, আসিয়াছি অসময়ে ;—"
জেঞ্জিরো না ভেবে পায় উত্তরিবে কি কথায়,
সম্ভ্রমে নামায়ে শির—'হ-জ-ব-ম-ল'-য়ে
"কি শীত বরফ !—" ইতি কহে পরিচয়ে।

"এসেছি কিনিতে এমি", তন্বঙ্গী প্রকাশে ;—
এই বলি দেখাইল গাত্রে পূর্ব্বপাশে
বিচিত্র এমির ঠোঙ্গা এক,—সে এমির,
(মাসেকের শিশু যবে মিয়া-মেইরীর (৫)
মন্দিরে প্রেরিত হয়) উৎসর্গ,—নচেৎ নয় ;—
সাদরে জেঞ্জিরো দিল সে এমি নারীরে ;
নারী বস্ত্র হ'তে লয়ে দিল তার বিনিময়ে
কাদামাখা কাল 'রিন' (৬) একটি, ও ধীরে
করিল প্রস্থান ; বৃদ্ধ বাঁধি' তবে ঝাঁপ,
দোকানের অন্দরে প্রবেশি,' ছাড়ে হাঁপ।

কুসা বলে, "কি ব্যাপার ! কে ও এত রাতে ?"
জেঞ্জিরো উত্তরে, "নারী, এমির বরাতে।"
"নূতন কি আছে তা'তে—তবে বড় বেশী রাতে",—
ভাবে বুড়ী ; ভাবিতে ভাবিতে ঘুমে ডোবে ;
বৃদ্ধ ব'সে ভাবে,—অত চিন্তায় কে শোনে ?—
মানুষী, না অমানুষী, ছায়া না কি মায়া ?
ব'সে গেল বৃদ্ধ-মনে সে নারীর কায়া !

(৫) জাপানের না-ষষ্ঠী।
(৬) সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্য জাপানী তাম্রমুদ্রা।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

"বড় কষ্ট আপনাকে দিতেছি এমিয়া!"
নতমুখে কহে নারী,—দোকানে এমিয়া সারি—
পূর্ব্ব রাত্রে যে এমি লইয়াছিল, ভাই
লইয়া, একটি রিং দিয়া, বলে,—"যাই"।
হেঁটে নয়, ভেসে যেন ছায়াময়ী চলে
হাওয়ার; জেঞ্জিরো ভাবে, 'কি পাপের ফলে
মলিন রমণী, অত শীর্ণ; ও সুন্দর
কোথা হ'তে আসে?' মনে গণিল সংশয়
জেঞ্জিরো আবার;—টানি' চালার আগড়খানি
করিল শয়ন; মন নানা ভাবনায়
কাতর;—এমিয়া অবশেষে নিদ্রা যায়।

এইরূপে পাঁচ দিন নিত্য নিত্য আসে
প্রমদা এমির আশে এমিয়ার পাশে।
নিত্য নিত্য নিশায় অবশ্য।—সে বেচারা
জেঞ্জিরো তো হতজ্ঞান, শেষ অবসন্ন প্রাণ,—
ভুলে গেল কাজ কর্ম্ম, ব্যবসার ধারা।
আর যারা এমি বেচে তাদের তল্লাটে,
শিশুরা সেথায় যায়—বুড়া বা তাকায় তার,
একে ভিন্ন মন তার নাহি অন্য পাটে।
গরীব জেঞ্জিরো;—ভাব, আশীর ওপার,—
চিন্তায় সে দাঁড়াল কিম্ভূত-কিমাকার!

ষষ্ঠ দিনে প্রভাতে, অদ্ভুত অঙ্গীকার
করিল সে;—নিশায় আসিলে খরিদ্দার,
এ বৃদ্ধ বয়সে ভাগ্যে যা' তার থাকুক থাকুগে,
তাহার অনুসরণ করিবে সে স্থির;
হোক ঝড় জল,—হোক অভেদ্য তিমির!
কুলা তো শুঁনয়া সারা,—"বুড়া পাগলের পারা
কি বলে গো! প্রেতিনীর সঙ্গ লোকে লয়?
যমপুরী প্রিয় নহে কাহারও নিশ্চয়!"

সে নারী যে প্রেতযোনি ক'রেছে উদ্গম,—
কভু তায় সন্দেহ করেনি এক পল!

জেঞ্জিরো জাপানী, তার প্রতিজ্ঞা জীবন,
যাইবে সে একবার করিয়াছে পণ,—
আর কে ঠেকায় তায়? ক্ষুণ্ণ ও আছাড় খায়,
সারা দিন 'নড়া-কানা' করিল সুপায়;—
জেঞ্জিরো পাথর, মুখে কথা নাই অন্য।
রাতে রানা উপজিল—যথা লয়, এমি নিল—;
দিল ঋণ, অন্য দিন হ'তেও কাতর,—
চ'লে গেল; বুড়া গেল পশ্চাতে সত্বর।
'হেঁটে না, হাওয়ায় যেন ভেসে চলে নারী,
(বলিয়াছি কোন স্থানে) তার সঙ্গে পারি
আমি যুড়া ছুটিতে?' ভাবে ও তবু ছোটে;—
নারীও উধাও চলে আপনার কোটে।

দীর্ঘ দেবালয় শত মন্দির শোভন,
তাও ক'ল অতিক্রান্ত;—পরে বিভীষণ
সমাধি-উদ্যান,—নিশা দ্বিপ্রহরে কভু
সে উদ্যান প্রমোদ-উদ্যান নহে; তবু
তাহাতে প্রবেশ করে বুড়া; অগ্রে নারী।—
ফেরে নারী বৃদ্ধ পানে; মুখে তার ভারি
ঔদাস্য। ফিরিয়া বৃদ্ধ পানে চায়,—যায়;—
'ফিরো না' শ্রুতটা এসে' চক্ষে যেন গায়।

আর দুই চারি পদ;—দীর্ঘ বৃক্ষতলে
আছিল কবর এক; নারী তথা চলে।
উঠিছে ধূমার ধোঁয়া—সুরভি বাতাস
বহে সে সমাধি হ'তে,—তাহারে প্রকাশ
রেখেছে স্তিমিত অগ্নিস্তূপ; তথা গিয়া
ক্রমে ডেবে বৃদ্ধ—নারী গেল মিলাইয়া।

তবে ত প্রস্তুত,—আর সন্দেহ কোথায় ?
প্রকৃতই প্রেতিনী ত এমি নিয়া বার।
ভয়ে যে কাঁপিল বৃদ্ধ, তা কি বড় কথা ?
সমীরণ হিমানী-সম্পাতে কাঁপে যথা !
কোন রকমে ত বৃদ্ধ ফিরিল আলয়ে—
কাটাইল রাত সে ভূতের কথা ক'য়ে।
আশ্বাসিয়া জেঞ্জিয়োরে কৃপা পেয়ে ভাবে,
দু' জনে যাইবে কাল পুরোহিত পাবে।

প্রাতঃকালে পরদিন ল'য়ে সে ছয়টি রিণ
চলিল ভজনালয়ে এমিয়া দম্পতি ;—
সে তারিখে বড় ভোজ, সে ভোজ না ঘটে রোজ'
সমুদ্র-তরঙ্গ মত জনতার গতি।
দেখিল, বিষম ব্যস্ত যাজক সবাই—
গরীব ভাদের পানে এ দিনে এমন স্থানে
কে চাহিবে ? হেন কালে বুঝি বিধাতাই
প্রাচীন যাজকরূপে এক, তাহাদের
নিকটে আসিয়া ভাষে, "বল গো কিসের
কারণে, সবার মাঝে (উৎসবের বাঁশী বাজে)
তোমরা একাকী দু'টি ?" "প্রভু !" বৃদ্ধ কয়,
"আছে গুরু কথা।" "এস আমার আলয়।"

নিকটেই অবস্থিত যাজকের বাটী,—
তরু লতা ফুলে মনোরম, পরিপাটী।
তথা উপজিয়া সব কহিয়া ব্যাপার,
প্রেতিনী-প্রদত্ত সেই রিণ ক'টি তার
সমর্পণ যাজকের চরণে করিয়া,
সম্ভ্রমে করিল নতি দম্পতি এমিয়া।

সমস্ত শুনিয়া পুরোহিত বহুক্ষণ
ললাটে করিল স্বীয় কর-সঞ্চালন।

"দেখাইতে পার তুমি কোথা সে কবর ?"
জিজ্ঞাসে ; জেলিয়ো করে সোৎসাহে উত্তর,
"অবধান কর পুণ্যবান ! তরুবর
সমাধি-উদ্যানে উচ্চ, তলদেশে তার
কবর সে ;—নেত্র প্রভু বিশ্বাসী আমার।"
শুনি' ভা' যাজক কয়, "চল সে কবরালয়।"
বুড়াবুড়ী করে আজ্ঞা তখনই পালন।—
কবর নূতন কাটা, মাটী সব ফাটা ফাটা,
মৃত্তি'-নিমজ্জিত কাষ্ঠে মৃতের বর্ণন।

"কিকুর কবর এ যে !"—কবর দেখিয়া
বৃদ্ধ পুরোহিত কহে বিস্ময়ে ডুবিয়া।—
"কিকুর কবর এ যে,—চোকিচীর নারী—
ছিল শুভগুণবতী, হৃদয় স্নেহের অতি.
কহিতে তাহার কথা না কেঁদে না পারি।
সে দারিদ্র্য-দাবদগ্ধা হরিণী সরলা—
ধরণীর পাপতাপ, ধরণীর মলা,
বর্জ্জন করিয়া গেছে ; আজ দশ দিন
হয়নি ; আমিই তারে করি পৃথ্বীলীন
ভগবৎ-চরণে সংবাদ দিছি তার ;—
আসন্ন-প্রসবা ছিল,—এ কবর তার।
অজ্ঞাত সন্তান গর্ভে, অভাগী জননী
সপ্তাহ হইল—সার করেছে ধরণী !
স্থির কোন দৈবী বার্ত্তা করিয়া বহন
নিশি নিশি তোমা পাশে ক'রেছে গমন।

রোমাঞ্চিতকলেবর, শুনি' সে বিস্ময়কর
কাহিনী, বুড়া ও বুড়ী স্তম্ভিত দু' জন ;
যাজক মন্দিরে যায়,—সে সমগ্র জনতায়
উদ্দেশিয়া কহিল অদ্ভুত বিবরণ।

প্রায়ুচ বন্ধার প্রায় সে ভবনমণ্ডলী
কিঙ্কর কবরে ধায় ত্বরা, কুতূহলী।
তার মাঝে এক জন হয় অগ্রসর
চোকিটী (কিঙ্কর ভর্ত্তা) সমীপে সত্বর।
চোকিটী অবাক হ'য়ে চোখভরা অঙ্ক ল'য়ে
বাতুলের মত তথা ছুটি' উপস্থিত ;—
ধাস-বিজড়িত-কণ্ঠে কহিল বিনীত,—
"বয়েস্য আচার্য্যবৃন্দ ! হে প্রসন্নমতি
সমাগত সুহৃজ্জন ! কর আমা প্রতি
আদেশ, আমার প্রিয়তমা দয়িতার
উদ্ঘাটিত করিতে কবর ; সুবিচার
তা' হলে করিতে সবে পারিব সতত,
কিঙ্কর প্রেতাত্মা কেন, অনাথ-বান্ধব
দেবোপম দরার, এ এমিরা-সকাশে
যায় ? কি করিতে বাক্ত-অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে ?"
আচার্য্য উত্তরে,—"নাহি ত্রাস মনে ভয়,
অভীষ্ট পালন কর ; আমি অসংশয়
মঙ্গল মানিয়া ও অমুখী আত্মার,
প্রার্থনা করিব পদে বিশ্ব-নিয়ন্তার।"

কথান্তে আরম্ভ তবে কবর খনন।
সমবেত কণ্ঠে বেদ-মন্ত্র-বিনিস্বন,
পুরোহিত-সম্প্রদায় শাস্ত্র মথি' স্তোত্র গায়,—
জনগণ জোড়পাণি ; পবিত্র সুন্দর
শোকের সে মুখদৃশ্য মর্ম্মদ্রবকর !
ব'সে অঙ্ক চোকিটী মৃত্তিকা ভেদ করে
অবিশ্রান্ত বহু শ্রমে ; ক্রমক্ষণ পরে
আচাধার (পরিত্যক্ত পবিত্র আত্মার
রক্ত-মাংস-আধার ভঙ্গুর দেহ তার
ধারণেতে রক্ষিত কথা) হইল বাহির—

ঘুম উপস্থিত সবে ভিন্না চৌকিটীর
খুলিতে সে কাষ্ঠপাত্র ;—'তথাস্তু' তাহার
সকলের। খোলে ডালা—ও কি ও হোথায়!
স্তব্ধ, স্তম্ভ-চেতন অমরা, আচার্য্য যি
উপস্থিত মানবমণ্ডলী সে ; নিরখি'
কাষ্ঠাধারমধ্যে দৃশ্য কল্পনা-অতীত!
বিধির খেয়াল-খেলা, নেশার নির্ম্মিত!
দেখে সব—অর্দ্ধ-উপবিষ্ট ও শয়ান
মাতৃ শবকোলে, শিশু উৎফুল্ল-নয়ান
চুষিছে কোমল ওমি, লালে বুক ভাসে,
জননীর প্রাণে চায়, ত্রাস নাহি বাসে!
সপ্তাহে গলিতপ্রায় রমণীর শব ;
দেখি' মুগ্ধ, মুখে কারও নাহি সরে রব।
বিহ্বল চৌকিটী শিশু কোলে তুলে লয়,
শোকে ও আনন্দে শ্রান্ত, পাগল বা হয়!

বন্ধুবর রাজকবিবর ভাসমান-
নয়ন-কমল বৃদ্ধ বিযুক্ত-পরাণ
কহিলেন, "হেথা দয়াময় বিধাতার
লীলা-ক্ষেত্র-মাধুর্য্য চিন্তিয়া একবার!
দেখ মাতৃ-মমতার অপরূপ লীলা—
পূত স্নিগ্ধ স্বর্গীয়তা-স্নেহ-সুসলিলা!
জননীর প্রাণ—সুতে জননীর স্নেহ
যম না কাড়িতে পারে,—যম কাড়ে দেহ!
চক্ষের উপরে দেখ জননীর শব
সন্তান-লালনে রত! কর অনুভব,
যদি শক্তি থাকে—মাতৃ-স্নেহ-পরাক্রম
সে শক্তির পাশে শক্তি কার? ছার যম!

"রাজধানীতে ফিরে যাবে বৈতরণী পারে—
তাহার উৎকোচ ক'টি দিন, ভাবিবারে

সে নয়নে, হায়! অশ্রুবিন্দু কভু
ছিল না, (১) শুধু চক্ষু বিস্ফারি কেবল,
এড়িয়াছে দিয়া ঘরামনী, এই আছে
দেখিয়াছে অন্যত্র ও নবাগত প্রাণী।"
ছিল কাটি সবলে কাহার জন্য ধরে
রাখি', পুরোহিত নেত্র মোছে দুই জন।
"পুণ্য মহাত্মা এই" কহে পুরোহিত—
জ্যোতিষের পানে চাহি,—"এই ঐশ্বর্য্যের
অন্তরালে ভোগিতা ও দুঃখ-দগ্ধ প্রাণ—
মিলি-দিবেরের শেত-মূর্ত্তিরে কহে
কে সেথা খুঁজিয়া নেয় হায়? মহাপ্রাণ
অগ্রসর এসিয়া হে, ত্রিদিবে বর্ষীয়ান!"

কষ্ট গাহে ক্ষ্যাপা আকাশ, কথা শেষ;—
যে অবধি জ্যোতিষের করি হস্ত বেশ
উন্নতির উচ্চ পথে অগ্রসর; আসে
যেন কোথায় হতে জ্যোতিষের পাশে
সেই জন,— যারে হেরে, গত শোকে আসি,—
সন্তানে হৃদয়ে ধরে জননী বসুধা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(১) অর্থাৎ শোকে ব্যাকুল চক্ষুর তরল। তাহাতে উৎকণ্ঠে চিত্রের নয়ন পক্ষের অভ্যন্তরিক্ত কাচ আবরণে চক্ষের ন্যায় দুইটি 'ডিম ডিম' দেখা প্রচলিত আছে।

বুদ্ধের মাতুলবংশ।

মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি বুদ্ধচরিতাখ্যায়ক গ্রন্থে তাঁহার মাতামহ-কুলের উৎপত্তি বিষয়ক নিম্নলিখিত কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে। শাকেতাধিপতি মহারাজ সুজাত বা সজাতের নির্ব্বাসিত পুত্রপঞ্চক ও তৎসহচর অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ শাক্যাভিধানে অভিহিত হইবার পর হইতে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিলেন।

প্রথম কপিলবস্তুরাজ ওপুরের পৌত্রের বাল্যকালে, প্রিয়া নাম্নী কোনও শাক্যদুহিতা দুশ্চিকিৎস্য পলংকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইলে, চিকিৎসক-গণের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও রোগের উপশম হইল না। বরং ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পূতিগন্ধে আত্মীয়গণেরও জুগুপ্সা উৎপাদন করিতে লাগিল। অগত্যা সাধারণের ঘৃণার্হা কুমারীর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কোনও পর্ব্বতগুহায় রাখিয়া আসাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া হিমালয়ের উৎসঙ্গ-বর্ত্তী এইরূপ কন্দর মনোনীত করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে প্রভূত খাদ্যসামগ্রী, পানীয় জল ও বসন-শয্যাদি সজ্জিত করিয়া কন্যাটিকে সেই গুহায় রাখিয়া দিলেন; এবং হিংস্র জন্তুর আক্রমণভয়ে গুহাদ্বার বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া বালুকায় গুহামুখ আরও প্রচ্ছন্ন করিয়া সুধমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদা এক স্বেচ্ছাবিহারী ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র সেই স্থানে উপনীত হইয়া মনুষ্যগন্ধে উন্মত্ত ও মাংসলোলুপ হইয়া পুনঃপুনঃ পদবিক্ষেপ দ্বারা বালুকা অপসারণ করিতে লাগিল। এই সময়ে কোল (কাহারও মতে বাঘ) নামক রাজর্ষি ফলাহরণার্থ সেই স্থানের সন্নিহিত হইলে, শার্দ্দূল মুনিবরের তপোবলসম্ভূত তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া চিরাভিলষিত নরমাংসাহার-পালসা বিসর্জ্জন দিয়া তথা হইতে অপসৃত হইল। বিজন বনমধ্যে পঞ্চকন্যার এইরূপ সযত্নে সংরুদ্ধ দেখিয়া নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাপসপ্রবর বালুকা উৎসারণ পূর্ব্বক কাষ্ঠপ্রাচীর অপসারিত করিয়া গুহামধ্যে অনুপমলাবণ্যবতী কিশোরী সন্দর্শনে সম্মোহিত হইলেন। অরক্ষণ স্থানে যত্নবিবর্দ্ধিত শাক্যকুমারীর গলিত শরীরে ক্রমে ব্রণের উপশম হইয়া-ছিল; তিনি অনন্যসদৃশ রূপপ্রভায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। কুমারীর আত্ম-

কাহিনী শ্রবণে রুদ্ধ রাজার এতদ্বংশী কুষ্ঠোপদষ্টা শাক্যের বিষয় জানিতে হইয়া, এবং তত্তোধিক তদ্বংশের আভিজাত্যোচিত গুণগ্রামে বিস্মিত ও সেই সুকুমারিকার প্রতি নিতান্ত প্রেমাকৃষ্ট হইয়া তপস্বী তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা! কি মহদুদ্দেশ্যে যে ত্রিগর্হ্যবংশীয় তপশ্চরণশীল রাজর্ষির হৃদয়ে প্রেমবীজ উৎপাদন করিয়া দিলেন, অল্প মানব তাহা কি করিয়া বুঝিবে? ক্রমে সেই পত্নীর গর্ভে তাপসপ্রবরের ঔরসে ষোলটি সন্তান জন্মিল। পুত্রগণ কিঞ্চিৎ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, সাধ্বী দুহিতা তাহাদিগকে কপিলবস্তু নগরে স্বীয় পিতা ও ভ্রাতাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

তাহারা শাক্যসভায় উপস্থিত হইলে, সেই ঋষিকুমারগণের আকারের প্রত্যক্ষ করিয়া সভাসদ্‌গণ তাহাদিগের পরিচয় জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মাতামহের নামোচ্চারণপূর্ব্বক স্বীয় জনক জননীর বিস্ময়োদ্দীপক কাহিনী সভাসমক্ষে বিবৃত করিলে, সকলে যারপরনাই বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। শাক্যকুমারীর পিতা তখনও জীবিত ছিলেন। ক্রমে পুরোহিতে পরিবৃত হইয়া সেই সভায় সমাসীন থাকিয়া, মহাত্মা কোলে তাঁহার জামাতৃরূপে বৃত হইয়াছেন শুনিয়া, নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। রাজর্ষি কোল তাঁহাদের পরিচিত ছিলেন। তিনি বারাণসীর রাজা ছিলেন, এবং পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপশ্চরণার্থ হিমালয়কন্দরে মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন।

মুনিবালকগণ সাদরে পরিগৃহীত হইয়া, মাতামহ ও মাতুলগণ কর্ত্তৃক বৃত্তিস্বরূপ এক একখানি গ্রাম ও কৃষিযোগ্য ভূমি প্রাপ্ত হন। অতঃপর শাক্যগণ স্নেহচুম্বনে ও মধুর বচনে আপ্যায়িত করিয়া কুমারগণকে পিতৃমাতৃসকাশে পুনঃপ্রেরণ করেন। কোল নামক ঋষির সংসর্গ বলিয়া তাঁহারা ও তাঁহাদিগের পরবর্ত্তিগণ কোলীয় নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার যে নাম, তদনুসারে স্ব স্ব গ্রামের নামকরণ করিলেন। কুমারদলের জ্যেষ্ঠতম রামভদ্র 'রামভদ্রনিগম' নামক গ্রামের অধিকারী হইলেন। কালক্রমে কোলীয় বংশের শাসনপ্রণালী যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। মাধ্যমিক শাসন বিভাগ এক দল রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক সুচারুরূপে পরিচালিত হইত। ইহারা পরিচ্ছদ ও শিরস্ত্রাণের সমতা (uniform) প্রযুক্ত এক নূতন আখ্যা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে অত্যাচারী ও অর্থগৃধ্নু বলিয়া

জন্মগ্রহণের ও ভাগী হইত। জনৈক কোলীয় সাধক কপিলবস্তু নগরের অদূরে দেবদহ (দেবদহো) নামক নগর সংস্থাপন করেন, এবং কালক্রমে অঞ্জন বা সুপ্রবুদ্ধ নামক জনৈক শাক্য তাহার আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এই অঞ্জন করভদ্র-গ্রামনিবাসী কোলীয় বংশের এক দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন, এবং তাহার গর্ভে তাহার সাতটি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা মায়া ও কনিষ্ঠা প্রজাবতীকে কপিলবস্তুরাজ সিংহহনুর জ্যেষ্ঠপুত্র শুদ্ধোদন ও তাঁহার অপর ভ্রাতৃগণ অবশিষ্ট কন্যাগুলিকে বিবাহ করেন। এই মায়াদেবীই সর্ব্বার্থসিদ্ধ বুদ্ধের জননী ও মহাপ্রজাবতী পরমযোগময়ী পাশবিহীরূপে সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ যাবৎ সমানভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।(১) এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে জগতের ইতিহাসে ভারতের স্থান যে কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছে, তাহা ভারতবাসী বুঝুক আর নাই বুঝুক, এসিয়া খণ্ডের যে সমস্ত জাতি জাতীর জীবনে উদ্বোধিত হইতেছে, তাহারা বুঝে, এবং সেই জন্যই ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থাকে তাহারাও যেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

---

(১) ত্রিপিটিকজ্ঞানবিদ্ ৺ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহাদিগের বংশবল্লী এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

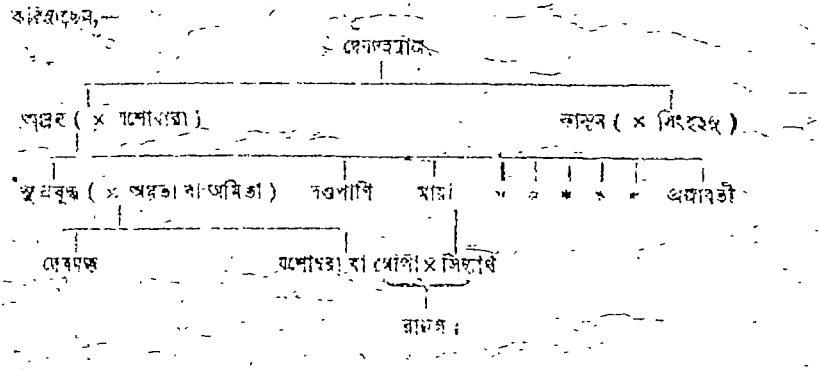

বিহঙ্গের দেশ-ভ্রমণ।

কোনও কোনও পাখী বার মাসই এক দেশে থাকে; আর কোনও কোনও পাখী এক ঋতুতে থাকে, অন্য ঋতুতে থাকে না। ইহারা যথাসময়ে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়। আমাদের চিরপরিচিত কোকিল ইহার এক দৃষ্টান্তস্থল। কোকিল বসন্ত ঋতুতে এ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ খঞ্জন, চড়াই ইত্যাদি পাখী আপন আপন সময়মত দেশান্তর হইতে এ দেশে আসে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পক্ষিগণের ব্যবহার এইরূপ। কোনও পাখী দেশ-ভ্রমণ করে, কেহ না করে না।

কিন্তু এই দেশভ্রমণ ব্যাপারটা কেবল পাখীরই স্বভাব নহে। মাছেরাও যথাসময়ে চলে দলে নদী সাঁতরাইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়। কখনও বা ভাটির দিকে, কখন বা উজানের দিকে যায়। পশুর মধ্যে হস্তী প্রভৃতিও যথাকালে এক স্থান হইতে দলে দলে অন্য স্থানে যায়। কেবল যে নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণই দেশভ্রমণ করে, তাহা নহে; মানুষও অসভ্যাবস্থায় দলে দলে স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করে। এক স্থানে থাকে না। সবই দেখা যাইতেছে যে, দেশভ্রমণ কাণ্ডটা অনেক জীবের মধ্যেই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু পক্ষিগণের দেশভ্রমণে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহারা আদিকাল হইতে যে যে পথে ভ্রমণ করিতেছে, সে সেই পথেই বংশানুক্রমে ভ্রমণ করে। যে জলের উর্দ্ধ দিয়া যায়, সে চিরদিনই ঐ পথে যায়। যে স্থলের উপর দিয়া যায়, যে চিরদিনই তদ্রূপ করে। ইহাদিগের এই স্বভাব জানা থাকিলে ভ্রমণপথ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে কোন স্থান পূর্ব্বে জলময় ছিল, কোথায় বা স্থল ছিল। কোকিলের স্বভাব স্থলপথের উর্দ্ধ দিয়া ভ্রমণ। যদি কখনও কোকিলকে জলরাশির উর্দ্ধ দিয়া যাইতে দেখা যায়, তবে মনে করিতে হইবে যে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে স্থল ছিল, এখন জল হইয়াছে। তাই কোকিল চির-স্বভাববশতঃ ঐ পথেই যাইতেছে। ইহা হইতে ভূপৃষ্ঠের অবস্থার পরিবর্ত্তন অনেক জানা যায়।

আর পক্ষিগণের দেশভ্রমণের যেমন নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, তেমনই নির্দ্দিষ্ট দিকও আছে। উহারা প্রায়ই উত্তর হইতে দক্ষিণে, অথবা দক্ষিণ হইতে

উত্তরে যায়। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধের পক্ষিগণ দক্ষিণ দিকে, এবং দক্ষিণার্দ্ধের পক্ষিগণ উত্তর দিকে ভ্রমণ করে। ইহাও একরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে। যদিও এ নিয়মের ব্যভিচার কোনও কোনও স্থলে দৃষ্ট হয়, তথাপি মোটের উপর এ কথা সত্য।

দেশভ্রমণ যখন অনেক জীবেরই স্বভাবসিদ্ধ দেখা যাইতেছে, তখন ইহার কারণও সাধারণ হইবে। এই কারণ কি? অনেকেই মনে করেন যে, আহার-অন্বেষণই ইহার কারণ। যখন এক স্থানে আহারের অসদ্ভাব ঘটে, তখন অন্য স্থানে যায়। পক্ষিগণও আহারের নিমিত্তই দেশভ্রমণ করে। এই সত্য হইলেও, আমার বোধ হয় যে, ইহা ব্যতীত অন্য কারণও আছে। ডিম্বপ্রসবও ইহার অন্যতর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। চড়াই-শ্রেণীর মধ্যেও আমি অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহারা গ্রীষ্মকালে ও বর্ষার প্রারম্ভে এই দেশে থাকে। একটি চড়াই আমার বসিবার ঘরে ছাদের নীচে তীরের উপর বাসা করিত। সে প্রতি বৎসরই এক স্থানে বাসা করিত। আর বাসা করিয়া অল্প দিন পরে ডিম পাড়িত। মৎস্যগণ দলে দলে ভ্রমণ করে, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ঐরূপ করে। উহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যে যেখানে সুবিধা বোধ করে, তীরের মধ্যে, অথবা তীরের উপর, জলের মধ্যে, কি নদীর তলায়, যে স্থানে সুবিধা পায়, সেই স্থানেই ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বপ্রসব যেন ভ্রমণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই এ সকল ক্ষেত্রে অনুমান হয়। যাহা হউক, আহার-অন্বেষণ ও প্রসব, এতদুভয়কেই দেশভ্রমণের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

আহারের অভাব হইলে সভ্য মানুষও দেশ হইতে দেশান্তরে যায়, কেবল অসভ্য মানুষই যায় না। ভ্রমণকাল উপস্থিত হইলে পক্ষিগণ এত উত্তেজিত হয় যে, উহাদিগকে কোনও প্রকারেই নিবৃত্ত করা যায় না। সে সময়ে যদি বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বদা বাহির হইয়া যাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করে। পিঞ্জরপার্শ্বে মাথা ঠুকিতে থাকে, এবং বারংবার এইরূপ করিতে করিতে মরিয়া যায়; তথাপি বহির্গত হইবার চেষ্টা ত্যাগ করে না। এ বৃত্তি এতই প্রবল। কিন্তু ইহাকে বৃত্তি বলাও সঙ্গত হয় বলা যায় না; কারণ, বৃদ্ধ পক্ষিগণ ছানাগুলিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ক্রমশঃ ভ্রমণ শিক্ষা দেয়। ইহারা প্রত্যেক পুরুষ পরম্পর পুরুষক্রমে ভ্রমণ শিক্ষা দিয়া থাকে। সুতরাং

ইহাকে বৃত্তি বলাও ঠিক হয় না। যাহা হউক, দেশভ্রমণ ব্যাপারটি ইহার বংশানুক্রমিক বৃত্তির মধ্যেই হইয়া গিয়াছে। নতুবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতে যাওয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া ও বহু দিন পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসা, এ সকল কেমন করিয়া হয়, তাহা বুঝা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে নিউজিলাণ্ড, এত দূরের পথ মনে রাখা ও যাওয়া আসা কিরূপে সম্ভব হয়? আহার-অন্বেষণ বা ডিম্ব-প্রসব, যাহাই কারণ হউক, নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহু দূরের পথ, বহু দিন পরে কিরূপে ইহারা যাওয়া আসা করে, তাহা বুঝা সহজ নহে। এ নিমিত্ত ইহাকে বৃত্তির ন্যায় বলিতেছি। ইহার কারণ এ পর্য্যন্ত বুঝা যায় নাই। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

কোথায় যাইবে, কোন্ পথে যাইবে, কোথায় ফিরিয়া আসিবে, এ সকল পক্ষিগণ কিরূপে স্মরণ রাখে? যাহাদিগের স্মৃতিশক্তি এত প্রবল, তাহাদিগের মস্তিষ্ক অত অনুন্নত কেন? এ সকল কথার আলোচনা আবশ্যক। অদ্যত্র এ পর্য্যন্ত ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। এ দেশে কেহ চেষ্টা করিবেন কি? এক জনের চেষ্টায় এ সকল কার্য্য হওয়া কঠিন। অনেকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এ কার্য্য এতদ্দেশীয়গণের অসাধ্য নহে। আমরা পূর্ব্বে প্রৈমিক ছিলাম; এখন রাজনীতিক হইয়াছি। জ্ঞানপিপাসু কখনও হইব কি? প্রশ্নের উত্তরপ্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গবধূর প্রতি।

তুমি ছিলে আদি যুগে সম্পদের পূর্ণ কমিলায়
লক্ষ্মীরূপে অমরার সিংহাসনে। পূজিত তোমায়
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ নত পূজা-উপচারে,
তোমার কটাক্ষপাত্রে বিকানি' উঠিত ভবে ভারে
নন্দনের পত্র পুষ্প—যেত বহি' প্রবাহ সুধার,—
ত্রিলোক হারা'লে তোমা' সর্ব্ব স্বর্গ হইত আঁধার,

[illegible]
তব অভিলাষে মেরা নিত্য-কাজ চলে যত সুখে
যোগায়ে ঘটিত নিত্য চরণে পুষ্পিত্র কে মম ;
মাধীয় মাটির আই মেরা ভাগ আর নিরুপম।

একমাত্র সাথি ! মর্ত্তে তুমিই সে বেদনা প্রাচীন
সকল-বিস্মৃতি ভরা তমুখানি ঘেরেছ বরীন।
তবুও তোমায় কত নিশিভোর মেরা-নিশ্রণ
সহসা মেরায় আতি করিয়াছে মরেছে মোচন।
একত্রিত বিশ্ব সহ ছেড়ে গেছে উদাস-মেরাণী,
তোমারে তাতে ফেলি ! তুমি কত সহজে আমার !
চিত্রিত মেরাসরাগে আমে মনে পরানের সুখে,
আঁকুটি বিহ আমে ভরাচর দিয়ে ভাল মুখে,
তবুও সঙ্গিত মনে বাহুপাশে নিয়েছিনু টানি,
মেরাস্থধারা ভরা মুখ কয়ে সারা বিশ্বখানি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মৃগিরাজ্ঞা।

১

যে বৎসর প্রথম ঠাকুরটী প্রেগগ্রস্তা এক হতে মৃত্যু ও অপর হতে পেয়া [illegible] করিতেছিল, এবং সমস্ত নগরবাসী ভয়ে ও মানে অস্থির হইয়া সহরের উত্তরাংশে বাসভবনে পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সময় হেমকুমার ঠাকুরের পরিবারবর্গ লইয়া দীর্ঘকালের জন্য [illegible] করিয়া অমরপুরে পৈতৃক বাসভূমিতে লইয়া আসার প্রস্তাব করিল। [illegible] তাহাদের বাটীর আগমনে সম্মতি দিয়া চিঠি লিখিল। তাহাদের [illegible] সংবাদ পাইয়া আমিতে সহজ হইতেছে না বলিয়া দুই মাসের [illegible] তাহারা মুক্তাগাছা নগরে আসিয়া অবস্থান করিত; এখনে [illegible] ঘাটের [illegible] [illegible] [illegible]

পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পল্লীগ্রামের নিরীহ বালকের দল যখন দেখিল যে, তাহাদের জমীদার বাবু তাহাদেরই মত হস্তপদবিশিষ্ট মানব, কেবল তাঁহার নয়নযুগলের সম্মুখে একজোড়া "কাঁচের পর্দ্দা" মাত্র অতিরিক্তভাবে বর্ত্তমান, তখন তাহাদের অস্থির হৃদয় কতকটা শান্তভাব ধারণ করিল। এইরূপে জমীদার বাবুর গ্রামে শুভাগমন ব্যাপারটি যে সকল কৌতূহল আগ্রহ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল, সেগুলি সম্পূর্ণ ভাবে পরিতৃপ্ত হইবার পূর্ব্বেই হেমন্তকুমার এমন একটি কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিল যে, সাধারণে, বাহিরে না হউক, অন্তরের মধ্যে কিছুতেই তাহার কৃশিকা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতির অনুমোদন করিতে পারিল না।

কমলদহে আসিবার কিছু দিন পরে হেমন্তকুমারের পত্নী সুকুমারী একদিন স্বামীকে কহিল, "এমন জায়গা ছেড়ে কলকেতা যেতে আমার একটুও ইচ্ছা করে না; কেমন খোলা নির্জ্জন জায়গা—গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি নেই, কোলাহল অশান্তি নেই।" হেমন্ত কহিল, "তোমার একখানা কাব্য লেখা দরকার হয়ে পড়েছে সুকু!" সুকুমারী কহিল, "না, সত্যি, ঠাট্টা নয়; আমি এখানেই থাকবো। কলকেতা যেতে হয়, তুমি যেও।"

হেমন্ত কহিল, "কি রকম হ'ল কথাটা?"

সুকুমারী। "তা নয় ত কি? তুমি ত তোমার সঙ্গীতসমাজ, বন্ধুবান্ধব, এ সব ছেড়ে এখানে থাকতে পারবে না;—এ অজপুর বিজন বন, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, শিয়াল ডাকছে!"

হেমন্তকুমার সুকুমারীর কপোলে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল, "মরি মরি,—এমন না হ'লে আর প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী তুমি! কলিকাতায় যেন, পাওনাদার, ধুলো, চিমনীর ধোঁয়ার মধ্যে না পাঠিয়ে আমাকে যেন বীপান্তরে পাঠাও না!"

সুকুমারী মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন, কথাটা কি আমার অন্যায় হয়েছে?"

"নিষ্ঠুর নারী—আমি পাড়াগাঁ, সহরবাঁ, মত শত বুঝি না। তোমার মুখখানি দেখতে পেলে সব জায়গাই আমার পক্ষে সমান" বলিয়া হেমন্ত সাদরে পত্নীর কোমল অধরে চুম্বন করিল। সেই দিনই স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া কমলদহে স্থায়িভাবে বাস করিতে হইলে বাটীর যেরূপ সংস্কার আবশ্যক, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিল।

ইহার দুই তিন দিনের মধ্যেই বাড়ী মিস্ত্রীর কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দীর্ঘ আন্দোলনের সংস্কার হইতে লাগিল। খড়খড়ি বিনমিনিতে রঙ পড়িল। লোহিত মৎস্য রক্ষার জন্য সুদৃশ্য ফোয়ারা বসিল, গেটের পথে বাঁশের বেড়া, এবং বাড়ী বারান্দার থামগুলির অন্তরালে নানাবিধ রঙ্গীন বিধাতী বৃক্ষের গাঁদ বসান প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার ও সজ্জার ধুম পড়িয়া গেল।

২

হেমন্তকুমারের সুবৃহৎ অট্টালিকার পশ্চাতে তাহাদের একখানি ক্ষুদ্র বাগান ছিল। তাহার পশ্চাতে অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের জীর্ণ বাটীর পার্শ্বে তাহাদের আর একখানি যে বৃহৎ বাগান ছিল, এক দিন তথা হইতে ফিরিয়া হেমন্ত সুকুমারীকে কহিল, "একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে সুকু!" "কি?" "এই খিড়কীর ছোট বাগানখানার সঙ্গে ওদিককার বড় বাগানখানা মিশিয়ে দেওয়া যাক্। চারি ধারে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে মধ্যে বেশ একটা মাঝারি রকমের দীঘী কাটানো যাবে:—একখানা জলিবোট আনাব, যায় দীঘীর মধ্যে পাথর দিয়ে একটা ছোট পাহাড় করব, কি বল?"

আঁচলের খুঁট দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া সুকুমারী কহিল, "বেশ ত! কিন্তু নাঝের ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটা তা হ'লে কোথায় যাবে?"

"কেন, ওটা ফিনে ফেলবো যে!"

"আর ওরা যদি না দেয়?"

"না, দেবে না! টাকা পাবে,—দেবে না কেন?" "তা হ'লে বেশ হ'বে কিন্তু!" উদ্যানের পরিসরবৃদ্ধির প্রস্তাবটি উভয়ের অনুমোদিত হইলে, হেমন্তকুমার ভবহরিকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। এ প্রস্তাব ভবহরির নিতান্ত সমস্ত মনে হইল। তখন একদিন জমীদারবাটীতে সেই জীর্ণবাটীর অধিকারীর তলব হইল।

হেমন্তের প্রতিবেশী মহেন্দ্রনাথ মিত্র কমলনাথের উপকণ্ঠে পাটের কলে কাজ করিত। বেতন মাসে ত্রিশটি টাকা। সংসারে স্ত্রী ও সপ্তমবর্ষীয়া একটি কন্যা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সুতরাং ঐ অল্প আয়ে বিনাড়ম্বরে ও বিনা-ক্লেশে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। মহেন্দ্রনাথের একটি গুরুতর দোষ ছিল যে, সে কাহারও সহিত মিশিতে পারিত না। লৌকিকতার সে বড় একটা ধার ধারিত না, এবং গৃহের বাহিরে সমাজের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করিতে তাহার সাহসে কুলাইত না। কেমন একটা এলোমেলো

থাকিয়া প্রতিটি তাহার হৃদয়কে এমন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে তাহার অমূল্য সময়ের কিয়দংশ পাটের স্কন্ধে অতিবাহিত করিয়া অবশিষ্ট সময় গৃহদুর্গে পত্নী ও কন্যার সহিত লীলাচ্ছলে অতিবাহিত করিত। ইহাতে পত্নীর চক্ষে সে কোনও দুঃবিত নিমাচরণগঙ্গীর সহিত উপমিত হইলেও, হাস্যাস্পদ হইত না। কর্ম্মনামক জীবটি যেমন রাহিয়ে আপনার মায়াটা ক্ষণকালের জন্য নাড়িয়া চাড়িয়া নিতান্ত সহজ পরিতৃপ্তির সহিত পুনঃ পুনঃ কঠিন আবরণের মধ্যে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখে, তেমনই মহেন্দ্রনাথ কার্য্যের কিয়ৎক্ষণের জন্য মস্তক নাড়িয়া আপনার গৃহাবরণের মধ্যে আসিয়া পরিপূর্ণ শান্তি অনুভব করিত। পাড়ার লোকে এই নিঃসম্পর্ক ও নির্ব্বন্ধটি মানুষটির প্রতি যেটুকু স্নেহ বা সহানুভূতি দেখাইত, সেটুকু শুধু তাহার স্বর্গীয় পিতার পরোপকারপ্রসূত; নতুবা মহেন্দ্র কখনও পল্লীতে এমন অবসর দান করে নাই, যাহাতে পল্লীর সহিত তাহার হৃদয়ের সম্বন্ধটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

মহেন্দ্রনাথ যখন সন্দিগ্ধহৃদয়ে জমীদারের নবসজ্জিত ভূমিকক্ষে ভজহরির সহিত পদার্পণ করিল, তখন হেমন্তকুমার হার্ম্মোনিয়মে একটা গৎ বাজাইতেছিল। ভজহরি কহিল, "মহেন্দ্র বাবু এসেছেন।"

বেহালার অন্তরাটা অসমাপ্ত রাখিয়া হেমন্তকুমার কহিল, "বসুন, আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।"

বিস্মিতভাবে মহেন্দ্র কহিল, "আমার সঙ্গে বিশেষ কথা?—বলুন।" তখন হেমন্তকুমার উদ্যানবেষ্টনকল্পে মহেন্দ্রনাথের জীর্ণবাটীটি তাহার নিকট ক্রয় করিতে চাহেন, এইরূপ অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করিলেন, এবং বাড়ীখানি কতগুলি মূল্যের বিনিময়ে মহেন্দ্রনাথ হস্তান্তরিত করিতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেও ভুলিলেন না। বিস্মিতভাবে মহেন্দ্র কহিল, "কত টাকা চাই? কেন, বাড়ী ত বাড়ী বিক্রী হবে না।" হেমন্ত কহিল, "আপনার ন্যায্য দামের চেয়ে বেশী পাচ্ছেন, তবু বেচ্‌বেন না?" মহেন্দ্র করযোড়ে কহিল, "আপনাকে মাপ করবেন—ও বাড়ী আমি ছাড়তে পারবো না।" ভজহরি কহিল, "এমন পাপ্পেও ত দেখিনি মশায়, বাবু কিনতে চাচ্ছেন,—ঐ ছুটো বাগান এক করে কেলা হবে, মধ্যে আপনার বাড়ীটা থাকবে,—তা হচ্ছে না; এই সামান্য কথাটা বুঝতে পাচ্ছেন না মহেন্দ্র বাবু?" মহেন্দ্র কহিল, "ক্ষমা করুন মশায়—আমি সেন বুঝেছি—আপনারা একথানা

[illegible] আমাকে [illegible] "[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

সেই দিন রাত্রে হেমন্ত ভূতহরির কথা শুনিতে লাগিল, শুনিয়া যেন কাহার তাহার নিকট শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন মহেন্দ্রনাথ শুনিল, যদি সে ভাস ঘরখানা বাড়ী ছাড়িয়া না দেয় ত তাহার নামে বাকীখাজনার নালিশ রুজু হইবে। বেচারী স্তম্ভিতভাবে গৃহে আসিয়া পত্নী মনোরমাকে সমস্ত কহিল। মনোরমা দন্ত দ্বারা রসনা চাপিয়া কহিল, "ছি! ছি! তা কখনও হতে পারে! সত্য কি এমন কলি হয়েছে!"

মহেন্দ্রনাথ কহিল, "ওরা যে বড়লোক মনু! ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে কি আমি এখানে টেঁকতে পারব?"

মনোরমা কহিল, "সে কথা ঠিক্। তা কাজ নাই এ সব গোলমালে; বাড়ীখানা বরং ছেড়েই দাও না। দেখ দিকিনি, ক'দিন ভেবে ভেবে তোমার রং যেন কালী মেড়ে গেছে; সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবলই ভাবছ!"

মহেন্দ্রনাথ কহিল, "তা হবে না মনু। বাড়ী আমি ছাড়তে পারব না। বড়লোকের গায়ের জ্বালে আজ বাড়ী ছাড়ব, তার পর কাল যদি মাথুরটী ছাড়তে বলে?"

"তোমার এক কথা!"

মহেন্দ্রনাথ। না মনু, তুমি আমাকে জ্বালাতন যাও। তুমি বাড়ী ছাড়বার পরামর্শ দিও না। বল কি? ওরা মিছামিছি নালিশ করে বাড়ী কেড়ে নেবে?"

"হাঁ, অমনি নিলেই হ'ল! মগের মুলুক কি না! ধর্ম্ম কি একেবারেই নেই!"

"তা ত বুঝি; কিন্তু ধর্ম্ম ত এ সব সইছেন।" মহেন্দ্রের চক্ষু হইতে সত্যই দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। "ওকি কাঁদছ নাকি! না, কেঁদ না" বলিয়া মনোরমা তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়া মহেন্দ্রের চক্ষু মুছাইয়া দিল। তাহারও চক্ষে জল আসিয়াছিল। সে তাহা সংবরণ করিবার জন্য জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

* * * * *

বৃদ্ধ জমিদার কর্ম্মচারীর সাহায্যে যাহা হইয়া থাকে, এ স্থলেও ঠিক তেমনি হইল। নির্দ্দোষী মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাকীখাজনার দাবী দিয়া মোকদ্দমা কোর্টে নালিশ রুজু হইল, এবং উকীল মোক্তারের হুতোনালো ও বক্তৃতার কথিবার তদ্বিরের পক্ষ অনায়াসে মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইল। অবশেষে-

[illegible] হেমন্তকুমারের নিকট [illegible] এবং [illegible] ভিক্ষা চাহিল। হেমন্তকুমার মহেন্দ্রনাথের [illegible] আমোদন অগ্রাহ্য করিয়া যা।

সে রাত্রে মহেন্দ্রবাবু মনোরমার নিকট কিছুতেই আপনার অন্তর্বেদনা লুকাইতে পারিল না, এবং মনোরমাও এমন একটি কথা খুঁজিয়া পাইল না, যাহা দ্বারা স্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করে। দুঃখে শোকে তাহার হৃদয়ও আজ একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আজিকার নারীহৃদয়ের মরণ বর্শাবিদ্ধের উপর আজ যে নির্মম আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহার মর্মের সমস্ত বন্ধনগুলি ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে! আজিকার ঘটনা তাহার নিকট যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। ইহাও কি সম্ভব হইতে পারে? যাহা একেবারে মিথ্যা, তাহা সত্যের ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও কি করিয়া যে সাধারণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিতে পারে, এ কথাটি মনোরমা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

৩

যে সময়টুকুর মধ্যে হেমন্তকুমার, অঘোরি প্রভৃতি মিলিয়া মহেন্দ্রনাথের দুর্দশার কারণ হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়টুকুতে নিধিভাণ্ডারপুরুষ তাঁহার আর একটি গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপ্রহরে প্রস্থান করিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্নে হেমন্তকুমারের বর্ষবর্ষীয়া কন্যা বীণা উদ্যানে [illegible] একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পের পশ্চাতে ধাবিত হইবার সময় মহেন্দ্রনাথের সাটীর ভ্রাতা জানালার সম্মুখে একটি ফুটফুটে মেয়েকে পুতুল খেলিতে দেখিয়াই ধীরে ধীরে জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি বীণাকে দেখিয়া বিচলিত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ভাই?" "আমি বীণা।" "তোমরা বুঝি ঐ বড় বাড়ীতে থাক?" "হাঁ।" "ঐটে বন্ধুদিদির—বুঝি তোমাদের বাগান?" "না।" "তুমি বাগানে কি করছিলে?" "প্রজাপতি ধরছিলুম; তার পর তোমাকে দেখ্‌তে পেলুম।" ক্রমে আরও নিকটে আসিয়া বীণা কহিল, "তুমি ও কি খেল্‌ছ ভাই! আমাকে নিয়ে খেল্‌বে?" "খেল না; তুমি ভাই আমাদের বাড়ী জানবে?" চারি ধারে চাহিয়া মৃদুস্বরে বীণা কহিল, "না ভাই, দেখে যদি মা জান্‌তে পারে, তা হ'লে যদি বকে? তার চেয়ে তুমি এই বাগানে এস না কেন?" "তোমায় মা যদি বকে?" "মা জান্‌তে পারবে না; মা-ও তো যাবে না।" "আচ্ছা, খেলবো ভাই, আমাকে কল দেবে?" "দেবো—

তোমাকে কি বলে ডাকবো?" "আমার নাম শুভা। বাবা মা আমাকে ভাই কিনু টুনু বলে ডাকে।" "আচ্ছা ভাই টুনু, রোজ বিকেলে আমরা এখানে এক সঙ্গে খেলা করবো। দুপুর বেলা আসতে পারবো না।" শুভা কহিল, "কিন্তু ভাই, তোমরা বড়মানুষ,—আমার সঙ্গে খেলতে গেলে তোমার মা বদি বকে।" "না ভাই, মাকে বলব কেন? মা কিছু জানতে পারবে না।"

সেই দিন এই বালিকা দুইটি নির্জনে পরস্পর হৃদয়-বিনিময় করিল। মনোরমা জানিল, শুভাকে কহিল, "ওদের বাড়ীতে যেও না যেন, ওরা বড়মানুষ; খেতে দেই।" শুভা মাতার কথা রক্ষা করিয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও সে কখনও বীণাদের বাড়ী যাইতে চাহিত না।

বীণাও সাহস করিত না। বীণা দুই একবার গোপনে শুভার বাড়ী খাবার খাইয়া গিয়াছে। আর শুভার আদর করত। কিন্তু শুভাদের বাড়ী যাইতে তাহার বড় একটা সাহস হইত না, কি জানি যদি মা জানিতে পারে। তাহা হইলে সে বাগানেও আসিতে পাইবে না,—শুভার সঙ্গে খেলিতে পাইবে না।

এইরূপে যখন দুইটি পরিবারের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক সমাকৃষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ে এই বালিকা দুইটি সমস্ত দ্বেষ হিংসা হইতে পৃথক থাকিয়া পরস্পরকে অতিরিক্তভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। হায়! এ জগতে শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাসের অকৃত্রিম অনুরাগ কত অল্প, কত ক্ষণিক!

৪

স্বগৃহে বাস করিবার জন্য মহেন্দ্রনাথ হেমন্তকুমারের নিকট হইতে এক মাসের জন্য যে সময়টুকু ভিক্ষা মাগিয়া লইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইতে দুই দিন মাত্র বিলম্ব আছে। চলিয়া যাইবে বলিয়া তাহার সহিত বীণার ছেলের বিবাহ দিবার জন্য শুভা তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে সে দিন বিপ্রহরে ক্ষেমঙ্করী ও সুকুমারী সুসংস্কৃত গৃহপ্রাচীরের ভাল ভাল ছবি খাঁটিতে ব্যস্ত ছিল, বীণা সেই অবসরে একটি আয়নার কাছে লইয়া মহেন্দ্রের জীর্ণ জামাখানার ধারে আসিয়া ডাকিল, "টুনু!" টুনু বাগানে আসিল। বীণা কহিল, "এই দেখ ভাই, গায়ে হলুদ এনেছি।" বলিয়া আয়নার বাক্স খুলিয়া 'এসেন্সের কাগজ', 'ওড়না', 'পুঁতির মালা' প্রভৃতি বাহির করিল। শুভা কহিল, "আমি ভাই মাকে বলেছিলুম।

মা বেশ পুঁথির গল্প তৈরি করতে পারে; যদি পাঁচ ছয় পুঁথির পাতা লাগে দেবে। আর 'ভাঙা' শাড়ি কোথায় পাব বোন! মা ত তাই আমি, কাপড় পরে না।" বলিয়াই একটা কাপড়ের মোড়ক খুলিয়া পুঁথির গোছা বাহির করিল। বীণা কহিল, "বাঃ! দিব্যি ত! এত ছিল—আমায় কি দেবে তাই? তা এখন এসব নিয়ে যাই; জল ঝরে দেখিগে;—আমি পড়তে পড়তে পালিয়ে এসেছি, এখানে যদি দৌড়ে পড়ে! বন্যার সময় আসব এখন! ভুলিও ভাই! তোমার মাকে 'তত্ত্ব' দেখাওগে।" বীণা চলিয়া গেল।

তুমি পাটোর্ণো প্রেম লইয়াছিল। কেনও বাড়ী ছিল না! বীণা অন্তভাবে উঠিতেই বারান্দায় একেবারে কুসুমাক্ষীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল;—অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে গিয়া তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরে কাপড়ের মোড়ক যেমনই বড় বড় দেখা করিল, অমনই কুসুমাক্ষীর তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে অতিরিক্ত ঘটিল না! কুসুমাক্ষী কহিল, "কি রে!" সর্বনাশ! বীণার চোখ দুটা ছল ছল করিয়া উঠিল। কুসুমাক্ষী কহিল, "ও কি ও? পেটের কাপড়ে লুকোচ্ছিস্?" "না না" বলিয়া করুণদৃষ্টিতে সভয়ে বীণা মাতার প্রতি চাহিল। মাতা কহিল, "দেখি!" বীণা তখন পোপন রাখা সম্ভব মনে করিল না!

কুসুমাক্ষী কহিল, "এ সব কোথেকে পেলি?" ঢোঁক-গুলাইয়া অভিমানের সুরে বীণা কহিল, "উঃ!" কুসুমাক্ষী কহিল, "বল্; না হলে এখনি সব ফেলে দেব!" বীণার মনে বড় আঘাত লাগিল। যাহাই হউক, আত্মসম্ভ্রমের বশে সে কহিল, "ওদের বাড়ীর মেয়ে যে দিলে!" কুসুমাক্ষী কহিলেন, "কাদের বাড়ীর মেয়ে?" "ঐ যে—ঐ বাগানের পাশে ভাঙা বাড়ী যাদের!" "তার সঙ্গে তোর দেখা হ'ল কি করে?" "বাগানে গেছলুম।" "বটে, এই সব করে' বেড়াচ্ছ এখানে!—ওদের মেয়ের সঙ্গে তোর ভাব হ'ল কি করে?" বীণা কম্পিতস্বরে কহিল, "ও নিজে থেকে করলে!" "বটে? ও ভাব করতে লাগিয়ে এসে—না? দিদ্বা, তোর বাবাকে বলে দিচ্ছি।" বীণা ব্যস্তভাবে কহিল,—"না না, বাবাকে বলো না; বাবা মারলে না হ'লে!—টুনু খুব ভাল মেয়ে মা, সে আমাকে খুব ভালবাসে।" বীণার বড় কষ্ট হইতেছিল। ওতার মা তাহাকে এত ভালবাসে, আর তাহার মা ওতাকে একটুও ভালবাসিবে না? কুসুমাক্ষী কহিল, "এ সব কথা শুনিস নি কেন আমাকে?" "যদি তুমি বকো।

টুনুর মা বলে—আমরা বড়মানুষ, তায় গরীব মানুষ ; বিশতে নেই ; কিন্তু ঐ বড়মানুষের ছেলেও ভালো না ; কেউকেটার মুখের কোনও মেয়ে আমাকে তত ভালবাসত না!" ক্রমে পুকুলের বিবাহপ্রসঙ্গ বীণা মাতার গোচর করিল। সুকুমারী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা দেখি, কি রত্ন নিয়ে তোর বৌকে?" বীণা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে তাড়াতাড়ি মাতার সম্মুখে কাগজের মোড়া খুলিয়া পুরির গহনা বাহির করিতে লাগিল। সুকুমারী কহিল, "তুই কি দিলি?" মুখখানা গম্ভীর করিয়া বীণা কহিল, "আমি আর কি দেব? সেই জরীর কাপড় ছেঁড়াটুকু দিয়েছি, আর ওতনা দিয়েছি।" "আচ্ছা, তুই ও ভালো জিনিস দিস,—এখন দুপুরবেলা এই রোদে ছুটোছুটি করে না; বই নিয়ে আয় একটু পড় দেখি।" বীণা ক্ষুণ্ণমনে পুস্তক আনিতে গেল। সুকুমারী যে কাগজের মোড়কে গহনা পুরিয়া দিয়াছিল, সেটা তুলিয়া পড়িতে লাগিল। সেটা একখানি পত্রের ছিন্নাংশ। পত্রখানি স্ত্রীলোকের লেখা। যতটুকু পাঠ হয় তাহা এইরূপ :—

"হুমুম। কি আর করবে বল—সবই অদৃষ্ট! না হলে সুকুমারী এমন ভাব, সে জানত! যখন স্কুলে পড়তে, তখন তার সঙ্গে 'মণিমালা' পাতিয়ে ছিলে না? ও' জন্মে কত ভাব ছিল। আজই না হয় কপালে দুঃখ—তোমার স্বামী গরীব, আর সুকুমারীর অদৃষ্টগুণে ধনীলোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাই! ছেলেবেলাকার ভালবাসা কি এমনি করে ভোলা যায়? বড়মানুষের স্ত্রী হয়ে সুকুমারী বোধ হয় 'মণিমালা' বলে তোমায় না চিনতে পারে, কিন্তু তাই বলে এমনি করে কি পেছনে লেগে ভিটেছাড়া করতে হয়! আহা! বেচারী মহেন্দ্রবাবু; তাঁর বোধ হয় খুবই প্রাণে লেগেছে—তা আর জানবে না বই! নিরপরাধে মানুষ! সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। এ রকম করে পালানো কি ভাল! যাই হোক্, ইনি বল্‌লেন, তুমি না হয় দুদিন এখানে বেড়িয়ে যাও—তবু মনটা একটু যদি শোধরায়! আমরা ও তাই সমীরার মানুষ নই, আর আমার সঙ্গে কখনও ত মণিমালা পাতাও নি—তার পরে বল—" অবশিষ্ট অংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পত্রাংশটুকু পাঠ করিয়া সুকুমারীর মুখের ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইয়া উঠিল। তাহার মানসনয়নের সম্মুখে একটা পুরাতন কথা সমস্ত সজীবতা ও মধুরতা লইয়া ফুটিয়া উঠিল। সেই সুবর্ণময়, সেই বাল্যসখীগণের ক্রীড়াকৌতুক, মনোরমার সহিত 'মণিমালা' পাতানো—সেই একদিন সুকুমারীর নকল সোনার ইয়ারিং হারাইয়া গিয়াছিল—মনোরমা

তার তত্ত্ব করিয়া অন্বেষণ করিল; অবশেষে তাহা বাহির করে—মনোরমার ছোট বড় ঐশ্বর্য্য ঐতিহ্যের নিমন্ত্রণ একে একে তাহার মনোমন্দিরকে ছাপিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার পর একদিন হেমন্তকুমারের সহিত বিবাহ হইয়া গেল, এবং সেই অবধি সে পিত্রালয়ে যাইতে পাইত না,—সুতরাং নানাবিধ আবেগে-মনোরমার কোনও সন্ধান হইতে পারে নাই। আর আজ সেই বাল্য-সখী—সেই সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনী 'মণিমালা' এত নিকটে! সেই 'মণিমালা' তাহারই পরিচ্ছদ ধোয়ার স্ত্রী! এবং নিজের বিলাসের জন্য তাহাকে ও তাহার শ্যামা কন্যাকে সে-ই আজ গৃহত্যাগী করাইয়া পথে বসাইতেছে? ইহা কি সম্ভব? পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন সুকুমারীর চক্ষে কালো হইয়া গেল। মুহূর্ত্তেই আলুলায়িত কুন্তল সংযত করিয়া লইয়া সুকুমারী খিড়্‌কীর বাগানে নামিয়া গেল, এবং ধীরে ধীরে মহেন্দ্রনাথের ভগ্না জানালার ধারে উপস্থিত হইল। ঘরের ভিতর মনোরমা তখন টুনুকে বলিতেছিল,—"কাঁদ্‌ছিস্ কেন টুনু? তোর পুতুলের বিয়ে হবে তখন?" এমন সময় বাহির হইতে সুকুমারী ডাকিল, "মণিমালা, ও মণিমালা!" সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত আকাশটা যদি ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলেও বুঝি মনোরমা অধিকতর স্তম্ভিত হইত না। সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারী কহিল, "তোমাদের বাড়ী যেতে চাই মণিমালা।" দ্বার খুলিয়া মনোরমা বাগানে আসিল। উভয় নারীর গাঢ় আলিঙ্গনে যেন একটা অপূর্ব্ব মিলন-রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

৫

সুকুমারী কহিল, "এই রকম করে' কি শাস্তি দিতে হয়? এক দিন কি পরিচয় দিতে নেই?" মনোরমা কহিল, "পরিচয় দোব কি? যে দিন জান্‌লুম তুমি এসেছ, তার তিন চার দিন পরেই বাড়ী যাবার কথা হল।" "তাতে পরই না হয় পরিচয় দিতে!" "ভেবে দিইনি—কি জানি—" "বুঝেছি ভাই, তুমি মনে করেছিলে, যদি চিন্‌তে না পারি; তা আমি কি করে জান্‌ব বল? আজ বীণা তোমার মেয়ের কাছ থেকে পুঁথির গহনা নিয়ে গেছে, একটা কাগজে সেগুলো জড়ানো ছিল—সেটা একখানা চিঠি—সেইটে পড়েই ও সমস্ত জান্‌তে পারলুম! ভাগ্যে চিঠিখানা পেয়েছিলুম! না হলে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছিল বল দেখি!"

তাতাতাড়ি সব সমীকরণের নাবিধ কাণ্ডকারখানা হইয়া। সেই তাড়াতাড়ির

পর কুল বৃত্তৎ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। হৃদয়ের মধ্যে যে প্রীতির প্রস্রবণ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বহুদিন পরে আজ আবার তাহা সঞ্জীবিত হইয়াছে। শুভা যখন শুনিল, তাহাদিগকে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে না, বীণার সহিত এবার হইতে বেশ নিশ্চিন্তে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে খেলিতে পাইবে, তখন বীণার মাতার প্রতি তাহার খুব একটা শ্রদ্ধা হইল, এবং বীণা যে তাহার মাতার সম্বন্ধে এত অকারণ ভীতি প্রকাশ করিত, তজ্জন্য বীণার উপর একটু অভিমানও হইল। সুকুমারী শুভাকে বুকে টানিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "ভাগ্যি তোমাদের পুতুলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলে টুনু, নহিলে এমন একটা ভুল করেছিলুম যে, জীবনে কখনও তার সংশোধন হইত না।" তাহার পর বিদায় লইবার সময় সুকুমারী সকলকে পরদিন আপনার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিল। টুনুকে কহিল, "তোমার মেয়ের বৌভাতে যেয়ো টুনু!"

বীণা যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিল, তখন সে সম্বন্ধে মার কাছে শুভাদের সহস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গকে মুক্ত করিয়া দিলে সে যেমন চারিধারে ছুটাছুটি করিয়া আপনার মনের আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে, আজ বীণার গতিতে হাসিতে কথাতে তেমনই বিপুল আনন্দ উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

সেই দিন রাত্রে হেমন্তকুমার ও সুকুমারী মিলিয়া তাহাদের উদ্যানের সংস্কার-সঙ্কল্প একেবারে পরিত্যাগ করিল।

৬

মহেন্দ্রনাথ ও মনোরমাকে জমীদার-বাটীতে নিমন্ত্রণে আসিতে দেখিয়া জমীদার-বাটীর কর্ম্মচারী ভাবিল, "আহা! লোকটা একেবারে দেশছাড়া হচ্ছে কি না, তাই বাবু একদিন তাদের পেট ভ'রে পাঁচরকম খাওয়াচ্ছেন।"

ভোজনাদির পর মহেন্দ্রনাথ হেমন্তকুমারের সহিত ড্রয়িংরুমে বসিয়াছিল। হেমন্ত যথাবিহিত ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া মহেন্দ্রকে কহিল, যা হয়েছে, "আপনি তার জন্য দুঃখ করবেন না!"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ!" এমন সময়ে ভজহরি আসিয়া কহিল, "খোকাবাবু! কাল সকালে পাইক নিয়ে"—হঠাৎ মহেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে বিস্ময়ে ভজহরির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। হেমন্ত মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভজু দা'! আজ থেকে মহেন্দ্রবাবু আমাদের বিয়ের

দেখ্‌বেন। তুমি বল্‌ছিলে, তুমি একা পেরে ওঠ না। মহেন্দ্রবাবু তোমাকে সাহায্য করেন যদি, তা হ'লে ত খুবই ভাল বন্দোবস্ত হবে, কি বল!—হ্যাঁ, আর দেখ, মিস্ত্রীদের এ বাড়ীর কাজ ত এক রকম হয়েছে—তা মহেন্দ্রবাবুর ও বাড়ীখানা মেরামতের দরকার হয়ে পড়েছে। তাদের ডাকিয়ে পাঠাও; দু এক দিনের মধ্যে তারা ও বাড়ীর কাজ আরম্ভ করে দিক্!" তাহার পর মহেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপাততঃ আপনি কোথায় থাক্‌বেন, সেটা হয় ত খুব সামান্য মনে করেছেন, না মহেন্দ্রবাবু? কিন্তু সামান্য কিছু নেই! এই বাড়ীতেই এক সঙ্গে থাকতে হচ্ছে। সঙ্গী অভাবে আমাদের বড়ই কষ্ট হচ্ছিল; সে কষ্ট থেকে আপনারাই উদ্ধার কর্‌তে পারেন।"

অপ্রত্যাশিত সুখে মহেন্দ্রনাথের চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত।*

সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার সহিত বুদ্ধদেবের লীলাভূমির পবিত্র তীর্থসমূহ দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, বহু বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে আপনাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রকাশে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ আলোকিত হইয়াছে। আমরা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তিন শত বৎসরের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারি। বস্তুতঃ, চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সর্ব্বথা আলোচনার যোগ্য। অদ্যাবধি ন্যূনাধিক ৪৫ জন চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* 1. Travels of Budhist Pilgrims—S. Beal.
2. Budhist Records of Western World—S. Beal.
3. Ancient India—R. C. Dutt.
4. Ancient Geography of India—A. Cannigham.
5. উৎসাহ, তৃতীয় বর্ষ।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ফাহিয়ান চীন দেশের শান্সী নামক প্রদেশে জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম (কুঙ্)। তদীয় পিতা শৈশবেই তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধমঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসর বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এবং সেই সময়ে ফাহিয়ান নাম ও 'সি' উপাধি গ্রহণ করেন। 'সি' শব্দের অর্থ শাক্যপুত্র।

ফাহিয়ান একরূপ আজন্ম সন্ন্যাসী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ও বুদ্ধদেবের জন্মভূমি-দর্শনাভিলাষ প্রবল হইয়া উঠে। তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিনয়পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র-পাঠ ও পবিত্র বৌদ্ধতীর্থসমূহ দর্শন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন।

ফাহিয়ানের সংকল্পের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া কতিপয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার সহযাত্রী হইবার সঙ্কল্প করেন। ফাহিয়ান তাঁহাদের সমভিব্যাহারে খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রী ২-৩ চীন সাম্রাজ্যের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গম মরুপথে অগ্রসর হন, এবং সপ্তদশ দিবস লোকালয়শূন্য পথে অতিবাহিত করিয়া সেন-সেন (আধুনিক লিউনান) নামক দেশে আগমন করেন। এক মাস কাল বিশ্রামান্তে ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ সেন-সেন দেশ পরিত্যাগ করেন, এবং পঞ্চদশ দিবস পর্য্যটন করিয়া টেঙ্গিস হ্রদের নিকটবর্ত্তী উকি (কার গহর) নামক দেশে উপনীত হন। তার পর তাঁহারা উকিদেশ হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, এবং দুর্গম পথ অতিক্রমপূর্ব্বক এক মাস পাঁচ দিবসে সেটাস নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই স্থানে ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ বিশ্রামার্থ তিন মাসের অধিক অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁহারা পঞ্চ-বিংশতি দিবস পর্য্যটন করিয়া ইয়ারকন্দে উপস্থিত হন। ইয়ারকন্দে এক পক্ষ বিশ্রাম করিয়া যাত্রী দল সুঙ্গলিঙ্গ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যটনের পর কিয়েশা দেশে উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। তৎকালে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও তুর্কিস্থানের কিয়দংশ ভারতবর্ষের সীমাভুক্ত ছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে সিন্ধুনদের পশ্চিমভাগে বহু হিন্দু রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল

জনপদের মধ্যে টোমি (১), উদ্যান (২), গান্ধার (৩), তক্ষশিলা (৪), পুরুষপুর (৫) এবং নগরহার (৬) সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; তাহাদের নাম অত্যন্ত পরিচিত রহিয়াছে।

সংঘ-পরিত্যাগের ন্যূনাধিক সাত মাস পরে ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। এই সাত মাস কাল তাঁহাদিগকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। জনশূন্য মরুভূমি, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বতমালা ও বেগবতী পার্ব্বত্য নদী পদে পদে তাঁহাদের পথরোধ করিত। অপরিচিত দেশের অপরিচিত অধিবাসীর ব্যবহারে অনেক সময় তাঁহাদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিত; কিন্তু তাঁহারা সমস্ত বাধা বিঘ্নে অবিচলিত থাকিয়া, কখনও সাধুচরিত্রের আতিথ্যে তৃপ্তিলাভ করিয়া, কখনও কটুকষায় বন্য ফলমূলে উদরপূর্ত্তি করিয়া, কখনও নিরম্বু উপবাস করিয়া, জ্ঞান ও পুণ্যলাভার্থ ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় সমগ্র মধ্য-এশিয়ার অর্থাৎ চীনের পশ্চিম সীমা হইতে কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত ছিল। আমাদের যাত্রীদল এই ভূভাগে বহু সঙ্ঘ বা অর্হৎসঙ্ঘ জনপদ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান।—এই সকল জনপদ হইতেই তাঁহারা প্রথমে ভারতীয় সভ্যতার আভাস প্রাপ্ত হন। তত্রত্যবাসীরা আচার ব্যবহারে তৈমিক জাতির অনুরূপ, এবং ধর্ম্মবিষয়ে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল। ফলতঃ, তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সমগ্র মধ্য-এশিয়া জ্ঞানধর্ম্মে, শিল্পে বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ফাহিয়ান ও তদীয় সহযাত্রিগণ মধ্য-এশিয়া অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতে সিন্ধুনদের

(১) সিন্ধুনদের পশ্চিমবাহিত দার্বিসম্রাটদীর্ঘোত উপত্যকা ভূমি।

(২) বর্ত্তমান সোয়াত প্রদেশ।

(৩) বর্ত্তমান কান্দাহার।

(৪) সিন্ধুনদ হইতে তিন দিনের পথ, এবং কান্দাহার হইতে সাত দিনের পথ দূরে তক্ষশিলা রাজ্য অবস্থিত ছিল।

(৫) বর্ত্তমান পেশওয়ার।

(৬) বর্ত্তমান জালালাবাদ জেলা।

তীরে আগমন করিলে, ফাহিয়ানের সংযাত্রিগণ বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হন। অতঃপর তিনি একাকী সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া বহুপথ পর্য্যটনপূর্ব্বক যমুনার তীরবর্ত্তী চিরখ্যাত মথুরা নগরে আগমন করেন।

ফাহিয়ান ভারতবর্ষের বহু নগর ও বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবরণের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধশাস্ত্র, বৌদ্ধকাহিনী ও বৌদ্ধ কীর্ত্তির কথায় পূর্ণ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ সমস্ত পাঠ করিয়া সে সময়ের ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমরা পাঠকগণের কৌতূহলনিবারণের জন্য এখানে ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তের সারসঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

মথুরা;—মথুরার পার্শ্ববর্ত্তী যমুনা নদীর দুই তীরেই সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এইরূপ সঙ্ঘারামের সংখ্যা বিংশতি। তাহাতে তিন সহস্র শ্রমণ বাস করেন। বৌদ্ধ বিধানের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। মথুরার নিকটবর্ত্তী মরুভূমির পশ্চিমসীমান্তে পশ্চিম-ভারত। এই দেশের রাজন্যকুল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। শ্রমণদিগকে দান করিবার সময় তাঁহারা রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। রাজবৃন্দের আত্মীয় স্বজন ও মন্ত্রিগণই অন্নদানের ব্যবস্থা করেন। অন্নদান শেষ হইলে, তাঁহারা প্রধান শ্রমণের সম্মুখে গালিচা পাতিয়া উপবেশন করেন। তাঁহারা কখনও শ্রমণগণের সম্মুখে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন না। রাজগণ কর্ত্তৃক ভিক্ষাদানের নিয়মাবলী বুদ্ধদেবের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। মথুরার দক্ষিণদেশে মধ্যদেশ। মধ্যদেশ অতি সুখপ্রধান; এখানে বরফ বা তুষার দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা স্বচ্ছল; তাঁহাদিগকে লোকসংখ্যানুযায়ী কর, ভূমিকর দিতে হয় না; কেবল যাহারা রাজভূমি কর্ষণ করে, তাহাদিগকে লাভের কিয়দংশ প্রদান করিতে হয়। গমনাগমন সম্বন্ধে প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাধীনতা আছে। কোনও অপরাধীকেই শারীরিক শাস্তি ভোগ করিতে হয় না; রাজন্যবৃন্দ অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। এমন কি, কেহ পুনঃপুনঃ রাজদ্রোহী হইলেও কেবল তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলা হয়। রাজকর্ম্মীরা নির্দ্দিষ্টহারে বেতন পাইয়া থাকে। এই দেশে প্রাণিহত্যা নাই; লোকসমূহ সুরা, মাংস, অথবা পেঁয়াজ রশুন ব্যবহার করে না। কেবল চণ্ডালেরা এই

সকল জাতি অভ্যস্ত। চণ্ডালদের অন্য নাম 'বদলোক'; তাহারা নগরের বাহির্ভাগে বাস করে। যদি তাহারা কখনও নগরে বা বাজারে প্রবেশ করে, তবে সঙ্গে একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া যায়; এই হেতু জনসাধারণ তাহাদিগকে দেখিয়াই চণ্ডাল বলিয়া চিনিতে পারে, এবং তাহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে। এই দেশের লোকে হাঁস অথবা মুরগী পালন করে না; তাহাদের মধ্যে গরুর ব্যবসায়ও প্রচলিত নাই। হাট বাজারে কশাইখানা ও মদের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল চণ্ডালেরা মৃগয়া-লিপ্ত হয়, এবং মাংস বিক্রয় করে। আদানপ্রদানকালে কড়ি ব্যবহৃত হয়। এই দেশের রাজন্যবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকল ও নাগরিকগণ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর হইতে শ্রমণবর্গের জন্য বিহার-নির্ম্মাণ ও তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য ভূমি, গৃহ ও উদ্যান দান করিয়া আসিতেছেন। এক রাজার পর আর এক রাজা তজ্জন্য তাম্রলিপি দান করিয়া থাকেন; এই কারণে কেহ সে সমুদয় বাজেয়াপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুবর্গ নিরুপদ্রবে ঐ সমস্ত ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বিহারসমূহে প্রত্যেক শ্রমণের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে; এই সকল স্থানে তাঁহারা লোকহিত, শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যানে নিরত থাকেন।

কণোজ;—এই নগর (১) গঙ্গার তীরে অবস্থিত। কণোজে দুইটিমাত্র সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। সেখানে হীনযান-মতাবলম্বী শ্রমণগণ বাস করেন। কণোজের অনতিদূরে পশ্চিম দিকে একটি স্থানে বুদ্ধদেবের শুভাগমন হইয়াছিল। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবৃন্দের হিতকল্পে মানব-জীবনের নশ্বরতা ও দুঃখ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তদীয় শিষ্যগণ এই ঘটনার স্মরণচিহ্নস্বরূপ কণোজে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে।

শ্রাবস্তী;—শ্রাবস্তী (২) কোশল রাজ্যের রাজধানী। এই চিরখ্যাত

(১) প্রাচীন ভারতের ভূগোল নামক গ্রন্থের রচয়িতা কনিংহাম লিখিয়াছেন, ঘাগ্রা নদীর তীরবর্ত্তী গৈরাবাদ হইতে তান্ডা ও যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী এটোয়া হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত কণোজ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কণোজ রাজ্য চক্রাকারে ৬০০ মাইল ছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নামও ছিল কণোজ। হিয়াওসাঙ্ লিখিয়াছেন যে, কণোজ দৈর্ঘ্যে ৩½ মাইল ও প্রস্থে ২ মাইল ছিল।

(২) শ্রাবস্তী অযোধ্যার অন্তর্গত রাপ্তি নদীর তীরস্থিত বলরামপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পুরাকালে শ্রাবস্তী যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার বর্ত্তমান নাম সাহেত মাহেত।

নগরীর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নগরে লোকসংখ্যা নগণ্য; সর্ব্বসাকল্যে দুই শত পরিবারমাত্র বাস করিতেছে। এই নগরীতে একদা প্রসেনজিৎ রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে বহু বৌদ্ধ কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া ঐ সকল কীর্ত্তিমালার ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, বজ্র ও বিদ্যুৎপাত আরম্ভ হয়; এই কারণে তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। শ্রাবস্তী নগরী হইতে অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে সুদত্ত একটি সপ্ততল বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিহারের চারিদিকে নির্ম্মলসলিল তড়াগসমূহ, চিররক্ষিত তরু-পূর্ণ বনরাজি ও বিচিত্রবর্ণ অসংখ্য পুষ্পশোভিত উদ্যানমালা পরিদৃষ্ট হয়। ইহার নাম জেতবন। এই স্থানে মানব জাতির উদ্ধারকর্ত্তা পঞ্চবিংশতি বৎসর বাপন করিয়াছিলেন। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের রাজন্যবৃন্দ এই জেতবনে কথার্থ দান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই দান লইয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। সমস্ত রাত্রি জেতবন উজ্জ্বল দীপমালায় আলোকিত থাকিত। একবার একটি মূষিক প্রজ্বলিত শলিতা মুখে করিয়া চন্দ্রাতপের উপর নিক্ষেপ করে; তাহার ফলে সপ্ততল বিহার ভস্মীভূত হয়। এই বিহারের অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত আদিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। (১) এই জন্য জেতবনের ধ্বংস-সংবাদে সমগ্র দেশে বিষাদের ঘন ছায়া পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু ৩।৪ দিন পরে জেতবনের একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের আদিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাতে সর্ব্বত্র বিপুল আনন্দ-ধ্বনি উঠে। অচিরে দ্বিতল বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কপিলবস্তু।—এই নগরে (২) রাজা বা প্রজা, কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া

(১) বৌদ্ধ ইতিহাসে এইরূপ কথিত আছে যে, একদা বুদ্ধদেব জেতবন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় মাতার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য স্বর্গে গমন করেন। রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া তাঁহার চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধদেব প্রত্যাগত হইলে, ঐ কাষ্ঠমূর্ত্তি সচল হইয়া অন্যান্য গমন করিতে উদ্যত হয়। তখন বুদ্ধদেব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, এখানে স্থির থাক; উত্তরকালে শিষ্যগণ তোমার আদর্শে আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে।

(২) উত্তর অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত চল্লিতাল নামক নদীর তীরে নগর নামক গ্রামে কপিলবস্তু অবস্থিত ছিল,—কানিংহাম এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

সমস্ত নগর একটি বৃহৎ মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এখানে কেবল এক দল ভ্রমণ বাস করিতেছেন; অত্যতীত দশ ঘর গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ শুদ্ধোদনের জন্য প্রাসাদের অভ্যন্তরে একখানি চিত্র বিলম্বিত আছে। এই চিত্রে বুদ্ধদেবের মাতার মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে; তাঁহার পার্শ্বে শ্বেত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বুদ্ধদেব মাতার উদরে প্রবেশ করিতেছেন। কপিলবস্তু নগরে বুদ্ধদেবের জীবনের বহু ঘটনার স্মরণচিহ্নস্বরূপ স্তূপসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু সমস্তই জনমানবশূন্য! সমগ্র নগর পরিত্যক্ত পুরীর ন্যায় মনে হয়। পথে অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কপিলবস্তু-বাসীরা সিংহ ও শ্বেত হস্তীর ভয়ে কদাচিৎ গৃহের বাহির হয়।

কুশীনগর;—এই স্থানে (১) হিরণ্যবতী নদীর তীরে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। এখানে বুদ্ধদেবের অন্তিম কালের নানা ঘটনার চিহ্ন-স্বরূপ স্তূপসমূহ বিদ্যমান আছে। কপিলবস্তুর ন্যায় কুশীনগরের জনসংখ্যাও অত্যল্প। এখানে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা শ্রমণ-সম্প্রদায়ের সহিত সংসৃষ্ট।

বৈশালী;—বৈশালীর (২) উত্তর ভাগে মহাবন নামক বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে। বুদ্ধদেব এই বিহারে অবস্থিতি করিতেন। অম্বপালি নামক এক জন বারনারী বৈশালীতে বুদ্ধদেবের বাসের জন্য একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন; তিনি আপনার নির্ব্বাণ-কাল আসন্ন জানিতে পারিয়া বৈশালী নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বৈশালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, ঐ স্থানে আমার পার্থিব জীবনের বিশেষ ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন

(১) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী কাশিয়া নামক স্থানে কুশীনগর অবস্থিত ছিল।

(২) বৈশালী লিচ্ছবিগণের রাজধানী ছিল। ইহারা খৃষ্টের জন্মের কিঞ্চিদধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-এসিয়া হইতে হিমালয়ের পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং মিথিলাকে এক পরাক্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। লিচ্ছবিরা বুদ্ধদেবের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক করিয়াছিলেন। কনিংহাম বর্ত্তমান পাটনার বিকটবর্ত্তী বেসাড় নামক গ্রাম প্রাচীন বৈশালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈশালী বৌদ্ধ ইতিহাসে সুপরিচিত।

করিয়াছি। শিষ্যবিরা বুদ্ধদেবের অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া বুদ্ধদেবের সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রবল অনুরাগবশতঃ বুদ্ধদেবের অনুসরণ করিতে থাকেন। বুদ্ধদেব হঠাৎ একটি নদীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দেন, এবং তাঁহাদের ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে আপনার ভিক্ষাপাত্র অর্পণ করেন। প্রাগুক্ত ঘটনা দুইটির সাক্ষিস্বরূপ তৎস্থলে সুগঠিত স্তূপ বিদ্যমান। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির এক শত বৎসর পরে বৈশালীর কতিপয় লিচ্ছু বিনয়পিটকের নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করিয়া স্ব স্ব অভিরুচি অনুসারে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কেহ তাঁহাদের আচরণের প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা বলিতেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারেই আমাদের আচার ব্যবহার নিয়মিত হইতেছে। এই জন্য শত শত অর্হৎ ও ভিক্ষু বৈশালীতে সমবেত হইয়া বিনয়পিটকের সূত্র সকল নির্দ্ধারিত করেন।

পাটলিপুত্র;—পাটলীপুত্র মহারাজ অশোকের রাজধানী ছিল। পাটলিপুত্র মগধের প্রধান নগর। অশোকের আদেশক্রমে অদিদেবতাগণ প্রস্তর রাশি সংগ্রহ করিয়া পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ইহা প্রাচীন, তোরণ, মর্ম্মরমূর্ত্তি, কিছুই মানবহস্তনির্ম্মিত নহে। অশোকের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। মহারাজ অশোকের স্তূপের পার্শ্বেই মহাযান সম্প্রদায়ের একটি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়; এই সঙ্ঘারাম সুদৃশ্য ও মনোরম। পাটলিপুত্রে হীনযান সম্প্রদায়ের বিহারও প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দুই বিহারে ছয় সাত শত শ্রমণ বাস করেন; তাঁহাদের আচার ব্যবহার শীলভাপূর্ণ ও সুবাসিত। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সৌগতগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন; জ্ঞানান্বেষী শ্রমণ ও ছাত্রগণ অন্যত্র বিহারে শিক্ষার্থীর বেশে উপনীত হন। মধ্যভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা মগধের নগরসমূহই বৃহৎ; জনসাধারণ ধনী ও উন্নতিশীল; তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও ন্যায়বান; প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মঞ্জুশ্রী এই নগরের মহাযান সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারামে বাস করিতেছেন; শ্রমণ ও ভিক্ষুকাকেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। প্রতিবৎসর দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে দেবমূর্ত্তির অভিযান হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে নগরবাসীরা বংশদণ্ড দ্বারা চতুষ্কোণ বেষ্টনী

রথ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা বিচিত্রবর্ণ বস্ত্রে সজ্জিত করে। তাহার পর তাহারা নানা প্রকার দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্ফটিক আভরণে ভূষিত করিয়া, রথের অভ্যন্তরে কারুকার্য্যখচিত চন্দ্রাতপতলে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং রথের চারি কোণে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি উপবিষ্টভাবে স্থাপিত করে। অন্যূন বিশখানি রথ এই প্রণালীতে নির্ম্মিত ও নানা ভাবে সজ্জিত হইয়া থাকে। অভিযানের দিন বিপুল জনসমাগম হয়; শ্রমণ ও গৃহস্থ,—সকলেই উৎসবে যোগদান করে। নানা প্রকার ক্রীড়া ও সংগীত দ্বারা সমাগত জনমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময়ে গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ অর্পণ করিবার নিয়ম আছে। ব্রহ্মচারিগণ নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য আগমন করেন। অতঃপর রথসমূহ একে একে নগরমধ্যে আনীত হয়। নগরবাসীরা সমস্ত রাত্রি স্ব স্ব গৃহ দীপমালায় উজ্জ্বল রাখে, এবং ক্রীড়া কৌতুক, গানবাদ্য ও ধর্ম্মকার্য্যে নিশিযাপন করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ ও গৃহস্থগণ পাটলিপুত্র নগরের স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এই সকল চিকিৎসালয়ে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দরিদ্র, অনাথ, বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন লোকসমূহ আশ্রয়লাভ করে। তাহারা এখানে বিনাব্যয়ে সর্ব্ব-প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসকগণ সবিশেষ মনোযোগসহকারে তাহাদের ব্যাধি পরীক্ষা করিয়া আবশ্যকমত ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়া আপনাদের সুবিধামত যথাস্থানে প্রস্থান করে।

রাজগৃহ;—রাজগৃহ দুই ভাগে বিভক্ত,—নূতন ও পুরাতন। মহারাজ অজাতশত্রু নূতন রাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বর্ত্তমান সময়ে দুইটি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন রাজগৃহের দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ দূরে পুরাতন রাজগৃহ। মহারাজ বিম্বিসারের রাজত্বকালে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পাঁচটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত পুরাতন রাজগৃহকে প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের জীবনের অনেক কাহিনী পুরাতন রাজগৃহের সহিত সংসৃষ্ট। তৎসমুদয়ের স্মরণচিহ্নস্বরূপ এখানে বহু স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন সমস্ত ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে; সমস্ত রাজগৃহ জনমানবশূন্য। রাজগৃহের আড়াই মাইল দূরে গৃধ্রকূট পর্ব্বত। তদুপরি বুদ্ধদেব সমাধিমগ্ন থাকিতেন।

গয়া ;—গয়ার অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত নগর লোকপরিত্যক্ত মরুস্থলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। গয়া হইতে দক্ষিণ দিকে সাড়ে তিন মাইল দূরে বুদ্ধগয়া। এই স্থানে বোধিসত্ত্ব ছয় বৎসর কাল সমাধিমগ্ন ছিলেন। ইহার এক মাইল দূরে (নৈরঞ্জন) নদীতটে তিনি (সুজাতা নাম্নী) রমণীর প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণ করেন। এই নদীতট হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন এক মাইল দূরে এক সুবিশাল বটবৃক্ষমূলে শাক্যসিংহ ঐ পায়সান্ন ভোজন করেন, এবং তাহার পর সমাধিস্থ হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। মধ্য-ভারতবর্ষের শীতোষ্ণতা এরূপ সমতাপন্ন যে, তত্রত্য বৃক্ষ প্রভৃতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। এই কারণে ঐ বোধিদ্রুম অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকথিত স্থানসমূহে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মঠনির্ম্মাণপূর্ব্বক বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল মঠ ও মূর্ত্তি এখনও পরিদৃষ্ট হয়। বোধিদ্রুমের নিকট তিনটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান; তথায় শ্রমণগণ বাস করেন। ইঁহারা বৌদ্ধসঙ্ঘ-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে স্থানে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ; এই মহাতীর্থ-চতুষ্টয়ের বৌদ্ধমন্দির প্রথমাবধি এক সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে।

বারাণসী ;—কাশীপ্রদেশ ও বারাণসী নগরী গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। বারাণসীর কিঞ্চিদধিক তিন মাইল দূরে মৃগদাব নামক উদ্যান। এই স্থানে বুদ্ধদেব আপনার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। মৃগদাব উদ্যানে দুইটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে; তথায় শ্রমণগণ বাস করিতেছেন। মৃগদাবে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন-সম্পর্কীয় তিনটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কৌশাম্বী ;—মৃগদাবের ত্রয়োদশ যোজন দূরে কৌশাম্বী নগরী। (১) এই স্থানে একটি প্রখ্যাত বিহার বিদ্যমান ছিল; তথায় বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাহার ভগ্নস্তূপমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

চম্পা।—চম্পা একটি বৃহৎ রাজ্য; (২) ইহা গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বুদ্ধদেব কিয়দ্দিবস এই রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন।

---

(১) কৌশাম্বী যমুনা নদীর তীরে, এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী।

(২) বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা লইয়া প্রাচীন চম্পা রাজ্য গঠিত ছিল। ইহার রাজধানীর নামও চম্পা ছিল। বর্ত্তমান ভাগলপুর সহরের ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী পাথরঘাটা প্রাচীন চম্পা নগরী।

তাম্রলিপ্তি।—তাম্রলিপ্তি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এই স্থানে চতুর্বিংশতি সংঘারাম বিদ্যমান। এই দেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধাশীল।

তাম্রলিপ্তিতেই ফাহিয়ানের ভারতভ্রমণ শেষ হইয়াছিল। বৌদ্ধতীর্থ সকল দর্শন ও বিনয়পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র-পাঠ তাঁহার ভারতাগমনের উদ্দেশ্য ছিল। ফাহিয়ান পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহার সংগৃহীত বিনয়পিটক গ্রন্থখানি এক সময়ে শ্রাবস্তীর জেতবনে অধীত হইত। বিনয়পিটক ব্যতীত অন্যান্য বহু শাস্ত্র তিনি পাটলিপুত্র নগর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান এই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন ও তাহাদের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। চিত্র-অঙ্কনের জন্য তিনি তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর বাস করেন।

অতঃপর ফাহিয়ান বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা তাম্রলিপ্তি হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে অগ্রসর হইয়া শীতকালের অনুকূল বায়ুযোগে দুই সপ্তাহ দিবারাত্রি পোতপরিচালন-পূর্ব্বক সিংহল দ্বীপে উপনীত হন।

ফাহিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে সিংহল লোকশূন্য ছিল। কিন্তু বণিকগণ বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রকারে সিংহলে সুবৃহৎ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর বৌদ্ধগণ আগমন করিয়া সিংহলবাসীদিগকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সিংহল প্রকৃতির রমণীয় লীলাস্থল, বৌদ্ধকীর্ত্তিপূর্ণ। কিন্তু ফাহিয়ান এখানে আসিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই ব্যাকুল অবস্থায় তিনি একদা একটি বৌদ্ধমন্দিরে একখানি চৈনিক পাখা দেখিয়া জন্মভূমির জন্য দুঃখে কাতর হইয়া পড়েন, তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হয়।

যাহা হউক, ফাহিয়ান সিংহলে দুই বৎসর যাপন করিয়া ও বিনয়-পিটক প্রভৃতি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, বাণিজ্যপোতে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই জাহাজে দুই শত আরোহী ছিল। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা উঠে; প্রবল বাত্যায় জাহাজের এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়, এবং বহু পণ্যদ্রব্য সমুদ্র-জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ফাহিয়ানও আপনার জলপাত্র প্রভৃতি ফেলিয়া দেন। বণিকগণ তাঁহার গ্রন্থ ও চিত্রসমূহ জলে ফেলিয়া দিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। একাদশ দিবস পরে

ঝটিকা থামিয়া যায়, এবং যাত্রিগণ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পঁচাত্তর দিবসের তরণীর সংস্কার করেন। অতঃপর তাঁহারা পুনর্ব্বার সমুদ্রপথে পোত-পরিচালনে প্রবৃত্ত হন। এই সমুদ্র জলদস্যুপূর্ণ ছিল। তাহারা হঠাৎ জাহাজের উপর পতিত হইয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এই অকূল সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিবার কোনও উপায় ছিল না; কেবল চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম নির্ণয়পূর্ব্বক পোত পরিচালিত হইত। যাহা হউক, প্রকৃতি প্রশান্ত হইল; নাবিকেরা দিক্ নির্ণয় করিয়া প্রকৃত পথে পোত পরিচালন করিল; এবং ৯০ দিন পরে যবদ্বীপের বন্দরে উপস্থিত হইল। এই দ্বীপে ব্রাহ্মণ ও অপধর্ম্মাবলম্বীর বাস ছিল।

ফাহিয়ান এই স্থানে পাঁচ মাস যাপন করিয়া অন্য একখানি বাণিজ্য-পোতে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই জাহাজে লোক-সংখ্যা দুই শত ছিল। তাহারা ৫০ দিনের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে লইয়াছিল। এক মাস কাল জাহাজ পরিচালনের পর প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। তখন কুসংস্কারাপন্ন ব্রাহ্মণগণ বলেন, "এই শ্রমণ (ফাহিয়ান) আমাদের সঙ্গী বলিয়াই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে; ইহাকে কোনও দ্বীপে অবতরণ করিবার জন্য বাধ্য করি; এক জন মনুষ্যের জন্য সকলের মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নহে।" কিন্তু ফাহিয়ানের জনৈক হিতৈষী বণিকের সাহস-সহকারে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন;—ফাহিয়ান নির্জ্জন দ্বীপে শোচনীয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। শীঘ্রই ঝটিকা থামিয়া গেল, এবং ৮২ দিবস পরে বাণিজ্যপোত চীন দেশের উপকূলে উপনীত হইল।

আমরা বিস্তারিতরূপে ফাহিয়ানের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ বর্ণনা করিলাম। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যগত সমুদ্রপথের অবস্থা কীদৃশ ছিল তাহা এই বিবরণ পাঠে উপলব্ধি হয়। পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে দুই শত বা তাহারও অধিক লোকপূর্ণ ভারতীয় বাণিজ্যপোত বিপৎসঙ্কুল সমুদ্র-পথে যাতায়াত করিত; এই সকল পোতের নাবিকেরা দিঙ্‌নির্ণয় করিবার জন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রমাত্র সহায় করিয়া অসীম সাহসসহকারে সমুদ্রপথে অগ্রসর হইত; বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও চীনদেশে গমন করিতেন; যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল; এই সকল বিবরণ-পাঠে আমাদের হৃদয়ে গৌরব বুদ্ধির উদয় স্বাভাবিক।

অনেকের নিকট এই পুরাকাহিনী গল্পকাহিনীর ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে।

নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ফাহিয়ান স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই মহান্ ব্রতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎকালে বুদ্ধভদ্র নামক এক জন ভারতবাসী ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চীন দেশে বাস করিতেন। তিনি ফাহিয়ানকে অনুবাদ কার্য্যে বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

—:০:—

কাশ্মীর-প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি Modern Review মাসিকপত্রে অধ্যাপক নেল্‌সন কেুজার 'কাশ্মীর-স্বর্গ' ইতিশীর্ষক এক সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; আমরা সংক্ষেপে তাহার সারসঙ্কলন করিলাম।

পূর্ব্ব হইতেই 'চমৎকারো' রকমের একটা কিছু আশা করিয়া পরে পরে হতাশ হইয়া পড়ি, সেই জন্য কাশ্মীর-ভ্রমণের পূর্ব্বে কাশ্মীর সম্বন্ধে কখনও আমি বিশেষ কোনও ধারণা করি নাই। তাই একদিন বর্ষাসুষুপ্ত মেঘময় প্রভাতে 'বারমুলা'য় উপস্থিত হইয়া সমুখে কতিপয় পঙ্কিল জলা, শাখাহীন তরু ও চতুষ্পার্শ্বে বিষম কুয়াসা ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তখনও সহসা এই শ্যামশৈলশোভিত দেশটির প্রতি কোনও প্রকার অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করি নাই। কিন্তু বারমুলা পরিত্যাগ করিবার কিছু ক্ষণ পরেই সমগ্র কাশ্মীর সম্বন্ধে যে নিষ্কান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, শেষের বিষয়, দেশটির স্নিগ্ধগম্ভীর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে তাহার সমর্থন করিয়াছিল, এবং যত দিন আমি এ দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, তত দিন ইহার প্রতিকূল কোনও প্রমাণ পাওয়া দূরে থাকুক, প্রতিদিনই নব নব চিত্র দর্শনে আমার এই ধারণাটি বদ্ধমূল হইয়াছিল।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই অতুলনীয়। সমুদায় দৃশ্যপটটি সাধারণতঃ তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—ইহার উপত্যকা, গিরিমালা ও রত্নতুল্য তুষাররাশি। উপত্যকাটি প্রকৃতই সুন্দর,—দূরপ্রসারিত, শ্যামল-শস্যাবৃত ও মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য-তরুসমাচ্ছন্ন; কোথাও বা স্বচ্ছ গিরিনির্ঝরিণী অলসভাবে বহিয়া চলিয়াছে; কোথাও বা মনোহর আরণ্যকুসুম পুঞ্জীকৃত হইয়া বিজন প্রান্তরের সৌন্দর্য্যরাশি লুটাইয়া তুলিয়াছে। তরুশ্রেণীর মধ্যে চিনার নামক এক জাতীয় বৃক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; উহার 'করধ' বৃক্ষ ও

শ্রীনগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে প্রায় আট ক্রোশ ধরিয়া যে 'পপলার' তরুশ্রেণি দেখিয়াছিলাম তাহাও ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। অধিক কি, বিপুল ছায়া ও গাম্ভীর্য্যে চেনার বৃক্ষের সমকক্ষ বৃক্ষ জগতে আছে কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। যথোচিত রস ও উত্তাপ পাইলে এই একটি তরু এমনই বিরাট আকার ধারণ করে যে, সে জন লোকও তাহার কাণ্ডটি বেষ্টন করিয়া ধরিতে পারে না। ইহার পত্রবহুল মস্তক ভেদ করিয়া মধ্যাহ্নেও সূর্য্যরশ্মি ধরণীতলে পতিত হয় না। ইহার প্রশান্ত ছায়ায় বহুসংখ্যক সৈনিক বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। বৃক্ষগুলি বহু পুরাতন; কথিত আছে, মহামোগল আকবর শাহের সময় এই সকল বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল।

কাশ্মীরের লোলাব উপত্যকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী পর্ব্বতমালা সাধারণতঃ তাদৃশ উন্নত নহে; কিন্তু চৈত্র বৈশাখ মাসে সেগুলি তুষারে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তবে স্থানে স্থানে যে উন্নত গিরি একেবারেই নাই, তাহাও নহে। লোলাব অরণ্য উপত্যকা; ইহার সৌন্দর্য্য সত্য সত্যই নয়নানন্দকর। তুষারধবল মহাগিরি হিমাচলের অন্তর্ভেদী বিরাট বপু বুকে লোলাব উপত্যকা।

লইয়া দিগন্তপ্রান্তে সমাসীন; চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ শৈলশ্রেণী ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। কোথাও বা সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট দেখিতে পাইবে, কোথাও বা আকাশে মনোহর শ্যামল ভূমি চোখে পড়িবে। দূরে পর্ব্বতপ্রান্তে বিশাল দেবদারু তাহার উন্নত শীর্ষ বুকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান; যুগ যুগান্ত হইতে সেই স্তব্ধ ধরণী মধ্যে মানবের কুঠারাঘাত পতিত হয় নাই, বিরাট তরুদল সেখানে আবহমান কাল ব্যাপিয়া ধ্বংস ও পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা বিশ্বে বিজ্ঞাপিত করিতেছে। সে দৃশ্য কি মহান্—কি মর্ম্মস্পর্শী! তাহার সাধ্য কি, তাহার বর্ণনা করে!

কাশ্মীরের মনোহর গিরিসঙ্কটগুলির মধ্যে জোজিলা গিরিসঙ্কট উল্লেখযোগ্য। অমরনাথ কিংবা শুক্রুবুবুন তুষার-দর্শন আমার অদৃষ্টে এ যাত্রা না ঘটিলেও এই গিরিসঙ্কট দেখিবার জন্য এক দিন রাত্রি তিনটার সময় অগ্রসর হইয়াম। তখন ইহা তুষারাবৃত ছিল। পর্ব্বতপ্রান্তস্থ পথটি তখন মুক্ত না থাকায় আমরা লোজাসুজি যাইতে লাগিলাম। জোজিলা গিরিসঙ্কট।

আমাদের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত পাহাড় উঠিয়াছে, এবং নিম্নে আঁকিয়া বাঁকিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী চলিয়াছে। দৃষ্টিবাত্যার একপ্রকার অভাব হইয়াছিল, এবং এত অল্পায়তে পুঞ্জীভূত তুষারপাতেরও কোনও সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং আমরা একরূপ নিরাপদে ও নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্ণকালে সূর্য্যোত্তাপে পথিক পর্ব্বতশিরে বরফ গলিতে আরম্ভ করে, তখনই এইরূপ তুষারপাত হইয়া থাকে। সে সময় এতদঞ্চলে পরিভ্রমণ অতিশয় বিপজ্জনক। আমাদের সম্মুখভাগে একটি স্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ বিপদে পতিত হইয়া পাঁচ জন হতভাগ্য কুলী জীবলীলা সংবরণ করিয়াছিল; দেখিলাম, একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড স্থানটিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, নির্ভয়ে চারি দিকের গম্ভীর জনশূন্য শৈল-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে করিতে ভ্রমণ

যে সকল বিভিন্ন বিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া কাশ্মীরের ইতিহাস গতি হইয়াছে, তাহার মধ্যে তাহার সকলেরই কোনও কোনও ভগ্নপ্রায় চিহ্ন আজও বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন দেবমন্দিরগুলির অধিকাংশ প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা কাশ্মীর ইতিহাসের প্রথম কাহিনীর সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি রামপুরের 'বেলন রোডে'র পার্শ্বে অবস্থিত, এবং মার্ত্তণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে 'ইসলামাবাদ' হইতে অনায়াসেই উপস্থিত হওয়া যায়। সুতরাং এগুলি পরিদর্শন করিতে ভ্রমণকারীকে বিশেষ কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কাশ্মীরের এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ভারতের ইতিহাসহীন যুগের নীরব কাহিনী সকলেরই দর্শনীয়। এই মন্দিরগুলি বহু পুরাতন; ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাদের গঠনপ্রণালীতেও বিশেষত্ব আছে। যে সকল ভ্রমণকারী বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ চালুক্য দ্রাবিড় জাতির স্থপতিশিল্প দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাঁহাদের ইহা মনুষ্যরচিত বলিয়া বোধ হইবে না। ইহাদের বজ্রলেখাঙ্কিত শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভগুলি দেখিয়া প্রাচীন গ্রীকদিগের স্থপতিশিল্পের ফাঁপড়ুপ্তি মনে উদিত হয়; কিন্তু তাহা হইলেও, ইহা সর্ব্বাংশেই ভারতের নিজস্ব; একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। মন্দিরগুলি বেশ সাদাসিদে ধরণের—তেমনতর কারুকার্য্য কোথাও নাই; তবে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই 'হিন্দু রকমের'। ইহাদের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে মন্দির অপেক্ষা অট্টালিকার অংশই অধিকতর সুস্পষ্ট।

মার্ত্তণ্ড মন্দিরটিই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হিন্দুর অন্য কোনও মন্দিরই আকৃতিতে ইহার সমকক্ষ নহে। ইহার চতুষ্পার্শ্বের সৌন্দর্য্য সত্যই তৃপ্তিকর। সম্মুখে দূরপ্রসারিত শ্যামল সমতল ক্ষেত্র; পশ্চাতে উপত্যকার দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতমালা, আর উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ শৈলশ্রেণী। এই স্নিগ্ধ মধুর দৃশ্য মন্দিরের কঠোর গাম্ভীর্য্যের সহিত বাস্তবিকই সুন্দররূপে মিশিয়া গিয়াছে।

এখানকার অন্যান্য ধ্বংসাবশেষগুলিও এইরূপ। তবে আর কোনটি মার্ত্তণ্ডের মত 'খুব গম্ভীর' নহে। 'ওয়ান্দাল' ও 'পেকে'র মন্দিরগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সকলেই কোনও না কোনও কারণে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হায় ধ্বংসের অনতিক্রম্য প্রভাবে সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আজ আর দেবদ্বেষী মুসলমান এই সকল মন্দির ভগ্ন করিবার জন্য আসে না সত্য, কিন্তু মৌন দুই ভুবার নীহারে তাহারা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাই আজ এই পুরাতন কীর্ত্তিগুলি—কাশ্মীরের সেই পুরাতন উন্নতি ও সমৃদ্ধির অভ্রান্ত সাক্ষী—একে একে বিলুপ্ত হইতেছে; তবে এত অযত্ন উপেক্ষায় আজিও যে এগুলি সম্পূর্ণরূপ বিলুপ্ত হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

কাশ্মীরের পল্লীগুলি খুব সুন্দর। পল্লীর বাহিরে তৃণাচ্ছন্ন সমাধিভূমি। এখানে বা চেনারে পরিবেষ্টিত কোনও সাধু সন্ন্যাসীর সমাধিমন্দির। সেখানে তরুচ্ছায়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামবাসী কৃষকগণ শান্তভাবে নির্দ্দোষ জীবন অতিবাহিত করিতেছে। সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় পল্লীর

ম কাশ্মীর। বর্ত্তমা

মত এগুলির মূর্তি সুস্পষ্ট, অতি শান্তিময়—প্রকৃতির একখানি বিচিত্র খাপলেখ্যের মত। পল্লীবাসীরা সকলেই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ আস্তিনযুক্ত এক প্রকার ঢিলা পোষাক, অনেকটা 'আলখেল্লার'ই অনুরূপ বলিয়া বোধ হইল। শীত অধিক পড়িলে রমণীগণ পরিচ্ছদের নিম্নে এক একটি 'কাংরা' লইয়া বহির্গত হয়। 'কাংরা' পদার্থের পরিচয় শুনিলে বোধ হয় অনেকেই বিস্মিত হইবেন। একটি হাঁড়িতে কিছু আগুন করিয়া একটা কাষ্ঠের পাত্রে বসাইলেই 'কাংরা' প্রস্তুত হইল। আমার বোধ হয়, ইহাতে তাহারা পাকস্থলীতে যেন একটু আরাম অনুভব করে; নতুবা শীতকালে এই হিতৈষী বন্ধু কর্ত্তৃক হতভাগাদের উদরদেশ উত্তপ্তকরণে বদ্ধ হইয়া গেলেও তাহারা উহার এত আদর করিবে কেন? "অন্ধস্তুনের বক্ষে 'মরুমা' যেরূপ, 'কাংরা'ও কাশ্মীরবাসীর নিকট সেইরূপ আদরের"—প্রচলিত এই প্রবাদ হইতেই বুঝা যায়, দেশবাসীরা ইহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে। সে যাহা হউক, শীতের দিনে এইরূপ কাংরা-ধারী 'দামোদর' কোনও কাশ্মীরীকে দেখিলে বাস্তবিকই আমোদ হয়।

—কাংরা ব্যতীত তুষার হইতে পদদ্বয় রক্ষা করিবার জন্য ইহারা এক প্রকার তৃণনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পাদুকাগুলি শুষ্ক বিচালি বা খড়ে নির্ম্মিত; ইহাতে বিলক্ষণ নির্ম্মাণকৌশল আছে; মূল্যও অতি অল্প; পার্ব্বত্য অঞ্চলে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, সন্দেহ নাই।

কাশ্মীরবাসী পুরুষ সাধারণতঃ উন্নত ও দীর্ঘকায়। মহিলাদের আকৃতি সম্বন্ধে আমার কোনও মতামত-প্রকাশ সঙ্গত নহে; কারণ, তাহাদের পশ্চাৎভাগের পরিচ্ছদ ব্যতীত আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; আমাকে আসিতে দেখিলেই তাহারা দূরে পলাইয়া যাইত। তবে দুই এক জনের আকৃতি যাহা দেখিয়াছি, সত্য বলিতে কি, তাহা আমার চক্ষে আদৌ ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই। তাহারা অতিশয় অপরিচ্ছন্ন ও কুৎসিত। তাহাদিগকে দেখিয়া আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না, কাশ্মীরের স্ত্রীজাতি অতিশয় রূপসী বলিয়া লোকের ধারণা কেন? হয় ত শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে ধনিগৃহে কোনও সুন্দরী মহিলা থাকিতে পারেন, কিন্তু ভ্রমণকারীর পক্ষে তাহা অনুমান সাপেক্ষ।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাশ্মীরেও পল্লীজীবন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোনও কোনও পল্লীর অবস্থা এত দূর শোচনীয় যে, দর্শন করিলে নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। এক দিন জোজিলা গিরিসঙ্কটের নিকট 'থানটিল্লান' নামক একখানি গ্রামের অধিবাসিগণকে সমবেত দেখিয়াছিলাম। সংসারে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্য প্রাণী আর কখনও আমি দেখি নাই। অনাহারে দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে; চক্ষু কোটরগত; শরীর আনত; পরিধানে শতগ্রন্থিযুক্ত ধূলিময় মলিন বস্ত্র। হতভাগ্যগণকে দেখিয়া মনুষ্য বলিয়া চিনিবে, কাহার সাধ্য? কয়েকটিমাত্র পয়সা হইলে তুষার হইতে চক্ষু রক্ষা করিবার উপায় হয়; কিন্তু হায়! ইহাদের তাহারও সম্বল নাই। সকলেই নেত্ররোগে কষ্ট পাইতেছে। এক একটা অপরিচ্ছন্ন অপুষ্টিকর খাদ্যে ইহারা আপনাদের উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। এই দরিদ্র অধিবাসিবৃন্দের সহিত 'বিজবিহারা' নামক অন্য একখানি গ্রামের কি বিষম পার্থক্য! উক্ত

কর্ষণোপযোগিনী ভূমি, তৃণাচ্ছন্ন গো-চারণস্থান, প্রচুর মৎস্যপূর্ণ স্বচ্ছতোয় নদী ও দীর্ঘিকা, কিছুরই ইহাদের অভাব নাই। ইহাদের গোশালা গাভীমেষপূর্ণ; গৃহ ধনধান্যে সুশোভিত, এবং তরা পুত্র কলত্রাদিতে অবনত। এখানে প্লাবনের উপদ্রব নাই; ভূমিকম্পের তেমনতর প্রভাব নাই, এবং বিসূচিকা রোগের বিশেষ কোনও প্রকোপ নাই। কিন্তু হায়! প্রকৃতির এত প্রাচুর্য্যের অধিকারী হইয়াও গ্রামবাসিগণ পশুর ন্যায় জীবনযাপন করে; হতভাগ্যেরা একেবারে নির্বোধ মূর্খ!

কাশ্মীরের পল্লীগুলির অবস্থা স্থানভেদে এইরূপ। রাজধানী শ্রীনগরের অবস্থা এইবার একবার পরিদর্শন করা যাক্। শ্রীনগর 'ঝেলাম' নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত জনাকীর্ণ বৃহৎ নগর। লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্দ নহে। মধ্য দিয়া ঝেলম নদীটি কলগানের উচ্ছ্বাস তুলিয়া ধীর ও শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু সুপ্তোত্থিত সিংহের মত যখন জাগিয়া উঠে, তখন সমুদায় নগরটি প্লাবিত হইয়া যায়, গৃহ প্রভৃতি ভাসিয়া যায়, এবং বহুসংখ্যক নগরবাসী বিনষ্ট হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নদীতে এরূপ ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল যে, দুই ঘণ্টার মধ্যে শ্রীনগরের প্রায় ১৮ ফিট্ জল উঠিয়াছিল। এখানে এরূপ ঘন ঘন বন্যা হইবার বিলক্ষণ কারণ আছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সমুদায় কাশ্মীর উপত্যকাটি একটি সুবৃহৎ হ্রদে পরিণত ছিল; কালক্রমে জল সরিয়া গিয়া বর্ত্তমান ঝেলাম নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সংকীর্ণ ও অগভীর বলিয়া অতিরিক্ত বারিবর্ষণ হইলে, কিংবা নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে তুষার গলিলে, এই নদীতে সহজেই প্লাবন উপস্থিত হয়। এই বিপদের প্রতিবিধানকল্পে ইহাকে গভীর করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। ব্যয় যথেষ্ট হইলেও, ইহা দ্বারা সমগ্র কাশ্মীর যে বন্যার উপদ্রব হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাইতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নগরের গৃহগুলি প্রায় ইষ্টক অথবা কাষ্ঠে নির্ম্মিত। অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাষ্ঠের ছাদগুলি মৃত্তিকায় আবৃত হয়; এই সকল জীর্ণ মৃত্তিকার আবরণের উপর পোস্তর গাছ ও দীর্ঘ তৃণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া গৃহের জীর্ণ ছাদগুলির এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছে। নগরের পথঘাট সেরূপ উৎকৃষ্ট নহে। অধিকাংশ রাজপথই সংকীর্ণ ও কুৎসিত। প্রধানতঃ নদীর সাহায্যেই লোকে গমনাগমন করে। নদীতটস্থ দুইটি প্রশস্ত সেতু দেখিলাম। শ্রীনগরের সুন্দর সৌধ অট্টালিকার মধ্যে মুসলমান মসজিদগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নদীতীরস্থ 'শাহা হামদান' নামক মসজিদটি ইহার সর্ব্বপ্রধান সাক্ষী। ইহার এমনই সৌন্দর্য্য ও গঠননৈপুণ্য যে, একবার-মাত্র দেখিলেই উপলব্ধি হয়, মোগলগণ ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা এরূপ হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ সম্ভবপর নহে। যদিও কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলেও মুসলমানের যে বিলাস ও সৌন্দর্য্যপ্রীতি আগরা নগরীকে ইন্দ্রপুরীতে পরিণত করিয়া গিয়াছে, তাহার প্রভাব এই অট্টালিকায় মন্দীভূত হয় নাই। জুম্মা নামক আর একটি মসজিদেরও এই প্রকার সৌন্দর্য্য; ৩০ ফিট্ উচ্চ এক একটি দেবদারু-স্তম্ভ ইহার ছাদ ধরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল অট্টালিকা এখন উপেক্ষিত ও ধ্বংসগতপ্রায়।

শ্রীনগর সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের বিষয় যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি; সংক্ষেপে ইহার দুই একটি দোষের কথা বিবৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কাশ্মীর-ভ্রমণের অন্তরায়।

কাশ্মীরে ভাদ্র শীত পড়িয়া থাকে; সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাতও অল্প হয় না। শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে সময় সময় এত তুষারপাত হয় যে, সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত গৃহের বাহির হইবার উপায় থাকে না। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্থানে সমুদ্রের ত কথাই নাই, সে সকল স্থান কখনও কখনও মাসাধিককাল তুষারাচ্ছন্ন থাকে। ইহাতে দেশবাসীর, বিশেষতঃ দরিদ্র লোকগণের (কাশ্মীরে দরিদ্র লোকের সংখ্যাই অধিক) যে কত দূর ক্লেশ ও অসুবিধা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্লাবনের প্রাদুর্ভাবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা কখনও কখনও সমুদায় নিম্নভূমি গ্রাস করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী গো মহিষ ভাসাইয়া লইয়া যায়। বিসূচিকা প্রভৃতি প্রাণনাশক ব্যাধি ইহাদের নিত্যসহচর। দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য ও ইতিহাসের প্রথম হইতেই কাশ্মীররাজ্য গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দেশের অবস্থা এত দূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে খাদ্যাভাবে চিরনির্ব্বাসন দণ্ড পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া গোয়ালিয়র যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সমুদায় কাশ্মীরের প্রায় অর্দ্ধাধিক লোক রোগ ও অনশনে জীবন দিয়াছিল। কিছু দিন হইতে ঝেলম নদীর পার্শ্ব দিয়া রাজপথ প্রস্তুত হওয়ায় খাদ্যাদির আমদানীর সুবিধা হইয়াছে; ভবিষ্যতে ইহা হইতে দুর্ভিক্ষের একটু উপশম হইবে, আশা আছে। কিন্তু এই রাজপথ প্রস্তুত হইবার পর হইতে কাশ্মীরের আর একটি বিপদের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে; বিসূচিকা সময় সময় ভীষণভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে। 'ছিদ্রেষ্বনর্থাঃ বহুলীভবন্তি'—সংসারের ইহাই নিয়ম।

এখন কাশ্মীরের অনেক বিষয়েরই উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। উলার হ্রদ হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে। হয় তো ভবিষ্যতে কাশ্মীর অধিকতর উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইবে; হয় ত দেশবাসী শিক্ষিত ও সভ্য হইবে; অবিচ্ছিন্ন অরণ্যানী বিলুপ্ত হইবে; শৈলে শৈলে কন্দরে কন্দরে খনির অনুসন্ধানে মানুষ ছুটিবে। হয় ত এই কন্দরময় উপরপ্রদেশে সুগম রাজপথ নির্ম্মিত হইবে; পাষাণগাত্র ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ ও বাষ্পীয়যান একদিন হিমালয়ে প্রতিধ্বনি জাগাইবে। হয় ত শ্রীনগর একদিন এসিয়ার লুসার্ন (Lucerne) নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে ভাল মন্দ যাহাই ঘটুক না কেন, চিরাশান্ত ও প্রাকৃতিকসৌন্দর্য্যপ্রিয় ভ্রমণকারীর চক্ষে ভবিষ্যতের কাশ্মীর বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইবে না ইহা স্থির। এখনকার মত এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য থাকিবে না জানি, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে একটা পার্থক্য চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। বিলাস-স্রোত প্রবাহিত না থাকিলেও এই শৈলময় নির্ঝর-প্লাবিত স্তব্ধ দেশটির এই স্নিগ্ধ শ্যাম শোভা, এই পরিপূর্ণ উদার শান্তি বাস্তবিকই প্রাণস্পর্শিনী।

ধর্ম্ম কি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইতেছে ?

১২ই এপ্রিল, ১লা ও ১৫ই মের "মার্কার ডি ফ্রান্সে" "আমরা ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত করিতেছি, কি বিনষ্ট করিতেছি ?' এই প্রশ্ন লইয়া ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ম্যাক্সিম গোর্কি ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, যদি ধর্ম্মচিন্তা অর্থে ঈশ্বরচিন্তা ধরিয়া লওয়া যায়, এবং ঈশ্বর বলিলে কোনও অলৌকিক বিশ্বনিয়ন্তা পুরুষ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাস, এইরূপ ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে ও হওয়াই উচিত।

ধর্ম্মই মনুষ্যকে মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র করিবার মূল। তাঁহার মতে, নাস্তিকতা অর্থাৎ ব্যক্তিগত ঈশ্বরে অবিশ্বাস মন্দ নয় ; কারণ, ইহাতে একটা ভীষণ ভ্রম অপসারিত হইয়া যায়।

সিগ্‌ফ্রেড ওয়াগনার বলেন, যে ধর্ম্মে র‍্যাফেল, দান্তে, ব্যাক্, রিচার্ড ওয়াগনার প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে ধর্ম্ম কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না।

ডাক্তার ম্যাক্স নরডু বলেন, ধর্ম্ম ও 'পাপ-স্বীকার', এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা দেখান নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, ধর্ম্ম মানবজাতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়, কিন্তু Confessionalismএর সেরূপ ক্রমোন্নতি নাই।

চন্দ্রের জন্ম।

চন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর অংশ ছিল ; পরে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির দ্বারাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ;—এই মতটি বিগত জুন মাসের 'হারপার্স্ ম্যাগাজিনে' অধ্যাপক পিকারিং পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর কোন অংশ হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারই নির্ণয়ে তিনি সচেষ্ট আছেন। তিনি আরও বলেন যে, চন্দ্রের জন্মের সময় যদি ধরিত্রীর স্তর কঠিন হইত, তাহা হইলে ইহার উৎপত্তিস্থানে সম্ভবতঃ একটী খাত থাকিয়া যাইত।

চন্দ্রের জন্মস্থান।

তাঁহার মতে, যে স্থানে এখন প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি রহিয়াছে, সেই স্থানেই চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। পৃথিবীর আবর্ত্তনের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির প্রভাবে বর্ত্তমান নিউজিল্যাণ্ডের নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকাস্তর স্ফীত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে, নিউজিলাণ্ডের ঠিক বিপরীতদিকস্থ স্তর ফাটিয়া গিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই গভীর কাটল দুই সহস্র মাইলের অধিক বিস্তৃতিলাভ করিবার পূর্ব্বেই কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির এতই প্রাবল্য হয় যে, সমস্ত পৃথিবীর ভিন-চতুর্থাংশ আয়তনের বর্ত্তুলাকার এক খণ্ড মৃত্তিকা উহার মধ্যস্থল হইতে স্খলিত হইয়া যায়, এবং চন্দ্র-রূপে পরিণত হয়। এইরূপে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর পার্শ্বে দুইটি মহাদেশ রহিয়া যায়।

কেন আমরা চন্দ্রের নিকট ঋণী ?

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহাদেশ ও মহাসাগরের জন্য আমরা চন্দ্রের নিকট ঋণী। কিন্তু সমগ্র মনুষ্য জাতির নিমিত্ত এই উপগ্রহের নিকট আমরা আরও ঋণী। অধ্যাপক পিকারিং বলেন, যদি আদৌ চন্দ্রের উৎপত্তি না হইত, কিংবা যদি পৃথিবীর সমস্ত কঠিন ভাগ লইয়া

চন্দ্রের ভর হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থার চন্দ্র যে পরিমাণ জলরাশি আকর্ষণ করিত, এবং সমুদ্রের যতটুকু বৃদ্ধিশক্তি আছে, সমুদ্রকেও ততটুকু বৃদ্ধি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কিংবা চন্দ্রের আয়তন যদি উহার বর্ত্তমান আয়তন অপেক্ষা অত্যন্ত দূর হইত, তবে আমাদের মহাদেশগুলি অন্তর্হিত হইয়া যাইত, এবং ক্রমে আমাদের লোকসংখ্যা অনেকাংশে কমিয়া যাইত। আর যদি চন্দ্রের আকার উহার বর্ত্তমান আয়তন অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ হইত, তাহা হইলে স্থানভাব করিয়া যাওয়ায় লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইত।

কর্ম্মভোগ।

—:o:—

বন্ধনময় সংসারে ধর্ম্মশাস্ত্রের সান্ত্বনা অনেক সময় রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মবাদ তাহার মধ্যে একটি। কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বদ্ধ জীবের মধ্যে মধ্যে তাহার পুনরালোচনা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ মনে থাকে না। কথাটা এই। বৈয়াকরণ শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার। অকর্ম্মক এবং সকর্ম্মক। "রাম ঘুমাইতেছে"। এ স্থলে অকর্ম্মক ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। "রাম শ্যামকে প্রহার করিতেছে"। এ স্থলে ক্রিয়া সকর্ম্মক।

এক জনের অস্তিত্বই অকর্ম্মক ক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দুই জন না থাকিলে সকর্ম্মক ক্রিয়া হয় না। অতএব ক্রিয়ার দুইরূপ; অদ্বৈত ও দ্বৈত।

শাস্ত্রমতে আত্মা অকর্ম্মা পুরুষ। যেমন, উদীয়মান কবিগণ, শিশু পত্রিকার সম্পাদকগণ। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ও সাহিত্য-জগতের ননস্থিগণ প্রায়ই অকর্ম্মা। কবিতা লেখা, সমালোচনা করা, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া, ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া বিচার করা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রভৃতি কর্ম্ম একাকীই হইতে পারে। অন্য লোক থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, কবিতা কেহ না পাঠ করিলেও কবিগণ লিখিয়া থাকেন; ছাত্রগণ নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলেও অধ্যাপকগণ বকিয়া থাকেন; এবং উকীল, মোক্তার, সাক্ষী ও আসামী না থাকিলেও নির্ব্বিবাদে আসনে বসিয়া রায় লেখা চলে। অদ্বৈত অবস্থাই অকর্ম্মক ক্রিয়ার উপযোগী। কর্ত্তব্যের কল্পনাই অকর্ম্মক ক্রিয়ার মূল; কল্পনাকে

"ধ্যান" বলিলেও চলে। ধ্যান করিতে করিতে সমাধিগ্রস্ত হইলে ক্রিয়ার শেষ হয়। শাস্ত্রের কথায় "ক্রীয়াশক্তি লীন হইয়া যায়।" ছোট কথায় লোকটা বেকার হইয়া পড়ে। বেকারের চরম অবস্থা সমাধিস্থ শিব। মধ্যম অবস্থা বিষ্ণু (ধারণা), এবং উত্তম অবস্থা ব্রহ্মা (ধ্যানস্থ)। ইহাই আত্মার সচ্চিদানন্দ অবস্থা।

অতএব শাস্ত্র বলেন, আত্মা (পুরুষ) কোনও কর্ম্ম করেন না। কিংবা করিয়াও করেন না। কারণ, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি অকর্ম্মক ক্রিয়া। ইহা নিরীহ। ইহাতে কোনও দোষ নাই। ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যদি কেহ আপত্তি করিতে আসে, তাহাকে স্বচ্ছন্দে একটা চড় মারিতে পারা যায়। তবে চড়টা কল্পনায় মারিতে হইবে, নচেৎ সকর্ম্মক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এবং সকর্ম্মক হইয়া গেলেই তাহা কর্ম্মভোগে পরিণত হয়।

শাস্ত্রের মতে স্ত্রী, পুত্র ও কলত্রকে কল্পনায় চড় মারা যায়, গালি দেওয়া যায়, ভালবাসাও যায়। ইহাতে কোনও কর্ম্মাভিসন্ধি হইতে পারে না।

এইরূপ চিরকাল যদি আত্মার সদানন্দ ভাবের খেলা অন্তর্জগতে চলিত, তবে কোনও গোল থাকিত না। কিন্তু এবংবিধ ক্রিয়ার কর্ত্তা থাকা না থাকা সমান। এরূপ কর্ত্তা জরদ্গব, অসাড়, গুলিখোর। সুতরাং কর্ম্মের মহিমা সাব্যস্ত করিতে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অবতারণা।

প্রকৃতির দাপট অসাধারণ। স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন যে, প্রকৃতিই কর্ম্ম করেন। তিনিই (অর্থাৎ প্রকৃতিই) কর্ত্তা। "আমি কর্ম্ম করি বটে", কিন্তু "প্রকৃর্তেবশাৎ"। প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ভগবান্ যদি স্বয়ং এই কথা বলেন, তবে আমরা ছেলেপুলের ঘর লইয়া যাই কোথায়?

"প্রকৃর্তেবশাৎ" অনেকটা 'গৃহিণীবশাৎএ'র মত। যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে মহাশয় প্রবীণ পুরুষ, নচেৎ ন্যাড়াকান্ত। ভগবান্ অনেক দেখিয়া শুনিয়া গীতার নোটবহি লিখিয়াছিলেন, এবং নরলোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহা ইঙ্গিতে সারিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে যদি এ কথা সকলের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে প্রচারিত হইত, তবে ভয়ানক কাণ্ড হইয়া যাইত।

কুরুক্ষেত্রের কর্ম্মবাদের সার সত্য এই যে, যুদ্ধ করিবে। কাহার সহিত, তাহা ইঙ্গিতে বুঝিয়া লউন। কিন্তু ফলের দিকে দৃষ্টি যেন না থাকে। সেটা কি, তাহা ক্রমশঃ জ্ঞাতব্য।

সংসার-কুরুক্ষেত্রের অনির্ব্বচনীয় কলরব, দ্বন্দ্ব, ও আস্ফালন অপরিহার্য্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমে ঘোর চীৎকার করিয়া সংসার-প্রাঙ্গনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিই ইহার কারণ। প্রকৃতিই কর্ম্মের মূল।

বিশ্বব্যাপ্ত আত্মকল্পনা প্রকৃতির গুণবিভাগে খণ্ড খণ্ড হইয়া অন্দর মহলের সৃষ্টি। দেহ একটা অন্দরমহল। কল্পনা তাহার মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়া কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

পশু পক্ষী ইতর জাতির কল্পনা নাই। তাহারা কবিতা লিখিতে পারে না। চিত্র টানিতে পারে না। সমালোচনা করিতে পারে না। হস্তীর শুণ্ড আছে। কল্পনা থাকিলে, বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া বালুকার উপর অন্ততঃ সরল রেখা অঙ্কিত করিতে পারিত। কিন্তু তাহা কখনও শুনা যায় নাই। তাহারা সহজাত-সংস্কার-বদ্ধ হইয়া সকর্ম্মক ক্রিয়া করে।

কিন্তু মানুষ সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক উভয় ক্রিয়াই করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মভোগ ও ফলের দিকে দৃষ্টিপাত। মানুষ যদি কেবল সকর্ম্মক ক্রিয়া করিত, তবে কোনও দোষ থাকিত না। কোনও কথাই উঠিত না। কিন্তু অকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত সকর্ম্মক যুক্ত হইয়া ঘোরতর কলরবের সূত্রপাত। ইহার কারণ, সকর্ম্মক ক্রিয়া ছাড়িয়া সকর্ম্মক কল্পনা।

শুনা গিয়াছে যে, কোনও আদিম যুগে অশ্বের স্কন্ধে মানুষের মস্তক সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্কেত এই যে, মানুষের মস্তক আত্মার পরিচায়ক। অশ্ব প্রকৃতির পরিচায়ক। মস্তক অকর্ম্মক; অশ্বরূপী দেহ সকর্ম্মক। উভয়ে একত্র হইয়া "জীব"।

অর্থাৎ, অশ্বের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি মানুষের মস্তকে গেল। মস্তকে পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। গোলাকার মুণ্ডমাত্র। যুক্তাবস্থার গুণে মুণ্ডে অহঙ্কার হইল, মন হইল, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তবে মুণ্ডে কল্পনা ছিল। মুণ্ড পূর্ব্বে মুণ্ডের মধ্যেই কল্পনা করিত। দেহে সংযুক্ত হইয়া কথা কহিতে লাগিল। মুণ্ডের অন্দরমহল পদ নখর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। পূর্ব্বে অশ্ব ঘাস খাইত। এখন মুণ্ড ঘাস খাইতে লাগিল।

মুণ্ড বোধতর বক্তৃতা আরম্ভ করিল। মুণ্ড স্বামী, দেহ স্ত্রী। মুণ্ডের সহিত দেহের সপ্তপদী বিবাহ। বরের সহিত কন্যার অন্তরে শুভদৃষ্টি। এবংবিধ প্রকারে মুক্তমুণ্ড বদ্ধমুণ্ড হইয়া গেল। মুণ্ড দেহের যন্ত্রবিধানে,

দেহের সুখের নিমিত্তে, দেহের পরিচর্য্যায় বদ্ধ-কল্পনা আরম্ভ করিল। কল্পনা অন্তর বহিয়া গেল। পূর্ব্বে কল্পনার কোনও ফল ছিল না; এখন মুণ্ডের মধ্যে ফল গজাইতে লাগিল। মুণ্ডের সুখ-কল্পনা অতঃপর দুঃখে পরিণত হইল। দেহের কষ্টে মুণ্ডের দুঃখ, দেহের সুখে মুণ্ডের সুখ।

মুণ্ড বুঝিতে পারিল যে, দেহের জন্যই তাহার এ দুর্দ্দশা। সে ভাবিতে লাগিল যে, এবংবিধ গৃহিণী না থাকাই শ্রেয়ঃ। তাহার বদ্ধ-কল্পনার পুত্র, কলত্র ও সংসার নিতান্ত জঞ্জালময়। মুণ্ড ঘোরতর বক্তৃতা আরম্ভ করিল। মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিল। কিন্তু বিশেষ কোনও উপায় না দেখিয়া চাঁটি মারিতে আরম্ভ করিল। দেহ ব্যথা পাইয়া হেষা-রব ছাড়িয়া দিল। মুণ্ড কাতর হইয়া পড়িল।

এইরূপ বিষণ্ণ বদ্ধমুণ্ডের পরিত্রাণার্থ ও সাধুদিগের হিতার্থ গীতার টীকা প্রশস্ত। মুণ্ডের বিবাদ হইতে গীতার আরম্ভ। সাংখ্যযোগে দেখান হইয়াছে যে, এবংবিধ মুণ্ড-জীব বহু। তাহারা পরস্পরের বক্তৃতা শুনিয়া থাকে, এবং পরস্পরকে ধরিয়া খায়। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। ফলে বহু দেহের উৎপত্তি, এবং বহু মুণ্ডের আবির্ভাব। দেহের নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেহ বীজ-ক্রমে প্রসারিত হইতেছে। মুণ্ড অলক্ষ্যে থাকে। দেহ ব্যবহারিক-রূপে জন্মে ও মরে। মুণ্ড কল্পনা লইয়া চিরকাল অমর। কল্পনায় বদ্ধ-ভাব থাকিলেও সে অমর, মুণ্ড হইলেও অমর। তবে বদ্ধ-ভাব থাকিলে মুণ্ড সুখ-অন্বেষণার্থ জলৌকার ন্যায় এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে যায়। নিম্ন দেহের জীবদ্দশায় যদি মুণ্ড লম্ফ দিয়া অন্য দেহে সংক্রামিত হইতে পারিত, তবে অবিলম্বে ধনাঢ্যগৃহে স্থানে রাজা প্রভৃতির ঘাড়ে গিয়া চাপিত। কিন্তু ইহাতে নিয়ম বাধা আছে। জীবদ্দশায় দেহ মুণ্ডকে ছাড়ে না। গৃহিণী কর্ত্তাকে ছাড়ে না। কর্ত্তা পুনর্জ্জন্মের চেষ্টা করেন। কিন্তু পুনর্জ্জন্মেও আবার সেই গৃহিণী।

আবার সেই? কি জঞ্জাল! আমি ত চাহি নাই। গৃহিণী বলেন, "আমিও তোমাকে চাহি নাই, তুমি নিজেই ডাকিয়াছিলে!" কর্ত্তার স্মরণ না হইতে পারে, কিন্তু আইনটা নাকি অতি দড়। যেমন কর্ত্তার কল্পনা, সেইরূপ তাঁহার দেহ গৃহিণী। কল্পনা না হইলে কর্ম্ম হয় না।

এইরূপে পুনর্জ্জন্মের পুনরাবৃত্তি, এবং পুনর্জ্জন্মের হেয় বক্তৃতা ও বিষাদ।

অতএব গীতা কঠোরস্বরে বলিয়া থাকেন যে, "হে জীব, কল্পনা তোমার, কর্ম্ম তোমার নহে। কল্পনা, বদ্ধ হইয়া গেলে, বৃক্ষ ও ফলের উৎপত্তি। তুমি অকর্ম্মক্রিয়া করিয়া যাও। ফলাভার্থে কখনও কল্পনা করিও না। সকর্ম্মক কল্পনা করিলে পুনর্বিবাদ ও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সে যুদ্ধ ত্রাণবিহীন। পুনর্বারাদি জগতের নিয়ম। যুদ্ধ করিতে গেলেই পুনর্বারাপি হইয়া থাকে। অতএব যুদ্ধ করিতেই হইবে। যুদ্ধ নহিলে মুক্তি নাই।"

অর্থাৎ, পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপে কল্পনা করেন, তাহাই তোমার করা উচিত। ইহা যন্ত্রবিশেষ।

অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন, "তুমি জীব নহ।" তোমার ভাবনাময় জীবভাব। ভাবে তুমি বদ্ধ, ভাবেই তুমি মুক্ত। যে কল্পনায় তুমি বদ্ধ হইতেছ, তাহা কাটিয়া যা। যে কল্পনায় তুমি মুক্ত হইবে, তাহাই কর। দেহ—অং, মুণ্ড—কল্পনার বাস। মৃত্তের যে দিকে দৃষ্টি অদ্বৈত সেই দিকে সৃষ্টি। পূর্ব্বে এক অভাবনীয় ভাবে, পিতামহের বিশ্বকল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া চলিত; এখনও সে চলিতেছে না, তাহা নয়; তবে পৌত্রের বহুকল্পনার সহিত তাহার আর একটি সম্বন্ধ হইয়াছে। জীবভাবে কল্পনার অপব্যবহার হয়, এবং বিরক্ত হইয়া চাটি মারিলে সে নিজেই পদাঘাত পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বকথিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা জানিতেন না; চক্রবর্ত্তীর মানসিক ভাব পিতামহের আধিভৌতিক ভাবের সহিত সংঘর্ষিত হইয়া কালক্রমে একটী জীব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই নিস্তারিণী দেবী। চক্রবর্ত্তীর বাস শ্রীহট্টে।

চক্রবর্ত্তীর দুই গৃহিণী হইল। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। দেহ আধিভৌতিক গৃহিণী। নিস্তারিণী দেবী আধিদৈবিক গৃহিণী।

আধিভৌতিক হিসাবে গৃহিণী "মেয়ে মানুষ"; চক্রবর্ত্তী "আটা ছেলে"। গৃহিণী যুবতী, চক্রবর্ত্তী যুবক। পূর্ব্বকালের বন্দোবস্তে চক্রবর্ত্তীর দেহ হইতেই চক্রবর্ত্তীর পুত্রের দেহ জন্মিতে পারিত, নূতন বন্দোবস্তে গৃহিণীর দেহই তাহার জন্য উপযোগী। বিজ্ঞান ইহার কৈফিয়ৎ দিতে পারেন।

কিন্তু কেবল আধিভৌতিক দেহের যুক্ত দেখিলে চলিবে না। ইহার মধ্যে

অন্যান্য কথা আছে। অন্তঃসংগ্রাম ও বহিঃসংগ্রাম—উভয়ের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। যথা,—

	জীব নং ১ চক্রবর্ত্তী মহাশয়		জীব নং ২ নিস্তারিণী দেবী
(১)	চক্রবর্ত্তীর আত্মা	——→	নিস্তারিণীর আত্মা (আধ্যাত্মিক)
(২)	ঐ মুণ্ড	←——	ঐ মুণ্ড (আধিদৈবিক)
(৩)	চক্রবর্ত্তীর মুণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁহার দেহ	↓ ↑	নিস্তারিণীর মুণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁহার দেহ (কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ)
(৪)	চক্রবর্ত্তীর দেহ	←—→	নিস্তারিণীর দেহ (আধিভৌতিক) (জীবনসংগ্রাম)

(১) আত্মার সহিত আত্মার কোনও সংগ্রাম নাই। অতএব, চক্রবর্ত্তীর সহিত নিস্তারিণী দেবীর প্রেম অনিবার্য্য। আত্মা আত্মার সখা। এক আত্মা বহু আত্মাকে জীবরূপে ধারণ করিয়া জগদ্ধাত্রী ভাব। ইহার নাম দৈবী প্রকৃতি। মাতৃরূপে, সখারূপে, পিতারূপে, পুত্ররূপে, স্ত্রীরূপে একই মধুর ভাবের প্রসারতা।

(২) আত্মার ভাবে মুণ্ডের সহিত মুণ্ডের কোনও সংগ্রাম হওয়া উচিত নহে। মুক্ত মুণ্ড আধিদৈবিক। সকলেরই কল্পনায় এক লক্ষ্য। মুণ্ড দেহের মধ্যে 'বদ্ধ' না হইলে, চক্রবর্ত্তী ও নিস্তারিণীর কল্পনায় কোনও ঘাত প্রতিঘাত হইতে পারে না। চক্রবর্ত্তীর অপত্যস্নেহ গৃহিণীর অপত্যস্নেহের পরিপোষক। চক্রবর্ত্তীর সংসারে আত্মোৎসর্গ ও কর্ত্তব্যপালনের স্পৃহা গৃহিণীর তথৈব ভাবের পরিপোষক। ইহারই মধ্যে সোনার সংসার।

(৩) কিন্তু যদি প্রত্যেক মুণ্ড স্বীয় দেহে বদ্ধ হইয়া যায়, এবং আত্মতৃপ্ত কল্পনা করে, তবেই অন্তঃসংগ্রামের উৎপত্তি। অবশ্য (৪) সংজ্ঞা অনুসারে জীবদেহের মধ্যে জীবনসংগ্রাম বহির্দ্দিকে আছে; তাহা কেবল বিশ্রামই দেখিয়া থাকে।

কিন্তু সেটা আত্মার নিকট কিছুই নহে। (১) ও (২) সংজ্ঞা অনুসারে বদ্ধ মুণ্ডগণ-তাহা সহিয়া যায়। পিতা পুত্রের জন্য দেহ উৎসর্গ করে। সমাজ সমাজের জন্য করে। দেশ দেশের জন্য করে। যেখানে যজ্ঞ, সেখানে বিবাদ নাই; যেখানে স্বার্থফলাকাঙ্ক্ষা, সেখানেই বিবাদ।

অতএব বদ্ধমুণ্ড, বদ্ধমুণ্ডের বিরুদ্ধে অন্তঃসংগ্রামে চিরন্তন বদ্ধপরিকর।

জীব-ভাবের কল্পনার অপব্যবহার জীব সহিতে পারে না। চক্রবর্ত্তী যদি মনে করেন, "আমি গৃহিণীর কর্ত্তা"; গৃহিণী মনে করেন; আমি চক্রবর্ত্তীর কর্ত্তা। একটি অপরের প্রতিবিম্ব। চক্রবর্ত্তী বলেন, "আমার জন্য কর্ম্ম কর"; গৃহিণী বলেন, "আমার জন্য কর।" গৃহিণী "হাঁতে নিধি দিয়া অপরের বাড়ী গেলে চক্রবর্ত্তী চটেন; চক্রবর্ত্তী কেশের পারিপাট্য বিস্তার করিয়া থিয়েটার দেখিতে গেলে গৃহিণী চটেন। চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মফলভোগে গৃহিণী খুসী; গৃহিণীর কর্ম্মফলভোগে চক্রবর্ত্তী খুসী।

গৃহিণীর মতে, চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মফল তাঁহাকেই অর্পণ করিতে হইবে; চক্রবর্ত্তীর মতে, গৃহিণীর কর্ম্মফল তাঁহাতেই বর্ত্তিয়া যাওয়া উচিত। চক্রবর্ত্তীর কল্পনার বিরুদ্ধে গৃহিণীর যৌবন চলিয়া যায়; গৃহিণীর কল্পনার বিরুদ্ধে চক্রবর্ত্তীর কেশ পাকিতে থাকে। বদ্ধ-জীবের বিরুদ্ধে ঈশ্বর; ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বদ্ধ-জীব। অথচ, উভয়ের হৃদয়েই করুণা থাকে, উভয়েই প্রেম সম্বন্ধে একাধারে, এক বৃন্তে বর্ত্তমান। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা পাইয়া উভয়েই কাঁদে; কাঁদিলে উভয়ে উভয়কে সান্ত্বনা করে।

বৃদ্ধা কাঁদিলে বৃদ্ধ চকিতভাবে অশ্রুজল মুছায়। উভয়েই তখন মুক্ত। তখন তাহারা চিরকুমার!

এ স্থলে ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলেও অকর্ম্মক, এবং অকর্ম্মক হইলেও সকর্ম্মক। "চক্রবর্ত্তী চক্ষের জল মুছায়।" এ স্থলে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। বৃদ্ধার চক্ষুর্জ্জলে স্বীয় চক্ষের জলের ভাব আসিতেছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা উভয়েই কাঁদিয়া আকুল। ইহারই নাম কর্ম্মভোগ।

এইরূপে বৃদ্ধ ঈশ্বরের সহিত তাঁহার বৃদ্ধা প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধ। দ্বৈতবাদিগণ বলেন, জীব অশ্রুকণা। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, সবই বিড়ম্বনা; অতএব চক্ষু মুদিয়া মুণ্ড উড়াইয়া দাও।—ইতি।—

ফিরিঙ্গী দস্যু।

—:০:—

নীল সমুদ্রের তরঙ্গরাশি বিক্ষুব্ধ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যতরী মালাবার উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয়। দাক্ষিণাত্য হইতে পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া যখন পর্ত্তুগীজগণের জাহাজ-সকল ইউরোপে গমন করিতেছিল, সেই সময়ে সোনার বাঙ্গলার বিপুল ঐশ্বর্য্যের কাহিনী জগতে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পর্ত্তুগীজগণ অধিককাল অপেক্ষা না করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আপনাদের বাণিজ্য-তরী লইয়া বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হয়। সেই সময়ে বাঙ্গলার দুইটি প্রধান বন্দর নানা জাতির বাণিজ্য-জাহাজে সর্ব্বদা শোভাশালী থাকিত। তাহাদের একটির নাম চট্টগ্রাম ও অপরটির নাম সপ্তগ্রাম। পর্ত্তুগীজেরা ঐ দুই বন্দরে উপস্থিত হইয়া পণ্যসম্ভারে আপনাদের জাহাজ পূর্ণ করিয়া ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিত। তাহারা চট্টগ্রামের 'পোর্টো গ্রাণ্ডি' বা বৃহৎ বন্দর ও সপ্তগ্রামের 'পোর্টো পেকিনো' বা ক্ষুদ্র বন্দর আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা বাঙ্গলার অনেক স্থানে বাণিজ্যার্থ সমাগত হয়। লোকে সাধারণতঃ তাহাদিগকে 'ফিরিঙ্গী' বলিয়া অভিহিত করিত।

সোনার বাঙ্গলা হইতে পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যতরী অবিরত ইউরোপে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলে দলে দলে পর্ত্তুগীজগণ বাঙ্গলায় আসিয়া উপনীত হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তাহারা আপনাদের জীবিকার উপায় করিতে থাকে। কিন্তু ক্রমে তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় ও ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহাদের বাণিজ্য ও ব্যবসায় দিন দিন মন্দীভূত হয়। অনন্যোপায় তাহারা জীবিকার অন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাহারা সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশীয় রাজগণের সেনাদলে প্রবিষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা আরাকানরাজই তাহাদের অধিকসংখ্যককে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। পরে চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়া তাহারা কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা

ইহাদিগের বহুচরগণে জীবনাতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হয়। বঙ্গদেশে দুইয়া-দিগের অধীনেও তাহারা প্রবেশলাভ করে। ক্রমে তাহাদের মধ্যে চতুর ও দক্ষ ব্যক্তিগণ সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া আপনাদের কার্য্যদক্ষতা ও বাহুবলের পরিচয় দিয়া সমগ্র বঙ্গভূমিতে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। উদাহরণ-স্বরূপ আরাকান-রাজের সেনাপতি ফিলিফ ডি ব্রিটো, শ্রীপুরাধিপতি কেদার রায়ের সেনাধ্যক্ষ কার্ভালো ও প্রতাপাদিত্যের গোমলাজ সেনাপতি রুডার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ফিলিপ ডি ব্রিটো আরাকান-রাজের অনুগ্রহে ক্রমে পেগুর সাইরাম বন্দরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। কার্ভালোও কেদার রায়কে সন্তুষ্ট করিয়া সন্দীপের আধিপত্য লাভ করে; তৎকালে এই দুই জন পর্ত্তুগীজ সেনাপতির বাহুবলে সমগ্র বঙ্গোপসাগর আন্দোলিত হইত। ব্রিটো পরিশেষে অবাধ্য হইয়া উঠিলে আরাকান-রাজ তাহাকে যারপরনাই নিপীড়িত করিয়াছিলেন; কার্ভালো কেদার রায়ের অধীনে আরাকান-রাজ ও মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতাপ আরাকান-রাজের সহিত সখ্যস্থাপনের জন্য কৌশলে কার্ভালোর হত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের গোমলাজ সেনাপতি রুডাও আপনার বাহুবলের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাহার শিক্ষিত গোমলাজ সৈন্যগণ মোগল সৈন্যদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া বাঙ্গালীর কুলীন অগ্নোদম করিয়াছিল। মানসিংহের সহিত প্রতাপের ঘোরতর সংগ্রামে রুডা বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন দেয়। কুলাচার্য্যগণ তাহার অদ্ভুত বীরত্বের কথা বর্ণনা করিয়া থাকেন। সুন্দরবনের কোনও কোনও স্থানে প্রতাপের গোলা রুডার আশ্চর্য্য বলের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কিছুকাল সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যখন তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, এবং দেশীয় রাজন্যগণের অবজ্ঞাভাজন হইয়া আসিল, তখন ফিরিঙ্গীগণ জীবিকার জন্য স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু সেই ঘৃণিত উপায়ের জন্য তাহাদের গৌরব চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়। যাহারা সুসভ্য ইউরোপের সন্তান বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিত, তাহারা ব্যবসায় বাণিজ্য ও সৈনিক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শেষে দস্যুতা অবলম্বন করিয়া আপনাদের জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু তজ্জন্য তাহারা এরূপ ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিত যে, তাহা শ্রবণ করিলে

তাহাদিগকে সভ্য জাতির সন্তান বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। উন্মুক্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া বঙ্গোপসাগর, পদ্মা ও তাহার শাখানদী ও খাড়ীর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া তাহারা লোকজনের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত, এবং হাট বসিবার দিনে, বিবাহদিবসে বা অন্য কোনও পর্ব্বোপলক্ষে যখন লোকজনের সমাগম হইত, তখন তাহারা সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্ত্রী পুরুষ সকল ধৃত করিয়া আনিত, এবং তাহাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিত। তাহাদের এইরূপ অত্যাচারে গঙ্গা ও পদ্মার মোহানাস্থিত অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসস্থান হইয়া যায়। (১) এইরূপ ঘৃণিত জীবিকায় ক্রমে তাহারা পশুতুল্য হইয়া উঠে। যদিও তাহারা নামে খ্রীষ্টান ছিল, তথাপি তাহাদের আচার বর্ব্বর জাতি অপেক্ষা কোনওরূপে উৎকৃষ্ট ছিল না। দস্যুবৃত্তি করিয়া ক্রমে তাহাদের স্বভাব এত দূর ঘৃণিত হইয়া পড়ে যে, তাহারা আপনাদের মধ্যে হত্যা ও বিষপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন কি, তাহারা তাহাদের ধর্ম্মোপদেশকদিগকেও নিহত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। (২)

---

(১) আমরা বার্ণিয়রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মন্তব্য-সমর্থনের চেষ্টা করিতেছি,—"As they were unawed and unrestrained by the Government, it was not surprising that these runagates pursued no other trade than that of rapine and piracy. They scoured the neighbouring seas in light gallies, called galliasses, entered the numerous arms and canals of the Ganges, ravaged the islands of lower Bengal, and often penetrating forty or fifty leagues up the country, surprised and carried away the entire population of villages on market days, and at times when the inhabitants were assembled for the celebration of a marriage, or some other festival. The marauders made slaves of their unhappy captives, and burnt whatever could not be removed. It is owing to these repeated depredations that we see so many fine islands in the mouth of the Ganges, formerly thickly peopled, now entirely deserted by human beings, and become the desolate receptacles of tigers, and other wild beasts."

(২) "These people were Christians only by name; the lives led by them in Arracan were most detestable, massacring or poisoning one another without compunction or remorse and sometimes assassinating even their priests, who, to confess the truth, were too often no better than their murderers." (Bernier)

ক্রমে ইহাদের অত্যাচারে সমস্ত বঙ্গভূমি সন্ত্রস্তিত হইয়া উঠে। সর্ব্বাপেক্ষা সনদ্বীপ ইহাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়। এই সনদ্বীপের সহিত বাঙ্গালার অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার বিজড়িত রহিয়াছে। মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর কত যুদ্ধ যে ইহাতে পড়াগড়ি গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কত রুধিরধারা যে ইহার চতুঃপার্শ্বস্থিত সমুদ্রের নীলধারার সহিত মিশিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ফলতঃ, এই সনদ্বীপ লইয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজ বা ফিরিঙ্গীগণ হেয় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করার পূর্ব্ব হইতেই সনদ্বীপকে আপনাদের করায়ত্ত করিবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই জন্য কখনও বা তাহারা ইহা অধিকার করিয়াছিল, আবার কখনও বা তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া ইহা বাঙ্গালী ভূঁইয়া, মগরাজ ও মোগল পাঠানদিগেরও হস্তগত হইয়াছিল। এইরূপে বহু দিন ধরিয়া সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বঙ্গোপসাগরে তুমুল তুফান উত্থিত হইত। ফিরিঙ্গীরা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেই তুফানকে আরও বাড়াইয়া তুলে।

দস্যুবৃত্তি করিয়া যে সকল পর্ত্তুগীজ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গঞ্জালেস ফিরিঙ্গীই সর্ব্বপ্রধান। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গবাসী গঞ্জালেসের নামে ভীত হইয়া উঠে। গঞ্জালেস পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরের নিকট জন্মগ্রহণ করে। ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে সে পর্ত্তুগাল হইতে বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হয়। গঞ্জালেস প্রথমতঃ সৈনিক দলে প্রবেশ লাভ করে, পরে জীবিকার জন্য লবণের ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাতে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা না ঘটায় অবশেষে সে ঘৃণিত জলদস্যুর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। ক্রমে ফিরিঙ্গী দস্যুগণ তাহাকে তাহাদের নেতা মনোনীত করে। এই সময়ে সনদ্বীপ ফতেখাঁ নামক এক জন মুসলমানের অধিকারে ছিল। ফতেখাঁ প্রথমে পর্ত্তুগীজদিগের অধীন ছিল; পরে মোগল সুবেদারের অধীনতা স্বীকার করে। ফিরিঙ্গী দস্যুগণ ফতেখাঁকে নিহত করিবার পর সনদ্বীপ অধিকারে ইচ্ছুক হইয়াই গঞ্জালেসকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিল। ফতেখাঁর মৃত্যুর পর গঞ্জালেস সনদ্বীপ অধিকার করিয়া বসে। গঞ্জালেস আপনার প্রভুত্ববিস্তারের জন্য বাকলারাজ রামচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে আবার তাঁহারই রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়া বসে। তদ্ভিন্ন সে আপনার স্বজাতীয়

ফিরিঙ্গীদিগকে কিছু কিছু ভূমি প্রদান করিয়া আপনার কাছে টানিয়া লয়। সেই সময়ে আরাকানরাজ সেলিম শাহার মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সেলিম শাহার ভগিনীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে। কিছুকাল পরে অরুপরাজের মৃত্যু হইলে, গঞ্জালেস তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি করায়ত্ত করে। ইহার পর গঞ্জালেস আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। আরাকানরাজ গঞ্জালেসের রণকৌশল দেখিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ক্রমে তাহার উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে সেলিম শাহ মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আরাকানের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। গঞ্জালেস নিজে আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া, গোয়ার পর্ত্তুগীজ প্রতিনিধিকে আরাকানরাজ্য অধিকারের জন্য আহ্বান করে। প্রতিনিধি এক জন প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধে পর্ত্তুগীজেরা পরাজিত হইয়া বঙ্গোপসাগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। গঞ্জালেস কোথায় যে পলায়ন করে, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। সনদ্বীপ আরাকানরাজের অধিকারে আসে, এবং বঙ্গোপসাগরে কিছুদিন ফিরিঙ্গী দস্যুদিগের প্রভুত্বেরও হ্রাস হয়।

গঞ্জালেসের পরে আর এক জন ফিরিঙ্গীও সনদ্বীপ অধিকার করিয়াছিল; তাহার নাম ফ্রা জোয়ান। ফ্রা জোয়ান প্রথমতঃ এক জন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ছিল; তাহার পর ফিরিঙ্গী দস্যুগণের সহিত মিলিত হইয়া কৌশলে সনদ্বীপ অধিকার করিয়া বহু দিন ব্যাপিয়া তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

বাদশাহ সাজাহানের রাজত্বকালে এই দস্যুগণের প্রভুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ বাতীত তাহারা বাঙ্গালার অনেক স্থানে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে হুগলী পর্ত্তুগীজগণের একটি প্রধান স্থান হইয়া। দস্যুগণ তথায় সমবেত হইয়া লোকজনের প্রতি অত্যাচার, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ও যাহাকে পাইত ধরিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। সেই সময়ে বাষ্টিয়ান কনসালভ নামে এক দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি ফিরিঙ্গী দস্যুগণের সর্দ্দার ছিল। কনসালভ গঞ্জালেসের ন্যায় আরাকানরাজ্য অধিকারের জন্য গোয়ার রাজপ্রতিনিধিকে আহ্বান করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিনিধি তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত

করেন নাই। পর্ত্তুগালাধিপতি এব ধন হীনবংশীয় লোকের সাহায্যে কোনও রাজ্য অধিকার করিতে ইচ্ছুক নহেন বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন।

দিন দিন এই সকল দস্যুগণের অত্যাচার বর্দ্ধিত হওয়ায় বাদশাহ সাজাহান তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গলার তদানীন্তন সুবেদার কাশীম খাঁ জবনীর প্রতি আদেশ দেন। কাশীম খাঁ জলে স্থলে তিন দল সৈন্য প্রেরণ করিয়া হুগলী অধিকার করেন। পর্ত্তুগীজেরা প্রাণপণে নগররক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মোগলেরা দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। পর্ত্তুগীজেরা জাহাজে করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলে মোগলগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। পরে তাহারা আপনাদের কতকগুলি জাহাজে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। মোগলেরা তাহাদের অধিকাংশ জাহাজ অধিকার করিয়া স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা প্রভৃতিকে বন্দিরূপে রাজধানী আগ্রায় বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দেয়। সেখানে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। সুন্দরী স্ত্রীগুলি অন্তঃপুরমধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়; বয়স্কা ও অল্পসৌন্দর্য্যবিশিষ্টা রমণীগণ আমীর ওমরাহদের মধ্যে বিতরিত হইয়া যায়; শিশুগণ মুসলমান হইয়া দাসবৃত্তি অবলম্বন করে; এবং বয়স্কগণের কতক প্রলোভনে, কতক বা ভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। (১)

হুগলীর ব্যাপারের পরও তাহারা ক্রমে ক্রমে আবার দস্যুবৃত্তি করিয়া জলে ও স্থলে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। চট্টগ্রাম তাহাদের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। এই সময় চট্টগ্রাম আরাকানরাজের অধীন ছিল। আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তিনি প্রথমতঃ ফিরিঙ্গী দস্যুদিগকে বশীভূত করিয়া স্বীয় পক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। পরে

(১) "The misery of these people is unparalleled in the history of modern times: it nearly resembled the grievous captivity of Babylon, for even the children, priests, and monks shared the universal doom. The handsome women, as well married as single, became inmates of the seraglio; those of a more advanced age, any inferior beauty, were distributed among the owrapa; little children underwent the rite of circumcision, and were made pages; and the men of adult age, allured for the most part, by fair promises, or tortured by the daily threat of throwing them under the elephant's feet, renounced Christian faith." (Bernier)

চট্টগ্রাম অধিকারের পর তাহাদিগকে ঢাকায় আনিয়া নানা প্রকারে সিথ্যাতিত করেন। তদবধি ফিরিঙ্গী দস্যুর অত্যাচার অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। কিন্তু তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে ও সুন্দরবনে দস্যুতা করিত। এখনও চট্টগ্রাম প্রদেশে তাহাদের বংশধরের অভাব নাই।

নৃত্তকী।

১

মহেশ্বরীর দারোগা বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। যেমন সময় সময় লঘু তৃণখণ্ড ক্ষুদ্রকায় নদী-স্রোতে নিপতিত হইয়া ক্রমে সাগরে উপনীত হয়, তেমনই মহেজদ্দীন ঘটনাস্রোতে বাঙ্গালার পল্লী-প্রান্তর হইতে রাজধানীর জনসঙ্কুলভীষণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিল। হুগলীর নিকটবর্ত্তী গণ্ডগ্রামনিবাসী কৃষক ভমেজ মণ্ডলের পুত্র মহেজ যে ঘটনায়—যেরূপে দিল্লীতে উপনীত হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। সে বিবরণ উপন্যাসের মত বিস্ময়কর। মহেজ যখন অনাহারক্লেশতাড়নায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া হুগলীতে আসে, তখন ভমেজের আপনার এক বিঘা ভূমিও নাই; সে এক জন প্রতিবাসীর কর দিয়া 'ভাগে' করিয়া কোনরূপে দিনাতিপাত করে। এখন সে গ্রামের মহাজন; তাহার গৃহে ধানেরগুলি ঘর; মহেজ ইট পোড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছিল, ভমেজ তাহাতে কাণ দেয় নাই। এখন তাহার "ধন, গরু, ধান—তিন বিদ্যমান" ত বটেই, পরন্তু তিনেরই অনাবশ্যক বাহুল্য। ওটীপোকা যেমন প্রজাপতিতে পরিণত হয়, মহেজদ্দীন তেমনই বাঙ্গালার মুসলমানের হিন্দু বেশভূষা ত্যাগ করিয়া দিল্লীর মুসলমানের ধরণ ধারণ অবলম্বন করিয়াছে। সে পায়জামা ও চাপকান পরিধান করে, পাগড়ী বাঁধে, নাগরা পায় দেয়, উর্দ্দু কহে। মহেজমণ্ডল এখন মহেজদ্দীন খাঁ। মহেজদ্দীন দিল্লীতে বিবাহ করিয়াছে; অবস্থাবিপাকে দীনদশাগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার মহেজ-অবস্থার বিবাহিতা—রৌপ্যালঙ্কারে সজ্জিতা পত্নী ও তাহার গর্ভজাত সন্তানগণ দেশেই থাকে। দুই বৎসর পরে মহেজদ্দীন ছুটীতে দেশে আসিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দারোগা সব-ইন্‌স্পেক্টর বা ইন্‌স্পেক্টর মাত্র নহে। তখনও ভারতবর্ষ বিদেশীয় শাসন-যন্ত্রের পেষণে স্বাতন্ত্র্য-রস-সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়ে নাই। তখন সিপাহী যুদ্ধের ঝটিকাঘাতে নির্ব্বাপিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মোগলের নিঃশেষিতপ্রায়তৈল গৌরব-দীপ মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। তখন বাহাদুর শাহ পশ্চিম চক্রবালে অস্তরাগ দিনান্ত-তপনের মত দিল্লীর প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। দিল্লীর প্রাসাদ-গুম্ফান্তে জিনাত মহল মোগলের বিগত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিতেছেন, এবং স্বামীর ঔদাস্যে ও অবস্থার প্রতিকূলে সংগ্রাম বিরতে নিশ্চেষ্টতায় মুহ্যমান হইতেছেন; তাঁহার কূটবুদ্ধি নানাবিধ ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবনে সচেষ্ট।

তখনও চারি দিকে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল পাতা হইতেছে মাত্র। দুই দিকের গ্রামের অধিবাসীরা তাহা দেখিতেছে, দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে,—দুইখানা রেলের উপর দিয়া অশ্ব, উষ্ট্র, গো, বা হস্তী-শূন্য যান কিরূপে যাইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাদশাহ বিজয়ী শের শাহের অসাধারণ কীর্ত্তি বৃক্ষচ্ছায়াবৃত, সুগঠিত পথ তখনও সুরক্ষিত, এবং যাতায়াতের প্রধান উপায়। পথে মধ্যে মধ্যে চটি বা সরাই। পথিক সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যা হইতে সরাইয়ে আশ্রয় লয়। পথে দস্যু তস্করের ভয়; রাত্রিতে সঙ্গিহীন অবস্থায় পথ চলা বিপজ্জনক; কতকগুলি যান একত্র হইলে সমর সময় চলে মাত্র। লোকে সশস্ত্র হইয়া বাহির হয়—বিদেশী শাসকের অস্ত্র-আইনে দেশ তখনও আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া পড়ে নাই। প্রায় সকল সরাইয়ে যান পাওয়া যায়; সাধারণ পথিক যান পরিবর্ত্তন করিয়া গমন করে—ধনীদের ব্যবস্থা অন্যরূপ। মহম্মদীন সরাইয়ে সরাইয়ে যান পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতেছিল।—কোনও সরাইয়ে যানের অভাব হয় নাই। দিল্লী আর দুই দিনের পথ। সন্ধ্যায় মহম্মদীন একটি সরাইয়ে পঁহুছিল।

২

সে সরাইয়ে কয়খানি যান ছিল। ভাড়া করিবার চেষ্টায় ফলে মহম্মদীন জানিল, সবগুলি ভাড়া হইয়া গিয়াছে; এক জন নর্ত্তকী ভাড়া করিয়াছে। মহম্মদীন অধিক ভাড়া দিতে স্বীকৃত হইল। এক যান চালক প্রলোভনে পড়িয়া নর্ত্তকীর কর্ম্মচারীদিগকে বলিতে গেল, সে অধিক ভাড়া পাইতেছে

সেই ভাড়ায় যাইবে।—সেই বৃদ্ধা আসিয়া মহেন্দ্রদীনকে বলিল, "নর্ত্তকীর কর্ম্মচারীরা অধিক ভাড়া দিতেছে বলিয়া মহেন্দ্রদীন আরও অধিক হাঁকিল; নর্ত্তকীর কর্ম্মচারীরাও তাহাতেই স্বীকৃত হইল। কিন্তু ক্ষণ এইরূপে পরে মহেন্দ্রদীন শুনিতে পাইল, পার্শ্ববর্ত্তী যে গৃহে নর্ত্তকী সদলে অবস্থান করিতেছিল, সেই-গৃহ হইতে রমণী-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "হাসিমা! বর্ত্তমানে সঙ্গে কতক্ষণ ঘর হাঁকিবে? যানচালককে বলিয়া দাও, সে অন্যের নিকট যে ভাড়া পাইবে, আমরা তাহাই দিব; আর, প্রত্যেক চালককে এক এক আশরফি পুরস্কার দিব।" স্বর বিরক্তিপূর্ণ।

মহেন্দ্রদীন বুঝিল, আর চেষ্টা করা বৃথা। প্রভাতে হাসি মুখ করিতে হইবে ভাবিয়া সে আহারাদির আয়োজন করিতে গেল। রাত্রিতে সে কোনও রূপে একখানি যান-প্রাপ্তির উপায়-উদ্ভাবন চিন্তা করিতে লাগিল।

যাহারা আপন চেষ্টায় দুরবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিতে পারে, তাহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মহেন্দ্রদীন চতুর লোক; তাহার পর কার্য্যোপলক্ষে নানা লোকের সহিত মিশিয়া, বিশেষ দস্যু তস্করাদি দুশ্চরিত্রকারীদিগকে রক্ষা করিয়া করিয়া সে নরচরিত্র-জ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া মহেন্দ্রদীন অশ্ব উপযুক্ত পরিধান করিল। যাত্রার অশ্ব যানগুলি প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া সে নর্ত্তকীর এক জন কর্ম্মচারীকে বলিল, "আমি বড় বিপন্ন। দুইটি দেখে দিয়াছিলাম; দ্বিতীয়ে পঁহুছিতে বিলম্ব ঘটিলে চাকরী যাইবে। তোমার মনিব যদি একখানি যান ছাড়িয়া দেন, আমার বিশেষ উপকার হয়।"

ভৃত্য যাইয়া নর্ত্তকীকে সে সংবাদ দিল। নর্ত্তকীর পরিচারিকা হাসিয়া আসিয়া মহেন্দ্রদীনকে বলিল, "তুমি ত অনেক ভাড়া দিতে চাহিতেছিলে, গাড়ী পাও নাই?"

পরিচারিকার বেশ দেখিয়া চতুর মহেন্দ্রদীন নর্ত্তকীর সম্পর্কের অনুমান করিতে পারিল. বলিল, "আমার অপরাধ হইয়াছে। আমি নিতান্ত বিপন্ন, তাই ব্যস্ত হইয়া সে কার্য্য করিয়াছি।"

হাসিদা বিদ্রূপের হাসি হাসিল,—তাহার পর বলিল, "গাড়ী আমরা ছাড়িতে পারি না। তবে—তুমি যখন বিপদ জানাইতেছ, তখন এই করিতে পারি যে, একখানি গাড়ীর কলের বাল অন্য গাড়ীতে ভাঙ্গিয়া দিয়া

তোমার বসিয়া যাইবার স্থান করিয়া দিতে পারি। তোমার নিকট অধিক দ্রব্যাদি থাকিলে উপায় নাই।"

মরেজদীন মুহূর্ত্ত ভাবিল। তাহার বৃদ্ধা মাতা ও পত্নী কর্ত্তৃক তাহার ও তাহার শিশুপুত্র সন্তানদের জন্য প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যাদি মরেজদীন দারোগার বা তাহার সন্তানদের উপযুক্ত নহে,—সে সব হুগলীর নিকটবর্ত্তী গণ্ডগ্রামের অধিবাসী ভেমেদ মণ্ডলের পুত্র ও পৌত্রাদিরই উপযুক্ত। সে বলিল, "তাহা হইলেই আমার হইবে। সেই দয়াই যথেষ্ট।"

হামিদা ভৃত্যদিগকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিল।

জননীর ও পত্নীর সযত্নরচিত ও সংগৃহীত দ্রব্যাদি ফেলিয়া রাখিয়া মরেজদীন দারোগা একখানি যানের এক পার্শ্বে স্থান পাইয়া দিল্লীর দিকে চলিল।

মরেজদীন জানিল, নর্ত্তকী—হাফজান।

দিল্লীতে হাফজানের নাম কে না শুনিয়াছে? মরেজদীন ভাবিতে লাগিল,—হাফজানের বাঙ্গালায় যাইবার কারণ কি? যান চলিতে লাগিল।

৩

সন্ধ্যাগমের কিছু পূর্ব্বে যে স্থানে যান থামিল, সে স্থানে কতকগুলি প্রবীণ বৃক্ষ অবারিত ছায়া বিস্তার করিয়া ক্লান্ত পথিককে বিশ্রাম দান করিতেছিল। পার্শ্বে একটি স্বচ্ছসলিল সরোবর। সরোবর-কূলে একখানি ক্ষুদ্র দোকান-ঘর; তথায় পথিকদিগের আহারাদির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। তখন রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষিত অনুষ্ঠানে ভারতবাসী ধনীর অর্থ ব্যয়িত বা অপব্যয়িত হইত না। তাহা প্রকৃত সদনুষ্ঠানে, লোকের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। তখন কঠোর পূর্ত্তকর ছিল না; কিন্তু তখন যে সকল রাজপথ নির্ম্মিত ও সরোবর খনিত হইয়াছিল, সে সকলের তুলনায় এখনকার তদনুরূপ অনুষ্ঠান সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ।

হাফজানের অনুচরগণ কানাত দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে তাহাদের আহারের আয়োজন চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে স্থানটি নির্জ্জন দেখিয়া হাফজান কানাতের বাহিরে আসিয়া একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। প্রসারিত প্রান্তর; মধ্যে মধ্যে শস্য-ক্ষেত্র, স্থানে স্থানে বৃক্ষ। হাফজান আর একটু অগ্রসর হইল; শস্যক্ষেত্রে স্বভাবের শোভা দেখিতে দেখিতে সরোবরকূলে আসিল। যে স্থানে একটি বৃক্ষমূলে দোকান-

বাহের মহাদ্রুতীয় মরেজদ্দীন রফতের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিল, ঘটনাক্রমে হাফজান সেই স্থানে আসিল। মরেজদ্দীন উঠিয়া দাঁড়াইল; সম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি বিপন্ন হইয়া গত রাত্রিতে এক্কাখানি যাত্র পাঠাইবার চেষ্টায় বড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। অপরাধ লইবেন না।"

হাফজান বলিল, "সামান্য কথা; সে কথা কি আর কেহ মনে করিয়া রাখে?"

মরেজদ্দীন যানে স্থানদানহেতু হাফজানকে প্রচুর ধন্যবাদ দিল।

হাফজান দিল্লীতে তাহার কার্য্য পরিচয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাঙ্গালায় যাইবার কারণ কি?"

মরেজদ্দীন বলিল, "আমার আত্মীয়গণ বাঙ্গালায়—" বঙ্গদেশে তাহার নিবাস, সে কথা স্বীকার করিতে মরেজদ্দীন ইতস্ততঃ করিতেছিল; এমন সময় হাফজান বলিল, "আমিও বাঙ্গালী। বাঙ্গালা আমার দেশ; কিন্তু আমার জীবনে এই প্রথম বাঙ্গালা-দর্শন।"

মরেজদ্দীন বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে হাফজানের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

হাফজান বলিল, "আমার পিতা বাঙ্গালী—হিন্দু; দিল্লীতে ব্যবসায় করিতেন। আমার জন্মের ছয় মাসের মধ্যে আমার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হয়। গৃহে যে মুসলমান দাসী ছিল, সেই আমাকে মানুষ করে। পরে, বড় হইয়া আমি পিতার হাতবাক্সে কাগজপত্রে আমার আত্মীয়দিগের সন্ধান পাই, এবং ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হই।"

মরেজদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল, "স্বগ্রাম দেখিতে আসিয়াছিলেন?"

"শুধু তাহাই নহে। আমি নক্কায় যাইব। তৎপূর্ব্বে স্বগ্রামে পিতা-মাতার নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছায় আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও গিয়াছিলাম। আমি বিধর্ম্মী, আমা হইতে ত সে কার্য্য সম্ভব নহে।"

"এ সঙ্কল্প আপনার মত ধর্ম্মপ্রাণ রমণীরই উপযুক্ত। সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে ত?"

হাফজান দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না।"

মরেজ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"যাঁহাদিগকে অর্থ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, তাঁহারা এ কার্য্যের ভার

পরীতে সম্মত হইলেন না। যাইবার তার লইতে আজই লোক পাঠাইব, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

"খোদা যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন। এও তাঁহারই ইচ্ছা। তাঁহার অভিপ্রায় আমরা কি বুঝিব?"

হাফজান মহেজদ্দীনের মিষ্ট কথায় তুষ্ট ও তাহার ধর্ম্মভাবে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবতী হইল।

৪

দিল্লীতে পঁহুছিয়া পর দিন মহেজদ্দীন হাফজানের গৃহে গমন করিল। উদ্দেশ্য,—তাহার দয়ার জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। মহেজদ্দীনের কৃতজ্ঞতা কিছু অতিরিক্ত বটে। তাহার পর মহেজদ্দীনের কিছু দিন সে পল্লীতে কাজ পড়িতে লাগিল। আর কাজে যাইবার সময় সে হাফজানের সংবাদ না লইয়া যাইত না। কখনও বা সে হামিদার নিকট সংবাদ লইয়াই চলিয়া যাইত, কখনও বা হাফজানের সহিত সাক্ষাৎ করিত। হাফজানের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সে মন্দির বা মসজিদ নির্ম্মাণের কথা তুলিত। মহেজদ্দীন বলিয়াছিল,—একটা অনুষ্ঠান হইলেই তাহার কিছু লাভ হইবে। ফলেও তাহাই হইল।

মহেজের প্রতি হাফজানের শ্রদ্ধা ক্রমে বিশ্বাসে ও বিশ্বাস হইতে দৃঢ়তর ভাবে পরিণত হইল। ক্রমে এমন হইল যে, মহেজের মত তাহার আর কেহ নাই। তাই সেও মসজিদ-নির্ম্মাণাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যোগী হইল। সে সকল কার্য্যে মহেজদ্দীন তাহার পরামর্শদাতা।

ক্রমে হাফজানের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; মহেজের সহিত তাহার ঘন ঘন সাক্ষাৎ সত্য সত্যই আবশ্যক হইয়া উঠিল। এক একটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উভয়ে বহুক্ষণ পরামর্শ করিত। ক্রমে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল।

এই সকল অনুষ্ঠান হইতে অর্থাগমই মহেজদ্দীনের উদ্দেশ্য। তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে লাগিল।

এ দিকে হাফজান-হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মহেজ-ময় অন্তরের এক প্রান্তে কোথায় ওয়েসিস সৃষ্ট হইয়াছিল; তথা হইতে উৎসারিত উৎসের উচ্ছ্বসিত স্ফটিক-বারিরাশি বহিয়া আসিয়া শুষ্ক মরুতে স্নিগ্ধ সরসতার সঞ্চার করিতেছিল। হাফজান আপনি আপনার এই

পরিবর্ত্তনে বিস্মিতা হইল; ভাবিল—একি! প্রাসাদে বাদশাহের বা বেগমের সাহচর্য্যে সে যে আনন্দ অনুভব করে নাই, আমীর ওমরাহের গৃহে আপ্যায়নে সে যে তৃপ্তি পায় নাই, এখন বঙ্গদেশাগত, অজ্ঞাতকুলশীল মহেন্দ্রনারায়ণ দারোগার সাহচর্য্যে সে তাহা লাভ করিল! যৌবনের উচ্ছ্বাস জলে তাহার যে হৃদয় কম্পিত করিতে পারে নাই, এখন শান্ত স্রোতে তাহা অনায়াসে কম্পিত হইল! এখন নারী-হৃদয় অভ্যাসের, শিক্ষার, সংযমের, সঙ্কল্পের সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল! সে কথা মনে করিয়া তাহার আপনার হাসি আসিত। কিন্তু সে সহজেই বুঝিতে পারিল, তাহার অবস্থা আর হাসিয়া উড়াইবার উপায় নাই।

হাফজান মধ্যে মধ্যে মহেন্দ্রনারায়ণের গৃহেও যাইত; তাহার পত্নীকে ও সন্তানদিগকে কত অলঙ্কার দিত। মহেন্দ্রনারায়ণের তাহাও লাভ।

এই ভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। মহেন্দ্রনারায়ণের প্রতি হাফজানের মনোভাব ক্রমে অনুরাগে পরিণত হইল।

৫

দিল্লীর প্রাসাদে বৃত্তিভোগী বাদশাহ বাহাদুর শাহের বেগম কুশাগ্র-বুদ্ধি জিনাত-মহল ভারতব্যাপী বিপ্লবের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া পুলকিত হইতেছিলেন; এবং সেই বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য অবিরত অর্থব্যয় ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন। তিনি সন্তানিত-সাকল্য সন্তুষ্ট চিত্তে দেখিতেছিলেন, ইংরাজের একমাত্র অবলম্বন—প্রধান বল ভারতীয় সৈনিকদল দেশের সাধারণ লোকেরই মত ইংরাজের উপর অসন্তুষ্ট, বিদেশীর শাসন-যন্ত্র বিকল করিতে উদ্যত। তিনি জানিতেন,—ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও আনুষঙ্গিক দাবাদিতে দিল্লীর জনসাধারণের উপর হাফজানের অসাধারণ প্রভাব। তিনি হাফজানকে ষড়যন্ত্রে সঙ্গী করিয়া লইয়াছিলেন।

যখন চারি দিকে অসন্তোষ প্রবল হইয়া উঠিল, কেবল ইংরাজ ব্যতীত আর সকলেই তাহা জানিল, তখন কামানের রঘুতরে অগ্নি দেওয়া হইল। ভারতবাসী তখনও নিজস্ব বিসর্জ্জন দেয় নাই; তাহার সব সহিত, ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ সহিত না। তখন অপবিত্র চর্ব্বিলিপ্ত টোটা কাটার কথা প্রচারিত হইল। যাহারা সিপাহীবিপ্লব গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহারা বুদ্ধিমান লোক; তাহার পরের কার্য্যভার যাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহারাই স্বকর্ম্মসাধনে অপটু ছিল।

৩

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, দিল্লীর প্রাসাদে একটি কক্ষে বেগম ও হাফজান—দুই জন। বেগম মধ্যে মধ্যে উঠিয়া দ্বার পর্য্যন্ত যাইতেছেন। তিনি যেন অস্থির হইয়া উঠিতেছেন। বহুক্ষণ এই ভাবে গেল। উভয়েই উৎকণ্ঠিত। বেগম একবার উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, আকাশে দুই একখানা মেঘ জমিতেছে। তিনি ঘরে আসিয়া বলিলেন, "হাফজান! মেঘ উঠিতেছে; কি জানি কি হয়!" বেগমের গলা ধরিয়া আসিতেছিল।

এই সময় বোধ হইল, কে সোপান অতিক্রম করিতেছে। দুই জনেই বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দ্দার খোজা বেগমকে কুর্ণিশ করিয়া একখানি পত্র দিল। বেগম উন্মাদিনীর মত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দীপালোকে পত্র পাঠ করিলেন; আনন্দে হাফজানকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। পত্রে মিরাটে বিপ্লব-সূচনার সংবাদ ছিল।

হাফজান আর বিলম্ব করিল না; নামিয়া আসিয়া শিবিকায় আরোহণ করিল।

৭

হাফজানের গৃহে দিল্লীর জনসাধারণের নায়কগণ অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে ইংরাজ সেনাদলের কয় জন হাবিলদারও ছদ্মবেশে আসিয়াছিল।

হাফজান তাহাদিগকে সংবাদ দিল। সকলেরই মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। তাহারা বহুক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিল;—পর দিনের কার্য্য-প্রণালী স্থির হইল।

তাহারা যখন বিদায় লইল, তখন মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের যাইবার সময় হাফজান হামিদাকে ডাকিল; তাহাকে দেখাইয়া সকলকে বলিল, "যদি অস্ত্রপক্ষীয়দিগের কাহারও গৃহে আমার এই পরিচারিকাকে ফিরোজা ওড়না উড়াইতে দেখ, তবে সে গৃহ আক্রমণ করিও না; তাহার বিশেষ কারণ আছে, জানিবে।"

তাহারা চলিয়া যাইবার পর হাফজান বহুক্ষণ কি ভাবিল; তাহার পর হামিদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শিবিকাবাহকগণ চলিয়া গিয়াছে কি?"

হামিদা বলিয়া আসিয়া জানাইল,—তাহারা তখনও অপেক্ষা করিতেছে।

সেই রাত্রিতে হাফজান মরেঞ্জদীনের গৃহে আসিল। হায় রমণী-হৃদয়!

হাফজান সরল-বিশ্বাসে ময়েজুদ্দীনকে সকল কথা বলিল; গজ্জকে একথা সন্ধান দিল। নারীবুদ্ধি যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, নারী-বুদ্ধিই তাহার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিল।

হামিদাকে সেই গৃহে রাখিয়া হাফজান ফিরিয়া আসিল।

এ দিকে ময়েজুদ্দীনও বাহির হইয়া গেল।

৮

পর দিন প্রভাত হইতে না হইতে নগরে অস্ত্র ঝন্‌ঝনা শ্রুত হইল; বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল; দিকে দিকে বাদশাহের জয়ধ্বনি হইতে লাগিল; দিল্লী জাগিয়া উঠিল। ইংরাজগণ ব্যস্ত হইয়া আগুন দিয়া বারুদ ভাণ্ডার উড়াইয়া দিল। সে শব্দ সে দিন প্রভাতে দিল্লীবাসীর নিকট মুক্তির আহ্বান বলিয়া বোধ হইল।

এই মুক্তির কামনা যখন শিশুমাত্র থাকে, তখন তাহাকে স্তন্যদানে বর্দ্ধিত করিতে হয়; তখন সে যদি দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রক্তের জন্য কাঁদিতে থাকে, তবে তাহাকে রক্তদান ব্যতীত আর উপায় কি?—দিল্লীর পথে সে দিন রক্তপাত হইয়া গেল।

প্রমত্ত জনগণ ইংরাজ শিবিরের পর ইংরাজের কর্ম্মচারী ও সহায়দিগের গৃহ আক্রমণ করিতে চলিল। রাজপথ সশস্ত্র জনগণে পূর্ণ; দিল্লী বাদশাহের জয়ধ্বনিতে ধ্বনিত।

কয়টি গৃহ লুণ্ঠনের পর লুণ্ঠনরত জনগণ ময়েজুদ্দীন দারোগার গৃহদ্বারে উপনীত হইল। নায়কগণ দেখিল,—গৃহ-শিরে হাফজানের পরিচারিকা কিরোজা ওড়না উড়াইতেছে! তাহারা আদেশ করিল,—কেহ সে গৃহ লুণ্ঠন করিতে পারিবে না। জনতা হতাশ হইল, কিন্তু সে আদেশ অবহেলা করিতে পারিল না। তখনও তাহারা বিজয়গর্ব্বমদিরাপানে জ্ঞানহারা হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশের বীজ বপন করে নাই। নায়কগণ ভাবিল, বুঝি ময়েজুদ্দীন বাদশাহের বন্ধু। ময়েজুদ্দীনের গৃহের একখানি ইষ্টকেও কোনরূপ আঘাত লাগিল না।

৯

চারি মাস কাটিল। দিল্লীতখ্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত মোগল-প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিরাম নাই,—বিশ্রাম নাই। সঙ্গে সঙ্গে হাফজানেরও বিশ্রাম নাই। কিন্তু উপযুক্ত সেনানায়কের অভাব, সেনাদলগঠনক্ষম লোকের অভাব দূর হইল না।

এই কথা দিল্লীর পথে পথে আবার শুনিতে পাইলাম। ধীরে ধীরে ইংরাজ নষ্ট অধিকার পুনরায় লাভ করিতে লাগিল। বাদশাহের অকুতোভয় সৈনিকদের রক্তে ভারতে মোগল-সিংহাসনের যে ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। দুই দিন যুদ্ধের পর দিল্লী ইংরাজের হস্তগত হইল; দেশ-বিখ্যাত মোগলের শ্মশানক্ষেত্র প্রতাপশূন্য শ্মশানে পরিণত হইল।

তাহার পর পিশাচ হডসন সহজে বাবরের বংশের শেষ আশা—যুবক উমেদের কুমারবাহাদুর বাহাদুর শাহের পুত্রদিগকে নিহত করিল; মুসলমানের চিরবাঞ্ছিত বাদশাহকে ধূলিলুণ্ঠিত করিল। সেই পৈশাচিক আদর্শে ইংরাজের সেনা ও কর্ম্মচারীদিগের ভীষণ প্রতিহিংসা-বৃত্তি ভীষণতর হইয়া উঠিল; তাহারা খাজিনাধ হইতে রক্তপিপাসুর ন্যায় বাহির হইল।

তাহারা প্রথমেই হাফজানের গৃহে আসিল। গৃহদ্বার রুদ্ধ; তাহারা দ্বার ভাঙ্গিতে বসিল। দ্বার মুক্ত হইল না; কিন্তু বিলম্বে একটি বাতায়ন-কপাট মুক্ত হইল। সেই বাতায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া হাফজান স্থিরকণ্ঠে বলিল, "তোমরা কি চাই? আমার জীবন থাকিতে তোমরা ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পাইবে না। বাদশাহের জন্য প্রাণ দিব—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। প্রাণ দিব, কিন্তু প্রাণ থাকিতে তোমরা আমার অপমান করিতে পারিবে না।—"

সম্মুখস্থিত বন্দুক তুলিয়াছে দেখিয়া হাফজান নীরব হইল। পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া সম্মুখস্থ সৈন্যটি বন্দুক তুলিয়াছিল।

হাফজান স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের রোষভাব নিমেষে পরিপূর্ণ হইল, ওষ্ঠাধরে যেন অতি-মৃদু মুদুহাসি ফুটিয়া উঠিল।

নিম্নে সকলে মুখ হইয়া দেখিতে লাগিল।

ইংরাজ সেনাপতি ওষ্ঠ চালাইবার আদেশ দিতে না দিতে সম্মুখস্থ বন্দুক ছুটিল। হাফজান যেন বল বাড়াইয়া দিল।

পর মুহূর্ত্তে বিদীর্ণবিদলিত হাফজানের মৃতদেহ ভূমিতলে পতিত হইল। বীরের অকুণ্ঠিতভাব ও রণধীর-ব্রতে ভারতে ইংরাজের শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবিত হইয়া রহিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভাব ও কর্ম্ম।

—:০:—

মানবীয় কর্ম্ম প্রধানতঃ ভাবজ। প্রথমে ভাব, তৎপরে কর্ম্ম। সকলেই জানেন, আমাদিগের ভাব মস্তিষ্কে। ভাব-তরঙ্গ মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু (১) যোগে দেহস্থিতে আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহাতেই হস্ত-পদাদি-সঞ্চালনে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ এই প্রক্রিয়া—এত দ্রুত বেগে ও অনায়াসে সাধিত হইতে পারে যে, মনে হয়, যেন কর্ম্ম আপনা হইতেই হইতেছে। ভাব ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়া কত পরিশ্রমে শিশু লিখিতে শিখে; কিন্তু আমরা অভ্যাসবশতঃ অনায়াসেই লিখিতে পারি; প্রত্যেক অক্ষর আর ভাবিয়া গণিয়া লিখিতে হয় না। যেন আপনা হইতেই লেখা যাইতে হয়। দেহ-যন্ত্র অভ্যাসবশতঃ প্রবণতা (Pre-disposition) প্রাপ্ত হয়। তখন ভাবের উদ্রেকমাত্রেই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যথাযোগ্যরূপে আন্দোলিত হয়, এবং কর্ম্ম তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়। যাহা হউক, মানবীয় কর্ম্ম মূলে ভাবজ; তবে অভ্যাসবশতঃ অনায়াসসিদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

এতদ্দেশে পুরাকাল হইতে দুই মত প্রচলিত আছে। এক মতে কর্ম্ম পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট; উহা অদৃষ্টের ফলে উৎপন্ন হয়; মানবের বর্ত্তমান ভাব হইতে নহে। অন্য মতে, কর্ম্ম অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়েরই অপেক্ষা করে; এবং পুরুষকার বর্ত্তমান ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা এই দ্বিতীয় মত অনুসারে ভাব ও কর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইলাম। (আমাদিগের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় ভাবজ কর্ম্ম। যাহা ভাবজ, তাহা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? এই বিষয়েই আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। বিদ্যুৎ অভাব গুরুতর, কিন্তু কর্ম্মী অথবা কর্ম্মেচ্ছুগণের অবশ্য আলোচ্য। এই গুরুতর বিষয়ের যথাযোগ্য আলোচনা করিতে পারি, এরূপ উপযোগিতা আমার নাই; তথাপি দুই একটি কথা আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ ও মনন করিলে কৃতার্থ হইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাবজ কর্ম্মের মূল ভাব; এবং মস্তিষ্ক পদার্থই ভাবের আধার। মানবের মস্তিষ্ক এতই জটিল যে, উহার স্বরূপ নির্ণয় করা অতীব কঠিন। তবে এ কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, উহার প্রত্যেক

(১) প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে Nerve অর্থে স্নায়ু শব্দই প্রযুক্ত হইল।

অথচই প্রত্যেক ভাবের আধার নহে। যে সকল মস্তিষ্ক-কোষের ক্রিয়া একরূপ জানা গিয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় যে, উহার ব্রিভিন্ন কোষগুচ্ছ ও তৎসংলগ্ন স্নায়ু-তন্তু সকল যেন বিভিন্ন ভাবের আধার।— এইরূপ কোষ-গুচ্ছকে আমি কেন্দ্র নামে অভিহিত করিব। মোটামুটি বলিতে গেলে মস্তিষ্ক পদার্থ যেন কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিভক্ত; আর এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্র বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি স্থান। এক কেন্দ্র পীড়িত অথবা নষ্ট হইলে, অন্য কেন্দ্র তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এই মত অদ্যাপি সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই, কিন্তু নিত্যই ইহা অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে প্রতীয়মান হইতেছে। "হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, 'মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার, এ কথা কোন শারীরতত্ত্বজ্ঞই অধিকক্ষণ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।(২) এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, যদি তাহাই হইল, তবে যে ভাব যে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সেই ভাবের মূলীভূত কেন্দ্রকে যথাযোগ্যরূপে উত্তেজিত করিতে পারিলেই সেই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবার পথ পরিষ্কৃত হইবে। কিন্তু মানবের মনে যুগপৎ বিরোধী ভাব সকল অনেক সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ বিরোধী ভাবকে রোধ করিতে না পারিলে, কর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ হইবে। সুতরাং যেমন উপযুক্ত ভাবের উত্তেজনা আবশ্যক, তেমনই বিরোধী ভাবের উত্তেজনাও রোধ করা প্রয়োজন। নচেৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে না; একটি জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিব,—এই ভাবে উত্তেজিত হইলাম। সুতরাং জলে ঝাঁপ না দিলে ঐ কর্ম্ম হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষা-বৃত্তি আসিয়া ঐ ভাবের গতি রোধ করিল। তখন ভাবিলাম,—জলে ঝাঁপ দিলে নিজে মারা যাইতে পারি। এরূপ অবস্থায় জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হইল না; সুতরাং উপযোগী ভাবের অনুশীলন ও বিরোধী ভাবের গতিরোধ,—এতদুভয় যুগপৎ সাধিত না হইলে, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বিরোধী ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে যে ভাব প্রবল হয়, কর্ম্ম তাহাকেই অনুসরণ করে।

বিরোধী ভাব নানা প্রকার; কিন্তু সে সকলের সাধারণ লক্ষণ,—দুঃখাশঙ্কা। "দুঃখং মে মা ভূদ্যাৎ" ইহাই জীবের আকাঙ্ক্ষা। বর্ত্তমানে অথবা

২) No physiologist can long resist the conviction that different parts of the cerebrum subserve different kind of mental action.

Ency. Brit vol. 15. p. 817.

ভবিষ্যৎ দুঃখ আশঙ্কা করিলেই কর্ম্মও প্রতিহত হয়। সে দুঃখ বাস্তবিকও হইতে পারে; কাল্পনিকও হইতে পারে। ব্যক্তিগত, অথবা পারিবারিক, অথবা সামাজিক, সর্ব্ব স্থলেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক দুঃখাশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। এই সকল দুঃখ একত্র অথবা পৃথক্‌রূপে বিরোধী কারণস্বরূপ কল্পিত হয়। তখনই মূল ভাব বাধা প্রাপ্ত হয়। আর ঐ ভাব ও বাধার মধ্যে যেটি প্রবল হয়, কর্ম্ম তাহাকেই আশ্রয় করে। বাধা কর্ম্মারম্ভে, অথবা তৎপরেও, উপস্থিত হইতে পারে। যখনই উপস্থিত হউক, উহার প্রতিক্রিয়াবশতঃ মূল ভাব আচ্ছন্ন হইলে কর্ম্ম রুদ্ধ হয়। কিন্তু যদি উহা মূল ভাবকে আরও উত্তেজিত করে, তবে উহার সংঘর্ষ লাভ করিয়া কর্ম্ম দৃঢ়তরূপে অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল স্থলে বাধাই কর্ম্মের সহায়। যেমন দুঃখাশঙ্কা কর্ম্মের বাধক, তেমনই সুখের আশা কর্ম্মের সহায়। 'সুখং মে ভূয়াৎ'—সুখ সকলেই ইচ্ছা করে। কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে যে সুখ হইবে, সেই সুখে দৃঢ় প্রত্যয় ও মতি থাকিলে, মানব ভবিষ্যৎ-নেত্রে সে সুখের চিত্র দর্শন করে; সিদ্ধির সুখ কল্পনা করিয়া মানব উৎসাহিত হয়, (৩) অধুনই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, সমাজের পক্ষেও তেমনই।

কর্ম্মকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত হিসাবে দুই দিক হইতে বিবেচনা করা যাইতে পারে। যে কর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনীয়, তাহা জাতীয় প্রয়োজনের অনুকূল হইতেও পারে, নাও পারে। জীবগণ কেহ বা স্বতন্ত্ররূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সমাজ-বদ্ধ হয় নাই; আর কেহ বা সমাজবদ্ধ হইয়া নিজের ও সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। সামাজিক জীব স্বার্থ ও পরার্থ,—এই উভয়বিধ ভাবে পরিচালিত হয়। পিপীলিকা-শ্রেণীয় কর্ম্মিগণ পরার্থের চরম উদাহরণ। ইহারা স্ত্রী জাতীয়, কিন্তু ডিম্ব প্রসব করে না। যিনি এ সমাজের মাতৃরূপা, ডিম্বপ্রসবিনী, তিনি ডিম্ব প্রসব করিয়া জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু যাহারা কর্ম্মী, তাহারাই ঐ ডিম্ব সকলকে প্রতিপালন করে; মাতৃরূপিণীকে আহার দেয়; দলে দলে বিভক্ত হইয়া সমাজস্থ শত্রু হইতে রক্ষা করে। (৪) ইহারা কেবল পরার্থেই জীবন ঢালিয়া

(৩) রামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(৪) Cf. Lubbock, Ants, Bees and Wasps.

Weismann On Heredity, vol. II. p. 20.

দিয়াছে; সমাজ-বদ্ধ জীব সম্পূর্ণ স্বার্থপরায়ণ হইতেই পারে না। নহিলে সমাজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অ-সমাজ-বদ্ধ জীবেরা সর্ব্ব বিষয়ে অন্যের নিরপেক্ষ। কেবল বংশ-রক্ষণ ব্যাপারে পরের সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যাহারা স্ত্রী-পুং-ভেদ-যুক্ত, অথচ সমাজ-বদ্ধ নহে, আমি তাহাদিগের কথাই বলিতেছি। এই এক কর্ম্ম, অর্থাৎ বংশ-রক্ষণ ব্যতীত অন্য কোনও কর্ম্মে ইহারা পরার্থের অনুসরণ করে না। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই সাধন করিয়া থাকে। ইহারা (প্রধানতঃ মানব) সমাজ-রক্ষার্থ প্রয়োজিত নিয়ম সকল রচনা ও পালন করে; এবং কালক্রমে সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত ঐ সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম প্রচলিত করে। কিন্তু সমাজ যখন তমদশায় উপস্থিত হয়, তখন এ শক্তি প্রায় সজীব থাকে না; সুতরাং স্বার্থই প্রবল হইয়া উঠে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই উভয়বিধ কর্ম্মই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার অভিক্রিয়া বংশানুগত হওয়াতে, জীব উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া নিম্ন হইতে উচ্চ পদবীতে উন্নত হইয়াছে। যদিও ইহাই একমাত্র কারণ নহে, তথাপি দেহ ও মন উভয়ই আদি কাল হইতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনতা করিতেছে। নিম্ন জীবগণ এই অবস্থার সম্পূর্ণ অধীন। কিন্তু মানব এক দিকে যেমন অবস্থার দাস, অন্য দিকে তেমনই অবস্থার প্রভু। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানবকে এক দিকে যেমন পরিচালিত করিতেছে, অন্য দিকে সেও যুক্তিবলে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিতেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ডে লাঙ্কেরেল্ সত্যই বলিয়াছেন, "Man is nature's rebel * * * Her insurgent Son (৫)"—মানব, প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান। এই মহাবাক্যের মর্ম্ম এরূপ নহে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্থির থাকিলেও মানব তাহার নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়; তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি অলঙ্ঘ্য প্রভাবে আপন কঠোর নিয়ম জীব-নির্ব্বিশেষে সকলের উপরই পরিচালন করেন। মানবকে অব্যাহতি দেন না। কিন্তু মানব স্বীয় বুদ্ধিবলে উদ্দেশ্যের উপযোগী ভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সক্ষম হয়; তাই সে প্রকৃতিকে পরাজয় করে। মানবীয় উন্নতির প্রধান উপায়ই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করা এবং তাহার ফল বংশানুগত করা।

(৫) Nature and Man p. 22—3.

ইহাই তাহার বিদ্রোহ, ইহাই তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা। এই স্থলেই মানবীয় ভাবের প্রাধান্য, মানবীয় ইচ্ছার আধিপত্য। নিম্ন জীবগণের এ ভাব নাই, তাই তাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং ঐ অবস্থার উপযোগী হইলে বাঁচিল, নচেৎ নির্ম্মূল হইয়া গেল। যোগ্যতমের জয়,—এ নিয়মের ইহাই প্রকৃত রহস্য। প্রকৃতি অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, যে তাহার উপযোগী, সেই বাঁচিবে;—অন্যে নহে। নিম্ন জীবগণ প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না; তাই তাহারা এই কঠোর নিয়মের দাসত্ব করে। বিদ্রোহী মানব কালক্রমে এ নিয়ম হইতে এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে যে, (৬) এখন সে প্রকৃতির প্রভু। যে দিন এই প্রভুত্ব হইতে মানব তিলমাত্র স্খলিত হইবে, সে দিন তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠাও শেষ হইবার সূত্রপাত হইবে। প্রভুত্ব ছাড়িলেই ক্রমে দাসত্ব উপস্থিত হইবে। তখন বিবিধ মানব-সমাজ-মধ্যে অযোগ্যের স্থান থাকিবে না। সুতরাং মানবীয় ভাবের আধিপত্য, মানবীয় ইচ্ছার প্রাধান্য স্থির রাখিতেই হইবে। নতুবা কোনও নির্দ্দিষ্ট মানবসমাজই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। মানব আপন ইচ্ছার জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছে; (৭) সে পতাকা আর সে নামাইতে পারিবে না; সে পতাকা হস্ত হইতে স্খলিত হইলেই পরাজয় অনিবার্য্য। সুতরাং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাকে আপন বশে আনিতেই হইবে, নচেৎ মানবের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অন্য উপায় নাই।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বিবিধ,—জড় ও জীব। এতদুভয়ে প্রকৃত প্রভেদ থাকুক আর নাই থাকুক, ব্যবহারে ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। জড়-প্রকৃতি,—মৃত্তিকা, জল, বায়ু, শীত, তাপ, ইত্যাদি; জীব-প্রকৃতি,—নিম্ন জীব হইতে মানব পর্য্যন্ত। এই উভয় প্রকৃতিই নির্দ্দিষ্ট মানব-সমাজের শত্রুতা করিতে সক্ষম হয়। মৃত্তিকা, জল, বায়ু মানবের দেহ ও মনকে এত প্রপীড়িত ও বিধ্বস্ত করিতে পারে যে, মানব আত্ম-রক্ষা করিতে সক্ষম নাও হইতে

(৬) At every step of his progress man has receded further and further from the ancient rule exercised by nature.

Nature and Man p. 22.

(৭) The standard raised by the rebel man * * is one of ideal comfort, prosperity and conscious joy in life—imposed by the will of man, involving a control * * of natures methods of dealing with life. Ibid P. 23.

পারে। তদ্ভিন্ন স্থলে ঐ সকলকে স্বীয় উদ্দেশ্যের অনুকূলরূপে পরিবর্ত্তিত করিতেই হইবে। জড়-প্রকৃতি যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট মানবজাতিকে দুর্ব্বল ও প্রপীড়িত করিয়া ক্রমে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তন না করিলে, মানব কখনই আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। জীব-প্রকৃতি কীট, পতঙ্গ হইতে মানব পর্য্যন্ত যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট মানব-সমাজের প্রতিকূল ব্যবহার করে, তাহাকে আপনার আয়ত্ত করিতেই হইবে। বিবিধ কীটশ্রেণী নানা রূপ পীড়ার উৎপাদন করিতেছে; সিংহ ব্যাঘ্রাদি মানবকে বিনষ্ট করিতেছে; এক মানবসমাজ অন্য মানব-সমাজকে উৎপীড়িত করিতেছে; এ সকল অবস্থায় তাহাদিগকে নষ্ট, নিবৃত্ত, অথবা স্বীয় উদ্দেশ্যের অনুকূল করিতে না পারিলে, আত্মরক্ষা কখনই হইতে পারে না। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের আদিমনিবাসিগণ পারিপার্শ্বিক মানব-উৎপীড়নে একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তাহাদিগের সংখ্যা এক্ষণে লুপ্তপ্রায়। তাহারা ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রভু হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ বিবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থারই আধিপত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে; তাহার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এ নিমিত্ত তাহাদিগের, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর, সংখ্যা ক্রমে ন্যূন হইয়া আসিতেছে। দেহ ও মন ক্রমেই অবসন্ন ও জীবন-ব্যাপারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। গত ৫০ বৎসরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে, এবং দেহ ও মন জীর্ণতার দিকে অনেক অগ্রসর হইয়াছে।(৮) এই ধ্বংসাভিমুখ গতি অপ্রতিহত থাকিলে ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা কল্পনার অবিষয় নহে।(৯) প্রাচীন গ্রীক্, রোমান্ ও ইজিপ্‌শিয়ান্‌গণের দৃষ্টান্ত ধ্বংসের পথ দেখাইয়া দিতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপ্রতিহত থাকিলে, এ পরিণাম অনিবার্য্য। জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে হইলে, পারিপার্শ্বিক জড় ও জীব প্রকৃতিকে

(৮) The experience of the last 50 years goes to shew that four or five decades more and very few of the higher and lower classes of Hindus will live to say that there was such a nation as the Bengalee Hindus.

A. B. Patrika—20. 7. 07.

(৯) Brahmins, vaidyas, kaisthas, Navasaks, Syeds and Pathans—these classes sooner or later must be wiped off from the face of the country.—Ibid.

পরাস্ত করিতে হইবে। এজন্যেরের জন্য, বায়ু ও মৃত্তিকা; পীড়ার বীজ স্বরূপ কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদাদি; প্রতিকূল মানব-পীড়ন,—এ সকল হইতে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে, ইহাতে গত্যন্তর নাই।

কেবল তাহাই নহে। সমাজ-বদ্ধ মানব সমাজ-রক্ষার্থ এক সময়ে যে সকল নিয়ম পালন করে, কালক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়। এতদ্দেশীয় স্মৃতিশাস্ত্র ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। কিন্তু যদি সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও ঐ সকল নিয়ম অসংস্কৃতরূপে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে সমাজ ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দিব। উপরে বলিয়াছি, এতদ্দেশীয় হিন্দুগণের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। ১৯০৬ সালের বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের বিজ্ঞাপনী পাঠে জানা যায় যে, ১৯০৫ সালে জন্মের সংখ্যা প্রতি সহস্র জনে প্রায় ৪০টি ছিল; কিন্তু ১৯০৬ সালে উহা প্রায় ৩৭ হইয়া গিয়াছে। তবেই জন্মের সংখ্যা কমিতেছে। ঐ বিজ্ঞাপনীতে আরও জানা যায় যে, মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে। সুতরাং বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে জন্মের, অন্ততঃ জীবিতের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, এবং মৃতের সংখ্যা কমাইতে হইবে। বিজ্ঞান বলিতেছে,—বাল্যবিবাহ অপেক্ষা অধিক বয়সের বিবাহেই অপত্য জন্মেও অধিক, বাঁচেও অধিক। (১০) এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? পুত্র কন্যাকে অধিক বয়সে বিবাহ দিবার সেই প্রাচীন প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইবে কি না? বাল্যবিবাহ পরিত্যাগ করিতে হইবে কি না? জনসংখ্যা বৃদ্ধি করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে এই ক্ষয়শীল সমাজে বিজ্ঞানানুমোদিত নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে। জড় প্রকৃতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা হইলেও জীব-বিজ্ঞানের নিয়ম—লঙ্ঘন করা যায় না; করিলে বংশক্ষয় নিবৃত্ত করিবার উপায় নাই। নিম্ন শ্রেণীস্থ হিন্দু জাতির মধ্যে অনেকে বাধ্য হইয়া চির-কুমার-ব্রত অবলম্বন করে; অনেকে আবাল্য চির-বৈধব্য পালন করে। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়, কি করিতে হইবে? এ সকল স্থলে বিবাহ-বিধির সংস্কার অত্যাবশ্যক। নতুবা আত্মরক্ষার উপায়ান্তর কি? কল্পিত আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যেমন জড় ও জীব প্রকৃতিকে পরাজয় করা আবশ্যক, তেমনই সামাজিক নিয়মাবলীও তদনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয়, এই শেষোক্ত বিষয় পূর্ব্বোক্তেরই অন্তর্গত।

(১০) Late marraiges are more prolific than early ones.
Stark Weather—Law of Sex P. 75.

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—জড় ও জীব প্রকৃতিকে পরাজয় করিবার উপায় কি? এবং কি করিলে সেই উপায় কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? জড়-প্রকৃতি বিজ্ঞানানুমোদিত বুদ্ধিবলে পরাজিত হয়। মানবেতর জীব-প্রকৃতিও তাহাই। এ নিমিত্ত মানব এতদুভয়ের নিয়ম সকল অবগত হইয়া বিজ্ঞানবলে ক্রমশঃ স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট মানব-সমাজ অপর মানব-সমাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে কি করিবে? ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বিবিধ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাবৃত্তাদি-শাস্ত্র-সম্মত উপায়ের নিকট মানবও পরাভূত হয়। কিন্তু এ বিষয় সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইতে পারে না; হইতে পারিলেও আপনাদিগের নিয়মানুসারে নিষিদ্ধ হইত। বাহুবল, চরিত্রবল, মনের বল, এ সকলের সম্মিলন অতীব দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক, আমি উপায় অবধারণ করিতে বিরত হইলাম। উপায় যাহাই হউক, কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে কি প্রকারে? ইহাই আমাদিগের প্রবন্ধের দ্বিতীয় বিভাগ। কর্ম্মই আমাদিগের আলোচ্য, সুতরাং সেই বিষয়ে আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বলিয়াছি,—কর্ম্মের মূলে ভাব। ভাব যে সকল স্থলে কর্ম্মে পরিণত হয় না, তথায় নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ বিরোধী-কারণ কল্পনা করিতে হয়। এ স্থলে একটি নির্দ্দিষ্ট সনাথ মানস-পটে অঙ্কিত করুন। বিবেচনা করুন, কোনও নির্দ্দিষ্ট মানবসমাজ জড় ও জৈব, পারিপার্শ্বিক অবস্থাধীনে ক্রমে দুর্ব্বল, ভীরু, উদ্ভাবনী-শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। তাহাদিগের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। বিবেচনা করুন, সে সমাজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, এবং চতুর্দ্দিকে প্রতিকূল সমাজে বেষ্টিত; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র সমাজের কতিপয় ব্যক্তি অত্যধিক ভাব-বিশিষ্ট; আর সেই প্রতিকূল সমাজ নিজের ও অপরের প্রবল শক্তিতে শক্তিমান্। এরূপ স্থলে ঐ ক্ষুদ্র সমাজ আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবে কি প্রকারে? উপায় নির্দ্ধারণ করিলে হইবে না। কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং কিরূপেই বা তাহা স্থায়িরূপে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই বিবেচ্য।

যখন ভাবজ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই, হয় ত সম্যক্‌রূপে ভাব উত্তেজিত হয় নাই; অথবা সিদ্ধির উপায় অপরিজ্ঞাত, নচেৎ, বিরোধী কারণ বাধা দিতেছে। সম্যক্‌রূপে ভাব উত্তেজিত হইলে, ভাবজ কর্ম্ম সহস্র বাধা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেই। বিরোধী ভাব হইতে মূল ভাবের শক্তি অধিক হইলে, বিরোধী ভাব পরাস্ত হইবেই। ভাব জিহ্বাগ্রে থাকি-

বার বিষয় নহে ; উহা মস্তিষ্কের কেন্দ্র-নিহিত। একাগ্র ভাব অধমর্ণীয়। আমি অন্যত্র বলিয়াছি,—

ভাবে মত্ত হৃদি যার, সুখ-দুঃখ-জ্ঞান
সকলই নিমেষে তার হয় অন্তর্ধান।
চেষ্টামাত্র সার হয় ; একাগ্র হৃদয়
আপনি সুসিদ্ধি আনি' অমনি মিলায়।

* * * * * *
* * * * * *
* * * ভাবের অভাবে
দ্বৈধ, চিন্তা, অনাহস, অলস প্রভাবে
হৃদয় ছাইয়া ফেলে ; দূরে যায় চলি'
সাহস, উদ্যম, চেষ্টা ; আসি সকলি,
নিতান্ত নিষ্ফল হয় চিরদিন তরে ;
তাই অধঃপাতে জীব যায় এ সংসারে। (১১)

বিরোধী কারণ উপস্থিত থাকিলেই বুঝিতে হইবে, একাগ্র ভাবের অভাব। যদি তাহাই হইল, তবে ভাবের স্ফুরণ করিতে হইবে ; আমাদিগকে সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে। মস্তিষ্কের উপযুক্ত কেন্দ্র সংপোষিত-রূপে আন্দোলিত করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বাঞ্ছিত ভাবের অনুকূল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ম্ম নীরবে করিয়া যাইতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিতে করিতেই ভাবের স্ফুরণ ও কর্ম্মের প্রবণতা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভাব কর্ম্মও পরস্পর পরস্পরকে উত্তেজিত করে ; ভাব একের সহায়তায় অন্যে পরিপুষ্ট হয় ; এবং সিদ্ধির উপায় অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, ক্রমেই তাহা আবিষ্কৃত ও স্বতঃপ্রকটিত হইতে আরম্ভ করে। বাঞ্ছিত ভাবের উপদেশের শ্রবণ, মনন ও ধ্যান ; ভাবপূর্ণ-গ্রন্থাধ্যয়ন ; চরিত্রবান ভাবুকগণের সঙ্গ ও তাঁহাদিগের কর্ম্ম দর্শন ;—এ সকলই ভাবোদ্দীপনের ও উপায়-উদ্ভাবনের অনুকূল। সৎসঙ্গ অশেষকল্যাণপ্রদ ; এ নিমিত্ত সভা সমিতির আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সে কেবলই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য, ভাব ও কর্ম্মে সমন্বয় করিবার নিমিত্ত ; অন্য কারণে নহে। কিন্তু যখন সভা সমিতিতে বিরোধী শক্তির ঈপ্সিত

(১১) প্রশ্ন ; পৃঃ ৯—১৩।

পথে লইয়া যায়, তখন সত্য অন্বেষণ করিতে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

তার পর ভাবের উত্তেজনা যাহাতে ক্ষণিক না হইয়া স্থায়ী হইতে পারে, তদ্বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। ভাবের ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব, সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর নির্ভর করে। আমার মনে হয়, যাহার চরিত্রে গাম্ভীর্য্য নাই, হৃদয়ে প্রকৃত বেদনানুভূতি নাই, যে চটুল ও বাচাল, তাহার ভাব স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। যাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ, যে ঐশী শক্তিতে আস্থাবান, স্থায়িত্ব তাহার হৃদয়কেই আশ্রয় করে। জগতে কর্ম্মবীরগণের জীবন-চরিত মুক্তকণ্ঠে ইহাই বলিতেছে। ব্যক্তিগত ভাবের স্থায়িত্ব চরিত্রের সহচর। কিন্তু ভাবকে বংশগত স্থায়িত্বও দেওয়া আবশ্যক। মানবের দেহ ও মন উভয়ই বংশানুক্রমের নিয়ম সকলের অনুসরণ করে। যাঁহারা বাঞ্ছিত ভাবের ভাবুক, তাঁহারা পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইলে ঐ ভাব অপত্যে জন্মগত হইবার আশা করা যায়; আর তাহা হইলে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গের গুণে ঐ ভাব হইতে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়াও সম্ভব। ক্ষণিক উত্তেজনামাত্রই সার হইলে বিশেষ কোনও ফল নাই। ভাবকে বংশগত স্থায়িত্ব দিতেই হইবে। নতুবা ভাব কখনই সমাজের অঙ্গীভূত হইবে না; উহা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ক্রীড়নকমাত্র হইতে পারে, আর কিছুই নহে।

সমাজ সম্বন্ধে বলিতে আর একটি কথা মনে হয়। ভাব ও কর্ম্মে যোগ করিতে হইলে, সমাজের দিকে লক্ষ্য থাকা চাই। ব্যক্তিকে ভুলিতে পারিলেই ভাল হয়; অন্ততঃ তাহাকে সমাজের অধীন করিতেই হইবে। ব্যক্তি চরিত্রগুণে সমাজের অনুগত হয় ভালই; অন্যথা নিন্দা, প্রশংসা ও দণ্ড পুরস্কারের দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। এ সকলের অসীম শক্তি; যে কর্ম্মের দশ জনে নিন্দা করে, তাহা না করিবার, এবং যে কর্ম্মের দশ জনে প্রশংসা করে, তাহা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। দশের প্রশংসা কর্ম্মের বিশেষ প্রবর্ত্তক। (১২) সমাজস্থ লোকের প্রশংসা লাভ করিবার নিমিত্ত আত্ম স্বার্থ ভাসা করিয়াও মানব কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়। তখন ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করিবার ইচ্ছা হয়। সমাজ-বদ্ধ মানবের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ব্যক্তিগত

(১২) Whenever public opinion is roused, it will lead to action.
Nature June 13, 1907.

স্বার্থকে এইরূপে সামাজিক স্বার্থে মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক। স্বার্থিকে পরার্থের অনুগত ও অনুপোত করিয়াই হইবে। কেবল নিজের ভাবিব, অন্যের ভাবিবই না, ইহা হইলে সমাজ হইতেও পারে না, থাকিতেও পারে না; ইহারও প্রধান সাধন আবাল্যের ব্যবহার ও আচরণ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি, যাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে এবং সে সাধনাকে বংশগত করিতে নর নারী উভয়েরই সহায়তা আবশ্যক। বংশ উভয়ের কর্ম্ম, একের নহে। সুতরাং ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, দম্পতীর মধ্যে একের ভাবশূন্যতায় অপত্যের মস্তিষ্কে অল্পাধিক জড়তা আসিবার নিশ্চিত সম্ভাবনা। দম্পতীর মধ্যে এক জন অথবা দুইই যদি ভাবহীন হয়, অপত্যের কি দশা হইবে? সে জাতি কত দিন টিকিবে? যাহার নিজের মস্তিষ্কের কেন্দ্র সকল নিদ্রিত রহিয়াছে, সুশিক্ষা, সৎসঙ্গ বহুদর্শিতা প্রভৃতি দ্বারে যাহার মস্তিষ্কের স্ফুরণ হয় নাই, চরিত্র সুগঠিত হইবার পথে অগ্রসর হয় নাই, বাহ্য জগতের উত্থান পতনের সংঘর্ষ আজীবন যাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করে নাই, এমন নারীর এমন নরের অপত্য হইতে আমরা কি প্রত্যাশা করিতে পারি? অধঃপতনের গতি নিবৃত্ত করিতে হইলে, জাতিকে হাত ধরিয়া তুলিতে হইলে, দম্পতীর মধ্যে কাহাকেও লোক-লোচনের অন্তরালে আজীবন লুকাইয়া রাখিলে চলিবে না। ইহা নিশ্চিত যে, যে জাতির অর্দ্ধাংশ মৃতপ্রায়, সে জাতি মৃত্যুর পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এ স্থলে আবার সেই পূর্ব্বকথা স্মরণ করুন। জীব ও জড় প্রকৃতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেও, মানব সমাজের বিধি ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করুন।

আমি বলিয়াছি,—ভাবের একাগ্রতায়, ভাবের মত্ততায়, বাধা পরাস্ত হয়; কিন্তু সর্ব্বত্র তদ্রূপ একাগ্রতা উৎপন্ন হইতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে বিরোধী কারণ আসিয়া উপস্থিত হইবেই। আমরা যেরূপ সমাজের কথা কল্পনা করিয়াছি, তাহাতে বিরোধী ভাবের প্রবলতা অনেক সময় লক্ষিত হইবে। এ সমাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়াবশতঃ যেরূপ হীন দশায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বহু বাধা লক্ষিত হইবেই। জড় প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি, উভয়ই তাহাকে অবসন্ন করিবে। এ ক্ষেত্রে জড় প্রকৃতিকে শাসন ও আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত অকঠিন। যদি তাহা পারা যায় ভালই; নচেৎ সে স্থানই ত্যাগ করা শ্রেয়। জীব-প্রকৃতির অধীনতায় দেহ ও মন যে ভাবে

অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা অতীব শোচনীয়। এ স্থলে পরপুষ্ট কীটের কথা স্মরণ করুন। পারিপার্শ্বিক জৈব অবস্থান হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে যে দুর্দশা হয়, পরনির্ভরতা যে বিষময় ফল উৎপন্ন করে, তাহার চরম দৃষ্টান্ত কীট। পরপুষ্ট কীট নিজের চেষ্টায় জীবনব্যাপার সম্পন্ন করে না। এ নিমিত্ত তাহার দেহ ও মন ক্রমে অধঃপাতে যায়। অনেক পরপুষ্ট কীট মুখ ও উদর পর্য্যন্ত এই কারণেই হারাইয়াছে। স্বচেষ্টায় আহার অন্বিষ্টে হয় না, তাই মুখ ও উদর লুপ্ত হইয়াছে। যখন স্বাবলম্বনপরায়ণ ছিল, তখন মুখও ছিল, উদরও ছিল; কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল! এ অবধি পরপ্রত্যাশী হইল, তখন হইতে কেবল ডিম্বাধারে পরিণত হইয়াছে। জীবতত্ত্ববিৎ উইস্‌ম্যান্ স্বীয় Heredity নামক গ্রন্থে বিশদরূপে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।(১৩) অধ্যাপক রে ল্যাঙ্কেষ্টার বলিয়াছেন,—"স্বাবলম্বন ত্যাগ কর; অমনই হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ সকলই যাইবে; পরিশ্রমী উচ্চভাবাপন্ন পশুর প্রভৃতিও এ বৃত্তির অভাবে কোলমাত্র ডিম্বাধারে পরিণত হয়। মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র ও অস্ফুট হইয়া যায়; জীব যেন মোহনিদ্রায় অভিভূত হয়।" (১৪) অধ্যাপকবর ভিন্ন ভিন্ন পরপুষ্ট জীবের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা জীবতত্ত্বের বহু-প্রমাণিত সত্য। পরতন্ত্রতা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ভুলাইয়া দেয়। পক্ষী জাতির সমস্ত দেহ ও মন উড়িবার উপযোগিরূপেই গঠিত; কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে স্বচেষ্টায় জীবনব্যাপার সম্পন্ন করিতে হয় না: তখন সে উড়াও ভুলিয়া যায়! আমি যখন জীবতত্ত্ববিৎ Weir সাহেবের Dawn of Reason গ্রন্থে প্রথম সেই লাল পিপীলিকার বৃত্তান্ত পড়ি, তখন অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। তিনি লিখিয়াছেন, (১৫) "এক শ্রেণীর লাল পিঁপড়ার বিষয়ে,

(১৩) Heredity vol. II 10–13.

(১৪) If the parasetic life be once secured, away go legs, jaws, eyes and ears * * * . The brain remains quite small and undeveloped * * * in fact has gone permanently asleep, and actually relapsed into a primitive stage. Roy Lankester, Degeneration P. P. 39—46.
Sedguick Life P. P. 91—95.

(১৫) I put some of these red slave-owners (ants) into a glass jar in which I placed an abundance of food. Notwithstanding the fact that this food was easy of access, being in fact immediately beneath their jaws they would not touch it. I then placed a black slave in the jar; she at once went to her masters, and after thoroughly cleaning them with her tongue, gave them food. These red ants would have starved to death in the midst of plenty if they had been left to themselves.
Dawn of Reason p. 135.

ঠিক তাহার মুখের নীচে, প্রচুর খাদ্য রাখিয়াছিলাম; কিন্তু সে স্বাবলম্বন-বৃত্তি—অর্থাৎ হারাইয়াছে যে, খাদ্য নিকটে থাকিতেও খাইতে পারিল না। তখন একটি কাল পিঁপড়া তাহার নিকটে দিলাম; সেটি লাল পিঁপড়ার ভক্ষ্য। সে গিয়া লালকে খাওয়াইয়া দিল। তাহা না করিলে লাল মরিয়া যাইত, তথাপি আপন চেষ্টায় খাইত না। প্রভু হও, দাস হও, স্বাবলম্বন-বৃত্তি হারাইবে। এই দশাই উপস্থিত হইবে, ইহা নিশ্চিত। জড় ও জীবপ্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিপ্রভাবে ক্রমে এই অবস্থাই উৎপন্ন হয়। পরতন্ত্রতায় দেহ, সুতরাং মনও একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। (১৬) সুতরাং কর্ম্ম সুদূর পরাহত হয়। পর-প্রত্যাশী লাল পিপীলিকা আহার্য্য গ্রহণ করে নাই কেন? আহার্য্য ত নিকটেই ছিল, ক্ষুধাও ছিল। আহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা; ক্ষুধা দেহের স্বভাব। কেবল মস্তিষ্কের জড়ভাবশতঃ এই দুই-এ সংযোগ করিবার ভাব ছিল না। তাই কর্ম্ম হইল না। (১৭) জড়তা দূর করিবার উহার নিজের সাধ্য নাই। কিন্তু ঐ পুরুষ কর্ম্মী পিপীলিকার সংযোগে অপত্য উৎপন্ন হওয়া যদি সম্ভব হইত, তবে উহার নিশ্চেষ্টতা বিদূরিত হওয়াও সম্ভব হইত। ভীরু, দুর্ব্বল, অকর্ম্মা কুক্কুরের সহিত সাহসী ও সবল 'ডালকুত্তা'র সংযোগে যে কুকুর জন্মে, তাহার ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা অনেক দূরীভূত হয়। নির্জ্জীব গরু ও সবল 'ষোণ্ডা' গরুর সংযোগে যে বাছুর হয়, তাহা সবল হয়। অশ্ব, মেষ, মহিষাদি সমস্ত জীবেই এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব জীবরাজ্যের বহির্ভূত নহে; জীব-রাজ্যের নিয়ম সকল মানবেও প্রযোজ্য। এ স্থলে ইংলণ্ডের আদিমনিবাসিগণের কথা স্মরণ করুন। রোমানগণের ছায়া-ভবে উহারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইত। সকল কর্ম্মই রোমানগণ করিত, উহারা সম্পূর্ণ পরপ্রত্যাশী হইয়া বসিয়া থাকিত। পরে যখন রোমানগণ আপনা হইতেই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রোম রাজ্যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন উহারা ঊর্দ্ধে বাহু তুলিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আপনারা যাইবেন না,

---

(১৬) Mental and physical degeneration rather go hand in hand. Heredity vol. II P. 22

(১৭) এ দেশে এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজেরা অযোধ্যা রাজ্য অধিকৃত করিবার সময়ে তাহার স্বাবলম্বনশূন্য অকর্ম্মণ্য সুলোমন অধিপতি ওয়াজেদ আলি তাঁহার পান্ডুল ফুরাইয়া দিবার ভয়ে নিকটে না পাইয়া পলায়ন করিতে না পারায় চিরজীবন যন্ত্রণাতে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমাদিগের কি দশা হইবে!" রোমানেরা শুনিল না; তাহারা চলিয়া গেল। এই সময় হইতে ন্যূনাধিকশক্তিসম্পন্ন লোক ইংলণ্ডীয়গণকে পরাজিত করিয়া প্রভু হইল। কালক্রমে আদিমনিবাসিগণের সহিত তাহাদিগের সংমিশ্রণে নূতন এক জাতি উৎপন্ন হইল। ইহারাই বর্ত্তমান ইংরেজ জাতি। ইহারা কেমন আত্মনির্ভরপরায়ণ! আমি হিন্দু জাতিকে ঠিক এরূপ করিতে বলিতেছি না। কিন্তু বলসঞ্চয় করিতে হইলে, বিবাহ-ক্ষেত্রের প্রসার-বৃদ্ধি করিতেই হইবে। বর্ণভেদ রক্ষা করিয়াও বিবাহ-ক্ষেত্র বিস্তৃত করা যাইতে পারে। কর্ম্মী, বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি জাতির সহিত দুর্ব্বল অলসস্বভাবাপন্ন তত্তৎ জাতীয়ের বিবাহ বন্ধন হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছে। ব্যবসায়িগণ গো, মেষ, মহিষ, কুক্কুর, অশ্বাদি পশুগণকে ও বাজ, পারাবত, বুল্‌বুল প্রভৃতি পক্ষিগণকে এই রূপেই উন্নত অবনত করে। ইহাতে দেহ ও মন, উভয়েরই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। যে মানব-সমাজ দিন দিন অবনত হইতেছে, এ উপায় তাহাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিবেচ্য। জীব-বিজ্ঞানের নিয়ম অলঙ্ঘ্য। নিয়ম সকল অবগত হইয়া পালন করিলেই প্রকৃতি আপনা হইতে পরাজয় স্বীকার করেন। প্রকৃতিকে জয় করিতেই হইবে; ইহাতে ঐকান্তিক ভাবের একাগ্রতা আবশ্যক। যে ভাবের স্ফুরণ করিতে হইবে, স্বাবাল্য তাহা অনুশীলনীয়। যে দেশে এক জনও ভাবুক আছেন, যাঁহার শিরায় শিরায়, অস্থি-মজ্জায় ভাব-তরঙ্গ নিয়ত আন্দোলিত, সে দেশে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবেই। ধর্ম্ম-জগতে, রাজনৈতিক জগতে, বৈজ্ঞানিক জগতে—ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রকৃত ভাবুক কর্ম্ম করিবেনই; পরে তাঁহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া অনুষ্ঠানকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর শিক্ষক; তাহার ন্যায় শিক্ষক জগতে আর নাই। কর্ম্ম করিতেছি না; করিবার উপায় কি? কর্ম্ম করাই একমাত্র উপায়। নিষ্কর্ম্ম-রোগের একমাত্র মহৌষধ কর্ম্ম করা। কর্ম্ম করিতে করিতেই ভাব উত্তেজিত হয়, সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু সে কর্ম্ম করিবে কে? পথ-প্রদর্শক কে হইবে? যিনি একাগ্র, যিনি ভাবুক, যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই হইবেন; অন্যে তাঁহার পদানুসরণ করিবে। ভগবান বলিয়াছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।—গীতা।

শ্রেষ্ঠ যেরূপ আচরণ করেন, জনসাধারণও তদ্রূপই করে। যে দেশে পথ-প্রদর্শক নাই, সে দেশের আশা কোথায়? এ সকল স্থলে স্বার্থ-পরার্থের

মহামিলন অত্যাবশ্যক। চির-কুমার সুতরাং স্বার্থ-শূন্য ভাবোন্মত্ত দণ্ডীর অত্যন্ত আবশ্যক। সকলকেই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং ভাবে ও কর্ম্মে সমন্বয় করিতে হইলে, অনাসক্ত এক শ্রেণীর মহাজন অধঃপতিত সমাজের নিতান্ত প্রয়োজন।

আপনারা পূর্ব্বে যে সমাজের কথা কল্পনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার কথা পুনরায় স্মরণ করুন। সেই ক্ষুদ্র সমাজ, চতুষ্পার্শ্বে বৃহত্তর প্রতিকূল সমাজে বেষ্টিত; আর সেই প্রতিকূল সমাজ নিজের ও অপরের প্রবল শক্তিতে শক্তিমান। এরূপ স্থলে ভাবকে কর্ম্মে পরিণত করিতে হইলে, কি করিতে হইবে? জগতের ইতিহাসে কয়েকবার এইরূপ হইয়াছিল। তন্মধ্যে একবারের কথা আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মহাত্মা যীশু দ্বাদশটি শিষ্য ও মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া ভাবে মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র সমাজ বৃহত্তর প্রতিকূল সমাজে বেষ্টিত ছিল। আর তাহারা নিজের ও অপরের শক্তিতে বিপুল শক্তিমান ছিল। তখন যীশু স্বীয় মুষ্টিমেয় শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "Go not into the way of the gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: But go rather to the lost sheep of the house of Israel. * * * Provide neither gold nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat." এই মহাবাক্য হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই? জগতের কোটী কোটী নর নারী যাঁহার পদতলে মস্তক অবনত করিতেছে, তিনি মহাপুরুষ, সন্দেহ নাই; তিনি কর্ম্মী, এবং সুকুশল কর্ম্মী। তিনি বলিতেছেন,—"ঐ বৃহত্তর প্রতিকূল সমাজের দিকে যাইও না। Gentiles এবং Samaritansদিগের সহিত মিশিও না। তাহাদিগের নগরে প্রবেশ করিও না। আপন Israel সমাজের পতিত জনসাধারণের নিকট যাও, বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" আমি এই মহাবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইতে অপারগ। আপনারা বিবেচনা করিবেন, মহাত্মার উপদেশ আত্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত হইতে বলিতেছে কি না? বিরোধী সমাজে শক্তিকে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিলে, প্রথমতঃ শক্তি প্রতিহত হয়। তাহাতে কর্ম্ম নিরুদ্ধ হইতে পারে। তাই যীশু বলিতেছেন,—"ভাব-প্রচার আত্মসমাজে সীমাবদ্ধ কর।" সে সমাজ মুষ্টিমেয়, সুতরাং

প্রথমে ভাবের বিস্তৃতি হইবে না; কিন্তু বিস্তৃতি অল্প হইলেও ভাবের গভীরতা ও তীব্রতা অধিক হইবে। সুতরাং যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী এক সুরে বাঁধা, তদ্রূপ মুষ্টিমেয় লোক লইয়া সমাজে কর্ম্ম যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, বহুবিস্তৃত হইয়াও তাহা হইতেই পারে না। তার পর, "Neither two coats, neither shoes, nor yet staves" ইহাতে বুঝিলাম যে, প্রকৃত ভাবোন্মত্ত সন্ন্যাসী চাই। আর প্রতিকূল সমাজ তাহাদিগকে চিনিতে না পারে, তাহাদিগের মনোদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ হয়, সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিরোধী পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়ী হইতে হইলে, একাগ্রতার সহিত আত্মসমাজে ভাব ও কর্ম্ম বিলাইয়া দিতে হয়; আর তাহাদের প্রধান উপায় মন-শুদ্ধি। এই বিরাট ধরাতলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মন আদিকাল হইতে বিভিন্ন ভাবে গঠিত হইয়াছে। তাহাদিগের আবহমণ্ডল ও ভ্রাম্যিকেন্দ্র সকল কালক্রমে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি যে ভাবে গঠিত, তাহাকে তদনুরূপ ভাবে পরিপূর্ণ করিতে হয়, সেই ভাবে উদ্বোধিত করিতে হয়। সে জাতির নর-নারীর শিক্ষা ও গঠন, কর্ম্ম ও অনুষ্ঠান আবাল্য তাহারই অনুকূল হইয়া থাকে। ইহাতে ভাবের পূর্ণতা হয়, চরিত্রে বল সঞ্চার হয়। তখন কর্ম্ম অপ্রতিহতবেগে অনুষ্ঠিত হয়। যদি কর্ম্ম চাও, কর্ম্ম কর। একাকীই কর, অতীতসংস্কারের অনুচর লইয়াই আরম্ভ কর; কারণ, জনসাধারণ তোমার পশ্চাতে আসিবে। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।" গীতায় এই বাক্য যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে অর্থে না হইলেও, "কর্ম্ম ব্রাহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি"। ভগবানে আস্থা চাই। তাঁহার নাম লইয়া, পরিণামে বিশ্বাসী হইয়া, বিশুদ্ধ-একাগ্রহৃদয়ে, নির্ম্মলচরিত্রে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। নতুবা সিদ্ধির আশা করা বাতুলতার নামান্তরমাত্র। একাগ্রতা বিঘ্নচিন্তায় দূষিত হয় না; বিঘ্ন-চিন্তা ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচায়ক।

প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানা
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি॥—মুদ্রারাক্ষস।

যিনি একলক্ষ্য ভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, বিঘ্ন তাঁহার প্রধান সহায়; বিঘ্ন তাঁহাকে দ্রুতপদে সফলতার দিকে লইয়া যায়; শত ব্যর্থতার মধ্য দিয়া বিঘ্নই সফলতা আনয়ন করে। প্রাথমিক ব্যর্থতা কর্ম্মীর ও অবশিষ্ট

জনগণের হৃদয়ে যে আঘাত দেয়, তাহাই সফলতার পিতৃপুরুষ। সুতরাং বিঘ্ন-চিন্তা অকিঞ্চিৎকর। কর্ম্মেই মানবের অধিকার; সুতরাং অনন্যমনে কর্ম্মই করিতে হইবে। ফল ভগবানের হস্তে। বারংবার বলিয়াছি, ইহাতে একাগ্রতা চাই; মনের প্রকৃত বল চাই; বিশুদ্ধি চাই; এক কথায়, মনের উৎকর্ষ চাই। এখন মনেরই দিন, ভাবেরই রাজ্য। (১৮) সুতরাং সর্ব্ব প্রযত্নে মনকেই, ভাবকেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; নতুবা গত্যন্তর নাই।

এই আলোচনাতে যে সকল কথা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা প্রধানতঃ এই,—

(১) জড় ও জৈব পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন।

(২) প্রতিকূল সমাজ-বিধির সংস্কার।

(৩) মস্তিষ্কের উপযুক্ত ভাব-কেন্দ্র উত্তেজিত করা। নরনারী উভয়ের পক্ষে।

(৪) অনুকূল শিক্ষা ও সৎসঙ্গ। নর-নারী উভয়ের পক্ষেই।

(৫) দেহকে বংশানুক্রমিক উপযোগিতা দেওয়া; ভাবকেও বংশানুগত ও সমাজবদ্ধ করা। ভাব সমাজ-বদ্ধ হইলে, ব্যক্তি সমাজের প্রশংসা-লাভার্থ তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে।

(৬) প্রথমে অনুষ্ঠান স্ব-সমাজ-বদ্ধ হইবে; শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

(৭) বিঘ্ন-চিন্তার দমন।

অতি সংক্ষেপে এই গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। ইহাকে বিস্তৃতি দিতে হইলে প্রত্যেকেই আপন আপন বিবেচনা অনুসারে উপায়-উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি যে পথেরই অনুসরণ করুন, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার উত্তেজনায় আত্ম-শক্তিকে বিকশিত করাই ইহার মূলমন্ত্র। স্বাবলম্বন ইহার আদি; মধ্য ও শেষ। ইহা কাল-সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাই একমাত্র উপায়। এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ কোনও ফলেরই আশা করা সঙ্গত হইবে না। * শ্রীশশধর রায়।

(১৮) The future struggles for Supremacy * * will be contests between minds, and muscles will be at a discount. Nature. 9th May, 1902. p. 36.

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রাজসাহী শাখার শ্রাবণ-মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রাচীন ভারত।

The wisdom of the East was early celebrated, and its productions were early in request among distant nations.

W. Robertson.

সভ্যতাভিমানী ইংলণ্ড, দার্শনিক গ্রীস, সমৃদ্ধিশালী রোম, প্রাচীন বিশ্বের সকলেই এত দিনে স্বীকার করিয়াছে যে, তুষার-ধবল-কিরীট-শোভী, তরঙ্গ-চঞ্চল-সীমাপু-বিধৌত-চরণ মহাভাপস বৃদ্ধ ভারতবর্ষ জ্ঞানে ও কর্ম্মে, ধর্ম্মে ও শিক্ষায় পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষা-গুরু।

স্বতঃসিদ্ধ-মুখর বক্তৃতা মঞ্চে অথবা বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রবন্ধে বা নিবন্ধে কখনও কখনও শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের জাতিভেদ-প্রথাই তাহার কলঙ্ক; জাতিভেদই ভারতবর্ষকে উন্নতির উন্নতশিখরে উঠিতে দেয় নাই। যাঁহারা সমাজ-সংস্কারক, তাঁহারাই এই সমস্যাপূর্ণ জটিল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সমর্থ। কিন্তু অতীতের সাক্ষী ইতিহাস অগ্নাক্ষরে লিখিয়াছে যে, যখনই যে জাতি আপনার সমাজকে স্তরে স্তরে সুবিভক্ত করিতে পারিয়াছে, প্রত্যেক স্তরের অনুষ্ঠেয় ও কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি স্বতন্ত্র করিয়া দিতে পারিয়াছে, সেই জাতিই সভ্যতার উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছে!

শিশু সমাজ যখন প্রকৃতি রাণীর স্তন্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার অনাবৃত নগ্ন দেহ লইয়া কাননে বা কান্তারে, সাগরসৈকতে বা শৈলশিখরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, যখন কাননচারীদিগের ন্যায় সেখানে বিচরণ করে—প্রকৃতির স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অনন্ত ভাণ্ডার যখন তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া দেয়,—তখনকার অবস্থায় তাহার কোনও অভাব থাকে না; অথবা থাকিলেও এত অল্প থাকে যে, শিশু সমাজ সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য আকুল হয় না। সেই ক্ষুদ্র অভাব দূর করিবার জন্য তখন সমগ্র সমাজের সমবেত শক্তির প্রয়োজন হয় না।

অনায়াস-লব্ধ বনফল, কলনিনাদিনী পার্ব্বত্য তরঙ্গিণীর সুমিষ্ট জল, বৃক্ষ মহাতরুর জীর্ণ বল্কল, অথবা বনদেবীর লীলানিকুঞ্জপূর্ণ হাস্যময়ী মল্লিকা, যূথিকা, বেলা, কাম্বিনী তখন সমাজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে; মানুষ তখন হস্তপ্রসারণমাত্রেই সেই বৈভবরাশির অধিকারী হয়। শত্রু-বধের জন্য

প্রস্তর-ভল্ল, মৃগয়ার নিমিত্ত সুদৃঢ় কার্ম্মুক ও সুশাণিত সায়ক, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত বাত নিবারণের উপযোগী পর্ণকুটীর, নদীবক্ষে বিচরণ করিবার 'ডোঙ্গা' বা 'মান্দাস', এ সকলই এক জনেই গড়িতে পারে। সমগ্র সমাজের চিন্তা ও শক্তি, কর্ম্মনৈপুণ্য ও উৎসাহ যদি না-ও থাকে, তাহা হইলেও আদিম বর্ব্বর বন্য মানবের কিছু আসিয়া যায় না।

কালের সঙ্গে সঙ্গে মানব-শিশুর মত সমাজ-শিশুও দিন দিন বড় হইয়া উঠে। বল্কলে তখন লজ্জা নিবারিত হয় না; বনফলে ক্ষুধা যায় না; শুধু ভল্লে শত্রুনিপাত হয় না; পর্ণকুটীর তখন আবাসের অযোগ্য বলিয়া মনে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভাবও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মানুষকে কর্ম্মের পথে প্রবুদ্ধ করে।

তার পর যতই দিন যায়, সৌন্দর্য্যবোধ ততই সূক্ষ্ম হইতে থাকে; এবং তাহারই ফলে প্রাত্যহিক জীবনের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগও বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া কর্ম্ম-ব্যস্ত সমাজকে আরও ব্যস্ত করিয়া তুলে। সমাজের সমবেত শক্তি ও চিন্তা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তখন শুভ পথে প্রধাবিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র, কৌশলাদির উদ্ভাবনে উন্মুখ হয়। সমাজের সেই উন্নত অবস্থাতেই আমরা উহাকে স্তরবিভক্ত ও সুবিন্যস্ত দেখিতে পাই। তখন এক এক শ্রেণীর মানব সমাজের এক একটি বিশেষ অভাব-দূরীকরণের জন্য আমরণ চেষ্টিত থাকে। যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের ফলে যীশু বা মহম্মদের জন্ম, বুদ্ধ বা চৈতন্যের অভ্যুত্থান, যে কারণে কলম্বস্, ভাস্কোডা গামা বা ড্রেকের আগমন, যে কারণে, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতির সৃষ্টি, যে কারণে নিউটন, টিণ্ডাল, ডেভি, অথবা খনা লীলাবতীর জন্ম, স্থূলতঃ সেই কারণেই মানব-সমাজের স্তর-বিভাগ। তাই এক জন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, ভারতের জাতিভেদপ্রথা দেখিলেই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ সে সময়ে বহুপরিমাণে সমুন্নত ছিল।*

ভারতের শিল্প যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল, তাহার মূলেও ভারতবর্ষের সেই অতি প্রাচীন যুগের কর্ম্মবিভাগ-প্রথা বর্ত্তমান। এত দিনেও কি আমরা বুঝিতে পারিব না যে, সেই সুপ্রথা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছিল; তাই আমরা আত্ম-নির্ভর-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছি!

* This is one of the most undoubted proofs of a Society considerably advanced in its progress.—*W. Robertson.*

সেকালে যে জাতি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, সে তাহারই উন্নতি-বিধানে চেষ্টিত ছিল। তাই যত বর্ষের অভিজ্ঞতাবলে সে জাতি তাহার অবলম্বিত শিল্পে অত্যধিক নৈপুণ্য লাভ করিত। কিন্তু আমরা চিরদিনই একান্ত স্থিতিশীল, কখনই গতিশীল নহি। তাই বহু বৎসরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বলে আমরা যতটুকু শিক্ষা করিয়াছিলাম, নানা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বলে সেই নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইতে কখনই সাহসী হই নাই। তবুও ইউরোপীয় জাতি তাহাদিগের বহুব্যয়সাপেক্ষ একান্ত জটিল কল কারখানা লইয়াও কোনও কোনও শিল্পে যে পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, কল কারখানার সাহায্য না লইয়াই আমরা বহু পূর্ব্বেই তাহার অপেক্ষা অধিক নৈপুণ্য লাভ করিয়াছি।

সেই প্রাচীন কালের কথা মনে হইলে অনুমান হয় যে, ভারতবর্ষীয় সমাজে একটা কর্ম্ম-গত তথা জাতি-গত পার্থক্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়াই সমাজ আপনার অভাব দূর করিয়াও এত অধিক পণ্যাদি প্রস্তুত করিত যে, তাহাতে বৈদেশিকদিগেরও অভাব দূর হইত। ভারতের বাণিজ্য যে পৃথিবীব্যাপ্ত ছিল, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

স্থিতিশীলতা যেমন আমাদিগকে নিত্য নব নব আবিকারের পথে যাইতে দেয় নাই, তেমনই আবার আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে! আজ এই কলিযুগের শেষ অবস্থায় (শেষ অবস্থায় কি?) আমরা ভারতবর্ষে যেরূপ দেখিতেছি, সত্য যুগেও প্রায় এইরূপই দেখিয়াছিলাম। মুসলমানের কৃপাণ, খ্রীষ্টানের কামান আমাদিগের যেমন বড় বেশী পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই, তেমনই কোনও কালেই আমরা একেবারে পরিবর্ত্তিত বা লুপ্ত হইয়া যাই নাই। বসা মাজায় যেরূপ ক্ষয়ও হয়, আবার চাকচিক্যও বাড়ে, আমাদেও শুধু তাহাই ঘটিয়াছে। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ফিনিসগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সুরাট বন্দরের প্রথম ইংরাজ বণিক পর্য্যন্ত সকলেই ভারতবর্ষ হইতে একই প্রকারের পণ্যাদি লইয়া গিয়াছে, এবং অর্ণবপোতপূর্ণ স্বর্ণ রৌপ্য আনিয়া ভারতের চরণতলে অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিয়াছে। তাই প্লিনির যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল বৈদেশিকই মনে করিয়া আসিতেছে যে, ভারতবর্ষ যেন একটা অতল সমুদ্রবিশেষ; তাহার বিরাট গহ্বরে পৃথিবীর সমুদায় স্বর্ণ ও রৌপ্যরাশি আসিয়া চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাইতেছে!

কাশ্মীরনিবাসী খাজা অবদুল করিম তাই সবিস্ময়ে বলিয়াছেন,—"যখনই দেখি যে, তুরাণ ও আরব প্রতিদিন দরিদ্র হইয়া যাইতেছে, অথচ হিন্দুস্থান দিন দিন সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে, তখনই আমি একান্ত বিস্মিত হই;—কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারি না। দুর্দ্ধর্ষ তৈমুর, সমগ্র পারস্য, তুর্কী ও হিন্দুস্থানের ধনরাশি তুরাণে লইয়া গিয়াছিলেন;—কিন্তু সে সমস্তই গিয়াছে! তুরাণের প্রথম চারি জন খলিফার রাজত্বকালে তুর্কী, পারস্য, আরবের অধিকাংশ, ইথিওপিয়া, মিসর ও সেরুইন ধর্ম্মিকাদিগের অধীন ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা সেরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেন না! তাহা হইলে ইহাই নিশ্চিত যে, তুরাণের ধনহানির কারণ—হয় অসাধারণ ব্যয়, নয় শাসনপ্রণালীর দোষ। বৈদেশিকগণ প্রায় সকলেই হিন্দুস্থান লুণ্ঠন করিয়াছেন, এবং হিন্দুস্থানের কোনও এক জন নৃপতিও দেশের ধনবৃদ্ধির তিলমাত্র আয়োজন করেন নাই। সে দেশে স্বর্ণ বা রৌপ্যের খনি অধিক নাই—তথাপি হিন্দুস্থান সৌভাগ্য-সম্পদে অতুলনীয়। য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশের বণিকগণ সর্ব্বদাই হিন্দুস্থানের পণ্যাদি ক্রয় করিবার জন্য জাহাজ পূর্ণ করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য আনয়ন করে। ইহাই কি হিন্দুস্থানের সম্পদের কারণ? না,—তাহা নহে। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদই হিন্দুস্থানের সমৃদ্ধির নিদান।"*

The wisdom of the East was early celebrated, and its productions were early in request among distant nations.

W Robertson.

শুনিতে পাওয়া যায় যে, এমন দিন ছিল, যখন পশ্চিমে সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত, এবং উত্তরে তিব্বতের অনন্ত শৈলশ্রেণী হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ অবধি এক জন মহাপরাক্রান্ত নৃপতির শাসনাধীন ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিবৃন্দ সেই মহাবলশালী অসীমশক্তিসম্পন্ন একচ্ছত্র নরপতির পদানত থাকিয়া এসিয়া খণ্ডের নানা স্থানে রাজত্ব করিতেন। এ কাহিনী সত্য কি না, তাহা বলা যায় না। কারণ, ঐতিহাসিক প্রমাণের একান্ত অভাব।

ভারতবর্ষের কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কোনও ইতিহাসই নাই। অনর্থ-

* Memoirs of Kajha Abdul Kureem.

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—"সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে ছুড়িয়া মারিলে মানুষ খুন হয়, আর মার্শম্যান্ বেণ্টলিঞ্চ প্রভৃতি চুটকি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া, অনেক টাকা যোজগার করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোনও কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরাজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালায় যাইতাম, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধি ধারণ করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়িভোজন মাত্র।"

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেও ঠিক ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। মিল্ বল, থরন্টন্ বল, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বল, হেনরী ইলিয়ট বল, ইহাদিগের বহু খণ্ড ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাস নহে—ইংরাজের, ফিরিঙ্গীর, দিনামারের, ফরাসীর, ওলন্দাজের ও মুসলমানের ইতিবৃত্তমাত্র। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র ভারতের সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়া আমাদিগকে এক মুষ্টি স্বর্ণ ভিক্ষা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের কাহিনী যে বহু দিন পর্য্যন্ত ইউরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্বজয়ী আলেকজান্দার এ দেশে আসিয়াই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; ইউরোপ সেই সকল তথ্য লাভ করিয়া ভারতবর্ষকে চিনিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

আলেকজান্দারের কালে পোরস্ ও তক্ষশীলের রাজত্ব পঞ্চনদে সুবিস্তৃত ছিল। এ দিকে আবার গঙ্গারিদীদিগের বিরাট বিশাল জনপদ ভাগীরথীর উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভারতবর্ষকে মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

মানুষ যখন আদিম বর্ব্বরতার অন্ধকার হইতে আলোকে আইসে, যখন তাহারা সমাজ-বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে, যখন সেই সমাজের এক জনের জন্য অপরের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, যখন বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে ঘোর প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়, মানুষ তখনই দূর দূরান্তর ছুটিতে থাকে; যেখানে শান্তি, সেখানে সুখ, যেখানে তৃপ্তি পাইবার আশা থাকে, সমাজবিদ্ধ মানব তখন সেই দিকে প্রধাবিত হইয়া আপনাদিগকে চরাচরে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়। ইহা দুই

এক বৎসরে ঘটে না; যুগযুগান্তরে অধোবনতলে সমাজের বা জগতের এই অবস্থা ঘটে। তখন তাহারা আপনাদিগের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত বিধি নিয়ম প্রভৃতি গঠিত করিয়া স্বেচ্ছায় শাসনশৃঙ্খল পরিধান করে। সেই শৃঙ্খল তাহাদিগকে অবনতির তমসাচ্ছন্ন কূপে আকর্ষণ করে না; বরং উন্নতির উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে উন্নীত করিবার আয়োজন করে। যখন সেই সকল প্রচলিত বিধি নিয়ম একান্ত সুগঠিত হইয়া সমাজকে সুদৃঢ় করে, তখনই মহিমময় রাজসিংহাসনে বসিয়া পার্থিব নরপতি ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন; নৃপতি তখন নৃপতি হইয়া শাসনে ও সংযমে সমাজকে তথা সমগ্র দেশকে স্বর্গতুল্য করিয়া তুলেন। সেই পৌরস, বা তক্ষশীল, বা গন্ধারাধিপদিগের যুগে ভারতবর্ষেও সমাজ ও দেশের অবস্থা এইরূপই ছিল। নতুবা এই বিরাট বিশাল ভারতবর্ষ ত্রিধা বিভক্ত হইয়াও শান্তিময় থাকিতে পারিত না। যে আন্তর্জাতিক বিধি অজ রক্তপাতের পর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহাও সেকালে ছিল না।

অধুনা যেমন প্রজাতন্ত্র ভিন্ন সভ্য-জগৎ অচল হইয়া উঠে, সেকালে সেরূপ ছিল না বলিয়া বোধ হয়। তখন রাজতন্ত্রই সর্ব্বস্থানে প্রচলিত ছিল। রাজা স্বাধীন হইয়াও পরাধীন ছিলেন;—যথেচ্ছাচারী প্রজাপীড়ক ছিলেন না। তাই অমর ঋষিবাক্য এখনও ভারতে ধ্বনিত হইতেছে,—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎসৃষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

যিনি বা ইংরাজ আজ যে মহাবাক্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের ব্যবহার-শাস্ত্র (Jurisprudence) প্রভৃতির যথেষ্ট স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, সেই মহাবাক্য যে বহুপূর্ব্বেই ভারতবর্ষে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা মনে হইলে পুলকিত হইতে হয়। রাজা নিষ্ক্রিয়;—যতই কেন ঘৃণিত অপরাধ হউক না, রাজ-শোণিত-পাত মহাপাপ। এই মহাবাক্য আমরা চিরদিন হইতে মানিয়া আসিতেছি; মিশর বা ইংরাজের নিকট নহে। "King can do no wrong" এই মহাশিক্ষা আমরা বহু পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় রাজা তাই সেকালে স্বাধীন হইয়াও স্বাধীন ছিলেন না;—ব্রাহ্মণের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাজকার্য্য করিতেন। যদিও পার্লামেণ্ট মহাসভা সেকালে ছিল না, কিন্তু প্রজার সুখ ও দুঃখ বুঝাইবার জন্য বহুবিধ উপায় তৎকালে বর্ত্তমান ছিল। রাজা স্বয়ং সে সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। যে দেশের

কবি দশরথ, যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আদর্শ রাজ-চিত্র লিখিতে পারিয়াছেন, সে দেশের ব্যবহারশাস্ত্র যে কত সমুন্নত ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রাচীন গ্রীস দেশবাসী শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল বলিয়া গৌরব করিত। সেই গ্রীকগণও ভারতীয় নৃপতিদিগের শান্তি-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। আমাদিগের শান্তিরক্ষকগণ যষ্টিহস্তে ধাবিত হইয়া শান্তিময় গ্রামে অশান্তির সৃষ্টি করিত না; তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া রাজ্যের কল্যাণ-কামনায় ব্যস্ত থাকিত।

ভারতবর্ষের শৈশবে যদিও কোনও লিখিত বিধিব্যবস্থা কিছুই ছিল না, কিন্তু প্রশ্বাসাবরণ লৌকিক ব্যবহারের একান্ত অনুগত ছিল। পরবর্ত্তী যুগের আর্য্য শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ বৃথা কালহরণ করেন নাই। তাঁহাদিগের তপোবন হইতে সামগান ধ্বনিত হইয়া যেমন ভারতবর্ষের শিরে আশীর্ব্বাদপুষ্প বর্ষণ করিত, তাঁহাদিগের চিরপ্রজ্বলিত হোমকুণ্ড হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া যেমন পূতগন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিত, তেমনই তাঁহাদিগের মহাবাক্যগুলিও ভারতবর্ষকে সভ্যতার ক্রমোন্নত স্তরে লইয়া যাইত।

সুসভ্য ইংরাজ হতভাগ্য প্রথম চার্লসের রাজত্বকালের পূর্ব্বে যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল।*

ভারতবাসিগণ তাঁহাদিগের দয়া ও কোমলতার জন্য চিরপ্রখ্যাত। কিন্তু আবশ্যক হইলে তাঁহারা যে 'বজ্রাদপি কঠোর' হইতেন, তাহাও ইতিহাস বলিয়া দিতেছে। তাই অপরাধের দণ্ডবিধান ভারতের শাস্ত্রকারগণ কখনই কোমল হইতেন না; তাঁহারা জানিতেন যে,—

* In the first of the sacred law tracts which the Hindoo suppose to have been revealed by Manu, some millions of years ago, there is a curious passage on the legal interest of money, and the limited rate of it in different cases, with an exception in regard to adventures at sea; an exception which the sense of mankind approves and which *commerce absolutely requires*, though it was not before the reign of charles I that our English jurisprudence fully admitted it in respect of maritime contracts.—*Sir W. Jones.*

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ॥

দণ্ডই যে ধর্ম্ম, ইহা ভারতের ইতিহাসে নূতন কথা নহে। যে যুগে এই নীতিবাক্য জন্মলাভ করিয়াছিল, সে যুগকে ভারতবর্ষের সভ্যতার যুগ বলিব না কি? সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ মহাপ্রাণ বেদমন্ত্রের ন্যায় যে যুগে গাহিয়া উঠিলেন,—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥

যে যুগে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহে, সে পরজন্মে কুৎ-পিপাসিত, বিবসন ও অন্ধ হইয়া নর-কপাল গ্রহণ করিয়া শত্রুর গৃহ-দ্বারে ভিক্ষার্থ গমন করে। সে যুগকে ভারতবর্ষের কোন্ মহাযুগ বলিব? যে যুগে ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন ঋষিতেজ তপোবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল; ইহকাল ও পরকাল যে যুগে ব্রাহ্মণকে বিশ্বসংসার ভুলাইয়া দিল; যে যুগে তাঁহার মুখে ধ্বনিত হইল, "মানুষ কেবল নিজের জন্য জন্মে না; বিশ্বের জন্য জন্ম গ্রহণ করে;" যে যুগে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম-বুদ্ধকে আর্য্যভূমি চিরসমাহিত হইয়া গেল; সে যুগে দার্শনিক গ্রীসকে কে চিনিত? যখন পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস্ আসিয়া দেখিলেন যে, বুলভবনে বসিয়া এক কালের রণমত্ত পঞ্চনদবাসী কেবল জীবন ও মৃত্যুর তত্ত্বালোচনায় মগ্ন, তখন ভারতবর্ষের জ্ঞানের আলোক কত সুতীক্ষ্ণ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

গ্রীস ও রোম যখন বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করিত, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতে সংখ্যাবাচক অঙ্কের প্রচলন ছিল। গ্রীক পণ্ডিতগণ ও রোমকগণ আরবদিগের নিকট সেই সংখ্যাবাচক অঙ্ক শিক্ষা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ আবার—আরবের গুরু। গ্রীস ও রোম যখন অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনায় একান্ত ক্লিষ্ট, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের শাকিন্ন-জ্যোতিগণ জানিতেন, 'অঙ্কানাং বামা গতিঃ' হইলেই তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ আবিষ্কার নিউটনকেও পরাস্ত করিয়াছে। একান্ত জটিল অঙ্ক-শাস্ত্র যখন আরব ও গ্রীক পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব হইতেই এ দেশে গ্রহণাদি-গণনা সুসম্পন্ন হইয়াছে, নক্ষত্রমণ্ডলের স্থান নির্ণীত হইয়াছে, রাশিচক্রের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যখন মিশর ও কাল্ডিয়ার সর্ব্বপ্রথম জ্যোতির্গিণ চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি নিরীক্ষণ করিয়া

গ্রহণের বাসনির্ণয়ে সচেষ্ট, তাহার পূর্ব্বেই ত্রিকোণমিতির সাহায্যে ভারতবর্ষ জ্যোতিষে পরম পণ্ডিত।

গ্রীস অনেক দিন পর্য্যন্ত ইউরোপে সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিল। যে জাতিই যখন সভ্যতার পুণ্য কিরণে মহাসুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠে, সেই জাতিরই সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শক্তি ক্রমে ক্রমে কুসুমের ন্যায় বিকসিত হয়। যখনই সৌন্দর্য্যবোধ অনেকাংশে সম্পূর্ণ হয়, তখনই নাটক, কাব্য প্রভৃতি মানুষকে আনন্দ দিতে পারে। গ্রীসে তাই যখন এস্‌কিলস্ বা সফোক্লিস্ লিখিতেন, এবং থেসিস্ ও এল্‌কিবিয়াডার তাঁহাদিগের আপন আপন পথে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহার পর থেস্‌পিস্ অনেক চেষ্টা করিয়া গ্রীক রঙ্গমঞ্চের জন্য অসম্পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর অনেক কাল অতিবাহিত হইয়া গেল, তবে সেই শিশু নাটক মানুষ হইল। কিন্তু ভারতের অপূর্ব্ব কুঞ্জভবনে যখন শকুন্তলা বীণানিন্দিতকণ্ঠে পূর্ণপ্রাণবন্তা মাধবিকাকে আহ্বান করিলেন, তখন বৃক্ষে বৃক্ষে কুসুম ফুটিয়া উঠিল, শাখায় শাখায় কোকিল গাহিল, লতাবিতানে ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত হইল। তাই এত কাল পরে কাব্যপ্রিয় ইংরাজ কবি সবিস্ময়ে সগৌরবে কহিলেন,—The tragedies, commedies, farces, and musical pieces of the Indian theatre, would file as many volumes as that of any nation in ancient or modern Europe. *

ভারতের আর্য্য বালকগণ যখন হিতোপদেশের ললিত মধুর নীতিকথাপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক গল্পগুলি পাঠ করিয়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করিত, তখনও ইউরোপীয় বালকদিগের জন্য কথাচ্ছলে নীতিশিক্ষাদানের কোনও ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষের হিতোপদেশ গেল মুরোপে গিয়া রূপান্তরিত হইল, এবং পিল্‌পাই ও ঈসপের নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া মুরোপের একটি অভাব দূর করিয়া দিল।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* Preface to Sakuntala—Sir W. Jones.

স্বদেশী ও বিদেশী বঁধু।

—:৬:—

১

একটা গান আছে,—

"যা রে বিদেশী বঁধু! তোরে আমি চাইনে,
যখন আমি চাই তোরে, তখন তোরে পাইনে।—"

অতএব, যাও।

রাগিণী ভৈরবী। তাল, কালের গুণে খেমটা। ইচ্ছা করিলে ধ্রুপদেও গায়িতে পারেন।

বঙ্গদেশ বঁধুর আড্ডা। বঁধু সকল দেশেই আসে যায়। ভারতে অনেক বার অনেক প্রকার বঁধুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, কিন্তু ডাকিয়া আনা বঙ্গের স্বভাব।

ভারত বার ভূতের স্থান। হৃৎপিণ্ডের মত। যত রকম শোণিত আসিয়া এখানে সংশোধিত হয়। আদিম আর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া হূন, মোগল, পাঠান, শিখ, জৈন, পারসীক, বৌদ্ধ, বৈরাগী, দ্বৈত, অদ্বৈত, শাক্ত, বৈষ্ণব, মারাঠী, ফরাসী, ওলন্দাজ ও আধুনিক বঁধু, সকলেই একবার এ আড্ডায় আসিয়া গুলি টানিয়াছে, নূতন বুলি শিখিয়াছে, এবং শিখাইয়া গিয়াছে! বঙ্গদেশটা সে হৃৎপিণ্ডের বাম ভাগ। দেহের বাম ভাগটা স্ত্রী-পরিচারক; কিছু অবনত; কিছু ঝুলিয়া থাকে; কিছু লজ্জাশীলা; কিছু রসিকা।

বঁধুমণ্ডলী মধ্যে মধ্যে আসিয়া এখানে লীলা করিয়া গিয়াছেন। যখন যেরূপ ভাব, তখনকার বঁধু তথৈবচ। লীলার অবসানে প্রেমের বিকার। সেই বিকারটা 'পলিটিক্যাল'। পলিটিক্যাল বঁধু নায়িকার অবস্থা দেখিয়া হোঁস করিয়া উঠিয়াছেন।

নায়িকা বলিতেছেন,—"যা রে বিদেশী।" বঁধু বলিতেছেন,—"চুপ্ রহ —লা।"

ইহার নাম ইতিহাস। সকল জাতিরই বংশের ও ধর্ম্মের ইতিহাস আছে। বাঙ্গালার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত নূতন। ইহার পুরাতন ভাগে কি ছিল, জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কেবল নূতন ভাগটাই সংক্ষেপের মধ্যে এত রঙ্গদার যে, চট্ জমিয়া যায়।

শূন্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বভাগে অগ্রসর হইয়া পর, তান্ত্রিক মতের আবির্ভাব হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভেও যে রূপ ছিল, ওই শত বৎসর পূর্ব্বে নাকি তাহাই ছিল :—

"মহাঘোরা মহাপ্রেতা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা"

তাহার পর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহের রূপ। অর্থাৎ প্রেত, মুণ্ড, মুক্তকেশ ও চতুর্ভুজ কালভৈরব। ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা অধিক পাওয়া যায় না। ইহারা বহুকাল পূর্ব্বের। তখন সেন-বংশ, পাল-বংশ, মগধ, পৌণ্ড্র ও তাম্রলিপ্তি-বংশ প্রভৃতি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। যখন ইঁহারা যখন আবির্ভূত হন, তখন ঘোর নেশায় অভিভূত; টিকী মাত্র ছিল!

এখানে ইতিহাস হারি মানে। কেন না, বঁধুর কোনরূপ সংবাদ পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের রাজ্য গিয়া প্রেমের রাজ্যে আসিল। বঙ্গদেশ প্রেমে ভাসিয়া গেল। সেই সময় যোগল ও পাঠান বঁধু চোগা চাপকান পরিধান করিয়া, মাথায় পাগড়ী দিয়া, আসরে নামিলেন।

আগে হরি সঙ্কীর্ত্তন!

এক দিকে জেনানা মিসটেস ও পাগড়ী, অন্য দিকে টিকী ও সনন্দ ভূসম্পত্তি। এ স্থলে ক্রসব্রিডিং অর্থাৎ জাতীয় ও বিজাতীয় মহিলার সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া দেখা ভাল নদারাম!

উপনিষদের ঔরসে যেমন নিরাকার ব্রাহ্মধর্ম্ম, রামানুজ স্বামী ও নিম্বার্কাচার্য্যের ঔরসে যেমন বৈষ্ণব, শঙ্করের ঔরসে যেমন অদ্বৈতবাদ, সেই রকম মোগল পাঠানের ঔরসে ভারতচন্দ্রের রূপ।

কবি, খেউড়, গায়লামস্তক গোঁড়া হিন্দু, যাত্রার দল, হরু ঠাকুর, রাম বসু, পদাবলী, বৈষ্ণব কবি ও অভিসার; বারাঙ্গনা এ খাপ্‌টা নাচ্‌ছে, কিম্বা ঘুরে বসে গিয়াছে! তাহারই মধ্যে, "দনুজ দলনী শ্যামা—"

মধ্যে মধ্যে বিকট রব। "শ্বেত-সরোজ-মা—"

কিছু দিন পরে শুনিতে পাওয়া গেল,—রাম মহাশয় উপনিষৎ কণ্ঠস্থ করিতে করিতে ত্রিষ্টলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে সব দিনের কথা স্বপ্নবৎ। তখন বিলাতী বঁধু আসরে উপস্থিত।

২

পাগ্‌ড়ী মাথায় দিয়া, দক্ষিণ হস্তে উপনিষৎ ধারণ করিয়া, ব্রহ্ম-নামের সরোবরে শ্বেত হংসের মত যখন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উঠিল, তখন অনেক আশা করা গিয়াছিল।

কিন্তু এক দল ষোলস বঁধুকে ছাড়িল না। আর এক দল নিতাই ছাড়িল না। গুপ্ত ভাবে তন্ত্র-মন্ত্র, ছিটে ফোঁটা, দাড়ী ও পশু মকার চলিতে লাগিল। কাটা চামচও আমিয়া গেল!

তাহার সামঞ্জস্যে "নয় বিধান"; এবং তাহারও সামঞ্জস্যে "সাধারণ।"

বিলাতী বঁধু বলিল, "হালি পলিটিকেল বঁধু; ওরে মধু, আমি তোর নূতন বঁধু।"

নবগোপাল দা, ওরফে চট্টগ্রামের "জজ্ঞা"—তখন টকের মাছ বিক্রী করিতেন। "ক্যাল্‌কটা ট্যামারিণ্ড চিম্‌—এক পয়সায় ইচ।"

"নাতনী! তোর জন্য ভেবে ভেবে বাঁচিনে,
নাতজামাই আসবে কত দিনে?"

নাতজামাই আসিয়াছে। নাতজামাই আসিয়া জাতি ও ধর্ম্মের বিচারে বসিয়া গেলেন। বাইবেল প্রচারিত হইল।

ভাবিয়া দেখিলে, ইহার মধ্যে একটু মজা আছে। রসিকা হইলেও জাতি মারার আতঙ্ক, বর্ণসঙ্করত্বের ভয়, ভারতের বিশেষত্ব। শৈবলিনী ক্রষ্টরকে লইল, কিন্তু জাতি দিল না,। মনে করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই একাকার করিত। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পর যুগে তাহার সোজা পথ দেখাইতে গিয়াছিল। মদ্য, মাংস, শূকর, গাভী চলিল, তথাপি একাকার হইল না।

দাঁড়াইল কেবল স্বারস্তপাসন। এক এক দলের এক এক বঁধু। তাহারই মধ্যে ভাঙ্গিয়া এক দল কংগ্রেস। বঙ্গে দলের সীমা নাই। যাহা চাও, তাহাই পাইবে। বিরাট মালগুদাম। যথা:—

(১) কুলকুণ্ডলিনীর দল।
(২) স্বামীজীর দল।
(৩) বৈষ্ণব, নেড়াবৈরাগী ও কর্ত্তাভজার দল।
(৪) যোগীর দল।
(৫) ব্রাহ্মসমাজের দল।
(৬) বিলাত-ফেরতের দল।
(৭) খাস্ চাকুরিয়াদিগের দল।
(৮) ছোটলোকের দল।
(৯) অ্যাঠা বালকের দল।
(১০) দোকানী ব্যবসায়ীর দল।

এইরূপে দল বাড়িয়া চলিলে সংখ্যার সীমা থাকে না।

ইহারই মধ্যে "পলিটিকেল" দল। সকলেই বলিবে, ইহা স্বদেশী বন্ধু! ইহারা মা বলিয়া ডাকে। ইহারা হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও শিখ্ একত্র করিতে চাহে। এক দল ইহার মধ্যে গীতা দেখিতে পায়, এক দল বেদান্ত দেখিতে পায়। কেহ কেহ জাতীয় জীবন দেখিতে পায়।

মুসলমানগণ বলিতেছে,—"সাবধান, ইহারা স্বদেশী বন্ধু নহে, বিলাতী বন্ধুর মুখস্ পরিধান করিয়া ইহারা কর্ত্তা হইতে চাহে।" উত্তরে,—

"সখী! কি করি সহিবে হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া।"

কোন্ দিকে অভিসার? কোন জাতির জীবন জাগিয়াছে?

নব দা' বলেন, "ইহারা দোকানদার হইবে, ভাল খাইবে, পরিবে।"

কি শোচনীয় অবস্থা!

যেখানে অনেক জাতি, সেখানে অনেক বন্ধু আনাগোনা করিয়া একটা একটা ছাপ দিয়া গিয়াছে। আমাদের মুসলমান-বন্ধু এখন নাতজামাইয়ের সহিত ইয়ারকি দিতেছে। তুমি গলিয়া খুন হইতে পার, কিন্তু প্রেম করিতে গেলেই কণ্টকের আঘাত সহিতে হয়।

বিরাট বৃদ্ধ ভারতবর্ষের অনেক নাতনী ও নাতজামাই। কোন্‌টার দিকে তাকাই? ইংরাজ না ক্লাসিক?

নব দা'র কথা মনে পড়িল। নব দা'র প্রেমের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে একটা মেমকে ইসারা করে। ৩৫৩ ধারা না করিয়া মেম ৩৫৪ ধারাতেই তাহার উত্তর দিয়াছিল। অর্থাৎ, মেমের কুকুর দন্ত দ্বারা বঁধুর পদতলে ছাপ মারিয়া দেয়।

ঘটনার কিছু দিন পরেই নব দা'র বৈরাগ্য হইল। স্ত্রী পূর্ব্বেই মরিয়া গিয়াছিল। যখন মরিল, তখন নব দা' নেশায় চুর।

তিন-বৎসর পরে নব দা'কে ব্রাহ্মসমাজে দেখিতে পাইলাম। তখনও পূর্ব্বাভ্যাস যায় নাই। কটাক্ষপাতটা নব দা'র একচেটিয়া ব্যবসায়।

সাহিত্যে, সমালোচনায়, রাজনৈতিক বক্তৃতায় নব দা'র কটাক্ষপাত মধুর। কিন্তু গত বৎসর নব দা'র লোচন স্তিমিত।

"স্তিমিত লোচন অমৃতরস গানে—"

নব দা' বলেন, "ভারত শ্মশান!" ভারত শ্মশান? তাহার আর আশ্চর্য্য

কি! পৃথিবীটাই শ্মশান! ভারতের দরিদ্র কৃষক এক বেলা খায়;—না? তাহা আর আশ্চর্য্য কি? পশু পক্ষীও চুরাচর কেহই সন্ধ্যার পর খায় না; তোমরা খাও কেন? আমরা নিরীহ পশু, স্বচ্ছন্দে একবেলা খাইয়া থাকিতে পারি। যাহাদের পেটের জ্বালা বেশী, যাহারা শার্দ্দূলের মত, তাহাদের দেশেও হাহাকার। তাহারাও না খাইতে পাইয়া এই দেশ হইতে ফাঁকি দিয়া ধান চাউল লইয়া যাইতেছে। চুপ্ করিয়া বসিয়া দেখ। মরিতে হয়, মর। মহাশ্মশানের মাতার নাম "মায়া"।

তিনি কি অসুর দমন করেন না?

ঘরের অসুরও করেন, বাহিরের অসুরও করেন। নিয়ম এই যে, ঘরের অসুর দমন করিয়া তাহার পর বাহিরের অসুরকে দলিও।

ইহাই নব দা'র মতে বেদান্ত। যে চক্ষু মুদিয়া আত্মোৎসর্গ করে, সেই রাজা। বাকি সব প্রজা।

তবে এটা কিছু সঙ্গীন। ক্রুপদের মত। তাহা ভাঙ্গিয়া খেঁয়াড় হয়। যেমন আত্মা ভাঙ্গিয়া মন, কুলীন ভাঙ্গিয়া বংশজ।

একই বিশ্বে আবার নিয়ম পর্য্যায় দল উপস্থিত হয়। যেমন চীন, জাপান, ফরাসী, ওলন্দাজ, গ্রীক, পারস্য ও হিন্দু। রকমারি বজায় রাখিতে গেলে একটার সহিত মিশিয়া যাইতে হয়। একটা দেশ, একটা উদ্দেশ্য, একটা খেয়াল। তাহা খাঁটী রাগিণী। দেশই ঈশ্বর, দেশের শক্তিই মা, দেশের জন্য সব সঁপিয়া দাও; কিন্তু বিদেশের জন্য দিও না। ইহার নিমিত্ত একটা পাঁচন ও বুদ্ধিযোগ আছে।

(১) একটা জাতি

(২) তাহার একই ঈশ্বর ও ধর্ম্ম, এবং একই উপাসনা ও আচার ব্যবহার।

(৩) দলাদলি করিতে পায়, কিন্তু দেশের জন্য আত্মত্যাগ সকলেরই কর্ত্তব্য।

(৪) স্ত্রীজাতির সম্মান ও রক্ষা; নচেৎ বীর সন্তান হইবে না।

(৫) সাধারণ জ্ঞানচর্চ্চা, শিল্প বিজ্ঞানের উৎকর্ষ। নিম্নশ্রেণীর প্রতি দয়া ও দরিদ্রের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা।

(৬) ফাঁকা আওয়াজ বন্ধ।

(৭) শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি।

ইহাতে একটা গোটা জাতি অন্য গোটা জাতির সহিত কবির দলের মত লাগিয়া যাইতে পারে। চলে লড়াই, চলে সংগ্রাম, এবং চলে বুদ্ধির দৌড়।

যার বুদ্ধি যাহার, জয় তাহার। তাহাতে তাহা নহে। প্রত্যেক জাতির স্বার্থ প্রবল; প্রত্যেক দলের স্বার্থ প্রবল; প্রত্যেকে স্বার্থপর; প্রত্যেকে সন্দিহান। বলাই চাচা এক রকম। স্বামীরা অন্য রকম। মুসলমান প্রজা অন্য রকম। হিন্দু প্রজা অন্য রকম। অথচ একতা, বিবাহ ও পলিটিক্স প্রেমের কথা শুনিবামাত্র সকলেই তৎক্ষণাৎ ভক্তিভাবে চক্ষু মুদ্রিত করে।

৪

নবগোপাল দা' বলেন,—ইহার নাম 'টিপ্পা'। অর্থাৎ টপ্পার সব রকম চলে। অথচ একত্র খাওয়া খাওয়া, বিবাহ ও দর্শনস্পর্শন চলে না। নব দা' বলেন, ক্বচিৎ পূর্ব্বকালে চলিয়াছিল, কিন্তু তৎকালীন বঙ্গু,—বীর যাদু।—সেটা পৌরাণিক যুগের বীরাচার!

বঙ্গ একাম্নবর্ত্তী হইয়াও ব্যাভারা; হিন্দু হইয়াও বিধর্ম্মী; পরস্পর ভাই হইয়াও শত্রু। অন্ত জাতি আলাদা হইয়াও একাম্নবর্ত্তী; বিধর্ম্মী হইলেও স্বধর্ম্মী; শত্রু হইলেও অন্যের পরস্পরের ভাই।

মন দেহের না। আসাদে বুলী গেলে কুমীর খা লাদে। অন্তচ্ছেদ হইলে আমরা কাঁদি। অতএব আমরা স্ত্রীলোক। রাজপুত-রমণী রাজস্থানের সমরে সন্তানকে সঁপিয়া দিত; তথাপি তাহারা স্ত্রীজাতি। মন বাঁধিয়া একত্র করিলে পুরুষ হয়। কতকগুলি খেয়াল দিয়া গোড়ার দিকে গেলে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু টপ্পা বিষম মোহ।

একাধারে
- দধীচি;—"তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ।"
- অভিমন্যু;—"তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।"
- প্রতাপ সিংহ;—"এ বাহু তোমারি অসি বহিবে।"
- সেজ বাবু—"এ বীণা তোমারই গাহিবে গান।"

কিন্তু বেলা গিয়াছে, কর্ম্মফলে কেহই দেহ লইতে চাহে না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশাল দেহতরী লইয়া দাশের মত ভবসাগরে বাস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পুত্র, কলত্র, আত্মীয়, বান্ধব, দেহের ভার কেহই লইল না। সকলেই নিজের দেহ লইয়া ব্যস্ত; নিজের প্রাণ লইয়া ব্যস্ত।

আমরা জানি, দীনু কৈবর্ত্তের বেগুনের ক্ষেত ছিল। সে লাঠী ঘুরাইয়া বিদেশী ছাগল তাড়াইত। ছাগলের উপদ্রব নিবারিত হইলে, প্রতিবাসীর উপদ্রব আরম্ভ হইল। বিদেশী উপদ্রব বরং ছিল ভাল। গলায় বস্ত্র দিয়া দীনু বলিল, "পিতামহগণ! তোমরা আমার বেগুনের দিকে নজর দিও না।"

পিতামহগণ নিবৃত্ত হইলে পর, দীনু স্থাবর সম্পত্তি সমানগণকে বণ্টনকরতঃ ঢকু টাঁটাইয়া মরিয়া গেল। তিন বৎসর পর, বন্ধু গৃহ-বিবাদে মুন্সেফের ডিক্রীজারি হইয়া বেঞ্চনের ক্রেতা ক্রোক হইল, তখন দীনু বিল্ব বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিল। বিকৃতাকার প্রেত-দেহ দেখিয়া দেওয়ানী আদালতের পিয়ন সসম্ভ্রমে বলিল, "প্রভু! তুমি কেটা?"

দীনু বলিল? "আমি দীনু। এ খেতের মালিক আমি। বিদেশী ছাগল তাড়াইয়াছি আমি; স্বদেশী প্রতিবাসীর মাথা ভাঙ্গিয়াছি আমি; আজ কোন আইনে ইহা ক্রোক করিতেছ?

পিয়ন। পরলোকগত মহাশয়! জগতের ধর্ম্মই ইহা। এক ভূতে করিয়া যায়, বার ভূতে খায়। ইহার মধ্যে দশ জন মহাজন দেনাদার আছে। তোমার বিধবা পত্নী আছে; অবিবা কন্যা আছে; বিদেশীর ঋণিক আছে; তোমার পুত্র কলত্রের জুয়াচুরী আছে; এবং সর্ব্বশেষে আমার প্রাপ্য আছে। অতএব আপনি মানে মানে বিল্ব বৃক্ষে পুনরারোহণ করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করুণ।

দীনু। তবে মোট কথা কি?

পিয়ন। একটা স্বদেশী দোকান করিতে পারেন; কিংবা বুদ্ধি থাকিলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন। যাহা হইতেছে, তাহাই হইয়া থাকে। ইহাতে নূতন কিছুই নাই।

কালিকার বিদেশী বন্ধু, আজিকার স্বদেশী বন্ধু। চাহিবার ইচ্ছা অনিচ্ছা তোমার। থাকিবার ইচ্ছা অনিচ্ছা বন্ধুর। বন্ধুকে পথে দেখিয়াছি, গোশালায় দেখিয়াছি, রন্ধনশালায়ও দেখিয়াছি। বন্ধু গণ্ডগোল বাধাইবার গোড়া; অথচ ডাকিয়া আনিতে আমরা চির তৎপর।

"শুনিয়া বঁধুর কথা, প্রাণেতে লাগিল ব্যথা।"

বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যোগি-মতের প্রাচীন গ্রন্থ।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে 'গোবিন্দচন্দ্র-গীত' নামধেয় বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগি-মতের একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চুঁচুড়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় সম্প্রতি উহা সাধারণে প্রকাশিত করিয়াছেন। 'গোবিন্দচন্দ্র-গীত' বাঙ্গালা ভাষার ঐতিহাসিক আদি-কাব্য বলিয়া কীর্ত্তিত। উক্ত গ্রন্থে 'হাড়িপা' নামে খ্যাত এক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যোগী সিদ্ধের মহিমা ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যাদি ত্যাগ করিয়া যোগিবেশে হাড়িপার অনুগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত হয়; 'গোবিন্দচন্দ্র-গীত' তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

সম্প্রতি 'গোরক্ষবিজয়' নামক এই শ্রেণীর আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহার বর্ণিত বিষয়ের সহিত 'গোবিন্দ-চন্দ্র-গীতে'র বর্ণিত বিষয়ের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং এই পুঁথিখানিও যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যোগি-মতের অন্তর গ্রন্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই উভয় গ্রন্থের উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গও অভিন্ন বলিয়াই অনুমান হয়। 'গোরক্ষবিজয়ে' স্পষ্টভাবে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কোনও উল্লেখ নাই; কিন্তু ঠিক তাঁহারই মত আর এক জনের (মীননাথের) সংসার-ত্যাগের বৃত্তান্ত ইহাতে বিবৃত আছে। সে সব কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি আরও একটি কারণে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। 'ভীমদান' নামক জনৈক হিন্দু কবির একটা ভণিতা এক স্থলে পরিদৃষ্ট হইলেও, সম্ভবতঃ 'শেখ ফয়েজুল্লা' নামক জনৈক মুসলমান কবিই ইহার রচনা করিয়াছেন। মুসলমানের সাধারণ বাঙ্গালা কাব্য-রচনাই কথঞ্চিৎ বিস্ময়োৎপত্তির হেতু। সেই সুদূর প্রাচীন কালে কোনও ইস্লাম্-ধর্ম্মান একখানি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মতের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কি নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয় নহে? দুঃখের বিষয়, আমাদের কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ হইবার পূর্ব্বেই বিষাদ আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিতেছে! কবি ফয়েজুল্লার কোনও বিবরণ ত পাওয়া যায়ই নাই, অধিকন্তু তাঁহার গ্রন্থখানিও সমগ্র পাই নাই! গ্রন্থের আদিতে কিয়দংশ নাই, তাহা বুঝা যায়; কিন্তু শেষ ভাগের কতটা নাই, তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? এই দুর্লভ পুঁথি-খানি সম্ভবতঃ কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে স্থান না পাইয়া অবশেষে জনৈক কস্তুক-গুলের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেইখানেই উহার এই বিকলাবস্থা ঘটিয়াছে। বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগি-মতের এইরূপ একখানি মূল্যবান গ্রন্থের এই শোচনীয় পরিণাম, কুটিল কালের মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ, প্রাচীন গ্রন্থগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ পীড়া জন্মে। অপাত্রে পতিত হইলে রত্নের এইরূপ দশাই স্বাভাবিক,—ইহা মনে করিয়া আপাততঃ আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের এই অভ্যুদয়কালেও ইহার সমগ্র পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করা যায় কি না, সাহিত্য-সেবিগণ একবার সে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি?

বলিয়া রাখা ভাল যে, এই গ্রন্থের পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ; তাহার উপর লিপিকর-প্রমাদেও উহা পূর্ণ। 'ইচান গাজী' নামক জনৈক মুসলমান ইহার প্রতিলিপি-লেখক। লিপিকরের প্রমাদবশতঃ গ্রন্থের অনেক স্থল অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রন্থের দুই স্থলে দুইটি ভণিতি দেখা যায়। যথা,—

(১) মোক্ষে কহি ভিমদাস মনে অনুমানি। (?)
মুনিআ রচিল তবে সিদ্ধা সমের কাহিনী ॥—৩য় পাত।

(২) কহে সেক ফাজুল্লাএ, শুন গুরু মীন রাএ
এবে আপন চিন্তা সার।

কাম শাস্ত্র-বুঝি পাইলা বিবিধ কন্তুক (কৌতুক) তৈল।
গোর্খ যাকা পিণ্ডরৈক্ষা কর॥—২৫শ পত্র।

এখানে আমরা কিছু নির্ণয় করিতে অক্ষম। একই গ্রন্থ একাধিক ব্যক্তির রচিত হইতে পারে বটে; কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিলিপি না পাওয়া পর্য্যন্ত এ স্থলে এই রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 'ফয়েজুল্লা' নামক কবির নাম অগ্রেই বিশ্রুত হইয়াছে। মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেও এক 'ফয়েজুল্লা' কবি আছেন। তাঁহারা ভিন্ন কি অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার কোনও প্রমাণ আমাদের হস্তগত নাই। এই গ্রন্থের রচয়িতা যিনিই হউন, ইহার বর্ণিত বিষয় আলোচনার যোগ্য, সন্দেহ নাই।

'গোবিন্দচন্দ্র-গীতে'র সহিত ইহার সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখাইতে গেলে পাঠকগণকে 'গোর্খবিজয়ে'র আখ্যানবস্তুর সহিত পরিচিত করা আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধ উপলক্ষে 'গোবিন্দচন্দ্র-গীত' সম্বন্ধেও আমাদের কিছু আলোচনা করিবার অভিলাষ আছে। এই দুই গ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা করিলে গোবিন্দচন্দ্র-গীতোক্ত বিষয়টির সহিত ইহার পার্থক্য বা সাদৃশ্য বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই জন্য আমরা নিম্নে অতিসংক্ষেপে 'গোর্খবিজয়ের' সারাংশ সঙ্কলন করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথার উল্লেখ করিতে গেলে সমগ্র 'গোর্খবিজয়'খানিই উদ্ধৃত করিয়া দিতে হয়। কিন্তু 'সাহিত্যে' তাহার স্থানাভাব। পুঁথিখানির ভাষা, রচনা-কাল ও কবিত্বাদি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

প্রথম পত্রটি বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় গ্রন্থের আরম্ভটা কিরূপ বলিতে পারিলাম না। তবে উহার পরবর্ত্তী অংশ হইতে প্রারম্ভ সূচিত হইতে পারে বটে। সাধারণতঃ মুসলমান কবিগণ খোদা রসুলের ও হিন্দু কবিগণ দেবদেবীর বন্দনা করিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে সেই রীতি অনুসৃত হয় নাই। গোবিন্দচন্দ্র গীতের,—

প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম্ম আদ্যের গোসাঞী।
আর অগোচরে কিছু ত্রিভুবনে নাঞী॥

এই আরম্ভ। আমাদের সমালোচ্য কাব্যের আরম্ভ-বাকাটি পাওয়া না গেলেও, অনুমান হয় যে, অনাদ্য গোসাঞী আদ্য গোসাঞীকে বন্দনা করিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন।

আদ্যে বোলে শুন কহি তত্ত্ব পাবে ছরিত্র।
অক্ষেত সংক্ষিপ্ত কথা বুঝিলে তুরিত।" (?)

এই ভ্রান্তিপূর্ণ ছত্র দু'টি হইতেই তাহা বুঝা যায়। আদ্য দেব তার পর বলিয়া যাইতেছেন;—

গ্রেন গাছ,মধ্যে,বীজ বীজ মধ্যে গাছ।
এই তত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্ব ঠান সাছ॥

গোরস মধ্যেতে তাহারে ফেলি দিলা।
দুই কাষ্ঠে বসিয়ে জে অমৃত আওটি।
শুনিতে শুনিতে তত্ত্ব অনাদ্যা হৈল মোহ।
দ্বাত্রিংশায় চন্দ্র গিনি বারিসা সমাপ্ত (?)॥
পূর্ণমাসী হইলে শরীর হইল পুষ্ট।
শুনিতে অনাদ্য তত্ত্বে হইল গরিষ্ট॥
শুনিআ সংগীত তত্ত্ব ভাবিতে লাগিলা।
একে একে তত্ত্ব সব বিসরি চাহিলা॥
ভাবিতে ভাবিতে হৈল শরীরের অন্তর।
পূর্ণমাসী ছাড়ি গেল অমাবৈস্যা অন্তর॥ (?)
অমাবৈস্যা হইল জেন ছাড়ি গেল কলা।
আকারে উকারে জেন মিশামিশি ভেলা॥
অমাবৈস্যা ছাড়ি গেল প্রতিপদ হইল।
তেন মতে যোগ যোগী একত্রে মিশাইল॥
প্রতিপদ ছাড়িআ যদি দ্বিতিআ হইল।
চক্রের পাঞ্জরে জেন অমিল মীন গুরু॥ (?)

এইরূপে গুরু মীননাথের জন্ম হইল। ইহার পর গ্রন্থের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ স্থলের দুই এক পংক্তি যাহা আছে, তাহাতে দেখা যায়, গুরু মীননাথের বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ মীননাথ,—

সাক্ষাতে শিবের ভেস যোগ সাধে নিতি॥
মীননাথের জন্মের পর আদ্য মোসাঞীর,—
হাড় হোন্তে হাড়িপা জন্মিলা নিকলিল।
সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার ভেস তাহার আছিল॥
কাণ হস্তে জন্মিলেক কাণফা সিদ্ধাই।
অতি খরতর দুই অমিল যোগাই॥
জটা হোন্তে নিকলিল যতি গোর্খনাথ।
সিদ্ধা কাঁধা সিদ্ধা ঝুলি তাহার গলাত॥

এইরূপে সিদ্ধগণের জন্মের পর হরগৌরীর জন্ম হইল। তখন,—

প্রভুর আজ্ঞাএ তারা ক্ষিতিতে আইল।
ক্ষিতিতে আসিআ সিদ্ধা সকল রহিল॥
তবে যদি হর গৌরী পৃথিবীতে আইল।
হাড়িপায়ে দেখিয়াছে কাণফা সিদ্ধাই॥
শিবের দক্ষিণে বামে হাড়িকা মীনাই।
পৃষ্ঠভাগে আছে গৌরী জগতের মাই॥

ইহার পর হরগৌরী ক্ষীরোদ-সাগরে গেলেন। তথায় মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মীন মোচন্দর অবস্থিতি করিতেছিলেন। কি কারণে ঠিক বুঝিলাম না, মোচন্দরকে অভিশাপ দিয়া—

তথা হোন্তে হর গৌরী উঠিআ আইলা।
পুনরপি সিদ্ধা সবে একত্রে বসাইআ।

আদ্য গুরু মহাদেব সিদ্ধে যাঁর সব।
সাধিএ সকল সিদ্ধা উদ্ধরিবারে ভব॥
মহাদেব চলি গেলা পর্ব্বত কৈলাশ।
তথা সিদ্ধা হর গৌরী কৈলা গৃহবাস॥
পূর্ব্বে সেথ হাড়িপা দক্ষিণে কাণফাই।
পশ্চিমে গোপীচন্দ্র গোর্খ উত্তরে মীনাই॥
পৃথিবী ভ্রমন্ত সবে যোগপন্থ লেআই।
কৈলাসেত হর গৌরী আছে সেই ঠাঁই॥

এক দিন ভবানী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শিষ্যগণ—

ধ্যানেত সাধিআ যোগ কি পাইব ফল।
আজ্ঞা দেঅ গৃহবাস করৌক সকল॥

প্রত্যুত্তরে মহাদেব তাঁহাদের কাম ক্রোধাদি জন্মের কথা বলিলেন,—

দেবীএ বোলএ দেব না বোল বচন।
কাম ক্রোধ তেজিছেন আছে কোন জন॥
আজ্ঞা যদি কর মোরে এ সব বচন।
কটাক্ষে মোহিতে পারি তা সবের মন॥

তার পর দেবী নারীরূপ ধারণ করিয়া সিদ্ধগণের ধ্যানভঙ্গ করিতে চলিলেন। তাহা দেখিয়া,—

কুম্ভিলেক মীননাথে মনে আশা করি।
জগতেত পাম্ যদি এমত সুন্দরী।
বিচিত্র পয়ন করি হেন নারী লৈআ॥

তা শুনিআ বোলে দেবী পাইলা এই বর।
কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর॥
ষোল শত নারী তৈআ কর গিআ কেলি।
কদলীর রাজ্য হৈবা ঝাটে যাও চলি॥
তবে মনে চিন্তিলেক সিদ্ধা হাড়িপাই।
এমত সুন্দরী যদি আমি তভু পাই॥
হাড়ি কর্ম্ম করি যদি থাকি তার পাশে।

হাসিআ বুলিলা দেবী পাইলা এই বর।
হাড়ি হৈআ চল তুমি মৈনামতী ঘর॥
হাতে শিঙ্গা লও তুমি কাক্ষেত কোদাল।
চল মেহরঙ্গ বুজে দেশ পাইবা ভাল॥
কাণফাএ কম্পিলেক হৃদয় অন্তর।
এরূপ যুবতী যদি থাকে মোর ঘর॥

অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিসর্জিআ।
ত্বরিতগমনে যাও তউকা চলিআ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কিন্তু তখনই যতি গোরক্ষনাথকে কিছুতেই উঠাইতে পারিলেন না। মহাদেব সে কথা শুনিলেন।

"গোরক্ষের চরিত্র দেখি কহে মহেশ।
তোর হেন তপী নাই তাহে দিব্য।
[illegible]
যাহিত হইল তোর গোর্খ অবধূত।

দেবী জীবন্তে প্রত্যক্ষরূপে দর্শিবার মানস করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা বর যাগের তলে, কামরূপ বহরীর নগরে, হাড়িপা মৈনামতীর পুরীতে, মাতুল নিজাই আপন গৃহে ও দীননাথ 'কদলী' নগরে চরিত্র গেলেন।

দীননাথ 'কদলী' নগরে গিয়া মঙ্গলা কন্যা নাম্নী দুই তুলসীকে প্রধানা মহিষী করিলেন; এবং ষোল শত রমণী লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ভোজন পড়িল দীন [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

গোরক্ষনাথ যোগিবর জানে আপনা লইল,—কি লাগি, কবে কে জানিবা দিলেন কন্যা লই মায়।' এই বলে,—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এইরূপে মীননাথের ঔরসে বিমুকুলনাথনামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন।

অতঃপর দেবী গোর্খনাথের ছলনায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম চেষ্টায় বিফল হইয়া তিনি মক্ষিকারূপে গোর্খনাথের উদরে প্রবেশ করিলেন। গোর্খনাথ দশ দ্বার রুদ্ধ করাতে,—

এক্কাণ না পাই দেউী ফট ফট করে।
বড় দুঃখ পাই দেবী ডাকিআ কহিল :
তুমি সতী যতি হেন নিশ্চয় জানিল :
পন্থ এড়ি দেহ মোরে চলি যাই ঘরে।
বড় দুঃখ পাই মুই তোমার অন্তরে॥

দেবীর বিনয়বচনে কাতর হইয়া গোর্খনাথ দেবীকে গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। দেবী তথা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানুষ খাইতে আরম্ভ করিলেন। তজ্জন্য মহাদেব তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। পরে গোর্খনাথের চেষ্টায় সে দেশে দেবী-পূজা প্রবর্তিত হইল।

'গার্ভসের' রাজস্থিত বিরহিণীর স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করেন। তাহাতে গোর্খনাথ বিরহিণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন :

স্বামী পাই বিরহিণী চলি আইল ঘর।
নাথেরে লইআ গেলা মন্দির ভিতর॥
তবে যতি গোর্খনাথে জ্ঞান কৈলা দড়।
দুই পহরের সিদ্ধ হৈল মন্দিরের ভিতর॥
দুর্জ্জ খাইবারে চাহে কান্দে ওআঁ ওআঁ।
তা দেখিআ রাজকন্যা হৈল আচাতুয়া॥

তাহা দেখিয়া বিস্ময়-চকিতা বিরহিণী গোর্খনাথের স্তুতি আরম্ভ করিল। গোর্খনাথ অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহাকে কর্কটীজল পান করিতে দিলেন। তাহার ফলে বিরহিণীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম হইল শ্রীখোয়াজ।

ইহার পর বিজলা-নগর ত্যাগ করিয়া গোর্খনাথ বকুলতলায় ফিরিয়া আসিলেন। এক দিন কাণকা ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। গোর্খনাথকে দেখিয়াও সে বুঝি মান্যতা করে নাই। তাই গোর্খনাথ,—

বাহিআ আনিতে তারে পাবকা পাঠাইল।
পবনাই তাহারে গিআ খবরেক বলে।
কাণকা দেখিআ গোর্খ করিলেক রোষ।
আমার উপরে বাঙ্ত কেমন সাহস॥
গোর্খের বচন শুনি বহুত ডরাইআ।
আমার বচন গোর্খ শুন মন দিআ॥

ত্রিভুবনে যোরে তুমি করিছি গোচরি।
একথার বাক্য তুমি গুপ্ত করি ঠাই।
বড়াই না ছাড় গোপী শ্রীঅঙ্গের বাস।
তোর অঙ্গে পড়িয়াছে কদম্বের বাস॥
মোর মুখ চাহিয়া বেড়াস্ ত্রিভুবন।
ভ্রমিতে শ্রীমতে মোর তথাত গমন॥
দেখিলাম যমুনায় যদি শক্তি নাই।
বকুলাটি স্থরে যেন আহ্নিয়া বেয়াই॥

যদি সে যাইব গোপী কদম্বের তর।
ঘাটে গিয়া তোর শুক্ল চিত রক্ষা কর॥
তব কথা কহি আমি শুনরে গোসাঁই।
হেন বুদ্ধি তর রক্ষা পাওক গোসাঁই॥
বাবড়ার বচন শুনি গোপীনাথ হাসে।
আপনে না যাও তুমি মোরে বোল কিসে॥
তোর শুক বন্দী হৈছে যেহর কুল দেশ।
নিশ্চয় জানম মুই তাহার উদ্দেশ॥
যেহর নগরে আছে রূপনী যে তুকিনী।
মেনামতী নাম তার রাজার গরিণী॥
বিধরা যে নারী হএ পুত্র রাখেশর।
দৈবজ্ঞক ডাকিপাঠ করে একেশ্বর॥
তার পুত্র বাড়া পাইয়া বাকিজা আনিল।
মাটীর ভিতরে নিয়া তাহাকে রাখিল॥
হস্তী সব বান্ধে সব তাহার উপর।
নিয়ন্তর রঞ্চে নিদ্ধা মাটীর ভিতর॥

এইরূপে—

দুই জনে পাইল দুই গুরুর উদ্দেশ।
দোহানের মন হৈল উন্মত্ত-বেশ॥
একখান ডুঙ্গা দুইরাম করি নায়।
বায় বেই গুরুর উদ্দেশে চলি যায়॥
আগুয়া চলিয়া গেল যেহরকুল দেশ।
গোপীনাথ চলি গেল শ্রীনের উদ্দেশ॥

অদ্য প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অবশিষ্ট গানের অবতারণার জন্য আমাদিগকে কয়েকদিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীআবদুল করিম।

পাল-রাজগণ। (ইতিহাস)

পাল-বংশের তৃতীয় রাজা,—দেবপাল।

ধর্ম্মপালের অনুজ বাক্‌পালের দুই পুত্র,—দেবপাল ও জয়পাল। দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন; জয়পাল ভ্রাতার পার্শ্বে থাকিয়া ভ্রাতার রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করেন। সমুদয় উত্তর-ভারত জয়পালের বীরত্বে দেবপালের অধীন হয়। জয়পাল বহুচেষ্টায় উত্তর রাঢ় অধিকার করেন, এবং অর্থবলে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে হস্তগত করেন। 'দুর্জ্জনসমবিরচিতপ্রকরণে' নারায়ণ লিখিয়াছেন,—'তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পরিতোষের বংশধর উমাপতি মহারাজ জয়পাল হইতে প্রভূত দান গ্রহণ করিয়াছিলেন।' উমাপতি পণ্ডিতাগ্রণী ও বহুশিষ্যের অধ্যাপক ছিলেন। তারানাথ বলেন,—'দেবপাল উড়িষ্যাধিকার করেন।' ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে কাষ্ঠ-ফলকে মুদ্রিত কোনও তিব্বতীয় ইতিহাসে লিখিত আছে,—'গৌড়েশ্বর দেবপাল বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত সেনা-বলের সাহায্যে মগধ ও বরেন্দ্রভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করেন।' * বাঙ্গালী জাতি চিরকাল ভীরু ছিল না।

মহীপালের তাম্রশাসনে আছে,—

তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈরতীতং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং ঘনরিতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বদেব ভুবনরাজ্যসুখান্তরেষীৎ॥

দেবপাল বৌদ্ধ ছিলেন। এখানে কাহাদিগকে ধর্ম্মদ্বেষী বলা হইয়াছে, বুঝা গেল না। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে আছে,—'জয়পালে জ্যেষ্ঠের আদেশে উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অধিকার করেন। জয়পাল যুদ্ধযাত্রা করিলে, উৎকল-রাজ নিজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলাইতেন; প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিতেন।' যথা,—

* 'সাহিত্য';—১৩১২, মাঘ।

যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্ বলভি পরিভবঃ প্রস্থিতে সেতুযাত্রায়াং
নীত্বা মাসৈর্দুরাদ্রিপ্রভবজলনিধীন্ তুঙ্গলীলাবতীর্ণঃ।
আসাদ্যৈকত্র চিত্রাং প্রণয়িপরিবৃতো বিন্ধ্যভূভ্যেন মূর্ত্ত্যা।
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপলমিতরমিৎসন্ধয়া যস্য চাস্থাৎ ॥

দর্ভপাণি মিশ্র দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। দিনাজপুরের সগলবাড়ীর গরুড়স্তম্ভলিপিতে আছে,—'দর্ভপাণির মন্ত্রণা-গুণে দেবপালের রাজ্য রেবার উৎপত্তিস্থান হইতে উত্তরে হিমালয় ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুই সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।' যথা,—

আরেবাত্রনকাম্মিতস্মজনদস্তিস্যাচ্ছিলাতৃৎপতে-
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যাৎ সিতিম্নো গিরেঃ।
যার্ত্তণ্ডস্করবারয়ারপুরগদ্বারিপ্রবিষ্যা-
ন্নীত্বা রাজ্যভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ ॥

বিহারের মুঙ্গেরে (বোস্‌রাবার) তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—'দেবপালের রাজ্য পঞ্চোৎপত্তিস্থান হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বদেশীয় লক্ষ্মীকুল হইতে পশ্চিম সাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।' লক্ষ্মীকুল, বোধ হয়, লাক্ষা নদীর কূল হইবে। বিন্ধ্য ও কাম্বোজ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল;—ইহা বোধ হয় কবির অত্যুক্তি। তারানাথ বলেন,—'দেবপাল হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় উত্তর-ভারত অধিকার করেন।'

দেবপাল নিজের রাজত্বের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের একুনে মার্গশীর্ষদিনে শ্রীনগর-ভুক্তির,—অর্থাৎ বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী কুমিলের অন্তর্গত সিরিটনগর বৌদ্ধ ভিক্ষুরাতমিশ্রকে দান করেন।

অশোক হইতে কনিষ্কের সময় পর্য্যন্ত যত দান-পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রায় ৬ অংশ বৌদ্ধদিগকে ও অবশিষ্ট জৈনদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পর যত দান-পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার ৬ অংশ ব্রাহ্মণদের ও অবশিষ্ট বৌদ্ধ-জৈনদিগের প্রতি ভূমি-দান-পত্র। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর যত দান-পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমস্তই ব্রাহ্মণদিগকে দত্ত;—কদাচিৎ দুই একখানি বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

বোধ হয়, মুঙ্গেরে দেবপালের একটি রাজধানী ছিল। কুলাচার্য্য হরিমিশ্র দেবপালের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। দেবপাল বৌদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। দেবপাল সম্বন্ধে হরিমিশ্রের উক্তি,—

শ্রীগোপালপ্রতিভূর্ভুবঃ পতিরভূদ্ গোপ্তা চ রাষ্ট্রে ততঃ
রাজাভূৎ প্রবরঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞা-রাক্ষ্য-বিবেক-গীত-বিনয়ৈঃ শুদ্ধাশয়ঃ শ্রীযুতো
ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স শ্রীরবংশোদ্ভবে॥

বিমলাদেবীনাম্নী দেবপালের এক কন্যার নাম পাওয়া যায়। মহাস্থানের নয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি উচ্চ বাঁধ দৃষ্ট হয়; তাহার উপরে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। স্থানীয় লোকে উহাকে 'দেবপালকা-ভুক্রি' বলে। এখানে দেবপালের মৃত্যু হয়; তাঁহার ভস্মাবশেষের উপর এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নিকট যোগি-গুফা নামক স্থান আছে। প্রবাদ যে, যোগি-গুফা হইতে মহাস্থানের কালীবাড়ী যাইবার একটি ভূ-মধ্যবর্ত্তী পথ ছিল।

দেবপাল অনেক দিন রাজত্ব করেন। 'ব্রহ্মখণ্ডে'র মতে,—'দেবপাল কলির চারি হাজার বৎসর অতীত হইলে, রাজা হইয়া অঙ্গরাজ্যে আটখানি গ্রাম স্থাপন করিবেন।' বিহারের নিকট বোঁসরাবী নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত ক্ষোদিত-লিপি-পাঠে জানা যায় যে, বীরদেব-নামক এক জন বৌদ্ধ পরিব্রাজক বিহারের যশোবর্ম্মপুরে দেবপালের অনুগ্রহে অনেক দিন অতিবাহিত করেন। উত্তরাপথের নগরহার নামক স্থান হইতে বীরদেব আসিয়াছিলেন। বীরদেব সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। 'ব্রহ্মখণ্ডে'র মতে, দেবপালের পুত্রের নাম শরণপাল।

চতুর্থ রাজা,—প্রথম বিগ্রহপাল দেব।

দেবপালের পর, তাঁহার ভ্রাতা জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে মদনপালের তাম্রশাসনে আছে,—

শ্রীমদ্বিগ্রহপালভূৎসুন্দরসাতশক্রিব স্মাতঃ।
শত্রু-ক্ষিতি-সাধন-বিলোপিবিক্রমাসিজ্ঞাধারঃ॥

রামপালের তাম্রশাসনে আছে,—

রিপবো যেন গুর্ব্বীণাং বিপদামাস্পদীকৃতাঃ।
পুরুষায়ুর্দ্ধীর্ঘাণাং সুহৃদঃ সম্পদামপি॥
লক্ষ্মেতি তস্য জলধেরিব জন্ম-কন্যা
পত্নী বভূব কুতহৈহয়বংশভূষা॥

বিগ্রহপাল অজাতশত্রুর ন্যায় ছিলেন।

নষ্ট হয়। তিনি রিপুগণের বিপক্ষ ও সুহৃদ্‌গণের দীর্ঘসন্দর্ভের কারিয়া ছিলেন। হৈহয়-বংশ-জাতা লজ্জাদেবী বিগ্রহপালের মহিষী ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে আছে,—

তস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতৃকুলে
পত্যুশ্চ পাবনবিধৌ পরমো বভূব।

লজ্জাদেবীর শুচি চরিত্রে পিতৃকুল ও পতিকুল পবিত্র হইয়াছিল।

মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে লিখিত আছে,—'কেদার মিশ্র সুরপালের মন্ত্রী ছিলেন।' সুরপাল উড়িষ্যার দ্রবিড় ও গুর্জ্জর জয় করেন। পাল রাজগণের বংশ-তালিকায় সুরপাল নামক কোনও রাজার নাম নাই। ইহাতে অনুমিত হয়, প্রথম বিগ্রহপালের নামান্তর সুরপাল। সুরপালের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে; অতএব, প্রথম বিগ্রহপালদেব যে অন্ততঃ ত্রয়োদশবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যায়।

বিহারের সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বোদ্‌রাবীর বজ্রাসন-বিহারের ধ্বংসাবশেষ হইতে বিগ্রহপালের বহু রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রা পারস্যের অগ্নি-উপাসকদিগের মুদ্রার অনুরূপ। মুদ্রার সম্মুখভাগে অস্পষ্ট রাজমুণ্ড ও 'শ্রীবিগ্রহ'—এই কয়েকটি কথা আছে।

পঞ্চম রাজা,—নারায়ণপাল দেব।

নারায়ণপাল বিগ্রহপালের ঔরসে লজ্জাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগলপুরে নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে নারায়ণপাল দেবের সময়ের নানা কথা জানিতে পারি। তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক এই,—

স্বস্তি। মৈত্রীং কারুণ্য-রত্ন-প্রমুদিত-হৃদয়ঃ প্রেমসীমা বন্ধুধানঃ
সম্যক্‌সন্দোধিবিদ্যা-সমিধ-বলজলক্লান্তিভাজ্ঞানপঙ্কঃ।
ত্রিবর্গঃ কামতানিপ্রভবমভিভবং পাতকীং বা (১) যশোভির
অশ্নাদ্‌ লোকমাখো জয়তি দশবলাহ্বস্তু গোপালদেবঃ॥

শমদিভ-হৃদয়, মার-জয়ী, দশবল বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া এই [illegible] হইয়াছে। নারায়ণপাল যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাতে সংশয় [illegible] সেই শ্লোকে বংশপ্রবর্ত্তক গোপাল দেবেরও নাম আছে। [illegible] আছে, গোপাল দেবকেও সেই সেই

(১) সম্ভবতঃ [illegible] পাঠ হইবে।

বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তাহার পর ধর্ম্মপালের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

লক্ষ্মীঃ শ্রীমনিকেতনংসমকরোদ্ বোঢ়ুং ক্ষমঃ শ্রান্তরং
পক্ষচ্ছেদভয়াদুপাশ্রিতবতাং একাশ্রয়ো ভূভৃতাং।
মর্য্যাদাপরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদ্ভুৎ
দুগ্ধাম্ভোধিবিলাসিহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ॥

জানা যাইতেছে, ধর্ম্মপালের সময় বংশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজ্যলাভীত অনেক রাজা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; ধর্ম্মপাল তাঁহাদের মর্য্যাদারক্ষা করিতেন। একাধারে বীরত্ব ও বাৎসল্যের অধিষ্ঠানে তাঁহার নির্ম্মল যশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার পর বাক্‌পাল, দেবপাল, জয়পাল ও বিগ্রহপালের কিছু কিছু প্রশংসা করিয়া, নারায়ণপালের বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে,—

দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তাং শ্রিয়ঃ
শ্রীনারায়ণপালদেবমসজ্জন্তনাং স পুণ্যোত্তরম্।
যঃ কৌণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাপ্লিষ্টাঙ্ঘ্রিপীঠোপলং
ন্যায়োপাত্তসদঙ্কনায় চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনম্।

নারায়ণপালের সিংহাসন রাজগণের শিরোমণি-দীপ্তিতে উজ্জ্বল ছিল। তিনি নিজের চরিত্রে ন্যায়োপাত্ত ধর্ম্মাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 'ন্যায়োপাত্ত' শব্দ থাকায় বোধ হইতেছে, সিংহাসনের আরও প্রার্থী ছিল। তাম্রশাসনের পশ্চাদুক্ত শ্লোকটি ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধেয়,—

যতঃ পুরাণৈর্জ্ঞানি চতুর্বর্গবিধীনি চ।
অরিণ্‌সন্তে যতঃ স্থানি চরিতানি মহীভৃতঃ॥

শ্লোকটির যে প্রকৃত পাঠোদ্ধার হইয়াছে, এমন বোধ হয় না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার অর্থ করেন,—'রাজগণ চতুর্বর্গ-বিধিবিশিষ্ট লিঙ্গপুরাণের ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া, নারায়ণপালের চরিত্রের অনুকরণ করেন।' শ্লোকটির অর্থ বিশদ নয়। যদি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কৃত অর্থ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে, লিঙ্গপুরাণকে সচরাচর যত আধুনিক মনে করা হয়, তাহা তত আধুনিক নহে। লিঙ্গপুরাণখানি পাঠ করিলে বোধ হয়, উহা বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। প্রশস্তিতে রাজগণের গুণাবলী বাড়াইয়া লেখা হয়। বাস্তবিক, রাজগণের সেই সেই গুণ অব্যভিচরিতরূপে থাকে না। নারায়ণ-

পাল অত্যন্ত দাতা ছিলেন। প্রজ্ঞা ও বাহুবলে জগৎ বশীভূত করিয়াছিলেন। যথা,—

যঃ প্রজ্ঞয়া চ ধনুষা জগদ্ বিনীয়
নির্ব্যাজবিশদমাকৃতমাত্মধর্ম্মৈঃ।
যস্যার্থিনঃ সবিধমেত্য ভৃশং কৃতার্থা
নৈবার্থিতাং প্রতি পুনর্বিদধুর্মনীষাং॥

এই সময়ে কি রাজগণ ধনুঃ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন?—বোধ হয়, সেনাদলের অধিকাংশ ধনুঃ ব্যবহার করিত। নারায়ণপাল বিগ্রহপালের জীবদ্দশায় সিংহাসনে আরোহণ করেন; বিগ্রহপাল শেষ বয়সে তপশ্চাচরণে প্রবৃত্ত হন। নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ অনুমান হয়,—

তপো সমাস্ত রাজ্যান্তে ঘাভ্যামুক্তমিদং দ্বয়োঃ।
যস্মিন্ বিগ্রহপালেন নয়বেণ ভগীরথে॥

এই দান-পত্র-প্রদানের সময়, মুদ্গগিরিতে—অর্থাৎ মুঙ্গেরে—নারায়ণ-পালের জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছিল। মুঙ্গেরের প্রান্তবাহিনী গঙ্গায় নৌ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল; দূর হইতে দেখিলে সেই সেতুকে শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া ভ্রম হইত। রাজার হস্তিশ্রেণী দেখিলে, দূর হইতে জলদমালা বলিয়া সংশয় হইত। উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী সামন্তরাজগণের অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন হইত। সমাগত অশেষরাজপুরুষ, 'রাজা', 'রাণক', 'রাজপুত্র', 'রাজামাত্য', 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক', 'মহাক্ষপটলিক', 'মহাসামন্ত', 'মহাপ্রতীহার', 'মহাকর্ত্তাকৃতিক', 'মহাদোঃসাধসাধনিক', 'মহাদণ্ডনায়ক', 'মহাকুমারামাত্য', 'রাজস্থানীয়োপরিক', 'দাশাপরাধিক', 'চৌরোদ্ধরণিক', 'দাণ্ডিক', 'দাণ্ডপাশিক', 'শৌল্‌কিক', 'গৌল্‌মিক', 'ক্ষেত্রপ', 'প্রান্তপাল', 'কোট্টপাল', 'খণ্ডরক্ষ', 'তদায়ুক্তক', 'বিনিয়ুক্তক', 'হস্ত্যশ্বোষ্ট্র-নৌ-বলব্যাপৃতক', 'কিশোর-বড়বা-গো-মহিষাজাবিকাধ্যক্ষ', 'দূতপ্রেষণিক', 'গমাগমিক', 'অভিত্বরমান', 'বিষয়পতি', 'গ্রামপতি', 'তরিক', 'গৌড', 'মালব', 'খশ', 'হূণ', 'কুলাট', 'লাট', 'চাট', 'ভাট', সেবকাদি ও মহাপূজনীয় ব্রাহ্মণ হইতে গোমেদ অক্ষ, চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে জানাইয়া কলশপোত নামক গ্রামে সংস্থাপিত হংশ্বরতনে প্রতিষ্ঠাপিত, শিব ভট্টারকের উদ্দেশে পাশুপত আচার্য্য পরিষদকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী তীরভুক্তি কক্ষ বিষয়ের অন্তর্গত মুকুটিকা গ্রাম প্রদান করিতেছেন; দানের উদ্দেশ্য এই যে, পাশুপত আচার্য্য প্রভৃতি

দেবতার সেবা করিবেন; পীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবেন। গ্রামের চতুঃপার্শ্বস্থ গো-চারণ স্থানে, গ্রামস্থ আম্র-মধুক বৃক্ষে, নগর্ত্তোপ্ত অর্থাৎ নিম্ন অনুর্ব্বর পতিত ভূমিতে গ্রামে যে শুল্ক, জরিমানা ও রাজস্ব আদায় হইত, তাহাতে পাশুপত আচার্য্যের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। চাট, ভাট প্রভৃতিদিগকে গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই চট্ট, ভট্ট, বা চাট, ভাট শব্দে কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বিচার্য্য। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেও ইহাদের উল্লেখ আছে। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় মনে করিতেন,—'চট্ট' শব্দে চট্টগ্রাম ও ভট্ট শব্দে ভোটান অঞ্চলের লোকদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। চাঁটিগা ও ভোটান অঞ্চলের লোক রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অশান্তি জন্মাইত। আমাদের এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সীমান্তবাসী জাতিগণ রাজাজ্ঞা পালন করিবে কেন? এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, পালরাজগণের রাজ্য চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। চাট-ভাটেরা যে মুঙ্গের পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত, তাহা বোধ হয় না। রাজসেনা ও রাজপ্রিয় চাটুকারেরা প্রায়ই দৌরাত্ম্যকারী হইয়া থাকে; চট্ট ভট্ট শব্দে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে।(২) তাহারা যেন পাশুপত আচার্য্যের প্রাপ্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া অশান্তির উৎপাদন না করে, রাজা ইহাই আদেশ করিয়াছিলেন। নারায়ণপালদেবের 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক' ও 'পরমসৌগত' বিশেষণ দৃষ্ট হয়। নারায়ণপাল পরমসৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া পাশুপত আচার্য্যকে দেব-সেবা-নির্ব্বাহার্থ ভূমিদান করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরম উদার ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবও মুঙ্গ-নারায়ণদেবের উদ্দেশে ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছিল, এবং হিন্দুধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্ব-প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। রাজগণ প্রজাদের সন্তোষবিধানার্থ হিন্দু-দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূমি দান করিতেছিলেন। এখন কোনও দেবমন্দিরে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহার চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা নাই; কিন্তু পাশুপত আচার্য্য তদ্বিষয়ে যাহাতে মনোযোগী হন, রাজার

(২) হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের একখানি পাঞ্চমপ্রদেশীয় তাম্রশাসনেও চাট ভাট শব্দ আছে; অতএব, চাট-ভাট যে চট্টগ্রামের ও ভোটের লোক নয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেইরূপ আদেশ ছিল। পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান ও তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা-বিধান মহান্ বৌদ্ধধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাসর্ব্বাকৃতিক, মহাকুমারামাত্য, রাজস্থানীয়োপরিক, দাশাপরাধিক, ক্ষেত্রপাল, প্রান্তপাল, কোষপাল ও দূতপ্রেষণিক,—এই সকল কর্ম্মচারীর নাম আছে। নারায়ণপালের সময়ে রাজ্যের বৃদ্ধি ও শাসন-কার্য্যের উন্নতি হওয়ায় নূতন নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে 'খোল' নামক কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে;—নারায়ণপালের তাম্রশাসনে নাই। 'মহাক্ষপটলিক' শব্দে দপ্তাগারসমূহের অধ্যক্ষদিগের কার্য্যপরিদর্শককে বুঝায়। 'মহাসান্ধিবিগ্রহিকে'র অর্থ,—সন্ধি-বিগ্রহের প্রধান মন্ত্রী; 'মহাপ্রতীহার,'—প্রধান দ্বারপাল; 'মহাসর্ব্বাকৃতিক',—সমুদায় কার্য্যের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক; 'মহাকুমারামাত্য',—যুবরাজের প্রধান অধ্যাত্য; 'রাজস্থানীয়োপরিক',—রাজস্থানীয় প্রধান শাসনকর্ত্তা। বৈশালীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে 'ভীরভুক্ত্যুপরিকাধিকরণস্য' এই শব্দাঙ্কিত একটি সিল পাওয়া গিয়াছে। উপরিকগণের এক একটি অধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয় ছিল; তাহাদের শিরোমোহরও ছিল। রাজ্যের স্থানে স্থানে সুবিচারবিতরণের ও শান্তিরক্ষার জন্য উপরিকগণ নিযুক্ত হইতেন; তাঁহাদের কার্য্যাবলীর পরিদর্শনের জন্য রাজধানীতে বৃহদুপরিকের কার্য্যালয় ছিল। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে গৌড়, মালব, খশ, হূণ, কুলিক, কুলাট, বৈদ, অন্ধ্র ও চণ্ডালদের নাম আছে। ইহারা রাজ্যমধ্যে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত। পূর্ব্ব হইতেই হূণেরা এ দেশে আসিয়াছিল। গুপ্তসাম্রাজ্য হূণদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। হূণেরা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। এক জন হূণ রাজা নগুড়া জেলার মহাস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক কঙ্কর যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর, হূণেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা স্থানে উৎপাত করিয়া বেড়াইত।

মঙ্গলবাড়ীর গরুড়স্তম্ভে পালরাজগণের মন্ত্রি-বংশের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত স্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপিতে আছে,—'গৌড়েশ্বরগণ মিশ্রবংশীয় মন্ত্রিসঙ্ঘের সাহায্যে হূণদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন,—

উৎকীলিতোৎকলকুলস্য হৃতহূণগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃত-দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্পং।

তুঙ্গীমতিরপনাত্তরণং বৃতোঽসৌ
গৌড়েশ্বরস্থিরপাসাবিনয়ং দধীয়ান্।

বৈদেশিক জাতি রাজ্যস্থাপনের জন্য দল বাঁধিয়া নানা স্থানে বেড়াইত, ইহা অনেকবার দেখা গিয়াছে। গ্রীকেরা দলবদ্ধ হইয়া ভারতের নানা স্থানে বেড়াইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। উড়িষ্যার ইতিহাসে যে যবনাক্রমণের উল্লেখ আছে, তাহা এইরূপ ঘটনা। পাল রাজগণ ভ্রমণশীল দলবদ্ধ হূণদিগের দর্পনাশ করিয়া, তাহাদিগের উৎপাত হইতে প্রজাবর্গের রক্ষাবিধান করেন।

গৌড়, মালব, খশ, কুলিক, কলাট, মেদ ও আন্ধ্রের বিষয় আমরা বিশেষরূপ অবগত নহি। বাঙ্গালার উত্তরবর্ত্তী পাহাড়িয়া লোকদিগকে বোধ হয়, খশ বলা হইয়াছে। গৌড়, বোধ হয়, গণ্ডোয়ানার বন্য জাতি। অন্ধ্র ও অন্ধ্র একই জাতি; যে অন্ধ্রেরা মগধে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, বোধ হয়, ইহারা তাহাদের হইতে পৃথক্। চণ্ডালেরা দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের লোক। এখনকার বেদিয়াদের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত জাতিগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিত; সুযোগ পাইলে চুরী-ডাকাতীও করিত। পাশুপত আচার্য্য যাহাতে তাহাদের কর্ত্তৃক উপদ্রুত না হন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে পূর্ব্বোল্লিখিত রাজামাত্য ও রাজকর্ম্মচারিগণ আদিষ্ট হইয়াছেন। রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষের ৯ই বৈশাখে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়; অতএব, নারায়ণপাল যে অন্ততঃ সপ্তদশবর্ষ রাজত্ব করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খজুরাহস্থ শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে, চন্দ্রাত্রেয়-বংশীয় যশোবর্ম্মদেব গৌড়বাসীদিগকে রণে পরাজিত করেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এই ঘটনা হয়। তখন গৌড়-সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত ছিলেন, জানা যায় না।

রাজমন্ত্রী ভট্টগুরব মিশ্র নারায়ণপালের তাম্রশাসনের শ্লোকমালা রচনা করেন। তাঁহার সম্বন্ধে তাম্রশাসনে আছে,—

বৈদেহৈরসুগতমং (?) বেদিতা ব্রহ্মতত্ত্বং
যঃ সর্ব্বাসু ক্ষিতিষু পরমঃ সর্ব্বনৈষ্কর্ম্মগীতী।
সো যজ্ঞানাং নমুদিতমহাভূরিদানানাং (?) প্রণেতা
ভট্টঃ শ্রীমান্ স ইব গুরবো দুতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ॥

গুরবমিশ্র পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। কবিত্ব-শক্তির জন্য তিনি 'দ্বিতীয় বাল্মীকি' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 'মাতঃ শৈলসুতাসপত্নিবসুধাশৃঙ্গারহারাবলি' ইত্যাদি যে গঙ্গাস্তব আছে, তাহা গুরবমিশ্রের রচিত।

এ স্থলে মিশ্র-বংশের পরিচয়-প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দিনাজপুর জেলার বুদেলার নিকটবর্ত্তী মঙ্গলবাড়ীর প্রস্তরস্তম্ভোৎকীর্ণ লিপিপাঠে মিশ্র-বংশের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়;—

(১) শাণ্ডিল্য মিশ্র—গোত্রের প্রথম পুরুষ।
(২) বীরদেব মিশ্র।
(৩) পাঞ্চাল মিশ্র।
(৪) গর্গ মিশ্র—স্ত্রীর নাম ইরাবতী।
(৫) দর্ভপাণি মিশ্র—দেবপালের মন্ত্রী;—স্ত্রীর নাম কর্করাদেবী।
(৬) সোমেশ্বর মিশ্র—স্ত্রীর নাম তরলা বা রণাদেবী।
(৭) কেদার মিশ্র, সুরপালের সমসাময়িক,—স্ত্রীর নাম বধ্বদেবী।
(৮) গুরবমিশ্র—নারায়ণপালের মন্ত্রী।

শুভদাসের পুত্র সমতটজন্মা মদ্গ্রদান কর্ত্তৃক নারায়ণপালের তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হয়। এখন যেমন মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারীদের দোষে মুদ্রণের ভ্রম-প্রমাদ ঘটে, তখনও সেইরূপ ক্ষোদকদিগের অজ্ঞতাবশতঃ উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে অশুদ্ধি থাকিয়া যাইত। এখন প্রুফ্ সংশোধন করা হয়, কিন্তু কোন তাম্রশাসন একবার ক্ষোদিত হইলে, তাহার আর সংশোধনের উপায় থাকিত না; এই জন্য তাম্রশাসন-বর্ণিত বিষয়ের অর্থ কোনও কোনও স্থলে সহজে বুঝা যায় না।

শ্রীব্রজসুন্দর-চক্রবর্ত্তী।

নীল-বিদ্রোহ ও নীল-দর্পণ।

১২৬৭ সালের আশ্বিন মাসে নীলদর্পণ প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান পাঠকমণ্ডলীর নিকট সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা সম্পূর্ণ অবিদিত; এ জন্য নীলদর্পণ ও নীলকর কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি। যাঁহাদের এ বিষয় সবিশেষ জানিবার বাসনা আছে, তাঁহারা ইংরাজিতে মৎপ্রকাশিত History of Indigo-Disturbance in Bengal নামক পুস্তক পাঠে সন্তুষ্ট হইবেন।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতবর্ষে নীল উৎপন্ন হইত। এখানে (Indiaতে) উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম Indicum-Indigo। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী নীলের চাষ হইতে বিস্তর লাভ করিয়াছিলেন, এবং বহু বৎসর ব্যাপিয়া এই লাভ ভোগ করেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর দেশে নীলের ব্যবসায় তাঁহাদের কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সাধারণ বাণিজ্যোপজীবীদিগের হস্তে অর্পণ করেন, এবং ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নীলকর সাহেবদিগকে প্রভূত সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু জানি না, কি কুক্ষণেই তাঁহারা নীলের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! কেন না, নীলকর সাহেবরা নীলের চাষ আরম্ভ করিবার পর হইতেই অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৩এ অক্টোবর তারিখে এক সারকুলার জারি হয়; তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে আদেশ দেওয়া হয় যে, তাঁহারা, স্ব স্ব এলাকায়, নীলকরেরা বলপূর্ব্বক রাইয়তদিগকে দাদন লওয়াইলে বা তাহাদিগকে অবৈধ উপায়ে নীল বুনিতে বাধ্য করিলে, সেই সকল ঘটনা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ মনোযোগ সত্ত্বেও অত্যাচারের কিছুই উপশম হয় নাই; বরং মাত্রা পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সিবিলিয়ান ডিগাটুর সাহেব নীলকরের ভীষণ অত্যাচার দর্শনে কাতর হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"মনুষ্যরক্তে কলঙ্কিত না হইয়া নীল ইংলণ্ডে পঁহুছে না।"

অত্যাচারকাহিনী সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে নীলের চাষ সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানা আবশ্যক। নীলের চাষ দুই প্রকার; প্রথম, নিজ আবাদি; দ্বিতীয়, রাইয়তি। নিজ আবাদির বর্ণনা নীলদর্পণের ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে তোরাপের মুখে পাওয়া যায়, এবং ইহাতে কোনরূপ অত্যাচারের সংবাদ শোনা যায় না। রাইয়তি চাষ—রাইয়তদিগের দ্বারা করা হইত। তাহারা নীলকরের নিকট হইতে দাদন লইয়া নীল বুনিবার চুক্তি করিত। ইহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। নীলকরের নিজ জমীতে হইলে ইহাকে এলেকা কহিত, এবং অপরের জমীতে হইলে ইহাকে বেএলেকা কহিত। চুক্তিপত্র প্রায়ই এক বৎসরের জন্য হইত, কোন কোন স্থলে তিন, পাঁচ কিম্বা দশ বৎসরের জন্যও হইতে দেখা গিয়াছে। হিসাব নিকাশের সময়, রাইয়তের নামে দাদনের টাকা, চুক্তিপত্রের ষ্ট্যাম্পের মূল্য ও বীজের মূল্য প্রভৃতি পাওনা—খরচ পড়িত, এবং তাহারা যে কয় গাড়ী নীল চাষ আনিল কহিত, তাহার মূল্য—জমা ধার্য্য হইত। এইরূপে হিসাব

পাওনা হইল, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে; নীলকরের পাওনা হইলে তাহারা আদালতের বৎসরের হিসাবে নালিশ রুজু করিত। বস্তুতঃ রাইয়তের সহিত পাওনা প্রায়ই ঘটিত না, এবং থাকিলেও বাকি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। এই জন্যই কুষ্টীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছিলেন,—"নীলের দাদন ধোপার ভাতা, একবার লাগ্‌লে আর ওঠে না।"

আইন দ্বারা পাওনা যায়, চুক্তিপত্রের প্রধান অঙ্গ দুই পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছা; কিন্তু নীলের চুক্তি প্রজাদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করিতে হইত। স্বর্গীয় মেকলে এক স্থলে বলিয়াছেন,—এই সকল চুক্তি স্বেচ্ছায় গৃহীত হইত না। বলপ্রয়োগ ও প্রতারণা ইহার প্রধান উপাদান ছিল। অনেক স্থলে চুক্তির ফলে পিতা হইতে পুত্রে ঋণিত। রাইয়তেরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তাহারা স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু যে সময় হইতে প্রজারা জানিতে পারিল যে, তাহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা চুক্তির প্রধান অঙ্গ, সেই সময় হইতে তাহারা নীল বুনিতে অস্বীকার আরম্ভ করিল। ইহা হইতেই নীল আন্দোলনের সূচনার সৃষ্টি হয়। নীলকরেরা নিশ্চেষ্ট রহিল না; তাঁহারা রাইয়তদের নামে চুক্তি-ভঙ্গের অভিযোগ দায়িল করিতে লাগিল। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সার অ্যাশলি ইডেন ১৮৬৮ সালে যখন যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাহার নিকট তৎকালীন প্রধান নীলকর আর. টি. সারদুর প্রজাদিগের বিপক্ষে চুক্তি ভঙ্গের নালিশ করেন। ইডেন প্রজাদিগের প্রকৃত সমর্থন করেন। প্রজাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে পরোয়ানাও জারি করিয়াছিলেন। এই সময় বাঙ্গালার ভাগ্যে সার পিটার গ্রাণ্ট সাহেব ছোটলাটের পদে উন্নীত হন। তিনি যথার্থই প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের শাসন, শিষ্টের পালন" ছিলেন। তোরাপ প্রণয়ের আবেগে বলিয়াছিল,—"হালের গাবনেল সাহেবডারে খোদা বেঁচিয়ে রাকে মোরা প্যাটের ভাত করি খাকি পারলো আর সুমুন্দির নীল মাথলো ঘাড়ে চাপতি পারবে না।" গ্রাণ্ট ছোটলাট হইবার পূর্ব্বে প্রজাবর্গের বিশ্বাস ছিল যে, গবর্মেণ্ট নীলের অংশীদার। হালিডে সাহেবের শাসনকালে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রধান প্রধান নীলকর ইংরেজদিগকে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করায় ঐ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই নিয়োগ উপলক্ষ করিয়া ৫ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে গোপী বলিয়াছে,—সাহেবেরা আপনারা কামার, আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায়, সেইখানে

পড়ে।" হ্যালিডে সাহেবের নামে কথিত অপবাদ তোরাপ ও এক জন রাইয়তে এইরূপ আলোচনা করিয়াছিল,—"তানার বুঝি ভাগ ছেল।—ওরে না, লুটসাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে?" সে যাহা হউক, নীলকর ও তাহাদিগের কর্ম্মচারী যে এই বিশ্বাসের অপব্যবহার করিত, তাহার সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, কুঠীর আমীন ও তাইদগির বলিত যে, "মুগুরের আইন" নামে এক নূতন আইন পাশ হইয়াছে, এবং যে রাইয়ত নীলের জমী গভীর করিয়া না খুড়িবে, তাহার মাথায় মুগুর পড়িবে ও তাহারা নীল বোয়া হইবে।

প্রজারা এইরূপে যতই আইন পরোয়ানা বুঝিতে লাগিল, ততই তাহারা নীলের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিল। পক্ষান্তরে, নীলকর ইংরেজদের অত্যাচারও ঘনীভূত হইতে লাগিল। রাইয়তদিগের মনোভাব নীলদর্পণের ২য় অঙ্কের ৩ গর্ভাঙ্কে রাইয়তের মুখে পাওয়া যায়,—"জেলে পচে মরবো তবু খোড্ডার নীল করবো না।" যদিও ছোটলাট সাহেব প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কিন্তু অনেক মাজিষ্ট্রেটই নীলকরের পক্ষপাতী। সেই জন্য নীলকরের প্রভাব অপ্রতিহত রহিল, এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগের সম্পূর্ণ অবিচার হইতে লাগিল প্রজারা আশু প্রতীকারের সম্ভাবনা না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, তাহাদিগের উদ্ধারের একমাত্র উপায় তাহাদের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। তাহারা পূর্ব্বের ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া সমবেত চেষ্টায় নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিরোধ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামে সাহেবগণ বাহির হইলে তাহাদিগকে অপমান এবং অনেক স্থলে প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইত। নীলকুঠী লুট হইতে লাগিল। একটি সমৃদ্ধশালী কুঠী অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল, এবং একরাত্রে সংবৎসরের কল ভস্মসাৎ হইয়াছিল। কুঠীর সেরেস্তা হইতে হিসাবের কাগজপত্র বলপূর্ব্বক গৃহীত ও ভস্মীভূত হইত। চারি দিকেই অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমন কি, যে সকল গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারী তদারক করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকেও বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। নীলকরেরা ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হইল। ছোটলাট সাহেব প্রজার একাগ্রতা ও আত্মনির্ভরশক্তি উপেক্ষা করেন নাই। বড়লাট ক্যানিং এতই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, এক স্থলে মন্তব্য প্রকাশ করেন, যদি কোনও নীলকর ক্রোধে বা ভয়ে একটি গুলি নিক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে হয় ত বাঙ্গালার প্রত্যেক কুঠীই অগ্নিসাৎ

হইত। ভাইয়ুর্তি-দের বিদ্রোহে একটি সুন্দর শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অকৃতির প্রাধান্য আন্দোলনের সুফল অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, নিরক্ষর কৃষকগণের সমবেত চেষ্টার ফল শিক্ষিত বাঙ্গালী বিস্মৃত হইবেন না। বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতেছেন যে, এই পরস্পরবিরোধী দলের সংঘর্ষণ মূলতঃ বিনষ্ট না হইলে দেশীয় রাজ্যের একবারে ছারখারে যাইবে।

১৮৬০ সালে এই আসন্ন বিপদ নিবারণের নিমিত্ত ও উভয় পক্ষের সন্তোষ-সাধনার্থ গ্রাণ্ট সাহেব ৬ঠা এপ্রিল এক কমিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই "ইণ্ডিগো কমিশন" নামে অভিহিত হয়। তৎকালীন বিচক্ষণ সিভিলিয়ান সীটনকার সাহেব ইহার সভাপতি হয়েন। কমিশনে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু নীলকরেরা ইহাকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন, এবং নীলদর্পণে উড সাহেব এক স্থলে ইহাকে "ডেডালি" বিশেষণে অভিহিত করিয়াছে। গ্রাণ্ট সাহেব এই কমিশন স্থাপন করিয়া যেমন বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছিলেন, পক্ষান্তরে এই কমিশন-সংশ্লিষ্ট নীলকরের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত, ১১ আইনের জন্য কলঙ্কের কালিমা মাখিয়াছিলেন। যদিও তিনি এই আইনের অপব্যবহার নিবারণের জন্য প্রথম হইতেই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। এই আইনে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমার সরাসরি বিচারের যে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার বিষময় ফল অচিরেই ফলিয়াছিল। ইহাই নীলদর্পণে নবীনমাধবের কথিত "সিঙ্গুর আইন"। এই আইনের একটি ধারা ছিল,—যদি কেহ বলপ্রয়োগ বা ভয়প্রদর্শন দ্বারা কোনও রাইয়তকে নীলের চাষ রহিত করিতে প্রবৃত্ত করিত, তাহা হইলে তাহার এই ধারার কারাবাস বা অর্থদণ্ড হইত। এই ধারার অভিযুক্ত হইয়া নীলদর্পণের গোলক বসুর কারাদণ্ড হয়। আইনের আর একটি কঠোর ধারা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির আপীল ছিল না। এই ধারা লক্ষ্য করিয়া সুরধুনী রেবতী বলিয়াছিল,—"মাকি এ্যাদের পিল হয় না।" এই আইন প্রজাদিগের যমদণ্ডস্বরূপ হইয়াছিল, এবং এই নিমিত্তই উড সাহেব ইহাকে "শ্যাম চাঁদের দাদা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রজার আর্ত্তনাদ সুদূর ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছিল, এবং ভারতসচিব সার চার্লস উড ১৮৬০ সালের ৬ঠা অক্টোবর এই শক্তিশেল আইন স্থগিত করিয়াছেন। কমিশনের কার্য্য ১৮৬০ সালের মে মাসে আরম্ভ হয়, এবং ইহার মন্তব্য গ্রাণ্ট

মাসে প্রকাশিত হয়। কমিশনে সাধারণ ইংরাজ সিবিলিয়ান, পাদরী মহোদয়গণ, নীলকর, দেশীয় জমীদার ও রাইয়তগণের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। কমিশন একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, যে, নীলের চাষ রাইয়তের আদৌ লাভজনক ছিল না। মন্তব্যে যে সকল অত্যাচারের বর্ণনা আছে, তাহা সকলই নীলদর্পণে পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। সভাপতি সীটনকার সাহেব নির্ভীকচিত্তে ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি নীলকরদিগের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। নীলকরদিগের মুখপত্র "ইংলিশম্যান" ও "হরকরা" তাঁহার যথেষ্ট কুৎসা প্রকাশ করিত। এই সময়ে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বীয় "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায়, প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া বঙ্গীয় কৃষকসম্প্রদায়কে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সীটনকার সাহেব ব্যতীত আর এক জন সিবিলিয়ান নীলকরদিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। ইহার নাম হার্সল। ইনি ১৮৬০ সালে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি নবীনমাধবের "অমরনগরের নিরপেক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট"। চিরস্মরণীয় জ্যোতির্ব্বিদ সার উইলিয়ম হার্সল ইঁহার পিতামহ; সেই নিমিত্ত ইঁহাকে "বড় সাহেবের ছাওয়াল" বলা হইয়াছে। ইনি সকলকে বাহির হইতে তাঁবু লইতেন, এবং "নীলমামদোর বাড়ি খাতি যাইতেন না।" নদীয়া বিভাগের কমিশনর লসিংটন সাহেবও প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; নীলদর্পণে ইঁহার উল্লেখ আছে।

ইণ্ডিগো কমিশনের মন্তব্য-প্রকাশের পর সুসময়ে নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশে বঙ্গদেশে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তদ্বিষয়ে "জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা" শীর্ষক প্রবন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"দূরেই বা যাই কেন, আমাদের স্মৃতিকালের মধ্যে এই বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে মহা উদ্দীপনার অবতারণা আমরা দেখিয়াছি।

যখন মানবের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইল। নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আমরা বৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা

উদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় হইল।"

নীলদর্পণ প্রকাশের দুই এক মাস পরে তখনকার মহানুভব খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক জেমস লং সাহেব, সীটনকার সাহেবের নিকট ইহার বিষয় উত্থাপিত করেন। সীটনকার সাহেব নীলদর্পণ-পাঠে চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এবং ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। লং সাহেব ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন, এবং ১৮৬১ সালের প্রারম্ভে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সীটনকার সাহেব বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের দপ্তরের মোহরাঙ্কিত করিয়া, কয়েক খণ্ড পুস্তক বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ-প্রকাশে নীলকর সাহেবেরা ও তাহাদিগের বন্ধুবর্গ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, এবং প্রকাশকের প্রতিশোধ লইবার জন্য নানাস্থানে অভিযোগের উদ্যোগ আরম্ভ করিল। নীলকরদিগের মুখপত্র ইংলিশম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক ওয়ালটার ব্রেট ফরিয়াদী হইয়া সুপ্রীম কোর্টে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই তারিখে নালিশ রুজু করিলেন। নীলদর্পণের ভূমিকায় "দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকবৃন্দ"কে উপলক্ষ করিয়া যে মন্তব্য আছে, তাহাই মানহানিকর বলিয়া অভিযোগের কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে নীলকর সম্বন্ধে নানা কথা উত্থাপিত হইয়াছিল। লং সাহেব জুরি কর্ত্তৃক অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, সুপ্রীম কোর্টের (তখন হাইকোর্ট হয় নাই) অন্যতম বিচারপতি সার মরডাণ্ট ওয়েলস, তাঁহার প্রতি এক মাস কারাদণ্ড ও সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডের হুকুম দিয়াছিলেন। মহাভারতের অনুবাদক স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ জরিমানার সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন।

নীলদর্পণ মোকদ্দমায় সফলকাম হইয়া নীলকর সাহেবেরা আইন সাহায্যে বিপক্ষদমনের চেষ্টা ফলপ্রদ বিবেচনা করিয়া আর দুইটি অভিযোগের অবতারণা করিলেন। প্রথম অভিযোগে স্বয়ং বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট সাহেব প্রতিবাদী। গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত নীল চাষ সম্বন্ধীয় কাগজে, জন ম্যাকআরথার নামক জনৈক নীলকরের বিরুদ্ধে এক অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়। ম্যাকআরথার উক্ত কাহিনী মানহানিকর বলিয়া গ্রাণ্ট সাহেবের নামে দশ হাজার টাকার দাবি দিয়া নালিশ করেন। প্রধান বিচারপতি পীকক সাহেবের বিচারে গ্রাণ্ট সাহেবকে দশ হাজার টাকার স্থলে এক টাকা খেসারত

দিতে হইয়াছিল দ্বিতীয় অভিযোগ "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে স্থিরীকৃত হয়। ইনি কায়মনোপ্রাণে প্রজার মঙ্গল সাধনে ব্রতী ছিলেন। নীলকরের অত্যাচার সাধারণের কর্ণগোচর করিতে কখন পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। এই সূত্রে তিনি অভিযুক্ত হয়েন। আর্চিবল্ড হিল্‌স (Archibald Hills) নামে এক জন নীলকর, হরমণী নামে এক সুন্দর কৃষক-কন্যার রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ বালিকা যখন জল আনিতে বাহির হয়, সেই সময়ে বলপূর্ব্বক কুঠীতে আনয়ন করাইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাকে নীল কুঠীতে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এবং সেখে পাল্কি করিয়া বিদায় করেন। এই ঘটনা "হিন্দুপেট্রিয়ট" প্রকাশিত করেন, এবং বালিকায় সতীত্ব সংহার করিয়াছে বলিয়া, হিল্‌সের প্রতি দোষারোপ করেন। সাহেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। যদিও নালিশের পর হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহাতে হিল্‌স সাহেবের প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই। সাহেব হরিশ্চন্দ্রের বিধবা পত্নীর নামে সেই মোকদ্দমা চালাইতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। মোকদ্দমা পরিশেষে আপোষে নিষ্পত্তি হয়। বলা বাহুল্য এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া নীলদর্পণে রোগ সাহেবের পাশবিক অত্যাচার অঙ্কিত হইয়াছে।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব। নীলদর্পণ রচনা কালে রচয়িতার নৌকা তরঙ্গসঙ্কুল ভীষণ সেখনায় জলমগ্ন হয়। গ্রন্থকার জীবন রক্ষার উপায় না দেখিয়া নৌকার ছইয়ের উপর দণ্ডায়মান হয়েন। মৃত্যুর ছায়া যেন তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল। তিনি তখন অনন্যোপায়, অসহায় বিপন্ন; কেবলমাত্র দীনের দুঃখ বিমোচনার্থ রচিত নীলদর্পণের প্রাক্ত পাণ্ডুলিপি তাঁহার হস্তে ছিল। তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; দীনের বন্ধু দীনবন্ধুর দয়ায় দীনের দুঃখদূরকারী রচনাই তাঁহার রক্ষাকবচ হইয়াছিল। সেই ভগ্ন নৌকা একেবারে জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বেই অন্য নৌকা আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করে। এই ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত নীলদর্পণের রচয়িতার জীবনীতে সবিস্তর বর্ণিত আছে। এই বর্ণনা পাঠ করিয়া ইণ্ডিগো কমিসনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সীটনকার সাহেব চমৎকৃত হইয়া এই পত্রিকার সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন,—("It seemed that *Baruna deva* saved his life—") "বোধ হয় বরুণদেব তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।"

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

নিষ্কৃতি।

—:০:—

১

সেই পুরাতন প্রেমেরই কথা।

শ্রাবণের সন্ধ্যায়, নির্জ্জন দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া, হেমেন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে সুধাকে বলিল, "আমি স্বপ্ন দেখেছি,—তুমিই পূর্ব্বজন্মে আমার স্ত্রী ছিলে।"

গৌরাঙ্গীর কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল।

হেম এক জন উচ্চশিক্ষিত যুবক—এখনও অবিবাহিত, সুচরিত্র; এবং শিক্ষার জন্য তাহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রতিবেশিনী সুধাও বিদুষী,—তাহার অপেক্ষা বয়সে সামান্য ছোট। দুই পরিবারে ঘনিষ্টতা খুব অধিক। যৌবনেও উভয়কে একত্র দেখিলে, কাহারও মনে সন্দেহের অবকাশ হইত না।

শান্ত ভরা সন্ধ্যায়, হেম এমন অতর্কিতভাবে তা'র স্বপ্নের কথা বলিল যে, সুধা ভয়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। দরিদ্র পিতা অর্থাভাবে যোগ্য-পাত্রে তাহাকে অর্পণ করিতে পারেন নাই। এক মূর্খ রূপহীন প্রৌঢ়ের সহিত তাহার পরিণয় হইয়াছিল। সেই স্বামীও স্বস্ব নষ্ট করিয়া, সুধার পিতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছে। সুতরাং তাহার মন বিষাদ ও হতাশায় পীড়িত ছিল। হেমকে সে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। তাহার কথায় এমন একটা বিশ্বাস ও বেদনার সুর ছিল যে, সুধা তাহা সব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল। কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া না আসিলে, হেমেন্দ্র দেখিতে পাইত, যুবতীর দু'টি কালো চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। হেম আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, সেখানে সুধার ছোট ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল।

দু' জনের মনে ঝড় বহিতেছিল। বাহিরে প্রশম শান্তি।

সে রাত্রি সুধার সুনিদ্রা হইল না। হেমের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আগা গোড়া শুনিবার জন্য তাহার মনে ভয়ানক কৌতূহল হইতেছিল। কেন সে একবার সব জিজ্ঞাসা করিল না? হাজার রকম উদ্ভট কল্পনায় তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

পর দিন সন্ধ্যাকালে হেম তাহাদের বাড়ীতে আসিলে, সুধা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রাজা মুণ্ড স্বপ্ন দেখেছিলে, তা' ত সব বলিলে না?"

হেম বিবর্ণনয়নে তাহার মুখে চাহিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমি অন্যায় করিয়াছি। তোমাকে যা বলা উচিত ছিল না, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বই লাভ নাই, তা' আমি কেন বলিতে গেলাম! আমায় ক্ষমা কর, সুধা!"

ইহার ফল হইল এই যে, হেমের জন্য সুধার মনে সমবেদনা আসিয়া উঠিল। সে হেমকে আরও বিশ্বাস করিল!

অল্পক্ষণমাত্র নীরব থাকিয়া সুধা বলিল, "যদি সবটা না বলিবে, তবে এ টুকু শুনাবে কেন? আমি কি এতই অপদার্থ অবিশ্বাসী যে, তোমার এই স্বপ্নটাও শুনিবার যোগ্য নই?"

হাসির পরিবর্ত্তে, তরুণীর মুখে একটু অভিমানের ছায়া পড়িল। তাহার দৃষ্টি ভূমিতলে অবনত ছিল।

হেম অনুচ্চস্বরে অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল, "এই স্বপ্নকে আমি মিথ্যা মনে করিতে পারি না। তুমি আছ জীবিত আছ যেমন সত্য, এও তেমনই। কিন্তু, তোমাকে সে কথা বলিবার অধিকার বুঝি আমার নাই। তুমি ত ছেলেমানুষ নও; আমাদের অবস্থা বুঝিয়া আমাকে মাপ কর।"

সুধা রাগিয়া উত্তর দিল, "স্বপ্ন আবার কবে সত্য হয়? আর যদিই বা সত্য হয়, আমাকে বলিবে না কেন? আমাকে যদি এত পর ভাব, তা' হ'লে তোমার উচিত, আমার সঙ্গে কথাই না কহা।"

হেমেন্দ্র কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "সুধা! তুমি আমার হৃদয় বুঝিতে পার নাই। আমি নিজে অসুখী। তোমার জীবনকেও কেন অশান্ত করিয়া তুলিব? আসিবার সময় আজ কাল করে নাই; দু'-তিন মাস আগে লেখিয়াছি। দেখা অবধি, আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তা' তুমি বুঝিবে না। মনের আবেগে, মুহূর্ত্তের অসংযমে, কালকে তোমাকে বলিয়া ফেলিয়াছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত। তোমাকে সকল কথা না বুঝিয়া থাকিতে কষ্ট হয়; অথচ তোমাকে বলা উচিতও নয়। তুমি অবিচার করিও না।"

সুধা ছলছলনেত্রে মৃদুস্বরে কৈফিয়ৎ অনুরোধ করিল,—"বল।"

কিন্তু তাহার সে মিনতি উপেক্ষা করা পুরুষের পক্ষে অসাধ্য। মুক্ত জানালার নির্ম্মল আকাশের দিকে, অতি অসহায় ভাবে, হেম একবার তাকাইয়া লইল;—আশ্রয় নাই। স্বপ্ন-কাহিনীর আসল কথাই সে প্রকাশ করিয়া

কেমিক্যাল! তাঁকা কথা না রহিলে, সুধাকে আঘাত দেওয়া হয়। তা সে কিছুতেই পারে না।

হেম দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিল, "তুমি জান, দু' তিন-মাস আগে আমি কাশীতে গিয়াছিলাম। প্রথম দিন সন্ধ্যায় আরতি দেখিয়া, বাসায় ফিরিয়া খাওয়া-দাওয়ার পর শুইলাম। সেই রাত্রেই আমি স্বপ্ন দেখি;—আমি যেন বিবাহ করিতে গেলাম। উৎসবের অন্ত নাই। রাত্রি—অনেক রাত্রে। চোখে ঘুম জড়াইয়া আসিতেছিল। স্ত্রী-আচারের সময় আমি পাত্রীর মুখে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম! ঠিক তোমার মত! প্রথমে ত বিশ্বাস করিতেই পারি নাই। চোখ মুছিয়া অনেকক্ষণ ভাল করিয়া দেখিলাম। তুমি নিশ্চয়ই! বিবাহের পর, সকলে আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে লইয়া গেল। পূজারি মহাশয় যখন আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন, আমি দেবতার বেদীর পিছনে যেন একটি অতি চমৎকার বাগান দেখিলাম। সেখানে একটি পরিচ্ছন্ন কুটীরে বসিয়া, দু'টি স্ত্রী-পুরুষে একটি ছোট ছেলেকে আদর করিতেছে! সবিস্ময়ে চিনিলাম, সে দু' জন,—তুমি আর আমি! তেমন বিশ্ব কিন্তু আমি পৃথিবীতে দেখি নাই। ভয়ে আমি ঘামিয়া গিয়াছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার অন্তরে কে যেন বলিল, 'পূর্ব্বজন্মে তুমি আর সুধা ঐরূপ ছিলে; ইহজন্মেও আমি তোমাদের মিলন করিয়া দিলাম।' আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। যত দিন কাশীতে ছিলাম, প্রত্যহ রাত্রে এই স্বপ্ন দেখিয়াছি! পাগলের মত কাশী ত্যাগ করিলাম!

সেই অবধি আমি নরকে রহিয়াছি। তোমার চিন্তা ছাড়া আমার অন্য কাজ নাই। প্রাণের এ বিষদাহ অসহ্য হইয়াছে। এখন আমার এই ভয় যে, যদি আমার কোনও কঠিন পীড়া হয়, তাহা হইলে বিকারের ঘোরে তোমার নাম আমার মুখ দিয়া বাহির হইবেই। নিষ্পাপ তোমাদের জোড়ে কি ভাবিবে? আমি তোমার জন্য ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি। বল সুধা, আমি কি করি? মৃত্যু ভিন্ন আমার উপায় কি আছে?"

হেমের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। সুধা কাতরকণ্ঠে "তুমি বিবাহ কর" বলিয়া, সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

২

গুরুজনদিগকে বলিবার পর, হেমের হৃদয় তার যেন অনেকটা লঘু

লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে প্রাণপণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—সুধার সঙ্গে আর দেখা করিবে না।

সুধার পিতা হেমকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি একরকমে বিশেষ ধনী ছিলেন; তখন জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্কও বেশ ছিল। এক অংশদায় গর্বিণীর হইয়া এখন নিজ গৃহেই তিনি সর্বদা থাকেন। হেম ছাড়া আর কোনও লোকের সংসর্গে তিনি আসিতে চান না। সেই হেমও সম্প্রতি আর তাঁহার কাছে আসে না। তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে, প্রত্যহ উত্তর পাইতেন, "হেম বাড়ীতে নাই।"

বিষাদিনী সুধা নীরবে গৃহকর্ম করিত। সে হেমের কি উপকার করিতে পারে? আপনার মানসিক অবস্থার বিচার করিতে সে বিমর্ষই হয় পাইত। হেমের দুঃখার্ত মুখ অহরহ তাহার মনে জাগিত না কি? কিন্তু সে যে হিন্দুনারী!

প্রায় এক মাস এই ভাবে কাটিল। হেম মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছিল, কাজে তাহা করিতে পারিল না। সুধাকে না দেখিয়া থাকা অসম্ভব। দেখিতে দোষ কি? নীরস জীবনে নারীর দু'টি মিষ্ট কথাও শুনিবে না? নিশ্চয়ই শুনিবে।

নিয়তির অঙ্গুলি-নির্দেশে, সেই ভরা সন্ধ্যায় আবার দু'জনের দেখা। যেন কত যুগ অতীত হইয়াছে! পরস্পরকে না দেখিয়া, তাহারা কি করিয়া এ ক'দিন জীবিত ছিল? চিন্তার নরক হইতে মুহূর্তের কি আশ্চর্য মুক্তি! হেম কোনও কথা না বলিয়া, সুধার কোমল হাতখানি শুধু নিজ হস্তে চাপিয়া ধরিল। তখন সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিতেছে। নির্মেঘ আকাশে তারকার শুভ্র-জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

যাহারা দু'টি প্রাণী নিঃসঙ্গ ছায়ার মত, জনহীন মুক্ত ছাদে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, কে বলিবে? তোমার আমার হিসাবে তাহা ধরাও হইবে না। তাহাদের নিকট কিন্তু উহার পরিমাণ ছিল না। অনন্ত বলিতে চাও, মিথ্যা বলা হইবে না; মুহূর্ত বলিতে চাও, তাহাও সত্য! তাহারা কিছুই জানে না। সুধার পিতা যখন বিতল গৃহ হইতে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে হেমকে ডাকিলেন, তখন তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। দ্রুতপদে উভয়ে নামিয়া আসিল।

সে রাত্রে হেমের সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। সুধার পিতার সহিত একত্র

প্রেমকে করিয়া যেমন যখন বিদায় হইল, তখন, মাতার মৃত্যুকালীন আদেশমত সুধাই তাহাকে অন্ধকার মৃত্যু-পথে প্রদীপ ধরিয়া আগে দেখাইল।

৩

উভয়েই ভালবাসিয়াছিল, অন্তরের এ মিলনে দোষ কি? হৃদয়ের প্রবল গতি কে আটকাইতে পারে? সেহের ভোগকে তাহারা পরম বলিয়াই গ্রহণ করে। কিন্তু আপনার মিলন তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখে না।

সুধা যখন স্বামীও হেমকে তাহার আদর্শ চরিত্রের জন্য ভালবাসিত। আর সে বিবাহের পর হইতে হেমকে পাওয়ালয়ে নিয়ত দেখিয়া, তাহাকে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং পরস্পরকে দেখিয়া, পরস্পরের সহিত আলাপ করিয়া, হেম আর সুধা যে সুখ পাইত; তাহা বাধাহীন, অপ্রতিহত, অমায়িক। কিন্তু সুধা হেমকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে পারিত না। সুযোগ পাইলেই, সে বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত; তাহার অন্তরে কপটতার লেশমাত্র ছিল না। অকৃত্রিম প্রেম-লাভ হইলে, কোনও নারী প্রেমাস্পদকে সে অনুরোধ করিতে পারে না। কিন্তু, হেম বলিত,—দ্বিতীয় নারীকে ভালবাসা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এমনই করিয়া দুটি সুখী প্রাণীর দিন কাটিতে লাগিল। সে নূতন জগতে আর কেহ নাই—কেবল একটি সন্ধ্যামণি লতা, আর একটি শুশ্রূষিণী মাতা। এ প্রণয়ের পরিণাম কি হইবে, তাহা তাহারও ভাবিবার আবশ্যক ছিল না।

৪

ইতিমধ্যে সুধার নিকট আর্থী একটি চাকুরীর সুবিধা করিয়া লইল। দূরস্থ রেলুনে তাহার একটি কেরাণীগিরি জুটিয়াছে। অর্থের অসচ্ছল অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল। সে স্ত্রীকে লইয়া রেঙ্গুন যাওয়াই স্থির করিল। তাহাদের সন্তান হয় নাই—দু' জনে নির্ঝঞ্ঝাটে চলিয়া যাইবে।

এই আকস্মিক বিচ্ছেদের আশঙ্কায় দুটি সহিষ্ণু অসহায় প্রাণী মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতেছিল। হায় প্রেম! তাহাদের এটুকু সুখও সহিল না? তাহাদের শুদ্ধ ভাষা কে বুঝিবে? এ নির্দ্দয় জগতে করুণা কোথায়?

সেই অশ্রুসিক্ত কথা বলিবার পর হেম এক দিনও সুধাকে প্রেমের একটি কথাও বলে নাই। কিন্তু আজ আসন্ন বিদায়ের সময় সে মনের সমস্ত বল

ধরাইয়া। উন্মাদের মত ব্যাকুলভাবে সুধাকে বলিল,—"তুমি কোন্ প্রাণে যাইবে? এ হতভাগাকে কি বলিয়া ত্যাগ করিবে? আমি সমাজ মানি না—তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

অশ্রুমুখী সুধা টুঙ্ক্ সাজাইতে সাজাইতে বলিল "তাও কি সম্ভব? আমার মত একটা তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্য তুমি তোমার বহুমূল্য জীবন নষ্ট করিতে চাও? স্বামীর সঙ্গে না যাইয়া আমার কি উপায় আছে? তুমি পুরুষ; দু' দিনে আমাকে ভুলিতে পারিবে। শুধু একবার চেষ্টা কর। তুমি বিবাহ কর।"

হেম তাহার কথায় কর্ণপাতমাত্র করিল না। মর্ম্মান্তিক যাতনায় তাহার নরীর মন অবসন্ন হইয়াছিল।

নিশাবসানে তাহাদিগকে জাহাজে উঠাইয়া দিতে আসিয়া হেম অনান্তিকে সুধাকে অনুরোধ করিল, "আমার চিঠির উত্তর দিও।"

উন্মনা সুধা নয়নের জল মুছিয়া, তাহাকে চিঠি লিখিতে নিষেধ করিয়া, স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল!

৫

যে বিচ্ছেদ অসহনীয় হইবে ভাবিয়া হেম এত কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও সহিতে হইল। দেড় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে সুধা-স্নিগ্ধ হাসি নাই, রমণীর সে মিষ্ট আলাপও নাই! তবুও জীবন কাটে!

সুধাকে কুশল প্রশ্ন করিয়া হেম বহু পত্র লিখিয়াছে। কিন্তু উত্তর আসিত, তাহার স্বামীর নিকট হইতে! দেড় বৎসরে সুধার নিজের অবকাশ হয় নাই? তৃষিতকে বারি-বিন্দু-দানেও নারীর এই নির্ম্মমতা!

কিন্তু আজ প্রভাতের 'ডাক' এ কার পত্র আনিয়া দিল? সুচির বাঞ্ছিত চিরপরিচিত হস্তলিপি! স্পন্দিতহৃদয়ে খামখানি খুলিয়া হেম পড়িতে লাগিল;—

রেঙ্গুন; শুক্রবার।

তোমাকে আমি কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা জানি না। দুর্বিনীত মন যে নামে তোমাকে ডাকিতে চায়, তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার আমার নাই। তাই, কোনও পাঠই লিখিলাম না।

তোমাকে আমি পত্র লিখিতে বারণ করিয়াছিলাম। তুমি সে অনুরোধ রক্ষা কর নাই। ভালই করেছ। নারী কতটুকু বল লইয়া,

বড় বড় পর্ব্ব যায়, তা আমি তখন বুঝি নেই। আমি কল্পিত তোমার স্নেহমাখানো ভূষিত পবিত্র মূর্ত্তি আমি সদা দেখিতেছি।

দেব! তোমার স্নেহলিপি না পাইলে অভাগিনী কি করিয়া এত দিন বাঁচিত? 'কেমন আছ?' শুধু এই প্রশ্নের ভিতর তোমার পরিপূর্ণ অন্তর প্রকাশ করিত। পুণ্যহারা কাঙ্গালিনী আমি! তোমার ঐশ্বর্য্যের মহিমা কি করিয়া বুঝিব?

অন্তর্য্যামী এই ক্ষুদ্র রমণীর মনকে কেন এ ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার ফেলিলেন, তুমি বলিতে পার কি? আমার শরীর মন জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে।

স্বপ্ন দেখিয়া তুমি আমাকে নিষ্পাপ স্নেহে, অকপটহীন প্রীতির গৌরবে ধন্য করিয়াছ। আর আমি? আমি কি করিয়াছি, জান? ইচ্ছা থাকিলেও আমি তোমাকে যাহা কখনও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই, সাক্ষাতে যাহা কখনও বলিতে পারিতাম না, তাহাই আজ লিখিয়া জানাইতেছি। তুমি শুনিয়া কি মনে করিবে, তাহা ভাবিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। আর না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শুন।

এ মন-ভাগিনী কুমারী-জীবন হইতেই, তোমার অলিখিত মূর্ত্তির নিকট, তোমার উদার চরিত্রের নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছিল। আমার বাসনা-মলিন পূজার ফুল তোমার চরণ-স্পর্শেরও যোগ্য নয়। বিস্মিত হইও না। মনের গোপন ব্যভিচারে যখন আমার দেহ পর্য্যন্ত লিপ্ত হইতেছিল, তখনও তুমি সেই সন্ধ্যায়, ভূমিকামাত্র না করিয়া স্বপ্নের কথা প্রথম প্রকাশ করিলে। আর যাহাই মনে হউক, আমি একটুও বিস্মিত হই নাই। তুমি জানি কেন, চিরদিন আমার মনে হইত, তুমি আমাকে জয় না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু কি অদৃষ্ট! বিধাতা তৃষাতুরের চক্ষের সম্মুখে মিষ্ট নির্ঝর-ধারা পাঠাইয়া দিয়া, তাঁর কাছে শুধু লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিলেন! অঞ্জলি পুরিয়া তৃষ্ণা মিটাইবার শক্তিমাত্র রহিল না। এ যন্ত্রণা কে বুঝিবে?

এত দিন তোমার কাছে এ সত্য গোপন রাখিয়া আমি মহা অপরাধী। তোমার নিষ্কলঙ্ক স্নেহের নিকটও আমি পরাজিত। কিন্তু এখন আমি নূতন বল পাইয়াছি। জীবনের মর্ম্মান্তিক যাতনার পর এক শান্তির আশায় আমি আজ উৎফুল্ল। আমার মুক্তির আর বিলম্ব নাই। কলঙ্কের মৃত্যু

মোহন বাঁশীর আহ্বান আমি শুনিয়াছি। আহ্বান ব্যর্থ হইবার নয়। আমার স্থির বিশ্বাস,—আমি শীঘ্রই নিষ্কৃতি পাইব।

নিরর্থক এ জীবনের শুধু একটিমাত্র কাজ বাকী আছে। তুমি না আসিলে, তাহা হইবে না। একবার এস।

আমি ইচ্ছা করিয়াই এতদিন বাবাকে মন্টুকে আমার পীড়ার কথা জানাইতে দিই নাই। আর কিন্তু দেরী করিতে পারি না। আজকের ডাকে তাঁদের কাছেও স্বামীর পত্র গিয়াছে। তুমি তাঁহাদিগকে আর আমার ভাইটিকে লইয়া শীঘ্র এখানে এস। কলিকাতায় ফিরিবার শক্তি আমার নাই—ইচ্ছাও নাই।

তোমাকে না পাইলে সে কাজ সম্পন্ন হইবে না। দেরী করিও না। ইতি—

চিরদুঃখিনী সুধা।

পুঃ—দুর্ব্বলতার জন্য তিন চার দিনে এ পত্র শেষ করিতে পারিয়াছি। বিলম্ব করিও না।

৬

সুধার পরিজনদিগের সহিত রেঙ্গুনে আসিয়া মর্ম্মাহত হেম দেখিল, পত্রের লিখিত কথা মিথ্যা নহে। সুধাকে দেখিলে আর চেনা যায় না। তাহার পাণ্ডুর মুখে মৃত্যুর কালিমা পড়িয়াছে।

তিন মাস পূর্ব্বে তাহার একটি পুত্রের জন্ম-সংবাদ বাড়ীতে পঁহুছিয়াছিল। কিন্তু প্রসবের পর হইতেই সে যে পীড়িত, এ সংবাদ সকলের অজ্ঞাত ছিল।

চিকিৎসক আরোগ্যের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুধাকে দেখিলে চোখে জল আসে! শীর্ণদেহে, বিষণ্ণনয়নে কখনও কখনও সে ছেলেটিকে কোলে লইয়া বসিত; দিনান্তে কখনও বা একবার বাতায়নে দাঁড়াইত আর বাকী সময় সে শয্যায় পড়িয়া থাকিত।

হেম সভয়ে দেখিল, ছেলেটি সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট শিশুর অবিকল প্রতিকৃতি! অব্যক্ত যেদনায় বিকল চিত্তে সুধার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া, নিজ জীবনের রহস্য ভাবিত। ডাক্তার বলিয়াছিল, সুধার হৃদয়-যন্ত্র কখন্ অচল হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পালা করিয়া সকলে তাহার নিকট রাত্রিদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিল।

এক দিন হেমকে বিরলে পাইয়া সুধা বলিল, "আমার অনুনয় তুমি

আমাও রাখিতে যাই! আমি অভাগিনী, বলিল কি তুমিও উপেক্ষা করিবে? আমি মৃত্যুমুখে তোমাকে যোড় হাতে আবার বলি,—বিবাহ কর; আমার কথা মনে রাখ, এই শিশুর মুখে চাহিয়া দেখ। আমি চলে' গেলে কে একে বাঁচাইবে? আর কারও হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তমনে মরিতে পারিব না। তুমি বল, গৃহে ফিরিয়াই বিবাহ করিয়া একটি মানুষ করিবে? বাছা যেন মার অভাব না বুঝিতে পারে!"

এই বলিয়া সে শিশুটিকে নিজ বক্ষের উপর রাখিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ক্রন্দিতে লাগিল। এবং কিছুক্ষণ পরে নির্ব্বাক হেমের ব্যথাক্লিষ্ট মুখে চাহিয়া, বিহ্বলকণ্ঠে বলিল, "তুমি আজ শপথ কর, আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর—বিবাহ করিবে; এই শিশুর মাথায় হাত রাখিয়া বল,—বিবাহ করিবে?"

উদ্‌ভ্রান্ত হেমেন্দ্র অশ্রুহীনচক্ষে, নির্জ্জীব পাষাণের মত, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "করিব—শপথ করিলাম!"

* * * *

এক মাস পরেই, সুধার মৃত্যু হইল। পঞ্চমীর চন্দ্রালোকের মত নীরবে, অতি ধীরে, পরম শান্তির মধ্যে, সুধার ক্ষীণ জীবন-শিখা নির্ব্বাপিত হইল।

৭

এবার সুমন্ত শিশুটিকে বক্ষে চাপিয়া হেম যখন রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য জাহাজে উঠিল, তখনও সুধার শোকসন্তপ্ত মাতার অশ্রুজল শুকায় নাই। কন্যাহারা জননীর আহারান্তরের মধ্যেও সে যেন কার—পরিচিত কণ্ঠে শুনিল,—"শপথ ভুলিও না!" ঘৃণ্যমনা শোকার্ত্ত যুবক মনে মনে শুধু বলিল, "নিষ্ঠুর! ভুলিবার পথ রাখিয়া গিয়াছ কি?"

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

লুপ্ত-ইতিহাস-উদ্ধারের উপায়।

—:০:—

চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, প্রাচীন ভারতের কোনও ইতিহাস নাই। ইউরোপীয়গণ বহুকাল ধরিয়া ভারতের ইতিহাস-উদ্ধারে ব্রতী আছেন। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবাসিগণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। গত ৩।৫ বৎসর হইতে বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাসের আলোচনা হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনা হয় না। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু ব্যতীত প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারে অপর কাহাকেও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। ইউরোপীয়গণ আমাদিগের প্রাচীন ইতিহাস-উদ্ধারের পথপ্রদর্শক। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহারা সময়ে সময়ে এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন যে, তাহা দেখিলে হাস্যের উদ্রেক হয়। বর্ত্তমান সময়ে লুপ্ত-ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টা ও উপাদান-সংগ্রহের প্রযত্ন বিশেষ আবশ্যক। আমাদিগের মনে যত দিন পর্য্যন্ত যথাপূর্ব্ববিস্মৃত অবস্থা ও গৌরব পুনরুদিত না হইবে, তত দিন আমাদিগের একতার চেষ্টা বৃথা। বর্ত্তমান কালে ভারতবাসী জনসাধারণের মনে ভারতের লুপ্ত গৌরবের ছায়ামাত্র জাগিয়াছে। আমরা এক্ষণে আমাদিগের পূর্ব্বাবস্থার যে বিবরণ দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত ও অত্যুক্তিপূর্ণ। কবির কাল্পনিক বর্ণনা ও অতিরঞ্জিত আখ্যায়িকা ঐতিহাসিক সত্যের দুর্ভেদ্য আবরণ হইয়া আছে। আবরণ ছিন্ন করিবার চেষ্টা এখনও হইতেছে না। ভারতের সকল প্রদেশেই এ বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশেও অনেক প্রথিতনামা পণ্ডিত ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন; কিন্তু সে আলোক কখনও সাধারণের নয়নগোচর হয় নাই। কখনও কখনও সাময়িক সাহিত্যে ইতিহাস-উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়, কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কখনও কাহাকেও আলোচনা করিতে দেখি নাই। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বি. এ. পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে শুনিয়াছি। কিন্তু ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের প্রাচীন ইতিহাস (V. A. Smith's Early History of India) কিরূপে পঠিত হইতেছে বা হইবে, তাহা জানিতে পারি নাই।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বলিয়া গিয়াছেন,—'আলেকজান্দারের আক্রমণের পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় ঘটনারই কালনির্দ্দেশ করা যায় না।' চত্বারিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে অধ্যাপক কাউয়েল বলিয়া গিয়াছেন যে,—মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বের কোনও ঘটনারই কালনির্দ্দেশ করা যায় না। ইহার পর ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বহুকালব্যাপী পরিশ্রমের ফলস্বরূপ লুপ্ত ইতিহাসের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণার ফল বিশেষরূপে বিশ্লেষণ না করিয়া ভারতবাসীর গ্রহণ করা উচিত নহে। এই প্রবন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত ইতিহাস-উদ্ধারের উপায় জনসাধারণের-গোচর করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা ও শ্রীযুক্ত স্মিথের রচিত ইতিহাসের মুখবন্ধ অনেকেরই কঠিন বোধ হইবে। তাহার কারণ, এগুলি বিশেষজ্ঞগণের জন্য লিখিত। শ্রীযুত স্মিথের ইতিহাসে বুদ্ধের জন্মকাল হইতে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ আলোচিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের ঘটনাসমূহ এখনও তমসাচ্ছন্ন। উপাখ্যান ও জনপ্রবাদই এই সময়ের মূল। বৌদ্ধ সাহিত্য ও খোদিত লিপি ও মুদ্রা হইতে বুদ্ধের জন্মের পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস অত্যন্ত দুরূহ, এবং তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। বুদ্ধের জন্ম হইতে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস পুনর্গঠনের উপাদান ;—

(১) সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য ঃ—

(ক) পালি সাহিত্য ;—ত্রিপিটকে গৌতম বুদ্ধের সম-সাময়িক অনেক ঘটনা জ্ঞাত হওয়া যায়। সিংহলের মহাবংশ ও দীপবংশ নামক ইতিহাসদ্বয়ে ভারতীয় ঘটনাসমূহের প্রচুর উল্লেখ আছে।

(খ) সংস্কৃত সাহিত্য ;—সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত ইতিহাস একখানিমাত্র। ইহা সর্ব্বজনপরিচিত রাজতরঙ্গিণী। কিন্তু ইহার সমকালীন ঘটনা ব্যতীত অন্য সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে ইহা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক স্থলে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং উহাতে ইতিহাস-রচনার বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছে। বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষচরিত ও বিহ্লণদেব-রচিত বিক্রমাঙ্কচরিত প্রভৃতি গ্রন্থাবলী ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ।

(গ) জৈন-সাহিত্যের অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত ও

পালি সাহিত্য অপেক্ষা জৈন সাহিত্য অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। প্রাকৃতে লিখিত মেরুতুঙ্গ প্রমুখ ইতিহাসকারগণের অনেকখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জৈন সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রচুর উল্লেখ আছে। নূতন আবিষ্কারে প্রতিদিন ইতিহাসের কলেবর পুষ্ট হইতেছে।

(২) বিদেশীয় সাহিত্যে ভারতীয় ঘটনাসমূহের উল্লেখ :—

(ক) বিদেশীয় গ্রন্থকারগণের মধ্যে হেরোডোটাস্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এতদ্ব্যতীত আলেকজান্দারের সহযাত্রিগণ ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণের দূত-সমূহ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রীক্‌গণের ভারত-বর্ণনার অতিসামান্য অংশ এখন পাওয়া যায়, এবং যাহা পাওয়া যায়, তাহাও অতিরঞ্জিত বর্ণনামাত্র।

(খ) চীনদেশীয় ইতিহাস গ্রন্থে ও পর্য্যটকগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ বৃত্তান্তে ভারতীয় ঘটনাসমূহের প্রভূত উল্লেখ আছে। সুঙ্-য়ুন্, হিউয়েন-থসং, ফা-হিয়েন্, ইচিং প্রভৃতি পর্য্যটকগণের ও মু-মাশিন্ পান্‌কু, মাটোয়ানলিন্ প্রভৃতি ইতিহাসকারগণের গ্রন্থে ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বহু উল্লেখ দেখা যায়।

(গ) মুসলমান ইতিহাসকারগণও ভারতসম্বন্ধীয় অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তহকিক-ই-হিন্দ্ প্রণেতা আবু রিহান্ (আল্‌বেরুণী) বর্ত্তমান কালে বিদ্বৎ-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। আরব ইতিহাসকারগণ ক্লাসির কর্ত্তৃক সিন্ধু-বিজয়ের ঘটনা ও তুর্কি ইতিহাসবেত্তৃগণ ভারতবিজয়-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

—(৩) খোদিত লিপি :—

ভারতীয় খোদিত লিপিসমূহে বহুবিধ লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে :—

(ক) প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি ও তাহা-হইতে উদ্ভূত লিপিসমূহ ;

(খ) খরোষ্ঠী লিপি ;—ইহা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয়। পারসীক অধিকারকালে উত্তর-ভারতে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়।

(গ) প্রাচীন তামিল লিপি ;—ইহার ব্যবহার দাক্ষিণাত্যেই দেখা যায়।

(ঘ) ভুবন্ধ লিপি;—হূণাধিকারসময়ে এই লিপি ব্যবহৃত হইত, অনুমান হয়।

(ঙ) চীন লিপি;—চীন পর্য্যটকগণ ভারতে আসিয়া তীর্থস্থানে স্বীয় লিপি উৎকীর্ণ করাইতেন, জানা যায়। ইহার কতকগুলি বুদ্ধগয়ার ধ্বংসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(চ) ব্রহ্মদেশীয় পর্ব্বতটঙ্কণদেশে অনেকগুলি প্রস্তরলিপি দুর্গগর্ভে আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে ব্রহ্মদেশীয় অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ছ) প্রাচীন কপিলবস্তুর ধ্বংসাবশেষমধ্যে তিব্বতীয় অক্ষরে কোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে।

(জ) কতকগুলি অতি প্রাচীন কোদিত লিপিতে এক প্রকার অক্ষর দেখা যায়; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইগুলিকে "শঙ্খলিপি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ভারতীয় কোদিত লিপিসমূহে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, রাজাদেশ, দান, নাটক, প্রেমের কবিতা ও অশ্লীল উক্তি প্রভৃতি অনেক বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ কোদিত লিপিই দান, দেবমূর্ত্তি, বা মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও বিজয়-কাহিনীর স্মরণার্থ কোদিত হইয়াছিল। ভারতীয় কোদিত লিপিসমূহের অধিকাংশই ভাম্রে বা প্রস্তরে উৎকীর্ণ। কিন্তু স্থানে স্থানে সুবর্ণ, রৌপ্য, মণি মুক্তাদিতেও অক্ষর কোদিত আছে। ডাক্তার হর্ণলি খোটানে সম্প্রতি কতকগুলি কাষ্ঠফলক আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে খরোষ্ঠী অক্ষর কোদিত আছে।

(৪) প্রাচীন মুদ্রা;—মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক ভারতীয় মুদ্রাসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।—

(ক) সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে কার্ষাপণ বা কাহাপণ নামে উল্লিখিত চতুষ্কোণ তাম্রখণ্ড। ইহাই ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রা। ইহাতে সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাঙ্কণ হইত না। পরে দুই একটি জীবমূর্ত্তি অঙ্কিত হইত। খ্রীক্-অধিকারের পরে ইহাতে এক বা ততোধিক অক্ষর মুদ্রিত হইত। পরে এই প্রকার মুদ্রা "প্রাচীন আকারের মুদ্রা" নামে কথিত হইবে।

(খ) খ্রীক্, পারসীক ও মুসলমান বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত মুদ্রা;—

(অ) খ্রীক বিজেতৃগণ ভারতে গ্রীসদেশীয় মুদ্রার অনুকরণে বহুসংখ্যক মুদ্রা অঙ্কিত করেন। ভারতীয় মুদ্রাসমূহের মধ্যে এইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। শকাধিকারকালে রাজগণ ভারতীয় খ্রীক রাজগণের মুদ্রার অনুকরণ করিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটগণও খ্রীক মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রাঙ্কণ করিতেন বলিয়া অনুমান হয়।

(আ) কুষাণ রাজ্যকালের শেষভাগে ও হূণাধিকারকালে ভারতে পারস্যের সাসানীয় সম্রাটগণের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রাঙ্কণ হইত।

(ই) কাশিম কর্ত্তৃক সিন্ধু-বিজয়ের পর সিন্ধু দেশে বহুকাল আরবীয় অক্ষরে ক্ষোদিত লিপিযুক্ত মুদ্রা ব্যবহৃত হইত।

(গ) প্রাচীনাকারের ভারতীয় মুদ্রা ও বিদেশীয় মুদ্রার সংমিশ্রণে উদ্ভূত মুদ্রা ;—

(অ) খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গান্ধার ও পঞ্চনদ পারসীক-সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। এই সময়ের কতকগুলি পারসীক মুদ্রায় খরোষ্ঠী অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়।

(আ) কাশগড় ও খোটানে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এক প্রকার মুদ্রা অঙ্কিত হইত ; ইহার এক পার্শ্বে চীন লিপিতে ও চীন ভাষায় ও অপর পার্শ্বে খরোষ্ঠী লিপিতে ও প্রাকৃত ভাষায় ক্ষোদিত লিপি আছে।

(ই) গ্রীক্-অধিকারের মধ্যভাগে অগথুক্লেয়, পন্তলেয়ন প্রভৃতি রাজগণ প্রাচীন আকারের ভারতীয় মুদ্রার ন্যায় চতুষ্কোণ মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। ইহার এক পার্শ্বে গ্রীক ভাষায় ও গ্রীক লিপিতে এবং অপর পার্শ্বে খরোষ্ঠী লিপিতে ও প্রাকৃত ভাষায় ক্ষোদিত লিপি আছে। কোনও কোনও মুদ্রায় ব্রাহ্মী লিপিও ব্যবহৃত হইত। সৌরাষ্ট্রের মহক্ষত্রপ নহপানের ও চষ্টনের মুদ্রাসমূহে গ্রীক্, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী, তিন লিপিই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ঈ) কুষাণ সম্রাটগণ প্রথমে মুদ্রায় গ্রীক লিপি ও পারস্য ভাষা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু কুষাণ রাজ্যকালের শেষভাগে গ্রীক লিপি ও পারস্য ভাষা, এবং ব্রাহ্মী লিপি ও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত।

(উ) মুসলমান-বিজয়ের প্রারম্ভে দিল্লীর পাঠান সম্রাট-গণের মুদ্রায় আরবীয় লিপি ও ভাষার, এবং নাগরী লিপি ও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

ইতিহাস-গঠনের উপাদানসমূহের যৎসামান্য বিবরণ প্রদত্ত হইল। পরে প্রত্যেক বিভাগের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারত।

তৃতীয় অধ্যায়।

Sculpture is the imitative art in which man seems to have made the first trial of his own talents.—*Robertson*.

মানবমাত্রেরই ইহাই ধর্ম্ম যে, সে প্রথমে নিজের অভাবগুলি দূর করিতে চাহে। অভাবের পীড়ন যখন অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়, তখন মানুষ শিল্পনৈপুণ্যলাভেচ্ছায় নানা কর্ম্মে ব্রতী হয়। সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহাই দেখা যাইবে যে, শিল্পনৈপুণ্যলাভেচ্ছু মানব প্রথমেই পুরদ্বারাদি সুসজ্জিত ও সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করে। প্রাচীন ভারত যে স্থাপত্যে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

প্রাত্যহিক জীবনের দৈনিক প্রয়োজনের জন্য মানুষ যে সকল শিল্পকলার অনুশীলন করিয়া থাকে, সে সমুদয়ে সকল সময়ে তাহার রচনা-কৌশলের পরীক্ষা হয় না। যে শিল্প যুগযুগান্তরের জন্য, যাহা শতাধিক বর্ষ ধরিয়া রচয়িতার কর্ম্মকুশলতার অবিনশ্বর সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে, শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া যাহা দেশীয় ও বৈদেশিকদিগের অবশ্য পরীক্ষণীয় হইয়া থাকে, তাহাই শিল্পীর নিপুণতার প্রমাণ দিয়া থাকে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, সেকালের মন্দিরাদি ও দেবমূর্ত্তিনিচয় ও নানা স্থানের প্রাচীন দুর্গাদি আজও ভারতবর্ষের অতিবৃহৎ স্থাপত্যের মৌন অথচ জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসিগণ যখন কাননে কান্তারে বিচরণ করিত, তখন তাহারা আত্মরক্ষার জন্য গিরিগুহায়, অথবা পর্ণকুটীরে, কিংবা অন্যতম সাময় ভূগর্ভে আশ্রয় লইত। তাহার পর যখন তাহাদিগের হৃদয় ললিত-কলার নবারুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা গিরিকন্দর পরিত্যাগ করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। এলিফ্যাণ্টা দ্বীপের কোরিত মূর্ত্তিগুলি ও পর্ব্বতগর্ভস্থ মন্দিরাদি তাই ভারতের অতি প্রাচীন কালের শিল্প স্থাপত্যের প্রধান নিদর্শন।

শিল্পিতকলা আদর্শসাপেক্ষ। বহু দিনের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ সেই আদর্শ লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃতি রাণী মানবের চিন্তবিস্ফারিত নয়নের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপিত করেন, মানুষ সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াই নয়না ভিরাম অনিন্দ্যকলার মূর্ত্তি-রচনায় প্রবৃত্ত হয়। সাধনা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনই সিদ্ধিলাভ ঘটে। কিন্তু এলিফ্যাণ্টার দৃশ্যাবলী দেখিয়া সভ্যতার এই সমোহনযুগের, সি ইংরাজ, কি ভারতবাসী, সকলেই বিস্মিত হইয়া থাকেন। সমুদ্র সৈনের লৌহকঠিন স্তূপপঞ্জর ভগ্ন করিয়া যে কালের ভারতবাসী যে কিরূপে সেই বিরাট মূর্ত্তিগুলি খোদিত করিয়াছিল, উপরিস্থিত যোজন-বিস্তৃত প্রস্তররাশি রক্ষা করিবার জন্য কিরূপে গর্ভস্থ মন্দিরমধ্যে বিরাট স্তম্ভাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, অধুনা ডিনামাইট না হইলে যে পাষাণ ভাঙ্গে না, কিরূপে তাহা ভাঙ্গিয়াছিল, এ সকল কথা মনে করিতে গেলে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ের উদয় হয়। এলিফ্যাণ্টা ও সল্‌সেটি দ্বীপের মন্দিরাদি তাই আজিও সে কালের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতার পরিচয় দিতেছে। সমগ্র পৃথিবীর যে কোনও দেশের প্রাচীন কারুকার্য্যের সহিত তুলনা করিলেও এলিফ্যাণ্টা বা সল্‌সেটির গৌরব খর্ব্ব হইবার নহে। তাই মনে হয়, মানুষ যে যুগে শিল্প রক্ষা করিতে শিক্ষা করে নাই, উক্ত মন্দিরাদি সে যুগের নহে। মানুষ যখন সমাজনিবদ্ধ হইয়া এক জনের নেতৃত্বে কার্য্য করিতে জানিত না, ঐ সকল মহৎ কার্য্য সে যুগে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

যাঁহারা গ্রীক ভাস্কর্য্যের ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কত দিনের কত যুগের সাধনার পর ভাস্কর প্রস্তরগাত্রে মানবমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পারসী পোলীসের রাজ-প্রাসাদে, অথবা মিসরে শিল্প ভাস্কর্য্যের যে সকল নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়, এলিফ্যাণ্টা বা সল্‌সেটির ভাস্কর্য্য তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। প্রস্তরে খোদিত সেই সকল বিরাট বিশাল মূর্ত্তিগুলি যাঁহারা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, কোনও কোনও মূর্ত্তির বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রের অনুকরণে নির্ম্মিত বিলাময় যজ্ঞসূত্রের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সুতরাং আমাদের জাতিভেদের নৈষ্ঠিক বা পৌরাণিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দিলেও, যে যুগে ভারতবর্ষে জাতিভেদপ্রথা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইলোরা, বা এলিফ্যাণ্টা, বা সল্‌সেটির ভাস্কর্য্য যে সেই যুগের, ইহাতে আর

সন্দেহ থাকে না। যদি তাহাই হয়, তবে তখন অধুনা-সুসভ্য ইয়ুরোপীয়গণ কোথায় ছিলেন, এবং কিরূপে বাস করিতেছিলেন? তাই সে দিন (১২ই মে, ১৯০৭) Chandos Hall-এ বক্তৃতা-কালে শ্রীযুক্ত হাইণ্ডম্যান (H. M. Hyndman) বলিয়াছেন,—"We owe much of our sciences, of much of our mathematics, much of our *religion* and much of our laws to these people (Indians) who cannot govern themselves!"*

ধর্ম্ম দুই মূর্ত্তিতে আসিয়া মানুষকে দেখা দেন। শিশু মানবসমাজ প্রথমে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি জানিতে পায় না। তাই তাহারা তখন কতকগুলি মূর্ত্তিকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া পূজা করিতে থাকে। শুধু ভারতবর্ষে নহে—সকল দেশেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর মানুষ যখন ধীরে ধীরে ধর্ম্মকে চিনিতে চায়, তখন তাহার নবজীবনের সূচনা হয়। সেই নবজীবন লাভ করিয়া মানুষ তখন মহামহিমময় চিরগৌরবমণ্ডিত নিখিলাশ্রিত দেবতার জন্য মন্দিরাদি গড়িতে থাকে। তখন পর্য্যন্ত মানুষের হৃদয়ে শিল্পি-কলার পূর্ণ বিকাশ হয় না। সে তখন কেবল ইহাই বুঝিতে পারে যে, দেবতা অতি মহান্, অতি বিরাট, আর সে নিজে একান্ত হীন ও নিতান্ত ক্ষুদ্র। তাই তাহার মন্দিরাদিও তখন কোনও অতি উচ্চ, অতি বৃহৎ একটা প্রকাণ্ড মনুমেণ্টের আকার ধারণ করে। তাহার গাত্রে শিল্পি-কলার বিশেষ পরিচয় তখন পাওয়া যায় না। মানব ক্রমে যত সুশিক্ষিত হইতে থাকে, যখন এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমনাগমন করিয়া নূতন নূতন আদর্শ—নবীন আলেখ্যসমূহ সংগ্রহ করিতে পারে, তখনই তাহার দেবমন্দিরগুলি কারুকার্য্যময় হইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। সে আর তখন তাহার দেবতাকে সৌন্দর্য্যবিহীন পাষাণস্তূপস্বরূপে স্থাপিত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাই আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনের যতই সুবিধা ঘটিয়াছিল, ততই ক্ষোভাহীন সৌন্দর্য্য-বিহীন মন্দিরাদি লুপ্ত হইয়াছিল;—কারুকার্য্যময় দেবগৃহ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। পুরীর মন্দির, ভুবনেশ্বরের কারুকার্য্যময় স্থাপত্য, কোণার্কের

* Mr. H. M. Hyndman's speech as reported in the *Bengalee* dated July 2 (Biweekly).

ক্ষ্যাবলী, দাক্ষিণাত্যের দেবগৃহাদি তাই আজিও জগতে অতুলনীয়। মাদ্রাজের এক জন প্রধান ইঞ্জিনীয়ার * তাই একবার বলিয়াছিলেন,—গঙ্গাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ অবধি ভারতবর্ষের সকল স্থানে অতিপ্রাচীন সভ্যতার, শিল্পবিদ্যার ও কর্ম্মনিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা যে সকল কারুকার্য্য হইতেছে, প্রাচীন ভারতবর্ষের অতিপ্রাচীন কারুকার্য্য—শুধু সৌন্দর্য্যে ও ভাস্করের অস্ত্র-চালনায় নহে, নির্ম্মাণব্যয়ে ও রচনাকৌশলেও, তৎসমুদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখনই মনে হয় যে, সেই সকল মন্দিরাদির উপকরণগুলি কত দূর দেশ হইতে আনীত হইয়া কত উচ্চে উত্তোলিত হইয়াছে, তখনই ভারতীয় কারুকার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। †

করমণ্ডল তীরে পোর্টোনোভোর নিকটে চিনিআমব্রাগের বিখ্যাত মন্দির। সেই মন্দিরের সিংহদ্বার দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ষাটি হস্ত উচ্চ একটি পর্ব্বতের নিম্নে সেই বিরাট সিংহদ্বার শোভা পাইতেছে। প্রায় চতুর্দ্দশহস্তপরিমিত দীর্ঘ ও দুই হস্ত পরিমাণ বেধের স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড দিয়া সেই দ্বার গঠিত। নানাপ্রকার কারুকার্য্যময় ভাস্করের গাত্রে সমাবৃত হইয়া ভারতপূজ্য দেবমন্দিরের সিংহদ্বার আজিও প্রাচীন ভারতের অনন্ত গৌরব প্রকাশ করিতেছে। মন্দিরের কোনও কোনও স্থানের সূক্ষ্ম কার্য্য এতই সুন্দর যে, নিতান্ত সুদক্ষ শিল্পীও উহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন। ‡ শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দির আবার সর্ব্বাংশে চিনিআমব্রাগের মন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন ভারত ভিন্ন এমন দৃশ্য কি পৃথিবীর আর কোনও স্থানে আছে?

---

* Colonel Call.

† It may safely be pronounced that no part of the world has more marks of antiquity for arts, sciences, and civilization, than the peninsula of India, from the Ganges to Cape Comorin. I think the carvings on some of the Pagodas and choultries, as well as the grandeur of the work, *exceeds anything executed now a days*, not only for the delicacy of the chisel, but the expense of construction, considering, in many instances, to what distances, the component parts were carried, and to what heights raised.

—*Colonel Call*

‡ Some of the ornamental parts are finished with an eloquence entitled to the admiration of the most ingenious artist.

— *W. Robertson.*

বিশাল ভারতবর্ষে যেমন সমতল ক্ষেত্রের অভাব নাই, তেমনই শৈল-শ্রেণীরও অভাব নাই। ভারতের অধিবাসিগণ তাই সেকালে এই সকল শৈলশ্রেণী অধিকার করিয়া সুরক্ষিত দুর্গের প্রয়োজন সম্পন্ন করিত। কিন্তু এ ভাব চিরকাল থাকিতে পারে না—চিরকাল ছিলও না। দেব-মন্দিরাদির যেমন ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল, দুর্গাদিরও তদ্রূপ। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ তাই পরিখাবেষ্টিত প্রাচীররক্ষিত সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবার জন্য সহরকোতোয়ালদিগকে আদেশ করিতেন। সেই সকল দুর্গ অস্ত্রে শস্ত্রে সুরক্ষিত থাকিয়া শত্রু দমন করিত,—দেশ রক্ষা করিত। পুণ্যতীর্থ কাশী হইতে অনতিদূরবর্ত্তী চুনারগড় গঙ্গা-নদীর তীরে নির্ম্মিত। আগরা হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ ব্যবধানে গোয়ালিয়রের বিখ্যাত দুর্গ আজি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজিও ইংরাজ পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন, আলীর দুর্ভেদ্য। টিপু সুলতানের অধিকৃত আদোনী দুর্গের পরিচয় ইংরাজ বাহাদুর সম্যক অবগত আছেন। এতদ্ভিন্ন অপেক্ষাকৃত আধুনিক সুদৃঢ় দুর্গের ইতিহাস ইংরাজের ভারত-বিজয়-কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

দুর্গ বা দেবমন্দিরই যে ভারতবর্ষকে ইউরোপখণ্ডে পরিচিত করিয়াছিল, তাহা নহে। ভারতের পণ্যসম্ভারই তাহার পরিচয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। আজ এত কাল পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতৃগণ যে বয়ন-যন্ত্র বাঙ্গালায় ফেলিয়াছে, সেই যন্ত্র ও সূক্ষ্ম সূচিশিল্প ভারতবর্ষকে চিরপূজ্য করিয়াছিল। সে কালে সিন্ধু নদের তীরে যেরূপ অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত, তাহা হইতে তৎকালীন ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষের বস্ত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 'সিন্দন্'। ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো প্রমাণ দিতেছেন যে, ইউরোপের সহিত যে সময় ভারতের প্রথম পরিচয় হয়, সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষ বস্ত্ররঞ্জনবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। রোমকগণ নীল রঙ্গ অত্যন্ত ভালবাসিত; ভারতবর্ষ হইতে তাহারা সে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া নীল রঙ্গের নাম-করণ করিয়াছিল—'ইণ্ডিকম।' নীল রঙ্গের ন্যায় লৌহিত রঙ্গও ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।

পলাশীর যুদ্ধের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যখন পরিব্রাজক ট্যাভার্ণিয়ার এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে, কাশীধামের রেশমব্যবসায়িগণ কদলী বৃক্ষের ক্ষারসংযোগে পীতবর্ণ রেশমকে এরূপ শুভ্র করিয়া দিত যে, উহাকে প্যারেইটাইনের শুভ্র রেশম বলিয়া ভ্রম হইত;

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কার্পাস বস্ত্রও ভারতবাসিগণ অতি সুন্দর-রূপে রঞ্জিত করিত।

ভারতবর্ষের গোলকুণ্ডা চিরবিখ্যাত। ভারতবাসিগণ অতি কঠিন প্রস্তরাদিতে ও মরকতের উপর সেকালে সূক্ষ্ম ও সুন্দর খোদাই কার্য্য করিতে পারিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোনও কোনও ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে, এই বিদ্যা ভারতবর্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেকালে বহুমূল্য মরকতাদির উপর সংস্কৃত ভাষায় নানাবিধ বাক্য খোদিত হইত। খোদিত মরকতের তালিকাপুস্তকের মুখবন্ধে তাই কোনও ইউরোপীয় লেখক ভারতবর্ষের বহুতর গুণানুবাদ করিয়াছেন। *

চতুর্থ অধ্যায়।

To some of those products, although brought up in the intermediate marts of the Euphrates vally an Indian origin is plausibly ascribed—ivory of which Solomon made a great throne, his precious stones, and the three hundred sheilds of beaten gold, the traffic of the spice-merchants, the 'apes and peacocks' of his pleasure gardens, and, probably, the sandal wood pillars 'for the House of the Lord.'

—*W. W. Hunter.*

অতি দীর্ঘকালের চিন্তা, আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, প্রাচ্যের মলয়ানিলান্দোলিত কুঞ্জভবনে, ফুলপ্লাবিনী তরঙ্গিণীর শস্যশ্যামল সৈকতভূমে, দিগন্তপ্রসারী চির-উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরমেশ্বর প্রথমে মানুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনায়াসলব্ধ ফলে ফুলে জলে ও শস্যে পরিপুষ্ট হইয়া তাহারাই প্রথমে গান গাহিয়াছিল, কথা কহিয়াছিল, শিল্প বাণিজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীমধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম সভ্যতার আলোক উদ্ভূত হইয়া তমোময়ী বর্ব্বর-রজনীর নিবিড় অন্ধকার দূর করিয়া দিয়াছিল; জ্ঞান ও শিল্পের প্রথম প্রভাতে ভারতবর্ষই সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। † সেই মহাজাগরণের দিন যে সামগান ধ্বনিত হইয়া

* Raspe's introduction to Tassies' descriptive catalogue of engraved James as quoted by W. Robertson.

† .....and from the remains of sciences which were anciently cultivated as well as of arts which were anciently exercised in India, we may conclude it to be one of the first countries in which men made any considerable progress in that career.—*Robertson.*

ভারতভূমি মুখরিত করিয়াছিল, আজিও তাহার মৃদু প্রতিধ্বনি সুদূরের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ইংরাজের বাইবেল হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রতীচ্য নহে, প্রাচ্যই প্রথমে পণ্যাদিকে বহিয়া আনিয়া মানবের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিল; * তাই প্রাচ্য-বাণিজ্যের আদিম ইতিহাস বণিক-সংঘ বা Caravanএর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ। প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের যে মিলন ঘটিয়াছিল, এই বণিক-সংঘই তাহার অগ্রদূত। ইউফ্রেটিস্ নদীর তীর হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে যে সকল রৌদ্রতপ্ত বালুকাময় মরুভূমি অতিক্রম করিতে হয়, উষ্ট্রাদির ব্যবহার না জানিলে সে সকল মরুভূমি অতিক্রম করিয়া স্থলপথে বাণিজ্য-বিস্তার অসম্ভব হইত। ইতিহাস যত দিনের কথা বলিতে পারে, তাহা হইতে ইহাই জানিতে পারা যায় যে, আরব-উপসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন জাতিরাই এইরূপে উষ্ট্রাদির সাহায্যে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত। সহসা কেহ নিজের দেশ হইতে দূরদেশে একাকী গমনাগমন করিতে চাহিত না। তাহার পর যখন পরস্পরের সুবিধার জন্য বণিক-সংঘের সৃষ্টি হইল, তখন তাহারা দূর-দূরান্তরে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল।

ফারোয়ার (Pharoa) কন্যার সহিত সলোমনের পরিণয়কালে যে গান গীত হইয়াছিল, আমরা তাহাতেও তাই বণিক-সংঘের পরিচয় পাই। আমরা দেখিতে পাই যে, শতাধিক বণিক মরুভূমি অতিক্রম করিতেছে;—তাহাদিগের চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল পবনবিধূত হইয়া নীলাকাশ অন্ধকার করিয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল; বণিকগণ বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহাদিগের পণ্যাদি-রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সাহসিগণ নানা স্থানে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইল; প্রত্যেকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে তরবারি আপন আপন অংশোপরি স্থাপিত করিয়া রাত্রির মত বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিল। †

স্থলপথে দেশ হইতে দেশান্তরে গমনাগমনের সেকালে যতই সুবন্দোবস্ত থাকুক না কেন, কিছুকাল পরেই বণিক-জাতি দেখিল যে, সে পথ অত্যন্ত

---

* Genesis XII 17; XXIV 19, 11.

† Who is this that cometh out of the wilderness,
Like pillers of smoke?
Perfumed with myrrh and frankincense,
With all powders of the merchants, etc.

—Song of solomon. III c.

আয়াসসাধ্য, নিতান্ত বিপজ্জনক, এবং অত্যন্ত ব্যয়াপেক্ষ। মানুষের চিন্তাশীল মস্তিষ্ক তখন গমনাগমনের সহজ ও সরল পথের আবিষ্কারে ব্যস্ত হইল। যে ডোঙ্গা বা মাল্লাসে আরোহণ করিয়া বর্ব্বর মনুষ্য শত্রুনিপাতে ধাবিত হইত, সেই মাল্লাসকে জাহাজে পরিণত করিতে যুগযুগান্তরের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছিল। অনেক দিনের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মানুষ অবশেষে পোতসঞ্চালন শিক্ষা করিয়াছিল। *

যখন পোতসঞ্চালন কেবল স্বল্পাধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই সময়ে ভূমধ্যসাগর ও আরবসাগরই সর্ব্বপ্রথমে বাণিজ্যতরণী-সুশোভিত হইয়া আনন্দে গর্জ্জন করিয়াছিল। এতদুভয়ের ভৌগোলিক তত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয়েই ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার মিলন-কেন্দ্র হইবার উপযুক্ত। উভয়েরই তীরে সেই প্রাচীনকালেও অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতিগণ বাস করিত; উভয়ের বেলাভূমি অতিক্রম করিলেই সুদূর-বিস্তৃত উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রগুলি দিগন্তপ্রধাবিত হইয়া শোভা পাইত। তাই উভয়ের তীরনিবাসিগণ আপন আপন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এ চেষ্টা স্বাভাবিক। অভাবই মানুষের প্রধান ও প্রথম শিক্ষক। সেই বিজ্ঞ শিক্ষক তাহাদিগকে এক দেশ হইতে অপর দেশে লইয়া গিয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, মিশরীয়গণ ও ফিনিকগণ সর্ব্বপ্রথমে ভূমধ্যসাগরে তরণী ভাসাইয়াছিল। তাহাদিগের বাণিজ্য বহুকাল ভূমধ্যসাগরের তীরেই নিবদ্ধ ছিল না। আরব উপসাগরের তীরবর্ত্তী কতকগুলি বন্দর অধিকার করিয়া তাহারা বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধি করিয়াছিল। ইতিহাসে প্রকাশ, তাহারাই প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, ভারতের সহিত ইউরোপের, অথবা প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের মিলন ঘটাইয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্রাদির প্রমাণ গ্রহণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্ব-প্রাচীন ঋগ্বেদেও "শতারিত্রং নাবং" ইত্যাদি ঋকে নৌযানের উল্লেখ আছে। সে সকল তরণী সমুদ্রপথে গমনাগমন করিত। মহাভারত যদিও ঋগ্বেদের তুলনায় আধুনিক, কিন্তু উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। তাহাতেও যন্ত্রযুক্ত নৌকার কথা শুনিতে পাই। রামায়ণে লিখিত নালিকাস্ত্র প্রভৃতি ও মহাভারতের "মনোমারুতগামিনী সর্ব্ব-

* Robertson's History of America, Vol. I.

ব্যাতনামা সমুদ্রযাত্রী নৌকা"র কথা আমরা ইংরাজী শিক্ষার মহিমায় কল্পনা বলিয়া মনে করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক কেনেডী আমাদিগকে বলিতেছেন, যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০০ বৎসরের পূর্ব্বে ভারতীয় বাণিজ্য-তরণীর কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কেনেডীর পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ তাহা বলেন না। ঐতিহাসিক হণ্টার বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বাণিজ্য-পোত সেকালে পারস্য উপসাগরে গমন করিত, এবং কাল্‌ডিয়ার পণ্যবীথিকায় দুর্ম্মূল্য পণ্যাদি বিক্রয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত। তিনি বাইবেল গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।*

কোনও কোনও প্রাচীন ঐতিহাসিক বলেন যে, মিশরের নৃপতি সিসষ্ট্রিস্ জলপথে আগমন করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, এবং মিশরে ভারতে পরিচয় ঘটাইয়াছিলেন। এ কথা বিশ্বাস করিতে অনেকটা দুঃসাহস আবশ্যক। হেরডোটস্ মিশরের সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মেম্ফিস, হেলিওপলিস্ ও পীরীয় পণ্ডিতগণ হেরডোটস্‌কে মিশর-সংক্রান্ত সকল সংবাদ প্রদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার ইতিহাসে নৃপতি সিসষ্ট্রিস্ কর্ত্তৃক ভারত-বিজয়ের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দিওদোরস্ সিকিউলস্ এই বিজয়কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিই বলিতেছেন,—'মিশরীয়' ঐতিহাসিকগণ যে সকল সময়েই সত্যের আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা নহে; যে কাহিনীকীর্ত্তনে দেশের সম্ভ্রমবৃদ্ধি হইতে পারে, তাঁহারা সেরূপ কথাও কহিতেন। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, গ্রীক ঐতিহাসিক ও মিশরীয় ঐতিহাসিকগণ রাজা সিসষ্ট্রিসের বিভিন্ন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সিসষ্ট্রিসের ভারত-বিজয়-কাহিনী বিশ্বাস করিতে যে দুঃসাহসের প্রয়োজন নাই, তাহা কিরূপে বলিব?

ইতিহাস কহে যে, রাজা সিসষ্ট্রিস্ মিশরবাসীদিগকে বণিক করিয়া তুলিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এবং অনেক চেষ্টা করিয়া

* "Whose cry is in the Ships"—Isaiah L iii, 14.
Mr. J. Kennedy, in a monograph which forms a model of destructive criticism, finds no positive evidence of an Indian *sea-trade* with Western Asia before 700 B. C: *Journal of the Royal Asiatic Society* April 1898. Previous autority is on the side of an earlier period.—*Hunter.*

অবশেষে চারি শত রণতরী নির্ম্মাণ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার রণতরীসমূহ আরব উপসাগর হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সমুদ্রের তৃভাগ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মিশরীয়গণ প্রথমে সমুদ্রযাত্রার একান্তই বীতশ্রদ্ধ ছিল। সমুদ্রযাত্রা তাহাদিগের ধর্ম্মানুশাসনের অনুমোদিত ছিল না। সিসষ্ট্রিস্ মহা-পরাক্রান্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি যে কয়েক বৎসরের চেষ্টাতেই একটা সমগ্র জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগের হৃদয় হইতে সমুদ্র-ভীতি দূর করিয়াছিলেন, এ কাহিনী সন্দেহজনক। সেকালে চারি শত রণতরী সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধযাত্রা যে কিরূপ দুষ্কর ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ডিওডোরস্ বলেন যে, নৃপতি সিসষ্ট্রিসের পিতা পুত্রের জন্মদিন হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে, শিশু যখন মানুষ হইবে, তখন সমুদ্রপথে দিগ্বিজয় করিবে। ভবিষ্যতে সিসষ্ট্রিস যাহাতে সাজান-সংগ্রহে বৃথা কালক্ষেপ না করেন, তাই তাঁহার পিতার আদেশে সিসষ্ট্রিসের জন্মদিন সমগ্র মিশরে যতগুলি বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সিসষ্ট্রিসের সহিত রক্ষিত হইয়া একরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক বলেন যে, শিশু সিসষ্ট্রিস্ মানুষ হইয়া যখন ভারত বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন এই কারণেই তাঁহার সহিত সপ্তদশ শত সৈনিক পুরুষ অগ্রসর হইয়াছিল!

সিসষ্ট্রিস্ যখন যুদ্ধাভিযান করেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বর্ষ ছিল বলিয়া কথিত হয়। ঐতিহাসিক গণেট বলিয়াছেন যে, প্রাক্তিক বিধি মানিতে গেলে যদি সিসষ্ট্রিসের যুদ্ধাভিযানকালে ১৭০০ মিশরীয় প্রৌঢ়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সিসষ্ট্রিসের জন্মদিন হইতে মিশরে অন্ততঃ দশ সহস্র বালকের জন্ম হইয়াছিল! সুতরাং মিশরের লোকসংখ্যাও অন্ততঃ ছয় কোটী ছিল। মিশরে সে কালে ২১০০ স্কোয়ারলিন ভিন্ন বাসযোগ্য ভূমি ছিল না, সে দেশের জনসংখ্যা যে ছয় কোটী ছিল, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? ঐতিহাসিক ডিওডোরসের ইতিহাসে এইরূপ নানাবিধ অত্যুক্তি দেখিয়া ষ্ট্রাবো, এরিয়ান্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সিসষ্ট্রিসের ভারত-বিজয়-কাহিনী আদৌ বিশ্বাস করেন নাই।

হেরোডোটস্ পারসীকদিগের নিকট হইতেই ভারতবর্ষের সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেই পারস্যের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয়

হইয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রাচীন ইন্দো-পারসীক বাণিজ্যকাহিনী কোনও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা কেবল ঐতিহাসিক রেনল্ডের নিজের সিদ্ধান্ত।

ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরীয় বাণিজ্য সেমিটিক জাতির অধীনে থাকিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ব্যাবিলোনিয়া বা চাল্‌দিয়ার বণিকগণ,—যাহারা পারস্য উপসাগরে ভারতের পণ্যাদি বিক্রয় করিত, যে সকল আদি সভ্য জাতি মরুভূমে বিচরণ করিয়া টায়র অথবা নীল নদীতীরে পণ্য লইয়া যাইত; কিংবা ফিনিকগণ,—যাহারা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বাণিজ্য করিত, ইহারা সকলেই সেই এক সেমিটিক জাতির অন্তর্গত।

নিশরীয়দিগের তুলনায় ফিনিকদিগের অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা যে দেশে বাস করিত, উহা অনুর্ব্বর ও ক্ষুদ্র ছিল; সুতরাং বাণিজ্যই তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়াছিল। আমরা তাই দেখিতে পাই যে, সিদন বা টায়রের ফিনিকগণ বাণিজ্য করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাদিগের ভারতীয় বাণিজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল বলিয়া জানা যায়।

ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বাস করিয়াও নৌচালন-বিদ্যায় অপটু ছিল বলিয়া ফিনিকগণ স্থলপথেই বাণিজ্য করিত। কিন্তু তাহারা অবশেষে আরব উপসাগরের তীরবর্ত্তী কতকগুলি বন্দর অধিকার করিয়া বাণিজ্যের ক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। এই স্থান হইতেই যে তাহারা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ও আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে বাণিজ্য করিত, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

আরব উপসাগর হইতে টায়র অনেক দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া ফিনিকগণ বুঝিতে পারিল যে, স্থলপথে বাণিজ্য করিতে হইলে রাইনকোলিউরা অধিকার করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, উহাই তখন আরব উপসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের পথে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বন্দর বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। ফিনিকগণ রাইনকোলিউরা বন্দর অধিকার করিল। তখন অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল স্থলপথে ভারতীয় পণ্য তথায় আনীত হইত, এবং তথা হইতে তরণীসংযোগে টায়রে নীত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রেরিত হইত। এই বাণিজ্যপথ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল বলিয়া ফিনিকগণ অল্পমূল্যে অধিক পরিমাণে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করিতে পারিত।

এইরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া—ফিনিকগণই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিল যে, বাণিজ্যেই লক্ষ্মীলাভ ঘটে;—বণিক জাতি অসাধ্যসাধনেও অপারগ নহে। ফিনিসীয় বাণিজ্য যে পরিমাণে উন্নত হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার বর্ণনায় সেই পরিমাণে নীরব! হেরোডোটস ভিন্ন অন্যান্য সকল গ্রীক ঐতিহাসিক আলেকজান্দার কর্ত্তৃক ফিনিক্-গৌরব টায়রের ধ্বংসের পর ইতিহাসের রচনা করিয়াছিলেন। তাই আমরা ইন্দো-ফিনিসীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে আশানুরূপ তথ্য পাই না। টায়র-পতনের বহু বৎসর পূর্ব্বে ইজিকেলের অভ্যুত্থান। তাঁহার ভবিষ্যৎবাণীতে আমরা ফিনিসীয় বাণিজ্যের যে উন্নত অবস্থার পরিচয় পাই, তাহা হইতেই ফিনিসীয়দিগের প্রতিষ্ঠা ও ধ্বংসান্তরে ভারতীয় পণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

যখন সুবিশাল অটোমান-সাম্রাজ্য সমৃদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন কিছুকালের জন্য ইউরোপ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সেই ইন্দো-ইউরোপীয় বাণিজ্য ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া ভূমধ্য-সাগরতীরে উপনীত হইত। অক্সাস্ ও কস্পাপ হ্রদের তীর দিয়া সেই বাণিজ্যের এক ধারা কৃষ্ণসাগরে পড়িত; অন্য ধারা সিরীয়ার পথে লেভ্যানেটে উপস্থিত হইত; তৃতীয় ধারা সমুদ্রপথে মিশরে গমন করিত; মিশর হইতে নীল নদীর স্রোতে ভাসিয়া একেবারে ইউরোপের বিপণীতে উপনীত হইত। সুসভ্য ইউরোপীয়গণ তখন মহোল্লাসে ভারতীয় পণ্যের বরণ করিত।

পরবর্ত্তী ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই ত্রিধারা অধিকার করিবার জন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু বণিকজাতি অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কগণ যখন এই বাণিজ্য-পথত্রয় অবরোধ করিয়াছিল, তখন হইতেই পর্ত্তুগীজ রাজ্য নবীন পথের সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। বর্ত্তমান বাণিজ্যের জন্মকাল নির্ণয় করিতে হইলে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিতে হয়।

সিরীয়ার বাণিজ্যপথই উক্ত ত্রিপথের মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীন। ভারতবর্ষের বাণিজ্য-তরণী এসিয়ার তীরে তীরে গমন করিয়া পারস্য উপসাগরে আসিত, এবং ইউফ্রেটিস নদীতীরে কাল্‌দিয়ার পণ্যশালায় বিক্রয় করিত। প্রধান বণিক-সংঘ তথা হইতে উত্তর মুখে যাত্রা করিয়া মেসোপটেমিয়ার হৃদয় ভেদ করিত, এবং আরবের প্রান্তমূল বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী টাডমুর নগরের নিকট উপস্থিত হইত। তাহার

পর পুনর্ব্বার মরু-প্রদেশের দুর্গম ভূমি অতিক্রম করিয়া কোনও ক্রমে দামস্কাস নগরে উপনীত হইয়া সেই বাণিজ্যপথ দিয়া বিতরু হইয়া যাইত। তাহার এক পথ প্রাচীন টায়র ও সিডন (মধ্য যুগের একর ও সেন্ট জন) হইয়া অপর পথ দক্ষিণে রাবা ও পেলেস্তাইনের পূর্ব্বসীমা দিয়া, ইদ্রিয়ের ভিতর দিয়া, সিদিম ও লোহিতসাগরের তীরে যাইয়া উপস্থিত হইত।

ত্রিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে পথে ইলো-সিরীয় বাণিজ্য অবাধে চলিত, এখনও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান। আজিও সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান সেই পথে 'হজ' করেন। সে পথের নাম তাই 'হাজার-উল্-হজ'। পথ বলিতে আমরা সর্ব্বদা যাহা বুঝি, উহা সেরূপ প্রস্তরে গঠিত রাজপথ নহে। উষ্ট্রপদ-প্রতিঘাতে বালুকাময় ভূমিপৃষ্ঠে যেরূপ চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, 'হাজার-উল-হজে'র পথও সেইরূপ।*

শ্রীরাধেন্দ্রলাল আচার্য্য।

সত্যানন্দ।

সেই ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষলতা কণ্টকে পরিপূর্ণ গভীর অরণ্যানীমধ্যে, সেই কণ্টকক্ষুণ্ণ ধূসরতলে, ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত্তা, দস্যুভয়ত্রস্তা, পতিবিরহিতা কল্যাণী যখন ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ় ভাবে, ক্ষুধাতৃষ্ণার অবসাদে বাহ্যজ্ঞানশূন্য আভ্যন্তরিক-চৈতন্যময়ী হইয়া শুনিতে লাগিলেন যে, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় সুরে গীত হইতেছে,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন কল্যাণীর মনে বাল্যস্মৃতির কথা, দেবর্ষি নারদের কথা জাগিতেছিল। ক্রমে সে সুর আরও স্পষ্ট হইল; এবং শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া যখন গীত হইল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

তখন কল্যাণী সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারবিমিশ্র চন্দ্ররশ্মিতে নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তি। প্রথম দর্শনেই কল্যাণীর মত আমরাও বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে ইঁহার নিকট মস্তক অবনত করি।

---

* *History of British India.*—*W. Hunter.*

ইনি সত্যানন্দ। সেই বিশাল বনমধ্যে, সেই অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে সহসা যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন সেই দস্যুপীড়িতা অনাথার উদ্ধারার্থে এই ঋষিকল্প মূর্ত্তির অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে মনে প্রচুর বিস্ময় ও সম্ভ্রমের ভাব উদ্রিক্ত হইল। বিষয়সংস্থানপটু আনন্দমঠের নূতনকবি বিচিত্র ঘটনা-সমাবেশের দ্বারা প্রথম হইতেই সত্যানন্দের উপর রসগ্রাহী পাঠকের মনে একটু শ্রদ্ধার ভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন। যখন আমরা আনন্দময় আনন্দমঠের অভ্যন্তরে অগ্রসর হই, তখন এ ভাব উত্তরোত্তর বদ্ধমূল ও পরিবর্দ্ধিত হয়। অপূর্ব্বকুশলী শিল্পীর সেই অদ্ভুত বিষয়-সংস্থানের কথা স্মরণ করুন। সেই দারুণদুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ কবির কথায়,—"বড় বড় গ্রাম ও নগর" শ্মশান, "মনুষ্য-সম্পর্ক-মাত্রশূন্য"। "বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃণ্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে, ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে। শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে কুক্কুর।" এইরূপ ভয়ানক দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে, যেখানে নগরই অরণ্য, মনুষ্যশ্মশানবৎ হইয়াছে, তখন অরণ্যানীর কথা সহজেই অনুমেয়। সেই ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষের অন্তরালে, চন্দ্রালোক যেখানে অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়া অন্ধকার আরও ভয়াবহ ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে, সেই অন্ধকার অরণ্যে, সেই অনন্যসঙ্কিষ্ট অনাথার সমক্ষে যখন কঙ্কালসার, কৃষ্ণকায় প্রেতমূর্ত্তি, মূর্ত্তিমান দুর্ভিক্ষের মত, আসন্ন নরমাংসভক্ষণের উৎকট আনন্দে বিকট তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল, যখন অসহায় কল্যাণীর চৈতন্য-প্রদীপ এই ভীষণ দৃশ্যের ভয়ে ও অবসাদে ক্রমে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল, যখন কল্যাণীর রক্ষার আর কোনও উপায় দেখা যাইতেছিল না, তখন বীণাযন্ত্রে মৃত্যুঞ্জয় সুধাময় হরিনাম করিতে করিতে দেবর্ষির মত ইনি সেই ভয়কাতরা অনাথার রক্ষার্থে সহসা আবির্ভূত হইলেন। এই অবস্থায় এই সময়ে গ্রীসীয় নাট্যকারেরা কি

করেন? তাঁহারা স্বীয় কাব্যনাটকের নায়ক নায়িকাদের এরূপ আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারার্থ কোনও দৈবশক্তি বা সাহায্য, অর্থাৎ যাহাকে প্রতীচ্য সমালোচকেরা "Angels in machines" আখ্যা দিয়াছেন, সেই দৈবশক্তির অবতারণা করেন। আনন্দমঠের কবিও সেইরূপ এই সময়ে সত্যানন্দের সহসা অতর্কিত আগমনের কৌশলে পাঠকের মনে দৈবশক্তির অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বিপদ্‌গ্রস্তা অসহায়া সাধ্বীকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠকের মনে সত্যানন্দের উপর যে সম্ভ্রমের ভাব উৎপন্ন হয়, ক্রমশঃ বর্ত্তমান এই মহাগ্রন্থের ভিতর প্রবেশ করিয়া আনন্দমঠের প্রতিভাশালী মঠাধিকারীর কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করি, ততই সে সম্ভ্রম প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। সত্যানন্দের স্বাভাবিক পরদুঃখকাতর দয়ার্দ্র হৃদয় অভুক্তা কল্যাণী ভাহার কন্যাকে যে পর্য্যন্ত না আহারাদিসম্পন্ন করাইল, সে পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইল না। উপবাসী পতির অভুক্তাবস্থায় সাধ্বী পত্নীর জলস্পর্শ করিবার অনিচ্ছার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সত্যানন্দ প্রথমে যে কল্যাণীকে বারংবার আহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয়ের পরিচায়ক। মহেন্দ্র যখন প্রথমে তাঁহার সমক্ষে আনীত হইল, তাহার প্রতি উক্তি ও তদানীন্তন ব্যবহারে এই হৃদয়ের দয়ার্দ্র ভাব পরিস্ফুট।

(এ স্থলে অনেকের মনে হইতে পারে যে, নারায়ণহৃদয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া আবার কোন্ ধর্ম্ম! এ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং গ্রন্থকার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দের মুখে দিয়াছেন! সত্যানন্দের চরিত্রের ও সন্তান-ধর্ম্মের মূল সূত্র এই প্রশ্নে নিহিত; এই জন্য সংক্ষেপে এ স্থলে তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সে কথাটি এই;—যে বৈষ্ণবধর্ম্মে সর্ব্বভূতে অহিংসাই সারবস্তু বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, উহা অপ্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম;—নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে চৈতন্য দেব বাঙ্গালার যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, উহা সেই ধর্ম্ম। সন্তানের বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাহা নহে। তাঁহাদের মতে, প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ,—দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। সত্যানন্দ সেখানে মহেন্দ্রকে বুঝাইতেছেন যে, চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। সন্তান-ধর্ম্মও অর্দ্ধেক ধর্ম্ম। কারণ, চৈতন্য দেবের বিষ্ণু যেমন প্রেমময়, সন্তানের উপাস্যদেবতা সেইরূপ অনন্তশক্তিময়। ত্রিগুণাত্মক ভগবানের সত্ত্বাত্মক গুণের উপাসনা যে চৈতন্য দেবের শিষ্যেরা ভক্তির দ্বারা সম্পন্ন করেন, সন্তানেরা সেই ত্রিগুণাত্মক অনন্তের রজোগুণের

উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা, দেবদ্বেষীদের নিধন দ্বারা সম্পন্ন করেন। ইহাই সন্তান ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি। ইহার সারবত্তা বিচার করিবার স্থান ও ক্ষমতা আমার নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দের মুখে প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, উহা যথার্থ কি না, সে বিচার পণ্ডিতেরা করুন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা যে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয়-জীবন-রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সর্ব্বজীবে দয়া ও অহিংসা করিতে করিতে আমরা এমন এক উদার সার্ব্বজনীন ভিত্তির উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, যেখানে, হিংসা করিবার আর বস্তু (বা কেহ কেহ বলিবেন ক্ষমতা) নাই। কারণ, শতাব্দী ধরিয়া সর্ব্বভূতে দয়া করিতে করিতে পঞ্চভূতে আসিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব লুটিয়া খাইতেছে। তাহা হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক প্রীতি ও উদারতার পরিচায়ক বটে, কিন্তু জাতীয়তার পক্ষে কত দূর অনুকূল তাহা সম্পূর্ণ বিবেচ্য। জাতীয়তা-সংরক্ষণ যদি আমাদের যুগধর্ম্ম হয়, তবে সত্যানন্দের বৈষ্ণব ধর্ম্মই আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে অনুসরণীয়। এ কথা স্মরণ রাখিলে, সত্যানন্দের চরিত্রে কোনও অসঙ্গতি বোধ হইবে না।)

সে যাহা হউক, কল্যাণীকে অসহায়াবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার মুখে তাহার পতির দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়া, সত্যানন্দ মহেন্দ্রের সন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। এ কার্য্যের মূলে যে কেবল দয়া ছিল, তাহা নহে; স্বার্থও ছিল। দূরদর্শী সত্যানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মহেন্দ্রকে বিপন্মুক্ত করিলে, কৃতজ্ঞ মহেন্দ্র সন্তান-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা অনুভব করিয়া যদি নিজের অসীম ধনসম্পত্তি সন্তান-ধর্ম্মের সেবায় উৎসর্গ করেন, তবে সত্যানন্দের ও দেশের প্রভূত লাভ। তজ্জন্যই, মহেন্দ্রের মনে এই পরমপবিত্র ধর্ম্মের বীজ বপন করিতে সত্যানন্দ ভবানন্দ-রূপ কুশলী চরকে নিযুক্ত করিলেন। সন্তানদের সকল কার্য্যই ইন্দ্রজালময়; অন্ততঃ মহেন্দ্রের চক্ষে এইরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল। ঐন্দ্রজালিকের কুহকময় মন্ত্রগুপ্তির মত তাহাদের সহসা আবির্ভাব তিরোভাব, তাহাদের রহস্যজড়িত, দৃশ্যতঃ-অন্যায় কার্য্যাবলী, মহেন্দ্রের মনকে প্রথমে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। সেই জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল বনপথে, পদচিহ্ন হইতে নগরে আসিবার পথে, যখন কোম্পানীর সিপাহী-রক্ষিত খাজনার গাড়ী আসিতেছিল, এবং মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া মহেন্দ্রকে চোর সাব্যস্ত করিয়া (এমন সুযুক্তি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আজ কালও সুপ্রাপ্য!) তাহাকে বন্দী করিয়া গ্রামবিহ্বল (অথচ

কোম্পানীর ধনরক্ষক।) ইংরাজ সেনাপতির নিকট লইয়া গেল, তখন তিনি সেখার ঝোঁকে বৃদ্ধ দস্যুকে "সাদি করিবার" ব্যবস্থা দিলেন। বঙ্গসাহিত্যে নির্ম্মল হাস্যরসের যিনি প্রথম সৃষ্টা, সেই আনন্দমঠের কবি তাঁহার স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সহিত বলিতেছেন যে,—"সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুক-ধারী ডাকাতকে তাহারা কি প্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু সেখা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে, বিবাহ করিতে হইবে না ভাবিয়া" তাঁহাকে গাড়ীর সহিত বাঁধিয়া লইয়া চলিল। পথে ভবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ। সত্যানন্দ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভবানন্দ মহেন্দ্রের সন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন,—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সিপাহীরা দস্যু ভাবিয়া তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিল। সৌভাগ্যক্রমে বন্দীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার আদেশ এবারে আর সেখার কাছে লইতে গেল না। হয় ত মনে আশঙ্কা ছিল যে, তাঁহার তখনকার দেখাদেখিয়া অবস্থায় বন্দীকে তিনি আবার সাদি করিবারই বা আদেশ দেন, এবং তাহারা অকারণ Bigamyর জালে জড়িত হয়! শুভক্ষণে মহেন্দ্রের সহিত ভবানন্দের সাক্ষাৎ হইল,—এবং তাহার পর উভয়ে যে কথা হইল, তাহা প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। রুসোর প্রতিপাদিত "Le contral Social" মহাগ্রন্থের তত্ত্ব সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া য়ুরোপের রাজনৈতিক গগনে ফরাসী-বিপ্লব-রূপ ঘূর্ণাবর্ত্ত সংসাধিত হয়,—রুসোর সেই বিচিত্র মনোরথ গ্রন্থের অনুরূপ যুক্তিবাদ গ্রন্থকার ভবানন্দের মুখে বসাইয়াছেন। সেই অপূর্ব্ব যুক্তিবাদ শুনিয়া মহেন্দ্র সন্তান-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। মহেন্দ্রের মনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন কবি তাঁহার স্বাভাবিক নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। যুদ্ধারম্ভে মহেন্দ্র অনেক সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া ভবানন্দকে সাহায্য করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু দস্যুজনোচিত দুষ্কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। অভিজ্ঞ পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই জন্য অকৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁহাকে ভবানন্দের নিকট তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মহেন্দ্রের মনে ক্রমে সে ঘৃণার ভাব আর রহিল না। যখন রণবিজয়ী ভবানন্দ, রণনিপুণ বীরমূর্ত্তি,—সৈন্যাধ্যক্ষের মুক্তধাতী গর্ব্বিত বীরমূর্ত্তি পরিহার করিলেন, সেই জ্যোৎস্নাময়ী শান্তিশালিনী পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-বন-নদীময়ী শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল, তিনি "চন্দ্রোদয়াবলম্ব ইবাম্বুরাশিঃ"—তখন তিনি হাস্যমুখ, বাক্যময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন; কথা-বার্ত্তায় বড় ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু মহেন্দ্র নীরব। তখন নিরুপায়

হইয়া ভবানন্দ সেই অপূর্ব্ব মহাগীত,—যে গীতে আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়-কন্দর অননুভূতপূর্ব্ব প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে মথিত হইতেছে; যে মহাসঙ্গীতনিহিত উন্মাদনা আজ পতিত ভারতের পক্ষে বিধাতৃপ্রেরিত জাগরণী তূরীর ন্যায় হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জাতিকে এক উদ্দেশ্যসমবে আকৃষ্ট ও একত্রিত করিতেছে, সেই বন্দে মাতরম্ মহাসঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন! মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, ঘৃণা করিয়া সন্ন্যাসীর ছদ্মকলেবরে আবৃত যে ধর্ম্মধ্বজী দস্যু-সম্প্রদায়ের রাজস্ব-লুণ্ঠনে সাহায্য করেন নাই, তাহারই সনায়ক এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কাঁদিতে লাগিল! একে সেই ঘন বনপথ, সেই জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল রাত্রি, তাহার উপর নিজের ম হইতে বাহির হইয়া অতর্কিত বিপদের উপর বিপদ, মহেন্দ্রের মন বিপর্য্যস্ত;—তাহার উপর ভবানন্দের সেই বিস্ময় ভাব; যাহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় সত্যানন্দ যে উদ্দেশ্যে ভবানন্দকে পাঠাইয়া হলেন, তাহা অনেকাংশে সফল হইল। ভবানন্দ যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যে সত্যানন্দের শিক্ষা, গ্রন্থপাঠে সে সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র থাকে না। দুঃখের বিষয়, আমাদের সময় অল্প; এ কথার বিশেষভাবে আলোচনা করিতে পারিলাম না। তবে সত্যানন্দ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া (গ্রন্থের উপসংহারে এ কথা পরিস্ফুট) যে পবিত্র সন্তান-ধর্ম্ম প্রচার করেন, সে ধর্ম্মের সাপক্ষে ও আমি যখন সত্যানন্দের চরিত্রের তত্ত্বোদ্ঘাটন করিতে সাহসী হইয়াছি,—সেই সত্যানন্দের পবিত্র চরিত্রের সাপক্ষে কিছু বলিতে হইতেছে। অবহিতচিত্তে যাঁহারা আনন্দমঠ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে স্বতঃই উদিত হইতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ণিত যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারের ন্যায় এ রাজস্ব-লুণ্ঠনও কি ন্যায়ানুমোদিত? মহেন্দ্রও সেই সন্দেহে প্রণোদিত হইয়া ভবানন্দকে সেই প্রশ্ন করিতেছেন;—

"তোমরা কা'রা?"

ভবানন্দ বলিল, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবা।—মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র।—ভাল,—সন্তানে কি চুরি ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা।—আমরা চুরি ডাকাতি করি না।

মহেন্দ্র।—এই ত গাড়ি জুটিলো।

ভবা।—সে কি চুরি ডাকাতি ক'রে টাকা জুটিলাম?

মহেন্দ্র।—কেন, রাজার!

ভবা।—রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহেন্দ্র।—রাজার রাজ্যভাগ।

ভবা।—যে রাজা রাজ্যপালন করে না, সে আবার রাজা কি?

ইহাই—বিপ্লববাদীদের চূড়ান্ত যুক্তি। ফরাসী-বিপ্লবের সার্বদিকের পূর্বোক্তি টীকা ইহার প্রতিধ্বনি। Communism, Furerism প্রভৃতি এই তত্ত্বের বিভিন্ন অংশমাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র তাঁহার বীর্য্য প্রবন্ধে যুক্তি দেখাইয়াছেন, ঐ তত্ত্বের ফলে ষোড়শ লুইর সিংহাসনচ্যুতি প্রভৃতি। ফরাসী-বিপ্লবে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মূল কথাই এই ছিল। সেই ফরাসী-বিপ্লবে রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল, সম্ভ্রান্ত লোকের সম্ভ্রমনাম লুপ্ত হইল। পুরাতন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় গেল, মাসবার প্রভৃতির নাম লুপ্ত হইল—অনন্তপ্রবাহিত শোণিতস্রোতে সকল ধুইয়া গেল।" কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের অমৃতময় ফলে ন্যায়ের মর্য্যাদা পুনঃসংস্থাপিত; সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত, প্রজাশক্তির মহাবিকাশ; এবং বঙ্কিমের কথায়, য়ুরোপের নূতন সভ্যতার সৃষ্টি,—মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গলের উৎপত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের এ মহাগ্রন্থে সে তত্ত্বের ইঙ্গিত যথেষ্ট আছে। সত্যানন্দের মত সর্ব্বত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক কর্ম্মবীরগণ ভারতবর্ষে কবির সে আদর্শ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়েন। যাঁহারা মনে করেন যে, "নষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্দ্বারবতে নৃপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা" ইত্যাকার মনুর পদ্যাসনে যে ভারত বাঁচে মরে, সে ভারতে কখনও কি প্রজাশক্তি জাগ্রত হইবে? তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, হিন্দুরা এ কথাও বলে যে, "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ।" ও তাহাদের উপাস্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্র প্রজার মঙ্গল-মন্দিরে নিজের প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীকেও উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন যে, য়ুরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে একদা এক জন রাজার এই দৈবপ্রদত্ত শক্তি,—এই Divine Right রূপ জীর্ণ খেরাল উদ্যত প্রজাশক্তির সংঘাতে বজ্রে কিরূপ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু বাকী আছে, যথেচ্ছ রাজশক্তির সেই

অবশিষ্ট দুর্গ রুসিয়ায় তাহা সম্পন্ন হইতে চলিল। ইহাই কি বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস নহে?

ইহাই অন্ততঃ সত্যানন্দ-চরিত্রের এ অংশের defence। কবি দেখাইয়াছেন, সত্যানন্দ ও তাঁহার সম্প্রদায় দস্যু তস্কর নহে; মুসলমানের অরাজকতা ও ইংরাজের অত্যাচার-স্রোতে বাধা দিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় (অবশ্য ঐতিহাসিক ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কাল্পনিক আবরণ দিয়া ও উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়া) যখন এ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তখন গ্রন্থোক্ত সন্তান চরিত্রের বিচার করিতে গেলে, সেই কাল্পনিক উদ্দেশ্য ধরিয়া চরিত্র আলোচনা করিতে হইবে। সেই হিসাবে সত্যানন্দ-চরিত্র ও সন্তান সম্প্রদায়ের কার্য্যাবলীর ন্যায়পরতাই সমালোচকের সমালোচনার বিষয়। দেশের যে অবস্থায় সত্যানন্দের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকারের নিজের কথায় এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। "১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরাজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজানার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ভার গ্রহণ করেন নাই! (এখানে গ্রন্থে মীরজাফরের প্রতি কতকগুলি কঠোর বিশেষণ প্রযুক্ত আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের দিনে ঐ সব বিশেষণ পরিত্যাজ্য;) সে ভার * * মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম; বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ভেস্‌প্যাচ লিখে। বাঙ্গালী কাঁদে, আর উৎসন্ন যায়। অতএব বাঙ্গালার রাজস্ব ইংরাজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর।" এই 'অতএব' কথার কঠোর অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ একবার অনুভববোগ্য। সন্তান-ধর্ম্মরূপ মহান্ আদর্শ-ধর্ম্মের স্বপক্ষেও কিছু বলিতে হয়; এই দুঃখে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে তীব্র শ্লেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সাপ মাটীতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি নাই। সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ, যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা; কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটী খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া শোয়াস্তি নাই;

সিংহাসনে খাসগ্রাম রাখিয়া গোখাদি নাই? ঘরে কি বউ রাখিয়া গোরাদি নাই? কি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে গোমাংস নাই? পেট চিরে ছেলে বার করব! [কিছু দেশে রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে নাই] ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। ০ ০ * ইহাদের না তাড়াইলে কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে।"

বিপ্লববাদীর মুখে এতদধিক যুক্তি আর নাই। ভবানন্দ নিজে সন্ন্যাসীর কার্য্য যে ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদিত, একবার ইহা-বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা দেখিলাম, কবি বুঝাইয়াছেন যে, সত্যানন্দের ঐ কার্য্যটী শুধু নির্দ্দোষ নহে, ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য। সত্যানন্দ-চরিত্রে আর এক মহৎ মধুর ভাব মহেন্দ্রের দীক্ষাকার্য্যে দেখিতে পাই। সেই কমল কানন পক্ষিকুজন-মুখরিত আনন্দময় প্রভাতে, আনন্দময় কাননে, আনন্দময়ী সত্যানন্দ ঠাকুর হরিশ্চন্দ্রে বলিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন; জীবানন্দ নিকটে উপবিষ্ট। এমন সময় মহেন্দ্রকে লইয়া ভবানন্দ উপস্থিত। বিনা বাক্যব্যয়ে ব্রহ্মচারী সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন; কেহ কোনও কথা কহিতে সাহস করিল না। এ কথায় জীবানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা ব্রহ্মচারীকে কিরূপ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন, তাহা সহজে অনুমেয়। সত্যানন্দের পূজা শেষ হইলে সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। উভয়ে কি কথা হইল, আমরা তাহা বলেন নাই; কিন্তু বর্ণনার পারিপাট্যে অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না যে, মহেন্দ্রের অন্তরালে উভয়ের মধ্যে মহেন্দ্রের সম্বন্ধেরই প্রতি মনের গতির কথাই হইল। সত্যানন্দই ইঁহার প্রাণ জানেন, তিনি যে কার্য্যে ভবানন্দকে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে কার্য্যে ভবানন্দ কত দূর কৃতকার্য্য হইলেন, সর্ব্বত্যাগী মাতৃসেবক সত্যানন্দের ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন হইবে, এ কথা সহজেই মনে আসে। ইহা ত সে পর্য্যন্ত ভবানন্দের মুখে যাহা উত্তর পাইলেন, লোকচরিত্র-অভিজ্ঞানে সত্যানন্দের সে কথা বোধ হয় সন্তোষজনক বোধ হইয়াছিল। তিনিও শান্তির জন্যের বিপদে সন্তানমূর্ত্তি ও ঈশ্বর-কৃপায় মহেন্দ্রের স্ত্রী কুমারীকে অনেক কাইলস্থ-হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সে কথাও প্রকাশ করিলেন। তাহাতে স্ত্রী কন্যার সন্ধিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন, এ কথা

মহেন্দ্রকে দেবালয়ের অভ্যন্তরস্থ গুপ্তদ্বার পথ দিয়া অভীষ্ট স্থানে লইয়া চলিলেন। সে পথ দিয়া মহেন্দ্রকে যাইয়া যাইবার মোর এক প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য,—নবীন-ধর্ম্মের মহিমা তাহার নিকট ব্যাখ্যা করা; যাহাতে মহেন্দ্রের মন সম্পূর্ণরূপে উক্ত ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ, যেটুকু ভবানন্দ অসম্পন্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন করা। মহেন্দ্র দেখিলেন, সেই "নবারুণ-ঐশ্বর্য্য প্রোভাসকালে যখন নিকটস্থ কানন হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষ প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে, প্রথমে মহেন্দ্র দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে দেখিতে ক্রমে দেখিতে পাইলেন যে, "এক প্রকাণ্ড পঞ্চদলপদ্মোপরি কৌস্তুভ-শোভিতহৃদয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, সম্মুখে সুদর্শন চক্র ঘূর্ণ্যমান প্রায় স্থাপিত; পার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতী জয়শ্রী ও শান্তি দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু বিষ্ণুর অঙ্কোপরি যে মোহিনী মূর্ত্তি উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ পূজা করিতেছে।" ইহা ও পরবর্ত্তী জন্মভূমিরূপিণী মাতৃমূর্ত্তিকে অভিনব কবিত্বে মণ্ডিত করিয়া যে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছেন, পৌরাণিক দশ-মহাবিদ্যার কল্পনাকে নূতন আকারে অর্থাৎ জন্মভূমিরূপিণী করিয়াছেন; ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের গঠিত নূতন ধর্ম্ম,—দুর্গাপূজাচ্ছলে পাগল কমলাকান্ত কাঁদিয়াছিল; সকলেই জানেন যে, সেই "আমার দুর্গাপূজা" প্রবন্ধে আনন্দমঠের বীজ নিহিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম কেবল মাতৃভূমিকে দেবীত্বে উন্নীত করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই; লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবীদের স্থানভ্রষ্ট করিয়া মাতার সিংহাসনমঞ্চ তলদেশে স্থাপিত করিয়াছেন। বিধাতার কৃপায় আমাদের এই উদীয়মান 'ন্যাশানালিজম' (জাতীয়তা) শিক্ষিতসমাজে সেই ধর্ম্মে পরিণত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বন্দে মাতরম্ মহামন্ত্রের ঋষি নহেন, এ ধর্ম্মেরও apostle, এ কথা আমাদের যেন স্মরণ থাকে। তাই স্বদেশী আন্দোলনের প্রাবল্যের সময়, পবিত্র মহালয়ার দিনে, স্থানীয় ভগবতী আদ্যাশক্তির মহাপীঠে, মাতৃর অভিনব বেশ দেখিতে লক্ষ লোক ছুটিয়াছিল। সে অভিনব বেশ কি?—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সেই অভিনব মাতৃমূর্ত্তি। মাতার সেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও ভাবী মূর্ত্তি, অর্থাৎ সেই দশভুজাদশদিগ্ব্যাপ্তা সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি,—সেই "মা মা" ছিলেন,—সেই "কুলরকেশ্বরী প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চ সকল পাত্রিকা দলিত করিয়া সকল ঐশ্বর্য্যময়ী মাতা যখন বঙ্গ পশুর আবাসস্থল

আপনার পথানন স্থাপিত করিয়াছিলেন ;—" অন্য মহাকবির কথায়,—

ভারত-কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত-জীবনে জগত জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা
পূজিত সকলে, পূজিত সকলে
ফিনিক, সিরীয়, য়ুনানীমণ্ডলে—

মাতার সেই বিগত মহীয়সী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি ; আবার মাতার সেই অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী, দুর্ভিক্ষব্যাধিমৃত সন্তানের অস্থিতে কঙ্কালমালিনী, হৃতসর্ব্বস্ব নগ্নিকামূর্ত্তি,—যে মূর্ত্তিতে শ্রীর মধ্যে মাতার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী প্লেগ ও তদনুপাতে বাৎসরিক সামরিক ব্যয়,—army expenditure Budget-এর অপরূপ শ্রীবৃদ্ধি,—এই মা যা' হইয়াছেন। তাহার পর মায়ের সেই ভাবী মূর্ত্তি,—সেই নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীমণ্ডিতা, বিদ্যাবিজ্ঞানসমন্বিতা, ঋদ্ধিসিদ্ধিযুক্তা, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থ-সাধিকা, শরণাগতপালিকার মূর্ত্তি ;—যে-মূর্ত্তির মাধুরী ব্যাখ্যান করিতে গিয়া সত্যানন্দ গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কাঁদিয়াছিলেন, (কোন্ সহৃদয় পাঠকই বা সে বর্ণনা নিরশ্রুনেত্রে পাঠ করিতে পারিয়াছেন ?)—মহাপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলনীয় স্বদেশভক্তি ভারতের সে ভবিষ্য স্বর্গ,—কল্পনাকালিন্দীতটে আনন্দমঠের মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় মণিমণ্ডিত সিংহাসনমঞ্চে নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, মহাকবির সে নহা আদর্শ-চিত্র কবে আবার আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব, তাহা ভারতের ভাগ্যবিধাতাই জানেন।

দেবালয়দর্শন ও তাঁহার মুখে পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত ব্যাখ্যান শুনাইবার পর সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে সন্তান-ধর্ম্মে অধিকতর আকৃষ্ট করিলেন। মহেন্দ্র তখন মনে মনে সন্তান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, স্থির করিলেন। তবে স্ত্রীর গ্রাম পদচিহ্নে কল্যাণীকে উপযুক্ত অভিভাবকের অধীনে রাখিয়া আসিবার অপেক্ষা। এই অভিপ্রায়ে পদচিহ্নাভিমুখ মহেন্দ্রের যে সব বিপদ হইল,

সে সব কথার আলোচনার এ স্থলে প্রয়োজন নাই। আমরা সত্যানন্দের কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিব।

সত্যানন্দ যে মহাব্রতে দীক্ষিত, তজ্জন্য বর্ষব্যাপী তপঃসাধনায় যাহা অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এরূপ আভাস আছে। গ্রন্থকার জীবানন্দ ভবানন্দ,—এই প্রধান সন্তানদ্বয়ের জীবনের পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন; সত্যানন্দের জীবনের পূর্ব্বাংশের কোনও আভাস দেন নাই। আনন্দমঠের সংলগ্ন কাননে যখন সত্যানন্দের সহিত প্রথম আমাদের সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য ঘটে, তখনই তিনি বৃদ্ধ ও অসীম শক্তিসম্পন্ন, সন্তানদলের এক-প্রকার নিয়ন্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে পাঠকদের এইরূপ কল্পনা করিবার যথেষ্ট যুক্তি ও অবসর আছে যে, সমস্ত জীবন তিনি কঠোর তপস্যায় ও ইন্দ্রিয়সংযমে পরীক্ষিত হইলে, মহাপুরুষদের নিয়োগক্রমে প্রৌঢ় বয়সে তিনি এই অপূর্ব্ব সন্তান-ধর্ম্ম ও এই বিচিত্রশক্তিশালিনী সন্তানবাহিনীর সৃষ্টি করেন। তিনি যে অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন কোনও মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এ ব্রতে নিযুক্ত, গ্রন্থের উপসংহারে উক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাবেই তাহা প্রকাশ। বঙ্কিমের দৈবশক্তিতে যে বিশ্বাস ছিল, তাঁহার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে অভিরামস্বামী, রামানন্দস্বামী, কাপালিক, চন্দ্রচূড়, অনন্তমিশ্র প্রভৃতি চরিত্রে তাহা প্রকাশ। অন্যান্য গ্রন্থের সহিত প্রভেদ এই যে, অন্যান্য গ্রন্থে কেহই এ গ্রন্থের ন্যায় প্রধান পাত্রস্বরূপ কার্য্য করেন নাই। সত্য বটে, গ্রন্থশেষে সত্যানন্দের গুরু দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু ঘটনাবহুল গ্রন্থের ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করিলে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ গ্রন্থের বর্ণিত ঘটনাবলীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক অত্যল্প। মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ উভয়ে কারাগারে গেলেন, সত্যানন্দ নির্ভীক হাস্যমুখ, সদানন্দ। বিষণ্ণ বিপন্ন মহেন্দ্রকে উৎফুল্ল করিবার জন্য বলিলেন যে, "আজ অতি আনন্দের দিন!" শুধু মহেন্দ্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য এ কথা বলিলেন, তাহা নয়। নিজের ব্রতে নিষ্ঠা ও গভীর ঈশ্বরভক্তি তাঁহাকে এরূপ নির্ভীক ও অসমসাহসী করিয়াছিল। এ জন্য কারাগারে বা শত্রুপুরীতে, সর্ব্বত্রই তিনি নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক। ভবানন্দ বলিয়াছিলেন যে, সত্যানন্দকে "আটক রাখে এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই,"—এ বিশ্বাসের মূল কি? তাঁহার অলৌকিক শক্তি। সে শক্তি কি সম্পূর্ণ মনুষ্য-শক্তি, না অমানুষী শক্তি? কবি সে সম্বন্ধে পাঠকদিগকে রহস্যের অন্ধকারে রাখিয়াছেন। এ জন্যই সত্যানন্দ মহেন্দ্রের স্ত্রীর সৎকার ও কন্যার রক্ষা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিতভাবে তাহাকে আশ্বস্ত

করিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই নিজেদের কারামুক্তির সম্বন্ধে তাঁহার স্থিরবিশ্বাস ছিল। মহেন্দ্রের সঙ্গে থাকিয়া তাহার স্ত্রীর সৎকারাদি অদৃষ্ট ঘটনা সুসম্পাদিত হইয়াছে, এরূপ স্থিরবিশ্বাস সত্যানন্দের কোথা হইতে হইল, এজন্য সবিস্ময়ে মহেন্দ্র এ বিষয়ে সত্যানন্দকে প্রশ্ন করাতে তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহাব্রতে দীক্ষিত; দেবতারা তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন। আপাতদৃষ্টে পাঠকদের মনেও এরূপ বোধ হয়। অনেকে বলিতে পারেন যে, তিনি অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণভবিষ্যৎদৃষ্টিসম্পন্ন লোক। এই জন্যই মহেন্দ্রের স্ত্রীর সৎকার প্রভৃতি বা পরবর্ত্তী উভয়ের কারামুক্তি ঘটনা অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। জীবানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সর্ব্বত্রগামী মনস্কার্য্যসাধনসক্ষম চর যে কোনও কাজ অননুষ্ঠিত রাখিবে না, এ কথা তাঁহার পক্ষে অনুমান করা বিচিত্র নহে। তাঁহার দৈবশক্তিতে যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনও কলহ নাই। তবে সত্যানন্দ যে মহাপুরুষ-প্রেরিত, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই কারাগার হইতে মুক্ত করিতে আসিলে তিনি ঐরূপে মুক্তিলাভ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, "আজ সন্তানের পরীক্ষার দিন।" ইহা নিজের জীবন-ব্রতে নিষ্ঠার সাফল্যে জলন্ত বিশ্বাস, না বঙ্কিমের কথায়, 'যোগবল বা Psychic force'? ক্রমশঃ।

সাধ।

চাহ মুক্তি ?—[illegible] দুর্লভ ধন,
পর-পদ-ধূলি-শয্যা শ্রেষ্ঠ তবে।
মুক্তকণ্ঠে ভক্তিভরে বরণ
অগ্নিযজ্ঞ মাতৃমন্ত্র—মেঘরব!
বজ্রবহ্নি সম তেজে গৌরবে
যাও সাধনার পথে :: অগ্রসর;
রহ স্থির গিরি রণ-আহবে :
চূর্ণ কর গদাকণ্টক কঙ্কর।
ভক্ত-জীবন শোণিত-চন্দনে,
পূজার রাঙ্গা চরণ দু'খানি!
দেয়া মাতা দিবেন নন্দনে
ও অমৃতফলে তুলি' পুণ্যপাণি।
দেবের হৃদি-রক্ত,—আত্মবলিদান
অমৃত-মুক্তির স্পর্শে মৃতে দেয় প্রাণ।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বুদ্ধের সমসাময়িক ভারত।

অবন্তী ও কৌশাম্বী রাজ্য।

অবন্তী-রাজ অনন্তসেনির পুত্র প্রদ্যোত কদা সভাগৃহে সমাসীন হইয়া, প্রসঙ্গতঃ 'আমার কি কিছু প্রার্থনীয় আছে,' এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, কোনও রাজসভাসদ বলিয়া উঠেন, "কৌশাম্বীরাজ উদয়ন বোধ হয় মহারাজ অপেক্ষাও যে ইহ প্রদ্যোত হস্তীর ন্যায় কোন্‌রূপ অসাধারণ শক্তি আছে, তাহার পরীক্ষা করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু অনুসন্ধ যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে সম্মুখ-সমরে উদয়নকে পরাজিত করিবা সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অগত্যা তাঁহার প্রদানি সম্বন্ধে ও করিতে বাধ্য হইলেন। উদয়ন হস্তীবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। এরূপ প্রকার আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা তাহাতেই বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। অতএব প্রদ্যোত কাষ্ঠ দ্বারা এরূপ একটি সুগঠন হস্তী নির্ম্মাণ করাইলেন যন্ত্রাদির সাহায্যে ও বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশকৌশলে দূর হইতে তাহাকে সত্যকার বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। অতঃপর এই হস্তী গোপনে কৌশাম্বী-সীমাপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়া তথায় স্থাপিত হইলে, সীমান্তচারী চরগণ হস্তী ভ্রমে রাজসদনে তাহা নিবেদন করিল। মৃগয়ালোলুপ উদয়ন প্র বুঝিতে না পারিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণে ব্যগ্র হইলেন। দারুময় দেহমধ্যে প্রচ্ছন্ন নৈপুণিক শস্ত্রবলে কাষ্ঠহস্তীকে পরিচালিত করিয়া দেখিল, হস্তীর অনুসরণতৎপর উদয়ন স্বীয় অনুচরবৃন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন পড়িয়াছেন, তখন তাহারা আর আত্মগোপন নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া শরীর হইতে বহির্গত হইয়া, হইয়া অনায়াসেই অসহায় কৌশাম্বীরাজকে ধরিল। অতিরিক্ত মৃগয়াব্যসনে লিপ্ত হওয়ায় সাবধানতার অভাবহেতুই দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল, ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়া, উদয়ন নিতান্তগ্লানির সহিত বন্দিভাবে অবন্তীরাজসমীপে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

উদয়ন আশ্চর্য্য সম্মোহন মন্ত্রবলে দুর্দ্দান্ত হস্তিগণকে বশীভূত করিতে পারিতেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি ছিল। প্রদ্যোত উদয়নের নিকট উক্ত বশীকরণবিদ্যা শিখিয়া লইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র;

এবং তজ্জন্য উদয়নকে পুনঃপুনঃ উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, মন্ত্রপ্রয়োগশিক্ষার বিনিময়ে উদয়ন প্রদ্যোতের কন্যা লাভ করিয়া কারামুক্ত হইবেন। কিন্তু উদয়ন যখন বলিলেন, "অতিস্বীকার পূর্ব্বক শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিলে কাহাকেও উহা শিক্ষা দিব না, এইরূপ পণবদ্ধ আছি," তখন প্রদ্যোত অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার জীবননাশের ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিভীষিকা-প্রদর্শনে উদয়ন সংকল্প ত্যাগ করিলেন না; প্রদ্যোতেরও মন্ত্র শিখিবার আগ্রহ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। এক পক্ষে বন্দীর শিষ্যত্বস্বীকারে নিজের মর্য্যাদা-হানির আশঙ্কা, পক্ষান্তরে উদয়ন প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, তবু শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিলে শিখাইতে অসম্মত; এ অবস্থায়, অপর কেহ গুরুবৎ অভিবাদন করিয়া উদয়নের নিকট হইতে মন্ত্রপ্রণালী শিক্ষা করিয়া, পরে তাঁহাকে শিখাইতে পারে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া প্রদ্যোত কতকটা চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু এরূপ অসাধারণ বিদ্যা অল্প কাহারও করলগত হইলে সে যদি কোনরূপ প্রতারণা করে, এইরূপ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া, অবশেষে স্বীয় দুহিতাকেই মন্ত্রগ্রহণে নিযুক্ত করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু তাহাতেও ভয়, বন্দীর নিকট রাজকুমারীর শিষ্যত্ব স্বীকারে গৌরবহানির সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, পরস্পর রাজা ও রাজকন্যা রূপে পরিচিত হইলে, মন্ত্রদানপ্রসঙ্গে হৃদয়ের আদান প্রদানও হইয়া যাইতে পারে! এইরূপ নানা আশঙ্কায় বিপর্য্যস্ত ও প্রকৃষ্টতর উপায়নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া যথার্থ ব্যাপার গোপন করিয়া পুনরায় ছল অবলম্বন করিয়া প্রদ্যোত রাজকুমারীকে বলিয়া দিলেন, "এক জন বামনের নিকট হইতে তোমাকে হস্তি-বশীকরণপদ্ধতি শিক্ষা করিতে হইবে," এবং উদয়নকে বলিলেন, "রাজান্তঃপুরের এক জন কুব্জা পরিচারিকা বিহিত বিধানে আপনার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া পরে আমাকে শিখাইবে।" উদয়নের ইহাতে আপত্তির বিশেষ কোনও কারণ ছিল না। সুতরাং স্থির হইল, তিনি বাহিরে থাকিয়াই যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতা মহিলাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবেন।

উদয়ন পটান্তরিতা রাজকুমারীকে হস্তিবশীকরণপ্রণালী ক্রমানুসারে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াও কয়েক দিনের চেষ্টাতে তাহাকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে না পারিয়া অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া 'কুব্জা' সম্বোধনে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। ইহাতে

রাজকুমারী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "প্রথমে শুভভাগ্য লাভন ; আবারকে কুলা বলিয়া সম্বোধন করিবার অর্থ কি ?" তাহার পর যবনিকা অপসারিত করিয়া মোষকমারিতনেত্রে উদয়নের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—বিস্তৃতাঙ্গ বামনের পরিবর্ত্তে তাঁহার সম্মুখে এক রাজলক্ষণযুক্ত সুন্দরকান্তি যুবক উপবিষ্ট! উভয়ের চারি চক্ষু মিলিত হইবামাত্র উভয়ের চিত্ত বিমোহিত হইল। প্রদ্যোতের প্রতারণা প্রকাশিত হইল, তাঁহার অভিসন্ধি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়া গেল। উভয়ে উভয়কে আত্মসমর্পণ করিলেন। নিষ্কৃতিলাভ ব্যতীত উভয়ের মিলনের আশা নাই জানিয়া, পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সুতরাং হস্তিশিক্ষাকরণমন্ত্র শিক্ষার পরিবর্ত্তে অবন্তীরাজ-বশীকরণের মন্ত্রণা চলিতে লাগিল।

রাজকুমারী পিতৃচরণে নিবেদন করিলেন, "বশীকরণপদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছি; কিন্তু তাহার প্রয়োগের সাফল্য নক্ষত্র-বিশেষে উদ্ভিদ্‌বিশেষের সংগ্রহের উপর নির্ভর করে; সুতরাং ঔষধি চিনিবার ও স্বহস্তে তাহা উৎপাটন করিবার জন্য তাঁহাদিগের উভয়েরই বনে গমন আবশ্যক ; অতএব একটি উত্তম হস্তী দিন, বিদ্যার পরীক্ষা করি।" মুহূর্ত্ত-প্রফুল্ল রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজহস্তী লইয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছামত বনে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

একদা প্রদ্যোত ভ্রমণার্থ রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া উদয়ন রাজপুত্রীকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, ভস্ত্রাস্থালী কিছু অর্থ ও স্বর্ণরেণুতে পূর্ণ করিয়া লইয়া, রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজানুচরগণ তাঁহাদিগের আচরণে সন্দিহান হইয়া দ্রুতপদে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন। প্রদ্যোত ইঙ্গিতে তাঁহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগের অনুসরণার্থ এক দল সেনা প্রেরণ করিলেন।

যেমন সৈন্যেরা দ্রুতবেগে উদয়ন ও রাজকন্যার হস্তীর সমীপবর্ত্তী হইল, উদয়ন অমনই চতুর্দ্দিকে অর্থ নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা অর্থলোভে দ্রব্যসংগ্রহে ব্যাপৃত হইল। সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। এ দিকে অনুসরণকারিগণ স্বকার্য্য সাধন করিয়া পুনরায় হস্তীর সন্নিহিত হইল। তখন উদয়ন স্থালী উন্মোচন করিয়া সুবর্ণরেণুগুলি তাহাদিগের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। অর্থলোলুপ অনুধাবনকারিগণ পুনরায়

অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মুদ্রাসংগ্রহের ন্যায় অস্ত্রসংগ্রহ সহজ ও অল্পসময়সাপেক্ষ নয়; ক্রমে উদয়নের হস্তী রাজানুচরগণের নিকট হইতে এত ব্যবধানে অন্তরিত হইয়া পড়িল যে, তিনি অনায়াসে স্বরাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী দুর্গের সমীপে উপনীত হইলেন। প্রভুসন্দর্শনে দুর্গোৎকুল্ল সেনাগণ উদয়নের প্রত্যুদ্গমনার্থ উপস্থিত হইল। অবন্তীরাজসেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। অতঃপর কৌশাম্বীরাজ উদয়ন অবন্তীরাজপুত্রী বাসবদত্তার সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া, শুভদিনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

এই উদয়ন নিতান্ত দুর্ব্বিনীত বলিয়া গ্রন্থান্তরে উল্লিখিত হইয়াছেন। একদা প্রীতিভোজনের পর তিনি সুপ্ত ছিলেন। এই অবসরে পুরস্ত্রীগণ বৌদ্ধ সংঘের পিণ্ডোলা নামক মহামাত্র ঋষির উপদেশাবলী শুনিবার জন্য তাঁহার অগোচরে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। উদয়ন তাহা অবগত হইয়া মাদক-মত্ততাজনিত ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাঁহাদিগের শরীরে পাটলবর্ণ পিপীলিকার নীড় সংশ্লিষ্ট করিয়া দিবার আদেশ দেন। আর এক প্রীতিভোজনের দিনে তাঁহার মহিষী সামবতী, পটমণ্ডপে অগ্নিসংযোগ হওয়ায়, বহুসংখ্যক পরিচারিকার সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে অনুমিত হয়, এই রাজকীয় প্রীতিভোজ নগরের বহির্ভাগে অস্থায়ী আবাসে সম্পন্ন হইত। কথিত আছে, বুদ্ধের প্রিয়ানুচর আনন্দ উদয়নের অন্তঃপুরস্থিত মহিলাগণকে উপদেশ দিবার জন্য প্রেরিত হন। উদয়নপুত্র বোধি বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। ইঁহার নামানুসারে একখানি বৌদ্ধসূত্রান্ত গ্রন্থ রচিত হয়। উদয়নের পিতার নাম শতানিক বা পরন্তপ। ইহার পর কৌশাম্বী রাজ্যের কোনও ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অবন্তীরাজ্য বুদ্ধনির্ব্বাণের পর অধিক দিন স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই; মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসারের সময়ে উহা পাটলীপুত্রের অধীনতা স্বীকার করে। বিন্দুসারের রাজ্যকালে তদানীন্তন রাজকুমার,—পরে সুপ্রসিদ্ধ সম্রাটচক্রবর্ত্তী অশোক বহুকাল উজ্জয়িনী নগরে পিতৃপ্রতিভূরূপে অবন্তীর শাসনে ব্যাপৃত ছিলেন।*

অবন্তীরাজ প্রদ্যোত ও কৌশাম্বীরাজ উদয়ন, উভয়ই বুদ্ধের সমসাময়িক; সুতরাং সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসরের প্রাচীন।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

* 'অশোক' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সাহিত্য; ১১ ভাগ; ১১ সংখ্যা।

দারপরিগ্রহ।

—:০:—

স্বামী ও স্ত্রী নামক দুই পক্ষ একত্র জুটিয়া উঠার নাম দারপরিগ্রহ। কর্ম্ম-চক্রের বিধানে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

বসন্তকালে গোবীজের ন্যায় মত, দারপরিগ্রহেরও সম্ভবতঃ কোনও উপকারিতা আছে; নচেৎ জগতে এ হেন বিধান হইত না। দর্শনকারের মতে প্রত্যেক কর্ম্মের তিনটি কারণ থাকে,—

১। আধিভৌতিক।

২। আধিদৈবিক।

৩। আধ্যাত্মিক।

অন্যমতে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ।

স্থূল সম্পর্কে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"; কারণ, "পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং।" ইহাই আধিভৌতিক।

আধিদৈবিক সম্পর্কে,—লালন পালনাদি। স্নেহ, মমতা, পুত্রসংরক্ষণ, তাড়না ও তাড়িত হওয়া, ঘোর কলহ, দ্বন্দ্ব ও উৎপাত প্রভৃতি।

আধ্যাত্মিক দিকে,—উভয় পক্ষের আত্মজ্ঞান, দমীকরণ ও নিঃশেষে দেহত্যাগ।

ভৌতিক কেন্দ্র হইতে আধিভৌতিক। পঞ্চ মহাভূত হইতে সংসারের উদ্ভব। স্ত্রী এবম্বিধ ক্ষেত্র। এটুকু প্রাকৃতিক। নরলোকে পুরুষ ও স্ত্রী মিলিত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ নামক একটা ব্যাপার সাধিত হয়।

বিবাহপ্রথা অতি পবিত্র। পশুদিগের মধ্যে দারপরিগ্রহ-প্রণালীর সহিত বিবাহের তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রথা লইয়া বহু তর্ক ও গোলযোগ হইয়া পড়িয়াছে।

যথা,—বহুবিবাহ নিন্দনীয়। বিধবা-বিবাহ উচিত কি না? বিবাহ কত বয়সে হওয়া উচিত? স্ত্রী মরিলে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করা উচিত কি না?

পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্যালিকার সহিত বিবাহ উচিত কি না, তাহা লইয়াও মহা গোলযোগ। রক্ত-সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতির এক একটা প্রথা আছে।

এগুলি আমাদিগের আলোচ্য নহে। ব্যাঘ্রের ঘাস খাওয়া উচিত কি না, গাভীর মাংসভক্ষণ উচিত কি না, এবং মার্জ্জারের সিং হওয়া উচিত কি না, এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। অনেক তর্কের পরে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, সময় আসিলে, অর্থাৎ কালের গতিকে প্রকৃতির স্বতঃই পরিবর্ত্তন হয়।

বানরের ঔরসে এককালে কুকুরের ন্যায় তিন চারিটি বাচ্ছা হওয়া উচিত কি না, এবং মনুষ্যেরও সেই প্রকার হইলে সৃষ্টিকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে কি না, এরূপ তর্কও হয় ত ভবিষ্যতে উঠিতে পারে। তজ্জন্য আমাদিগের পুঁথি প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত থাকা উচিত।

বংশবৃদ্ধি ব্যাপারটা তর্কের মধ্যে পড়িয়াও যথাক্রমে নিজের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেছে। ভরসা করা যাইতে পারে যে, এইরূপই চলিবে।

মনুষ্যের দারপরিগ্রহের সার্থকতা আধিদৈবিক হইতেই লক্ষণীয়। এ স্থলে পশু হইতে মনুষ্য কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ।

প্রেম, বিরহ, হা-হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস, মান ও তস্য ভঞ্জন, বিচ্ছেদ, মিলন, রসালাপ, কটাক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ ভাব অতি অপূর্ব্ব, এবং ইহার বর্ণনা ও সমালোচনাদির নিমিত্ত বহুতর সাহিত্যবীর, বহু কবি ও গায়ক প্রভৃতি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া ভাবের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন।

এগুলির সহিত জীব জন্তুর নীতি গতির তুলনা করিলে, আমাদিগের অর্থ কতকটা বুঝিতে পারিবেন। মানবের প্রেম, বিরহ, হা-হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস, মান প্রভৃতির মধ্যে একটু 'আমি' ও 'তুমি'র সম্বন্ধ আছে, তাহা আধ্যাত্মিকের পূর্ব্বলক্ষণ। কাহারও মতে, প্রেম এমন বস্তু, যাহার প্রতিদান না চাহিলে অধিকতর শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। "আমি তোমাকে প্রাণের ভালবাসা দিয়াছি, তাহার প্রতিদান চাহি না।" খোকা আমাকে ভাঙ্গা পুতুলের মুণ্ডটা দিয়া বলিয়াছিল, "বাবা! এটা তুমি নাও।" অর্থাৎ, মুণ্ডটা যখন কোনও কাজেই আসিবে না, তখন দানই প্রশস্ত। তর্কালঙ্কার গৃহিণীকে যথাসর্ব্বস্ব প্রেম দান করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! আমি প্রতিদান চাহি না।" গৃহিণী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ও চালাকীতে চলিবে না; প্রতিদান নিশ্চয় গ্রহণ করিতে হইবে।" তর্কালঙ্কার সভয়ে গ্রহণ করিলেন।

প্রতিদান-গ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য। কাশীতে কেহ কাহারও দান লয় না। অন্য প্রেম। না মিলে অবশ্য কোনও উপায় নাই, এবং তজ্জন্য বাঙ্গা

হাঙ্গামা করাও অজ্ঞান। কিন্তু 'আমি লইব না' বলা অত্যন্ত পাপ! ইহা নীতিবিরুদ্ধ।

এই সূত্রানুসারে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিয়াই সকলে বিবাহ করিয়া থাকে, এবং প্রতীচ্য দেশে পূর্ব্বে মনোভাব প্রভৃতি জানিয়া স্ত্রী-নির্ব্বাচন করিবার রীতি আছে। ইহাতে অনেকটা স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। আদান প্রদানটা পূর্ব্বেই হইয়া যায়। কিন্তু সে দেশে পুত্রকে পিণ্ড দিতে হয় না; অতএব এরূপ প্রথাতে কোনও দোষ নাই।

প্রতিদানের উপর—হা হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস, বিচ্ছেদ প্রভৃতি নির্ভর করে। যে প্রতিদান চাহে না, তাহার পক্ষে এগুলি শিলাবৃষ্টির ন্যায়। কিন্তু বলিবার যো নাই। দীর্ঘনিশ্বাস অপর পক্ষে হইবামাত্র এ পক্ষেরও হওয়া উচিত। মান হইলে ভঞ্জন না করা নীতিবিরুদ্ধ। রসালাপের সময় রসালাপ, কটাক্ষের সময় কটাক্ষ।

কিন্তু প্রিয়তমা রাগিলে তোমার রাগা অন্যায়। সে কাঁদিলে তুমি কাঁদিতে পার। সে জাগিয়া থাকিলে তোমার ঘুমাইয়া পড়া উচিত নয়; কিন্তু সে ঘুমাইয়া পড়িলে তুমি একটু জাগিয়া পরকালের চিন্তা করিতে পার। সভ্য জগৎ বহু ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছেন যে, স্ত্রীর সম্মান না করিলে তাহাদিগের সন্তানাদি কাপুরুষ হইয়া থাকে; যেমন ভারতবর্ষে।

আমরা এরূপ মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তাড়া না হড়া দিলে স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হইয়া যায়। অবলার উপর গর্জ্জন গর্জ্জন কাপুরুষের লক্ষণ।

অনেকে বৃদ্ধ বয়সে এরূপ উপায় অবলম্বন করেন। কারণ, তখন তাঁহাদিগের স্বীয় অবস্থা অবলাগণ অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়া পড়াতে, অন্য কোনও উপায় থাকে না। কিন্তু একটু বুদ্ধির সহিত চলিলে ইহাতে দোষ ঘটে না।

কোনও পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, "সংসার নামক বিদ্যালয়ে স্ত্রী যৌবনকালে সহপাঠী, বার্দ্ধক্যে গুরু, এবং মৃত্যুকালে ঈশ্বর।" মরণকালে স্ত্রী নিকটে না থাকিলে, "প্রয়াণকালে মনসাচলেন—" প্রভৃতি হয় না। অর্থাৎ, সংসার নামক মরীচিকা হইতে যদি কেহ মন ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়, সেই স্ত্রী। অতএব স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী। মৃত্যুকালে স্ত্রীর মুখ দেখিলেই সংসার অসার বোধ হয়। অতএব পূর্ব্বকালে স্ত্রীকে সম্মুখে রাখিয়া মরিবার রীতি ছিল; যেমন ভীষ্মদেবের সম্মুখে শিখণ্ডীকে রাখিয়া অর্জ্জুন সমরজয়ী হইয়া-

ছিলেন। এইরূপ উভয় পক্ষ উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেহত্যাগ করিলে যে ভাব হয়, তাহার নাম—

আধ্যাত্মিক।

আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে বিশাল অংশ দারা সুত হইতে আমরা সংগ্রহ করিয়া থাকি।

এ স্থলে জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আধিদৈবিক বিভাগে যেমন এক দিকে প্রেম (প্রণয়) প্রভৃতি লক্ষণীয়, অন্য দিকে দ্বন্দ্ব, কলহ, তর্জ্জন গর্জ্জন প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য। আজীবন প্রেম করিয়া কাটাইয়া যাওয়া ভক্তিমার্গ। ইহা ভাববাচ্যের মত। কিন্তু কর্তৃবাচ্যে কলহ উপস্থিত হয়, এবং কলহের সঙ্গে জ্ঞানের উদয়। প্রকৃতি ও পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ (সাংখ্যমতে) রহস্যজনক। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার অনেকটা মীমাংসা হইয়া যায়।

প্রকৃতি অলীক, অসার, মায়া, ভ্রম ইত্যাদি ভাব দ্বন্দ্বজাত। ইহাই জ্ঞানমার্গ।

কিন্তু অসার মায়া ভ্রম প্রভৃতির উপর আক্রমণ, এবং অন্য মায়া উপকরণ, অর্থাৎ, বাক্য ও লগুড়াদির সাহায্যে তাহা দূর করিবার চেষ্টা অতি হাস্যাস্পদ ব্যাপার। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে আত্মসংবরণই সুপ্রশস্ত। এই সূত্রানুসারে অবলার উপর অত্যাচার অতি জঘন্য পাপ। যাহা অলীক, তাহার উপর দোষারোপ প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানের কার্য্য।

কিন্তু এরূপ মহাদোষ কেন হয়? বোধ হয়, কর্তৃত্বাধিকার লইয়া।

এক সারে দুই কর্ত্তা অতি দোষের কথা। সংসারে দুই ভাগ। এক ভাগ ভ্রমপূর্ণ, অন্য ভাগ সত্য।

যে ভাগ ভ্রমপূর্ণ, তাহার কর্তৃত্বের ভার স্ত্রীর উপর অর্পণ করিয়া নিজে বসিয়া রঙ্গ দেখাই সাংখ্যকারের মত। ইহাতে ঈশ্বর অসিদ্ধ হইয়া পড়েন। যাঁহাকে লৌকিক মতে ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বলা হয়, তাঁহার সার্থকতা এরূপ রঙ্গস্থলে নাই। অর্থাৎ, জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মই আলোচ্য।

তবে ঈশ্বরের সার্থকতা কোথায়?

উত্তর,—ভক্তিমার্গে। যেখানে সৃষ্টিকে মায়া বলিয়া না উড়াইয়া, সংসারের ভাবে ধরিয়া লওয়া হয়, সেই স্থানে ঈশ্বরের সত্তা স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়।

এ স্থলে কর্ত্তৃত্ব পীর উপর প্রধান করিয়া হাস্য করা নীতিবিরুদ্ধ। জ্ঞান-মার্গে দম্ভ প্রবেশ করিয়া বসিতে পারে, ভক্তিমার্গে রসাতলে সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে। বরং একটু দুঃখিত হওয়া ভাল। কারণ, উভয় মার্গেই বিপদ আছে। জ্ঞানমার্গে যেমন ঘোর কলহ ও কর্ত্তৃত্ব লইয়া আস্ফালন হয়, ভক্তিমার্গে তেমনই প্রেমের অপব্যবহার হইতে পারে।

কেহ কেহ নিজ সহধর্ম্মিণী সম্পর্কে জ্ঞানমার্গী, এবং অন্যান্য স্ত্রীলোক সম্পর্কে ভক্তিমার্গী। ইহা দোষের নয়। যদি কেহ নিজ স্ত্রী সম্পর্কে প্রেমিক ও অন্য স্ত্রী সম্পর্কে জ্ঞানী হইয়া পড়েন, তাহাও ঠিক পথ নহে। কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত হইতে গেলেও মাথা ঠিক রাখা সুকঠিন।

সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, দারপরিগ্রহ নামক ব্যাপারে আধ্যাত্মিক বিকাশ ক্রমে নিম্নস্থান অধিকার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ ইহার তত্ত্ব বুঝিয়া কেহই দারপরিগ্রহ নামক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা কর্ম্মফল স্ত্রীজাতি-রূপ ঈশ্বরেই অর্পণপূর্ব্বক অভিমুখে কালযাপন করিতেন। সদাশিব মহেশ্বর হইয়াও গৌরীর উপর সমস্ত ভার অর্পণ পূর্ব্বক চিরসমাধিতে নিমগ্ন। এই উদাহরণ দেখিয়া মনে হইতে পারে, জ্ঞানই প্রেমের মূল। জ্ঞান হইতেই ভক্তি।

অন্য দিকে দেখিলে হয় ত মনে হইতে পারে, প্রেমরাজ্যের অন্তর হইতে জ্ঞানবৃক্ষের অঙ্কুর বাহির হইতেছে। কারণ, আত্মবিসর্জ্জন অন্য কিছুতে এত যথাতথভাবে প্রকাশ পায় না।

এইরূপে অতি সাবধানে সংসারপথে বিচরণ করিতে পারিলে দারপরিগ্রহ নামক বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

স্ত্রী পক্ষেও এইরূপ বুঝিয়া লইলে, সে দিকেও আধ্যাত্মিক উন্নতি ফুটিয়া উঠে।

অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও অতিবৃদ্ধা স্ত্রী, উভয়ে একরূপ বিকাশলাভের সর্ব্বোচ্চ-শিখরস্থ ছাত্র ও ছাত্রী। উভয়েই উভয়ে বিদ্বান। ইহাই যুক্তিতর্কের সামঞ্জস্য ও চিত্তার মধ্যম-টীকা। যেমন রায় মহাশয়ের।

আমরা ক্রমে সেই পথে চলিতেছি।

সংসারবৃক্ষে একদিকে বৃদ্ধ ও দন্তহীনা বৃদ্ধা, যেন স্নেহের কোলে হংস ও হংসী। যেন পাখা বিস্তার পূর্ব্বক পরকালের পথে উড্ডীয়মান।

নিম্নস্থ প্রান্তরে সেকালের স্মৃতি—বহুদূরবিস্তৃত। সেই পুরাতন ইতিহাস। উহাতে নূতন কিছুই নাই।

তখন উভয়ে একাকী। অর্থাৎ, উভয়ে উভয়ের সহিত মিশিয়া যায়।

দুইটি চক্ষুর অন্য কোনও সার্থকতা নাই। বাম চক্ষু দক্ষিণের সঙ্গিনী। দক্ষিণ বামের সঙ্গী। ঘটনাক্রমে একটি নষ্ট হইলে অন্যটি কিছু দিন শোকার্ত্ত-চিত্তে সংসার রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তাহা কেবল কর্ম্মভোগ।

দারপরিগ্রহ সংসারের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্যাপার। ঊর্দ্ধে যাহা মাতৃস্বরূপা, মধ্যে তাহা স্ত্রী, এবং অধোভাগে কন্যা। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভাগ ক্রমে আধ্যাত্মিক ভাগে মিশিয়া যায়।

এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, স্বর্গে স্ত্রীর সহিত দেখা হয় না। যে আত্মদান করিয়াছে, কিংবা যাহাকে আত্মদান করা গিয়াছে, সে আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র; এবং মনে থাকে যেন,—স্বর্গে দর্পণ নাই।

উভয়ে উভয়কে উদ্ধার করে। যেমন এক জন অন্ধ অন্য অন্ধ সখা কিংবা সখীকে লইয়া মহাতিমিরাবৃত পথে চলিতেছে। উভয়েই একটির ছায়া, উভয়েই মিথ্যা, কেবল স্নেহ ও মায়া সম্বন্ধই অপূর্ব্ব। কলহ করিয়া আবার মিশে, মিশিয়া আবার কলহ করে।

মহাস্মান।

—:০:—

"কত আর, কত আর হে মানব, অনিবার মত্ত দেহবলে
অপমৃত্যু, অপঘাতে, বিলোল বিনাশি সাথে ডুবিবি অতলে?
খোল আঁখি; কত আর কৃত্রিম জঞ্জাল মাঝে আত্মহত্যা করি'
কমনীয় মরণের মহিমা করিবে খর্ব্ব প্রাণপণে মরি'?

"বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ভুলি' পূতিগন্ধপরিসরে আর কতদিন
ধূলি ও কর্দ্দম মাঝে কূর্ম্ম সম বিচরিবে থাকিয়া মলিন?
সংসারের দেবদারু, শাল, তমালের তলে রহিবি পড়িয়া?
কত দিন পৃথিবীর ক্ষুদ্র রোমকূপ মাঝে মরিবি বাঁচিয়া?

"হৃদয়কুসুম তোর ঊর্দ্ধে ফুটিবে না কি মেঘলোক হ'তে ?
সহস্র সূর্য্যের কর পশিবে না প্রভু তোর হৃদয়-পরতে ?
মাটীর কুসুমগুলি মুক্তবৃন্তে মুক্তাকাশে না হ'লে বাহির,
ভূগর্ভে পায় কি কভু সুপ্রসন্ন বর্ণরাগ, সুরভি মদির ?

"বিকশিতে চাহ যদি প্রতিরোমে, রত্নদীপ-কদম্বক মত,
সুধারসে ধরণীর পুষ্ট হয়ে, ঊর্দ্ধে শির রাখিও উন্নত ;
যারা চিরবিকশিত সমাজের জগতের রত্নবেদিকায়,
দুই মুখে, দুই দিকে অমৃত টানিয়া লয় স্বরগে ধরায় !

"পুরাণ মানব-যুগে এই জীব-জগতের তরুণ উষায়,
শীত, বৃষ্টি, রৌদ্র হ'তে কৌশলে রক্ষিতে শুধু শরীর, আত্মায়,
পথিকনিবাস কভু নির্ম্মাণ করেছে তব পিতামহগণ,
কেন ওগো, লক্ষ্য ভুলি' পান্থশালে পড়ে আছে মুগ্ধ আজীবন ?

"দুর্ব্বলের ক্ষীণরক্তে সবলের পরিপুষ্টি,—ঘোষিছে সংসার ;
দুর্ব্বল-বলিতে আর হে মানব ! রচিও না পশু-পরিবার ;
অনাথ, আতুর, অন্ধ যদি তোর বক্ষ'পরে নাহি পায় স্থান,
বিধাতার পরা সৃষ্টি, জগতের প্রভু বলি' কেন অভিমান ?

"সহস্র সহস্র বর্ষ অলিখিত, অকথিত, বিকট আহবে
নাশিয়াছ কত রূপে সনাতন ব্যবধান মানবে, দানবে ;
কোটী-চন্দ্র-সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ দেবলোকে আজ পড় বাহিরিয়ে ;
হানাহানি, কাড়াকাড়ি সাজে কি হে দেবশিশু ! তুচ্ছ মাটী নিয়ে ?

"আশৈশব পরিপুষ্ট হইয়াছ যুগান্তের আবর্জ্জনা-জালে ;
স্নায়ু, মাংসপেশী শিরা হইয়াছে নিপীড়িত সহস্র জঞ্জালে ;
পাওনি সুরভি তুমি ওষধি, আকাশে, শৈলে, জগত-মধুর ;
ভ্রান্ত তুমি, হে মানব ! কূপোদকে কোথা স্বাদ অমৃত-সিন্ধুর ?

"সঙ্কীর্ণ কোটর হ'তে এস, বাহিরিয়ে এস, হে ধ্রুব মানব!
অমৃতনির্ঝরবুকে জ্বালিয়া কি ফল বল, অনল বাড়ব?
এই চিরস্নানা ধরা মানবের, দেবতার ক্ষুদ্র কেলিবন!
শ্রান্ত মোরা, দগ্ধ মোরা; আর জ্বালিও না এত বিচিত্র দহন!

"সংসার সর্ব্বস্ব নহে,—সর্ব্ব কামনার শেষ,—নহে লক্ষ্যস্থান
অনন্ত জীবন-পথে এ রম্য আশ্রম মাঝে নিমেষ-বিশ্রাম;
দু' দিনের কর্ম্মশালা, নয় ইহা কভু তোর গৃহ চিরন্তন;
তবু কেন বারবার করিস্ রে একাকার জীবন মরণ?

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোদের সমরমুখে করিছে আহ্বান;
শত পাশে স্থিতিমুখে আকর্ষিছে শান্তিভরা জনপদ, গ্রাম;
এই দুই আকর্ষণে আজন্ম রয়েছ বদ্ধ শরীরে, পরাণে;
এস সর্ব্ব বন্ধ ভু'লে একবার প্রাণ খুলে' যাই মহাস্থানে।

"'এ জীবনে শুধু ছায়া, শুধু শ্রান্তি, শুধু মায়া, শুধু অন্বেষণ,
শুধু অগ্নিকণা-আশে যথাশক্তি অনুদিন ভস্ম-আহরণ',—
আত্মার শোণিতশোষী-এইরূপ দীর্ঘশ্বাসে যারা ম্রিয়মাণ,
সবে আজ মুক্তপ্রাণে করিতেছি আমন্ত্রণ, আকুল আহ্বান।

"সারাদিন শ্রম করি' যাহারা ফিরিছ ধীরে আপন কুটীরে,
বিগলিত ক্লান্তি সম স্বেদজল যাহাদের এখনো শরীরে;
সন্ধ্যার প্রসন্ন হাসি আহ্বানিছে যাহাদের লভিতে আরাম,
এস, বাহিরিয়ে আজ, ছাড়ি' সবে গৃহপীঠ, করি মহাস্নান।

"নভোনীলিমার কোলে আঁকি' বাঁকি' চলিয়াছে দীর্ঘ ছায়াপথ,
দুই পাশে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাতীত দেবগৃহ * উজ্জ্বল, বৃহৎ;
যেথা নিত্য কামচারী দেবতারা করিতেছে মৌন অভিনয়,
অবাধে চলিছে ধীরে লক্ষকোটী পৃথিবীর ভাব-বিনিময়।

---

* নক্ষত্র সকল দেবগৃহ।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; ১।৫।২

"চল সেই পথ ধরি' প্রাণপণে লক্ষ্য করি' বিশ্বকেন্দ্রমুখে ;
যেথায়ে অমৃতসরে নিত্য সুরবালিকারা নক্ত কেলিসুখে ;
মোদের পথের পাশে তুলক-অঙ্গুলি দিয়া দেবস্থপাগণ
জ্বালি' দিবে সন্ধ্যাকালে অতৈল প্রদীপমালা ছাইয়া গগন।

"শ্যামলা ধরণী ছাড়ি' উত্তরিব সোরা যবে দূরদূরান্তরে,
কোটী কোটী মহাসূর্য্য হেরিতে পাইব কত বিরাট অম্বরে ;
গলিত অনলসারে ঝলসিলে আঁখিতারা, দিক্‌বধূগণ
অভ্র আঁখি-উন্মীলিবে, রচি' দিয়া নীলিমার নির্ম্মল অঞ্জন।

"যদি শ্রান্ত হও পথে, সুরভি, প্রতিষ্ঠা, কিংবা সপ্তর্ষিমণ্ডলে
করিও বিশ্রাম ; হেরি' ধ্রুবটীকি, অঙ্গিরা, অত্রি দেবর্ষিদ্বয়ে ;
বরেণ্য ঋষিক্ কত জন্মমরামৃত্যুহীন হেরিবে তথায়,—
অখণ্ড হোমাগ্নি জ্বালি' বিশ্বের সবনে রত উষায় সন্ধ্যায়!

"ফেনরেণুসম সবে ভেসে চলে যাবি মৌন আকাশসাগরে ;
ঘনীভূত অনন্তের চাপিবে অনন্ত ভার বাহিরে অন্তরে ;
মরমে মরমে মরি', বুঝিতে পারিবি সবে,—ভঙ্গুর, মৃণ্ময়,
প্রাণপূর্ণ দেহযন্ত্রের যত বড় মনে কর, তত বড় নয়।

"ক্রমে ক্রমে উত্তরিবে পক্ষিরাজমণ্ডলের বিচিত্র সীমায়,
মরুপুরী, মনীষুথ* পাশে অতিক্রমি' যাবে দিব্যচঞ্চলায় ;
সেই দূরদেশ হ'তে হেরিবে—তোদের দীপ্ত সবিতৃমণ্ডল
চূর্ণ হীরকের মত ক্ষুদ্র কোণে উজলিছে নীল নভস্তল।

"তখন করিবে মনে,—কি বিশাল দেবরাজ্যে নিবাস তোমার!
কি মহাসাগরবুকে ভাসিতে ডুবিতে তব আছে অধিকার!
কেন হে মানব! তুমি, ক্ষুদ্র গৃহ বিশ্ব হ'তে স্বতন্ত্র করিয়া
তাহাতেই বদ্ধ থাকি' ঘুরিছ—কাঁদিছ সদা জগৎ ভুলিয়া?

---

* সুরভি, প্রতিষ্ঠা, সপ্তর্ষি, পক্ষিরাজ, মরুপুরী, মনীষুথ, দিব্যচঞ্চলা প্রভৃতি নক্ষত্রমণ্ডলের নাম।

"তখন করিবে মনে,—তোদের পৃথিবী ত্যজে যত প্রিয়জন,
পায় তারা বহুশত শ্যামলা ধরণী, বহু নির্ম্মল গগন;
ছাড়ি' পৃথিবীর কোল ছুটে তারা প্রাণপণে দিব্য অভিসারে;
গৃহরূপে বদ্ধ রহি' তোমরা শ্মশানে অন্ধ শোকে হাহাকারে!

"তখন বুঝিবে ভাল,—তোদের পিঞ্জরগৃহে যা' কিছু হারায়,
বাহিরে আসিয়া তারা মুক্ততপে, মুক্তাকাশে খেলিয়া বেড়ায়;
হারায়নি, হারাবে না কোন দিন কোন জীব, মহাক্ষেত্র 'পরে
সহস্রবিলাসবেগে অনুদিন খেলে সবে গৃহে গৃহান্তরে।

"নেহারিবে বিন্দুসম, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলমাঝে সিন্ধু পৃথিবীর;
বহু মধ্যে কেন্দ্র সনে, প্রান্ত হ'তে অন্তহীন বিশ্বপরিধির;
নিজ নিরূপিত কক্ষে স্থাবর জঙ্গম জীব হয় আগুয়ান;
অনন্তের কেন্দ্রমুখে সবে মিলি' ছুটিয়াছে পথে দেবযান।*

"বুঝিবে,—হলেও তুচ্ছ, আছে স্থান, আছে স্থিতি, তবুও তোমার;
অণু স্থাণু সবে মিলি' পরিপূর্ণ করিয়াছে পাত্র বিধাতার!
কল্যাণকুসুমরেণু তব নিত্যদেহে আছে, পুণ্য পরিমল;
ক্ষুদ্র হোক,—বড় হোক, ক্ষীরসাগরের বিন্দু ক্ষীরই কেবল।

"চলে যাও আরো দূরে—আরো লোকলোকান্তরে, পৃথিবী ছাড়িয়া,
ছাড়ি' মহ-তপো-লোক ক্রমে বিশ্বনাভিমুখে চল গো ছুটিয়া;
পথে পথে কত শত মনস্বী, মেধাবী ঋষি, দিব্যবাসবাসী,
তোমাদের হাত ধরি' পথ দেখাইয়া দিবে স্নেহ পরকাশি'।

"শুভ্রাম্বর-পরিহিতা বনসৌদামিনীস্থির, অপূর্ব্ব, উজ্জ্বল,
বেগবতী-তনয়না, আয়ুষ্মতী, ভুবনস্থিতি—অপ্সরোমণ্ডল,†
নেহারিবে যুগকক্ষে ছুটিয়াছে নিখিলের মধ্য-সর-পানে,
পূর্ণকুম্ভা ফিরে আসি' অমৃতে ডুবাতে বিশ্ব প্রেমের প্লাবনে।

---

* দেবযান পথে বিশ্বভ্রমণের প্রসঙ্গ।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; ১।৪।৩

† বেগবতী, সুচরণা, আয়ুষ্মতী, ভুবনস্থিতি প্রভৃতি অপ্সরোবর্গের নাম।

"ক্রমে শান্ত সত্যলোকে যাত্রাশেষে যবে তোরা হ'বি উপনীত,
হেরিবি নয়ন ভরি' পুণ্য মহাস্থানতীর্থ, অমর-বাঞ্ছিত ;
বর্ত্তুল-নীলাদ্রি-ঘেরা যেথায় অচল শান্তি অচিন্ত্য, মহান্,
যেন বিশ্বদেবতার হিরণ্যবিহারবেদী স্থির, জ্যোতিষ্মান্!

"ধ্বনিহীন, গতিহীন, তথায় অচলধৈর্য্য স্তম্ভিত, উদার ;
দেশকাল অতিক্রমি' কভই ব্রহ্মর্ষি-তপা করেন বিহার ;
গতিও নিস্তব্ধ তথা! দুঃখ,—আনন্দের কণা! গরল, অমৃত!
নির্ম্মল প্রকাশ,—আর আঁধার বিস্তার, তথা চিরবিরাজিত।

"মূর্ত্তিমতী তৃপ্তি তথা বহিশ্চর-প্রাণলীলা করি' সংবরণ,
শুধু প্রাণমূলব্রহ্মে অনলকণার মত স্থির জাগরণ ;
অনাহতধ্বনি শুধু 'আরো কত! আরো কত! কোথায়! কোথায়!'
শুদ্ধ প্রণবের মত সমাধিমগন যোগি-হৃদয়-সীমায়।

"দিগ্‌বিদিক, কালস্রোত, নিরাভিবঙ্গযোগে হেথা চিরদিন,
জগতের সনাতন সেই ধ্রুব মূলাভূমে বিলুপ্ত, বিলীন ;
অপার, অতল এক সীমাহীন ব্যাপ্তি সম অমৃতসাগর
আছে চিরপ্রকাশিত প্রসন্ন দর্পণ সম নির্ম্মল, ভাস্বর!

"নিত্য আলিঙ্গন-রত সত্য-শিব-সুন্দরের বিচিত্র লীলায়,
তথায় জীবনস্রোত ফুটিতেছে কতরূপে নৌন মহিমায়!
বিভূতি, বিকাশ তথা দেবভোগ্য অমৃতের বর্ণ-গন্ধ নিয়ে,—
'সমগ্র বিশ্বের তলে একই অমৃত রস',—দেয় প্রচারিয়ে।

"সেই সুধাসাগরের দুর্জ্ঞেয় অতল হ'তে ফুল্ল শতদল
রক্তকর্ণিকায় মেলি' আছে নিজ মহিমায় স্ফুট, উজ্জ্বল!
তাহার পরাগে, দলে, রেণুতে রয়েছে কত জগৎ সুন্দর,
ওড়ি' বিশ্ববিধাতার আনন্দ্য পদাবিছায়া,—বিরাট, অক্ষর!

"যা' কিছু সেথায় আছে, সকলেরি মধ্য দিয়া অমৃতসম্ভবা
সৌম্যা সুরবালাগণ পশিবে হৃদয়ে তব চারি' হেমপ্রভা ;
প্রাণমূল ডুবাইয়া বর্ষিবে অধর-রস নির্ম্মল রভসে ;
শিথিল হইবে তব দেহবন্ধ, প্রাণ-সন্ধি, আনন্দের বশে।

"প্রভি রোমকূপপথে উদগ্র ইন্দ্রিয় এক-বাণিও প্রেরণী ;
তাহারা আনিবে বার্ত্তা প্রাণপণে অনীহের দিগ্‌-দিগন্তরী ;
দিবা, রাত্রি, ঊষা, সন্ধ্যা মৌন আলিঙ্গনে তথা হইয়া বিলীন,
রচি' দিবে দেবতায় অপলক দৃষ্টি সম এক মহাদিন।

"সে অমৃতসম্পদের অচ্ছিদ্র, অচল, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ পূর্ণতায়
হে মানব! ডুব দিয়ে চলে যেও অকাতরে অতল সীমায়!
শতজিহ্ব, লেলিহান, লুব্ধ সুধাতৃষা তব প্রাণ-প্রসন্নার,
কূলে কূলে পূর্ণ করি' হে মানব রেখো তুমি সেথা বারবার।

"দেবধানী হ'তে ধীরে মহাস্নান-রসায়ন করি' সমাপন
নিজগৃহ তীর্থ পানে ফিরিতে প্রসন্নমনে অক্লান্তচরণ,
অমনি হেরিবে পথে,—যা' ছিল সুদূরে, তাহা অতি কাছাকাছি,
খানা পৃথ্বীতল, আর সুদূর সে বিশ্বকেন্দ্র, অতি পাশাপাশি!

দগ্ধ ধরণীর বুকে পিপাসু অযুত নর, ঊর্দ্ধমুখী নারী,
নেহারিবে ফিরে সব বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত যাচে শান্তিবারি ;
মূর্ত্ত আশ্বাসের মত ঢালিও তাদের বুকে অমৃত-নবনী ;
প্রাণপণে শান্তি-বার্ত্তা প্রচারি' করিও স্নিগ্ধ, শীতল, ধরণী।"

হসিতে উঠিনু জাগি ;—বিষণ্ণ প্রভাতী বায়ু, প্রাচীকলম্বর,
ঊষার অরুণকান্তি, জাগ্রত জীবন-লীলা, আনন্দ-নিকর
আলিঙ্গি' রয়েছে মোরে ; নিদ্রালস বুকে শুধু বাজে প্রতিধ্বনি,—
"অমল, অমৃতবার্ত্তা প্রচারি করিও স্নিগ্ধ, শীতল ধরণী।"

শ্রীগঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত।

ভাষা ও আদিরস।

—:০:—

পরিশিষ্ট।

মূল প্রবন্ধে ভাষার উৎপত্তি সংশ্লেষণ-প্রণালীতে (Synthesis) আলোচনা করা হইয়াছে। আবার আরম্ভ আদিরস হইতে কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এবং তৎপরে বাক্যযন্ত্রাদি কিরূপে উহা হইতে বিকশিত হইতে পারে, তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয় বিশ্লেষণ-প্রণালীতেও (analytical) আলোচনা করা যায়। ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়ম সকল অনুসরণ করিয়া দেখা যাউক, আমরা আদিরস, ভাষাবৃত্তি ও বাক্যযন্ত্রাদির পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সক্ষম হই কি না। ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়ম এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে।

প্রকৃতির নিয়মই এই যে, একশ্রেণীয় জীবের মধ্যেও ব্যক্তিগত অল্পাধিক প্রভেদ হইতেছে। আমরা এক দল কুক্কুট পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, উহাদিগের পক্ষের বর্ণবৈচিত্র্য অগণ্য। এই বিচিত্রতার অবশ্যই পৃথক পৃথক প্রবর্ত্তক কারণ আছে। যদি একই কারণ, একই ভাবে একাধিক কুক্কুটের বংশপরম্পরার উপর ক্রিয়া করে, তবে উহারা সকলেই সম্ভবতঃ একই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে। আমরা ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের কারণ এখনও সম্যক অবগত নহি। ডারুইন তদীয় "Origin of Species" নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমাংশে বলিতেছেন,—"আমি এতক্ষণ জীবশ্রেণীর অল্পাধিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এরূপ ভাবে বর্ণিতেছিলাম, যেন উহা যদৃচ্ছাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা তাহা নহে। ঐরূপ বলায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ বিষয়ে আমাদিগের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।" মূল প্রবন্ধে এই কারণ সকলের অবোধ্যতা একরূপ স্বীকার করিয়াও ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, ভাষার আদিকারণ সম্ভবতঃ আদিরস।

যদিও জৈবিক পরিবর্ত্তনের কারণ সকল সম্যক বোধগম্য করা দুরূহ, তথাপি জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ পরিবর্ত্তন সকলের কতিপয় নিয়ামক কারণ প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নিয়ামক কারণ সকলের মধ্যে নির্ব্বাচনই সর্ব্ব-প্রধান, এবং তাহা এইরূপ।—জীবশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির যে সকল ক্ষুদ্র

সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, তাহা যে কারণসত্ত্বেই হউক, যে কারণেই হউক, যদি ঐ জীবগণের উপযোগী হয়, তবে তাহা ক্রমপরম্পরায় সঞ্চিত হইতে থাকিবে, এবং ঐ সকল শ্রেণী মধ্যে উহা বিস্তৃত হইবার এক প্রবণতা লাভ করিবে। পক্ষান্তরে যে সকল পরিবর্ত্তন উহাদিগের উপযোগে আসে না, তাহার উপর প্রাকৃতিকনির্ব্বাচনশক্তি কোনও আধিপত্যই পায় না; ঐ সকল পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তিতরূপে ঐ জীবশ্রেণীতে কোনও স্থান, কোনও অধিক ভাবে প্রসার পাইবে। আর যে সকল পরিবর্ত্তন ঐ জীবগণের উপযোগী, তাহা ক্রমে প্রাধান্যপ্রাপ্ত হইবে। কারণ, তাহার বলে সেই সকল জীব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। জীবন-সংগ্রাম ত্রিবিধ। (১) আপনার ও অন্যান্য জীবগণের আবশ্যক উপকরণের নিমিত্ত অপর জীবের সহিত ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, (২) জল বায়ু ও পঞ্চ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া, (৩) পরস্পরের সুবিধা ও অসুবিধা। প্রাকৃতিকনির্ব্বাচনবিধি প্রচারে মূলে এই আমিলেও, তৈরিক পরিবর্ত্তনের অন্যান্য অনেক অবান্তর নিয়ম আছে। যথা :— একত্রপরিবর্ত্তনবিধি (correlated variation) ডারউইন্ "Origin of Species" নামক গ্রন্থে একত্রপরিবর্ত্তনবিধির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; মানব ও মানবেতর জীবগণের মধ্যে দেখা যায় যে, দেহের এক অংশ কি কোনাংশ পরিবর্ত্তিত হইলে, অপরাংশও সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আমরা অনেক সময়ে উহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হই। কি এক অংশ অপর অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে, কি ঐ উভয় অংশের পরিবর্ত্তনের পশ্চাৎ কোনও কারণের প্রভাব নির্ভর করে, তাহা বলা যায় না। সমবয়স্ক, সমপ্রকৃতি সকল একজ ও সমভাবে পরিবর্ত্তনের দিকে বিশেষরূপে অগ্রসর হয়, যেমন দেহের মাংস ও অস্থির আপেক্ষিক, অথবা দুগ্ধ ও দধির। অনেক দিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, হস্তের পেশী সকল যদি সাধারণ নিয়ম হইতে পৃথগ্ভাবাপন্ন হয়, তবে তাহারা পদের পেশীর আকার ধারণ ও অনুকরণ করিতে উদ্যত হয়; পক্ষান্তরে পদের পেশী যদি সাধারণ নিয়ম হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে উহা হস্তের পেশী অনুকরণ করে। চক্ষু ও বর্ণ, দন্ত ও কেশ, মেদের ও দেহের বর্ণ, দেহের বর্ণ এবং ধাতু,—ইহারা অন্যান্যিত একত্রপরিবর্ত্তনশীল। অধ্যাপক হাক্সলে বলিয়াছেন বুঝাইয়াছেন যে, বলিষ্ঠ, দৃঢ় পেশল দেহ ও ক্রমশঃ অধিকোত্তর উচ্চতা এত দূর একত্র পরিবর্ত্তিত হয়, এমন কথাও তিনি বলিয়াছেন

সহিত তুলনার সম্ভোষ দেখা যায়। সমস্যা মানবের দেহ এই অবস্থা সকল পরিস্ফুট। "Origine of Species" গ্রন্থে ডারউইন্ এই একত্বপরিবর্তনবিধির দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় দিকের দৃষ্টান্ত উদাহরণ সংগৃহীত করিয়াছেন। যে সকল পাখির সম্পূর্ণ ডেনার্স ও নীল-চঞ্চু তাহারা বর্ষিল। তাই বর্ষ সাগরের পাখি দীর্ঘতীব্র। কুরচঞ্চু পাখাদের পক্ষও ক্ষুদ্র, এবং টিটিভূমিদের পদও দীর্ঘ।

জৈবিক পরিবর্তনের আর একটি নিয়ম এই দেখা যায় যে, বিশেষ যে সময়ে কোনও নির্দিষ্ট পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহা সম্ভবতঃ হইলে সম্ভবতঃ ঐ সময়েই সন্তানদিগে উদাত হয়। কোনও নির্দিষ্ট বয়সে যে পরিবর্তন উপস্থিত হয়, ডারউইন্ তাহাকে একত্বপরিবর্তনবিধির অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করেন; সুতরাং তাহা সমানভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সহিত যুক্ত না হইয়াই পারে না।

ডারউইন্ আর একটি কথার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন। এমন পরিবর্তন অনেক আছে, যাহাতে জনন-যন্ত্রের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করে। কোনও কোনও পরিবর্তনে জনন-শক্তির বর্দ্ধিতা উৎপাদন করে, আবার পরিবর্তনে ঐ শক্তির উপর কোনও ক্রিয়াই করে না; এবং অন্য বিশ পরিবর্তনে জনন-শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

ডারউইন্ এ কথা অনেকবার বুঝাইয়াছেন যে, ঐ পরিবর্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর কোন ভাবে নির্ভর করে, তাহাপেক্ষা অধিকতর রূপে জীবের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে। "ভৌগোলিক এমন অনেক পরিবর্তন উপলব্ধ হয়, যাহাদের কারণ কখনই আমরা অনুভব করিতে পারি না; যে কোন ঐ সকলের প্রকৃত কারণ সকলে আমরা অনভিজ্ঞ। যাহা হউক ঐ সকল পরিবর্তন দৃষ্ট বাহ্যিক পারিপার্শ্বিক হউক, অথবা অন্তরতর আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতাই হউক, উহা নিশ্চয় আমাদের উপর কোন বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, যাহা আমরা উপলব্ধ করি না।"

এই সকল ও অন্যান্য অনুমানের ক্রমবিবর্তনবিধির সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবার উৎপত্তি করিবার জন্য যেরূপ যত্ন করা হইয়াছে তাহা বলিতে হয় যে, তাহার কোনও আশ্চর্য্যের মধ্যে নহে। "ধারণ লইয়া ডারউইনের সময় যে সকল জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় তথ্যের উপর নির্ভর করে, তাহা মূল গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিজ এ কথা ডারউইন্ তাঁহার "Descent of Man" নামক গ্রন্থের

নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি বিশদরূপে বুঝা যাইবে। ডারুইন বলেন, "যদিও সর্ব্ববিধ প্রাণীরই ধ্বনি দ্বারা নানা প্রকার উদ্দেশ্য ও উপকার সাধিত হইয়া থাকে, তথাপি কামযন্ত্র সকল যে প্রথমতঃ বংশবৃদ্ধির উপায়-স্বরূপেই ব্যবহৃত ও উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা দৃঢ়রূপে বলা যায়। নিম্নশ্রেণীস্থ জীবের মধ্যে উর্ণনাভ ও কীট সকলকেই সর্ব্বপ্রথম ধ্বনি করিতে শুনা যায়।"

ঐ সকল জীবের ধ্বনি-উৎপাদনের নিমিত্ত ঘর্ষণ যন্ত্র আছে। উহা পুংজাতীয়গণের মধ্যেই প্রায় দেখা যায়। বয়সহকারে একই স্বরের পুনঃপুনঃ উৎপাদনবশতঃ ঐ সকল ধ্বনি উৎপন্ন হয়; এবং উহা কখনও কখনও মানবেরও শ্রুতিমধুর বোধ হইয়া থাকে। পুংজাতীয়গণ প্রধানতঃ স্ত্রীজাতীয়-দিগকে আহ্বান অথবা মোহিত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ ধ্বনি উৎপাদন করে। পুংজাতীয় মৎস্য সকল কামকালেই ধ্বনি করিয়া থাকে। বায়ুশ্বাসী জন্তু সকল স্বভাবতঃ শ্বাসযন্ত্রের দ্বারা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বাহির করিয়া থাকে; উহা একটি নলমাত্র; ঐ নলের এক মুখ ইচ্ছামত বন্ধ করা ও খোলা যাইতে পারে; সুতরাং ঐ জাতীয় নিম্নতর প্রাণিগণের যখন কোনও বিশেষ উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ আন্দোলিত হয়, তখন উহাদিগের পেশী সকল অবশ্যই শুরুতররূপে আকৃষ্ট ও কুঞ্চিত হইবে। ইহাতেই ধ্বনি উৎপন্ন হইবে; ঐ ধ্বনি উদ্দেশ্যমূলক নহে; উহা উত্তেজনা ও যন্ত্র-কুঞ্চনের ফলমাত্র।

নিম্নপ্রাণিগণের মধ্যে উভচর প্রাণীই সর্ব্বপ্রথমে বায়ু দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। ইহাদিগের মধ্যে ভেকগণের বাক্‌যন্ত্র আছে। উহারা কামকালে ঐ যন্ত্র দ্বারা প্রায় সর্ব্বদাই ধ্বনি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ যন্ত্র স্ত্রীগণের অপেক্ষা পুংগণেরই অধিক পরিপুষ্ট। অধিকাংশ কচ্ছপের মধ্যে পুংজাতীয়-গণেরই এই যন্ত্র আছে, স্ত্রীজাতীয়ের নাই; এবং উহা কামকালেই শব্দায়মান হয়। পুংজাতীয় কুম্ভীরগণ কামকালে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিয়া থাকে। সকলেই জানেন, পক্ষিগণ কামকালে স্ত্রীগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কত বিচিত্র ধ্বনি উৎপাদন করে। স্তন্যপায়ী জন্তুগণও এই কালেই অধিকতর শব্দায়মান হয়। কোনও কোনও স্তন্যপায়ী জীব (সজারু ও ভিয়েফা ইত্যাদি) কামকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সম্পূর্ণ মূক। অন্যান্য স্তন্যপায়িগণের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই, অথবা স্ত্রীগণ কামকালে ধ্বনি উৎপন্ন করিয়া স্বামী অথবা সঙ্গিনীকে আহ্বান করে। জীবতত্ত্বের এই সকল বিধানের সহিত জীব-

মণ্ডলের ঘটনা সকলের তুলনা করিয়া আমরা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত-বিশেষে সমাগত হইতে পারি।

নিম্নতম জীবমণ্ডলীতেও দেখা যায় যে, যে সকল জীবের ধ্বনি উৎপাদন করিবার যন্ত্রই নাই, তাহারাও সঙ্গীতের সুখানুভব করিতে সক্ষম হয়। সঙ্গীতের স্বর, তান, লয় সংযোগে কতিপয় প্রাণীকে আনন্দিত করে কেন, তাহা আমরা জানি না; তেমনই এক স্বাদে সুখ অন্য এক সৌরভে আনন্দ উপভোগ করি কেন, তাহাও আমরা বুঝিতে সক্ষম নহি। উভয়ই তুলারূপে দুর্ব্বোধ্য। যাহা হউক, অতি নিম্নতম প্রাণীও সঙ্গীতে অভিভূত হয়, তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা জানি যে, পৃষ্ঠকশ্রেণীস্থ জীবগণের শ্রবণেন্দ্রিয়স্বরূপ কতিপয় কেশ আছে; তাহা উপযোগী স্বরের সহিত কম্পিত হয়। মশকের শুঁড়ের উপরিস্থ কেশেও এইরূপ কম্পন লক্ষিত হইয়াছে। ঊর্ণনাভকে সঙ্গীতস্বরে আকৃষ্ট হইতে বিশিষ্ট পরিদর্শকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। ডারউইন বলেন,—"পুংজাতীয় প্রাণিগণ স্ত্রীজাতীয়গণকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত সৌন্দর্য্য লাভ করে; আমি বলি, তদ্রূপই বাক্‌যন্ত্র উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বেও পুংজাতীয় অমেরুগণ এরূপ কারণেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া কামকালে শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাই দাম্পত্য নির্ব্বাচন (Sexual Selection); সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অন্তর্গত কালসহকারে নিম্নতম সমেরুগণ জাত হইল। উহারা শ্বাসযন্ত্রের দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস করে। ঐ যন্ত্র একটি নলমাত্র; যাহা এক দিকে ইচ্ছামত বন্ধ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট বাক্‌যন্ত্র উদ্ভূত হয় নাই; ঐ নলই পেশীর সঙ্কোচবশতঃ ধ্বনি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইত। যখনই ঐ সকল জীব গুরুতর উত্তেজনা অনুভব করিত, তখনই উহাদিগের ইচ্ছার নিরপেক্ষভাবেও ঐ নল-সংলগ্ন পেশী সকল সঙ্কুচিত হইত। নিম্ন জীবগণের কাম-মত্ততা অপেক্ষা আর গুরুতর উত্তেজনা নাই।

সুতরাং কামকালে উহাদিগের ঐ নল হইতে শব্দ উৎপন্ন হওয়া অতীব স্বাভাবিক। কালক্রমে ঐ নলের অথবা ঐ নলধারী জীবের দেহযন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলে যে সকল পরিবর্ত্তন জীবের বংশবিস্তারের সহায়ক হইল, তাহা হইতে ক্রমে বাক্‌যন্ত্র ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল। অবশেষে মানবে আসিয়া ঐ যন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

সঙ্গীত অথবা বাগ্মিতা আমাদিগের মনে অনেক ভাব জাগাইয়া তুলে। ডারুইনের মতে ইহা আদিরসমূলক ভাষা উৎপত্তির অন্যতর প্রমাণ।

তিনি বলেন, "সঙ্গীত আমাদিগের মনে নানা ভাব জাগাইয়া দেয় সত্য, কিন্তু আতঙ্ক, ক্রোধ, অথবা ভীতি উৎপাদন করে না। উহাতে প্রেম ও ও প্রীতিপূর্ণ ভাব জাগাইয়া দেয়, ধর্ম্মভাব উন্মুক্ত করে। সঙ্গীত কোমল ভাবের উৎস, ভয়ঙ্কর ভাবের নহে। চীনদেশীয় প্রবাদে কথিত হয়, সঙ্গীত স্বর্গলোককে মর্ত্ত্যধামে লইয়া আসিতে সক্ষম। ইহা আমাদিগের মনেও রণমত্ততা অথবা জয়োল্লাসের ভাব জাগাইয়া দেয়। এই শক্তিময় মিশ্র ভাব সকল হইতেই উচ্চতর মহান ও গম্ভীর ভাব সকল সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।" ডাক্তার সিমান বলেন, "শত শত পৃষ্ঠা লিখিয়া যে ভাব উদ্রেকিত করা যায় না, সঙ্গীতের একটিমাত্র স্বরে তদপেক্ষা অধিক ভাব পুঞ্জীকৃত ও উন্মুক্ত করা যায়।" যখন পুংজাতীয় বিহঙ্গগণ কামোন্মত্ত হইয়া স্ত্রীজাতীয়গণকে স্বরলহরী বর্ষণ করিয়া বিমোহিত করিয়া তুলে, তখনও এইরূপ ভাবই সমুদ্ভূত হয়; কিন্তু মানবীয় সঙ্গীত অপেক্ষা বিহঙ্গ-সঙ্গীত দুর্ব্বল ও সরলতর। অদ্যাপি মানব-সঙ্গীতের প্রধান উপকরণ প্রেম। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, "সঙ্গীত হৃদয়ের যে সমস্ত সুপ্ত ভাবকে জাগাইয়া তুলে, সঙ্গীত ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানব বুঝিতে পারিত না; তাহার মর্ম্ম অনুভব করিতে মানব অদ্যাপিও সম্পূর্ণ অক্ষম।" রিকুটার বলিয়াছেন, "সঙ্গীত অদৃশ্য বস্তুর কথা বলিয়া দেয়। তাহা বুঝি জীবনে কখনই দেখিব না।" এ দিকে যখন মনের ভিতর জীবন্ত ভাব সকল অনুভূত হয়, এবং বাগ্মীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে, অথবা দৈনন্দিন মানব-ভাষায় প্রকাশলাভ করে, তখন সঙ্গীতের তান লয় আপনই আসিয়া উপস্থিত হয়। আফ্রিকা দেশের নিগ্রোজাতি উত্তেজিত হইলে অনেক সময় একের মুখ হইতে সঙ্গীত ফুটিয়া বাহির হয়; অন্যে সঙ্গীতেই তাহার উত্তর প্রদান করে। এইরূপে সঙ্গীত-লহরীতে আন্দোলিত হইয়া সমবেত নিগ্রোমণ্ডলী ঐক্যতানে গুঞ্জন করিয়া উঠে। মর্কটগণও তীব্র ভাব ব্যক্ত করিতে নানাবিধ স্বর ব্যবহার করে। ক্রোধ ও অধীরতা মৃদু স্বরে, ভীতি ও ক্লেশ উচ্চস্বরে প্রকাশ করিয়া থাকে; সঙ্গীতে যে সকল ভাব ও অনুভূতির উদ্বোধন হয়, বাগ্মীর স্বর-লহরীতে যাহার অভিব্যক্তি, তাহা গভীর; তাহা অপরিস্ফুট বলিয়াই যেন কোনও চিরাতীত যুগের চিন্তা ও আবেগ স্মরণ করাইয়া দেয়। উহা তাহারই যেন পুনরাবৃত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কামকালে সকল জন্তুই প্রেম, হিংসা, প্রতিযোগিতা ও জয়োল্লাসে মত্ত হয়। মানবের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবগণ, যাহাদিগকে অর্দ্ধমানব বলা যাইতে পারে, তাহারাও প্রণয়োদ্গমসময়ে ধ্বনি সহ তান লয়ের সংযোগ করিত। এই সকল কথা স্মরণ রাখিলেই সঙ্গীত ও ভাবপূর্ণ বাক্যের আবেগ মানব-হৃদয়ে কিরূপে উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি একরূপ বুঝা যাইতে পারে। ভাব সকল বংশপরম্পরাগত; এই সুপ্রমাণিত বিধান অনুসরণ করিলেই বুঝা যায় যে, সঙ্গীত-স্বরলহরীতে চিরাতীত কালের ভাবরাশি অস্পষ্ট স্বপ্নের মত মানব-হৃদয়ে জাগাইয়া দিবেই। সঙ্গীত, নৃত্য ও কাব্য যে এত পুরাতন কলা, ইহার প্রকৃত রহস্য এইখানেই নিহিত আছে। এতদপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায়; এই সিদ্ধান্তকে অতীতে প্রসারিত করিলে বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতই মানবীয় ভাষার অন্যতর মূল। এ স্থলে উল্লেখ করিতে হয় যে, ভাষার মূল কারণ সম্বন্ধে ডারউইনের মতের সহিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য ডারউইন এইরূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, "স্পেন্সারের সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ডিডারটের সহিত ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভাবময় মানবীয় ভাষায় যে স্বর-তরঙ্গ বিকাশ পায়, তাহা হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, আদি যুগের মানব দাম্পত্যবশীকরণ উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীতের তান ও লয় প্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এইরূপে সঙ্গীতের স্বরের সহিত অন্যগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম ভাবের সংযোগ হইয়া যায়; আর এই হেতুবশতঃই ভাষায় হৃদয়ের প্রবল আবেগ ব্যক্ত করিতে গেলে সঙ্গীতের তান লয় যেন আপনই আসিয়া পড়ে।"

বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে ভাষার উৎপত্তি উল্লিখিত উপায়ে নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই মতগুলি আপন সীমার মধ্যে যথাসম্ভব সত্য বলিয়া স্বীকার করি; কিন্তু আমার বোধ হয় যে, ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিলে আরও গভীর তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও জীব-জগতে ক্রমবিবর্ত্তন বিষয়ে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন একটি বিশেষ প্রবল শক্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র শক্তি নহে। বস্তুতঃ জৈবিক ব্যাপার সকলের মধ্যে অনেক ঘটনা এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বোধগম্য হয় না।

এ স্থলে জিরেফের কথা স্মরণ করুন। এই জন্তুর গ্রীবা দীর্ঘ হইবার কারণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, মূলে ডারউইন এইরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।—"একশ্রেণীস্থ জন্তুগণের মধ্যে পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছু কিছু ছোট বড় হইয়াই থাকে। প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাপ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এই নিয়মাধীনে যে সকল জিরেফের কোনও কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছু দীর্ঘাকৃতির হইয়াছিল, প্রায় তাহারাই জীবন-সংগ্রামে রক্ষা পাইয়াছিল। ইহারা পরস্পর অপত্যোৎপাদন করিলে, সেই অপত্য পিতৃমাতৃধর্ম্মানুক্রমবশতঃ ঐ দৈহিক দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইবে, অথবা এইরূপ দৈর্ঘ্যপ্রাপ্তির প্রবণতা লাভ করিবে। আর যাহারা ঐ বিষয়ে হীন, তাহারা গো মহিষাদি অপর পশুর সহিত জীবন-সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া বিলুপ্ত হইবার পথে অগ্রসর হইবে। ইহার ফলে জিরেফের গ্রীবা পদাদি অঙ্গাবয়ব দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ বিচারে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঐ কারণবশতঃ কেবল যে জিরেফই দীর্ঘ-দেহ হইবে, তাহা নহে; অন্যান্য সমাবস্থ জন্তুও তদ্রূপই হইবে। আফ্রিকার জিরেফ অসাধারণ দীর্ঘগ্রীব। জগতের অন্য কুত্রাপি এরূপ দীর্ঘগ্রীবের দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। জিরেফ-শ্রেণীস্থ অপর জীব জগতে অন্যত্র ঐ ভাবাপন্ন হয় না কেন, ডারউইন তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। ঐ তর্কেও ঐরূপ অনেক তর্কের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা মীমাংসা করা যায় না। আর তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, শুধু প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবিধির সাহায্যেই বিবর্ত্তনবাদ সমাক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

জীবের বংশবিস্তৃতির বিষয়ে আলোচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হইতেও উচ্চতর বিধান জীবমণ্ডলীর বিবর্ত্তন বিষয়ে সহায়তা করিতেছে; নিম্নতম জীবগণের মধ্যে কাহারও দেহ খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া, কাহারও বা দেহাংশ স্ফীত ও পরিত্যক্ত হইয়া, বংশবৃদ্ধির কার্য্য নিষ্পন্ন করে। এই উপায়ে একটি জীব হইতে দুইটি উৎপন্ন হয়। ইহাই বংশবৃদ্ধির প্রাথমিক ও সরলতম বিধান। যদি জীবন-সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জীবমণ্ডলীর ক্রমবিবর্ত্তনের একমাত্র নিয়ামক শক্তি হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত সরল ও সহজ বিধানের পরিবর্ত্তে উচ্চতর জীবশ্রেণীর বংশবৃদ্ধিবিষয়ক জটিল বিধান প্রবর্ত্তিত হইবার কোনও কারণই দেখা যায় না। কারণ, বংশ-

বৃদ্ধির নিয়ম যতই জটিল হইবে, জীবের জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার আশাও তত কম হইয়া যাইবে। জীব যতই উচ্চতর পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছে, ততই উল্লিখিত সরল ও সহজ উপায়দ্বয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। উভলিঙ্গ জীবগণ কথঞ্চিৎ উচ্চশ্রেণীস্থ। ইহাদিগের মধ্যে ঐ উপায়দ্বয়ের পরিবর্ত্তে অন্যবিধ উপায়ে বংশবিস্তৃতি সিদ্ধ হইতেছে।

এই সকল উভলিঙ্গ জীবের জনন কার্য্যে একটি বিবেচনা করিবার বিষয় আছে। যদিও ইহাদিগের প্রত্যেকেরই শরীরে স্ত্রী ও পুং উভয়বিধ জননেন্দ্রিয়ই বর্ত্তমান আছে, তথাপি অধিকাংশ স্থলেই এই শ্রেণীস্থ একটি জীবের উভয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগে অপত্য উৎপন্ন হয় না; ইহাদিগেরও দুইটি জীবের পরস্পর সংযোগ আবশ্যক হয়। এই জাতীয় যে কতিপয় জীবের মধ্যে একের উভয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগেই অপত্যোৎপাদন হইয়া থাকে, তাহাদিগেরও এইরূপ বিধান চিরদিন বংশপরম্পরায় রক্ষিত হয় না। উহারা কালক্রমে দুইটি জীব সম্মিলিত হইয়া সময় সময় বংশবিস্তার করিতে আরম্ভ করে। নচেৎ বংশলোপ হইয়া যায়। ডারউইন স্বীয় "Origin of Speciese" গ্রন্থে বলেন যে,—"অতি নিকট কুটুম্বগণের সংযোগে অপত্য উৎপন্ন হইলে, তাহার তেজ ও জননশক্তি অল্পাধিক কমিয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয় যে, কোনও একটি জীব আপন উভয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগে অপত্য উৎপাদন করিয়া বংশপরম্পরায় স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। দুইটি জীবের পরস্পর সম্মিলনে অপত্য-উৎপাদন বংশরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কস্যতঃ বহু বংশ পরেও এক এক বার ঐরূপে বংশবৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়। উদ্ভিদগণের বিষয় আলোচনা করিলে অনেক সময় এইরূপ কৌতূহলজনক ব্যাপার লক্ষিত হয় যে, তাহা উল্লিখিত নিয়ম ব্যতীত অন্য প্রকারে বোধগম্য হয় না। কোনও কোনও বৃক্ষে প্রত্যেক ফুলে পরাগরেণু ও গর্ভকেশর দৃষ্ট হয়। ইহা স্ত্রী ও পুংবীজ। এ স্থলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ঐ উভয়ের মধ্যে একটি পরিপুষ্টিলাভ করিলেও, অপরটি অপুষ্ট থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট ফুলের গর্ভকেশর ও পরাগের সংযোগে বংশবৃদ্ধির উপায় নাই। ডারউইন এই ব্যাপার সম্বন্ধে বলেন যে, "ইহা অতীব বিস্ময়কর। পরাগরেণু ও গর্ভকেশর পরস্পরের এত সন্নিহিত, তথাপি উভয়ে এক সময়ে পরিপুষ্ট না হওয়ায় উহাদিগের মিলনে অপত্য (বীজ) উৎপাদন হইতে পারিল না। এই সকল বৃত্তান্ত অতি সহজ ও সরল ভাবে বুঝা যাইতে

পারে। আমরা বিবেচনা করি যে, সময়ে সময়ে দুইটি জীবের সম্মিলন বংশবিস্তার বিষয়ে উপকারজনক অথবা অপরিহার্য্য। যে সকল পুষ্পের গর্ভকেশর ও পরাগরেণু যুগপৎ পরিপক্ক হয়, তাহাদিগেরও পতঙ্গগণ আসিয়া একের রেণু অন্যের কেশরে সংযুক্ত করিয়া বংশবিস্তারের উপায় করিয়া দেয়। পতঙ্গগণ ঐ পুষ্পের সঞ্চিত মধুর লোভে অথবা সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে, এবং রেণু বহন করিয়া উড়িয়া যাইতে পারে, তাহার বিধান ঐ পুষ্পমধ্যেই রচিত আছে। পতঙ্গগণের আগমন ইহাদিগের বংশবিস্তারের নিমিত্ত এতই আবশ্যক যে, উহা নিবৃত্ত করিলে ঐ সকল পুষ্পের বীজোৎপাদনশক্তি কমিয়া যায়। যদি প্রকৃতি এক পুষ্পের পরাগরেণু অপরের গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিবার উপায় না করিতেন, তাহা হইলে এই সকল পুষ্পমধ্যে পতঙ্গ আকৃষ্ট করিবার যে সকল উপায় আছে, এবং পতঙ্গের সহজে আগম ও নির্গমের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, শিশির কিংবা বৃষ্টিপাত পুষ্পের বীজোৎপাদনের পক্ষে অতীব অনিষ্টজনক। তথাপি বহুসংখ্যক পুষ্পের পরাগ ও গর্ভকেশর শিশির ও বৃষ্টিপাতের অধীন। এই সকল হইতে তাহাদিগের আত্মরক্ষার কোনও উপায় নাই। কিন্তু এক পুষ্পের পরাগরেণু অপরের গর্ভকেশরে সংযুক্ত হইবার নিমিত্তই ইহারা এইরূপ বিপদের মধ্যেও রক্ষিত হইয়াছে।

এই সকল বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, নিম্নতম জীবের মধ্যেও জননক্রিয়া শুধু বংশবৃদ্ধির জন্য নহে; এক জীব অপর জীবের সহিত সম্মিলনের দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্তও ঐরূপ বিধান রচিত হইয়াছে। অপরের নিরপেক্ষ হইয়া একের আত্মসর্ব্বস্বতা প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে। এই হেতু প্রকৃতি নিম্নতম শ্রেণীতেও জীবদ্বয়ের সংযোগের বিধান ক্রমশঃ শিখা দিয়াছেন। অন্যান্য সংযোগের নিমিত্ত এই সকল জীবকে অনেক সময় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিপরীত দিকে যাইয়াও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। ইহাকেই জীব-জগতের একটি আধ্যাত্মিক নিয়ম বলা যাইতে পারে। আমরা জানি না, কিরূপে এই আধ্যাত্মিক আসঙ্গলিপ্সা উৎপন্ন হইল। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, ভাষার উৎপত্তি দাম্পত্যভাবের আধ্যাত্মিক দিকের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত, কেবলমাত্র শারীরিক দিকের সহিত সেরূপ নহে। আধুনিক বিবর্ত্তনবাদের ভাষায়

বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ভাষা ও আদিরসের আধ্যাত্মিক বিভাগ একরূপবিবর্ত্তনবিধির * একমাত্র উদাহরণস্থল।

হেকেল তাঁহার বিখ্যাত "History of Creation" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মর্কট হইতে ক্রমবিবর্ত্তনের বিধান অনুসারে বর্ত্তমান মানবে উপনীত হইবার সময় একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থা ঘটিয়াছিল। সেই অবস্থায় মানব মূক অর্থাৎ ভাষাহীন ছিল। হেকেলের এই মত অসম্ভব বোধ হয় না; কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত মর্কট ও বর্ত্তমান অসভ্যতম মানবের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কত প্রভেদ। এতদুভয়ের শারীরবিধান তুল্য হইলেও আধ্যাত্মিক প্রভেদ অনেক, সন্দেহ নাই। এই হেতু একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থার কল্পনা করিতে হয়। তাহা হইলে সেই অবস্থায় মানবের আদিরসের আধ্যাত্মিক ভোগ উৎকর্ষ লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়; এবং তন্মূলে ভাষা-বিকাশের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিবর্ত্তনবাদিগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মানবেতর জীবজন্তুরও বিবেকশক্তির বীজ আছে; উহা মানবে বিকাশলাভ করিয়াছে। আধুনিক মানবেতিহাসপাঠেও জানা যায় যে, বিবেকহীন মানব জাতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ভাষাব্যবহারী মানবের পূর্ব্বে ভাষাহীন মানবের অস্তিত্ব কল্পনা নিতান্তই অসম্ভব নহে বা ওরা হইবে না। যাহা হউক, মানবের আত্মসম্বিৎ সাবৃত্তি হইতেই অর্থাৎ দাম্পত্য বৃত্তির আধ্যাত্মিক বিভাগ হইতেই ভাষার মূল বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করা আবশ্যক; কারণ, এতদুভয় কার্য্যকারণ ভাবে সম্বদ্ধ। আদিরসের আধ্যাত্মিক দেহের সহিত ভাষার উৎপত্তি জড়িত আছে।

ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিতে নয়ার উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন কোনও এক দল ব্যক্তি একত্র কোনও কার্য্য সাধনে চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা অনেক সময় যেন একরূপ তালে তালে ধ্বনি উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা সমবেত প্রবৃত্তিরই ফল। নাবিকগণ একত্র রজ্জু আকর্ষণ করিবার সময়, অথবা দাঁড় বাহিবার সময় যে সমস্বরে ঐকতান ধ্বনি করে, তাহা সকলেই জানেন। দলবদ্ধ হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার কালে সেই দল হইতে সমস্বরে যে বিকট ধ্বনি যুগপৎ উৎপন্ন হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সকল ধ্বনি নয়ার চীৎকারকেই নয়ার আদিম ভাষার প্রারম্ভ নির্দ্দেশ করেন। এই মত

* Correlated Variation.

অধ্যাপক সইস (Sayce) যাঁহার "Introduction to the Science of Language" গ্রন্থের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি একাধিক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া কোনও সাধারণ কার্য্য করিতে যায়, তাহা হইলে সকলের মনেই এক উৎসাহ উদ্যম ও তেজের ভাব উদিত হয়; তাহা হইতে আপনই মানবীয় ভাষার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। নরাম্বের এই মত মানবেতর জীবে প্রসারিত করিলে, ইহা আদিরসমূলক ভাষার উৎপত্তিবাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ, উৎসাহ, উদ্যম ও তেজের ভাব দাম্পত্য আবেগ হইতে যেরূপ উৎপন্ন হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে, আর একাধিক পুংজাতীয় জন্তু আপন শোভা ও সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা, অথবা বলপূর্ব্বক স্ত্রীজাতীয় জন্তুকে আকর্ষণ করে, ইহাই সাধারণতঃ আবশ্যক। সুতরাং কামকালে যখন জন্তুগণ আদিরসের উত্তেজনা অনুভব করে, তখনই স্বরমাধুর্য্য-প্রদর্শন ও স্বরের পরিপুষ্টি-সাধনের উপযুক্ত সময়। আর জীবতত্ত্বের আলোচনাতেও জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষেও এইরূপই বটে। কিন্তু বিহঙ্গ-সঙ্গীতকে যদি ভাষা বলা যায়, তবে জীবের ভাষার মূল প্রাকৃতিকনির্ব্বাচন অপেক্ষাও জীবন ব্যাপারের আরও গভীরতর স্তরে অনুসন্ধান করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডারউইন জীববিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া গভীরতম কারণ খোঁজা অনুমান করেন; কিন্তু তাহার সম্যকরূপে নির্দ্দেশ ও নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট জীবশ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেক জীবই অপর সকলের অপেক্ষা দেহবিধানে কিছু কিছু বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। বিবর্ত্তনবাদের ইহা এক প্রধান উপকরণ। ডারউইন ইহার কারণ নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। জীবের কোনও কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্র পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহা বিবর্ত্তনবাদের অন্যতর বিধি; ডারউইন ইহারও কারণ-অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হন নাই। সুতরাং ভাষার উৎপত্তি-নির্ণয়ে উচ্চতর কারণ অনুমান করিবার বিশেষ কোনও বৈজ্ঞানিক বাধা নাই। এ স্থলে এ কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, ডারউইন স্বয়ং জড়বাদী হইয়াও স্বীকার করিয়াছেন যে, জৈবিক পরিবর্ত্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর যত দূর নির্ভর করে, তদপেক্ষা জীবের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির উপরই অধিকতর নির্ভর করিয়া থাকে। তাঁহার এই মত আমি পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই অন্তর্নিহিত প্রকৃতি কি? আমরা বলি, আত্মা।

সুতরাং আদিমসের আধ্যাত্মিক দিক হইতে আসলবিশ্লার বিচার করিলে, ইহাতেই যে ভাষার মূল নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ থাকে না। এই মতের সহিত ডারউইনের মতের অসামঞ্জস্য হয় না, বরং একই কথার উচ্চতর দিক হইতে সমাধান হয়।

শ্রীনরসীলাল সরকার ও শ্রীশশধর রায়।

প্রাচীন ভারত।

—:০:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

The geography of Genesis is the geography of the syrian trade-route; one of its most picturesque episodes, the late of joseph by his brethren, is incident of the caravan journey.—*W. W. Hunter.*

আরব উপসাগরের তীরে কিনিকদিগের প্রতিষ্ঠা-সন্দর্শনে ইহুদিগণ এক কালে একান্ত অধৈর্য্য হইয়াছিল। তাহাদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ডেভিড ও সলমনের রাজত্বকালে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। ডেভিড যখন খ্রীষ্টজগতের পুণ্যতীর্থে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তখন এসিয়ার বাণিজ্যপথগুলি অধিকার করিতে ত্রুটী করেন নাই। যে সমস্ত স্থান হইতে এসিয়ার বাণিজ্যপথ রক্ষা করিতে পারা যায়, ডেভিড সে সমস্তই অধিকার করিয়াছিলেন। বালুময় মরুভূমির শুষ্ক তপ্ত বিস্তৃত বক্ষ হইতে বিনির্গত হইয়া যে পথে ভারতীয় পণ্যাদি দামাস্কসে যাইত, ডেভিড সেই পথ অধিকার করিয়া উত্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পশ্চিমে টায়ারের ও দক্ষিণে নিশরের বাণিজ্যপথও তাঁহারই করায়ত্ত হইয়াছিল। অবস্থা বুঝিয়া টায়রের রাজা তখন ডেভিডের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এ সকল বাইবেলের কথা।

ডেভিড তখন দামাস্কসে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ সুরক্ষিত করিলেন। পশ্চিমে লেভাণ্টে মশলার যে বাণিজ্য চলিত, তাহাও অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি পূর্ব্বকথিত রাস্তা অধিকার করিলেন। মরুপ্রধান দেশে যে নগরে অপরিমিত পানীয় বারি প্রাপ্ত

হওয়া যায়, সেই নগরই পর্য্যটক বণিকদিগের আশ্রয়স্থল হয়। ডেভিড এই কারণেই রাব্বা অধিকার করিয়াছিলেন। ডেভিডের শাসনসময় শেষ হইতে না হইতেই দামাস্কস্ হইতে ইদম পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগের বাণিজ্যপথ ইহুদীদিগের চরণ চুম্বন করিয়াছিল। ইদমবাসিগণ মিশরের বাণিজ্য-পথ শত্রু-করতল হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া ডেভিড ক্রোধান্ধ হইয়া ইদমের সমুদয় পুরুষদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন!

ডেভিডের পুত্র সলমন যখন রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন টায়র-অধিপতি হিরামের সহিত তাঁহার সন্ধি হইল। টায়র-রাজ প্রতি বর্ষে সলমনের নিকট যথোপযুক্ত কাঞ্চনও লেবাননের শৈলবালায় কাষ্ঠাদি প্রেরণ করিতেন। এই সকল উপঢৌকনের বিনিময়ে তিনি টায়র-সীমান্তের কয়েকটি নগর নিজের অধীনে রাখিবার আদেশ পাইয়া প্রতীচ্য বাণিজ্যের মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই পরিতুষ্ট ছিলেন।

বাইবেলে কথিত হয় যে, নরপতি হিরামের সাহায্যে সলমন যে সকল অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—ফিনিক আড়কাঠীদিগের তত্ত্বাবধানে সে সকল পোত টার্সিস্ ও অফির্ বন্দরে গমনাগমন করিত। এই বন্দর দুইটি যে পৃথিবীর কোন্ অংশে ছিল, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে মীমাংসিত হয় নাই। পুরাকালে লোকে মনে করিত যে, উহারা ভারতবর্ষের উপকূলে ইহুদীদিগের ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক প্রকাশ করিত। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন যে, বাইবেলের 'অফির্' বোম্বাই উপকূলের 'সোপারা' বন্দর।*

সলমনের বাণিজ্য-পথাধিকারে পেলেস্তাইন যেরূপ সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল, জেরুজালেম যেরূপ মণিমাণিক্যে সুশোভিতা হইয়াছিল, শুক্লগৃহে রাজকোষ যেরূপ পূর্ণ হইয়াছিল, একালে সে সকল বর্ণনা পাঠ করিলে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। মনে হয়, যেন উহা কবির কল্পনা। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই স্থির নহে, পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর ন্যায় সমুদয়ই চঞ্চল।

---

* The *Ophir* of the Old Testament or *Sophara* of Josephus has been variously identified with *Sopara*, the ancient Seaport of the Bombay coast; with the Sanskrit *Abhira* or delta of the Indus .... &c.

W. W. Hunter.

ঐতিহাসিক রবার্টসন অনুমান করেন যে, অফির বন্দর ভারতবর্ষে ছিল না; আফ্রিকায় ছিল।

তাই সলমনের সম্পদও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইন্দো-সিরীয় বাণিজ্যে সলমনের প্রতিষ্ঠা যেরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল, উহা তেমনই ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু সেই বিপুল সম্পদের চিত্তবিনোদন সুখ-স্বপ্ন বহুকাল পর্য্যন্ত ইহুদীদিগের হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তাহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতের মণিমাণিক্যাদি, নানাবিধ মশলা ও দুর্ম্মূল্য ভেষজসমূহের স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিল। তাই তাহাদিগের ভীষণ অধঃপতনের কালেও ইহারা গাহিয়াছিলেন,—'হে বসোরার রঞ্জিত পরিচ্ছদধারী! ইদম্ হইতে তুমি কে আসিয়াছ?' তাই যখন জেরুজালেম প্রতীচ্য-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানমন্দিরের কনকচূড়া হইতে ধূলিতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন ইহুদীগণ হিংসা ও দ্বেষে দগ্ধ হইয়া সেই কনকমন্দিরের অন্যান্য ভাগ্যবান সেবকদিগের বিরুদ্ধে নিদারুণ অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া পরশ্রীকাতরতার ও হিংসার নগ্নমূর্ত্তি দেখাইয়াছিল। আজিও আমরা তাই 'ইজাকিয়েলে' দেখিতে পাই—'টায়র সাগরসলিলে ডুবিয়া যাউক; আমরা সেই সমুদ্রমধ্যে মৎস্য ধরিব', 'তাহার ঐশ্বর্য্যাদি কিছুই থাকিবে না, দস্যুকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবে; তাহার ভগ্ন চূর্ণ ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে,' 'রাব্বা নিশ্চয়ই এক দিন তাহার উষ্ট্রশালায় পরিণত হইবে, উহার কিছুই থাকিবে না, সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে, রাব্বা-রমণীগণ অনলে পুড়িয়া মরিবে!' 'বসোরা ধূলিতে পরিণত হইবে। বিশ্বগ্রাসী অনল তাহার রম্য হর্ম্ম্যাদি ভস্মসাৎ করিবে। নারী-হৃদয়-বেদনার যেরূপ চঞ্চল হয়, বসোরার মহৎ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ও তদ্রূপ হইবে।' 'ইজাকিয়েলে' এরূপ অভিসম্পাতের শেষ নাই! ইহারই নাম হিংসা!

ইহুদীদিগের এরূপ হিংসার কারণ আছে। বাইবেল আজিও কহিতেছে যে, এ দেশের বাণিজ্য-লব্ধ অর্থে সলমন হস্তিদন্ত দ্বারা একখানি বৃহৎ সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার বহুমূল্য প্রস্তরাদি, স্বর্ণ-নির্ম্মিত তিন শত ঢাল, তাঁহার প্রমোদ-উদ্যানের শাখামৃগ ও নীলকণ্ঠ ময়ূরাদি ও দেবমন্দিরদ্বারস্থ চন্দনকাষ্ঠের সুবৃহৎ স্তম্ভাবলী আজিও ইহুদীদিগের সম্পদের স্বপ্ন দেখাইয়া থাকে। পূর্ব্বেই কহিয়াছি, সলমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীর গৌরব-রবি চির-অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী নয় শতাব্দী ধরিয়া যে সকল প্রবল জাতি ইন্দো-সিরীয় বাণিজ্য অধিকার করিবার জন্য এসিরীয়াইনর ও মিসরীয়ের প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, দুর্ব্বল ইহুদী জাতি সহস্র চেষ্টাতেও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বে আসিরিয়া, বাবিলোনিয়া ও পারস্য দেশ, পশ্চিমে গ্রীস, উত্তরে মেসিডোনিয়া, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শক্তি পরীক্ষা করিয়া ইহার বাণিজ্য অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। সেই মহা সমর-প্রাঙ্গণে যে জাতি যখন বিজয়লাভ করিয়াছিল, তাহার আধিপত্য প্রবল প্রতাপে অন্যান্য দুর্ব্বল জাতি ইহুদীদিগের ন্যায় একেবারে নষ্ট হইয়াছিল।

এই কালের ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। যতটুকু আছে, তাহাও একান্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। তবে সলমনের পর হইতেই ইহুদী য়ুরোপীয় বাণিজ্যের ইতিহাস অনেকটা পরিস্ফুট, এবং ঐতিহাসিক সত্যের উপর বহু অংশে প্রতিষ্ঠিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

The spoil found by the soldiers of Heraclius in the palace of King Khosru Perviz shows how the *products of India had entered into the country life of Persia in the 7th century A. D.*

W. W. Hunter.

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে ইহাই জানিতে পারা যায় যে, বৈদেশিক-দিগের মধ্যে পারসীকেরাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। ডেরায়াস্ যখন পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন কশ্যপ হ্রদ ও অক্সাস্ নদী তীরবর্ত্তী রাজ্যসমূহ জয় করিয়া তিনি ভারতবর্ষের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ইচ্ছামাত্রেই স্কাইলাক্স নামক জনৈক সেনাপতি অর্ণবপোতাদি লইয়া ভারতবর্ষের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।* তিনি

* Darius being desirous to know in what part the Indus (which in the second river that produces crocodiles) runs into the Sea, sent *Scylax* of *caryandra*, with others of approved fidelity, to make the discovery. They departed in divers ships from *caspyrus*, and the territories of *Pactya*; sailed down the river east ward, to the sea; and then, altering their course to the west, arrived in the 30th month, at the place where the king of Egypt (Nechao) had caused the Phenicians I mentioned before, to embark, in order to surround the coast of Lybia (Africa). After this voyage, Darius subdued the Indians, and became master of that Sea.—Herod: Book IV: as quoted in Rennell's Memoris. হেরডোটস্ লিখিয়াছেন যে, হেরডোটসের *Pactya* আটকের নিম্নবর্ত্তী বর্ত্তমান পুখ্‌তুনি।—(vide Rennell's Memoirs page 171.)

স্থির করিলেন যে, সিন্ধুনদের পথে ভারতে প্রবেশ করিবেন। অধ্যবসায়-শীল হাইলাক্স মাত্র দ্বিবর্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় ও নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বসন্তকালে নৃপতি ডেরায়াসের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ডেরায়াস দূর হইতে বিচক্ষণ সেনাপতির নিকট শুনিলেন,—ভারতবর্ষ অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ও সুরক্ষিত সমৃদ্ধিসম্পন্ন, তখনই তিনি ভারতবর্ষ জয় করিবার বাসনা করিলেন। যেমন সৌন্দর্য্য যেমন অনেক সময়ে তাহার শত্রুকে আহ্বান করিয়া আনে, ভারতের সমৃদ্ধিও তেমনই আবহমানকাল হইতে বৈদেশিক-দিগকে আকৃষ্ট করিয়া আসিয়াছে। সেকালের স্বর্ণ-সৌধ এখন দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইয়াছে, তবুও তাহার রক্ষা নাই!

ক্রমক্রমে ডেরায়াসের বিপুল বাহিনী সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী রাজ্য জয় করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহাতেই ডেরায়াস সমগ্র পারস্য-রাজ্যের রাজকরের এক-তৃতীয়াংশ অর্থ ভারতবর্ষ হইতে শোষণ করিতে পারিয়াছিলেন! * যাহা হউক, ডেরায়াসের অভিযান ও হাইলাক্সের আবিক্রিয়া গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয় ঘটাইতে পারে নাই। সভ্যতাভিমানী গ্রীকগণ সেকালে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে একান্ত বর্ব্বর বলিয়া বিবেচনা করিত; তাই তাহাদিগের কাহিনী আলোচনা করিয়া কালক্ষেপ করিতে গ্রীকগণ ভালো বোধ করিত না! সুতরাং ডেরায়াসের সঙ্গেই পারস্যের ভারত-সম্বন্ধও লুপ্ত হইয়াছিল।

তাঁহার রাজত্বকালের শতাধিক বর্ষ পরে মহাপ্রবল আলেকজান্দার ভারতাভিযানের আয়োজন করিয়াছিলেন। টায়রের অসীম সৌভাগ্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া মহাবীর আলেকজান্দার ভারতীয় বাণিজ্য আপনার করতলগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাই তিনি যখন মিশর জয় করিলেন, তখন নীল নদীর মুখে আলেকজান্দ্রিয়া নগর নির্ম্মাণ করিয়া ভারতীয় বাণিজ্যকে টায়র হইতে তথায় স্থানান্তরিত করিয়া দিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া নর্ব্বাংশে বাণিজ্যকেন্দ্র হইবার এতই উপযোগী ছিল যে, উহা বহু বর্ষ ধরিয়া পুরাকালের

* "..... in enumerating the 20 Satrapiæ of Persia (under Darius 47 Satraps), India is reckoned one of them, and is rated the highest: it being assessed in the proportion of 4680 Eubean talents of silver, out of 14, 560, the whole annual revenue..... It is worthy of remark that this tribute *was paid in gold*, whereas that of the other Satrapies *was paid in silver*..... We are told..... that gold was estimated about 13 at that time, *i.e.* the value of 13 times its weight in Silver."—Rennell's Memoirs Indus: xxv.

বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে বিরাজিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভীষণ সমর-তাড়নেও আলেকজান্দ্রিয়ার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। ভারতের সমগ্র বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

পারসীকদিগকে পরাজিত করিয়া আলেকজান্দার যখন দিমাস্ ও শেষ ডেরায়াসের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি বর্ত্তমান সমরকন্দ নগর অবধি আগমন করিয়াছিলেন। তথায় ভারতের বিস্ময়পূর্ণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া আলেকজান্দার আরও উল্লসিত হইয়া স্থির করিলেন যে, যে প্রকারেই হউক, অনন্ত রত্নের আকর এই মহাদেশ জয় করিতেই হইবে।

আলেকজান্দারের বিপুল বাহিনী তাই ধীরে ধীরে তুষারধবল হিমালয় অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল। ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বপ্রথমে আলেকজান্দার, তৎপরে তৈমুর ও সর্ব্বশেষে বাবর ঠিক একই পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন; বীর আলেকজান্দারই সেই প্রবেশ-পথের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত। হিমালয়-শৈলমালা অতিক্রম করিয়া, হিন্দুকুশ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি সিন্ধুনদের উত্তর-পশ্চিম-তীরবর্ত্তী জনপদসমূহ জয় করিয়াছিলেন, এবং তক্ষশিলার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে সিন্ধুনদে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন। * তৈমুরের ন্যায় তিনিও নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ভৌগোলিক রেনেল সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ত্তমান আটকের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে এই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। †

সিন্ধুনদতীর হইতে আলেকজান্দার-বাহিনী গাঙ্গেয়প্রদেশাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু পথিমধ্যে বিপাশা-তীরে পোরসের সহিত তাঁহার যেরূপে সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পোরস্ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আলেকজান্দার তাঁহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অভিযান-পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমেই দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যখন পঞ্চনদে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন,

---

* Rennell's Memoir Page 175.

† I take it for granted that he Named the Indus (about 327 years before Christ according to Usher; and in the month of May) at or near the site of Attock becusse.....it is the pass leading from the quarter of Cabul and Bijore from whence Alexander came.

Rennell's Memoir Page 121

See also Pages 114, 113, 176 of the Memoir.

তখন ভূলোকের সমৃদ্ধি দর্শনে, তাঁহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পঞ্চনদ ভারতবর্ষের কোহিনূর; ধনে, শিল্পে, কলে-কৌশলে, শস্যে যেমন স্থান বুঝি আর ছিল না। * কিন্তু তিনি অচিরে গণিমা-ছিলেন যে, অনন্তরত্নপ্রসবিনী বসুন্ধরার গর্ভাবস্থা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। যদি তাঁহার সৈন্যগণ, পথশ্রমে ক্লিষ্ট, অর্থাশনে পীড়িত সেনাকুল সমস্ত হইত, তাহা হইলে আলেকজান্দার নিশ্চয়ই বাসনার জাগিতেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়া সিন্ধুনদে তরণী ভাসাইয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার যে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশও দর্শন করেন নাই,—বিপাশা-তীরে তাঁহার দ্বাদশটি দেবীহি তাহার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ বহু দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সমুদ্রে উপনীত হইয়া আলেক-জান্দারের বাহিনী বহুপশ্চাতে পারস্য উপসাগরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। আলেকজান্দারের বিচক্ষণ অমাত্যবর্গ,—টলেমি, আরিষ্টাবুলাস্ ও নিয়ার্কাস্ যে সকল বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন, য়ুরোপ সেই সময় হইতেই প্রথমে ভারত কথা শিক্ষা করিয়াছিল।

এসিয়া ও য়ুরোপকে মিলিত করিবার জন্য সেলিউকাধিপতি সাধ্য মত চেষ্টা করিয়াছিলেন। আরাবেলার যুদ্ধের পর তিনি স্বয়ং পারসীক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার প্রধান অমাত্যদিগকেও উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেলিউকস ও পারস্যে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ছিল। ফিরিঙ্গীদিগের সময় হইতে আজ পর্য্যন্তও আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদেশিকগণ এ দেশে আসিয়া দেশীয়দিগকে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। এই নীতির আবিষ্কর্ত্তা ফিরিঙ্গী, বা ফরাসী নহে; ডিনেমার্ক, ওলন্দাজ, বা ইংরাজ নহে; বিশ্বজয়ী আলেকজান্দার ইহার প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার মহাবল ফ্যালাংক্স (phalanx) এই সত্যের পরিচয় দিয়া থাকে।

আলেকজান্দারের ভারতাভিযানকাহিনী পাঠ করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে ইচ্ছা হয় যে, কি জলপথে, কি স্থলপথে, আলেকজান্দার ভারতবর্ষের সহিত উভয় দিক্ দিয়াই একটা বাণিজ্য-সম্বন্ধ-সংস্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন; সমুদ্রপথে বাণিজ্যবিস্তারের ইচ্ছা তাঁহার একান্ত বলবতী হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ভাইজীস, ইউফ্রেটিস্, সিন্ধুনদ প্রভৃতির অবস্থা বিশেষ করিয়া পর্য্য-

* Rennell's Memoir; Intro; Page xxxv.

করেন। এইরূপ নানা সুবন্দোবস্ত করিয়া আলেকজান্দার আদেশ দিয়াছিলেন যে, ভারতীয় পণ্যাদি পারস্য উপসাগর হইতে এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইবে, এবং আরব-উপসাগর হইতে প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ায়, পরে সমগ্র য়ুরোপে প্রচারিত হইবে।

আলেকজান্দার যখন টায়র নগর অধিকার করেন, তখন টায়রের বিপণি-সমূহ ভারতীয় পণ্যেই পূর্ণ থাকিত। ভারতীয় পণ্য তখন পোতিঙ্গ (Patingas) হইতে ওরিয়নগাবার (Orionagabx) ও তথা হইতে মাইলোকোরুরা ককভূমি অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরে উপনীত হইত। রাইলোকোরুরা হইতে পোতযোগে ভারতীয় পণ্য টায়রে আনীত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩২ অব্দে এইরূপে ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলিত। কিন্তু টায়র যখন আলেকজান্দারের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তিনি যখন আলেকজান্দ্রিয়া নগর নির্ম্মাণ করিলেন, তখন আলেকজান্দ্রিয়া ভারতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল পরিণত হইল।

আলেকজান্দারের পতনের পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তখন টলেমিগণও মিশরে আলেকজান্দ্রিয়ার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং উহাকে ভারতীয় পণ্যের প্রধান আবাসস্থলরূপে পুনর্ব্বার পরিচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

স্বদেশী ও বিলাতী।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'মিষ্টার' সেন সুমধুর শারদীয়া রজনীর দ্বিতীয় যামে স্বদেশের পুরাণো পুষ্করিণীটার পাড়ে সটান লম্বা হইয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

No country he had hither to visited was so populous and well cultivated or abounded in so many valuable productions of *Nature* and *art*, as that part of India through which he had led his army—*Robertson.*

টলেমি আলেকজান্দারের অভিযানবৃত্তের সন্নিবারে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূবিবরণ ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১২৩ হইতে ১৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্বদেশের পুকুরটা পানায় পরিপূর্ণ। বনবাদাড়-ভরা ভাঙ্গা পাড়ের অন্ধকার-ভাগে ঝিল্লীকুল বিরল চীৎকার করিতেছিল। দেশীয় শৃগাল বিলাতীয় ব্যারিষ্টারের সহৃদয়তা লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকালের জন্য দার্শনিক বিচার-পরায়ণতার পরিচয় দিয়া নীরব হইল। গোটাকতক অন্ধকার ও গোটাকতক আলোক স্বদেশী ও বিলাতী ভাব ধরিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। গোটাকতক বিলাতী স্বপ্ন ও গোটাকতক দেশী স্বপ্ন দুই দিকে সারি সারি দাঁড়াইয়া চক্রকরে নৃত্য করিতে লাগিল।

মিষ্টার সেনের হৃদয় চিরকালই উদার। সম্মুখের ছবিগুলি তাঁহার পক্ষে একটু নূতন বোধ হইল। অতএব বিদেশীয় সিগারেটটার প্রথম ধূম একবার টানিয়াই অবশিষ্ট ভাগটা একেবারে পদদলিত করিয়া ফেলিলেন।

তখন বঙ্গের প্রথম পরিবর্ত্তনের সময়। বঙ্গনিশি প্রতি শিশিরকণায় শতাব্দীর দূষিত হৃদয়-রক্ত অন্ধকারে পরিবর্জ্জন করিতেছিল। অতিব্যথা-পরিপূর্ণ, অতিশোকক্লিষ্ট বঙ্গনৈশবায়ু পুরাতন চঞ্চলতা রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ নিশীথিনীর সহিত ঘোর অস্পষ্ট-ভবিষ্যতের দিকে চাহিতেছিল।

মাগানের ও পারে প্রকাণ্ড মাঠ। সেই মাঠে মিষ্টার সেন বাল্যসখা বিনোদের হাত ধরিয়া অনেক দিন পূর্ব্বে স্বদেশের হিতচিন্তা করিয়াছিলেন।

বিলাতী ভাবগুলি পশ্চাতে রাখিয়া এবং দেশীয় ভাবগুলির হাত ধরিয়া মিষ্টার সেন মাঠ ভাঙ্গিয়া বিনোদের বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মিষ্টার সেনের আলোক ও মিষ্টার সেনের ছায়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সেই পুরাণো ভগ্নবাড়ী! সেই বহুকালের ভগ্ন মণ্ডপ! শ্রীহীন, শক্তিহীন, বাল্যস্মৃতির পরিত্যক্ত তীর্থ! এখানে, ওখানে, কোথাও জনমনুষ্য নাই; কোথাও দেবতাও নাই। কণ্টকাবৃত দুর্গম উঠানে পদচারণ করিতে করিতে মিষ্টার সেন ডাকিলেন,—

"বিনোদ আছ!"

একটি বৃদ্ধ লগুড়-হস্তে নিকটস্থ বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন বৃদ্ধ উমাচরণ বাবুকে চিনিলেন। উমাচরণ গুপ্ত বিনোদের পিতা।

বৃদ্ধ বলিল, "কে তুমি বাবা?"

মিষ্টার সেন। আমি অপূর্ব্ব। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। বিনোদ কি এখানে নাই?

"না বাবা, সে কোথায়ও নাই, বিনোদ যে সকলকে ছাড়িয়া গিয়াছে—"

মানব-হৃদয়ের গভীর স্তরে শোক নামক একটা পদার্থের মহিমা আছে। সেটা স্বদেশী। শোকার্ত্ত বৃদ্ধ পিতার করুণ স্বর অপূর্ব্বকৃষ্ণের হৃদয়কে টানিয়া বৃদ্ধের সম্মুখীন করিল।

ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে অনেকক্ষণ বসিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন বাল্যসখা বিনোদের শেষ ইতিহাস শুনিলেন। আরদীয়া রজনী কাটিয়া গেল।

২

বিনোদের শেষ ইতিহাস ক্ষুদ্র। প্রায় ছয় মাস বিনোদ মিঃ সেনকে পত্র লিখে নাই। এম্. এ. পাশ করিয়া বিনোদ কলিকাতার একটি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়াছিল।

বিনোদ তিন মাস পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিল।

অপূর্ব্বের হৃদয়ের বন্ধু-সম্মিলনের মহান্ উৎসাহ বন্ধুবিয়োগের কঠোর মুটারাঘাতে ভগ্ন হইয়া গেল। মিঃ সেন ভাবিলেন, "দেশে থাকিয়া কি হইবে? আবার বিলাতে যাই।"

ভাবিতে ভাবিতে মিষ্টার সেন বাটীতে গিয়া ধুতিচাদর পরিধান করিলেন। বিনোদ স্বদেশভক্ত ছিল; স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিল। স্বদেশের হিতে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া বিনোদ অরাক্রান্ত হয়। সেই জ্বরই তাহার শেষ।

বেলা পাঁচটার সময় পোর্টম্যাণ্টো প্রভৃতি টানিয়া বাঁধিয়া গুছাইয়া মিষ্টার সেন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। মিষ্টার সেনের কলিকাতার বাটীতে তাঁহার জননী থাকিতেন। সংসারে আর কেহ ছিল না।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ বলিলেন, "মা! তোমাকে দেখিতে দেশের বাটীতে গিয়াছিলাম।" জননী বলিলেন, "বাবা! আমি কি জানিতাম, দেশের বাটীর এত ভাগ্য হইবে? তাই আমি কলিকাতায় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

মিষ্টার সেনের ধুতিচাদর ও প্রণামের বন্দোবস্ত দেখিয়া জননীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ স্বদেশী প্রস্রবণে উছলিয়া উঠিল। জননী পুত্রকে কোলে লইলেন। অপূর্ব্ব ভাবিল, "যদি এ সময়ে বিনোদ থাকিত!"

৩

কাঁসারিপাড়ার রামহরি গুপ্ত স্বদেশী আন্দোলনে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার অজীর্ণ হইল। "এ দেশটা কি পাগল? বিলাতী মদের কাছে কি স্বদেশী মদ? কি দুর্গন্ধ!"

পাড়ার দুষ্ট বালকগণ গুপ্তজায় ভৃত্য নিধিরামকে শাসন করিয়াছিল, "ব্যাথ্ ব্যাটা! যদি তোর বাবুর জন্য বিলাতী লইয়া যাস্, তবে মাথা কাটাইয়া দিব!" এই সুশাসনের গুণে নিধিরাম এক টাকা দরের রসা-ডিষ্টিলারির মাল লইয়া যাইত।

চতুর্দ্দিকে ঘোর বিপ্লব দেখিয়া রামহরি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। "ছোঁড়াদের জাতীয় কি একটু স্ফূর্ত্তি করিবার যো নাই?"

মানসিক ও নৈতিক অবসাদের চরম অবস্থাপন্ন রামহরি গুপ্ত ঘাতর হইয়া পড়িলেন, এবং ইতস্ততঃ তাকাইয়া মধ্যে মধ্যে হরি-নামটাও করিলেন।

ইতিমধ্যে মিষ্টার সেন উপস্থিত। কি আহ্লাদ! কি অভাবনীয় সাক্ষাৎ! "সেন! তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ! সেন! স্বদেশী ভরঙ্গে প্রাণটা যায়,—রক্ষা কর লাউসেন!"

মিঃ সেন। আমার নাম অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন।

রামহরি। বাবা, অবস্থাবিশেষে এখন তুমি লাউসেন। তোমার নেকটাই—টা কোথায়?

মিঃ সেন। দেশী নেকটাই যন্ত্রস্থ।

ওঃ! সময়ের কি গুণ? রামহরি ডাকিলেন, "অনিলা, এ দিকে আয়,—অপূর্ব্বের অবস্থা দেখে যা—বিলেত-ফেরত অপূর্ব্ব alias লাউসেন—for the present."

হাসিতে হাসিতে অনিলা আসিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে মিষ্টার সেন অনিলার সহিত একটু বিলাতী ধরণের কোর্টশিপ করিয়াছিলেন। সেটা কিন্তু বিশেষ রকমের গভীর নহে; অর্থাৎ, উভয়ের মধ্যে কাহারও বিরহের ভাব হয় নাই, এবং মতিগতির কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।

অনিলা অনেকটা বিলাতী। চক্ষু কটা; কিন্তু কটার মধ্যেও স্বদেশী বেগুনের মত একটু মাধুর্য্য ছিল। অনিলা আনন্দময়ী। অনিলা পিতার শিক্ষায় মা ভোলিয়া গিয়া বিলাতী ভাবে ও বিলাতী উপাদানে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অনিলার পশ্চাতে যে একটা স্বদেশী ভাব ছিল, সেটা কেহই জানিত না। কাজেই মিষ্টার সেনের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনটা অনিলার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। অনিলা বড় সুখী হইল।

অপূর্ব্ব। মিস্ গুপ্ত!—আজ আপনাকে আবার স্বদেশে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম।

অনিলা। আমিও আপনাকে অনেকটা পরিবর্ত্তিত দেখিয়া সুখী হইলাম।

অপূর্ব্ব। কেন?

অনিলা। আপনি খেলুড়ি করেন নাই।

অপূর্ব্ব। ওটা কি বিরক্তিজনক?

অনিলা। বোধ হয়।

অপূর্ব্ব ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

৪

অনিলা বুঝিতে পারিল, এবং অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া বিতলে লইয়া গেল।

অনিলা পূর্ব্বে চঞ্চলভাবে হাসিত, এখন স্থিরভাবে হাসিল। "আপনাকে গোটাকতক নূতন জিনিস দেখাইব।"

অনিলার সুন্দর ঘরে আর সে বিলাতী ছবি নাই। কেমন সুন্দর তুলিকা-চিত্রিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি! সে অনিলা টানিয়াছে। আর অনিলা বলিল, "এই দেখুন।"

তখন বড় বড় তোরঙ্গ খুলিয়া অনিলা রাশীকৃত মাথার ফিতা, রেশমের গলাবন্ধ, মসলিনের লেস বাহির করিয়া একে একে মিষ্টার সেনকে দেখাইল।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। "অনিলা! এগুলি তুমি বুনিয়াছ?"

অনিলা। না। এগুলি যাঁহার কারিকুরি, তিনি দেবী। তিনি চির-বিষাদিনী। আপনার বাল্যসখা বিনোদ বাবুর বিধবা স্ত্রী শান্তি।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ একটি রেশমের রুমাল বাছিয়া লইলেন। তাঁহার বিশাল নয়নে শোকাশ্রু সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া উছলিয়া পড়িল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ গবাক্ষ-পার্শ্বে গিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিলেন।

স্বদেশী হৃদয় দুর্ব্বল। তাই কি কেবল কাঁদিতে জানে?

৫

বিষাদিনী ষোড়শী শান্তি সেই ঘরের এক কোণে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলা, মূক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অনিলা সুন্দরী, কিন্তু শান্তির সৌন্দর্য্য স্বর্গের।

শান্তি মুগ্ধা; কেন না, অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেখিতে ঠিক বিনোদের মত। বাল্যকালে বিনোদকে তাহার সহোদরের মত দেখাইত। শান্তি মুগ্ধা, কেন না,

অপূর্ব্ব নিতে হবে প্রাণের সখা। বিনোদ মরিবার সময় বলিয়াছিল, "শান্তি, যদি সংসারে কখনও সহায়হীনা হও, যদি কখনও হৃদয়ে বল না পাও, তবে অপূর্ব্বকে আশ্রয় লইও। তাহাকে লজ্জা করিও না। সে ও আমি এক।"

কিন্তু মূর্চ্ছিতা বিধবা। শান্তির শক্তি থাকিলেও নাই। হৃদয়ের যে মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া বিনোদ চলিয়া গিয়াছিল, সে মায়া আবার জাগরূক হইলেও শান্তি অপূর্ব্বকৃষ্ণের শোকের গভীর মধ্যে যাইতে পারিল না।

শান্তি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অপূর্ব্ব গবাক্ষ হইতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—

"অনিলা! তিনি কোথায়?"

অনিলা। কে?

অপূর্ব্ব। বিনোদের শান্তি?

অনিলা শান্তির নিকট গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। অনিলা বলিল, "এই সেই শান্তি। আপনি একবার ও বাড়ীতে গিয়া শান্তির দাদাকে ডাকিয়া দিন।"

৩

বিনোদের শ্বশুরালয় অনিলার বাটীর পার্শ্বে। বিনোদের শ্বশুরের সহিত অনিলার পিতার কোনও দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতির একটু সম্বন্ধ ছিল। বিনোদের শ্বশুর বড়মানুষ। শান্তি বড় আদরের মেয়ে।

শান্তির দাদা নরেন্দ্র রামহরিবাবুকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। নরেন্দ্র বিনোদের চেলা। নরেন্দ্র স্বদেশপ্রিয়। নরেন্দ্র ভাবিত, "আমিও বিনোদের পথে যাইব, কিন্তু আমি এ জন্মে বিবাহ করিব না।"

বিধবা ভগ্নীর মুখ দেখিয়া নরেন্দ্রর হৃদয় গলা হইয়াছিল।

অপূর্ব্বকে দেখিয়া নরেন্দ্র অভ্যর্থনা করিল। নরেন্দ্র বলিল, "নিষ্ঠুর কেন! তুমি আমাদের বিনোদের প্রাণের সখা। তুমি বিনোদের পবিত্র স্মৃতি অবলম্বন করিয়া বিলাতীটুকু একেবারে ছাড়িয়া দাও।"

অপূর্ব্ব। কি করিতে হইবে?

নরেন্দ্র। বিলাতীর কেশাগ্র পর্য্যন্ত ছাড়িতে হইবে, এবং স্বদেশী কুশাগ্র পর্য্যন্ত ধরিতে।

অপূর্ব্ব। বেশ ভাই, তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলাম, কিন্তু আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৮। সত্যানন্দ।

—:০:—

১

এই গ্রন্থের নিবন্ধটি পড়িয়া, যোগলকেই বলুন, আর ভীমসুমিন্দরাজ ভবিষ্যদ্বক্তাই বলুন, সত্যানন্দ চরিত্রের প্রধান উপাদান। তৎকর্তৃক স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ সত্যানন্দই হউন। এই নিবন্ধের বলে কোনও গ্রন্থকার বা বিশ্বকর্তাও সত্যানন্দকে অমর করিতে পারেন নাই; এই বিশ্বাসের বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বকে যেন পুনঃ কৃতার্থ করিয়াছেন। এই নিবন্ধের বলে তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, অন্যান্য সাহসী ও দৃঢ়চেতা। যে নিক্ষাম, ত্যাগে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও সুখে বিগতস্পৃহ, স্থিরপ্রজ্ঞ, নিষ্কাম মনের বর্ণনা আছে, সত্যানন্দ সেই নিয়মে সংযত তপস্বী। এ কথা যদি যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, সত্যানন্দকে যদি সকলেই উচ্চ আদর্শের মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ভবানন্দও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিতে হয়, তিনি নৈষ্কর্ম্মিকাগ্রগণ্য। সত্যানন্দ যখন তাহাকে মহেন্দ্রের সহধর্ম্মিণী করিতে বলিলেন; তখনও সে নিষ্কামতায়, তখনও পরার্থে তিনি বিচলিত হইলেন না। ঐ জন্য তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগী পরমহংস-শিরোমণীর নিকট পরাজিত হইতে হয়, যে ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বিনী বিশ্বের অদ্বিতীয়া পরমাসুন্দরী, তিনি তাহা তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করিলেন। সেই ভয়ে বিচলিত হইয়া মাতৃসম্বোধনে, তাহার দেবতা শিক্ষাগুরু ঠাকুর সম্বোধন করিয়া তাহাকে "এখন আমাদের আনন্দমঠে আসিয়া ধ্যানস্থ হইতে" বলেন। তেমন তেমন যোগী পুরুষেরা যাহা,—যখন সত্যানন্দকর্ত্তৃক কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—সেই সময় মহাপুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। সত্যানন্দকে এরূপভাবে ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অধিকারে কেহ যদি সেই ভীষণতেজে সমাজের দুষ্কৃতি দূরীভূত হইতে দেখিয়া থাকেন, তিনিই সত্যানন্দকে মহাপুরুষ বলিতে সক্ষম হইবেন। এই জন্যই তিনি মহাপুরুষের পদতলে এ হিসাবে ঐ করিয়াছিলেন—মাপীয়া আজ করিয়াছি মাত্র। তিনি যে মুহূর্ত্তের পরে,—সেই মুহূর্ত্তের মত। মহাপুরুষের আদেশমাত্রে সত্যানন্দ যে বলিয়াছেন, —"আমি প্রস্তুত আছি।"

এ স্থলে এ কথা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের এরূপ পরিসমাপ্তি কাব্যাংশে তত ভাল বলিয়া বোধ হয় না। এ কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক স্বর্গীয় মহাকবির অমর কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া যথেষ্ট সম্ভ্রম ও বিনয়ের সহিত বলিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। মনে হয়, সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া কবি উপসংহারে একটু জোড়া তাড়া দিয়াছেন। ভবানন্দ ও সত্যানন্দের ব্রতের সফল উদ্‌যাপনে আনন্দমঠের পরিসমাপ্তিই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু নানা কারণে তাহা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মনের কথা ও বেদনা আমরা "শত্রু-শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব" ইত্যাদিতে দেখিতে পাই। মহাপুরুষ ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"ইংরাজ মিত্র রাজা, শত্রু আর নাই।" উত্তরে সত্যানন্দ বলিয়াছিলেন,—"না থাকে, সেইখানে—এই মাতৃ-প্রতিমা-সম্মুখে দেহত্যাগ করিব।" এ উক্তি কি বঙ্কিমচন্দ্রের নীরব মর্ম্মবেদনা-ব্যঞ্জক নয়? ইহাই কি আনন্দমঠের যথার্থ পরিসমাপ্তি নয়? কেবল "Liberal" সম্পাদক মহাশয়ের Justificationই কি আমাদিগকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে?

পুঁথিও বাড়িয়া গিয়াছে, লেখকের ক্ষমতাও অতি সামান্য, আপনাদের ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। অতএব, সত্যানন্দের চরিত্রের অন্যান্য মুখ্য উপাদানের বিশ্লেষণ করিবার সময় নাই। আমি এক কথায় বলিয়াছি, সত্যানন্দ-চরিত্রের মূল ভিত্তি,—তাঁহার নিষ্কাম তপস্বিভাব। ইহাতে তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য, তাঁহার ইন্দ্রিয়জয়, তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার ঈশ্বর-নিষ্ঠা, তাঁহার দয়া, তাঁহার পরহিতসাধনপ্রবৃত্তি, তাঁহার ব্রতোদ্‌যাপনের একান্ত নিষ্ঠা, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, সবই বুঝায়। এই জন্যই তাঁহার সন্তান-সেনায় তিনিই অধিপতি, তিনিই গুরু, তিনিই নিয়ন্তা। তিনি সন্তান-বাহিনী ও সন্তানধর্ম্মের স্রষ্টা ও প্রাণ। জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ, ধীরানন্দ, মহেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ সেই অতুলনীয় স্বার্থত্যাগী মাতৃ-সেবকগণ, তাঁহারই হাতের গড়া সামগ্রী। চরিত্র-গৌরবে সেই অতুল্য মাতৃ-সেবকেরা কেহই তাঁহার সমকক্ষ এমন কি, সন্নিহিতও নহেন! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই তপোনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী যথার্থই অনন্যমাতৃক, অনন্যবন্ধু ছিলেন। জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, সকলেরই সংসার ছিল, এ গ্রন্থে তাহার আভাস আছে। কিন্তু সত্যানন্দের সংসার ছিল না; ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার,—কেহই ছিল না; ছিল কেবল তাঁহার চিরজীবনের

[illegible] [illegible] [illegible] [

মহাগ্রন্থের লেখক, সেই 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রের ঋষি, যাঁহার স্বদেশপ্রেমের পূত মন্দাকিনীধারা আজ সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত ও পবিত্র করিতেছে, যাঁহার 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রের অভয় পাঞ্চজন্য-নিনাদ 'আসমুদ্রহিমাচল' সমগ্র ভারতে বিঘোষিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়কে আশার অনির্বাণ আলোকের অভিমুখে ও এক স্থির লক্ষ্যের ধ্রুবজ্যোতির দিকে আকৃষ্ট করিয়া আনন্দমঠের মাতৃমন্দিরে উপনীত করিয়াছে, সেই অমর বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গীয় স্মৃতির যথেষ্ট সম্মাননা করা হয় না। হে বঙ্গীয় যুবক! যে মহাপ্রাণ ব্রহ্মচারী অক্ষুণ্ণ ব্রতনিষ্ঠা, অসীম কার্য্যপটুতা, লোকাতীত ইন্দ্রিয়জয়, বিচিত্র ত্যাগস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, মহাকবির সেই কল্পনা-চিত্রে—সত্যানন্দ-চরিত্রে আমাদের কি কোনও শিক্ষণীয় বস্তু নাই? আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য-পথে এই মহান চিত্র কি কোনও আলোক প্রক্ষেপ করে না? সত্যানন্দ যে ধ্রুবতারার লক্ষ্যস্থির রাখিয়া মাতৃপূজার অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেইরূপ নিষ্কাম নির্ভীক চিত্তে, স্বীয় ব্রতের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া, হৃদয়ে সেই শত্রুনিসূদন শ্রীহরি—যিনি এই পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের নিধন ও ধরিত্রীর উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন,—মধু, মুর, নরক, রাবণ, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ ত্রিভুবনবিজয়ী অসুরগণও যাঁহার কোপ-বহ্নিতে তৃণের ন্যায় ভস্ম হইয়া গিয়াছে;—'যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বর্ত্তমান',—আর্য্য-জাতির শরণদাতা সেই শ্রীমধুসূদনকে সহায় জানিয়া, এই জাতীয় জীবন-পুনরুদ্বোধনরূপ কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে কি সত্যানন্দ শিক্ষা দেন না? পরাক্রমের অশুভ মুহূর্ত্তে, শুভ মাঘীপূর্ণিমার মদনবাণরে, আনন্দমঠের মাতৃমন্দিরের বিশাল কক্ষে, সেই একাণ্ড চতুর্ভুজমূর্ত্তির সমক্ষে, জীবনের ব্রত আংশিকভাবে পালন করিয়া, অসমাপ্ত অবস্থায় মহাপুরুষের আদেশে যে মহাব্রত পরিত্যাগ করিয়া সত্যানন্দকে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। হে বঙ্গীয় যুবক! আপনারা এক জনও কি সত্যানন্দের মত অবিচলিত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত স্বীয় জীবনের অনুষ্ঠেয় এই মহাব্রত মাথায় তুলিয়া লইবেন না? অগ্রসর হইয়া অঙ্গুলি রাখিবেন, সত্যানন্দের ক্ষোভের কারণ এখনও দূর হয় নাই! সে ব্রতপালন যে আপনাদের পক্ষে নিরুপদ্রব হইবে, এ মিথ্যা কথা আমি বলিব না। এখন ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব নহে। এখন ইহা কেবল স্বার্থীর উত্তেজনাময়ী মত্ত তার ক্রীড়াভূমিতে

সন্দেহ এখন ইহা উত্তরোত্তর বিপক্ষশূন্য হইতেছে বলিয়া। কিন্তু মনে হয়,—বিধাতার কৃপাও সন্নিহিত হইতেছে। এখন বাঙ্গালীর চটুল রসনা অপেক্ষা প্রকৃত স্বদেশপ্রাণ কর্ম্মবীরের শ্রদ্ধাঞ্জলি সেবা ও প্রাণপণ অনন্ত স্বার্থত্যাগ অধিকতর মর্য্যাদা লাভ করিতেছে। আট কোটী বঙ্গবাসীর মধ্যে এক কোটী—অর্দ্ধ কোটী—দশ লক্ষ, এমন কি, বিশ লক্ষ বঙ্গসন্তানও যদিও সত্যানন্দের মত নির্ভীক সর্ব্বত্যাগী হইয়া মাতৃপূজায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে সত্যানন্দের আরব্ধ ও অসমাপ্ত যজ্ঞ অবশ্যই উদ্‌যাপিত হইবে, এবং যে বাঙ্গালা প্রদেশের ভূম্যধিকারীরা একজনে ষড়যন্ত্র করিয়া পলাশীক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় বণিকের করতলে এই সোনার বাঙ্গালা সমর্পণ করিয়াছিল, বাঙ্গালীর সেই বিশ্বাসঘাতকতারূপ মহাপাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, এবং বাঙ্গালীর সেই আজীব কলঙ্ক দূর হইবে। সে দিন উষার শুভ-জন্মদিনের মত "প্রসন্নদিক্-পাংশুবিবিক্তবাতং",—সকল দিক্ প্রসন্ন হইয়া উঠিবে; পাংশু-বিরহিত সুমন্দ বায়ু বহিতে থাকিবে; "নাভ্রঘনানন্তরপুষ্পবৃষ্টিঃ",—দেবতারা আপনাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পবৃষ্টি ও পুষ্পবর্ষণ করিবেন; "শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং বভূব তজ্জন্মদিনং সুখায়!" —স্বাধীনতার সে শুভ জন্মমুহূর্ত্ত ভারতের নিখিল জড় ও চেতনের ভাগ্যে পরম সুখের মুহূর্ত্ত হইবে। "সেই মুক্তির আশা ও আনন্দ যখন মাতৃভূমির উদয়াচল স্পর্শ করিবে—তখন যে অপরূপ সঙ্গীত চতুর্দ্দিক্ হইতে ধ্বনিত-উদ্গীত হইয়া উঠিবে, তাহা আমার অন্তরে বাজিতেছে; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই!" আনন্দমঠের অমর মহাকবি যে মহৈশ্বর্য্যময় লোকে আছেন, সে স্থান হইতে তাঁহার অযোঘ আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিবেন। মহাকবি-নির্দ্দিষ্ট পথে আনন্দমঠ গঠিত হয়,—সত্যানন্দের মত দেশনায়কের অধীনে যদি পুনরায় সন্তান-বাহিনী গঠিত হয়, তাহা হইলে সে শুভ দিন শীঘ্রই আসিবে, এ কল্পনা আমাকে মুগ্ধ করিতেছে; এবং সেই পরম আশা ও আনন্দের সংবাদ এই সভাস্থলে মহানন্দে জ্ঞাপন করিয়া ও অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের † অভয়বাণী উচ্চারণ করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করি।—

কেন ভয়, ভীরু! কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়!
ছিন্ন-ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়? ‡

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

---

* রবীন্দ্রনাথ।

† শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

‡ ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির নববর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

কুকুরের সমালোচনা।

জীবদেহে মস্তিষ্ক নামক যে একটি বিশেষ গহ্বর আছে, তাহা উৎপাটন করিয়া মনুষ্য জাতির সমালোচনার স্থান হয়।

কথার উপর কথার নাম সমালোচনা। মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোনও জন্তুর সমালোচনায় অধিকার নাই। যথা, কবিতা একটি জগতের কথা, যদি কেহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, অমুকের কবিতাগুলি অতি অপকৃষ্ট, এবং তাহার কোনও অর্থ নাই, এবং কবি অতি বেকুফ ধরণের লোক,—এতৎবিধ আলোচনার নাম সমালোচনা। কবি কবিতালেখনরূপ কর্ম্ম করেন, সমালোচক তাহার সারতা ও অসারতা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। এইরূপে জগতের প্রত্যেক কর্ম্মের টীকা হইয়াছে, এবং সেই টীকাগুলির মধ্যে অধুনাদ একটী ঘোরতর প্রকারের সমালোচনা। সমালোচক জ্ঞানী। অন্য সকলে কর্ম্মী। জগতে এক দল কর্ম্ম করিয়া যায়, এবং আর এক দল তাহার অর্থ বাহির করে। মনুষ্যদেহে দুই ভাগ আছে। কর্ম্মের ভাগ ও জ্ঞানের ভাগ। দুই ভাগেরই সহিত মস্তিষ্ক নামক গহ্বরের সম্বন্ধ দেখা যায়। এক ভাগের গতিগতি, প্রবৃত্তি, অন্য ভাগ বিশ্লেষণ করিয়া দেখে। কর্ম্ম যাহা দ্বারা চালিত হয়, তাহার নাম বুদ্ধি, এবং সমালোচনা যাহা দ্বারা চালিত হয়, তাহার নাম জ্ঞান।

বলা, বাহুল্য, মৌমাছি ও জীবজন্তুগণ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। কর্ম্ম-জগতে মনুষ্যও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। বহু জ্ঞান থাকিলেও বুদ্ধি অনেক সময় ছুটে না। মৌমাছির বুদ্ধি আছে, কিন্তু জেরা করিলে তাহার জ্ঞানের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র রাবণ-নিধনকালে হনুমানের বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়াছিলেন; নচেৎ ব্রহ্মাস্ত্র পাইতেন না। হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যদুকুল ধ্বংস হইয়াছিল।

জন্তুগণের বুদ্ধিকে আমরা সংস্কার বলিয়া থাকি। মনুষ্য-সম্পর্কে 'সংস্কার,' বুদ্ধি বলিয়া অভিহিত হয়। ইহা সম্মানের খাতিরে। বুদ্ধি তাহারও বিশেষ নহে।

ইতিহাস দেখিলেই এই বিবাদ চুকিয়া যায়। বুদ্ধি যেমন ব্যাঘ্রের পশুর রাজা করে, সেইরূপ এক জাতিকে অন্য জাতির মস্তকের উপর তুলিয়া

দেয়। বুদ্ধি আপনার দিকে হেলিয়াছে। কেহ বা বা পারত্রের দিকে হেলিবে। বুদ্ধিতে কেহ কেহ ক্রিয়াশক্তিও বাড়িয়া থাকেন।

সমালোচক ইহার কোনও তথ্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া এখানে বুদ্ধির মাথা খাইয়াছেন,—অদৃষ্ট। কিন্তু সমালোচক পুরুষকারও মানেন। ইহার মীমাংসা করিতে গেলে গোলযোগ বাধে। গোলযোগ বাধে কেন?

সমালোচক অদৃষ্ট মানিয়া ক্ষান্ত হইলে বিবাদ হইত না। সমালোচক কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের কথা টানিয়া আনেন। ফলের দিকেও ঘন ঘন কটাক্ষপাত করেন। অতএব কথা বাড়িয়া যায়।

একই কর্ম্মে বহুপ্রকার ফল হয়। নিধিরাম বড় সাহেবের ভগ্নী করিয়া ডিপুটী হইয়াছিল, ক্ষুদিরাম তাহাই করিয়া জুতা খাইয়াছিল। একই প্রকরণে ফলের পার্থক্য শোচনীয়! আমিও ধার্ম্মিক, রামও ধার্ম্মিক। আমি দোকান করিয়া 'ফেল' হই, রাম লাভ করে। দরিদ্র ভিক্ষা করিয়া দুই পয়সা আনে, আমি সঙ্গদয়তা প্রকাশ করিতে গিয়া কনগ্রেসে জুতা খাই। এইরূপে কর্ম্মজগতের চঞ্চলতা অতি কদাকার অদৃষ্টবাদের অধীন হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক ইহাতে ক্ষুব্ধ হয়। জ্ঞানশক্তি চটিয়া উঠে। তবে গোটা-কতক নিয়ম, বহু গবেষণার পর, জ্ঞান অনুসন্ধানপূর্ব্বক বাহির করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, কর্ম্মের মূলে 'উৎসর্গ'।

অর্থাৎ, বিশ্বের কোনও স্থানে অভাব ঘটাইলে, অন্য স্থানে সম্পূর্ণতা উৎপন্ন হয়। এক স্থানে অন্ধকার হইলে অন্য স্থানে আলোক। এক স্থানে জয় হইলে অন্য স্থানে পরাজয়। এক স্থানে দুঃখ ঘটাইলে অন্য স্থানে সুখ। নচেৎ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ,—যদি কেহ কিছু 'চাহে', তবে প্রথম আইন অনুসারে তাহাকে উৎসর্গ করিতে হইবে। কড়ায় গণ্ডায় মূল্য না দিলে বিনিময় হইবে না। ছয়টা অঙ্গুলি চাহিলে, যে পাঁচটা আছে, তাহার প্রত্যেকটাকে খর্ব্ব করিয়া, কিংবা অন্য কোনও অংশ হারাইয়া, অভীপ্সিত ফলের পূরণ করিতে হইবে। শুধু চাহিলে ন্যাজ দিতে হইবে। এইরূপে বানরের ন্যাজ খসিয়া মানুষের দিব্য গোঁফ হইয়াছে!

তৃতীয়তঃ,—যদি ফললাভে সুখ হয়, তবে মূল্যদানে দুঃখ উপস্থিত হয়। বিনামূল্যে প্রাপ্তির সুখ জগতে নাই। যদি ইহা বুঝিতে না পার, তাহার নাম কর্ম্মভোগ।

প্রথম সূত্রানুসারে,—

জগতের কর্ম্ম একই। তাহার ফলে কি হইতেছে, কেহই জানে না। এক দিকে অভাব উৎপাদন করিয়া, এবং তদ্দ্বারা অন্য দিকে পূরণ করিয়া কর্ত্তার কোনও লাভ নাই। অতএব কর্ম্মের উদ্দেশ্য ফললাভ নহে। এরূপ কর্ম্মে সুখ দুঃখ কিছুই হয় না। সুখ+দুঃখ=০ অর্থাৎ, প্রাণ উৎসর্গ পূর্ব্বক জীবের সৃষ্টি হয়, এবং সকলেই সেই প্রণালীতে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে। তবে লাভ হয় কি?

হ্যামিল্টনের ঘাটীর সহস্র মুদ্রা মূল্যের হীরকাঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়া প্রাণতোষিণীকে দিলেও যাহা ফল, দরিদ্রকে দিলেও তাহাই ফল। অর্থাৎ, টাকা ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রজাবৃদ্ধি করে। যাহাই উৎসর্গ কর, সকলই মূলে যায়, এবং মূলের উদ্দেশ্য পরিপোষণ করে। কিন্তু দরিদ্রকে সহস্র মুদ্রা দিতে কষ্ট বোধ হইত। অঙ্গুরী কিনিতে গিয়া হয় নাই।

কিন্তু ভবিষ্যতে হইবে। প্রাণতোষিণী ফাঁকি দিলে অঙ্গুরীয়-দানের ফল কাঁসিয়া গিয়া দুঃখ হয়; এবং তাহার ফলে একটা নূতন জিনিস হয়;—তাহার নাম জ্ঞান।

যখন এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন বুদ্ধি ও জ্ঞান একাধারে বর্ত্তে। তাহার নাম প্রজ্ঞা। যাহাতে শীঘ্র বৃষোৎসর্গ ব্যাপারটা বুঝা যায়, তাহারই জন্য কর্ত্তব্যতা ও অকর্ত্তব্যতার তর্ক।

এ স্থলে পুনর্ব্বার কথাগুলির সমালোচনা অন্য প্রকারে করিতে পারেন।

১। অদৃষ্ট আছে কি না?

উত্তর।—যদি বৃষোৎসর্গের নিয়মটাকে অদৃষ্ট বলা যায়, তবে আছে। আইনই অদৃষ্ট।

২। পুরুষকার আছে কি না?

উত্তর।—যে উৎসর্গ করে, সেই পুরুষকার।

৩। কর্ম্ম তবে কি?

উত্তর।—উৎসর্গই কর্ম্ম। পলকে পলকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক কর্ম্মেরই ঐ কার্য্যে ব্যস্ত।

৪। যদি সকল কর্ম্মই উৎসর্গ, তবে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের ভাব আসে কেন?

উত্তর।—না বুঝিতে পারিলেই আসে।

৬। চুরি ভাল, কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য?

উত্তর।—এ কথার উত্তর সহজেই বুঝা যায়। যদি চুরি করার অর্থ উৎসর্গ না হয়, তবে চুরি করা নামক লাভের মূল্য আছে। তাহা শোধ করিতে হইবেই এবং করিতে গিয়া দুঃখ হইবে; কারণ চুরি করিতে গিয়া সুখ হইয়াছিল।

৭। চুরি করিতে আমি চাহি নাই, তবে প্রবৃত্তি কেন হইল?

উত্তর।—চুরি করার কর্ম্মাংশটুকুর নাম গ্রহণ, জ্ঞানাংশটুকুর নাম চুরি। কর্ম্মে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। চুরি করার ফন্দি তোমার নিজস্ব। চুরি করিবার প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়। সমালোচকের মতে, কর্ম্মে 'চুরির' ভাব তোমারই গুণে। অতএব তুমি জ্ঞানতঃ চোর। কিন্তু কর্ম্মতঃ তুমি অন্যান্য পশুর ন্যায়।

৮। তবে কি নিষ্কাম ভাবে চুরি করা যায়?

উত্তর।—কামনার নামই চুরি; অতএব নিষ্কাম ভাবে চুরি হইতে পারে না; কেবল 'গ্রহণ' হইতে পারে। গ্রহণেও অপহরণে এই পার্থক্য।

৯। মনে করুন,—যদি কেহ নিষ্কাম ভাবেই গ্রহণ করে, অথচ আমি যদি তাহাকে চুরি বলি?

উত্তর।—তাহার নাম সমালোচনা। কারণ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি মানবের আয়ত্তাধীন নহে। ইচ্ছা করিলেই কেহ অপরের ঘরে প্রবেশ করিয়া ধন গ্রহণ করিতে পারে না। তবে নিমিত্তের ন্যায় কর্ম্মচক্রে চলিতে চলিতে যখন সে কর্ম্মের মধ্যে কর্ত্তাগিরি অর্থাৎ স্বার্থপরতার ভাব আনিয়া ফেলে, তখনই চুরির কথা আসে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ঘোর রবে দার্শনিক তর্ক চলিতে পারে।

কিন্তু এই প্রণালীতে মস্তিষ্কের বিলক্ষণ উৎকর্ষ হইলেও, বুদ্ধি যে আয়ত্তাধীন হয়, তাহা বড় একটা দেখা যায় না। কারণ, উৎসর্গের ব্যাপারটা বড়ই দুঃখদায়ক।

তবে বুদ্ধির সহিত জ্ঞানের একটি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ আছে। উভয়ে সুখ দৃষ্টিতে পরস্পরের বিরোধী হইলেও, মূলে উভয়েরই সম্পূর্ণ সখ্য আছে। সেই সখ্যের নাম ভক্তি।

আছে বলিয়াই আনন্দ। কবি যখন ভাবে আত্মহারা হইয়া যান, তখন সমালোচক গদ্‌গদচিত্তে আলিঙ্গন করিতে থাকেন।

তখনও কর্ম্মের সফলতা দৃষ্ট হয়।

যখন বুঝিতে না পারা যায়, তখন অদৃষ্ট। সকলই দৃষ্টপথের মধ্যে।

ঘোর, বিরাট, বিশ্বব্যাপক অদৃষ্টের মধ্যে, জ্ঞান ক্ষুদ্র আকারে থাকিয়া, তাহাকে টানিয়া বাহনে পরিণত করে। জ্ঞান কিছুই চাহে না।

না চাহিলেই অদৃষ্ট ছোট হইয়া যায়।

যে কিছুই চাহে না, তাহার সমালোচনা নীরব, করুণাপূর্ণ, অনিমেষ আঁখির ন্যায় তীব্র, অথচ মধুর। বিশ্বের শেষ সমালোচনা তাহাই।

যখন আমাদিগের জ্ঞান ছোট থাকে, তখন বুদ্ধি বড় বোধ হয়। যেমন, মাতৃকোলে সন্তান। তাহার নাম অদৃষ্ট। যখন জ্ঞান বুদ্ধির মাথার উপর উঠে, এবং বুদ্ধিকে আয়ত্তাধীন করিয়া চালনা করে, তখন তাহার নাম পুরুষকার। যখন জ্ঞান বুদ্ধিকে আলিঙ্গন করে, তখন তাহা অপূর্ব্ব ভক্তি।

সহযোগী সাহিত্য।

—:০:—

রাজপুতানার মীনা জাতি।

মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত সাগর জেলার পুলিসের কর্ম্ম-শিক্ষার্থ যে বিদ্যালয় আছে, ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত পেয়ার ভারতবর্ষীয় অপরাধী জাতিসমূহ সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি সম্প্রতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে অন্যান্য জাতির ন্যায় রাজপুতানার মীনা জাতির বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা ঐ পুস্তক হইতে মীনা জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

দস্যুতা ও সিঁধ চুরী ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়। এই জাতির ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। বিগত আদমসুমারীতে মীনাদিগকে যুক্তপ্রদেশের মেওজাতি ও মেও জাতির সহিত এক-পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, এই তিন জাতিই এক মূল-জাতি হইতে উৎপন্ন। মেওজাতির ধর্ম্মে মুসলমান। মেওদের ধর্ম্ম যে কি, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। কিন্তু মীনারা গোঁড়া হিন্দু। মীনার বংশ-গৌরবও নিতান্ত হীন নহে।

মীনা জাতি অনেকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। অপর কোনও অপরাধী

জাতির মধ্যে গণ্য [illegible] নহে। অপরাধী জাতির সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রিজলী যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই জাতির কোনও উল্লেখ করেন নাই। তাহাতে বোধ হয়, ইহারা তত দূর অপরাধী নয়।

ঐতিহাসিক ও প্রাত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অভিযানের সময় অনেক রাজপুত রাজপুতানার অতি দুর্গম প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করে। পরে সেখানে ধীরে ধীরে বাহির হইতে আগত অন্যান্য আদিমনিবাসী জাতিগণের সহিত মিশিয়া যায়। বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়। এই মিশ্রণের ফলে মীনানায়ক সকল শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। রাজপুতানার ইতিহাসে ইহাদের স্থান অতি নগণ্য নহে। রাজপুত ও মীনা সর্দারেরা দিল্লীর ভুয়ারবংশীয় রাজগণের অধীনে রাজস্থানের একটি বিস্তীর্ণ অংশ শাসন করিত। অবশেষে দশম শতাব্দীর শেষভাগে কাছওয়াহীরা দেশ-শাসনের অধিকার কাড়িয়া লইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তখন হইতে রাজপুতানার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং ঐ প্রদেশের অন্যান্য জাতিসমূহের সহিত ইহাদের অধিকাংশ সম্প্রদায় মিশিয়া গিয়াছে। তিনটি চারি শতাব্দী ধরিয়া ইহারা "কারাওলি" রাজ্যে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, এবং রাজ্যের কৃষিকর্ম্মের ভার প্রধানতঃ ইহাদেরই উপর ন্যস্ত। জয়পুর অঞ্চলে ইহাদের হাতে অনেক বিস্তৃত কর্ম্মের ভার আছে। শ্রীযুক্ত লেপ্টিং বলেন, মীনারা (এবং শ্রীযুক্ত ক্রুকের মতে গুজরাও) রাজপুতনার নূতন রাজার অভিষেকের সময় তাঁহার ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দিবার অধিকার রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই ব্যবস্থা হইতে অনায়াসে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যাঁহারা ইহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা বাহুবলে রাজ্য অধিকার করেন নাই;—ইহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছে। কাছওয়াহীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রথমাবস্থা ইহাদের উপর রাজার দেহরক্ষার ভার ও রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত ছিল।

যে সকল মীনা রাজ্যের আইন-কানুন মানিয়া চলে, অর্থাৎ যাহারা অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতি, তাহারা হয় চাষবাস, না হয় গ্রাম্য চৌকিদারের কাজ করে। অবশিষ্ট সকলে চৌর্য্যব্যবসায়ী। কারাওলির কৃষিজীবী মীনাদিগের সহিত চৌরদের "কোলপাটি" নায়ক মীনা জাতির অন্যতম শাখার বিবাহ-বিষয়ে পরস্পরের আদান-প্রদান প্রচলিত নাই। লেপ্টরের মীনারা জমিদারী-শাসনে, কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।—

মাড়োয়ারের উত্তরাংশে ও আলমীর অঞ্চলে মীনারা প্রায় দস্যুতা ও চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মেওয়ারের উত্তর-পূর্ব্বে পার্ব্বত্য-প্রদেশে তাহারা অসম-সাহসী ষাষাবর দস্যু বলিয়া পরিচিত। দেশের সর্ব্বত্র তাহারা দস্যুব্যবসায় চালাইয়া থাকে। জয়পুরের উত্তরভাগে এই দস্যুবৃত্তিপরায়ণ মীনারা বহুল-পরিমাণে বসতি করে। অক্টোবর মাসে ইহা দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে; জুন মাস পর্য্যন্ত ইহাদের ব্যবসায় চলে। বৎসরের অবশিষ্ট কাল দস্যুতার পক্ষে তত প্রশস্ত নহে।

ইহারা দলে দলে ভ্রমণ করে। এক এক দলে নিম্নসংখ্যা পাঁচ জন লোক থাকে। কোনও কোনও দলে আবার বেশীও দেখা যায়। স্ত্রীলোক ও বালক কার্য্যে অন্তরায় হইবে বলিয়া, তাহাদিগকে দলে লওয়া হয় না। ভারতের সর্ব্বত্র ইহাদের গতিবিধি আছে। তবে সর্ব্বাপেক্ষা মুম্বই অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রদেশই ইহাদের প্রিয় কর্ম্মভূমি।

সাধারণতঃ ইহারা সিঁধ কাটিয়া চুরী করে। মাসের মধ্যে শুক্লপক্ষের ১৫ দিন ইহারা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষার ছলে গমনাগমন করিয়া সন্ধান লয়, এবং যে যে বাড়ীতে চুরি করিবে, সেই সেই বাড়ী চিহ্নিত করিয়া রাখে। পরে কৃষ্ণপক্ষের ১৫ দিনের মধ্যে চিহ্নিত বাড়ী-গুলিতে চুরি করে। বাড়ীর মেয়েরা সর্ব্বদা যে সকল অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে, তাহার দ্বারাই ইহারা গৃহস্থের আর্থিক অবস্থার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারে। এইরূপে অতিদীনবেশে আটা, ময়দা প্রভৃতি ভিক্ষার ছলে শুক্লপক্ষের কয় দিন ভ্রমণ করিতে করিতে ২৫।৩০ ক্রোশ-ব্যাপী স্থানের মধ্যে ১০।১৫ খানি বাড়ী চিহ্নিত করে। শুক্লপক্ষের মধ্যে বাড়ী চিহ্নিত করিতে করিতে যেখানে কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়, সেইখান হইতেই চুরির কাজও আরম্ভ হয়। অর্থাৎ, সর্ব্বশেষ যে বাড়ী চিহ্নিত করে, সর্ব্বপ্রথমে সেই বাড়ীতেই চুরি করে। তার পর পূর্ব্ব পথে ফিরিতে ফিরিতে সর্ব্বপ্রথমে যে বাড়ী চিহ্নিত করিয়া গিয়াছে, সেই বাড়ীতে সর্ব্বশেষে চুরি করিয়া এক দফা কাজ শেষ হয়। শুক্লপক্ষের প্রথমে যেখান হইতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, কৃষ্ণপক্ষের শেষে সেইখানে ফিরিয়া আসিয়া কার্য্য শেষ হয়।

ভিক্ষা করিবার সময় বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভিখারীরা "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। মীনারা ভিক্ষা করিবার সময় বলে "জয় বালাজী কা জয়।" তাহাদের সিঁধকাটীর নাম "রুমাল"। সিঁধকাটী লুকাইবার আবশ্যক হইলে তাহারা বলে,—"রুমাল ব্রাণ্ দেও।"

যে যে বাড়ীতে তাহাদের নজর পড়ে,—তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই সেই বাড়ীর সমস্ত সন্ধান নখদর্পণে রক্ষা করে। বাড়ীটি দেখিতে কেমন, কত বড়, বাড়ীর আশে পাশের গলিঘুঁজি কিরূপ, বাড়ীর প্রবেশ-দ্বার কয়টি, সদর, অন্দর ও খিড়কীর অবস্থান, বাড়ীতে কুকুর আছে কি না, এই সকল বিষয় তাহারা যত্নপূর্ব্বক লক্ষ্য করে, এবং মনে করিয়া রাখে। প্রায় সর্ব্বদা তাহারা মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের দেহ বেশ সুগঠিত ও গাত্রের বর্ণ গৌর।

বাসস্থান হইতে দূরদেশে যাত্রা করিবার সময় পথে কোনও উদ্যানে, কিংবা কোনও দেবমন্দিরে, অথবা কোনও নদীতীরে আড্ডা করে। মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে থাকাতে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আতিথ্য-গ্রহণেরও বিলক্ষণ সুবিধা হয়। এই সূত্রে সিঁধচুরির উপযোগী অনেক সংবাদও সংগৃহীত হয়।

মূল্যবান্ বস্ত্র ও গহনাপত্রের দিকেই ইহাদের লক্ষ্য অধিক। ছিঁচ্‌কে চুরি ইহারা প্রায়ই পছন্দ করে না। চোরাই মাল লইয়া পথ চলিবার সময় জিনিসগুলি ইহারা থলিয়ার অথবা তোরঙ্গের মধ্যে রক্ষা করে। যখন ধনী মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে থাকে, তখন গহনা আপনাদের অঙ্গে পরিধান করিয়া থাকে। রেলযোগে ভ্রমণেও ইহারা বিলক্ষণ অভ্যস্ত।

ইহারা সচরাচর জয়পুর, আলোয়ার, বিকানীর, নাভা ও ভরতপুর রাজ্যে ও দিল্লী, রোটাক ও গুরগাঁও জেলায় বসতি করে। মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে থাকিবার সময় ইহাদের সঙ্গে কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য একগাছি দড়ী ও একটি লোটা, রুটী পাকাইবার জন্য একখানি লোহার চাটু ও পূজার সাধারণ আনুষ্ঠানিক উপকরণ থাকে। তাহারা ললাটে রক্ত-চন্দন লেপন করে, এবং মাড়োয়ারী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। সময় সময় তাহারা গৌড় ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মাড়োয়ারী শ্রেষ্ঠীদিগের গৃহে পাচক ব্রাহ্মণের পরিচয়ে নিযুক্ত হয়। নীনারা এতটা চুরী ডাকাতি ভালবাসিলেও বিলক্ষণ প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী। কেহ ইহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে ইহারা প্রাণান্তেও প্রভুর বিশ্বাসহন্তা হয় না, এবং জীবন দিয়াও প্রভুর সম্পত্তি দস্যু তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করে। ইহাদের এই গুণের জন্য বেরারের মাড়োয়ারী ধনীরা নীনাদিগকেই রক্ষী নিযুক্ত করেন।

আত্ম-চৈতন্য।

আজি বুঝিয়াছি মোরা,—সত্য কি সুন্দর,
স্বাতন্ত্র্য-মহিমাদীপ্ত পৌরুষ কি ধন;
আত্মশক্তি কল্যাণ্যের কি সুধা-নির্ঝর,
কি গৌরবে বিমণ্ডিত স্বাধীন জীবন!
তাই আজ রাজরোষ তুলিয়াছে ফণা,
ক্রুদ্ধ বাসুকীর মত মহাদর্পভরে;
তাই চলিতেছে নিত্য সহস্র লাঞ্ছনা
মুক্তিমন্ত্র-উপাসক মহতের পরে।
কিন্তু বৃথা;—গরীয়সী এ আত্ম-চেতনা,
বিধাতার দিব্য দান,—ধ্রুব, মৃত্যুঞ্জয়।
অবিশ্রান্ত অত্যাচার—ন্যায়ের ছলনা,
সাধ্য কি নিভায় তাহে? হীন নীচাশয়
মদান্ধ জেতার পায় নত করে শির,
বীর দেয় সত্য লাগি' হৃদয়-রুধির।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ বোস।

পাল-রাজগণ।

ষষ্ঠ নরপতি,—রাজ্যপাল।

নারায়ণপালের পর তৎপুত্র রাজ্যপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যপাল গভীর জলাশয় ও পর্ব্বততুল্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যপালকে মধ্যম লোকপাল বলা হইয়াছে; প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে আছে,—

"তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ভৈ-
র্দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধরতুল্যকক্ষৈঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবৎ তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ॥"

রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সোমেশ্বর মিশ্র রাজ্যপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; ইনি দর্ভপাণি মিশ্রের পুত্র। তারানাথ রাজ্যপালের 'রাসপাল' নাম লিখিয়াছেন।

সপ্তম রাজা,—গোপালদেব (দ্বিতীয়)।

রাজ্যপালের ঔরসে ভাগ্যদেবীর গর্ভে দ্বিতীয় গোপালদেবের জন্ম হয়। পিতার পর ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। মদনপাল ও মহীপালের তাম্রশাসনে আছে,—

"তস্মাৎ পুরুক্ষিতীন্দ্রাগ্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দোঃ
তুঙ্গস্তোত্তুঙ্গমৌলের্দ্ধ হিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ।
শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকা
ভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যুতিখচিতচতুঃসিন্ধুচিত্রাঙ্গিকায়াঃ॥"

"চিরতরমবনেরেকপত্ন্যা ইবৈকো ভর্ত্তাভূৎ"—এই বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে, যে গোপালদেব বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অষ্টম রাজা,—বিগ্রহপালদেব (দ্বিতীয়)।

দ্বিতীয় গোপালদেবের পর দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। মদনপাল ও মহীপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, এই বিগ্রহপাল অত্যন্ত লক্ষ্মী ও পিতার প্রিয় ছিলেন; ইঁহার জন্মে পৃথিবীর তাপদূর হইয়াছিল। যথা,—

"তস্মাৎ (গোপালাৎ) ক্ষুব্ধ সবিতুর্ব্বসুকোটিবর্ষা,
কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপাল্দেবঃ।
পিতুঃ প্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন
যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ॥"

ইঁহার রাজত্বের দ্বাদশবর্ষের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

নবম রাজা—মহীপালদেব (প্রথম)।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের পর তৎপুত্র মহীপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি পাল-বংশীয় এক জন বিখ্যাত রাজা। ইঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে আছে,—ইনি যুদ্ধে সকল বিপক্ষকে নষ্ট করিয়াছিলেন, পিতার অনধিকৃত ও বিলুপ্ত রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। যথা,—

"হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পা-
দনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যম্।
নিহিত-চরণ-পদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মা-
দভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ॥"

ইঁহার পিতা, বোধ হয়, বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন না। ইনি রাজা হইয়া পিতৃনষ্ট রাজ্যগুলির উদ্ধারসাধন করেন। * লিখিত আছে, মহীপালের সেনা-গজেন্দ্র সকল প্রচুরজলযুক্ত পূর্ব্ব দিকে স্বেচ্ছানুসারে স্বচ্ছবারি পান করিয়া, মলয়পর্ব্বতের উপত্যকাভূমির চন্দনতরুতলে মৃদুমন্দগতিতে ভ্রমণ করিয়া, ঘনীভূত শীকরসমূহ দ্বারা বৃক্ষসমূহের জড়ত্ববিধান করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ আশ্রয় করিয়াছিল;—অর্থাৎ, মহীপাল সেনাগজের সাহায্যে পূর্ব্বদিকে মলয়পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভূভাগ ও হিমালয়পর্ব্বতের কটকভূমিতে প্রভুত্বস্থাপন করিয়াছিলেন। মূল শ্লোক এই,—

"দেশে প্রাচি প্রচুরপয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং
স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনু মলয়োপত্যকা-চন্দনেষু।
কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরদ্রতুল্যাঃ
প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্ যস্য সেনা-গজেন্দ্রাঃ॥"

---

* খঞ্জুরাছর শিলালিপিপাঠে জানা যায়, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চন্দ্রাত্রেয়-বংশীয় যশোবর্ম্মদেব গৌড়বাসীদিগকে রণে পরাজিত করেন। তখন গৌড়ে কে রাজা ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়েই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এ সকল বর্ণনার কোন-কোন অংশ ভ্রমের অন্তর্গত মনে করা যাইতে পারে। বাস্তবিক পাল-রাজবংশের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তারানাথ বলেন, পশ্চিম দিকের সমুদয় মগধ-সাম্রাজ্য পাল-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। রামাবতী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া ও বিহারের পালরাজগণের অধীন ছিল। আমরা অনুমান করি, পুরাতন মগধ, বিদেহ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন পাল-রাজদের প্রকৃত রাজ্য ছিল। ধর্ম্মপাল দেবপাল প্রভৃতি পরাক্রান্ত নৃপতিরা এই সীমার বাহিরেও রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। ইহারা স্বরাজ্য ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন। বিজিত রাজারা যে অধিক দিন ইহাদের অধীন থাকিত, এমন বোধ হয় না; বিদেশের সকল রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিত। কনোজ ও গুর্জ্জর-রাজপুতানার রাজাদের সঙ্গে ইহারা সংঘর্ষ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট, চৈদ্য ও লিচ্ছবি-রাজগণের সহিত ইহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

মহীপালের রাজত্বের দশম, একাদশ ও অষ্টত্রিংশ বর্ষের লিপি পাওয়া গিয়াছে। তারানাথ বলেন মহীপালদেব বাহান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। মহীপাল ১০৮৩ সম্বতের (১০২৬ খৃষ্টাব্দ) পরে রাজা ছিলেন, ইহা আমরা সারনাথের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি। মহীপাল তাঁহার স্থিরপাল ও অনুজ বসন্তপাল নামক দুই ভ্রাতার সাহায্যে সারনাথে ধর্ম্মচক্রপুনর্ভব, বৈকুণ্ঠরাজকুটীম ও অন্যান্য কীর্ত্তি করেন, এবং অনেকগুলি প্রস্তর-স্তম্ভের জীর্ণসংস্কার করেন। মহীপাল আউট অব্‌ষেণের সাহায্যে ইউরোপ প্রকৃত সংগ্রহ করিয়া, একটি বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করেন। তুর্ক ঐতিহাসিক ও তুর্কী ওয়ারী মিথাইয়া তাঁহারা ইহার ও পাল-রাজদের উল্লেখ করিয়াছেন। পৌত্রাধিপতি মহীপালের কাশীনগরীতে এক শত দেবালয় ছিল। Lamp Pillar ও নিত্যপূজা কার্য্যের জন্য ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।

দিনাজপুরের বৈগ্রামের গুপ্ত মহীপালদেবের এক লিপি আবিষ্কার করিয়াছে। ইহার সন ও তারিখ কে চাঁচিয়া ফেলিয়াছে। বিজয় রক্ষাবাহিনী জয়স্কন্ধাবার হইতে ভগবান্ বুদ্ধভট্টারকের উদ্দেশে, পরাশরগোত্রীয় শক্তি-বশিষ্ঠ-পরাশরপ্রবর ঋগ্বেদি-বহ্বৃচ-শাখাধ্যায়ী, মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্ক-বিদ্যাবিৎ, ভট্ট কৃষ্ণাদিত্য-প্রপৌত্র ভট্ট বিশ্বরূপ-পৌত্র ভট্ট ঈশ্বরাদিত্য-পুত্র ভট্ট ভবদেব (ভট্টপাটিকাবাসী) কর্ম্ম প্রদত্ত হয়। ভট্ট ভবদেব ক্রিয়া-কর্ম্মে, ভট্ট ঈশ্বরাদিত্য ধর্ম্মে ও ভট্ট মধুসূদনের পুত্র। কৃষ্ণগিরি বিহারাগত—পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষবীথীর অন্তঃপাতী গোকলিকানিবাসের মধ্যস্থ ছিল। এই সমুদায়ের অবস্থান সম্বন্ধে শিলালেখের প্রকাশক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন,—[illegible] এখন দেবীকোট বলিয়া খ্যাত,—[illegible]

মান আমলে যাহার বড় নাম ছিল, তাহার প্রাচীন নাম কোটিবর্ষবিষয়। পাল-রাজগণের সময় কোটিবর্ষ একটি বৃহৎ বিভাগ ছিল। গোকলিকামণ্ডল,—নিংপুর ডাকঘর হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত; বর্ত্তমান নাম 'গোআলা।' গোআলা পূর্ব্বকার গোকলিকামণ্ডলের অংশমাত্র। গোআলা গ্রামের এক ক্রোশ দক্ষিণস্থ কুরণ্ডগ্রামের প্রাচীন নাম 'কুরটপল্লী'। চুটপল্লীর বর্ত্তমান নাম 'চুহাড়া'. ইহা কুরণ্ডগ্রামের কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। বিলাসপুর কোথায় ছিল, জানা যায় নাই। ইহা গঙ্গার তীরবর্ত্তী ছিল। সমস্ত তাম্রশাসনই কোন-না-কোন জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। রাজধানী গৌড়ে থাকিয়া কেহ তাম্রশাসন প্রদান করেন নাই। রাজগণ অলসের ন্যায় রাজধানীতে বসিয়া থাকিতেন না,—রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রজার প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেন; নদীতীরে জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হইলে, লোকজনের যাতায়াতের জন্য নৌ-সেতু নির্ম্মিত হইত; নৌ-সেতুগুলি খুব উচ্চ হইত। গঙ্গার ন্যায় প্রবল স্রোতস্বিনীর উপর উচ্চ-নৌ-সেতুনির্ম্মাণ অল্প কৌশলের কার্য্য নহে।

পরমসৌগত, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর মহীপালদেব নিজে বুদ্ধদেবের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন, কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধে তারতম্য করিতেন না। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। রাজা এ দিকে পরমসৌগত ছিলেন,—কিন্তু আবার বিষুবসংক্রান্তিতে বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধভট্টারকের উদ্দেশে হিন্দুব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইয়াছে। হিন্দুব্রাহ্মণ বুদ্ধভট্টারকের জন্য দান গ্রহণ করিতেন! বুদ্ধ সন্তুষ্ট হইবেন—যদি এই উদ্দেশ্য হয়, তবে ধর্ম্মপালের নারায়ণভট্টারকের উদ্দেশে ও নারায়ণপালের শিব-ভট্টারকের উদ্দেশে ভূমিদানেরও সেই উদ্দেশ্য হইতে পারে। কিন্তু কোনও কার্য্য না থাকিলে ভূমিদান করিবেন কেন? অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধ-দেবালয়ের তত্ত্বাবধান-ভার ব্রাহ্মণের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব নারায়ণের অবতার হইয়া হিন্দুদেরও উপাস্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকে তখন ভুলিয়া যাইতেছিল, অথবা তখন ভুলিয়াই গিয়াছিল।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করা হয় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা বিধর্ম্মী রাজার দানগ্রহণ করিতেন না। যে ভূমি দান করা হইয়াছে, তাহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। দিনাজপুর, রঙ্গপুর অঞ্চলে পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণসজ্জনের বাস ছিল; উহা এখনকার ন্যায় অস্বাস্থ্যকর ছিল না।

নারায়ণপালের তাম্রশাসনে যে যে কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, মহীপালের তাম্রশাসনে সেই সেই কর্ম্মচারীর নাম আছে,—কেবল 'অঙ্গরক্ষ' পদটি নূতন

দেখিতেছি। অঙ্গরক্ষ শব্দের অর্থ শরীররক্ষী (Aide-de-camp)। এই শাসনপত্রেও গৌড়, মালব, খশ, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, চাট, ভাট ও সেবক-দিগকে এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে জানাইয়া ভূমিদান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, চাট-ভাট যেন তোমার অধিকারে প্রবেশ না করে। উহারা কি এতই দৌরাত্ম্য করিত যে, উহাদের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইত? মেদদের কোন সন্ধানই পাইলাম না। কুলিক কাহারা? কর্ণাটেরা এ দেশে আসিল কেন? বঙ্গের সেন-বংশীয় রাজগণ কর্ণাট হইতে আগমন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারাই কি সেই সেন-রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ? ইঁহাদেরই নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া কি সেন-রাজগণ এ দেশে রাজ্যস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? মালবেরা এ দেশে আসিত কেন? গৌড়দিগকে জানাইয়া ভূমিদান করা হইল কেন? নারায়ণপালের তাম্রশাসনে গোদজাতির উল্লেখ আছে, তাহারাই কি গৌড় হইয়া উঠিয়াছিল? গৌড়নগর-স্থাপনের মূল কি এই গোদ-জাতি? এই সকল তত্ত্বের মীমাংসা হইলে, বাঙ্গালার ইতিহাস-রচনার পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়া যায়।

দেখিতেছি, রাজগণের অনেক হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ, অজ ও অবিক থাকিত। এই সকল জন্তুগণের তত্ত্বাবধানের জন্য ছোট-বড় নানা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। উষ্ট্র দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হইত? এ দেশ জলার্দ্র, উষ্ট্র দ্বারা এ দেশে কোনও কার্য্য হয় না; বোধ হয়, পশ্চিমাঞ্চলে গমনাগমনের জন্য উষ্ট্র রাখা হইত।

ভট্ট শ্রীবামন অর্থাৎ শ্রীবামন ভট্ট মহীপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মঙ্গলবাড়ীর গরুড়স্তম্ভ হইতে ভট্টগুরব মিশ্র পর্য্যন্ত মন্ত্রিগণের নাম পাইয়াছি। ভট্টগুরব নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন। নারায়ণপালের পর রাজ্যপাল, ২য় গোপাল ও ২য় বিগ্রহপাল রাজত্ব করেন। বামনভট্ট, বোধ হয়, গুরবমিশ্রের পুত্র বা পৌত্র হইবেন।

পোষ্যলীগ্রাম-নিবাসী বিজয়াদিত্যের পুত্র মহীধরশিল্পী কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই সকল শিল্পী কোন্-জাতীয় লোক,—তাহা বুঝা যায় না।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ও বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে মহীপালের নামসংশ্লিষ্ট অনেক স্থান দৃষ্ট হয়। এই সকল নামের সহ গৌড়াধিপ মহীপাল কি পরিমাণে সংসৃষ্ট, তাহা জানা যায় না। ধর্ম্মপালের সমবে পাল-বংশীয় এক মহীপাল বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব-প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। লিখিত আছে, উৎকলরাজ রেবাচার্য্য মহীপালের করদ ছিলেন। এই নামের কোনও রাজা উৎকলের মুখ্য

রাজা ছিলেন না, ইনি হয় ত ক্ষুদ্র রাজা হইবেন। বরাহকেশরী মহীপালের সময় উৎকলে রাজত্ব করিতেন।

১১ রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপি-পাঠে জানা যায়, তিনি সংগ্রামকোট্টরাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া রণদুর্ম্মদ হস্তিসমূহ লাভ করেন। এত মহীপালের নাম পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে গিয়া ঐতিহাসিককে দিশাহারা হইতে হয়।

মহীপালের সময়ে ওদন্তপুরবিহারে হীনযানমতের এক হাজার ও মহাযান-মতের পাঁচ হাজার ভিক্ষু বাস করিত। পাল-রাজগণ ওদন্তপুরবিহারে প্রকাণ্ড পুস্তকালয় স্থাপন করেন। এই বিহারে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের বহুসংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল।

তিব্বতীয় বৌদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মতে, গৌড়াধিপতি মহীপাল ভোটরাজ লা-লামার সমসাময়িক। *

দশম রাজা,—নয়পালদেব।

প্রথম মহীপালের পর, তৎপুত্র নয়পাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নয়পাল জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অনুগত ছিল। মদনপালের তাম্রশাসনে আছে,—

"ত্যজন্ যোষাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং
বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসভমুদয়াদ্রেরিব রবিঃ।
গুণগ্রামস্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগৈকবসতিঃ
সুতো ধন্যঃ পুণ্যৈরজনি নয়পালো নরপতিঃ॥"

নয়পালের মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণদত্তের পুত্র চক্রপাণিদত্ত, ১০৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত "চক্রদত্ত" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। "দ্রব্যগুণ", "সর্ব্বসারসংগ্রহ" ও চরকটীকা ইঁহার রচিত। এতদ্ব্যতীত ইনি "শব্দচন্দ্রিকা" নামক অভিধান ও নাষ, কাদম্বরী ও ন্যায়শাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। ময়ূরেশ্বর গ্রামে ইঁহার বসতি ছিল। চক্রপাণিদত্ত লোধ্রবলীনামক বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। চক্রপাণিদত্তের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভানুদত্ত নয়পালের অন্তরঙ্গ অর্থাৎ বিশ্বাকুলসম্পন্ন ভিষক্ ছিলেন।

নয়পালের সময়ে, অতীশ বিক্রমশিলা-বিহারের প্রধান অধ্যাপক হন। অতীশের অন্য নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। অতীশ বিক্রমপুরের † রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ

---

* তিব্বতীয় কোনও গ্রন্থে আছে, বঙ্গদেশ কিয়ৎকাল তিব্বতের অধীন ছিল; ইহা কত দূর প্রামাণিক, বলা যায় না।

† মূলগ্রন্থে "বিক্রমণিপুর বাঙ্গালা" নাম আছে।

করেন। ইঁহার পিতার নাম কমলশ্রী বা কল্যাণশ্রী, মাতার নাম প্রভাবতী, গুরুর নাম নারোপা বা অমিতায়ুঃ। নারোপা তিব্বতদেশীয় এক জন সাধুপুরুষ। অতীশ ওদন্তপুর-বিহারে বৌদ্ধ যতি-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বৃদ্ধবয়সে, ১০২৮ খৃষ্টাব্দে, তিব্বতে গিয়া মহাযান-মত প্রচার করেন। ৭৩ বৎসর বয়সে, ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে, লাসানগরের নিকটবর্ত্তী সক্রেটাং সঙ্ঘারামে অতীশের মৃত্যু হয়। অতীশের "বিমল-রত্নালোক" গ্রন্থ নয়পালের উদ্দেশে লিখিত। নয়পাল অতীশকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন;—এমন কি, অনেক সময় বিক্রমশিলায় গমনপূর্ব্বক তাঁহার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। নয়পালের সঙ্গে কার্ণ্যরাজের ভয়ানক যুদ্ধ হয়, তাহাতে মগধ-সৈন্য প্রথমে পরাজিত হয়, পরে জয়লাভ করে। অতীশের যত্নে উভয় রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। তিব্বতে অতীশের যে মূর্ত্তি আছে, তাহার মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ দৃষ্ট হয়।

গয়ার কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরের প্রস্তরস্তম্ভে নয়পালের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে উৎকীর্ণ শাসন-লিপি দৃষ্ট হয়।

একাদশ রাজা,—বিগ্রহপালদেব (তৃতীয়)।

নয়পালের পর তাঁহার পুত্র ৩য় বিগ্রহপালদেব গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিগ্রহপাল শৈব ছিলেন। তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমাশ্রয় ছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে আছে,—

"পীতঃ সজ্জনলোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা
সংগ্রামৈকবলোঽধিকগ্রহকৃতাং কালঃ কুলে বিদ্বিষাম্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ঃ সিতযশঃপূরৈর্জগল্লম্ভয়ন্
তস্মাদ্বিগ্রহপালদেবনৃপতিঃ পুণ্যৈর্জ্জনানামভূৎ॥"

এ পর্য্যন্ত পাল-রাজগণকে সৌগত দেখিতেছিলাম; কিন্তু এখন বিগ্রহপালকে শৈব দেখিলাম। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ বৌদ্ধ-শ্রমণের ন্যায় ব্রাহ্মণদেরও সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে বৌদ্ধই বলিতেন। 'স্মররিপু' শব্দের অর্থ মারজিৎ বুদ্ধও হইতে পারে। রাজা যখন চাতুর্ব্বর্ণ্যের সমাশ্রয় ছিলেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃত বৌদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইতেছিল; বৌদ্ধমন্দিরগুলি হিন্দুমন্দিরে পরিণত হইতেছিল; ভগবান্ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিগুলি ভৈরবমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। অশোক সমুদয় ভারতবর্ষে ৮৪০০০ বৌদ্ধ-স্তূপ স্থাপন করিয়াছিলেন; তৎসমুদয়ের অধিকাংশই হিন্দু-দেবমন্দিরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের স্থানে প্রধানতঃ শৈবমত প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। শিব ও বুদ্ধ উভয়েই মহাযোগী; বৌদ্ধ ও শৈবমতে প্রাণিবধ মহাপাপজনক। এই জন্য সহজেই বৌদ্ধ-মতের স্থলে শৈব-মত পরিগৃহীত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ প্রতিভাবলে তাহা বুঝিতে পারিয়া, বৌদ্ধমত-নিবারণের জন্য শৈবমতের প্রচার করিয়াছিলেন।

দিনাজপুরের অন্তর্গত আমগাছী হইতে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দ্বাদশ রাজা,—মহীপালদেব (দ্বিতীয়)।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্র,—মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। মহীপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে মদনপালের তাম্রশাসনে আছে,—বিগ্রহপাল হইতে চন্দ্রশেখর শিবের ন্যায় শ্রীমান্ মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মলয়জশীতল শুভ্রযশোরাশি দ্বারা জগৎকে আনন্দিত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যথা,—

"তন্নন্দনশ্চন্দন-বারিহারি-কীর্ত্তি-প্রভা-নন্দিতবিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভূব॥"

দিনাজপুরের মহীপাল-দীঘি ইনি খনন করান। দিনাজপুরের ও রঙ্গপুরের বহুসংখ্যক গ্রাম ও সরোবর মহীপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গপুরাঞ্চলে অল্পকাল রাজত্বের পর মহীপালের সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বনের প্রবাদ প্রচলিত আছে।

ত্রয়োদশ রাজা,—শূরপালদেব।

দ্বিতীয় মহীপালের পর তাঁহার ভ্রাতা শূরপালদেব রাজা হন। শূরপাল অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। যদিও বিলাসী ছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতাপে শত্রুগণ ভীত ছিল। মদনপালের তাম্রশাসনে আছে,—

"তস্যাভূদনুজো মহেন্দ্রপ্রতিমাকন্দঃ প্রতাপশ্রিয়া-
নেকঃ সাহসসারথিগুণময়ঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ।
যঃ স্বচ্ছন্দনিগর্ম্মবিভ্রমভরান্ বিভ্রৎস্বসর্ব্বায়ুধ-
প্রাগল্ভ্যেন মনঃসু বিস্ময়ভয়ং সদ্যঃসুতা ন দ্বিষাম্॥"

ইঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

চতুর্দ্দশ রাজা,—রামপালদেব।

শূরপালের পর তাঁহার সহোদর রামপালদেব গৌড়ের শাসনদণ্ড পরিচালন

করেন। বোধ হয়, রামপাল সকল ভ্রাতার অপেক্ষা পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রামপালের সম্বন্ধে মদনপালের তাম্রশাসনে আছে,—

"তস্যাপি সহোদরো নরপতির্দিব্যপ্রজানির্ভর-
ক্ষোভাহৃতবিব্রতত্ত্বরাসবৃত্তিঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ।
যাসত্যৈব চিরং জগন্তি জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ
তেজোভিঃ পরচক্রচেতসি চমৎকারং চকার স্থিতম্॥"

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহোদয় পাণ্ডুয়ায় "সেকশুভোদয়া" নামক একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য অতি সামান্য। যখন মোগলেরা বাঙ্গালা জয় করিয়া নিষ্কর ভূমির অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, তৎকালে পাণ্ডুয়ার প্রচুর নিষ্কর ভূমি কে কাহাকে দান করিয়াছিল,—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। পাঠান-রাজগণ এই সকল নিষ্কর ভূমি মকদুম শাহ জালাল ও নূর কুতব আলমকে প্রদান করেন। মকদুমশাহ জালালের নিষ্কর ভূমির অধ্যক্ষগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, উহা পাঠানরাজদেরও পূর্ব্বগত রাজা লক্ষ্মণসেন মকদুমশাহ জালালকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে সেন-রাজগণের বিষয় কিছু বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত। পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলা হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে, রামপালদেব যখন সুরধুনীতীরে দেহ বিসর্জ্জন করেন, তখন মন্ত্রিগণ, মহাদেবের স্বপ্নাদেশে, কাঠুরিয়া বিজয়সেনকে রাজা করেন। অবশ্য বিজয়সেন কাঠুরিয়া ছিলেন না;—পাল-বংশের রাজত্বও রামপাল হইতে শেষ হয় নাই। তবে ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, রাম-পালের পর হইতেই বিজয়সেনের প্রতাপ পাল-রাজ্যে অনুভূত হইতেছিল। "সেক-শুভোদয়া" বলেন, রামপাল পরম বৈষ্ণব ছিলেন; উক্ত গ্রন্থের শ্লোক এই,—

"শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্রগতে কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণে গীষ্পতিবাসরে যমতিথৌ বামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্তনশনৈর্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
হা পালাদ্বয়মৌলিমণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ॥"

এই শ্লোকের মতে, রামপাল ৯৭৭ শাকে (১০৫৫ খৃঃ) পরলোকগমন করেন; ঢাকা জেলায় রামপালের নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে; উহা উত্তর-দক্ষিণে বার শত হস্ত ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৫৩৪ হস্ত দীর্ঘ। রামপাল রামাবতী বা রামপালনগর স্থাপন করেন। *

* কেহ কেহ বলেন, রামাবতী সমতট-রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী; রামপাল, তাহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া, স্বনামে 'রামপাল' নাম রাখেন।

বিহারে রামপালের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের ও চণ্ডিমাউতে দ্বাদশবর্ষের এক খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

রামপাল মিথিলার রাজা ভীমকে যুদ্ধে বিনষ্ট করেন। * রামপালের মন্ত্রীর নাম যোগদেব। রামপালের রাজত্ব-কালে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক কালচক্রযান তিব্বতরাজ্যে প্রচার করিয়া, তথাকার রাজাকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

সুন্দরবনের নিকটে রামপাল নামক একটি স্থান আছে। রাজা রামপালের সঙ্গে তাহার কোনও সংস্রব আছে কি না, জানা যায় না।

"রামপাল-চরিত" নামক কাব্য নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে রামপালের কীর্ত্তিমালা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ রাজা;—কুমারপালদেব।

রামপালের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র কুমারপালদেব, সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুমারপাল নিজের আয়ত-ভুজ-বীর্য্যের দ্বারা বলবান্ শত্রুগণের যশঃসাগর পান করিয়াছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসনে আছে,—তিনি নরেন্দ্রবধূগণের কপোলে কর্পূরের পত্র ও মকরীর চিত্রণ-বিষয়ে বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। যথা,—

"তস্মাদজায়ত নিজায়তবাহুবীর্য্য-
নিষ্পীতপীবরবিরোধিযশঃপয়োধিঃ।
নেদিষ্ঠকীর্ত্তিশ্চ নরেন্দ্রবধূকপোল-
কর্পূরপত্রমকরীষু কুমারপালঃ॥"

নরেন্দ্রবধূগণের কপোলে কর্পূরপত্র ও মকরীর চিত্রণে পটুতালাভ করায়, রাজার কোন্ গুণ ব্যক্ত হইতেছে, বুঝিতে পারা যায় না; রাজা, বোধ হয়, নিতান্ত বিলাসী ছিলেন। কোনও রাজ-বংশের পতন-কালে, সেই বংশে বিলাসিগণের জন্ম হইয়া থাকে। সকল রাজারই রণ-নৈপুণ্য বর্ণিত হইয়াছে, উহা প্রশংসা-বাক্য-মাত্র।

কুমারপালের মন্ত্রীর নাম বোধিদেব। রাজা বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেবকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা করেন। * এই বোধিদেব রামপালের মন্ত্রী যোগদেবের পুত্র। বৈদ্যদেবের পূর্ব্বে তিগ্ম্যদেব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কুমারপাল কোনও কারণে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া বৈদ্যদেবকেই তৎপদে অভিষিক্ত করেন।

---

* কামরূপাধিপতি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন।

দেওপাড়ার শিলাফলকে আছে—বিজয়সেন গৌড়াধিপতিকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, এবং কামরূপের রাজাকে বিদূরিত করিয়াছিলেন। যথা,—

"গৌড়েন্দ্রমুদ্রবদপাকৃতকামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়।"

ষোড়শ রাজা,—গোপালদেব (তৃতীয়)।

কুমারপালের পর, তৎপুত্র গোপালদেব রাজত্ব করেন। ইঁহার সম্বন্ধে মদনপালের তাম্রশাসনে আছে,—গোপালদেব শৈশবকালেই কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ বিলাসী পিতার রাজ্য পুত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত; মূল শ্লোক এই—

"প্রত্যর্থিপ্রমদাকদম্বকশিরঃসিন্দূরলোপক্রম-
ক্রীড়াপাটলপাণিরেষ সুষুবে গোপালমুর্ব্বীভুজঃ।
ধাত্রীপালনজৃম্ভমাণমহিমাকপূর্ণরূপাংশূৎকরৈ-
র্দেবঃ কীর্ত্তিমরৈর্নিজৈর্বিতনুতে যঃ শৈশবে ক্রীড়িতঃ॥"

গোপালদেব শত্রু-প্রমদাগণের সিন্দূর-বিন্দুলোপ করিয়া পাটলপাণি হইয়াছিলেন। প্রজা-পালন-গুণে শৈশবেই কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ রাজা,—মদনপালদেব।

গোপালদেবের পর, তাঁহার পিতৃব্য মদনপালদেব সিংহাসনারোহণ করেন। মদনপাল রামপালের পুত্র। গোপালদেবের পুত্রসন্তান হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। মদনপালের তাম্রশাসন দিনাজপুরে পাওয়া গিয়াছে। মদনপালের মাতার নাম মদনদেবী। মদনপাল জ্যোৎস্নাধবল কীর্ত্তিপুর দ্বারা জগৎ পূর্ণ করিয়া সপ্তসাগরমেখলা পৃথিবীকে পালন করিয়াছিলেন। মূল শ্লোক এই,—

"তদ্দৃষ্ট মদনদেবীনন্দনশচন্দ্রগৌরৈ-
শ্চরিতভুবনগর্ভঃ পাংশুভিঃ কীর্ত্তিপূরৈঃ।
ক্ষিতিমনবমতাতস্তজ্ঞ সপ্তাব্ধিকাঞ্চী-
মভূত মদনপালো রামপালাত্মজন্মা॥"

এই তাম্রশাসন হইতে আমরা সতর জন রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে পারি। মদনপালের রাজত্বের অষ্টমবর্ষে এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হয়। রাজমহিষী চিত্রমতিকা-দেবী বটেশ্বরস্বামিনামক ব্রাহ্মণকে মহাভারতপাঠে নিযুক্ত করেন। মহাভারত-পাঠের দক্ষিণাস্বরূপ ইহা প্রদত্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজা "ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য" অর্থাৎ ভগবান্ বুদ্ধভট্টারক প্রীত হইবেন মনে করিয়া, মহাভারত-

পাঠের দক্ষিণাপ্রদান করেন। দেখা যাইতেছে, তখন হিন্দু ও বৌদ্ধের পার্থক্য রাজ-সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ শৈবপক্ষ বৌদ্ধমতকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

রামাবতীসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। রামাবতী ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী। ভাগীরথীতে নৌ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, রামাবতী বর্ত্তমান রামপাল; উহা মহীপালদীঘি হইতে দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। আমাদের ইহা সঙ্গত বোধ হয় না; কেন না, এরূপ হইলে, রামাবতী গঙ্গাতটবর্ত্তী হয় না। রামাবতীনগর প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্যে রমতী নামে উক্ত হইয়াছে। উহা যে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরমসৌগত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ, এই বিশেষণ-চতুষ্টয়ে মদনপালকে বিশেষিত দেখিতে পাই। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী কোটিবর্ষ-বিষয়ের হলাবর্ত্তমণ্ডলের অন্তর্গত কোষ্ঠগিরিগ্রাম তাম্রশাসনোল্লিখিত প্রদত্ত ভূমি। মহীপালের তাম্রশাসনে যে-যে কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, এই তাম্রশাসনেও সেই-সেই কর্ম্মচারীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়; কেবল 'শৌনিক' নামক কর্ম্মচারীর নাম নূতন পাওয়া গেল। শৌনিক বা সৌনিক শিকারের জন্য কুকুরসমূহের তত্ত্বাবধারক, অথবা কসাই-খানার অধ্যক্ষ, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। "ভোগভাগকরহিরণ্যাদিরাজস্বসমেতবট-ত্রয়বর্জ্জিত",—এই অংশটি দুর্ব্বোধ্য। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ গো-চারণভূমিও দেবভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। দানগ্রহীতার উপর প্রদত্ত ভূমির শান্তিরক্ষা-ভার অর্পিত হইয়াছে। যাহাতে চট্ট, ভট্ট, গৌড়, মালব, চোড়, খশ, হূণ, কুলিক, কর্ণাট ও লাটেরা প্রদত্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া অশান্তির উৎপাদন করিতে না পারে, তাহার আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। চোড়ের নাম নূতন দেখিলাম। রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণের পর হইতে কি চোড়দের কতকগুলি লোক বাঙ্গালায় থাকিয়া লোকদিগের অশান্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল? এই চোড়-শব্দ হইতে, বোধ হয়, বাঙ্গালাভাষায় 'চোয়াড়'-শব্দ আসিয়াছে।

দানগ্রহীতা বটেশ্বরস্বামীর পিতার নাম শৌনিকস্বামী, পিতামহের নাম প্রজাপতিস্বামী; গোত্র—কৌৎস; শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল—প্রবর; সাম-বেদান্তর্গত কৌথুমী-শাখাধ্যায়ী। চম্পাহিট্টা গ্রামে বটেশ্বরস্বামীর বাস ছিল। *

* চম্পাহিট্টী গ্রাম পরে চম্পটী নামে প্রথিত হইয়াছিল। চম্পটী গ্রাম হইতে রাঢ়েন্দ্র-ব্রাহ্মণদের চম্পটী গাঁই হইয়াছে।

মহাসন্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব এই তাম্রশাসনের দূতক অর্থাৎ কার্য্য-নির্ব্বাহক ছিলেন। ভীমদেবের বিষয়ে লিখিত আছে,—

"কৃতসকলনীতিজ্ঞো ধৈর্য্যস্থৈর্য্যমহোদধিঃ।
সন্ধিবিগ্রহিকঃ শ্রীমান্ ভীমদেবোঽত্র দূতকঃ॥"

শিল্পী তথাগতসর এই তাম্রশাসন খনন করিয়াছিলেন (অখনৎ)। তথাগতসর বোধ হয় বৌদ্ধ ছিলেন।

মদনপালের পর, গৌড়ের মহেন্দ্রপাল নামক এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি মদনপালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা কি না, জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ে পাল-বংশীয় রাজগণ সেন-রাজবর্গ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বেহারপ্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করেন, এবং তথায় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বেহার-বিজয়-কালপর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে থাকেন। মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খিলিজি বেহারের রাজধানী ওদন্তপুর অধিকার করিয়া এই বংশীয় শেষ-রাজা গোবিন্দলালকে নিহত করেন (১১৯৭ খৃঃ)। "তবকৎ-ই-নাসিরি" বলেন, বক্তিয়ার দুই শত সেনা লইয়া বেহার অধিকার করেন। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা বলিতেছেন, নিজামুদ্দিন ও সামসুদ্দিন নামক ভ্রাতৃদ্বয় সেই সময়ে বক্তিয়ারের সেনাদলে ছিল; তাহাদের মুখে, ৬৪১ হিজিরিতে, তিনি দুই শত সেনা দ্বারা বেহার ও আঠার জন সেনা-সাহায্যে নবদ্বীপ-জয়ের কথা শুনিয়াছিলেন। নিরক্ষর দুই জন সামান্য সৈন্যের মুখে শুনিয়া রচিত ইতিহাস-গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যতটুকু, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

গোবিন্দপাল।

ইনি পাল-বংশের শেষ-রাজা। ইঁহার নামাঙ্কিত ১২৩২ ও ১২৩৫ সংবতের দুইখানি শাসন-লিপি পাওয়া গিয়াছে। ১২৩৫ সংবতের শাসন-লিপিখানি গোবিন্দপালের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষের; অতএব ১২৩৫-১৫=১২২০ সংবতে অর্থাৎ ১২২০-৫৬=১১৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্য মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। অতএব, ১১৯৭-১১৬৪=৩৩ বৎসর গোবিন্দপাল রাজত্ব করেন। ওদন্তপুরে গোবিন্দপালের রাজধানী ছিল। ইহার প্রায় ৮২ বৎসর পূর্ব্বে সেন-রাজগণ গৌড়াধিকার করেন। ইহাতে বোধ হয়, পাল-বংশীয় শেষ তিন চারি জন রাজার রাজধানী গৌড়ে ছিল না। গোবিন্দপাল, বৌদ্ধ ছিলেন না; কারণ, তাঁহার একখানি তাম্রশাসনে "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" আছে। তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ এক হইয়া গিয়াছে।

গোবিন্দপালের রাজত্বের প্রথমভাগে, ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে, কনোজের রাজারা করদ-

দেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলা অধিকার করেন। পূর্ব্বদিক্ হইতে সেন-রাজগণের ও পশ্চিমদিক্ হইতে কনোজরাজগণের পরাক্রমে পাল-রাজগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা মুসলমানাক্রমণে সম্পূর্ণ বাধা দিতে পারেন নাই। মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার ওদন্তপুর অধিকার করিলে, তাঁহার সেনাপতি মহম্মদ বিন্ সিমের আদেশে তথাকার উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় ভীস্মভূত হয়, এবং বহুসংখ্যক বৌদ্ধপুরোহিত অস্ত্রমুখে নিক্ষিপ্ত হন। শ্রীগয়াকর নামক পণ্ডিত বাঙ্গালা অক্ষরে ১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন; তাহার একখানিতে যবনগণ কর্ত্তৃক গোবিন্দপালের পরাজয়-বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

কানিংহামের মতে
পাল-রাজগণের রাজ্যারম্ভকাল।

১	গোপাল	— ৮১৫ খৃঃ
২	ধর্ম্মপাল	— ৮৩০ খৃঃ
৩	দেবপাল	— ৮৫০ খৃঃ
৪	রাজ্যপাল	— ৮৮৫ খৃঃ
৫	শূরপাল	— ৮৮৭ খৃঃ
৬	বিগ্রহপাল ১ম	— ৯০০ খৃঃ
৭	নারায়ণপাল	— ৯১৫ খৃঃ
৮	রাজপাল	— ৯৪০ খৃঃ
৯	... ...	— ৯৬৫ খৃঃ
১০	বিগ্রহপাল ২য়	— ৯৯০ খৃঃ
১১	মহীপাল	— ১০১৫ খৃঃ
১২	নয়পাল	— ১০৪০ খৃঃ
১৩	বিগ্রহপাল ৩য়	— ১০৫৫ খৃঃ
১৪	মহেন্দ্রপাল	— ১০৮৫ খৃঃ
১৫	রামপাল	— ১১১০ খৃঃ
১৬	মদনপাল	— ১১৩৫ খৃঃ
১৭	গোবিন্দপাল	— ১১৬১ খৃঃ
১৮	ইন্দ্রদ্যুম্ন	— ১২০০ খৃঃ

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে
পাল-রাজগণের রাজ্যারম্ভকাল।

১	গোপাল	— ৮৫৫ খৃঃ
২	ধর্ম্মপাল	— ৮৭৫ "
৩	দেবপাল	— ৮৯৫ "
৪	বিগ্রহপাল ১ম	— ৯১৫ "
৫	নারায়ণপাল	— ৯৩৫ "
৬	রাজ্যপাল	— ৯৫৫ "
৭	... পাল	— ৯৭৫ "
৮	বিগ্রহপাল ২য়	— ৯৯৫ "
৯	মহীপাল	— ১০১৫ "
১০	নয়পাল	— ১০৪০ "
১১	বিগ্রহপাল ৩য়	—

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাল-রাজগণের রাজত্ব গড়ে ২০ বৎসর ধরিয়াছেন।

"বিশ্বকোষ"-নির্দ্দিষ্ট পাল-রাজগণের রাজ্যকাল।

১	গোপাল (মগধে)	...	৭৭৫ খৃঃ	...	৭৮৫ খৃঃ
২	ধর্ম্মপাল (মগধ ও গৌড়ে)	...	৭৮৫ খৃঃ	...	৮৩০ খৃঃ
৩	দেবপাল "	...	৮৩০ খৃঃ	...	৮৬৫ খৃঃ
৪	শূরপাল ১ম	...	৮৬৫ খৃঃ	...	৮৭৫ খৃঃ
৫	বিগ্রহপাল ১ম "	...	৮৭৫ খৃঃ	...	৯০০ খৃঃ
৬	নারায়ণপাল "	...	৯০০ খৃঃ	...	৯২৫ খৃঃ
৭	রাজ্যপাল "	...	৯২৫ খৃঃ	...	৯৫০ খৃঃ
৮	গোপাল ২য় "	...	৯৫০ খৃঃ	...	৯৭০ খৃঃ
৯	বিগ্রহপাল ২য় "	...	৯৭০ খৃঃ	...	৯৮০ খৃঃ
১০	মহীপাল ১ম "	...	৯৮০ খৃঃ	...	১০৩৬ খৃঃ
১১	নয়পাল "	...	১০৩৬ খৃঃ	...	১০৫৩ খৃঃ
১২	বিগ্রহপাল ৩য় "	...	১০৫৩ খৃঃ	...	১০৬৮ খৃঃ
১৩	মহীপাল ২য় "	...	১০৬৮ খৃঃ	...	১০৭৮ খৃঃ
১৪	শূরপাল ২য় "	...	১০৭৮ খৃঃ	...	১০৯১ খৃঃ
১৫	রামপাল (মগধ ও উত্তর-গৌড়ে)		১০৯১ খৃঃ	...	১১০৩ খৃঃ
১৬	কুমারপাল "	...	১১০৩ খৃঃ	...	১১১০ খৃঃ
১৭	গোপাল ৩য় "	...	১১১০ খৃঃ	...	১১১৫ খৃঃ
১৮	মদনপাল "	...	১১১৫ খৃঃ	...	১১৩০ খৃঃ
১৯	মহেন্দ্রপাল "	...	১১৩০ খৃঃ	...	১১৪০ খৃঃ
২০	গোবিন্দপাল "	...	১১৪০ খৃঃ	...	১১৬১ খৃঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকা যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা তাম্রশাসন দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। তৃতীয় তালিকা কিয়দংশে বিশুদ্ধ বটে। হণ্টারের মতে, পাল-বংশ ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহা প্রকৃত নয়।

তাম্রশাসন ও অন্যান্য নিদর্শন দ্বারা জানা যায়, ধর্ম্মপাল ৩২ বৎসরের কম রাজত্ব করেন নাই। প্রথম বিগ্রহপাল অন্ততঃ তের বৎসর, নারায়ণপাল অন্ততঃ সতর বৎসর, রামপাল অন্ততঃ বার, মদনপাল অন্ততঃ আট, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল অন্ততঃ বার ও মহীপালদেব অন্ততঃ আটচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

১০২১ খৃষ্টাব্দে মহীপাল যে রাজা ছিলেন, ইহা আমরা সারনাথের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি। মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে, দেবপাল অন্ততঃ তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ঘোষরিয়া ও রাজগীর হইতে মহেন্দ্রপালের

অষ্টম ও নবম বর্ষের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহেন্দ্রপাল অন্ততঃ নয় বৎসর রাজত্ব করেন। গয়ার কুক্কুরবারিকামন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায়, নয়পাল অন্ততঃ পঞ্চদশ বর্ষ রাজত্ব করেন।

প্রায় তিন শত বৎসর পাল-রাজগণ গৌড়ে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের পরাক্রম সামান্য ছিল না। বাঙ্গালার নানা স্থানে এই বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। হুগলী জেলার হরিপালের সঙ্গে পালরাজগণের সংস্রব থাকিতে পারে। হরিপাল হরিপালনগর স্থাপন করেন। * হরিপালের পিতার নাম কুঙ্কপাল। পাল-বংশীয় দেশপাল ভাগীরথীর পশ্চিমপ্রদেশের রাজা ছিলেন। ভাওয়াল অঞ্চলের কাপাশিয়ায় শিখরপাল নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তালিপাবাদ পরগণায় যশপাল নামক রাজার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইঁহারা পাল-বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বঙ্গ, বিহার পাল-বংশের সম্পূর্ণ অধীন ছিল। কামরূপ ও উড়িষ্যা কখন কখন অধীন হইত। মহীপালের সময় বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত হয়। ধর্ম্মপালের ও দেবপালের সময় পাল-রাজগণের প্রতাপ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বহু দূর প্রসারিত হয়। এই বংশের অধীনে বারজন ভুঁইয়া-রাজা ছিলেন। মধুপুরে ভগদত্ত নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি কোন্ জাতীয়, স্থির হয় নাই। তৎপ্রতিষ্ঠিত বারতীর্থ ক্ষেত্রে এখনও মেলা হইয়া থাকে।

পাল-রাজত্বকালে, ১০৩০ খৃষ্টাব্দে, বিক্রমশিলা নামক রাজকীয় বৌদ্ধমঠে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের এক মহাসভা হয়; সেই সভায় তিব্বতীয় রাজ-দূত নাগটাহোলচড়া উপস্থিত ছিলেন। এই রাজ-দূত মগধের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-পুরোহিত স্থবির রত্নাকরের নিকট সংস্কৃতশিক্ষার্থ মগধে অবস্থান করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাবল্য হইয়াছিল। সেখানে পণ্ডিত-বিহার নামে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। তিলোপা নামক বৌদ্ধ পণ্ডিত সেই বিহারের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। অতীশের শিক্ষক নারোপা তিলোপার নিকট ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

পাল-রাজগণ মহাযান-মতাবলম্বী ছিলেন। তবে, সকলেই বজ্রবারাহী, বজ্রতারা, বজ্রভৈরবী প্রভৃতি শক্তির উপাসনা করিতেন। † তাঁহাদের রাজত্ব-কালে রাঢ়দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। রাঢ়দেশের বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল ঈষৎপরিবর্ত্তিতাকারে

* ব্রহ্মাণী-নদীতীরবর্ত্তী শিমুলগড়ে হরিপালের রাজধানী ছিল। লাউসেন হরিপালকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার কন্যা কানাড়াকে বিবাহ করেন। কানাড়া একবার গৌড়েশ্বরের সেনাদল পরাজিত করেন।

† "বিশ্বকোষ;"—বাঙ্গালা সাহিত্য।

বাকুড়া-রায়, কাঁচাচাঁদ,* শ্যামরায় ও ভৈরব নামে হিন্দু-দেবশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই বংশের রাজত্বকালের শেষভাগে বৌদ্ধমত ও পার্ব্বতীয় অসভ্যদের ধর্ম্ম-মতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন তান্ত্রিক মত প্রাধান্য লাভ করে; সমুদয় বৌদ্ধবিহারে তান্ত্রিকমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া যায়; বৌদ্ধ-বিহারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোকে বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করে। এই রাজত্বের শেষভাগে রমাই পণ্ডিত তাঁহার "ধর্ম্মমঙ্গল" রচনা করেন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পাণ্ডুদাস নামক রাজা দক্ষিণ-রাঢ়ে ভূরশুট নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। ইনি পাল-রাজগণের করদ ছিলেন কি না, জানা যায় না। এই রাজ্যকে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভূরিসৃষ্টি বলিত। ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই দুই স্থান বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, এবং ইহাতে অনেক ধনশালী বণিক্ বাস করিত বলিয়া, ইহার ভূরিশ্রেষ্ঠী নাম হইয়াছিল।

পাল-রাজগণের সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্ব হইতেই বেদাচার পরিত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক মত আশ্রয় করিয়াছিলেন। বেদাচার পুনঃ-প্রচলনের জন্য আদিশূর কনোজ হইতে বেদপায়গ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজ পাল-রাজগণের আশ্রিত ছিলেন, তাঁহারাই প্রথমে সাগ্নিক পিতৃপিতামহগণের বৈদিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড় হইতে তাড়িত শূর-বংশের আশ্রয়ে থাকায়, কিছুদিন বৈদিক আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গের পাল-বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হইলে, বঙ্গপ্রদেশে গোলযোগ উপস্থিত হয়; সেই সুযোগে বর্ম্মবংশীয় ভূপালগণ বিক্রমপুর অধিকার করেন। ধর্ম্মবংশ শূরবংশের এক শাখা। ইঁহারা পূর্ব্বে স্বর্ণরেখা-তীরবর্ত্তী সুহ্মান্তর্গত কাশীপুরীর রাজা ছিলেন। কাশীপুরীর বর্ত্তমান নাম কাশীয়াড়ি। ইঁহারা যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন, তখন বিক্রমপুরের এক পার্শ্ব দিয়া পদ্মানদী প্রবাহিত ছিল; এখন ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়াতে বিক্রমপুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই বংশীয় হরিবর্ম্মা, জ্যোতিবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা পাল ও সেন-বংশের করদরূপে বিক্রমপুর শাসন করিতেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

আরব্য-কবিতা।

জয়-পরাজয়।

[আখর বিন আলবা হইতে।]

ক্ষণিক জয়ের নেশায় মত্ত শত্রু-শিবির হ'তে
বার্ত্তা আসিল পীড়িত হৃদয়ে পীড়িয়া শতেক মর্ম্মে।
দূত আসি কহে, "শত্রু, শুন হে; কি ভাবিছ অধোমুখে ?
হয় পর হাতে শৃঙ্খল, নহে বল্লম ধর বুকে।"
কহিনু তখন, এখনই কি রণ সাঙ্গ হয়েছে ? তবে
এত ত্বরা কেন ? ভাগ্য-কথন ক্ষণকাল পরে হবে।
নহি পদানত ; দম্ভ যে এত, সে তবে কিসের তরে ?
হয় ত সেদিন নহে বহু দূর, যবে আমাদেরি পরে
বর্ষিত হবে জয়ের হরষ, স্বাধীনতা, শান্তির
শুভ্র শীতল চির-উজ্জ্বল পুণ্য বিমল নীর।
দূত গেল ফিরি' ; তারা এল ঘিরি' এক নিমেষের মাঝে,
অসি বল্লমে চর্ম্মে বর্ম্মে ঘন ঝন্‌ঝনা বাজে।
শত্রুর ব্যূহ হইল শিথিল, পিছনে ছুটিনু মোরা,
নরু-বালুকায় লিখিল কাহিনী শোণিত-সিক্ত ছোরা ;
শেষে যবে তারা মুমূর্ষু পারা লুটায়ে চুমিল ধূলি,
কেশে ধরি' তবে কহিনু তা সবে শাণিত খড়্গ তুলি' ;—
এবারের মত হস্ত মোদের ধরিল ছোরার মুঠ,
ছোরার ফলক ফেলুক গ্রাসিয়া তোদের বক্ষপুট।

[আবু মহম্মদ হইতে।]

মাঝিরা বলিল,—গেল, বেলা গেল,
আর বিলম্ব নয় ;
সেইক্ষণে প্রিয়া শিখাল তিয়ায়
আঁখি কত কি যে কয়।

উদ্বেল-হিয়া কাছে এল প্রিয়া
কহিতে বিদায়-বাণী;
মনের যে কথা মুখে মিলাল তা'
আধেক চেতনা মানি'।
মুগ্ধ নয়ন জলভার-নত
মেলি' দুইখানি কর,
গোলাপের বনে মলয়ার মত
পড়িল বুকেরই পর।
রাহু সম মোর উৎসুক বাহু
বেড়িয়া ধরিল তারে,
সে কহিল কাঁদি,'—"পরিচয় যদি
না ঘটিত একেবারে!"

সাকীর প্রতি।

[আবদুল সালেম বিন্ রাগ্‌ওয়ান্ হইতে।]

এস সাকী! দেহ পাত্র ভরিয়া
রঙ্গিল মদিরায়,
আর কারো হাতে এমন করিয়া
পাত্র কি লওয়া যায়?
সে রস ধরে না আঙ্গুরের ফল
নাহি সে মর্ত্ত্যলোকে,
সে যে রাঙ্গিয়াছে তোমারি কপোল,
উজল করেছে চোখে।

বন্ধুগর্ব্ব।

[মসকিন অল্ দরামী হইতে।]

তাদের গর্ব্ব আমি করে থাকি, সে কথাটি জানি আমি,
যাহারা নিয়ত আমারে ঘিরিয়া রয়েছে দিবসযামী।

আমার গর্ব্ব, আমার সর্ব্ব, আমার বন্ধু তারা,
এতগুলি মণি-রতনের মাঝে হ'য়ে আছি আমি হারা।
তারা ঢল ঢল মুকুতার ফল, তারা মুকুতার পাঁতি,
আমি একখানি রেশমের সুতা, তাদের রেখেছি গাঁথি।
পশি' পরশিয়া দেখিয়াছি আমি অন্তর-সবাকার,
তাদের বক্ষনীড়ে গতিবিধি চিরদিন এ জনার।
আমারে বিরিয়া সদা আছে তারা, আমারে বেড়িয়া আছে,
মোরে নির্ভয়ে করি' নির্ভর তারা হেসে খেলে বাঁচে।
তারা ঢল ঢল লাবণ্য-জল-সিক্ত মুকুতা-পাঁতি,
আমি একখানি রেশমের সুতা, রেখেছি তাদের গাথি।

মুখর ও মৌন।

[সিরাজ অল্ ওয়াররাক্।]

আকুল কূজনে কপোত কাঁদিছে
মরম-যাতনা জুড়াতে তার,
আমারি মতন ব্যথিত সে জন
মম সম বুকে দুখেরি ভার।
সে কাকলি শুনা যায় বনে বনে,
গোপন বেদনা আমারি শুধু;
তবু আঁখি-জল ঝরে অবিরল,
লুকান আগুন জ্বলে সে ধূ ধূ।
হায় পাখী মোরা প্রেমেরি বেদনা
আধা-আধি বেঁটে নিয়েছি দোঁহে,
মুখর বেদন তোমার সাধন
মৌন-ব্যথা সে আমারে দহে।

নিয়তি।

[ইমাম সাফাই মহম্মদ বিন্ ইদরিস্।]

নিয়তির গতি অপরূপ অতি,
নহে সে ধনের মানের বশ;

খণ্ডিত-শির দিগ্বিজয়ীর
শকুনিতে খায় শোণিত-রস।
কেহ আস্তনন নাহরহে অধম
বলহীন দীন বলিয়া শুধু,
যেই মাছি নরে পরশের ভরে,—
রাজার পাত্রে পিয়ে সে মধু।

মাতাল।

[কালিফ এলিদ্।]

আম্মার ত্রুটীর মার্জ্জনা নাই,
রোষের শাস্তি নাই কি তব?
আঙ্গুর ফলের জলটুকু খাই,
তৎসনা তাই নিয়ত সব?
এমন করিলে সুরা দিব ছেড়ে
তুমি মনে মনে ভেবেছ তাই?
কারণ-সংখ্যা গেল শুধু বেড়ে,
এবার দেখিবে কামাই নাই!
সুরার পেয়ালা বড় ভাল লাগে,
আরও ভাল লাগে উম্মা তব;
আপনা তুষিতে পান করি আগে,
তোমারে জানাতে ভরিব নব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

বিবিধ।

চণ্ডীর অনুবাদ।

২৫০ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কাটালিয়াগ্রামবাসী বৈদ্য-বংশোদ্ভব জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একখানি বঙ্গানুবাদ

প্রণয়ন করেন। যে ভগবান্ পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘনে সমর্থ করেন, তিনিই অন্ধ কবির কাব্যলেখার সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

রূপনারায়ণ ঘোষ।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী আমডালা-নিবাসী রূপনারায়ন ঘোষ চণ্ডীর আর একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন।

অপর কয়েকখানি অনুবাদ।

এই অনুবাদ-শাখায় শিশুরাম দাস ও ঈশ্বরচন্দ্র সরকার-কৃত প্রভাসখণ্ডের অনুবাদ, তিন শত বৎসরের রচিত বহুনন্দন দাস-কৃত গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধ-মাধব ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের অনুবাদ, প্রেমদাস-কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। রসময় দাস-কৃত গীত-গোবিন্দের অনুবাদ রচিত হইবার পরে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে গিরিধর নামক জনৈক কবি গীত-গোবিন্দের আর একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত অনুবাদখানি উৎকৃষ্ট।

পদ্মাবতী।

আর একখানি অনুবাদ-গ্রন্থের এখানে উল্লেখ করা উচিত। বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যে আলোয়াল-কৃত পদ্মাবতীর অনুবাদ অতি সম্মানিত স্থান পাইবার যোগ্য। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে মালিক মহম্মদ হিন্দী ভাষায় পদ্মাবতীর রচনা করেন। মুসলান-রচিত হইলেও, এই পদ্মাবতী-কাব্যের ভাষা বিশুদ্ধ হিন্দী। কবি আলোয়াল এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আলোয়াল বাঙ্গালা দেশের ফতেয়াবাদ পরগণার (আধুনিক ফরিদপুর) অন্তঃপাতী জালালপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আলোয়ালের পিতা জালালপুরাধিপতি সম্‌সের কুতুবের অমাত্য ছিলেন। পিতা পুত্র একদা সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে পর্ত্তুগিজ জলদস্যুগণ ইহাঁদিগকে আক্রমণ করে; পিতা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, এবং পুত্র কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া আরাকানে আসিয়া উপস্থিত হন। আরাকানাধিপতির প্রধান মন্ত্রী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী মাগণঠাকুর আলোয়ালকে আশ্রয়দান করেন, এবং তাঁহারই আদেশে পদ্মাবতীর অনুবাদ বিরচিত হয়।

পদ্মাবতী-কাব্যের স্থানেস্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রের,—বিশেষতঃ অলঙ্কার-শাস্ত্রের যেরূপ অধিকার-নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার তুলনা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। মুসলমান কবি হিন্দুর আচার-ব্যবহারের যে চিত্র উপহার প্রদান করিয়াছেন, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির নিকট আমরা ততটা প্রত্যাশা করি নাই। পিঙ্গল-ধৃত গণাগণের ব্যাখ্যা সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী না হইলে কেহ বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। এই

কাব্যের রচনা বিশুদ্ধ সংস্কৃতাত্মক বাঙ্গালা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাব্যখানি চট্টগ্রামের মুসলমানগণ পার্শী অক্ষরে লিখিয়া এতাবৎকাল রক্ষা করিয়াছিলেন। পার্শী অক্ষর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরে পরিবর্ত্তন-কার্য্যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ একান্ত অক্ষরজ্ঞান-শূন্য প্রকাশক হামিদুল্লা যে সকল প্রমাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহাকে উদ্ধার না করিলে কাব্যখানি একবারে মাটী হইবে।

আলোয়ালের জীবনের শেষাংশও কষ্টপূর্ণ। যখন সম্রাট্ শাজাহানের পুত্র সুজা আরাকানে উপস্থিত হন, তখন আরাকানাধিপতি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণ করেন। আলোয়াল মুজা নামক এক দুষ্ট ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে সুজার অনুচরগণের সহিত কারারুদ্ধ হন। নানাপ্রকার বিপদ্ অতিক্রম করিয়া জীবনের অন্ত-ভাগে তিনি ছৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহম্মদ খান প্রভৃতি কয়েক-জন ধনী ব্যক্তির আজ্ঞায় কয়েক-খানি পার্শী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। সেই সমস্ত অনুবাদই বিশুদ্ধ সংস্কৃত-প্রধান বাঙ্গালায় রচিত। মুসলমান লেখক বাঙ্গলাভাষায় কিরূপ অসামান্য সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারেন, পদ্মাবতী-কাব্য তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ।

উদ্ভট শ্লোক।

বহুশতাব্দী-ব্যাপিনী বিজয়-বাত্যায় ও বিভিন্ন বিজাতীয়ের বন্যায় প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বঙ্গভাষা যে শীর্ণ, সঙ্কীর্ণ ও শ্রীহীন না হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতিসম্পদ্‌সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মুখ্য কারণ এই যে, উদ্ভিদ যেমন ধরণী, বায়ু ও সূর্য্যকিরণ হইতে আপনার বর্দ্ধনোপায় লইয়া উন্নতি লাভ করে, বঙ্গভাষা তেমনই যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তখন তাহারই মধ্য হইতে আপনার পোষণ-রস শোষণ করিয়া উন্নতি ও পুষ্টি লাভ করিয়াছে। বন্যার পর বন্যা যেমন ধরাপৃষ্ঠে চিহ্ন রাখিয়া যায়, সমতল-ভূমিকে উন্নত করিয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীয়ের বিজয়-বন্যাও তেমনই বঙ্গভাষায় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে;—বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছে।

বঙ্গভাষা বহু পার্শী শব্দ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। সে সকল শব্দ এখন বঙ্গ-ভাষার ব্যাকরণ-রীতিতেই পরিচালিত হইতেছে। ইংরাজী শব্দও ভাষার অঙ্গী-ভূত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান বিজেতৃবর্গ ভারতবর্ষকেই স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান মিত্ররূপে, ভ্রাতার মত, পরস্পরের সুখদুঃখ-ভাগী হইয়া বাস করিতেন। আজ সন্ধান করিয়া দেখিলে

হিন্দুর আচার-ব্যবহারে বহু আচার-ব্যবহার মিশ্রিত লক্ষিত হইবে; মুসলমানের আচার-ব্যবহারেও হিন্দুর আচার-ব্যবহার সেইরূপ অধিক। কেহ কাহারও মনোবেদনার কারণ হইতেন না। এই নীতিভ্রষ্ট হইয়াই আওরঙ্গজেব মুসলমান-সাম্রাজ্যের দৃঢ়ভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলেন। হিন্দুর সম্প্রীতিবশতঃই মোগলের সিংহাসন সুদৃঢ় হইয়াছিল; আকবর হিন্দুমুসলমানের সমবেত শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। হিন্দুর সম্প্রীতি হারাইয়াই মোগলের দোর্দণ্ড প্রতাপ দিনান্ত-তপনের মত তেজোহীন হইয়া পড়ে। তাই মুসলমানের সময়ে রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজাতীয় প্রভাব অত্যন্ত অধিক নহে। ইংরাজ মুসলমানের অনুসৃত পথে গমন করেন নাই। ইংরাজের নিকট ভারতবর্ষ স্বদেশ নহে—বিদেশ, ভারতবাসী মিত্র বা ভ্রাতা নহে—বিজিত জাতিমাত্র। তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী প্রভাব বড় সহজে চক্ষে পড়ে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যে ইংরাজী প্রভাবে সিক্ত, তাহা পদে পদে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যে তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত সে প্রভাব কল্পনাপ্রভাবে অতিরিক্ত অধিক দেখাইয়াছে। মধুসূদনের কাব্যে, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কোথায় তাহা লক্ষিত না হয়? বরং বিধর্মী মধুসূদনের রচনায় জাতীয়ভাব সমুজ্জ্বলতম।

সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মনোরম উপন্যাসে বঙ্গগৃহের নানাচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত চিত্র ও চরিত্র কত দূর বাস্তবানুগ ও কত দূর কল্পিত, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখা আবশ্যক। সে সকল চিত্র ও চরিত্র কল্পনা-রঞ্জিত। সমাজ যেমন আছে, সে সকল চিত্রে ও চরিত্রে তাহার অপেক্ষা, সমাজকে যেমন করিতে ইচ্ছা করি, তাহাই সুস্পষ্ট। বাঙ্গালার একান্নবর্ত্তী পরিবারের বহুজনের সহানুভূতিসিক্ত সুখদুঃখের কথা সে সকল উপন্যাসে কোথায় তেমন ভাবে চিত্রিত? হিন্দু-পরিবারে পত্নীর অপেক্ষা জননীর, বিধবা পিতৃষসার ও ভগিনীর প্রভাব অধিকাংশ স্থলেই অধিক। নিপুণ শিল্পী তাঁহাদিগকে চিত্রের পশ্চাতেই রাখিয়াছেন, প্রাধান্য দেন নাই। ইহা যে তাঁহার ক্ষমতার অভাবের পরিচায়ক, এমন বিশ্বাস করিতে পারি না। সমাজকে নূতন প্রতীচ্য আদর্শে প্রভাবিত আমরা যে ভাবে গড়িতে চাহি, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন। "ভ্রমরে"র দৃঢ়তার আমরা যতই প্রশংসা করি না কেন, বাঙ্গালায় দেখিতে পাই কোথায়? পতিপ্রেমবঞ্চিতা কোন্ "সূর্য্যমুখী" গৃহের বাহিরে পদার্পণ করিবার কল্পনা করিতে সমর্থ? কোন্ "শৈবলিনী" বাঞ্ছিতকে লাভ করিবার জন্য ইংরাজের সহিত গমন, নবাব-সন্দর্শন প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারে? এ অবস্থায় উত্তরকালে পাঠকগণ এই সকল গ্রন্থ হইতে সমাজের

যে অবস্থা কল্পনা করিবে, তাহা কি অভ্রান্ত হইবে? প্রাচীন ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসাগার-কল্পনা, হিন্দুর বিবাহে ঢক্কাবাদন, ঐ সকল এক দিকে যেমন কল্পিত সমাজের কল্পিত চিত্র, অপর দিকে তেমনই অভিজ্ঞতার অভাবের পরিচায়ক।

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সমাজের প্রকৃত চিত্র নিপুণ শিল্পীর নৈপুণ্যলাভে বঞ্চিত হইয়াও সহজে হৃদয় আকৃষ্ট করে। দৈন্য-দুঃখ-দুর্দ্দশার দাবানল-দগ্ধ বঙ্গপরিবারের দুঃখিনী বধূ "সরলা" আমাদের অশ্রুজলে পুণ্যস্নানস্নাতা হইয়া সহজেই হৃদয়মন্দিরে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থা।

আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরাজীর যথেষ্ট প্রভাব আসিয়াছে। পরিবর্ত্তন-যুগের পরিসমাপ্তিতে এখন নূতন গঠনযুগ আরম্ভ হইবার কথা। আশা করি, এখন আমরা জাতীয় জীবনের প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করিতে ভুলিব না। সমাজ ও সাহিত্য পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়, এ কথা আর বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আশা করি, এখন বঙ্গের ঔপন্যাসিক বঙ্গগৃহের বাস্তব সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিবাদ, বিপদ্-সম্পদ চিত্রিত করিবেন; বঙ্গের কবি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীতের উৎস মুক্ত করিবেন। বঙ্গগৃহের ক্ষুদ্র সুখদুঃখাদি উপন্যাসের অযোগ্য নহে; বঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও কাব্যের অনুপযুক্ত নহে। বঙ্গগৃহে কত সুখ, কত দারুণ মর্ম্মপীড়া, কত বিপদ্, কত সম্পদ্ আইসে, তাহা কে না জানে? বঙ্গের পল্লীতে এখনও ছায়াসুশীতল অশ্বত্থবটাদি বনস্পতিশাখায় বহুবিধ বিগহ কূজন করে, পবনতাড়নে নারিকেল-তরুর পত্রমুকুট বিকশিত হয়; বিচিত্রবর্ণবহুল কুসুম-সুষমাময় শস্যক্ষেত্র সযত্ন-সজ্জিত উপবনকে লজ্জা দেয়। এখন সে সকল দেখিবার, বর্ণনা করিবার, সে শোভা উপলব্ধি করিবার ও তাহার গীত গাহিবার সময় আসিয়াছে।

প্রতীচ্য সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে লক্ষিত হইবে, প্রতীচ্যে গাথার যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, ভারতে সেরূপ হয় নাই; বৌদ্ধ সাহিত্য ব্যতীত গাথার উন্নতি নাই। কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেক স্থানে আর একরূপ কবিতার বিশেষ আদর ছিল। অতি অল্প কথায়, কয়টিমাত্র চরণে গভীরভাব প্রকাশে সে সকল কবিতার তুলনা নাই। হাফেজ, ওমর খায়ম ও ভারতের উদ্ভটশ্লোককারগণ সেইরূপ রচনায় সিদ্ধহস্ত।

সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকে বিশুদ্ধ হাস্যরস, অকৃত্রিম গম্ভীর মর্ম্মবেদনা, গভীর প্রেম, সবই প্রকাশিত; ক্ষুদ্র কবিতা যেন বিপুলকুসুম-ভারাবনতা লতিকার শ্রীধারণ করিয়াছে। সে সকল কবিতা প্রকৃত কবিত্ব-গুণে দীপ্ত হীরকের শোভায় সমুজ্জ্বল। কিন্তু বোদ্ধার অভাবে সে সকল কবিতা আজ অনাদৃত।

এ দেশের অধিকাংশ প্রবাদবাক্য উদ্ভট শ্লোকের মহার্ণব-মন্থন-জাত। পূর্ব্বে এই সকল কবিতা দেশে প্রচলিত মুদ্রারই মত সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু অকারণ অনাদরে আজ অনেক কবিতা বিস্মৃতির অতল তলে অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রতীচ্য সাহিত্যাগার যখন আমাদের নিকট প্রথম মুক্ত হয়, তখন আমরা প্রতীচ্য সাহিত্যের নবীনদীপ্তিতে মুগ্ধ ও মোহিত হইয়া আপনাদের সঞ্চিত রত্নরাজির প্রতি অমনোযোগী হইয়াছিলাম। তাহার শাস্তি আমরা পাইয়াছি। সেই অনবধানতার—অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আজ অনেক উদ্ভট শ্লোক বিস্মৃত। একটি শ্লোকে শ্লোককার যথার্থই বলিয়াছেন,—

বিদীর্ণ হরির নখে করিকুম্ভ হ'তে
রক্তসিক্ত মুক্তাফল লুটে ভূমি' পরে;
অবোধ ভীলের পত্নী যায় সেই পথে,
বদরী ভাবিয়া ব্রত তুলি' লয় করে;
কঠিন হেরিয়া তবে মূঢ়া সে তখন
ফেলি' দেয় দূরে তারে অতি তুচ্ছ বলি'।
অস্থানে পতিত হ'লে মহৎ যে জন
তারো ভাগ্যে অবহেলা—দুর্গতি কেবলি।

মূঢ় আমরাও এমনই অবহেলায় বহু রত্ন হারাইয়াছি। বড় দুঃখেই কবি বলিয়াছেন,—

আর যত দুখ আছে, হে-চতুরানন,
সিখ যদি ভালে তাহে নাহি খেদ মোর;
শুধু অরসিক জনে কাব্য-নিবেদন
লিখো না কপালে, দেব, এ যাতনা ঘোর।

তাজমহলের সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কোন লেখক বলিয়াছিলেন,—ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, জগতের অধিকাংশ সুরম্য হর্ম্ম্যের নির্ম্মাতা স্থপতির নাম অপরিজ্ঞাত। এই সকল কবিতা পাঠ করিয়া তেমনই মনে হয়, কি আশ্চর্য্য, এই সকল কবিতার রচকগণ অপরিজ্ঞাত! বিকসিত উপবনে রবিকরপানফুল্ল প্রজাপতি যেমন কুসুমে কুসুমে ভ্রমণ করে, উদ্যানের শোভা সংবর্দ্ধন করে, এই সকল শ্লোকও তেমনই কাব্যরসরসিকদিগের কথোপকথনে ব্যবহৃত হইয়া কথায় রসসঞ্চার করিত।

বঙ্গদেশে এই সকল শ্লোক-সংগ্রহের জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে, এমন বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগর বহুদিন পূর্ব্বে "শ্লোকমঞ্জরী" নাম দিয়া একখানি উক্ত শ্লোকসংগ্রহ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত চন্দ্রমোহন

তর্কালঙ্কার বাঙ্গালায় গদ্যানুবাদ সহ "উদ্ভটচন্দ্রিকা"র প্রচার করেন। কিন্তু সুকবি তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত সংগ্রহই বিশেষ সমাদৃত; তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, অনুবাদে সিদ্ধহস্ত কবিরত্ন মহাশয়ের কবিতানুবাদ অতি মধুর হইয়াছে। *

আমাদের দৈন্যদুঃখাদির জন্য আমরা সর্ব্বদাই দুঃখ করিয়া থাকি,—"এমনি কপাল পাতর-চাপা, বুকের উপর প্লাষাণ চাপা।" কিন্তু আপনাদিগের দোষবিষয়ে আমরা একান্তই অন্ধ। ভারতবর্ষে প্রাচীন শিল্পের কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ বিজেতার দণ্ডাঘাতে চূর্ণ হইয়াছে—আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই; উপযুক্ত বাহুবল ছিল না। কিন্তু সাহিত্যসম্পদরক্ষার যোগ্যতাই বা আমাদের কোথায়? আমরা "হারায়ে অঞ্চলের সোনা" এখন পরের উপাসনা করিতেছি।

এই সকল কবিতায় যুগযুগান্তের রুচি ও জ্ঞান আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রস্তরীভূত মৃত্তিকায় যেমন বহুপূর্ব্বের বিহঙ্গের নখচিহ্নও বিদ্যমান থাকে, তেমনই এই সকল কবিতায় কত কালের কত ভাব রহিয়াছে! পিতৃভক্ত রামচন্দ্রের আত্মত্যাগ, ধর্ম্মভীরু পাণ্ডবদিগের দুঃখদুর্দ্দশা, রাধাকৃষ্ণের মধুরপ্রেম; সবই এই সকল কবিতাদর্পণে প্রতিবিম্বিত।

এই সকল শ্লোকে সর্ব্ববিধ ভাবই বিদ্যমান। ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,—

"Such is the patriot's boast where'er we roam,
His first, best country ever is at home"

উদ্ভট শ্লোকে আছে,—

কাঞ্চন-পিঞ্জরে বাস; এ দেহ-মার্জ্জন
রাজকরপদ্মে; পেয় দুগ্ধ সুমধুর;
রসাল দাড়িম্ব ফল আহার প্রচুর;
সভামাঝে রাম-নাম সতত কূজন।
মোর সম ভাগ্যবান্ কে আছে কোথায়?
তবু জন্মতরু ক্রোড়ে মন সদা ধায়।

পাঠ করিলে মনে পড়ে,—

"The naked negro panting at the line,
Boasts of his golden sands and palmy wine."

যাহারা অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে দুর্দ্দিনের সঙ্গীদিগকে বিস্মৃত হয় ও উপেক্ষা করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবি কোকিলকে বলিয়াছেন,—

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল উদ্ধৃত অনুবাদমধ্যে কোনরূপ উল্লেখ নাই, সে সকল কবিরত্ন মহাশয়ের "কবিবচন-সুধা" হইতে উদ্ধৃত।

কুহুবিদ্যাগর্ব্বে তুমি গর্ব্বিত এখন,
পরশে না পদ আর এ ধরার ভূমি!
পর-নীড়ে বায়সের উচ্ছিষ্ট ভোজন,
বন্ধুপ্রিয়, ভুলেছ কি আজি তাহা তুমি?

যাহারা ক্ষমতা পাইলে লোকের উপকার না করিয়া অপকার করে, তাহাদের উদ্দেশে কবি বলিয়াছেন,—

অচিরেই হ'বে শেষ যবে বরষার,
তোমার এ বৃদ্ধি শেষ হ'বে, প্রবাহিণী!
তটতরু-পাতনের পাতক তোমার
শুধু চিরস্থায়ী হয়ে র'বে, তরঙ্গিণী।

যাহারা কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিতে সর্ব্বদাই বিলম্ব করে, কবি তাহাদের জন্য লিখিয়াছেন,—

"তৈলদানে কিবা ফল প্রদীপ নিবিলে?
সাবধানে কিবা ফল চোর পলাইলে?"

সর্ব্বদেশের জ্ঞানগর্ভ বাক্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উদ্ভট শ্লোকে,—

"তটিনীর খরতর প্রবাহ যেমতি
অহোরাত্র বহিতেছে অবিরাম গতি;
তেমনি জীবের আয়ু সঙ্গেতে লইয়া
অনন্ত কালের স্রোত চলিছে বহিয়া।"

পাঠ করিয়া সহজেই ইংরাজ কবি কাউপারের কবিতা মনে পড়ে। ইংরাজীতে আছে,—

"Let not thy winged days be spent in rain,
When gone no gold can bring them back again."

উদ্ভট শ্লোকে আছে,—

"ক্ষণমাত্র পরমায়ু যাইলে চলিয়া,
কোটি কোটি স্বর্ণ দিলে না পাবে ফিরিয়া।"

বাইবেলে আছে,—"A prophet is not without honour, save in his own country and in his own house."—উদ্ভটশ্লোককার বলিয়াছেন, "স্বদেশজাতস্য

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল উদ্ভট অনুবাদে অন্য কোনরূপ উল্লেখ নাই, সে সকল শ্রীযুত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের "কবিবচনসুধা" হইতে গৃহীত।

জনস্য লোকে গুণাধিকস্যাপি ভবেদবজ্ঞা।" দরিদ্রদিগের কথায় কবি গ্রে বলিয়াছেন,—

"Chill penury repress'd their noble rape,
And froge the genial current of the soul."

উদ্ভটশ্লোকে দেখিতে পাই,—

দরিদ্রের মনোরথ হৃদি মাঝে তার
উঠিয়া মিলায়ে যায় সেথাই আবার।

এরূপ সাদৃশ্য পদে পদে দেখান যাইতে পারে।

চন্দ্রমার আছে শত কুমুদের দল,
কুমুদীর কিন্তু এক চন্দ্রই সম্বল।

সার উইলিয়ম জোন্সের পুস্তকে এই কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়া সুর লিখিয়াছেন,—

The moon looks
On many brooks,
"The brook can see no moon but this."

উদ্ভটশ্লোক জ্ঞানগর্ভ বাক্যের অক্ষয় ভাণ্ডার; কিন্তু অধিক দৃষ্টান্তের উদ্ধার অনাবশ্যক।

Similia similibus curantur প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। উদ্ভটশ্লোক-কার অতি কৌশলে ইহার ব্যবহার করিয়াছেন,—

"যে দৃষ্টি করিয়া দান বধিলে আমায়,
সেই দৃষ্টি, সুলোচনে, দাও পুনরায়।
'বিষেই বিষের ক্ষয়'—শুনেছি শ্রবণে,
পূর্ব্বকাল হ'তে ইহা বলে সর্ব্বজনে।"

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্য উভয়ের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে, প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্য-কল্পনা নারীদেহকে অবলম্বন করিয়া শিল্পে ও সাহিত্যে, দেবালয়প্রাচীরে ও রঙ্গমঞ্চে; শিলা-অঙ্গে ও পুস্তকপত্রে অজস্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের সুন্দরের আদর্শ পুরুষে নহে—নারীতে। প্রাচীনভারতের কবি রমণীর আননে স্রষ্টার ক্রমশঃ বিজ্ঞতালাভের পরিচয় পাইয়াছেন,—

নলিন মলিন হয় ফুরাইলে দিন,
নিশাশেষে শশধর বিবর্ণ মলিন।

তাই বিধি নিরমিলা নারীর আনন,
ক্রমে ক্রমে বিকসিত হয় যত জন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল কবিতায় পূর্ব্বকালের কবিত্ব-সঞ্চিত জ্ঞান লক্ষিত হইবে। নারীনয়নে কজ্জল-বিলেপন এখন বিরল হইয়া আসিতেছে; পূর্ব্বে তাহা রমণীর প্রসাধনের অঙ্গ ছিল; কজ্জল-সজ্জিত নয়নের প্রতি কবির উক্তি,—

"হরিণ-নয়ন জিনি' তব ও নয়ন
কজ্জলে ভূষিত, ধনি, কর কি কারণ?
সে বাণে অমনি প্রাণ করয়ে হরণ,
সে বাণে মাখায়ে বিষ কিবা প্রয়োজন?"

হাস্য-পরিহাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, রঙ্গরস, এ সকল কবিতায় কিছুরই অভাব নাই। তাই অবগুণ্ঠিতাকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

অবশ্য এ ধনী ধনী চুরী করা ধনে,
নহে ত গুণ্ঠন কেন ও বিধুবদনে?
চন্দ্রের সুষমা কিংবা নলিনের শোভা
অবশ্য করেছে চুরী, নহে মনোলোভা
ও মুখ দেখাতে কেন শঙ্কা গণে মনে?
এ ধনী অবশ্য ধনী চুরী করা ধনে।

কবি বলেন, জীবন অল্পকাল-স্থায়ী, প্রেম অনন্ত। মানবের এই চিরনবীন বৃত্তি চিরদিনই কবিকুলের সঙ্গীতের বিষয়। তবুও বায়রণ বলেন, হিমপ্রধান-দেশবাসীদিগের রক্তও শীতল, তাহাদের প্রেম প্রেম-নামের যোগ্যই নহে! উষ্ণপ্রধান দেশে প্রেমাদি বৃত্তি প্রবল ও আগ্নেয়গিরির অন্তর্নিহিত গলিত ধাতুর মত উগ্র। এ দেশে প্রেমকুসুম অল্পদিনেই বিকশিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে; কাজেই এ দেশে কবিতায় প্রেমের প্রাধান্য ও প্রাবল্য অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। এই সকল কবিতায় নিত্য নবমূর্ত্তিধর প্রেমের শত মূর্ত্তি লক্ষিত হইবে। সেক্‌স্‌পিয়ার বলেন, প্রেমিক মৈশরীর ভ্রূভঙ্গীতে তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করেন। উদ্ভট শ্লোকে প্রেমবিহ্বল প্রেমিক চন্দ্রগ্রহণকালে প্রেমিকাকে বলিতেছেন,—

বাহিরে থেক না আর, ত্বরা পশ ঘরে;
এখনি হইবে, প্রিয়ে, শশাঙ্ক-গ্রহণ;
হেরি' তব মুখশশী গ্রাসিবার তরে
পাছে রাহু শশী ত্যজি' করে আগমন!

নিয়মে, বিধানে প্রেম বদ্ধ করা যায় না; প্রেম দূরত্বের ব্যবধান মানে না;

মকরকেতন সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বত্র বিচরণক্ষম ; সর্ব্বত্র তাহার দৃষ্টি। প্রেম গুপ্ত রাখাও অসম্ভব,—

"গুপ্ত নাহি রহে প্রেম। মৃগনাভি প্রায়
বসনে ঢাকিলে তবু গন্ধ বাহিরায়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-রচনার মধ্যে আপনার অনন্ত যৌবনের সম্মোহন সজ্জা পুষ্প-সুষমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কোমলতায় ও কমনীয়তায়, বর্ণে ও গন্ধে কুসুমের তুলনা নাই। তাই প্রেমিক কুসুম-কোমলা প্রণয়পাত্রীর নয়নে, অধরে, সর্ব্বাঙ্গে কুসুমই বিকশিত দেখিয়াছেন ; কিন্তু হায়, হৃদয় কেবল শুষ্ক, কঠিন, পাষাণ,

ইন্দীবরে নিরমিলা যুগল নয়ন ;
অম্বুজে গঠিলা ওই আনন সুন্দর ;
শুভ্র কুন্দে নিরমিলা দশন মোহন ;
নবীন পল্লবে বিধি গঠিলা অধর ;
চম্পকের দলে অঙ্গ করিলা নির্ম্মাণ ;
কেবল হৃদয় কেন কঠিন পাষাণ ?

পাঠ করিলে হায়েনের কবিতা মনে পড়ে,—

"নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢল ঢল,
রাঙা গোলাপ গাল দুখানি সুধায় মাখা সুকোমল।
শুভ্র বিমল করকমল ফুটে আছে চিরদিন !
হৃদয়টুকু শুষ্ক শুধু পাষাণ সম সুকঠিন !" *

হারেন লিখিয়াছেন,—

যুবক বাসিত ভাল এক যুবতীরে,
যুবতী বাসিত ভাল আর এক জনে ;
সে জন বাসিত ভাল আর সুন্দরীরে—
শেষে বাঁধি নিল তারে বিবাহ-বন্ধনে।

* * * *

এ কথা প্রাচীন অতি, ঘটে বার বার।

উদ্ভট শ্লোকে আছে,—

"আমি যারে ভালবাসি অন্যেরে সে চায়,
অন্যেও অন্যেরে ভাবে, না ভাবে তাহায় ;

---

* রবীন্দ্র বাবুর অনুবাদ।—সাধনা ;—প্রথমবর্ষ, প্রথম ভাগ।

আমি যারে নাহি ভাবি, সে ভাবে আমায় ;
পিরীতির এই রীতি কি বলিব হায় !
যে যাহারে ভালবাসে ধিক্ সে সবারে ;
ধিক্ মোরে, ধিক্ সেই মদন রাজারে।"

হায়েন লিখিয়াছিলেন,—

তুমি যবে যাও চলি মোর পাশ দিয়া—
আমারে পরশে শুধু তোমার বসন ;
আনন্দে আকুল হয়ে উঠে মোর হিয়া,
চাহি আমি পিছু পিছু করিতে গমন।

আর এক স্থানে—

শুধু যদি পাই তব ও মুখ দেখিতে—
সুখী আমি, সুখী আমি নৃপতির সম।

উদ্ভট শ্লোকের ভাব আরও মধুর,—

"কিছু যদি নাহি করে, শুধু কাছে রয়,
তথাপি আনন্দে সব দুঃখ দূর হয় ;
এ জগতে যা'র প্রতি ভালবাসা যা'র,
বলিতে পারি না সে কি ধন তাহার।"

বার্ণস লিখিয়াছেন,—

"Had we never loved see kindly,
Had we never loved see blindly,
Never met or never parted,
We had never been broken-hearted !"

উদ্ভট শ্লোকে আছে,—

"না জনমে যেন ভবে কুলনারীগণ,
যদিও জনমে যেন না লভে যৌবন ;
যৌবন হ'লেও যেন না হয় প্রণয় ;
প্রণয় হ'লেও যেন বিচ্ছেদ না হয়।"

এইরূপ মধুর, সরস, সুমার্জ্জিত, সুলিখিত ও জ্ঞানগর্ভ বহু বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু অনাবশ্যক। অনাদরে এইরূপ বহু কবিতা বিলুপ্ত হইয়াছে ; দিন দিন আরও হইতেছে। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে কোনও কৃতী পণ্ডিত এ সকলের সংগ্রহ করিয়া এই সব জাতীয় সাহিত্যরত্ন-রক্ষার উপায় করিবেন ;—ভারত-বাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

গিরিজায়া।

উপক্রমণিকা।

সাগর ও তটিনী।

মথুরা-রাজকন্যা মৃণালিনীর চরিত্রের সহিত সমুদ্রের তুলনা যদি অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে সাগরবাহিনী তটিনীর সহিত গিরিজায়ার তুলনা অসঙ্গত বিবেচিত হইবে না। কেন না, সকল দিকেই এ চরিত্রের তল আছে, সীমা আছে; কিন্তু মৃণালিনী-চরিত্র অতল, সে চরিত্র "অসীমমহিমামণ্ডিত"। তটিনী সমুদ্রগামিনী, গিরিজায়া-তটিনীও মৃণালিনী-সমুদ্রাভিমুখিনী। সাগর ও তটিনীর সম্মিলনে যে শোভা, যে ব্যাপকতা, মৃণালিনী ও গিরিজায়ার সম্মিলনে সেই শোভা ও সেই ব্যাপকতা।

চিত্রা ও চন্দ্রমা।

ভূলোকের দুইটি বস্তু দ্বারা আমরা উল্লিখিত চরিত্র দুইটিকে যেমন বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তেমনি দ্যুলোকের দুইটি বস্তু দ্বারাও আমরা নির্ব্বিঘ্নে এই চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। আকাশ-পট-বিরাজিনী চিত্রা ও চন্দ্রমার সহিত আমরা যথাক্রমে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর তুলনা করিতে পারি। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিঃ যেমন প্রশান্ত, তাহাতে যেমন কোনও বিকার নাই, কোনও কলঙ্ক নাই, সে যেমন "ঘাট-মাঠ-বাট" সকলই আলোকিত করে; মৃণালিনীর চরিত্র-জ্যোতিও তেমনি প্রশান্ত, তেমনি নির্ব্বিকার ও তেমনি নিষ্কলঙ্ক; সে চরিত্রের আলোকে সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়; তাহার সংসর্গে যে আইসে, সেই আনন্দলাভ করে, এবং ব্যথাবেদনা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। চিত্রারূপিণী গিরিজায়ার বুদ্ধি চিত্রার রশ্মির ন্যায় সুদূরগামী; সে বুদ্ধিতে যেমন তীক্ষ্ণতা, তেমনি কুটিলতা, কিন্তু তাহার আলোকদায়িনী-শক্তি অপ্রখর।

স্মৃতি।

গিরিজায়া, এই শব্দটী উচ্চারিত হইলেই একটি রহস্যময়ী ও কমনীয়া খর্ব্বাকৃতি বালিকামূর্ত্তি আমাদের নয়নপ্রান্তে যেন সহসা আবির্ভূত হয়, এবং তাহার ক্ষুদ্র রক্তপ্রভ ওষ্ঠাধর-মধ্যবর্ত্তী তরল হাস্যের সহিত আমরা তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার

পরিচয় প্রাপ্ত হই। আর একটি কথা আমাদের মনে পড়ে, এ বালিকা এ জগতে যেন কেবল গান গাহিতেই আসিয়াছে, এবং সত্যই আমাদের মনে হয়, যেন এই বালিকা আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া গাহিতেছে,—

মথুরা-বাসিনী, মধুর হাসিনী,
শ্যাম-বিলাসিনী রে।
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী রে॥

তাহার কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে আমাদের সমস্ত প্রাঙ্গণখানি যেন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং বিরহের একটি বেদনামিশ্রিত ভাবে শ্রোতৃমণ্ডলী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিরহের মধ্যেও আনন্দ আছে; সেই জন্য তাহার এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে মনে হয়, যেন হর্ষবিষাদ দুইটি কপোতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বায়ু-হিল্লোলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে।

গীতিকবিতা।

বস্তুতঃ গিরিজায়া বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি; এ যেন একখানি নির্দ্দোষ গীতি-কবিতা, নিতান্ত সহজ-বোধ্য ও মর্ম্মস্পর্শী। আড়ম্বর নাই, অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য অথবা রূপক ও উপমার বাহুল্য নাই। অথচ যাহা বলিবার, সমস্তই যথাযোগ্য সালঙ্কার বলা হইয়াছে। রচয়িতার মৌলিকতায় কবিতাটির আগাগোড়া পরিস্ফুট।

গিরিজায়ার সমস্ত জীবন কবিত্বময়। কবিতাই এই বালিকার ভাষা, কবিতার ন্যায় এ বালিকার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতি। দক্ষিণ-বাতাস শস্যশ্যামল প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া যেমন গান গাহিয়া যায়, এ বালিকা তেমনি পৃথিবীর উপর দিয়া গান গাহিয়া চলিয়া গিয়াছে। চিরজীবন ব্যাপিয়া এ বালিকা খঞ্জনীর মত নাচিয়াছে, বাঁশীর করুণ তানটিতে তাহার ব্যথা-বেদনা ফুটিয়া উঠিতে দেখি নাই। প্রসন্ন শরতের প্রভাতে চাহিয়া দেখি, পুষ্পোদ্যানের এক পার্শ্বে এক রাশি স্থলপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, অমনি মনে হইয়াছে, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ বুঝি শতরূপে গাছের ডালে ডালে পাতার আড়ালে চাহিয়া রহিয়াছে। নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, সৌন্দর্য্যের মধ্যে অধিক সৌন্দর্য্য, আনন্দের মধ্যে অধিক আনন্দ; স্থলপদ্ম-দল-বিরাজী শিশিরবিন্দু, পুষ্পদল-বিরাজী শিশিরবিন্দু পুষ্পের অন্তর্নিহিত বেদনার বহির্বিকাশ নহে, তাহা প্রকৃতির দারুণ বেদনার প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু বেদনার প্রতিবিম্ব বেদনা নহে, সেও এক প্রকার আনন্দ; তাই আমরা বলিয়াছি, আনন্দের মধ্যে অধিক আনন্দ। অন্যের বেদনায় পুষ্পকে যেমন বেদনাভারাক্রান্ত

দেখা যায়, তেমনি গিরিজায়াকে অনেক সময়ে অন্যের বেদনায় কাতর দেখিয়াছি; তাহাকে তাহার নিজের জন্য দুঃখ করিতে কখনও দেখি নাই। কবিত্বময় জীবনের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর লক্ষণ আর কি হইতে পারে?

গ্রন্থমধ্যে গিরিজায়ার স্থান।

[রঙ্গমঞ্চে গিরিজায়া ও মৃণালিনী।]

এক্ষণে মৃণালিনী-গ্রন্থমধ্যে গিরিজায়ার স্থান-নির্দ্দেশে আমরা অগ্রসর হইব। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজা, অমাত্য, সেনা, বিজিত প্রভৃতি আড়ম্বরে পূর্ণ এই গ্রন্থমধ্যে এই সামান্যা ভিখারিণীর প্রাধান্য যে অল্প নহে, এ কথা প্রথমেই স্বীকার করা যাইতে পারে। অপ্রধান কেন, আপাত-দৃশ্যে এই চরিত্রটিই সর্ব্বপ্রধান মনে হইতে পারে। তাহার কারণ এই, চরিত্রের বহিশ্চাকচিক্য অত্যন্ত অধিক। এই বহিশ্চাকচিক্যের আধিক্যবশতঃ দ্রষ্টার দৃষ্টিভ্রম জন্মে, সেই কারণে তাহার চক্ষে গিরিজায়ার চরিত্র গ্রন্থস্থ অপর চরিত্রাবলী অপেক্ষা অনেক সুন্দর বোধ হয়। যাঁহারা মৃণালিনী গ্রন্থের অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই মুখে শুনিয়াছি যে, এই গ্রন্থোল্লিখিত চরিত্রাবলীর মধ্যে একমাত্র গিরিজায়াই দর্শকবৃন্দের চিত্ত মুগ্ধ করে। এমন কি, মৃণালিনী গিরিজায়ার জ্যোতিতে ম্লান ও নিষ্প্রভ মনে হয়। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারা বস্তুতই কৃপার্হ। এক্ষণে এইরূপ উক্তির যে সকল কারণ থাকিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি। (১) মৃণালিনী-চরিত্রের অভিনয় সুকঠিন, সাধারণ অভিনেত্রীর পক্ষে সে চরিত্রের গভীরতা সম্যক্ ব্যক্ত করা সহজ নহে। (২) গ্রন্থকার স্বল্প কথায় মৃণালিনীর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, গ্রন্থকারের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবশতঃই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। লেখনীর কয়েকটি সূক্ষ্মরেখায় যে অপূর্ব্ব চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্যক্ ধারণার স্থল রঙ্গভূমি নহে, বঙ্গের বর্ত্তমান অভিনয়-দর্শকগণও তাহার অনুপযোগী, এ ক্ষেত্রে কালেরও অনুপযোগিতা-দোষ অবিদ্যমান নহে। (৩) যিনি গ্রন্থখানিকে নাটকে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহার অনভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যহীনতা। (৪) গিরিজায়া-চরিত্রের বহিশ্চাকচিক্য। আমরা এই বহিশ্চাকচিক্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নিসর্গের যে নিয়মাধীনে পতঙ্গ বহির

আলোকে মুগ্ধ হয়, নিসর্গের সেই নিয়মাধীনে সাধারণ দর্শকও লোক-চরিত্রের বহিশ্চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া থাকে। প্রকৃত রত্ন-পরীক্ষকের সংখ্যা জগতে নিতান্ত বিরল।

বহিশ্চাকচিক্যবশতঃ গিরিজায়ার চরিত্র নিতান্ত মুগ্ধকর হইলেও তাঁহার মুগ্ধকরী অন্য শক্তি আছে। তৎপ্রভাবেই গ্রন্থমধ্যে গিরিজায়ার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। গিরিজায়া প্রভূতপরিমাণে অন্তর-সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী, সহৃদয়তা গিরিজায়ার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। বহিশ্চাকচিক্যের মধ্যে এই সহৃদয়তা যেন রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসের মধ্যে শরতের বারিধারা।

গিরিজায়া আজন্ম ভিখারিণী, তাহার সংসারে এমন বন্ধন নাই যে, তাহাকে গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থিত প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। গৃহের বাহিরে বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে সে আনন্দ লাভ করে, এবং গৃহে গৃহে গান গাহিয়া সে তৃপ্তিলাভ করে। এই তৃপ্তিলাভ তাহার ভিক্ষাবৃত্তির গৌণ উদ্দেশ্য হইয়াও যেন মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী তণ্ডুলাদি দ্রব্যাহরণ মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াও যেন গৌণ উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছে। একদিন এ বালিকা সামান্য উদরান্নের জন্য ভিখারিণী ছিল সত্য; কিন্তু যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে ও নারী-হৃদয়ের বৃত্তি-নিচয়ের স্বাভাবিক উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এ বালিকা আর উদরান্নের ভিখারিণী নহে, প্রেমের ভিখারিণী, এবং সেই হেতু পরের জন্য ভিখারিণী।

দূতী গিরিজায়া।

এক্ষণে, এই গ্রন্থমধ্যে গিরিজায়ার স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, গিরিজায়া যে পরের জন্য ভিখারিণী, সে কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, গিরিজায়া একদিন ঈষৎ আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিল, "পরের জন্যই মলেম"। বৈষ্ণব সাহিত্যের বৃন্দা দূতীর ভাবের সহিত গিরিজায়ার এই ভাবটির মিল দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যে বৃন্দা দূতীর যে স্থান, হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মধ্যে, গিরিজায়ারও সেই স্থান বলা যাইতে পারে। বৃন্দা কখনও শ্রীকৃষ্ণের দূতী, কখনও শ্রীরাধার দূতী, গিরিজায়াও তদ্রূপ। বৃন্দা শ্রীরাধার দুর্দ্দিনের আশ্রয়, গিরিজায়াও মৃণালিনীর দুর্দ্দিনের অবলম্বন। সখীর জন্য বৃন্দাকে শত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত, মৃণালিনীর জন্য গিরিজায়াকে অল্প লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। শত লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে গিরিজায়া বৃন্দাদূতীরই ন্যায় মৃণালিনীকে ভালবাসিত, এবং তাহার যত্ন ও সেবা করিয়া সুখী হইত।

প্রেম।

সহৃদয়তা গিরিজায়া-চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হইলেও, গ্রন্থকার অপূর্ব্ব কৌশলে এই ভিখারিণীর হৃদয়ে যে প্রেমের বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য অল্প নহে। তাহার সহৃদয়তা নিতান্ত সহজ-বোধ্য, সরল ও পরিস্ফুট; কিন্তু তাহার প্রেম অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও অব্যক্ত। ভূগর্ভস্থ স্বর্ণের ন্যায় তাহার প্রেম প্রচ্ছন্ন। অথচ এই প্রেমের পরিচয় না দিলে গিরিজায়ার চরিত্র-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হইবে না। সেই জন্য আমরা এক্ষণে এই প্রেমের পরিচয় দিব।

পূর্ব্বাভাষ।

প্রথমেই বলা যাইতে পারে, গিরিজার প্রেম অনন্য-সাধারণ নহে। ত্যাগ এ প্রেমের ভিত্তি নহে, বিসর্জ্জন এ প্রেমের উদ্দেশ্য নহে। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রেমের সাধারণ লক্ষণ সকল তদীয় প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। প্রিয়তম-সাক্ষাতে আনন্দ-বিহ্বলতা, প্রিয়দর্শনাভিলাষ জন্য উৎকণ্ঠা ও তজ্জন্য বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ-সহনশীলতা, এ সকলই গিরিজায়ার প্রণয়শীলতার নীরব পরিচয়স্থল। উৎকণ্ঠা, অভিমান, সোহাগ, আনন্দ প্রভৃতি প্রেমের সাধারণ লক্ষণ সকলও গিরিজায়ার প্রণয়ে অবিদ্যমান নহে। এ সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও, প্রেমের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ তন্ময়তা, ভক্তি-প্রবণতা প্রভৃতি তদীয় প্রেমের অঙ্গীভূত নহে।

পরিচয়।

যাহা হউক, এই ভিখারিণীর প্রেম বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে কতকগুলি পূর্ব্বের কথা বলিতে হইবে। আমরা প্রথম যখন গিরিজায়ার সাক্ষাৎ লাভ করি, তখন সে ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী, কিন্তু তথাপি সে অবিবাহিতা। আশ্চর্য্য এই, রমণীর যৌবন-সঞ্চারে যে বিপদের আশঙ্কা, তাহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া, নিতান্ত নিঃশঙ্কচিত্তে এই বালিকা গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গীত গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। অভিভাবকশূন্যা, সর্ব্বত্রগামিনী ও স্বচ্ছন্দচারিণী এই বালিকা সঙ্গীত-নিপুণা। সঙ্গীতই তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। তাহাকে ভিখারিণী না বলিয়া সঙ্গীত-ব্যবসায়িনী বলিলেও অন্যায় হইবে না। জাতিতে বৈষ্ণবী, সদাই হাস্যময়ী, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তা ও উদ্বেগশূন্যা; যেন গগনসঞ্চারিণী বিহঙ্গিনী, অথবা অরণ্যচারিণী কুরঙ্গিণী। দারিদ্র্যজনিত কালিমার রেখা তাহার অবয়বের কোথাও পতিত হয় নাই, যেন দারিদ্র্য এই বালিকার ত্রিসীমায় অবস্থান করে না! অথচ দেহের লজ্জা-নিবারণোপযোগী ও সৌষ্ঠববর্দ্ধনকারী কোন অনুষ্ঠানেরও অভাব

নাই : আড়ম্বরও নাই। যেন সমৃদ্ধির বিপুল অঙ্কে এ বালিকা লালিতা হয় নাই, এবং দারিদ্র্যের কঠিন ও শীর্ণ হস্তের তাড়নায় এ বালিকা নিগৃহীতা হয় নাই।

ভিখারিণী বালিকার এই পরিচয়প্রাপ্তিমাত্রই আমাদের হৃদয়ে স্বতঃই একটি প্রশ্নের উদয় হয়। এই পরানুগ্রহজীবিনী বালিকার এ প্রকার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাব কেন? কিন্তু এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য সমগ্র গ্রন্থমধ্যে অনুসন্ধান করিলেও সদুত্তর পাওয়া যায় না। অথচ ইহার একটি মীমাংসা না করিলেও আমরা গিরিজায়ার চরিত্র সম্যক্ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই না। সেই কারণে কল্পনা ও বিচার দ্বারা ইহার একটি যথাসম্ভব সদুত্তর আমাদিগকে গড়িয়া লইতে হইবে।

স্বচ্ছন্দভাব কেন?

দৈন্য, অভাব, শোক, অথবা বিপদ্ কর্ত্তৃক মানুষ আক্রান্ত হইলে, সেই আক্রমণের চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে তাহার মুখমণ্ডলে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ কোনও চিহ্ন আমরা গিরিজায়ার মুখমণ্ডলে অঙ্কিত দেখতে পাই না। তাহার কারণ এই, সম্ভবতঃ এই বালিকাকে আজ পর্য্যন্ত সংসারের কোনও ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয় নাই, এবং সংসার তাহার বিভীষিকাময় রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আজ পর্য্যন্ত এই বালিকার সম্মুখে আবির্ভূত হয় নাই। অন্নাভাব-জনিত দুরন্ত ক্লেশও এ বালিকাকে সহ্য করিতে হয় না। বালিকা গীত গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, ভিক্ষারও অভাব নাই; এমন অরসিক কে আছে যে, এই কলকণ্ঠা নবযুবতীকে তাহার আশার অতিরিক্ত ভিক্ষা দিবে না? ফলতঃ গিরিজায়াকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কোনও চিন্তা করিতে হয় না। শৈশব হইতেই সহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও বিলাস-সুখভোগবঞ্চিতা এই বালিকাকে কাল্পনিক অস্বচ্ছন্দতার নিগ্রহ কখনও ভোগ করিতে হয় নাই। মদনের তীক্ষ্ণ পঞ্চশরে এ বালিকার হৃদয় আজিও ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই, এবং নিরাশপ্রণয়জনিত উৎকণ্ঠায় এ বালিকার প্রাণ কণ্ঠাগত হয় নাই। পরিশ্রম ও অসমৃদ্ধির মধ্যে মানবহৃদয় প্রণয়-দেবতার অভিনন্দন করিবার তত অবসর পায় না, যত সমৃদ্ধি ও আলস্যের মধ্যে পাইয়া থাকে। সেই কারণে মদনের অত্যাচার হইতে এই বালিকার হৃদয় আজিও রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে।

প্রেম-বিকাশ।

কিন্তু বয়সের একটা দোষ আছে। মৃত্তিকামধ্যে একটি বীজ বপন করিয়া তুমি তাহার আর-কোনও সন্ধান লও আর না-ই লও, কালক্রমে দেখিবে, সেই বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই বৃক্ষ পুষ্পভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। তখন কাহার সাধ্য, সেই বৃক্ষের শোভা গোপন করিয়া রাখে? তখন সকলের

দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়, পবনদেব আসিয়া সেই বৃক্ষের ফুলের সৌরভ লুটে, ভ্রমর আসিয়া মধু লুটে, এবং ভক্ত যত্নের সহিত তাহাকে ঈশ্বর-সেবায় অর্পণ করিয়া ধন্য হয়। তেমনি, তুমি লক্ষ্য কর আর না-ই কর, বালিকার অঙ্গে কালক্রমে যৌবন-সঞ্চার হইবেই হইবে, তখন প্রণয়-দেবতা আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না। সেই দেবতা আসিয়া তখন নিশিদিন সেই বালিকার "হৃদয়-দুয়ারে ঘা" দিয়া বলে, দ্বার খোল, দ্বার খোল। সেই অলৌকিকী শক্তিশালী দেবতার নিঃশব্দ দারুণ আঘাতে হৃদয়ের অর্গল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া খসিয়া পড়ে, তখন হৃদয়ের কবাট দুখানি যেন কোন্ মায়াদণ্ডের স্পর্শে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইয়া সরিয়া যায়, এবং প্রণয়-দেবতা নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে সেই হৃদয়মধ্যে প্রবেশলাভ করেন। সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ পর্য্যন্ত যেন এক স্বর্গীয় গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে।

গিরিজায়ার চরিত্রগৌরব।

গিরিজায়ার অবস্থা এমনই হইল। এক্ষণে প্রশ্ন এই, গিরিজায়া কাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে? গিরিজায়া বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী রমণী, গিরিজায়া অযোগ্য পাত্রে হৃদয় সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহে। গিরিজায়া চরিত্রের গৌরব উপলব্ধি করিতে সক্ষম, এবং সে সেই অমূল্য রত্ন হেলায় নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহে। যে গিরিজায়াকে হৃদয়-বিনিময়ে হৃদয় দিবে, গিরিজায়া তাহারই। গিরিজায়া আজন্ম ভিখারিণী। আজ তাহার যৌবন বিকশিত হইয়াছে, এবং তাহার কলকণ্ঠে গৃহপ্রাঙ্গণ মধুময় হইয়া উঠিতেছে বলিয়া অনেক ধনীর পুত্রও তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেও করিতে পারে; কিন্তু গিরিজায়া কলঙ্কের বিনিময়ে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা চাহে না। তাহার হৃদয়ের সকল বৃত্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে সত্য, কিন্তু গিরিজায়া প্রবৃত্তি দমন করিতে জানে। গিরিজায়া আপন ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে আচরণ করিত। এরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষে প্রলুব্ধ হইবার সম্ভাবনা অল্প ছিল না, কিন্তু তথাপি সে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা। গিরিজায়া ধন্যা, সে মৃগালিনীর সহচরী হইবার যোগ্যা রমণী বটে।

যোগ্য বর।

পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার যোগ্য বয়সে গিরিজায়ার যোগ্য বর জুটিল। গিরিজায়া মগধ-রাজপুত্র হেমচন্দ্রের পার্শ্বচর দিগ্বিজয়কে দর্শন করিল। সামাজিক অবস্থানুসারে দিগ্বিজয় গিরিজায়ার যোগ্যপাত্র, দিগ্বিজয় গিরিজায়ার রসিকতার মর্ম্মগ্রাহী, এবং সে গিরিজায়াকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। গিরিজায়া দেখিল, এই তাহার যোগ্য বর বটে।

আশা।

দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের একান্ত অনুগত। গিরিজায়া সহজেই বুঝিল, যদি কোনও প্রকারে সে প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে, তাহা হইলে একদিন সে সাহস করিয়া প্রভুর নিকট হইতে ভৃত্যকে ভিক্ষা করিয়া লইতে পারিবে। সুবিধা এই, হেমচন্দ্রের তখন নিতান্ত দুঃসময়, প্রিয়তমা পত্নী মৃণালিনীর সন্ধান-লালসায় তিনি উৎকণ্ঠিত। এ দিকে কৌশলময়ী গিরিজায়া সম্মুখে উপস্থিত। হেমচন্দ্র গিরিজায়াকেই মৃণালিনীর সন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত করিবার যোগ্যপাত্রী বিবেচনা করিলেন, গিরিজায়াও সানন্দচিত্তে সেই কার্য্যভার গ্রহণ করিল। গিরিজায়া বুঝিয়াছিল, যদি হেমচন্দ্রের আশা মিটে, তাহা হইলে একদিন না একদিন তাহারও আশা মিটিবে।

গিরিজায়া অনেক কষ্টে মৃণালিনীর সন্ধান জানিয়া হেমচন্দ্রকে সংবাদ দিল। হেমচন্দ্র সংবাদ পাইয়া গুরুর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন, সুতরাং গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত হইল। এই হেতু গিরিজায়ার চিরপ্রফুল্ল চঞ্চল প্রকৃতিমধ্যে সহসা যে ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, মৃণালিনী গ্রন্থের সূক্ষ্মদর্শী পাঠকমাত্রই তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। হেমচন্দ্রের বিদায়ক্ষণ হইতে যে পর্য্যন্ত না মৃণালিনীর ও গিরিজায়ার মধ্যে নবদ্বীপ-যাত্রার সংকল্প স্থির হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা গিরিজায়ার সকল উক্তির মধ্যে একটি নিরানন্দময় ভাবের অস্ফুট বিকাশ দেখিতে পাই; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নবদ্বীপযাত্রার সংকল্প স্থিরীকৃত হইল, সেই মুহূর্ত্তে গিরিজায়া আবার আনন্দময় ভাব ধারণ করিল, এবং সে গাহিল,—

মেঘ-দরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে!
মেঘেতে বিজলী হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা গিরিজায়া যায় রে।

চাতকিনী।

এ ক্ষেত্রে মেঘ ও চাতকিনী কাহাকে কাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছে? নিঃসন্দেহ হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গিরিজায়া শুধু সহযাত্রিনী নহে, সে দর্শনপ্রার্থিনীও বটে। বস্তুতঃ এই সঙ্গীতের মধ্যে দুই খণ্ড মেঘ ও দুইটি চাতকিনীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। গিরিজায়া-চাতকিনী আপনার অন্তরের কথা সঙ্গীতে প্রকাশ করিল, এবং মৃণালিনী এ রহস্য না বুঝিলেও আমরা বুঝিলাম।

গিরিজায়া মৃণালিনীর সমভিব্যাহারিণী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মৃণালিনী যৎপরোনাস্তি বিস্মিতা হইলেন; কেন না, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি গিরিজায়ার মনোভাব অবগত নহেন। মৃণালিনী জানেন না যে, এই বালিকার ভাগ্যসূত্র তাঁহার নিজের ভাগ্যসূত্রের সহিত বিধাতাপুরুষ জড়াইয়া রাখিয়াছেন। মৃণালিনী জানেন না যে, এই বালিকা তাঁহারই ন্যায় কঠিন প্রেমের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছে, এবং মৃণালিনী জানেন না যে, এই বালিকা প্রেমের তরঙ্গে সুবৃহৎ পোতের পশ্চাতে একখানি ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। তাই মৃণালিনী সবিস্ময়ে গিরিজায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাবে?" গিরিজায়া কহিল, "আমার সর্ব্বত্র সমান। রাজধানীতে ভিক্ষা বিস্তর।" আমরা এ স্থলে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, গিরিজায়ার উত্তরের প্রথমাংশ সত্যাশ্রিত নহে; তাহার সর্ব্বত্র সমান, এ কথা আদি সে কিছুতেই বলিতে পারে না। গিরিজায়ার উত্তরের শেষাংশ সত্যাশ্রিত হইলেও, তাহা দ্ব্যর্থ-সূচক। রাজধানীতে ভিক্ষা বিস্তর সত্য, কিন্তু গিরিজায়া সাধারণ ভিক্ষার কথা বলিতেছে না, সে দিগ্বিজয়ের দর্শন-ভিক্ষার কথাই বলিতেছে।

মৃণালিনী গিরিজায়া-সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে নবদ্বীপ যাত্রা করিতেছিলেন; উদ্দেশ্য, হেমচন্দ্রকে গোপনে দেখিবেন। মৃণালিনীর উদ্দেশ্য অবগত হইয়া গিরিজায়া এই গীতটি গাইল,—

"চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন।
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন।"

এই গীতটি আমরা এই হেতু উদ্ধৃত করিলাম যে, ইহা দ্বারা গিরিজায়ার প্রেমের স্বরূপ ব্যক্ত হইতেছে। এ সঙ্গীতের মর্ম্ম এই যে, গিরিজায়া প্রেমের ষোল আনা প্রতিদান চাহে। তাহার হৃদয়ের এই ভাবটি গিরিজায়ার কণ্ঠোচ্চারিত পরবর্ত্তী সঙ্গীতে আরও স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে।

হীরা দাসী ও গিরিজায়া।

গিরিজায়া যখন গাইল,—

যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়া দিনু তরী
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে।

তখন আমরা গিরিজায়ার প্রণয় যে কোন্ স্তরের, তাহা সুস্পষ্টরূপে অবগত হইলাম। বাস্তবিক গিরিজায়ার প্রেম বিষবৃক্ষের হীরা দাসীর প্রেম অপেক্ষা

উচ্চস্তরের নহে, এবং এই স্তরের প্রেমই জগতে একান্ত সুলভ। গিরিজায়া ও হীরা দাসী উভয়েই অসাধারণ বুদ্ধিমতী, উভয়েই অশিক্ষিতা ও ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্যা; উভয়েই চরিত্রের গৌরব বুঝিত, কিন্তু কেহই ধর্ম্মের গৌরব বুঝিত না। হীরা দাসী অনেক দিন ধরিয়া প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়াছিল। গিরিজায়াও অল্প-দিন ধরিয়া প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্ব করে নাই। কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি দমিত হইতে পারে না, সেই জন্য হীরা দাসীকে একদিন প্রবৃত্তির হস্তে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, এবং তাহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল; কিন্তু গিরি-জায়ার ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই। তাহার প্রথম কারণ এই, গিরিজায়া হীরা দাসীর ন্যায় বালবিধবা নহে, এবং তাহার দ্বিতীয় কারণ, হীরা দাসী ভালবাসার বিনিময়ে সুতীব্র অপমান ও উপহাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু গিরিজায়ার কপালে ভগবান্ ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসাই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ যে ভালবাসার প্রতিদান নাই, তাহা অগ্নিতুল্য, তাহা দগ্ধ করে, তাহা ভস্ম করে। কিন্তু স্বর্গীয় ভালবাসা প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকে না। তাই মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গীত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "গিরিজায়া, এ কোন্ অপ্রেমি-কের গান?" তরণীর অঙ্গে কাণ্ডারী পদার্পণ করিলেন না বলিয়া গিরিজায়া আক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু মৃণালিনী আক্ষেপ করিবেন না। বস্তুতঃ মৃণালিনী ও গিরিজায়ার প্রেমের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। যাহা হউক, আমরা গিরিজায়ার নিকট হইতে মৃণালিনীর প্রেম আশা করি না, তবে যতটুকু আশা করি, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত নহি। ভিখারিণীর শিরোদেশে রাজ্ঞীর রত্ন-মাণিক্য-বিম-ণ্ডিত স্বর্ণমুকুট কখনও দিন সুশোভন হয় না। তাহার দুই হাতে দুইগাছি "পিত্ত-লের বালা" দিলে হাত যেমন সুশোভন হয়, এবং স্বর্ণ-বলয় সে হাতের তেমন উপ-যোগী মনে হয় না; তেমনি সকাম ভালবাসাই গিরিজায়ার হৃদয়ের উপযোগী মনে হয়, নিষ্কাম ভালবাসা তাহার উপযোগী মনে হয় না।

বস্তুতঃ প্রেমে গিরিজায়ার চরম সৌন্দর্য্য নহে। তবে এই প্রেমবিকাশের চিত্র-লিখনে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কি? তাঁহার উদ্দেশ্য দুইটি। (১) যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বচ্ছন্দচারিণী ভিখারিণীর হৃদয়ে যে ভাবে প্রেমের বিকাশ হইতে হইতে পারে, এবং সেই প্রেম যে ভাব অবলম্বন করিতে পারে, তাহা দেখানই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য। (২) তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, তুলনা দ্বারা মৃণালিনীর প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।

গিরিজায়ার প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাহার সহৃদয়তায়, তাহার নির্ভীকতায়, তাহার রহস্য-প্রিয়তায় ও তাহার বাক্‌পটুতায়।

সহৃদয়তা।

—*—

প্রথম পরিচয়।

গিরিজায়ার সহৃদয়তার কথা আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। মৃণালিনীর সহিত গিরিজায়ার প্রথম সাক্ষাতের পর বিদায়-কালে মৃণালিনী গিরিজায়ার কাণে কাণে কহিয়াছিলেন, "আমার ধৈর্য্য হইতেছে না, কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না; তুমি আজ রাত্রে আসিও। তোমার বণিক যদি আসেন, সঙ্গে আনিও।" উত্তরে গিরিজায়া কহিয়াছিল, "বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চিত আসিব।" "বুঝিয়াছি" এই শব্দটি গিরিজায়ার সহৃদয়তার প্রথম পরিচয়স্থল।

মৃণালিনীর প্রতি গিরিজায়ার এই সহৃদয়তা যত দিন গিয়াছে। ততই উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রেমের ভিখারিণী গিরিজায়া প্রথম যে দিন মৃণালিনীর অপূর্ব্ব প্রেমময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করে, সেই দিন হইতে সে তাহার নিতান্ত পক্ষ-পাতিনী, এবং সে তাহার ব্যথার ব্যথী। মৃণালিনী যখন "কণ্টকে গঠিল বিধি" গাহিয়া গিরিজায়াকে সেই গীত শিখিতে বলিতেছিল, তখন গিরিজায়া মৃণালিনীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন আলোড়িত করিয়া কহিয়াছিলেন, "চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি শিখিব?" গিরিজায়ার এই ক্ষুদ্র উক্তিটিতে তাহার হৃদয়ের কতখানি সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই উক্তিটি পাঠ করিয়া মনে হয়, গিরিজায়া যেন মৃণালিনীর সমস্ত হৃদয়খানি আপনার হৃদয়-মধ্যে লইয়া অনুভূতির অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

মায়াবিনী।

হৃষীকেশ কর্ত্তৃক গৃহ-বহিষ্কৃতা ও আশ্রয়হীনা মৃণালিনী যখন রজনীর অনন্ত অন্ধকাররাশিমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, স্থান কোথায়, ভাবিতে ভাবিতে নবদ্বীপের কথা স্মরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে গিরিজায়া যেন কোন "মায়াবিনী"র ন্যায় মৃণালিনীর হৃদয়ের কথা সহসা টানিয়া বাহির করিল, এবং স্থান দেখাইয়া দিল, নবদ্বীপ। মৃণালিনীর সহিত গিরিজায়ার চিন্তার এই অসাধারণ ঐক্য গিরিজায়ার সহৃদয়তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ দিগ্বিজয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কতকটা এই সহৃদয়তার বশবর্ত্তী হইয়াও গিরিজায়া যে মৃণালিনীর সমভিব্যাহা-রিণী হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তার পর, প্রবাসে মৃণালিনীকে সুখী করিবার জন্য এই বালিকা কতই না যত্ন

করিয়াছিল? কত আশ্বাসবাক্যে সে মৃণালিনীর অবসাদ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। মৃণালিনীর প্রতি গিরিজায়ার অকৃত্রিম ভালবাসা, স্নেহ ও যত্নের কথা স্মরণ করিলে তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

পাঠক, মৃণালিনী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছদে দেখুন, মৃণালিনীর মৌন-ব্যাকুল ভাব বিদূরিত করিবার জন্য এই বালিকা কত চেষ্টা করিতেছে। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছদে দেখুন, সে মৃণালিনীর দুঃখ নিজের দুঃখ মনে করিয়া কেমন "নীরবস্রুত" অশ্রুতে আপনার গণ্ডদেশ ভাসাইয়া দিতেছে। যে সদাই হাস্যময়ী, সে যখন পরের জন্য কাঁদিতে থাকে, তখন তাহাকে কত সুন্দর দেখায়!

গুণমুগ্ধা।

মৃণালিনীকে একটা সুখের সংবাদ দিবার জন্য এ বালিকার কত আগ্রহ, এবং একটি দুঃখের সংবাদ দিবার কালে তাহার কত সঙ্কোচ! মৃণালিনীর জন্য অনাহার, অনিদ্রা ও পথ-পর্য্যটন-জনিত ক্লেশ এ বালিকার পক্ষে যেন কিছুই নহে, বরং সেই ক্লেশ-স্বীকারেই তাহার যেন আনন্দ। কিন্তু মৃণালিনীর জন্য এতটা কেন? দিগ্বিজয়কে প্রাপ্তির আশা আছে, সেই জন্য? না, গিরিজায়া মৃণালিনীর গুণমুগ্ধা। সহচরী, সেই জন্য। বাস্তবিক মৃণালিনীকে গিরিজায়া প্রাণে প্রাণে ভালবাসিত। মৃণালিনীর প্রেম-বিহ্বলতায় সে মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মৃণালিনীকে ভালবাসিত। মৃণালিনীর ধৈর্য্য ও অভিমান-শূন্যতায় সে অবাক্ হইয়া তাহাকে ভালবাসিত। মৃণালিনীর প্রতি গিরিজায়ার এই গুণজ ভালবাসা জন্মিয়াছিল বলিয়াই গিরিজায়া মৃণালিনীর দুঃখ অত সহজভাবে আপনার হৃদয়মধ্যে অনুভব করিতে পারিত।

গিরিজায়ার সহৃদয়তা সম্বন্ধে আর আমরা অধিক কিছু বলিব না, তবে সে সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

অন্যের অবস্থা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও তদবস্থায় তন্ময়তা লাভ করাই সহৃদয়তার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। গিরিজায়া অনেক সময়ে এই তন্ময়তা লাভ করিত। সে দিন হেমচন্দ্র মৃণালিনীর পত্র, কুলটার পত্র বোধে শতধা ছিন্ন করিয়া অরণ্যমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেদিন গিরিজায়া মৃণালিনীর শোকে তদ্গত-চিত্তা হইয়া নৈশনিস্তব্ধতামধ্যে গাহিয়াছিল,—

"পরাণ না গেলো।
যে দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে

ওহিপর পিয়-সই কাহে কালনীরে
জীবন না গেলো।"

আজ হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক মৃণালিনী পরিত্যক্ত হওয়ায় গিরিজায়া যে ভাবে যে সঙ্গীত-ধারা বর্ষণ করিল, বুঝি সে স্বয়ং দিগ্বিজয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলেও সে ভাবে সে শোকের ধারা বর্ষণ করিতে পারিত না। এই শোক-সঙ্গীতে মৃণালিনীর হৃদয়ের সহিত গিরিজায়ার হৃদয় কেমন মিশিয়া গিয়াছিল। মিশিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, মুহ্যমানা মৃণালিনীর শোক এই সঙ্গীতশ্রবণে অশ্রুর আকারে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। সহানুভূতি শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ের বেদনাভার অশ্রুর আকারে দ্রবীভূত করিয়া দেয়।

রহস্য-প্রিয়তা।

সুরসিকা।

আমরা এক্ষণে গিরিজায়ার রহস্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। গিরিজায়ার রহস্যপ্রিয়তার গৌরব ও আদর এই জন্য যে, তাহা কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিত। সুরসিকের লক্ষণ এই যে, যোগ্য ব্যক্তির সহিত যোগ্য রসিকতায় সে সুনিপুণ। এ হিসাবে গিরিজায়া সুরসিকা বটে। হেমচন্দ্রের সহিত গিরিজায়ার রসিকতা একরূপ, রত্নময়ীর সহিত অন্যরূপ, দিগ্বিজয়ের সহিত তাহার দিগ্বিজয়ী রসিকতা।

হেমচন্দ্রের সহিত গিরিজায়ার রসিকতা সংযত ও সুমার্জ্জিত, অথচ প্রত্যেক রসিকতার মধ্যে বেশ একটি জীবন্তভাব বিদ্যমান। সে রসিকতার একটিও ব্যর্থ মনে হয় না; যখন যে উদ্দেশ্যে রসিকতার প্রয়োগ হইয়াছে, তখনই সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, দেখিতে পাই। সামান্যা ভিখারিণী হইয়াও, রসিকতা-প্রভাবে সে হেমচন্দ্রের হৃদয় কখনও শোকে, (১) কখনও ক্রোধে, (২) কখনও লজ্জায়, (৩) কখনও বা মহান্ বিস্ময়ে (৪) অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে। অথচ, আশ্চর্য্য এই, তাহার একটি রসিকতাও রাজপুত্র হেমচন্দ্রের অযোগ্য বিবেচিত হয় না, এবং হেমচন্দ্রের সহিত এই বালিকা যখন রহস্য করিয়াছে, তখন তাহাকে নাচকুণ্ডোদ্ভবা ভিখারিণী মনে করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

১। ৩৫ পৃষ্ঠা ৬—৮ ছত্র।
২। ৩৮ „ ৫—৭ ছত্র।
৩। ৩৯ „ ১৪—১৫ ছত্র।
৪। ৩৯ „ ১২—১৩ ছত্র।

তখন মনে হইয়াছে, রসিকতায় হিসাবে সে বিমলা অথবা কমলমণি অপেক্ষা কোনও অংশে হীনা নহে।

রত্নময়ীর সহিত গিরিজায়ার রসিকতা সুধীজন-সুলভ। বাহুল্যবোধে তাহা আমরা আর উদ্ধৃত করিলাম না। (৫)

দিগ্বিজয়ের সহিত গিরিজায়ার রসিকতাকে আমরা 'দিগ্বিজয়ী' আখ্যা প্রদান করিয়াছি। ভদ্রসমাজের পক্ষে এ রসিকতা কদর্য্য, কিন্তু দিগ্বিজয় সমাজের যে শ্রেণীতে অবস্থিত, সে শ্রেণীর পক্ষে এ রসিকতা কদর্য্য নহে; বরং এইরূপ রসিকতাই সে শ্রেণীর উপযুক্ত; সে শ্রেণীর লোক এতদপেক্ষা সুমার্জ্জিত রসিকতার মর্ম্মগ্রহণে পারগ হইবে কি না, আমরা সন্দেহ করি। (৬) "বঙ্কিমচন্দ্র"-রচয়িতা গিরিজাপ্রসন্ন বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, রসিকতা গিরিজায়ার বাহিরের জিনিস নহে, অন্তরের জিনিস। তাহা যেন গিরিজায়ার চরিত্রের সহিত অবিভাজ্যরূপে কে মিশাইয়া দিয়াছিল। কেন না, সহজ অবস্থার কথা দূরে থাকুক, এ বালিকা ক্রোধের বশবর্ত্তিনী হইলেও তাহার কণ্ঠ হইতে কখনও রসোক্তি, (৭) কখনও বা ব্যঙ্গোক্তি (৮) শুনিতে পাওয়া যাইত।

বাক্‌পটুতা।

বাক্‌পটুতার সহিত রসিকতার চিরসম্বন্ধ না থাকিলেও রসিকতার সহিত বাক্‌পটুতার চিরসম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে। সেই কারণে গিরিজায়া শুধু রসিকা নহে, সে বাগ্মীও বটে। তাহার বাক্‌পটুতার আমরা অধিক পরিচয় কি দিব? তাহার অনেক বাণী আমাদের কণ্ঠস্থ রহিয়াছে; "অশোকফুলের স্তবকের মত", "বর্ষাকালের পদ্মের মত",—

"দেখিলাম সরোবরে কাঁপিছে পবনভরে
মৃণাল উপরে মৃণালিনী।"

"তবে তুমি জলের ভিতর রত্ন দেখিয়াছ!" "কালিকার দিনও কাটিবে, পরদিনও কাটিবে; কেন কাটিবে না?" "তুমি পারঘাটার রসময়ী" প্রভৃতি গিরিজায়ার কণ্ঠোচ্চারিত অনেক উক্তি আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। গিরিজায়ার বাক্‌চাতুর্য্য সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তাহার সম্মুখে হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, রত্নময়ী প্রভৃতি সকলেই মূক।

৫। ১২৬ „ দ্রষ্টব্য।
৬। ২২৮ „ দ্রষ্টব্য।
৭। ৪৮ „ ১—২ ছত্র।
৮। ১৬২ „ ২—৩ ছত্র।

সুখের প্রবাস। *

কথায় বলে,—'সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ'। তাই পূজার ছুটীতে 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই ঋষিবাক্যের অনুসরণ করিয়া 'দারাপুত্র' লইয়া কাশীবাস করিয়া আসিয়াছি। তবে সেটা ঠিক 'সৎসঙ্গ' বলিয়া আদালতে ধার্য্য হইবে কি না, বলিতে পারি না। সেই তীর্থ-দর্শনের বৃত্তান্ত গত ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেও মনের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া বৈশাখের 'ভারতমহিলা'য় একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু তরুণবয়স্ক পাঠক-পাঠিকা ধর্ম্মের কাহিনী বড় শুনিতে চাহেন না, তাই এবার গুরুগম্ভীর আলোচনা ছাড়িয়া দুটা স্ফূর্ত্তির কথা বলিব, মনে করিতেছি।

বলা বাহুল্য, পূজার ছুটীতে এক পক্ষকাল কাশীবাস করিয়া মনের খেদ মেটে নাই, আবার বড় দিনের ছুটীতে সেই পথের পথিক হইয়াছি। এবার আর 'শীতলা ঘাড়ে করিয়া' বাহির হই নাই; 'একা আসা, একা যাওয়া, একের কর ভাবনা' মহাপ্রয়াণের এই সারতত্ত্ব বুঝিয়া একাই বাহির হইয়া পড়িয়াছি। সঙ্গে পথের সম্বল লোটাকম্বল ত আছেই, তার উপর পুরানেটিভস্ত্ব-পরিচায়ক একটি প্রমাণসই বোঁচকা! এবার ঠিক বিশ্বেশ্বর-দর্শনলালসায় চিত্ত-চকোর চঞ্চল, ইহা বলা চলে না। বড়দিন উপলক্ষে কন্‌গ্রেস্, এগ্‌জিবিশন, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি 'দুশ' রগড়, তলাথ মজা' উপভোগ করিবার জন্যই উৎসাহ ও ঔৎসুক্য বেশী। তবে সেটা আসল উদ্দেশ্যের ফাউস্বরূপ। দিন কয়েকের জন্য সংসারের ভাবনা, কাজের ঝঞ্ঝাট, কুটুম্বভারচিন্তা, অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রাণটা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশী রাজার জাতির গৌরব-গর্ব্বের নিশানা কলিকাতা সহর ছাড়িয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিলে 'বায়ুনঃ-কর্ম্মভিঃ' ম্লেচ্ছসংস্পর্শদোষের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয় ও তাহার দরুণ কতকটা চিত্তপ্রসাদলাভ হয়, ইহাও মনে মনে আঁচিয়াছিলাম! এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া 'দুর্গা' বলিয়া যাত্রা করা গেল।

গাড়ীতে আরোহীর অভাব নাই। অধিকাংশই কন্‌গ্রেসের 'প্রতিনিধি,' বা নিতান্ত পক্ষে 'দর্শক' হিসাবে যাইতেছেন। এতগুলি শিক্ষিত ও স্বচ্ছল অবস্থার লোক দেশের কথা ভাবেন, ও তজ্জন্য পয়সা খরচ করিয়া সুদূর (?) 'পশ্চিমে'

* প্রবন্ধটি প্রকাশে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে। তজ্জন্য প্রবন্ধলেখকই ষোল আনা দায়ী।

মানুষকে নিষ্পীড়ন করিতে যাইতেছেন, তীর্থদর্শনরূপ কুসংস্কারের মায়া ফেলিয়া দেশের শ্রেয়ঃসাধনে তৎপর হইতে দেখিয়াও বুকটা দশহাত হইল। বুঝিলাম, ভারত উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই, সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী—অন্ততঃ বক্তৃতায়। গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট প্রসঙ্গে মুস্কিল সরগরম, গোখ্‌লের নাম সকলের মুখে, এ আসরে পোড়া বিশ্বেশ্বরের নাম কেহ মুখেও আনে না, হেথায় তিনি বড় কল্‌কে পান না। কাজেই ভাবগতিক দেখিয়া কাশী যাচ্ছি কি মক্কা যাচ্ছি, তাহা বড় ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিলাম না। গাড়ীর ভিতরে চা, পাঁউরুটি, বিস্কুটের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতেছে, আর বিলাতী-বর্জ্জন ব্যাধির নূতন উপসর্গ বিড়ি সকলের মুখে রাবণের চিতার ন্যায় চিরজ্বলন্ত, গন্ধে দশদিক্ আমোদিত (গন্ধটিও প্রকৃতিসাদৃশ্যে রাবণের চিতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে)। আরোহীদিগের তেজস্বিনী বক্তৃতায় নিদ্রাকর্ষণের আশা সুদূর-পরাহতা। বোধ হইল, ভাবী কন্‌গ্রেসমণ্ডপে বাহবা লইবার জন্য ইঁহারা আগে হইতেই আখ্‌ড়া ভাঁজিতেছেন, বিজেতার শাসন-কলঙ্ক প্রকটন করিয়া, রাজপুরুষ-গণের মস্তকমুণ্ডন করিয়া দিবার জন্য ইঁহারা এখন হইতেই রসনারূপ ক্ষুরে শাণ লাগাইতেছেন। বলা বাহুল্য, এই রাজনীতিবিশারদের দায়রায় শিক্ষাব্যবসায়ী নিরীহ (?) লেখক 'নিতান্ত সঙ্কোচ ক'রে, একধারে আছে স'রে,' ঠিক 'হংসমধ্যে বকো যথা।' যাক্, এ দৃশ্য বড় চটকদার নহে; অতএব এ বিষয়ে বিস্তর লিখিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাহি না।

এইরূপে রাত্রিযাপনের পর আরায় কি বক্সারে, ঠিক মনে নাই, প্রভাত হইল। যাত্রীর ভিড়ে ও বক্তৃতার তেজে পৌষমাসের কন্‌কনে শীত টেরও পাওয়া যায় নাই। এখানে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া হাতমুখ ধুইয়া অনেকেই কিঞ্চিৎ জল-যোগের ব্যবস্থা করিলেন। চা পাঁউরুটি ত আছেই, তাহার উপর 'বোঝার উপর শাকের আঁটিটা' হিসাবে কেহ গরম গরম জিলেপি, কেহ গরম গরম পুরী, (পুরী বলিয়া কি ইহার এইরূপ নামকরণ?—ভাষাতত্ত্ববিদের উপর মীমাংসার ভার থাকিল) ও অনুপানস্বরূপ ঢেঁড়সচচ্চড়ী ভোগ লাগাইলেন; আর কেহ বা গৃহিণীর কোমল-করে প্রস্তুত, সুতরাং বড় মোলায়েম লুচি-মোহনভোগ টীনের চুঙ্গি হইতে বাহির করিয়া সেই সুদূর-প্রবাসেও অঙ্কশায়িনীর এই প্রীতির নিদর্শন অবলোকন করিতে করিতে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া (অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকেই সাত্ত্বিকভাব বলে) অন্তরের ও বাহিরের ক্ষুধা মিটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; শীতকালের ভোরের কুয়াশায় বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু বোধ হইল যেন, প্রেমিকবরের দাড়ী বহিয়া দুই এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু পড়িয়াছিল। যাক্, সুখের ভ্রমণ-কাহিনী

লিখিতে গিয়া এত প্রেমের অভিনয়ের বাড়াবাড়ি ভাল নহে। একটু বেলা হইলে গাড়ী মোগলসরাই পৌঁছিল। তথায় গাড়ী বদল করা গেল। ট্রেনের অধিকাংশ লোকই কাশীযাত্রী, কাজেই নূতন গাড়ীতে 'ন স্থানং তিলধারণং', তবে আশ্বাসের কথা, এরূপ গর্ভস্রাবণ বেশীক্ষণের জন্য নহে, যোগে আগে একটা ষ্টেশন গেলেই কেল্লা ফতে হয়। দেখিতে দেখিতে গাড়ী গঙ্গার পুলের উপর দিয়া কাশী (রাজঘাট) ষ্টেশনে পঁহুছিল। পুলের ওধার হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার ধারে ধারে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর কেবল সারি সারি অসংখ্য সোপানশ্রেণী, অগণিত দেবালয়চূড়া ও দ্বিতল ত্রিতল চৌতল ভবন রহিয়াছে, এই মনোমোহন দৃশ্য অতৃপ্তনয়নে দেখিলাম; পূর্ব্ববারে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ, যে বিস্ময়, যে ভক্তির উদয় হইয়াছিল, এবারও তাহার অণুমাত্র কমে নাই। সহযাত্রীরা ক্বচিৎ কেহ কেহ এই সৌন্দর্য্য এই grandeur লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু অধিকাংশই প্রাতে বাল্যভোগের পর নূতন উদ্যমে রাজনীতিচর্চ্চায় ভরপূর, এই মনোলোভা পুরীশোভার দিকে তাঁহারা দৃক্‌পাতও করিলেন না। যাঁহারা আবার একটু পাকাপোক্ত গোছের লোক, তাঁহারা সময় থাকিতে তল্পীতল্পা গুছাইতে লাগিলেন, সকলেই জিনিসপত্র নির্গমনদ্বারে আনিয়া হাজির করিলেন, দুইটি বস্তু একই স্থান অধিকার করিতে পারে না, এই জ্যামিতিক মতটি তাঁহারা তাড়াতাড়ি ভুলিয়া গেলেন। কাশীষ্টেশনের লাগাও কন্‌গ্রেসের মহামণ্ডপ ও প্রতিনিধিবর্গের ডেরাডাণ্ডার স্থান। অনেকেই এখানে নামিলেন, তবে যাঁহারা কেবল দর্শক হিসাবে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহার পরের ষ্টেশন শিক্‌রোলে নামিবেন, এইরূপ মন্তব্য জারী করিলেন। সহরের ঐ অংশে অনেক ইংরেজ-পছন্দ বাড়ী পাওয়া যায়। তজ্জন্যই তাঁহাদের এই সঙ্কল্প। আর বিশ্বেশ্বরের অতিসান্নিধ্য অনেকে নিরাপদ্ মনে করেন না। মানবচিত্ত দুর্ব্বল, কি জানি, যদিই কোনও 'দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে' পাষাণ-বিগ্রহের উপর ভক্তির সঞ্চার হয়! শাস্ত্রে শস্ত্রপাণির সান্নিধ্য নিষিদ্ধ আছে, মহাকালের শূলদণ্ড প্রভৃতিও শস্ত্রের সামিল।

সহযাত্রীদিগের নিকট কায়দামাফিক বিদায় লওয়া গেল। পাঠকবর্গকে আশ্বাস দিতেছি, বিদায়দৃশ্য নিতান্ত মর্ম্মভেদী হয় নাই। প্রথামত দ্বিগুণ মূল্যে (কলিকাতার বাবুদের জন্য এইরূপ ডবল ফীর ব্যবস্থা সনাতন) একা ভাড়া করিয়া হিতোপদেশের রাজহংসের ন্যায় 'সুখাসীন' হইলাম। অঙ্কে কসীগড়গড়ার পরিবর্ত্তে বোচ্‌কা, ইহাতে balance ঠিক রাখার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। তবে জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যগুলির উপর কখনই ভরাভর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি নাই। (বোধ হয়, ছাত্র-জীবনে বিজ্ঞানপাঠের অত্যন্তাপেক্ষ), তাই

শরীরের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে একার তাঙা চাপিয়া ধরিয়াছি, বামহস্ত বোচকার উপর সন্নিবিষ্ট; হিন্দুশাস্ত্রোক্ত শক্তির কোনও মূর্ত্তিরই এমনতর রূপকল্পনা নাই, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি। একার প্রথম ধাক্কাতেই (শব্দগত ও অর্থগত কি সুন্দর মিল!) বুঝিলাম, গতবার স্ত্রীপরিজন আনিয়া কি ঝক্‌মারিই করিয়াছিলাম, তাঁহাদের আব্রুরক্ষার খাতিরে পাল্কীগাড়ী ভাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, সুতরাং পশ্চিমে আসার একটি প্রধান সুখ একা-আরোহণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। বাল্যকালে উৎসব উপলক্ষে সখ করিয়া 'নাগরদোলা'য় চাপিয়াছি, (কলিকাতার ভাষায় 'চাপা' বলিলাম, 'চড়া' অপেক্ষা 'চাপা' কথাটি এখানে সঙ্গত, কেন না, ইহাতে উঠিলেই একটা কিছু চাপিয়া ধরিতে হয়!) গোরুর গাড়ীর সুখে ত চিরাভ্যস্ত, বর্দ্ধমানের উটের গাড়ীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলেও কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি; মহিষ, অশ্ব ও হাওদাবিহীন হাতীতেও যে না উঠিয়াছি, এমন নহে; কিন্তু এই নূতন যানের নামও যেমন শ্রুতি-সুখদ, ইহাতে আরোহণের সুখও সেই অনুপাতে আরামদায়ক। যেমন ধর্ম্মতত্ত্বে 'একমেবদ্বিতীয়ম্', তেমনি যানতত্ত্বেও একা ('একমেবা'র অপভ্রংশ কি না, মহামহোপাধ্যায়, শাস্ত্রী বা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিচার করিবেন)। এতক্ষণ পর্য্যন্ত একা অবশ্য লেখককে রূপবর্ণনার অবকাশ দিবার জন্য বসিয়া নাই। উপন্যাসবর্ণিত পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিতেছে, টুপি মাথায় মুসলমান গাড়োয়ান চাবুক কসিতেছে, একার ঝঙ্কার শব্দে দিগ্বলয় মুখরিত হইতেছে, আর সৌভাগ্যবান আরোহী হেলিতে দুলিতে টলিতে টলিতে চলিতেছেন; যেখানে পথ অসমতল, তথায় একটি করিয়া বিষম ধাক্কা লাগিতেছে। পুরীতে সাগরের ঢেউ খাওয়া কি ইহা অপেক্ষা বেশী আরামদায়ক? এও ঠিক যেন সাগরোর্ম্মির আঘাতে উঠিতেছি পড়িতেছি, তরঙ্গবেগে কখনও সম্মুখে, কখনও পশ্চাতে ঝুঁকিতেছি, আর সমুদ্রফেনের ন্যায় ধূলিকণা মস্তকের কেশে ও গাত্রবস্ত্রে পুঞ্জীভূত হইতেছে। এক একবার আমার মনে হইতে লাগিল, 'বেহারে বেঘোরে চড়িনু একা' ইত্যাদি গানটা ধরি, কিন্তু কণ্ঠ-ব্যায়াম দেখাইতে গিয়া হয় ত মুষ্টিবন্ধন শিথিল হইবে, ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে পারিব না, আর মুখ খুলিলেই মুখবিবরে ধূলিপটল প্রবেশ করিয়া ভূগোলনির্দ্দিষ্ট 'ব-দ্বীপ' গঠনের সহায়তা করিবে; কাজেই গলা ছাড়িয়া গাহিতে পারিলাম না, 'মনে রৈলো সৈ মনের বেদনা' গানটি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইলাম। সুখের ভিতর, শীতকালের রৌদ্র তত প্রখর নহে, বেলাও অধিক হয় নাই, খাদ্যপ্রাচুর্য্যে বত্রিশ নাড়ীর উপর গুরুভারও পড়ে নাই, সেই জন্য এই অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী অভিযান একেবারে অসহ্য হইয়া পড়ে নাই।

যেখানে প্রশস্ত রাজপথ ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিতে হইবে, তথায় এই অনভ্যস্ত যান হইতে বহু কসলতে নামিলাম, ধরাশায়ী হইলাম না, সে কেবল পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে। এখান হইতে 'দু পা' গেলেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যায়, কিন্তু কলিকাতার প্রথামত মুটিয়া ডাকিতাম, বোঁচকাটি বহিবার জন্য। একাওয়ালা নিজে উদ্যোগী হইয়া মুটিয়া ডাকিয়া দিল, এই বিদেশ-বিভূমে ভিন্নধর্ম্মীর উপচিকীর্ষা-বৃত্তি দেখিয়া হৃদয় উৎফুল্ল হইল, (তবে বখ্‌রার বন্দোবস্তও থাকিতে পারে), কিন্তু মুটিয়া লোক, বাঙ্গালী, বিশেষতঃ 'কলিকাতাই' বাঙ্গালী পাইলে 'দোহাগাই' পাইয়া বসে, 'দু পা' যাইবার জন্য চারি আনা হাঁকিল। তীর্থস্থানে কৃচ্ছ্রসাধনই ধর্ম্ম, তীর্থ-ক্ষেত্রে অর্থের নানারূপে সদ্ব্যয় করা যাইতে পারে, মনে ইত্যাদি নানারূপ 'সদ্ভাব' ও সুচিন্তা উদিত হওয়াতে ও পয়সাও বিশেষ সস্তা নহে বুঝিয়া, অগত্যা বোঁচ-কাটিকে কক্ষে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। মুটিয়া আমার পানে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিল। এ চাহনি ঠিক গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের নহে, ইহা হলপ করিয়া বলিতে পারি। হায়! অধিক কচলাকচলি করিলে হিতে বিপরীত হইবে, অধিক নিঙড়াইলে লেবু তিক্ত হইয়া যাইবে, শীকার হাত-ছাড়া হইবে, এ কথাটা বেচারা একবারও ভাবে নাই। ইহাকেই বলে, 'অতিলোভে তাঁতি নষ্ট'। যাক্, আর নীতিবোধের সূত্র আওড়াইব না। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, যাত্রিবৎসল একাওয়ালার মুখখানি বিষাদ-গম্ভীর; পরোপকারে বাধা পাইলে সজ্জনের হৃদয়াকাশ এইরূপই মেঘাচ্ছন্ন হয়। আহা, ইহাদের চিত্তসমুদ্রে কি ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত বহিতেছিল, তাহা দার্শনিক ভিন্ন কে বিশ্লেষণ করিবে? যাহা হউক, সে রাত্রে এই দুইটি সেবা-ধর্ম্মীর সুনিদ্রা হইয়া-ছিল কি না, সে ভাবনায় লেখকের নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই, পাঠক মহাশয়েরও বোধ হয় বিশেষ মাথাব্যথা নাই।

বাঙ্গালীটোলায় এক আত্মীয়ের বাটীতে অধিষ্ঠান করিলাম। তাঁহাদের তখন বাজারের বেলা। পূর্ব্বেই আমার আগমনসম্ভাবনা পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম; তাঁহারা সাদরে সহাস্যবদনে আমাকে গ্রহণ করিলেন। কাশীবাসী এরূপ উপদ্রবে অভ্যস্ত। যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া পথশ্রম দূর করিবার অভিপ্রায়ে ও পূর্ব্ব-রাত্রের ক্ষতিপূরণমানসে মধ্যাহ্নে নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। আত্মীয়েরাও "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই ঋষিবাক্যের অবমাননা করিলেন না। নিদ্রাভঙ্গে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের নিকট কানাঘুষায় টের পাওয়া গেল যে, আমাদের সকলের সমবেত নাসিকাগর্জ্জন বাগ্‌বাজারের অবৈতনিক কন্‌সার্ট-পার্টিকেও পরাভূত করিয়াছিল।

২

এই প্রবন্ধে কাশীর আত্মীয়গণের কথা মাঝে মাঝে তুলিতে হইবে। অতএব তাঁহাদের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বোধ হয়, নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচিত হইবে না। পাঠক ও লেখকের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মিলে লেখকের আত্মীয়জনের সঙ্গেও পাঠকের আত্মীয়তা জন্মিয়া যায়, সে ক্ষেত্রে এরূপ বিবরণ নীরস ও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না। বাড়ীর কর্ত্তাটি সম্বন্ধে ঠাকুরদাদা, সম্পর্ক নিতান্ত দূর নহে, দশ রাত্রের জ্ঞাতি, দেশে পুরুষানুক্রমে এক ভিটায় বাস। অবস্থা পূর্ব্বে ভালই ছিল, কিন্তু নূতন করিয়া অর্থাগমের কোনও উপায় না থাকাতে অনটন ঘটে, শেষে পত্নীবিয়োগের পর কয়েকটি শিশু পুত্রকন্যা লইয়া কয়েক বৎসর হইতে কাশীবাসী হইয়াছেন। এখন দুইটি পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে, এবং কিছু কিছু আনিতেছে, তাহাতেই অন্নপূর্ণার কৃপায় এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। আজকালকার দিনে যেরূপ সৌখীনতা বাড়িয়াছে, তাহাতে অবস্থা স্বচ্ছল বলা যায় না; তবে গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ কষ্ট নাই। পুত্র দুইটি বিবাহিত, একটির একটি পুত্রসন্তানও হইয়াছে। তৃতীয় একটি পুত্র আছে, সেটি বালক, পড়াশুনা করে। কন্যাদ্বয় শ্বশুরালয়ে। পুত্র, পুত্রবধূ ও শিশুপৌত্র লইয়া ঠাকুরদাদা মহাশয় শেষবয়সে একপ্রকার সুখস্বস্তিতেই দিন কাটাইতেছেন। অনেক দিন হইতে তাঁহার অনুরোধ, একবার সপরিবার কাশী গিয়া তাঁহার আতিথ্যস্বীকার করি। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পূজার ছুটীতে পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়াছিলাম, এবং তাঁহার আদর-যত্ন ভুলিতে পারি নাই বলিয়া এ যাত্রায় তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া উঠিয়াছি। তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদিগের সৌজন্যে প্রবাসের কোনও কষ্টই পাইতে হয় নাই। পুণ্যধামে বাস করিয়া ইঁহাদের হৃদয়ের পল্লীগ্রামসুলভ সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়াছে, জ্ঞাতিকুটুম্বের প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। পৈতৃক ভিটায় যেরূপ সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করিতাম, বহুকাল পরে একত্র আহার, একত্র শয়ন, নানারূপ সুখ-দুঃখের কথাবার্ত্তায় একত্র যাপন করিয়া উভয় পক্ষই যেন কৃতার্থ হইলাম। ইহাকে 'সুখের প্রবাস' বলিব না ত কি বলিব?

৩

মাতৃপূজার তিন দিন প্রাতর্ভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণের তত সুবিধা হইত না। সে কয়দিন শীতও দারুণ পড়িয়াছিল, প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিতে একটু বিলম্ব হইত। উঠিয়াই বালিকা বধূদ্বয়ের উপর কিঞ্চিৎ অত্যাচার করিয়া সকাল সকাল ভাতের তাগাদা এবং ১০টা না বাজিতেই তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইয়া নাকে মুখে চারিটি গুঁজিয়াই কন্‌গ্রেস্‌মণ্ডপে যাত্রার উদ্যোগ। আহারান্তে একটু আরোহণ করিয়া

ভোর, চুকভোগিমাত্রই জানেন। এবার দরও এ কয়দিন খুব চড়া, তবে ইহাতে কেহ চিন্তিত নহে। এলাওয়াদাতে যোগ আনা দক্ষিণা দিয়া মাতৃসেবার জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করিলাম, সকলের মনে যেন এইরূপ ভাব। এত সস্তায় মাতৃভূমির কল্যাণসাধন করিয়া যদি মনের তৃপ্তি হয়, মন্দ কি? সভাস্থলে পঁহুছিয়া টিকিট কিনিয়া ভিড় ঠেলিয়া যথাযোগ্য আসনে অধিষ্ঠান ও উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব হইয়া বক্তৃতাশ্রবণ, এ কয়দিনের নিত্যকর্ম্ম হইয়াছিল। প্রথম দিনে সভাপতি মহাশয়ের গোখ্‌লের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় লর্ড কর্জ্জনের সঙ্গে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের (ইংরাজী 'জেড্' ও আরবী 'জ্বাল' অক্ষরের শব্দসাদৃশ্যও প্রণিধানযোগ্য) তুলনাটা খুব জমিয়াছিল। তবে নূতন ভারতসচিবনিয়োগে কেতাবী বিদ্যার জোরে তিনি যে সকল আশার বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সভাস্থ স্ত্রীবর্গের কি হইয়াছিল, জানি না, আমার ত বিশেষ আস্থা হয় নাই। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা যুধিষ্ঠিরই হউন আর দুর্য্যোধনই হউন, ভারত যে তিমিরে, সে তিমিরেই থাকিবে। তবে এ সব বড় বড় রাজনীতির কথা, শিক্ষাব্যবসায়ী ক্ষুদ্রপ্রাণ লেখক ইহার কি বুঝিবেন? এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করাই ধৃষ্টতা। (গোখ্‌লে মহোদয়ও কিন্তু গোড়ায় শিক্ষাব্যবসায়ী।) অন্যান্য দিনের বক্তৃতাও জমিয়াছিল প্রায়; বক্তৃতার বন্যায় দেশের আসল কাজের ফসল হউক বা না হউক, ইহাতে যে হৃদয়ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধিত হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহাতে যথেষ্ট উত্তেজনা ও উদ্দীপনা হয় (যদিও তাহা সাময়িক), ভারতের চতুঃসীমা হইতে সমবেত সহস্র সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় একসুরে বাজিয়া উঠে, এবং তাহার ফলে জাতীয় একতা সংসাধিত হইবার সহায়তা করে, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহাও জাতীয় শিক্ষার একটা স্তর, তাহা বলিতেই হইবে। উর্দ্দু বক্তৃতা শুনিয়া, প্রকৃতই রোমাঞ্চ হইয়াছিল, যদিও তাহার একবর্ণ বুঝি নাই। তবে এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, স্বদেশী সমাজে ভাব আদানপ্রদানের জন্য বিদেশী ভাষার সাহায্য না লইয়া এইরূপ একটা দেশী স্বদেশী ভাষা সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিলে কাজটা সহজে, স্বাভাবিক উপায়ে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যাক্, এক ভাষা বা একাক্ষর-সমস্যার পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধকার লেখনীধারণ করেন নাই।

দৈনন্দিন বক্তৃতা ফুরাইলে ফিরিবার পালা। বক্তৃতা শ্রবণ করিবার কৌতূহলে প্রবল উৎসাহে গাঁটের কড়ি বাহির করা যতটা সহজ হইত, উক্তরূপ 'খোলা চোখে' বাহাটা তত সহজ হইয়া উঠিত না। আর ওজস্বিনী বক্তৃতা-শ্রবণে মনটা এত চড়াসুরে বাঁধা হইত, হৃদয়ে স্বাধীনতার অনল এতই জ্বলিয়া উঠিত, দেশের জন্য একটা কিছু করিয়া ফেলি, এই সম্বন্ধে কর্ত্তব্যবুদ্ধি

এতই সজাগ হইত যে, সে সময়ে একার আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিতান্তই উপহাস্য হইয়া পড়িত, যাহাকে ইংরাজীতে বলে, It is one step from the sublime to the ridiculous; অগত্যা পদব্রজেই পাড়ী দেওয়া যাইত। এরূপ পথশ্রমে শক্তি-প্রয়োগের কণ্ডুয়ন কতকটা নিবৃত্ত হইত। তাহা ছাড়া, এরূপ অঙ্গচালনায় সারা-দিনের আটাকাটি বাঁধনের পর শরীরের আড় ভাঙ্গিত, এবং ভিড়ের মধ্যে বদ্ধ বায়ুর যে বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল, সন্ধ্যাকালীন নির্ম্মল বায়ু-সেবনে তাহার দোষটা কাটিয়া যাইত অতএব শারীরিক, মানসিক, এই উভয় দিক্ হইতেই যে ব্যব-স্থাটি সঙ্গত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বোধ করি আর দ্বিমত নাই। বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইত। তখন জঠরাগ্নির তেজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা-বহ্নিকেও পরাস্ত করি-য়াছে, যথাসম্ভব জলখাবারের সাহায্যে অগ্নিনির্ব্বাণ করা যাইত। পরে যথাসময়ে রাত্রিভোজনান্তে সুনিদ্রার ব্যবস্থা। দিনের শ্রান্তি-ক্লান্তির পরে তদ্বিষয়ে কোনও ত্রুটি হইত না। শীতটা যদিও কন্‌কনে, কিন্তু বক্তৃতার গরম ও ভিড়ের গরম ছুটিতে সমস্ত রাত্রিই যাইত, কাজেই শীতটা তত শাণাইত না।

বঙ্গদেশে এক এক বৎসর দুর্গোৎসব তিন দিনে শেষ না হইয়া চারি দিনে শেষ হয়। এবার বোধ করি বঙ্গদেশের হাওয়া লাগিয়া এই হালফ্যাশনের মাতৃপূজায়ও সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল। লেখকের কিন্তু তিন দিনের পূজার আড়ম্বরেই নেত্র-শ্রোত্রের যথেষ্ট পরিতোষ হইয়াছিল, চতুর্থ দিনে পূজাস্থলে যাইবার আর প্রবৃত্তি হয় নাই।

সমাজসংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের তত্ত্ববিচার অধম আমার ক্ষুদ্রশক্তির অতীত বুঝিয়া কংগ্রেসের লেজুড় Social conference প্রভৃতিতে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন অনুভব করি নাই। তবে একদিন স্বদেশী প্রদর্শনীক্ষেত্রে গিয়া এখনও 'দীন পরাধীন' ভারতের যে শিল্পনৈপুণ্য আছে, তাহার নিদর্শন-দর্শনে নয়ন-মন সার্থক করিয়া আসিয়াছি। এদিন আর আমি একা নহি। আমার আর এক জন আত্মীয় কলিকাতায় যুবরাজ-আগমনের উৎসব দেখা সাঙ্গ করিয়া কাশীতে আসিয়া যুটিলেন, এবং পুত্রকন্যা ও পাচক ভৃত্য লইয়া এগ্‌জিবিশন দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কাশীস্থ আত্মীয়েরাও সেই রায়ে রা দিলেন। কাজেই দলে পুরু হইয়া Family টিকিট লইয়া প্রদর্শনী-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব তিন দিন ফাঁকা বক্তৃতা শুনিয়া মনের যে স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, এদিনে ভারতশ্রমজাত শিল্পসম্ভার দেখিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক স্ফূর্ত্তি হইয়া-ছিল। কথা ও কাজের প্রভেদে আনন্দের এরূপ প্রভেদ। এদিন যাতায়াতেও যথেষ্ট আরাম হইয়াছিল। মধ্যাহ্নভোজনের পর নৌকাযোগে দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে

রাজঘাটে আসা হইয়াছিল; ইহাতে ভোজনের অব্যবহিত পরে পরিপাকক্রিয়ার কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই। সায়ংকালে নৌকাপথে ফিরিতে ততোধিক আরাম হইয়াছিল। প্রশস্ত প্রদর্শনীপ্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে ক্লান্তি হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ অপনোদন হইয়াছিল; এবং মন্দাকিনী-সলিল-সংস্পর্শ-শীতল সান্ধ্য সমীরণ-সেবনে শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছিল। ক্ষুধার বিলক্ষণ উদ্রেক হওয়াতে, ফিরিয়া আসিয়া আত্মীয়গণের অন্নব্যঞ্জনের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা গেল। এ কয়দিন রাত্রে, সুনিদ্রা ত ভোজনান্তে দক্ষিণার ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। [ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

মনুষ্যত্বে প্রাণিকুলের মধ্যে কেবল মানবেরই অধিকার; কিন্তু তাহা মানব-মাত্রেরই অধিকৃত নহে। সর্ব্বত্র সকল মানবের মধ্যে মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল; তাহা সৌভাগ্যবান্ জনকয়েকের সম্পদ; উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত পাত্রে, উপযুক্ত শিক্ষায়, উপযুক্ত সময়ে তাহার বিকাশ। প্রবাদ আছে, কোন বিশেষ ভিপি-নক্ষত্রে বৃষ্টিবিন্দু গজকুম্ভে পতিত হইলে গজমুক্তার উৎপত্তি হয়। সেইরূপ বিশেষ সময়ে, বিশেষ সুবিধায়, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির হৃদয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। তাই যিনি মনুষ্যত্ব-সম্পৎসম্পন্ন, তিনি সাধারণ মানব হইয়াও তাহাদের এক জন নহেন; পরন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র। তাই যেখানে সহস্র সহস্র সাধারণ মানবের মধ্যে এক জন প্রকৃত মনুষ্যত্ব-গৌরবে গরীয়ান্ মহাপুরুষকে দেখা যায়, সেইখানেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে হয়,—এই এক জন মানব-দৃষ্টি হইতে দূরে অবস্থিত, মানবের জ্ঞানের অতীত, সৃষ্টির কোন রহস্য-কুহেলিকাচ্ছন্ন নিয়মে আর সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন? প্রকৃতি কেন সহস্র সাধারণ মানব গড়িতে গড়িতে এক জন অসাধারণ মানব গড়িয়াছেন? কোন্ মহাশক্তি অলক্ষিতে ইঁহার দুর্ব্বল প্রারম্ভ হইতে ইঁহাকে অনন্য-অনুসৃত পথে পরিচালিত করিয়া অসাধারণ মানবে পরিণত করিয়াছে?

ঈশ্বরচন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই অসাধারণ মনুষ্যত্ব ছিল বলিয়াই এই "নারী-সুকুমার" জাতির সধ্যে সেই অসাধারণ পুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া, যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। মনে প্রশ্ন উঠে, প্রকৃতি কি ভাবিয়া সহস্র সহস্র বাঙ্গালী গড়িতে এক জন "মানুষ" গড়িয়াছিলেন;—এই কোমল, কমনীয় মেরুদণ্ডের দেশে ঈশ্বরচন্দ্র কোথা হইতে কেমন করিয়া সরল, সবল, সুদৃঢ় মেরুদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন? আমার পরম-শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন,—"বঙ্গভূমি স্বয়ং যে ব্রীহি-শস্যের বর্ষে বর্ষে উৎপাদন করেন, তাহা শুনিতে পাই, একান্ত নাইট্রোজেন-বর্জ্জিত; বঙ্গের

[illegible] যে [illegible] উৎপাদন করেন, তাহা [illegible] পদার্থ। [illegible] যে সকল বংসের সমুদান করেন, তাহারা কঙ্কালবিহীন; [illegible] যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তাহা 'অস্থোস্থিমজ্জাবিনির্ম্মুক্ত' [illegible] সমুদয় [illegible] ধর্ম্ম-বিনির্ম্মিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন, তাহা তত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য। এই দেশে ঈশ্বরচন্দ্র কোথা হইতে কিরূপে অনন্যসাধারণ আন্তরিকতা, আন্তরিক একাগ্রতা, অসাধারণ শ্রমশীলতা, দুর্দ্দমনীয় তেজ ও আদর্শ চরিত্রবল পাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয়।

বিদ্যাসাগরের সমস্ত জীবন সংগ্রাম। বাল্যে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম; তাহার পর সমস্ত জীবন প্রতিকূল সমাজের সহিত, সহানুভূতিহীন দেশাচারের সহিত, দুর্দ্দমের পক্ষ হইয়া সবলের সহিত কঠোর সংগ্রাম। বাগ্মিবর বার্ক এক স্থানে বলিয়াছেন,—"আমার মত লোকের জীবনের মূলমন্ত্র,—'আমি প্রতিকূলভার [illegible] সংগ্রাম করি'।" অসঙ্কোচে যদি কাহারও সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য হয়, তবে সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে।

একটা লাটিন কথা আছে,—"আমি মানুষ; মানুষের কিছুই আমার নিকট উপেক্ষণীয় নহে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ইহাই মনে করিতেন। তাই তাঁহার জীবনে মনস্ক করিবার সর্ব্বপ্রধান বিষয়—কার্য্যবহুলতা। ভাষা-গঠন হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন, সুলভ শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি নানা-কার্য্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার সময়ে [illegible] করি, এমন কোনও স্থায়িফলপ্রদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহার সহিত বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত ছিলেন না। সেই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনটিতে তিনি কি পরিমাণে লিপ্ত ছিলেন, সাধারণে তাহা [illegible] অবগত নহে; কারণ, বিদ্যাসাগর কোন দিনই যশের কাঙ্গালী ছিলেন না। তিনি তাঁহার আন্তরিকতা-প্রসূত উৎসাহে নানা সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিতেন; কিন্তু চপলমতি বালকের মত যশের আশায় সাধারণের সমক্ষে সাহসপূর্ণে আপনার নামের নাটিয়টা লইয়া ঘুরাইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। ইহাও বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব। সুখের বিষয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল হইতে সহজেই নানা অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার [illegible] অবগত হওয়া যাইতে পারে। এই সকল চরিতকারদিগের [illegible] শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের নিকট আমার ঋণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রবন্ধের নানা স্থানে আমি কেবল তাঁহারই রচিত বিদ্যাসাগর-চরিত হইতে কথা [illegible] উদ্ধৃত করিয়াছি; তাঁহার গ্রন্থ হইতে আমি নানা ঘটনাদির বিষয় [illegible]

তিনি আষাঢ়ের ক্ষণে বিকশিত ক্ষণে বিলম্বিত সভা-সমিতিতে যোগ-দান করেন নাই, আপনার অটুট স্বাবলম্বনবলে আপনার স্বাতন্ত্র্য লইয়া যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেই কার্য্যই সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আপনার অসামান্যবিক্রমবলে প্রায়ই সফলকাম হইয়াছেন। কার্য্যসিদ্ধির পথে বাধাবিঘ্ন যেন তাঁহার সবল বাহুকে দ্বিগুণ বলশালী করিত। সমাজের সহিত তাঁহার সংগ্রামে আমরা পদে পদে ইহারই পরিচয় পাই। যে তেজে দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান আসন্ন দারিদ্র্যের আশঙ্কায় শঙ্কিতমাত্র না হইয়া আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন; যে তেজে তিনি তাঁহার সমক্ষে ইংরাজ প্রভুকে টেব্‌লের উপর বুটজুতা-পরা পা তুলিতে দেখিয়া, তাহার সমক্ষে স্বীয় চটুরাজ-শোভিত পদ-যুগল টেব্‌লের উপর তুলিতে ভুলেন নাই, সেই তেজে তিনি স্বীয় শক্তিতে নির্ভর করিয়া সমাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহা সাধারণের বিচার্য্য। তবে যদি কেহ তাঁহাকে বিজয়ীর গৌরব দান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, তাহাতে বিদ্যাসাগরের গৌরবের হানি হয় নাই। কারণ, অনেক স্থানে অসাফল্যের গৌরব সাফল্যের গৌরব অপেক্ষাও অধিক; জগতের ইতিহাসে অনেক সময় অবনত অসাফল্য সমুজ্জ্বল সাফল্য অপেক্ষাও জগতের পক্ষে হিতকর। অসাফল্যে সর্ব্বত্র গৌরবের হানি হয় না, বরং অনেক স্থানে গৌরব বর্দ্ধিত হয়।

তাঁহার পদত্যাগ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের স্বাবলম্বনের ও এই চটিজুতার ব্যাপারে তাঁহার তেজের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুই ব্যাপারে তাঁহার বিশাল চরিত্রের আর এক দিক্ সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাসাগরের সব সহিত, আত্মসম্মানে আঘাত সহিত না। তাই যিনি সর্ব্বজনপূজ্য হইয়াও দরিদ্র মুদীর দোকানে খেলো হুঁকায় ধূমপান করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, তিনিই বঙ্গের ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় আপনার মোটা চাদর ও চটিজুতা ছাড়িতে অস্বীকৃত। যে সম্মান-রক্ষার জন্য ইংরাজ-সৈনিক সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও রণে অগ্রসর হয়, যে সম্মান-রক্ষার জন্য বীর প্রতাপ অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও বিজাতীয় জেদার সহিত সখ্য-সংস্থাপনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, সেই সম্মান-রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যের আশঙ্কা, আত্মীয়-স্বজনের তিরস্কার, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অনুরোধ, কিছুতেই তাঁহাকে পুনরায় পদগ্রহণ করাইতে পারে নাই। যে মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিলেন, সম্মান ও চাকরী উভয় বজায় রাখা অসম্ভব, সেই মুহূর্ত্তে "তেজস্বী বিদ্যাসাগর এক কথায় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদ

এখায় বঙ্গভাষার দুঃখদুর্দ্দশার দুর্নিশাবসানে অরুণোদয় সূচিত হইতেছিল মাত্র। বিদ্যাসাগরের সময় উজ্জ্বল আলোকে ভাষা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর আলোক ও উত্তাপ হইতে বিচিত্রবর্ণ আকর্ষণ করিয়া চারিদিকে নানা কুসুম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষাকে বৃথা শব্দাড়ম্বরের গুরুভার হইতে মুক্তিদান করেন। ভারমুক্ত করিয়া তিনি তাহার গতিবিধি সম্ভব করিয়া দেন। আজ বঙ্গভাষা ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইয়াছে। আজ যে আমরা বঙ্গভাষায় হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা, আনন্দ ও বেদনা প্রকাশ করিতে পারি, আজ যে বঙ্গভাষা ক্রোধে বিকম্পিত, ভীতিতে সঙ্কুচিত, বিষাদে বিকুণ্ঠিত, হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেও অনেকটা বিদ্যাসাগরের কৃপায়। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে বঙ্গভাষা কি ছিল, এবং তাঁহার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে, তাঁহার প্রতি ভক্তির উৎস স্বতঃই উৎসারিত হয়।

যে বঙ্গভাষা মধুসূদনের রচনায় অশনি-নির্ঘোষবৎ প্রতীয়মান হয়, যে বঙ্গভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বিগতবাত্যাবেগ গগনে বিগলিতাম্বু-বারিদবক্ষে ইন্দ্রধনুর মত বিচিত্রবর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, যে বঙ্গভাষা হেমচন্দ্রের রচনায় জাতীয় দুঃখদুর্গতির কথায় বাত্যাবিক্ষুব্ধ বারিধির গভীর কল্লোল বলিয়া মনে হয়, যে বঙ্গভাষা নবীনচন্দ্রের রচনায় নির্ঝরমুক্ত পূত স্বচ্ছ বারিরাশির মত বহিয়া যায়, যে বঙ্গভাষা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় সুমধুর বিহগকাকলির মত শুনায়, যে বঙ্গভাষা চন্দ্রশেখরের রচনায় নিস্তব্ধ নিশীথে দূরাগত ললিতমধুর মুরলীধ্বনির অনুকরণ করে, যে বঙ্গভাষা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় বাদ্যকুশল-অঙ্গুলিস্পর্শে বাদ্যযন্ত্রের মত নানা স্বরলহরী উত্থিত করিয়াছে, আবার তাঁহার দার্শনিক রচনায় দর্শনের কূটতত্ত্ব-বিচারে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, যে বঙ্গভাষা কালীপ্রসন্নের রচনায় বর্ষাবারিরাশিপুষ্টা ভাগীরথীর স্রোতের মত বহিয়া গিয়াছে, যে বঙ্গভাষা রবীন্দ্রনাথের রচনায় বীচিবীবিক্ষেপবিহ্বল সরসী-হৃদয়ে বিকশিত বিসপ্রসূনবৎ শোভা পাইতেছে, যে বঙ্গভাষা আজ কাব্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, উপন্যাসে, ভ্রমণবৃত্তান্তে কোথাও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে, সেই বঙ্গভাষার গঠনে বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

১২৮০ সালের "বঙ্গদর্শন" পত্রে কোনও লেখক পরিহাসচ্ছলে লিখিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় টাঁকশাল, ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দু-আনি, সিকি, আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্য স্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খণ্ডরূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া, চারি দিকে গোলা-

করা করিয়া, কিনিয়া দিয়া, উপরে Queen Victoria ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙ্গালা রসান চড়াইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া চারি দিক্ ছাঁটিয়া উপরে 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত' ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। বর্ণপরিচয় দু-আনি; ক্ষুদ্র, বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয়, বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোনও গ্রন্থ সিকি, কোনও গ্রন্থ আধুলি, ও কোনও গ্রন্থ টাকা। তিনি প্রথমে এক খোট্টা মহাজনের পনিস্তট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বসান; সেই খোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান; সে টাকার নাম 'বেতালপচিশ'। সেবার ডেমারস্ বলে এক জন বিলাতী মহাজনের নিকট রূপা লইয়া 'জীবনচরিত' নাম দিয়া, একটু কম খাদ মিশাইয়া এক হাজার আধুলি প্রস্তুত করাইয়া অনেক লাভ করেন। এক জন বৃদ্ধ পশ্চিমে পণ্ডিত অধিকপরিমাণে বেণা খাঁটিরূপা রাখিয়া যান; তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার নিজের খাদ কতকগুলা দিয়া তাহাই 'সীতার বনবাস' নামে টাকা করিয়া বিক্রয় করিলেন। এখনও ব্যবসা ছাড়েন নাই, আজি চারি বৎসর হইল, সেক্ষপিয়রের 'ধোঁকার মজা' বলে খানিক রূপা ছিল, তাহাতেই আপনার সেই মোহর দিয়া 'ভ্রান্তিবিলাস' টাকা নাম দিয়া বিক্রয় করিলেন। * * * বিদ্যাসাগর টঙ্কযন্ত্র মাত্র।" সত্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধিকাংশ গ্রন্থের উপাদান ভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত; সে সকল গ্রন্থে কেবল ভাষায় ও রচনাপ্রণালীতেই তাঁহার মৌলিকত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কি তাঁহার মৌলিকত্বের অভাব-পরিচায়ক? বিদ্যাসাগর মৌলিক রচনায়ও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ও বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; তবে সাহিত্যসেবা সে সকল রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে;—তাঁহার অন্য কার্য্যে তিনি সাহিত্যের সাহায্য লইয়াছিলেন; সাহিত্য অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সে সকল রচনা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধীশ্বর বিদ্যাসাগর ইচ্ছা করিলে মৌলিক রচনায় বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া "বর্ণপরিচয়" হইতে "সীতার বনবাস" পর্য্যন্ত নানা পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালাভাষা-শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন। তিনি যদি মৌলিক উপায়ে ভাষা-শিক্ষার পথ সুগম না করিয়া মৌলিক রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আজ বঙ্গভাষার এত উন্নতি লক্ষ্য করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, বিদ্যাসাগর যশের আশায় দাঁড় ধরিয়া দ্রুত ফেনপুঞ্জমাত্রের সৃষ্টি করেন নাই, পশ্চাতে হাল ধরিয়া বঙ্গভাষার তরণীকে সাবধানে গন্তব্যস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারই জন্য জলে চড়া বাধে নাই, বর্ণাবর্ত্তে' পড়িয়া নিমজ্জিত হয় নাই। নিজে সাগর একটা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর আপনি দেবতা সাজিয়া বসেন

নাই; দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আগবার যশোঘোষণা করিবার চেষ্টা করেন নাই, অনাধারণ ধৈর্য্যসহকারে নিপুণতার সহিত বঙ্গভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন; ভক্তের মত তিনি সে মন্দিরের সোপান হইতে চূড়া পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়া আপনি তৃপ্ত হইয়াছেন। তিনি সে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা অবাধে সে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পূজা করিয়া ধন্য হইতে পারিতেছি। বিদ্যাসাগর যে মৌলিক রচনা না করিয়া দেশের লোকের হিতের জন্য মৌলিক উপায়ে বঙ্গভাষা-শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব ও স্বার্থত্যাগই প্রকাশ পাইয়াছে। যশোলাভের অপেক্ষা স্বার্থত্যাগের গৌরব অনেক অধিক। দধীচির গৌরব তপস্যায় নহে,—স্বার্থত্যাগে—আত্মত্যাগে। সেরূপ তপস্যা অনেকের পক্ষে সম্ভব; সেরূপ স্বার্থত্যাগ নিতান্তই দুর্ল্লভ।

বিদ্যাসাগর কেবল ভাষাগঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। ভাষার প্রচার-সৌকর্য্যার্থ তিনি আপনার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কোথায় কোন্ অক্ষরটি রাখিলে ছাপিবার জন্য অক্ষর সাজাইবার সুবিধা হইবে, তাহার জন্য তিনি প্রভূত শ্রমস্বীকার করিয়া এক নূতন সুবিধাজনক প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। এখন অনেক মুদ্রাযন্ত্রেই তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালী প্রচলিত।

এই সকল ভিন্নও বঙ্গসাহিত্য বিদ্যাসাগরের নিকট নানা প্রকারে ঋণী। কত দরিদ্র গ্রন্থকার যে বিদ্যাসাগরের দয়ায় সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার অবসর পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সকল ছাড়িয়া দিলেও তিনি মধুসূদনের প্রতি যে স্নেহ দেখাইয়াছেন, অসময়ে তিনি মধুসূদনকে যেরূপ অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতেই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে, তাহাতেই বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ বহুচেষ্টায় সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, সেক্ষপীয়ারের জীবিতকালে তিনি যথাসম্ভব সমাদর পাইয়াছিলেন। মধুসূদনের চরিতকার সহজেই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মধুসূদনের জীবিতকালেই লোক তাঁহার গুণের আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধুসূদনের সেই জীবনচরিত-পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি,—অনেক ধনী এখন মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন, বলিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয়,—এত বন্ধু থাকিতে কেন নব্য-বঙ্গের কবিকুলচূড়ামণি নিরন্ন, নিরাশ্রয়, সহায়হীন, সম্পদ্‌হীন, পথের ভিক্ষুকের মত তাহাদিগেরই সহিত একত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন?—কেন মরণাহত কবি দারুণ মর্ম্মব্যথায় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া

বলিয়াছিলেন,"দেখ, এই চিকিৎসালয়ের পরিচারক ও ধাত্রীদিগকে পুরস্কার দিতে পারি, আমার এখন সম্বল নাই। ইহারা অর্থপ্রয়াসী, ইহাদিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দিলে ইহারা আমার অধিক যত্ন করিত। যদি প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা ব্যয় করিতে পারিতাম, তবে এ অবস্থায়ও কিছু শান্তি পাইতাম!" এই কথা মনে করিলে যেমন হৃদয় বিষাদে ও লজ্জায় পূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনই আবার যখন মনে করা যায় যে,নিরাশ্রয়ের নিত্য আশ্রয়, অসহায়ের চিরসহায় বিদ্যাসাগরের সাহায্য ব্যতীত হয় ত সুদূর-প্রবাসে অন্নাভাবে মধুসূদনের জীবনদীপ বহুপূর্ব্বেই নির্ব্বাপিত হইত, তখন বিদ্যাসাগরের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর অতিরিক্ত স্নেহশীল জনকের মত মধুসূদনের শত আবদার ও স্নেহের অত্যাচার সহ্য করিতেন। প্রতিভাবান্ মধুসূদন দুঃখে কষ্টে বিদ্যাসাগরের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিদ্যাসাগর মধুসূদনের জন্য অকাতরে অজস্র ব্যয় করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের স্নেহ মধুসূদনের তাপতপ্ত, ক্লেশক্লিষ্ট জীবনে চিরপ্রবাহিত অমৃতপ্রস্রবণের মত কার্য্য করিয়াছিল। তাই মধুসূদন কৃতজ্ঞচিত্তে লিখিয়াছেন,—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!"

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এখন পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকে সমাজের নিম্নস্তর অবধি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এখন আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কতকটা পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত হইতেছি। এ নূতন আদর্শের যুগে, এ নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার সময় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার রুদ্ধ করিয়া সমাজে বৈষম্যবৃদ্ধি আশঙ্কাজনক বলিয়া বিবেচনা করি। সময়ের সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তবে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা যে প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে,তাহাতে সুফল ফলিবে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তাহা সমাজহিতার্থীমাত্রেরই বিবেচনার বিষয়। কিন্তু তাই বলিয়া কে সাহস করিয়া এ কথা বলিবে যে, যে স্ত্রীশিক্ষার ফলে আমরা "দীপনির্ব্বাণ" ও "ছিন্নমুকুল" হইতে "পালিতা" অবধি নানা মনোরম উপন্যাসে, "অশ্রুকণা" হইতে "আলো ও ছায়া" পর্য্যন্ত নানা উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থে বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত দেখিতেছি, যে স্ত্রীশিক্ষার ফলে আজ অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গ-রমণীদিগের রোগে চিকিৎসার উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে;—সেই স্ত্রী-শিক্ষা বঙ্গদেশে প্রচলিত না হইলেই ভাল হইত? তোমার আমার ব্যবহারের দোষে যদি স্রোতস্বতীর পূতবারি কোথাও কলুষিত হয়,

তবে আমাদের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করাই আবশ্যক; মঙ্গল-বিধায়িনী রোম-স্বতীর মূল উৎস-মুখ রুদ্ধ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। যিনি বঙ্গভাষার গঠনকার্য্যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তিনিই যে বঙ্গভাষাকে সুসজ্জীকরণে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে পরস্পরের সাহায্য করিবার উপযোগী করিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, ইহা বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহার সেই চেষ্টার ফলেই আজ বঙ্গভাষার রম্য নিকুঞ্জভবন কোকিলার কলকণ্ঠোদ্গত কাকলিতে পূর্ণ।

বিদ্যাসাগরই প্রথম কায়স্থ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান করেন। তৎপূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রগণ শিক্ষা পাইতেন। লাটিনে একটা কথা আছে,—"সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছি।" আমাদের সম্বন্ধে এই কথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন, যখন কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চা আবদ্ধ থাকাতেই ভারতবর্ষের জ্ঞানালোকে অন্য দেশের অধিবাসীরা বিস্মিত হইয়াছিল, সে সময় আর নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যখন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ স্বেচ্ছায় সংসারসুখ পদে দলিয়া, সর্ব্বক্লেশ সহ্য করিয়া জ্ঞানচর্চ্চায় রত হইতেন, যখন তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া জ্ঞানসম্পদ্-সংরক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন, যখন ভারতবর্ষে কেবল জ্ঞানই আভিজাত্য দান করিত, যখন ভারতবর্ষে ধনের সম্মান অপেক্ষা জ্ঞানের সম্মান অনেক অধিক ছিল, সে দিন আর নাই। মানবের ইতিহাসের সুদূর অতীত অধ্যায়ে যখন ভারতবর্ষে জ্ঞানসম্পদ্ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এবং সেইরূপ আবদ্ধ ছিল বলিয়াই তাহার অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার পর-সময়ে, শিক্ষায় ও সভ্যতায় যে প্রভূত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া সর্ব্ববিষয়ে পূর্ব্ব-নিয়মের অনুসরণ সর্ব্বত্র সুফলপ্রদ নহে। তবে কোন্ বিষয়ে কত দূর পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সে বিচারে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। সমাজে প্রচলিত সকল আচারেরই প্রচলনকালে বিশেষ উপযোগিতা থাকে। উপযোগিতা না থাকিলে সে সকলের প্রচলন হয় না। কিন্তু সমাজের ও সময়ের, শিক্ষায় ও সভ্যতায় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপ্রচলিত সকল আচারের ও আদেশের, ব্যবহারের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া উঠে। তাই টেনিসন এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"Our little systems have their day;
They have their day and cease to be."

বিদ্যাসাগর উপযোগিতা বুঝিয়াই সংস্কৃত কলেজে কায়স্থ ছাত্রদিগকে প্রবেশা-

[illegible] করুণার উৎস [illegible] [illegible] [illegible]

এমন কি, জীবনের আশঙ্কাও কর্ম্মবীরকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরাইতে পারে নাই, কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ করিতে পারে নাই। এই সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিদ্যাসাগর যেন ভিমরুলের চক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর আমাদের মত আন্তরিকতাশূন্য ছিলেন না, তাই দংশন-ভয় তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। এই সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে বিদ্যাসাগর অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা, অদম্য তেজ ও অগাধ-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই সমাজ-সংস্কার-ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের দুইটি ভাগ সুস্পষ্টতম হইয়া উঠিয়াছে,—সে দুইটি তাঁহার অনন্যসাধারণ দয়া ও অটল স্বাবলম্বন। সমাজের নিন্দা, কুৎসা, লাঞ্ছনা, কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই; কিন্তু বিধবার দুঃখে বিদ্যাসাগর মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনচরিত-কার বিহারীলাল বাবু বলিয়াছেন,—"প্রকৃতই বিদ্যাসাগরের হৃদয় 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি'।" বিদ্যাসাগর মহান্ মহীধ্রের মত আপনার শুভ্র, সমুজ্জ্বল, সমুন্নত মহিমায় অটল ছিলেন; মেঘগর্জ্জন, দামিনীস্ফুরণ, ধারাপাত, করকাঘাত, অশনি-সম্পাত, কিছুই তাঁহাকে বিচালিত করিতে পারে নাই। আবার তাঁহার হৃদয়ের উৎস হইতে দয়া-ভাগীরথীর যে পূত-স্রোত বহিয়া গিয়াছিল, তাহার তুলনা কোথায়? ইহাই বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব; এই বিশেষত্বের জন্যই এই আন্তরিকতাশূন্য, তেজোলেশ-হীন জাতির মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব স্মরণীয় ঘটনা। বাঙ্গালার নমনীয় কর্দ্দমময় সমতলভূমে এই পর্ব্বতের অভ্যুত্থান প্রকৃতির বিস্ময়করী লীলা।

বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, সমাজ-সংস্কার-পাগল ছিলেন না। তিনি আতিশয্যের পথপাতী ছিলেন না। তাই সমাজ-সংস্কারকার্য্যে তিনি কেবল যুক্তির আশ্রয় না লইয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহা সমাজের পক্ষে উপযোগী, তাহার জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অপেক্ষা যুক্তিরই অধিক প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। আজ যাহা সমাজের পক্ষে আবশ্যক, তাহা বহুকাল পূর্ব্বে রচিত শাস্ত্রের অনুমোদিত না হইতে পারে; ব্যবস্থা সময়োপযোগী হওয়াই বিধি। কিন্তু বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন, প্রাচীন-বিধান-চালিত সমাজে কেবল যুক্তির সাহায্যে কোনও বিধি প্রচলিত করা দুঃসাধ্য। তদ্ব্যতীত প্রাচীন বিধানের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কোনও সংস্কার-প্রচলনের পথ একবার পরিষ্কৃত হইলে অনেকে সে পথে গমন করিতে চেষ্টা করিবে,—অনেকে যশের আশায় অন্ধ

হইয়া বিপথগামীও হইতে পারে। সেই আশঙ্কা হেতু বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-সংগ্রহে অসাধারণ শ্রম-স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা বিদ্যাসাগরের দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

নানা কার্য্যে বিদ্যাসাগরের এই দূরদর্শিতা প্রকাশিত হইত। আমি একটি দৃষ্টান্ত দিব। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া দেশীয় বেশ পরিধান করিবার ও দেশীয় প্রথায় থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে হাইকোর্টের অন্যান্য ব্যারিষ্টারগণ তাঁহাকে বারলাইব্রেরীতে প্রবেশাধিকার দিবেন না, এইরূপ স্থির করেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহার পিতার অন্যতম বন্ধু কলিকাতার এক জন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট পরামর্শপ্রার্থী হয়েন। তিনি সকল শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যদি বিদেশীয় বেশ পরিধান কর, বিদেশীয়ের মত থাক, তবে আমরা তোমাকে কোনরূপে সাহায্য করিতে পারিব না। তাহাতে তোমার অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে।" মনোমোহন বাবু বিদ্যাসাগরের নিকট পরামর্শপ্রার্থী হইলেন। সকল শুনিয়া ভণ্ডামী-বিরোধী বিদ্যাসাগর বলিলেন, "যে ভণ্ড তোমাকে এ কথা বলিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, সে যে ইজার চাপকান পরে, তাহা কি হিন্দুর বেশ? তাহার গৃহসজ্জা কি হিন্দুর গৃহসজ্জা? মুসলমান আমাদের রাজা ছিল, সে এখনও মুসলমানের অনুকরণ করে; এখন ইংরাজ আমাদের রাজা, সে ইংরাজের অনুকরণ করিতেছে। আর তোমাকে উপদেশ দিবার সময় বুঝি ষড় হিন্দু সাজিয়াছে? আমার উপদেশ,—তুমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, সে কার্য্যে সাফল্যের জন্য যখন আবশ্যক, তখন ইংরাজের বেশ পরিধান করিতে পার, বাহিরে আবশ্যক হইলে তাহাদের মত থাকিতে পার। কিন্তু সাবধান, ইংরাজ হইও না; হৃদয়খানা যেন বাঙ্গালীর হৃদয় থাকে। অল্পদিন পরে লোকের আর আপত্তি থাকিবে না।" মনোমোহন বাবু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কলিকাতা-সমাজের অন্যতম নেতা, ইজার-চাপকান-মোগলাই-পাগড়ী-পরা পিতার বন্ধুর নিকট সুপরামর্শ পাই নাই। যে তেজস্বী ব্রাহ্মণের নিকট আন্তরিকতা ও সুপরামর্শ পাইয়াছিলাম, তিনি কখনও মোটা চাদর ও চটি সুতা ত্যাগ করেন নাই। এখন পথে ঘাটে হ্যাটকোটের বাহুল্য দেখি, ইংলণ্ড-প্রত্যাগতদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিতে দেখি, ইংলণ্ড-প্রত্যাগতদিগকে হিন্দুর গৃহে নিমন্ত্রণে যাইতে দেখি, আর ভাবি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা ফলিয়াছে। তাঁহার দূরদর্শিতা দেখিয়া বিস্মিত হই।" একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে তাঁহার মতও অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

"দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্রে দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না।" স্রোতস্বতী শিলার উপরও স্নেহ ঢালিয়া যায়। বিদ্যাসাগরের নিকট কেহ অভাব জানাইলেই বিদ্যাসাগর তাহাকে দান করিতেন। ইহাতে যে তাঁহার দান কখনও অপাত্রে অর্পিত হইত না, এমন কথা বলিতে পারি না। বরং বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার দয়া বহুবার অযোগ্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল; তাঁহার দান বহুবার অপাত্রে অর্পিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ্যায় শিক্ষিতগণ এই উপলক্ষে অবিচারিত দানের দোষে বিদ্যাসাগরকে বিষম দোষী প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাকে সমাজের অহিতকারী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, এবং শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের সামান্য ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট শনির মত এই ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া বিদ্যাসাগরের সকল কার্য্য অন্যায় ও অহিতকর সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখি, বিদ্যাসাগর অর্থনীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া দয়া শিক্ষা করেন নাই। তাঁহার দয়া অর্থনীতির অপেক্ষা করিত না; তিনি অর্থনীতির অনেক উপরে অবস্থিত ছিলেন। কাহারও দুঃখ দেখিলে বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। কাহারও পীড়ার সংবাদ পাইলে বিদ্যাসাগর কেবল ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হইতেন না,—হইতে পারিতেন না। যতক্ষণ রোগীর শুশ্রূষার ব্যবস্থা না হইত, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি হইত না। আবশ্যক হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং রোগীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইতেন। দরিদ্রের কুটীরে মলিন শয্যা-পার্শ্বে বসিয়াও তিনি রোগীর শুশ্রূষা করিতেন; আপনার জীবন তুচ্ছ করিয়া বিসূচিকা-পীড়িতের মল-মূত্র নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেন। বিদ্যাসাগর আপনার স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া অসংখ্য সাঁওতালের সেবা করিতেন; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রভু কর্ত্তৃক বিতাড়িত ভীষণ-সংক্রামক-রোগপীড়িত ভৃত্যকে বুকে করিয়া আনিয়া, আপনার শয্যায় শয়ন করাইয়া, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। বিদ্যাসাগর যখনই পথে বাহির হইতেন, তখনই সঙ্গে দুয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকা লইয়া যাইতেন। সেগুলি প্রায় ফিরিয়া আসিত না। ভিখারী বিদ্যাসাগরের নিকট ভিক্ষা করিতে গিয়া রিক্ত-করে ফিরিত না। কোনও দীন-দুঃখী আসিলে বিদ্যাসাগর তাহাকে অর্থ দান করিতেন; অধিকন্তু সে যাহা আহার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিত, তাহাকে তাহাই আহার করাইয়া স্বয়ং অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করিতেন। কেহ বিপদে পড়িয়া বিদ্যাসাগরের শরণ লইলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না; আপনার সহস্র ক্ষতি-স্বীকার করিয়াও তাহার উদ্ধারের উপায় করিতেন। কেহ আসিয়া বিদ্যাসাগরকে

জানাইল, অর্থাভাবে তাহার বাস্তুভিটা বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, উত্তমর্ণ আর বিলম্ব করিতেছে না; বিদ্যাসাগর অমনই তাহার সাহায্যের জন্য সচেষ্টিত হইলেন। আপনার নিকট তত টাকা নাই, দানশৌণ্ড বিদ্যাসাগর স্বয়ং কোথাও হইতে ঋণ করিয়া তাহাকে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন। বিদ্যাসাগরের নিকট কেহ বিপদ্ জানাইলেই তাঁহার করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, কর্ম্মবীর বিদ্যাসাগর দানবীর দয়ার সাগররূপে তাহার উপকারের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন। কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, তাহার দুঃখ মোচন করিতে না পারিলে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইত না। পথে কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে দেখিলেই বিদ্যাসাগরের প্রাণ কাঁদিত, তিনি তাহার দুঃখের কারণ জানিতেন; তাঁহার দ্বারা সে দুঃখ-নিবারণ সম্ভব হইলে তিনি সে দুঃখ-মোচনে চেষ্টিত হইতেন। পঠদ্দশায় বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের দ্বাররক্ষীর নিকট পয়সা ধার লইয়া দুঃখীকে দান করিতেন, সংসারে প্রবেশ করিয়াও তিনি আপনি ঋণ করিয়াও অপরকে সাহায্য করিয়াছেন। শৈশবেই লোকের পরজীবনের আভাষ পাওয়া যায়। কত লোক যে, বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণ লইয়া ঋণ পরিশোধ করে নাই,—করিতে পারে নাই, বা ক্ষমতা-স্বত্বেও করে নাই, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। অনেকে মিথ্যা জানাইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য লইয়াছে অপরের সাহায্যার্থ ঋণ করিয়া বিদ্যাসাগর বহুবার বিপদে পড়িয়াছেন; কিন্তু কিছুতেই সেই দানবীরের দানশীলতা ম্লান হয় নাই। তিনি কে কোথায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে, কে কোথায় রোগশয্যায় শুশ্রূষার অভাবে ক্লেশ পাইতেছে, তাহার সন্ধান লইতেন, এবং আবশ্যকমত অর্থ দান করিতেন, ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। অপরিম্লান দানশীলতা ও অসাধারণ দয়া বিদ্যাসাগরের চরিত্রের উজ্জ্বল বিশেষত্ব। ১২৭৩ সালে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের দারুণ লোলজিহ্ব শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। লোকের দুঃখের কথা অবগত হইয়া বিদ্যাসাগর গ্রামে অন্নসত্র সংস্থাপন করিলেন। তাহার পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাসাগরের জননী অন্নপূর্ণার মত বহু লোককে অন্নদান করিতেছিলেন। প্রথম প্রথম অন্নসত্রে প্রতিদিন এক শত কহিয়া লোক অন্ন পাইত। ক্রমে অন্নার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। বিদ্যাসাগরও সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। বিহারীলালবাবু লিখিয়াছেন,—"যাহারা অন্নসত্রে আহার না করিত, তাহারা প্রত্যহ সিধা পাইত। কেহ পুত্রকন্যা ফেলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, তাহার পুত্রকন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় লইতেন। গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসব করিলে, তাহার নবজাত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতি-

পালনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।" অনেক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং অনেক রুক্ষকেশ, দীন হীন, মলিন দুঃখী ও দুঃখিনীর মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন। "যে সব ভদ্রলোক ভিক্ষা লইতে কুণ্ঠিত হইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় গোপনে তাঁহাদিগকে টাকা দিতেন। অনেক ভদ্র-মহিলাকে তিনি গোপনে গোপনে কাপড় বিতরণ করিয়া আসিতেন। অন্নসত্রে রোগীর চিকিৎসা চলিত, মৃতের সৎকার হইত।" দান অনেকেই করিয়া থাকে; কিন্তু দানে এরূপ অসাধারণ আন্তরিকতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সঞ্চিত পিতৃধনের অধিকারীর পক্ষে বা অতুল-বিভবশালীর পক্ষে যশের আশায় বা প্রকৃত দয়ার উত্তেজনায় দানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার কঠোর দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া আপনার শ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে দয়ার উত্তেজনায় ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়মাত্র না রাখিয়া মুক্তহস্তে অর্থদানের, অকাতরে অবসর-ব্যয়ের, ইচ্ছায় শ্রম-স্বীকারের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। তাই বিদ্যাসাগরের দান অসাধারণ; তাহাতেই বিদ্যাসাগরের দানের বিশেষত্ব। তাই কবিবর হেমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথায় বলিয়াছেন, "মানব-দেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান।" "ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহে সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।" বিদ্যাসাগর সত্যই দয়ার সাগর।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় সাগরেরই সহিত উপমেয়। সে হৃদয় তেমনই উদার, তেমনই বিশাল, তেমনই মধুর, তেমনই কোমল; আবার অন্যায় বা অত্যাচারের ঝঞ্ঝাঘাতে তাহা বাত্যাতাড়িত উত্তুঙ্গ-তরঙ্গকুল-সঙ্কুল সাগরেরই মত ভীষণ হইয়া উঠিত। কিন্তু সে আন্দোলন অধিকক্ষণ থাকিত না; অচিরে সে হৃদয়ে সুমধুর শান্তি, সুকোমল স্নেহ বিরাজ করিত। শুনিয়াছি, অন্যায় বা অত্যাচার দেখিলে বিদ্যাসাগরের করুণারস-সম্পৃক্ত নয়ন রোষে জ্বলিয়া উঠিত, তাঁহার রহস্যরসোৎপুল্ল আনন প্রলয়-সহস্র বজ্রসহচর পার্ব্বত্যবাত্যার মত অন্ধকার হইয়া উঠিত। ধনী বন্ধুর গৃহদ্বারে দ্বারবান কর্ত্তৃক দরিদ্র ভিক্ষুকের লাঞ্ছনা দেখিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জীবনে আর সে গৃহে পদার্পণ করিবেন না। প্রতিজ্ঞাপালনে তিনি পরশুরাম ছিলেন।

বিদ্যাসাগর অত্যাচার দেখিলে তাহার প্রতীকারকল্পে বদ্ধপরিকর হইতেন। তাই তিনি সর্ব্বদাই অক্ষম দুর্ব্বলের পক্ষাবলম্বন করিয়া সক্ষম সবলের সহিত সংগ্রাম করিতেন। তিনি পীড়িতের আশ্রয়স্থল ও পীড়কের ভীতির কারণ ছিলেন।

তাঁহার সমাজসংস্কারও দুর্ব্বল রমণীর পক্ষ হইয়া সবল সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

৪

কিছুতেই বিদ্যাসাগরকে কর্ত্তব্য-পথচ্যুত করিতে পারিত না। কর্ত্তব্যপালনের জন্য বিদ্যাসাগর সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কর্ত্তব্যপালনের জন্য তিনি আপনার দুঃখ, কষ্ট, বেদনা সকলই তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। ইহাও তাঁহার আন্তরিকতার পরিচয়। যে ব্যাপারে পারিবারিক জীবনে বিদ্যাসাগর কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইতে উদ্ভূত; পুত্রবর্জ্জন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ক্লেশকর। বিশেষ যে দেশে লোক পুত্রের অভাবে দত্তক লইয়া দুগ্ধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইতে প্রয়াস পায়, সে দেশে স্নেহশীল জনকের পক্ষে পুত্রবর্জ্জন অত্যন্ত কষ্টকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে মুহূর্ত্তে পুত্রবর্জ্জন আবশ্যক ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সে কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সহিষ্ণুতা তাঁহার দয়ারই মত অসাধারণ অধিক ছিল। তাঁহার সহিষ্ণুতার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। গুরুভার দ্রব্যের পতনে তাঁহার পদের অঙ্গুলি নিষ্পিষ্টপ্রায় হইলেও তাঁহার প্রীতিপ্রফুল্লমুখে বিকৃতির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। চিকিৎসক যখন তাঁহার পদে "কারবঙ্কলে"র অস্ত্রচিকিৎসা করিতেছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর বন্ধুর সহিত গল্পে রত ছিলেন। অন্তিমে রোগশয্যায় তিনি সহিষ্ণুতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন; যিনি জীবনে স্বেচ্ছায় সহস্র রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তিনি রোগশয্যায় যতক্ষণ আপনি পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ কাহাকেও শুশ্রূষা করিতে দেন নাই। শুনিয়াছি, "যাতনার অগ্নিকুণ্ড হইতেও যথাপাত্রে যথাযোগ্য রসস্যাভাষের সুধাধারা বর্ষিত হইত!" কিন্তু এই শারীরিক সহিষ্ণুতা তাঁহার অন্তরের সহিষ্ণুতার বাহ্যাভাসমাত্র; ধনীর গৃহে দ্বাররক্ষীর হস্তে দরিদ্রের লাঞ্ছনা দেখিয়া বিদ্যাসাগর নিজগৃহে কখনও দ্বারবান্ রাখেন নাই; অধিকন্তু দৌহিত্রবর্গকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন,—"যদি শুনিতে পাই, বাড়ীর কাহারও দ্বারা আমার বাড়ীতে কাহারও আসিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে দূর করিয়া দিব।" সাক্ষাৎপ্রার্থীদিগের জন্য তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই অবারিতদ্বার থাকিত। অনেকে স্বার্থপরতা-প্রণোদিত হইয়া অসময়ে—পারিবারিক বিপদের সময়েও তাঁহাকে বিরক্ত করিত। তথাপি বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সাক্ষাৎপ্রার্থীর পক্ষে তাঁহার গৃহ অবারিতদ্বারই ছিল।

বিদ্যাসাগরের সরল—সবল—সমুন্নত মনুষ্যত্ব—মেকির উপর বড় চটা ছিল। তিনি আপনি কখনও হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে জানিতেন না। একবার তিনি

কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় অপর এক ব্যক্তি সেই রাজকর্ম্মচারীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হইল, তিনি "অবসর নাই" বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-বিমুখ হয়েন। বিদ্যাসাগর অমনই বলিলেন, "কেন—আমার সহিত গল্প করিবার সময় আছে, আর অপরের সহিত সাক্ষাতের সময় নাই? হয় ত সে দরিদ্র—কোন আবশ্যকে গাড়ী বা পাল্কী ভাড়া করিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।" তিনি সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা দেখিলেই মুগ্ধ হইতেন; খাঁটী মানুষকে বড় আদর করিতেন। একবার কোনও বাঙ্গালী একটা মকদ্দমার জন্য কয় জন সাঁওতালকে মিথ্যা সাক্ষ্য শখাইয়াছিলেন। সাঁওতালগণ প্রথমে শিখান কথা বলিয়াছিল; কিন্তু বিচারক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল,—সত্য গোপন করিতে পারে নাই। ইহাতে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি সাঁওতালদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাহাদের দুঃখে তিনি দুঃখিত হইতেন; তাহাদের আনন্দে তাঁহার করুণ হৃদয়খানি বিপুল আনন্দে প্লাবিত হইয়া যাইত। তিনি আপনি বলিয়াছেন,—"সাঁওতালদের সহিত আলাপে আমার প্রীতি। * * তাহারা অসভ্য বটে; কিন্তু সরল ও সত্যবাদী।"

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজের প্রিন্সিপ্যাল, তখন পুস্তক-প্রকাশের জন্য তাঁহার নিকট গভর্মেণ্টের কিছু টাকা ছিল। সে টাকা ব্যয় হয় নাই। গভর্মেণ্ট টাকার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; হিসাব-নিকাশেও সে টাকার উল্লেখ ছিল না। বহুকাল পরে আপনার হিসাব দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া গভর্মেণ্টে পত্র লিখিয়া, টাকা দিয়া তবে সুস্থির হয়েন। এ সততা বিদ্যাসাগরের পক্ষে স্বাভাবিক বটে।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় পৌরুষ ও দয়া এতদুভয়ের সম্মিলনের পুণ্য প্রয়াগ-ক্ষেত্র। আবার কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া আসিত। রহস্যরসে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। দয়ার প্রবাহে বা স্নেহের স্রোতে বিদ্যাসাগরের রাগ ভাসিয়া যাইত। আমরা তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। বিহারীলাল বাবু লিখিয়াছেন,—"একবার তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত 'মেট্রপলিটান কলেজে'র শ্যামবাজারস্থ শাখাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে অবাধ্যতা-দোষের জন্য ভাড়াইয়া দেন। কর্ত্তব্যানুরোধে দ্বিতীয় শ্রেণী একেবারে উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ বিতাড়িত হইয়া, পরদিন প্রাতে তাঁহার বাদুড়বাগানস্থিত বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হয়, এবং কাতরকণ্ঠে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বালকদিগের কোমলকরুণ মুখ দেখিয়া দয়ার্ণব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে দুরন্ত ক্রোধ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। তখন তিনি সাদর-স্নেহ-সম্ভাষণে বলিলেন,—'বা, আর এ

আজ করিস্ না ; এবার মাপ্ কর্‌লাম।' ছাত্রগণ এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল ; তখন বেলা বারটা। বাড়ী ফিরিবার জন্য বিদায় লইয়া, ঠিক সিঁড়িতে নামিবার সময়, তাহাদের এক জন হাসিতে হাসিতে অনুচ্চস্বরে বলিল,—'কি কঠোর প্রাণ। এতখানি বেলা হ'ল, বল্‌লে না—একটু জল খেয়ে যা!' কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে গেল। তিনি তখন তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়া সকলকে বলিলেন, 'ঠিক বলেছিস্ ; আমার কঠোর প্রাণ বটে ; অন্যমনস্কে তোদিগে একটু জল খেতেও বলি নাই ; আয়, আয়, একটু একটু জল খেয়ে যা।' ছাত্রগণ তখন অপ্রস্তুত হইল। কেহ কেহ হাতযোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল ; কেহ কেহ বা তাড়াতাড়ি পলাইবার চেষ্টা করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। পরে তিনি সকলকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। উপরে গিয়া সকলকে জল খাইতে হইল। তখন তাঁহার সেই প্রফুল্ল প্রসন্ন বদনখানি দেখিয়া এক জন আর এক জনকে বলিয়াছিল,—'এ লোকের রাগ হয় কেমন করিয়া?'

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে আর এক বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তি। বিদ্যাসাগর একবার কাশীর ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়াছিলেন,—"আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না। * * * আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী বিরাজমান।" ভিখারী বালক "আমার মা নাই" বলিলে বিদ্যাসাগরের চক্ষে জল আসিত। বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে মাতৃভক্তির মন্দাকিনী-ধারা কিরূপ পূর্ণোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—বিদ্যাসাগর যখন "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে" কার্য্য করিতেন, সেই সময় তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। বীরসিংহ গ্রাম হইতে জননী তাঁহাকে সেই বিবাহ উপলক্ষে গৃহে আসিতে আদেশ করেন। বিদ্যাসাগর ছুটী চাহিয়া—ছুটী পাইলেন না। ব্যথিত-হৃদয়ে তিনি বাসায় ফিরিলেন। আর সকলেই গৃহে গেল। বিদ্যাসাগর একাকী সারারাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন ; ভাবিলেন, "আমি অত্যন্ত কুতঘ্ন—মাতৃ-আজ্ঞাপালন করিতে পারিলাম না।" শেষে তিনি স্থির করিলেন—"ছুটী না পাই, কর্ম্ম ত্যাগ করিব। বাটী যাইবই।" পরদিন কাপ্তান মার্শালের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যাসাগর বলিলেন, "ছুটী না দেন, কর্ম্মত্যাগ করিলাম।" পদত্যাগ মঞ্জুর করুন। চাকরীর জন্য জননীর অশ্রু সহ্য করিতে পারিব না।" কাপ্তান মার্শাল তাঁহার মাতৃভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ; ছুটী মঞ্জুর করিলেন। ছুটী লইয়া বিদ্যাসাগর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বর্ষাকাল,—আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন অনবরত ধারাপাত হইতেছে, পথ কর্দ্দমে পূর্ণ—দুর্গম। বিদ্যাসাগর কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ

করিলেন না, মাতৃদর্শনে চলিলেন। পথে এক দোকানে রাত্রি কাটাইয়া পরদিবস প্রভাতে বিদ্যাসাগর আবার যাত্রা করিলেন। তিনি যে ভক্তির আকর্ষণে ছুটিতেছিলেন, ভৃত্যের সে আকর্ষণ কোথায়? সে পঙ্ক চলিতে পারিতেছে না দেখিয়া তাহাকে এক দোকানে ফলারে বসাইয়া বিদ্যাসাগর চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি বর্ষাবারিপাতে ভীমমূর্ত্তি দামোদরের কূলে উপনীত হইলেন। বর্ষায়,—

"রুদ্রমূর্ত্তি দামোদর তাণ্ডব-তাড়নে
প্রলয়-প্লাবন সম চলিছে ছুটিয়া।"

পারাপারের নৌকা তখন পরপারে; সে নৌকার আশায় বসিয়া থাকিলে সে দিন আর গৃহে যাওয়া যায় না। পরিপ্লবনেত্রা জননীর বিষাদ-বিমলিন মুখের চিত্র তাঁহার কল্পনা-নয়নে ফুটিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর আর বিলম্ব করিলেন না, উপস্থিত সকলের নিষেধ সত্ত্বেও দামোদরের স্রোতে ঝাঁপ দিলেন। বলশালী বিদ্যাসাগর সহজেই সেই খরস্রোত দামোদর পার হইয়া পরপারে উপস্থিত হইলেন। তিনি সিক্তবস্ত্রে পথ চলিতে লাগিলেন। পথে দারকেশ্বর নদও আবার সাঁতরাইয়া পার হইয়া বিদ্যাসাগর যখন "কুড়ীরা খালে"র নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, বর্ষার সন্ধ্যার ঘনান্ধকার চারি দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। সেখানে বিষম দস্যুভয়। বিদ্যাসাগর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় তিনি গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন বর বিবাহ করিতে গিয়াছে; জননী তাঁহার অনুপস্থিতিতে মর্ম্মব্যথায় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে পড়িয়া আছেন। বিদ্যাসাগর উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, মা, আমি এসেছি।" পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিহ্বলা জননী ঘরের বাহিরে আসিলেন। তখন মাও কাঁদিতে লাগিলেন, ছেলেও কাঁদিতে লাগিলেন। "উভয়েই অনাহারে ছিলেন।" উচ্ছ্বাসবেগের হ্রাস হইলে পর, মাতা ও পুত্র একত্র আহার করিতে বসিলেন। জননীর পক্ষে এরূপ অপরিমিত স্নেহের উচ্ছ্বাসের ও পুত্রের পক্ষে এরূপ অসাধারণ মাতৃভক্তির মন্দাকিনীধারার দৃষ্টান্ত বিরল। এই মাতৃভক্তিতেও বিদ্যাসাগরের অনন্যসাধারণ আন্তরিকতা পরিস্ফুট। এই আন্তরিকতা ব্যতীত জননীর অশ্রু মুছাইবার জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া বিদ্যাসাগর খরস্রোত দামোদরের দুরন্ত প্রবাহে ঝাঁপ দিতে পারিতেন না; তখন বিদ্যাসাগর মুহূর্ত্তের জন্য মনে করতে পারেন নাই যে, যদি সঙ্কট-সঙ্কুল নদীস্রোতে তাঁহার জীবন ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডেরই মত ভাসিয়া যায়, তবে জননীর হৃদয়ে শোকের দারুণ চিতানল কখন নির্ব্বাপিত হইবে না। জননী অশ্রু অসহ্য মনে করিয়াই বিদ্যাসাগর পাগল হইয়াছিলেন—আর কোন বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই।

বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মমত কিরূপ ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। বারাণসীতে একবার কোন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট তাঁহার ধর্ম্মমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন,—"আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই, বলিবও না; তবে এই কথা বলি, গঙ্গাস্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন, তাহা হইলে তাহাই আপনার ধর্ম্ম।" ধর্ম্মমতে এরূপ উদারতা বিদ্যাসাগরেরই উপযুক্ত। উপাসনায় উপাসিতের ইষ্টানিষ্ট নাই—উপাসকেরই মনের তৃপ্তি; যদি তাহাই হয়, তবে মনের তৃপ্ত্যর্থই ধর্ম্মচর্য্যা। মানব-মনের শেষ আদর্শ "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।" কিন্তু সে আদর্শ অনেকের ধারণাশক্তির অতীত;—তাই হৃদয়ের তৃপ্ত্যর্থ Personal Godএর কল্পনা। আর্য্যশাস্ত্রে আছে,—"অনাদি অনন্ত যিনি মহান, তিনিই সুখরূপ।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।" বোধ করি, তাই যে হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরের কল্পনা "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং", সেই হিন্দুধর্ম্মেই সাকার উপাসনার ব্যবস্থা। বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজবেষ্টন ত্যাগ করেন নাই; তিনি সামাজিক কার্য্যে হিন্দু ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার সকল পত্রের উপর আনুষ্ঠানিক হিন্দুর "শ্রীহরিঃ শরণম্" দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহাকে অন্য কোনও ধর্ম্মবাদী বলা বিড়ম্বনা। তবে হিন্দুসমাজে প্রচলিত আচারের মধ্যে সবই বিদ্যাসাগরের অনুমোদিত ছিল কি না, জানি না। হিন্দুসমাজে হিন্দুপরিবারে বিদ্যাসাগরের জন্ম। তাঁহার শিক্ষাও হিন্দুসমাজানুমোদিত। গীতায় হিন্দুর উপাসতের উপদেশ,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

উদারতাই ধর্ম্মের প্রধান গুণ। প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণ, অন্যমত-বিদ্বেষী, অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষা উদার হৃদয়ের আন্তরিক সংশয়বাদ বহুবার বাঞ্ছনীয়। ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—

"There lives more faith in honest doubt,
Believe me, than in half the creeds,"

বিদ্যাসাগর ধর্ম্মমতে প্রকৃত উদারতা দেখাইয়াছেন। সভ্যতার আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম বিততসহস্রশাখ বৃহৎ বনস্পতির মত লক্ষ লক্ষ মানবকে স্নিগ্ধ ছায়া ও অবারিত আশ্রয় দিয়াছে ও দিতেছে; যে ধর্ম্ম লক্ষ লক্ষ মানবের তাপতপ্ত হৃদয়ে শান্তির স্নিগ্ধস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে ও করিতেছে; যে ধর্ম্ম

শোকে দুঃখে মানবকে সান্ত্বনা দিয়াছে ও দিতেছে. এ উদারতা যে ধর্ম্মেরই উপযোগী বটে।

বিদ্যাসাগর প্রকৃতই বিদ্যাসাগর ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহাও যেমন বলবতী ছিল, জ্ঞানার্জ্জনক্ষমতাও তেমনই অসাধারণ ছিল। বাল্যকালে পথ চলিতে চলিতে "মাইল"-পাথর দেখিয়া বিদ্যাসাগর ইংরাজী অঙ্ক চিনিয়াছিলেন, নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে তিনি সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, বিরল-প্রাপ্ত অবসরকালে তিনি হিন্দী শিখিয়াছিলেন ও পরলোকগত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহোদয়ের সাহায্যে ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। আপনি ভাল না বুঝিলে কেহ পরকে ভাল বুঝাইতে পারে না, ভাল ডুবারী নহিলে সাগরতল হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিতে পারে না। বিদ্যাসাগরের পুস্তকেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়। অগাধ পাণ্ডিত্য না থাকিলে তিনি ব্যাকরণ-শিক্ষার সহজ ও নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষার পথ সরল ও সুগম করিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ নূতন পদ্ধতিতে রচিত,—সহজবোধ্য—সরল। যিনি ভাষা-শিক্ষার নূতন সহজ পথ আবিষ্কার করিতে পারেন, ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার থাকে। বিদ্যাসাগরের সেই অসাধারণ অধিকার ছিল। বিদ্যাসাগরের জ্ঞান ও সাগরের সহিতই উপমেয়। সে জ্ঞান সাগরেরই মত গভীর ও গম্ভীর—আবার তাহা সাগরেরই মত লোকহিতকর। বিদ্যাসাগরের পুস্তকাগারের উল্লেখ না করিলে তাঁহার পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি নানা বহুমূল্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরম বন্ধু আনন্দকৃষ্ণ বসুরই মত জগতের জ্ঞানসম্পদসার পুস্তক ভালবাসিতেন। বিদ্যাসাগর পুস্তক-ক্রয়ে, পুস্তক-সুসজ্জীকরণে ও পুস্তক-সংরক্ষণে যে ব্যয় করিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু জ্ঞানসঞ্চয়ে বিদ্যাসাগরের গৌরব নহে; জ্ঞানদানেই তাঁহার গৌরব। তিনি ধ্যানযোগীর মত জ্ঞাননিমগ্ন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন নাই; লোকহিতার্থ জ্ঞানবিতরণ করিয়া জাতীয় উন্নতির পথ মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। "মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন" বিদ্যাসাগরের বিরাট কীর্ত্তি। বিদ্যাসাগরই এ দেশে সুলভে ইংরাজী-শিক্ষা-প্রচারের পথ প্রদর্শিত করেন। তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করেন যে, নিরবচ্ছিন্ন দেশীয় শিক্ষকের সাহায্যে, নিরবচ্ছিন্ন দেশীয় লোকের কর্তৃত্বে এ দেশে উচ্চশিক্ষাদান অসম্ভব নহে। আজ যে কলিকাতায় ও মফস্বলে নানা বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্রগণ অত্যল্প ব্যয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে, সমাজের অতি নিম্নস্তরও উচ্চশিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, সে বিদ্যাসাগরের কৃপায়। রাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকার সময় বিদ্যাসাগরকে নানা স্থানে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা

করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বিদ্যাসাগর এ দেশে শিক্ষাবিস্তারের বড় পরিচয় হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর আপনি দরিদ্র সন্তান—দরিদ্রের পক্ষে যে সমস্ত বিদ্যার্জ্জনে যে সহস্র বাধা আছে, বিদ্যাসাগর তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই যাহাতে দরিদ্রসন্তান সুলভে উচ্চশিক্ষালাভ করিতে পারে, বিদ্যাসাগর তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে তিনি দরিদ্রের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভের সহজগম্য করিয়া দিয়াছিলেন। দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় যে বিদ্যাসাগর অকাতরে অন্ন দিয়া লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাসাগরই অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে জ্ঞানের উচ্চ আলোক ফুটাইয়াছিলেন;—জ্ঞানের ভাস্বরজ্যোতিঃ আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে মগ্ন জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সে চেষ্টা কি বিফল হইবে? বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণসন্তান। ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাদান করিয়া প্রতিদানে অর্থ লইতে ঘৃণা বোধ করিতেন—বিদ্যাদানেই তাঁহাদিগের তৃপ্তি। আজও এ দেশের নানা স্থানে সংস্কৃত-শিক্ষার টোলে ছাত্রগণ বিনা বিতনে বিদ্যালাভ করে;—অধিকন্তু গুরু তাহাদের আহারাদির ব্যয় বহন করেন।

ইহা সেই প্রাচীন জ্ঞানদানানন্দ-তৃপ্ত জ্ঞানীদিগের প্রবর্ত্তিত প্রণালীর অবশেষ। বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন যে, কালে সমাজে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বপ্রচলিত প্রণালীতে কার্য্য করিলে কার্য্য ভাল চলিবে না। তখন ধনিগণ বিদ্যাদাতৃগণকে সাহায্য করিতেন, সাধারণ লোকে ভক্তি করিয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিত, তাহাতে সশিষ্য ব্রাহ্মণগুরুর বিলাসলেশহীন সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহে কোনরূপ ক্লেশ হইত না। এখন সংসারের অভাব বাড়িয়াছে, আবার সেরূপ সাহায্য ও সেরূপ উপহার ক্রমেই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন, শিক্ষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানপ্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাই তিনিই প্রথম সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদিগের বেতনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যে লোকহিতেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বপুরুষগণ বিদ্যার্থীর নিকট অর্থ গ্রহণ করিতেন না, সেই লোকহিতেচ্ছা বিদ্যাসাগরের হৃদয় হইতে অপনীত হয় নাই। তাই "মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে" ছাত্রদিগের নিকট যথাসম্ভব অল্পবেতন লইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; অধিকন্তু বিদ্যালয়ের আয় বিদ্যালয়ের উপকারার্থই ব্যয়িত হইত,—বিদ্যাসাগর সে অর্থ লইতেন না। এখন বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ের অনুকরণে যে বহু বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশের "পেশাদারী";—ব্যক্তিবিশেষের বা দুই তিন জন লোকের স্বার্থলাভের উপায়মাত্র। যে দয়া ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া বিদ্যাসাগর ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিতেন

জ্ঞানপিপাসুর পিপাসা-নিবারণ-কল্পে সুলভে উচ্চশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অধুনা-সংস্থাপিত বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশেরই সংস্থাপকগণ সে দয়া ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করেন নাই। অর্থাগমই সে সকল বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য, লোকশিক্ষা গৌণ উদ্দেশ্যমাত্র। তাই সে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার তেমন সুব্যবস্থা হয় না; শিক্ষক ছাত্রগণের গুরুতর অপরাধেও তাহাদিগকে শাসন করিতে শঙ্কিত,—পাছে তাহারা অন্য বিদ্যালয়ে চলিয়া যায়! অনেকের মতে এই সকল বিদ্যালয়ের কৃপায় ছাত্রগণ যে বিকৃত শিক্ষা পাইতেছে, তাহার ফলে তাহারা দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যাসাগর অর্থলাভ-লালসায় বিদ্যালয়-স্থাপন করিয়া ব্যবসা খুলেন নাই; লোকহিতার্থে বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া সুলভে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে স্বার্থ ছিল না; পরার্থ ছিল। হিন্দুর নিকট বিদ্যাদাতা বিশেষ পূজার্হ। অকাতরে বিদ্যাদান করিয়া বিদ্যাসাগর এ দেশের যে মহোপকার-সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে।

বিদ্যাসাগরের জীবনে কার্য্যবহুলতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অসাধারণ শ্রমশক্তি ও অদম্য উৎসাহ ব্যতীত বিদ্যাসাগর একাকী এত কার্য্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার সময়ের প্রায় সমস্ত স্থায়িফলপ্রদ অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার আন্তরিকতা হইতেই তাঁহার এই অসাধারণ কার্য্যকরী শক্তির উৎপত্তি। আন্তরিকতার উৎসমূলে উৎপন্ন হইয়া বিদ্যা-সাগরের কার্য্যকরী শক্তি শতধারায় প্রবাহিত হইত। তাহার পর,—প্রবাহিণীর পূত-প্রবাহ যেমন ঊষরভূমি শস্যশ্যামল করিয়া তুলে, বিদ্যাসাগরের কার্য্যকরী শক্তি তেমনই দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য করিত। বিদ্যাসাগরের কর্ম্মবহুল জীবনের আলোচনা করিলে, তাঁহার কৃতকর্ম্মের বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাঁহার অনন্য-সাধারণ আন্তরিকতা, তাঁহার আন্তরিক একাগ্রতা, তাঁহার অসাধারণ শ্রমশীলতা, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় তেজ ও তাঁহার আদর্শ স্বাবলম্বন দেখিয়া বিস্মিত হই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাহাতে বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব, যে সকল গুণে বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব—সেই সকল গুণই সাধারণ বাঙ্গালী-চরিত্রে একান্ত দুর্লভ। তাই আমাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব নিতান্তই বিস্ময়কর স্মরণীয় ঘটনা। তাই বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের ক্ষুদ্রত্ব দেখিয়া যখন লজ্জিত হই, তখন আমাদের ক্ষুদ্রত্বজ্ঞানোদ্ভূত লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে নিরাশার গাঢ়তম অন্ধকারমধ্যে আশারুণরাগপ্রকাশ অনুভব করি। মনে আশা হয়, যে জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, হয় ত সে

জাতির হৃদয়ে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই, হয় ত সে জাতির হৃদয়ে মহত্ত্বের শেষলেখা এখনও মুছিয়া যায় নাই, হয় ত কালের রহস্য-কুহেলি-চ্ছন্ন বিবরে সে জাতির পুনরুত্থান অসম্ভব নহে, হয় ত সে জাতির দুঃখদুর্গতির অমানিশীথে উন্নতির অরুণকিরণোজ্জ্বল আলোকরেখার শুভপ্রভাত-সূচনা বহুদূর নহে।

কমল যেমন জলতলবদ্ধ মূল হইতে উত্থিত হইয়া, সলিলরাশি ভেদ করিয়া, নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিয়া ভাস্করের ভাস্বর জ্যোতির দিকে চাহিয়া বিকশিত হয়, বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তেমনই দারুণ দারিদ্র্য হইতে উদ্ভূত হইয়া সংসারসংগ্রামে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির কনককিরণালোকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সৌরভে বঙ্গভূমির ইতিহাস চিরদিন সুরভি হইয়া থাকিবে।

সেই আপন মহিমায় আপনি সমুন্নত, আপন স্বাবলম্বনে আপনি স্বতন্ত্র, কর্ম্মরত, দানবীর, দয়ার সাগর, অমিততেজা মহাপুরুষ আর বঙ্গভূমিতে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাঁহার আদর্শ বর্ত্তমান। মরণে জীবনের অবসান হয়,—আদর্শের বিলোপ হয় না।

আশা করি, কালের সলিল-সেচনে একদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিদ্যাসাগরের অমূল্য চরিত্রের বীজ অঙ্কুরিত হইবে; তাহারই পরে আমাদের নিরুদ্ধপ্রায় জীবনীশক্তি সমাজ-শরীরে নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, এবং এই জড়ত্ব-শাপমুক্ত জাতি নূতন আশায়, নূতন আনন্দে, নূতন আগ্রহে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। সে দিন আমাদের নিকট বিদ্যাসাগরের বিরাট চরিত্রের মহান্ আদর্শ অন্ধকার নিশীথে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সঙ্কটসঙ্কুল বারিধিবক্ষে বহিত্রবাহীর চক্ষে ধ্রুব-তারার মত প্রতীয়মান হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মৃত্যু।*

ডাক্তার রোগীর জীবনের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। অনুগত পুরাতন ভৃত্য টম বিবর্ণ-নয়নে প্রভুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। প্রভুর জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাটি বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের পৃষ্ঠার মত তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। হায়, এত শ্রম, এত সেবা, এত অর্থব্যয়—সকলই নিষ্ফল হইল! তাহার চিরজীবনের সহচরস্বরূপ ভৃত্যবৎসল প্রভু আজ মৃত্যুর দেশে যাত্রা করিতেছে! টমের চোখদুটি জলে ভরিয়া আসিল। কয়েকটা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করিয়া একটা সিগার ধরাইয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরম্যান হাওয়ার্ড চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে টমকে দেখিয়া নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। টম নিকটে আসিলে ক্ষীণস্বরে কহিল, "ডাক্তার বলে, আমার জীবনের আশা নাই। কি ভয়ঙ্কর কথা টম! সত্যই আমি বাঁচিব না?"

খুব ঘন মেঘে যখন আকাশ ভরিয়া থাকে, তখন একটা দমকা বাতাসের আঘাত পাইলে মেঘ কাটিয়া সহসা যেমন প্রবল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হয়, প্রভুর এই কথা শুনিয়া টমের অন্তরের সমস্ত রুদ্ধ বেদন', রুদ্ধ শোক প্রবল হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার চোখ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া টম কহিল, "ডাক্তারের কথা কিছু নয়, একেবারে যদি আশা না থাকিবে, তবে শুশ্রূষার পরামর্শ দিবে কেন?" নরম্যান কহিল, "জনকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে?" জন নরম্যানের ভাগিনেয়। টম কহিল, "হয়েছে।" নরম্যান কহিল, "আঃ! বাঁচা গেল। সে-ই আমার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী! মৃত্যুর সময় তার এখানে থাকাটা প্রয়োজন। তোমার ও ডিক্সের সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্তের কথা উইলে লেখা আছে।" টম প্রভুর পানে চাহিয়া রহিল। নরম্যান আবার কহিল, "এখন একবার আমাকে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দাও, ভাব্‌বার এই সুন্দর মুহূর্ত্তটুকু শেষ হ'বার মত হয়েছে!"

টম ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দু' একটা পাখী তখন এক বৃক্ষের শাখায় বসিয়া প্রভাতী তান ধরিয়াছিল। অদূরস্থ 'টেনিসকোর্ট' সবুজ মসৃণ

* ইংরাজী গল্পের মর্ম্মানুবাদ।

মখমলে মণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছিল, এবং তাহারই পাশে তারের বেড়া ছাপিয়া গোলাপীরঙ্গের 'ওয়ালফ্লাওয়ার' সভা সাজাইয়া বসিয়াছিল! "টম!" টম ফিরিয়া চাহিল। নরম্যান কহিল, "এমা পিয়ার্সন কি এখনও ওখানে আছেন?" টম কহিল, "কাল ডাক্তারখানা যাইবার সময় গ্রীণ-পার্কে তাঁহাকে বেড়াইতে দেখিয়াছি।" নরম্যান একটু গম্ভীরস্বরে কহিল, "হুঁ; একবার তাঁর কাছে গিয়া বল, নরম্যান হাওয়ার্ডের মৃত্যুকাল উপস্থিত; এ সময় তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হ'তে পারে কি?" টম চলিয়া গেল। নরম্যান ভাবিতে লাগিল;—"মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তার দেখা পাব! আহা! স্বামী পুত্র নিয়ে সে সুখে থাকুক্, আমার এ ব্যর্থ জীবনের অবসান হোক্, ভগবানের কাছে ইহাই শুধু প্রার্থনা!" ভাবিতে ভাবিতে নরম্যান চক্ষু মুদিত করিল। তখন ধীরে ধীরে সেই কক্ষদৃশ্য, তাহার হোয়াটনট, আলমায়রা, চেয়ার, টেবিল, সোফা, ছবি প্রভৃতি লইয়া নরম্যানের দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইয়া গেল, এবং তাহার হৃদয়ে অতীতের একখানি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল: একখানি ছায়াশ্যামল আঁকাবাঁকা গ্রাম্যপথ অদূরে নদীর তীর অবধি বিস্তৃত হইয়াছে; তাহার একপার্শ্বে একখানি ছোট দোকানে আপেল, পীয়ার প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে; দোকানের পাশ দিয়া আর একটি পথ বাঁকিয়া গিয়াছে; সেই পথে একটি ছোট বাস্কেটহস্তে সুন্দরী কিশোরী-মূর্ত্তি! কিশোরীর সুনীল চক্ষু-তারকাদুটি মরকতের ন্যায় জ্বলিতেছিল। নরম্যান ধীরে ধীরে তাহার হস্ত স্পর্শ করিল; পরে উভয়ে মিলিয়া একটি ছোট বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাগানে অসংখ্য গোলাপগাছ তাহাদের সমগ্র ঐশ্বর্য্য বক্ষে লইয়া ঈষৎ গর্ব্বভরে দাঁড়াইয়া আছে! সেই বাগানের প্রান্তে একখানি ছোট কুটীর আইভিলতায় অলঙ্কৃত হইয়া ভ্রান্ত পথিককে স্বর্গশোভার আভাষ দিতেছে! সেই কুটীরে কিশোরীর সহিত নরম্যান প্রবেশ করিল। সেখানে খানিকটা হাসি ও অশ্রু, আলো ও ছায়া, বিজলীর অচিরপ্রভার ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! নরম্যান কিশোরীর গোলাপী-রঞ্জিত অধরে চুম্বন করিল, এবং কিশোরী নরম্যানের বক্ষে তাহার হাস্যদীপ্ত লজ্জানম্র মুখখানি লুকাইল। তাহার পর কত বিচিত্র বর্ণের চিত্র মায়াস্বপ্নের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নদীতীরে সুখের গান, প্রেমের কথা, পুলকের গৃহ, উচ্ছৃঙ্খল হাস্য—দু'জনের জীবন একখানি মিলনসূত্রের পবিত্র স্পর্শে কি অপূর্ব্ব সুখে, কি অতুল উল্লাসে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিবে, তাহারই আশাস্নিগ্ধ সুমধুর মোহসঙ্গীত! ইহার পর? ইহার পর দীর্ঘ বিরহ, আকুল সন্তাপ ও বিদায়ের বেদনা-ব্যথিত একটি অশ্রুময় মুহূর্ত্ত! স্মৃতি ও স্বপ্ন, ছবির পর ছবি উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। নদীর ধারে যেখানে উইলোর শাখা একটু ঘনবিন্যস্ত, তাহারই নিম্নে প্রেমিকদম্পতীর কাতরো-

ছুঁসে! কিশোরীর নয়নের একবিন্দু প্রেম-অশ্রু একটি নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ভাসাইয়া দিল! তাহার পর একদিন মুহূর্ত্তের মধুর মিলন! সোণার জলে ছাপা ছবির মত সমস্ত ঘটনা নরম্যানের হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল। নরম্যান অধরে একটা কোমল ও মৃদু চুম্বনস্পর্শ অনুভব করিল। ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, কৃষ্ণমধ্যে টম! টম কহিল, "নিসেস্ এমা পিয়ার্সন!" নরম্যান চক্ষু মেলিয়া চাহিল। টম কহিল, "এমা পিয়ার্সন!" নরম্যান দেখিল, এখন আর স্বপ্ন নহে! সত্যই এমা আসিয়াছে! এই মহাবিদায়ের দিনে তাহার যৌবনের জীবন-সহচরী মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে!

নরম্যান কহিল, "নিয়ে এস!" নরম্যান ভাবিল, তবে এমা আজও সেই নদীর তীর, সেই গোলাপকুঞ্জ, সেই ছায়া-নিবিড় গ্রাম্য পথখানি মনে রাখিয়াছে। হায়! সেই সুন্দর শুভ সুখময় অতীত!

২

ধীরস্বরে কম্পিতকণ্ঠে কে ডাকিল, "নরম্যান!" নরম্যান চোখ খুলিয়া কহিল, "এমা, এসেছ?" "হাঁ নরম্যান্, এসেছি" বলিয়া ক্ষিপ্রচরণে আসিয়া এমা সোফার নিকট জানু পাতিয়া বসিল। এমার মুখে বিষাদের একটা পাণ্ডুর রেখা পড়িয়াছিল। নরম্যান এমার পানে চাহিল, এমার শুষ্ক ওষ্ঠ কম্পিত হইল, নয়ন সজল হইয়া উঠিল, এবং তাহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া একটা তড়িতের প্রবাহ বহিয়া গেল। তাহার দীর্ঘশ্বাস-ব্যথিত অন্তরখানা নরম্যানের একটি কথার জন্য ক্ষুধার্ত্ত শিশুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নরম্যান এমাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। এমার অঙ্গে একটা চিক্কণ কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ ছিল, এবং তাহার বুকের উপর একটি পূর্ণবিকশিত গোলাপ নন্দনশ্রীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। নরম্যান কহিল, "বোধ হয়, ইহাই শেষ সাক্ষাৎ! তোমাকে না দেখিলে এ জগৎ থেকে বিদায় লওয়া আমার পক্ষে কঠিন হ'ত!" এমা তাহার বেদনার রাশিকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি সে নরম্যানের হাত দুখানা টানিয়া তাহার ভিতর আপনার অশ্রুসিক্ত মুখখানি লুকাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া নরম্যানের পানে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে এমা কহিল, "পনেরো বৎসর—ঠিক পনেরো বৎসর পরে তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ! পনেরো বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে প্রথম দেখি! সেই প্রথম দর্শনের দিন যে অতৃপ্তি তোমার বুকের মধ্যে হাহাকার ক'রে উঠেছিল, আজো তার অবসান হয় নাই!"

ক্ষীণ ও কাতরকণ্ঠে নরম্যান কহিল, "ক্ষমা কর এমা! আজ প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় দাও!" এমা অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না,—

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল, "বিদায়? কোথায় যাবে নরম্যান? তুমি কি জান না, তুমি চলে গেলে এ জগৎটায় বাস করা আমার পক্ষে কি দুঃসহ হবে!" নরম্যান কহিল, "এমা, তুমি যে আজও আমাকে ভুলতে পারনি, এ কি আমার পক্ষে কম সৌভাগ্য নয়!"

এমা কহিল, "তোমাকে ভুলব? তোমার জীবনে আমার জীবন!"

নরম্যান কহিল, "না এমা, তোমার স্বামী আছেন, পুত্র আছে,—"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে ক্ষিপ্রস্বরে এমা কহিল, "তাদেরও পূর্ব্বে আমার হৃদয় তুমি অধিকার করেছিলে! তোমাকে ভুলতে পারিনি, কখনো পারবো না। যদি তোমার জীবনের আশা থাকত, তা হ'লে এ সব কথা তোমাকে বলতুম না। কিন্তু আজ তুমি মরণপথের যাত্রী হয়েছ, তাই এ সব কথা তোমাকে বলতে সাহস পাচ্ছি! এ কথা এ জগতে কারো কাছে বলবার নয়!"

নরম্যান কহিল, "আমি ভেবেছিলুম এমা, তুমি আমাকে বহুদিন ভুলে গেছ! তাই সসঙ্কোচে আজ তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম!"

এমা কহিল, "এক বৎসর তোমাকে ভোলবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব বিফল হয়েছে।"

নরম্যান কহিল, "কিন্তু এমা, বিবাহ করে তুমি সুখী হয়েছ ত?"

"সুখী?—হাঁ, হয়েছি বই কি! স্বামী আমার দেবতা—তাঁকে আমি পূজা করি, সে পূজায় তৃপ্তিও পাই।"

"তবে আমাকে তুমি কেমন ক'রে ভালবাস?"

"বুঝলে না নরম্যান? এ ত অতি সহজ কথা, স্বামী যেন দেবতা, আমার অনেক উপরে! আমার সমস্ত দুর্ব্বলতা, অযোগ্যতা তাঁর করস্পর্শে ম্লান হয়ে পড়ে। যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকি, পবিত্রতার একটা পুলকহিল্লোলে জগতের কথা ভুলে যাই। তিনি আমার খৃষ্ট; আমি তাঁর নাগাল পাই না—শুধু পূজা করি, ভক্তি করি, কিন্তু তুমি আমার সহচর, আমি তোমাকে ভালবাসি!"

"তবে তাঁকে বিবাহ করেছিলে কেন?"

এমা ধীরে ধীরে কহিল, "ওঃ! নরম্যান, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে এলে, আর আমার বুকখানা একেবারে ভেঙ্গে গেল! তুমি ত জানতে, তোমার সঙ্গ আমার কত প্রিয় ছিল! মনে করো না, তার জন্যে তোমাকে আমি তিরস্কার করছি—হে আমার প্রিয়, যা ঘটেছিল, আমি শুধু তাই বলছি। তুমি বোধ হয়, আমাকে ভালবেসে সুখ পাওনি,—বুঝি ভেবেছিলে, আমাকে বিবাহ করলে তোমার মর্য্যাদা নষ্ট হবে। আমি কিন্তু তোমারি ছিলাম! তুমি বিবাহ করলে না,

সে সব কথা কি মনে পড়ে নরম্যান? তুমি নিষ্ঠুরের মত চলে গেলে! তখন আমার মনে হ'ল, তুমি বুঝি আমাকে পত্নীভাবে ভালবাসনি; মনে করেছিলে, বুঝি বিলাসিনী নায়িকার অভ্—উঃ! সে কথা থাক্, তাই বুঝি ঘৃণা ক'রে ফেলে চলে গেলে! আমার মনে হ'ল, আমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করতে তুমি সঙ্কুচিত! আ! সে কি মনঃকষ্ট! তাঁর উপর পিতার ভীষণ দারিদ্র্য, সেই সমস্ত বেদনা, দুঃসহ নির্জ্জনতার মধ্যে স্বামী যেন যীশুখ্রীষ্টের মত আবির্ভূত হলেন, তবু তোমাকে আমি ভুলিতে পারিলাম না।" এমা স্থির হইল; নরম্যান একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার বুকখানার মধ্যে এক রাশি ব্যথা যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। তাহার জ্যোতিহীন, মৃত্যুক্ষীণ চোখদুটি মুহূর্ত্তের জন্য ধ্বক্ ধ্বক্ করিতে লাগিল। এমা আবার কহিল, "আমার হৃদয়টা তখন যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট তরণীর মত হয়ে পড়েছিল। ভালমন্দ কিছুরই জ্ঞান ছিল না, সমস্ত ঘটনা যেন স্বপ্নের ন্যায় মনে হইতেছিল; প্রতি দণ্ডেই আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে নরম্যান, জেম্‌স্ মিষ্ট ব্যবহারে পিতার দারিদ্র্যদুঃখ-মোচনে অসীম করুণাপ্রদর্শনে ব্যথিতা বালিকার প্রাণে শান্তি ও মুক্তি আনিয়া দিল! জেম্‌স্ আমার জীবনের সমস্ত কালি মুছিয়া দিয়া, শুভ্রশুভ্র পবিত্রতা দান করিল, আমি তাঁহাকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রতিদানস্বরূপ সে আমার পাণি-প্রার্থনা করিল, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমার ভগ্নহৃদয় তাহার চরণপ্রান্তে আমি নিবেদন করিলাম। জেম্‌সের প্রতি আমার হৃদয়ের যে অনুরাগ, তাহা প্রেম নয়—সে শুধু করুণাময় সৌম্য-দেবতার প্রতি সরল ভক্তের কৃতজ্ঞতার প্রীতিময় আবেগ। হে আমার প্রিয় নরম্যান, আমাকে ঘৃণা করিও না, আমার হৃদয় বোঝ, অন্তর্য্যামী দেবতার মত আমার হৃদয় বোঝ, পাষাণহৃদয় সমালোচকের মত নিষ্ঠুর হইও না! তোমার ভালবাসা চাপা দিবার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা-যত্ন করেছি; কিন্তু দুর্ব্বল স্ত্রীলোক, কেবল পরাজিত হয়েছি! এক আকাশের নীচে তোমার সঙ্গে বাস করছি, এই চিন্তা-টুকুই আমার সান্ত্বনার অবলম্বন, তুমি আমাকে ফেলে যেও না—"

নরম্যানের হৃদয়যন্ত্রের সমস্ত তারগুলা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। গম্ভীরস্বরে নরম্যান কহিল, "কিন্তু এমা, আমাকে ভালবাসবার তোমার ত' এখন কোনও অধিকার নাই, তুমি এক জনের স্ত্রী, এবং সন্তানের মাতা!"

এমা করুণকণ্ঠে কহিল, "ভালবাস্‌বার অধিকার নাই? সে কি কথা? স্বর্গীয় ভালবাসায় অধিকার নাই? এ ভালবাসায় কোনও পরিমাণ নাই ত!"

অশ্রুমোচন করিয়া এমার হাত দুটি আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া নরম্যান

কহিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি, আর কোন স্ত্রীলোককে কখনও ভালবাসি নাই। তোমাকে যে বিবাহ করি নাই, তাহার কারণ, পিতার আদেশের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল নষ্ট বলিয়া। শেষে পিতার মত ফিরাইয়াছিলাম, কিন্তু বহু বিলম্বে; তখন আর তোমাকে পাইবার আশা ছিল না। আমার সমস্ত নিষ্ঠুরতা ভুলিয়া, আজ এমা, এ শেষদিনে আমাকে ক্ষমা কর। প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও, তোমার স্বামী-পুত্রের হৃদয়ে গরীয়সী দেবীর ন্যায় নিত্য বিরাজ করো। সত্য বল্‌ছি, আমি মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই।"

এমা কহিল, "এ জীবনের উপর জেম্‌সের অধিকার আছে, নচেৎ তোমার সঙ্গে আজ আমি মৃত্যুর আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশ করিতাম। এখন নরম্যান—" এমার স্বর গদ্‌গদ হইয়া আসিল, "এখন আমার একটি সাধ পূর্ণ কর, চিরজীবনের মত মনে রাখ্‌তে পারি, এমন একটা কিছু দাও।" এমা ধীরে ধীরে নিজের মুখখানি নরম্যানের মুখের নিকট লইয়া গেল। নরম্যান অনেকক্ষণ স্থিরভাবে এমার মুখপানে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে এমার কোমল অধরে চুম্বন করিল। এমার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎশিখা চমকিয়া গেল। এমাও নরম্যানের অধরে চুম্বন করিল।

নরম্যান কহিল, "এমা, এখন একবার বল, আমাকে মনে রাখিবে?"

এমা কহিল, "প্রিয়তম বন্ধু, তোমাকে কখনও ভুলিব না।"

নরম্যান এমার হস্তচুম্বন করিয়া কহিল, "এমা, সুখী হও,—সুখী হও, হে আমার প্রিয়তমা, স্বামীর প্রেমে সুখে থাক।"

সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। এমা ক্ষিপ্রচরণে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়িতে তাহার বুকের ফুলটা বিছানার উপর পড়িয়া গেল। নরম্যান কহিল, "থাক্, এটা আমার বুকের উপর থাক্।"

তাহার পর এমা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। নরম্যান কত কি ভাবিতেছিল। তাহার হৃদয় তখন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় উচ্ছলিত হইতে লাগিল।

৩

পরদিন ডাক্তার রোগী নরম্যানকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! সুসংবাদ, মিষ্টার লাওয়ার্ড, আপনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন; কোনও ভয় নাই।"

টম আনন্দপ্রদীপ্তনয়নে ডাক্তারের নিকট সরিয়া আসিল। নরম্যান কহিল,

"সে কি ডাক্তার, আমি যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। কাল আমার প্রিয়তম বন্ধুর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়াছি।"

ডাক্তার কহিল, "না, ভগবানের অনুগ্রহে ডাক্তারীশাস্ত্র আপনাকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় আসিব। টম, ঔষধ ও পথ্য যেন সযত্নে ব্যবহার করা হয়; এ সময়টা বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এখন তবে আসি মিষ্টার হাওয়ার্ড।"

সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আসিয়া কহিলেন, "নিরাপদ্! মৃত্যুর সাধ্য নাই যে, মিষ্টার হাওয়ার্ডকে স্পর্শ করে। সপ্তাহের মধ্যেই আপনি আরোগ্যলাভ করিবেন।"

টম আসিয়া কক্ষে আলো জ্বালিয়া দিল। আজ তাহার অন্তরটা কিঞ্চিৎ লঘু হইয়াছে; ভগবান তাহার আকুল প্রাণের আন্তরিক প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাহার সমস্ত শ্রম সফল হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে প্রভুর সোফার নিকট আসিয়া বসিল। নরম্যানও আজ তাহার শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল, "এ জীবনে প্রয়োজনই বা কি? আমার সমস্ত অতৃপ্ত সাধ, আশা, সম্ভবপর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এখন আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে এমার সুখ অসম্ভব। সে যে সব কথা কাল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছে, আমাকে দেখিলে সে সব কথা মনে করিয়া আপনাকে যথেষ্ট ঘৃণা করিবে। উঃ! এ বিছানায় শুয়ে থাকা অসহ্য বোধ হচ্ছে, এ কি, গোলাপফুল! আহা, এ যে এমার বুকে ছিল; আমিও বুকে রাখি। আঃ! কি তৃপ্তি! এমা! প্রিয়তমে! দেবী! তুমি সুখে থাক।" নরম্যানের হৃদয়ে সমস্ত ভাবগুলি যেন বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিল। নরম্যান ভাবিল, "জেম্‌স্ আমার খৃষ্ট, সে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে পবিত্র করিয়াছে, আমি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে রক্ষা করা সুকঠিন হইবে।"

"টম!" টম নিকটে আসিল। নরম্যান কহিল, "বড় দুর্ব্বল, একটু ঔষধ দাও।" টম গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া দিল। "না, শিশিটা দাও, ওটুকু ঔষধে হবে না।" টম সসঙ্কোচে কহিল, "বেশী দিতে ডাক্তার বারণ করেছে। ওটাতে মরফিয়া আছে, বেশী খেলে,—" "তোমার কোনও ভয় নাই। আচ্ছা থাক্, এখন খাব না, এখন একটু ঘুম আসছে। যদি বেশী দুর্ব্বল বোধ করি, তখন খাব। এখন তুমি আমার ঐ ড্রয়ারে যে চিঠিগুলো আছে, সেগুলি নীচে লইয়া গিয়া পোড়াইয়া ফেল। আর আলোটা একটু কমাইয়া দাও, দক্ষিণদিকের সার্শিটা খুলিয়া দাও, ঘরটায় একটু বাতাস আসুক। আঃ! এখন তুমি যাও, চিঠিগুলি পোড়াইয়া ফেল, বড় গোপনীয়।" প্রভুভক্ত ভৃত্য আদেশ-পালন করিতে গেল।

চন্দ্রের স্নিগ্ধরশ্মি কক্ষমধ্যে ছিন্নোল্লিত হইয়া পড়িল। বাহিরে তরুর শাখায় বসিয়া একটি নাইটিংগেল বড় সুন্দর তান ধরিয়াছিল। তখন নরম্যান শিশি হইতে অনেকখানি ঔষধ গ্লাসে ঢালিল, পরে ধীরে ধীরে কহিল, "এমা, তোমার সুখের জন্য আজ মৃত্যুর অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিলাম! তোমার সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত অপরাধ, সমস্ত দুঃখ আপনার শিরে বহন করিয়া চলিলাম। সুখে থাকো, হে আমার জীবনের আলো, তুমি চিরদিন পবিত্রশিখার আভায় উজ্জ্বল থাক। এ জগতে তোমার সুখের অন্তরায় আমি তোমার পথ ছাড়িয়া চলিলাম। দেবতার পূজায় আপনার জীবন সফল কর। আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া আমার জন্য কেবল একবিন্দু অশ্রু ফেলিও, ইহার অধিক আমি প্রত্যাশা করি না।"

* * * * * *

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে টম কক্ষে আসিয়া দেখিল, নরম্যানের মস্তক শয্যার পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, হাত দুইটা দিয়া বুকের উপর একটি গোলাপফুল সযত্নে চাপিয়া রাখিয়াছে। তাড়াতাড়ি শয্যায় তুলিয়া দিবার জন্য প্রভুর দেহ স্পর্শ করিতেই টম অনুভব করিল যে, দেহে প্রাণ নাই! নরম্যানের আত্মা তখন কোনও অজ্ঞাত অনন্তের পথে যাত্রা করিয়াছে! টম ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সুখের প্রবাস।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

৩

পর দিন প্রাতঃকাল হইতে স্বাধীনভাবে বেড়াইবার অবসর পাইলাম। আর মায়ের ডাকে এক স্থানে মিলিবার উপরোধ নাই। কয়েক দিন একায় বসবাস করিয়া কেমন একটু প্রাণের টান হইয়া পড়িয়াছিল; যানের নানা অসুবিধা সত্ত্বেও রোজ একবার করিয়া না চড়িলে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করিত। ইহাকেই বলে মায়ার বন্ধন। আর এটাকে খাঁটি স্বদেশী ভাব বলিয়া পাঠকপাঠিকা যদি বাহবা দেন, তবে নাচার। যাক্, দু' দিনের আলাপী একার মমতায় একদিনের তরেও আশৈশবসঙ্গী চরণযুগলের অনাদর করি নাই, তাহাদিগকে তাহাদিগের ন্যায্য দাবী দিতে কোনও দিনই কুণ্ঠিত হই নাই। বাস্তবিক, এইরূপ সমদর্শিতাই মহতের লক্ষণ।

পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই চেনা মুখ; কলিকাতার অর্দ্ধেক লোক সে কয়দিন কাশীতে অবস্থিতি করিতেছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হাঁহার মধ্যে কেহ কেহ সুপরিচিত, কেহ কেহ অর্দ্ধপরিচিত, মুখ চিনি, কিন্তু নাম জানি না; (সেটা ত আধুনিক সভ্যতার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। যাঁহারা একেবারেই অপরিচিত, তাঁহাদিগকে যেন পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি দেখিয়াছি বোধ হয়। আর ছাত্রদিগকে ত (বর্ত্তমান ও ভূত উভয়প্রকারই আছে) যে দিকে ফিরাই আঁখি, পাই দেখিতে, ছড়িঘড়িশোভিত, বিরাট অল্‌ষ্টারলম্বিত, শালের কম্‌ফর্টারজড়িত কলিকাতার বাবুদিগের-সবুটপদবিক্ষেপে কালভৈরবরক্ষিত পুরী সে কয়দিন টলটলায়মান হইয়াছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী তরীতরকারী বাজারে একবার করিয়া হাজিরা দেওয়া সকলেরই প্রাতর্ভ্রমণের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আত্মীয়ের গৃহে অতিথি হইয়া বেথরচায় দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন হইলেও বাজারে যাওয়ার প্রলোভন এড়াইতে পারি নাই। সখের সওদাও যে দুই এক দিন না হইয়াছে, এমন নহে। বাস্তবিক, সেই রাশীকৃত ফুলকপি, কড়াইসুঁটি, মূলা, বেগুন, কুল, পেয়ারা দেখিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফেরা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ না হইলে সম্ভবপর নহে। মূল্যও যৎপরোনাস্তি সুলভ, কলিকাতার তুলনায় ত এক রকম বিনামূল্যের ব্যবস্থা। তবে কাশীর বাসিন্দাকুল এ কয় দিন কলিকাতার বাবুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাজার গরম হওয়াতে তাঁহারা বড়ই অপ্রসন্ন। আমিও ক্রেতার দলে মিশিয়া দরচড়ানর কার্য্যে সহায়তা করাতে (যাহাকে দণ্ডবিধি আইনে, Aiding and abetting বলে) আত্মীয়গণের কাছে মৃদুভৎর্সনা খাইয়াছি। যাহা হউক, স্থানীয় লোকের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া কলিকাতার বাবুরা বড় বড় রুই, কাতলা ও ফুলকপি ঝাঁকা বোঝাই করিতেছেন ও দানশৌণ্ডতার পরিচয় দিয়া ইতরভদ্র সকলকেই চমৎকৃত করিতেছেন। ইলিসমাছও হেথায় অপর্য্যাপ্ত, মূল্যও অতিসুলভ, এক পয়সা দু' পয়সায় ডিমভরা ইলিস, লোভসংবরণ অসম্ভব। তবে সেগুলি রসায়ন-শাস্ত্রের অম্লজান জলজান প্রভৃতির ন্যায় স্বাদহীন, গন্ধহীন, তাহা এই আমিষ "দিল্লীকা লাড্ডু" খরিদারগণ 'পিছে মালুম' করিয়াছিলেন। যাক্, সে ত ভূতে পশুন্তি'র কথা। কলিকাতায় ফিরিবার সময় কাশীর বাজার উজাড় করিয়া ঝুড়িবোঝাই ফুলকপি, কুল পেয়ারা লইয়া লকলেই গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, এবং রেলওয়ে কোম্পানীকে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া কাশীভ্রমণ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি করিয়াছিলেন।

কার্ মাইকেল লাইব্রেরী নামক সাধারণ পুস্তাকাগারে একবার করিয়া 'ধন্নল' দেওয়াও প্রায় সকলেরই প্রাতর্ভ্রমণ বা সান্ধ্য-ভ্রমণের একটা অঙ্গ ছিল। এখানে আসিলে দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সারসংগ্রহ করা যায়; এই উদ্দেশ্যে এখানে হাজিরা

দেওয়া। কথায় বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; সেইরূপ এখনকার সভ্য মানব দুদিন চারদিনের জন্যও যেখানে যায়, সেখানে দিনকার দিন দুনিয়ার সংবাদ না জানিলে মনের খুঁতখুঁতনি যায় না। পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখাশুনা ও মেলামেশাও এই পুস্তকাগারে আসিবার আর এক উদ্দেশ্য। মানুষ নূতনের মধ্যেও পুরাতনের মায়া একেবারে কাটাইতে পারে না। কলিকাতায় ইডেন-উদ্যান বা গোলদীঘি, লালদীঘি, হেদুয়া প্রভৃতিস্থানে বায়ুসেবন যাঁহাদের চিরাভ্যস্ত, তাঁহারা স্থানীয় পার্কে যাইতেন। সহরের দুই প্রান্তে দুইটি পার্ক আছে; তবে সেগুলি এত প্রশস্ত ও পরিপাটী নহে, একটি ত হালে তৈয়ার হইতেছে। যাহা হউক, কাশীতে আসিয়া অতি অল্প লোকেই পার্কে বায়ুসেবন করিতে উৎসুক। গঙ্গার বাঁধাঘাটেও অনেকে বৈকালে বসিতেন, এবং সাধুদণ্ডীদিগের শাস্ত্রালাপ শুনিতেন। ইহার মধ্যে দশাশ্বমেধঘাটে একটি মন্দিরের চাতাল বসিবার পক্ষে সর্বোত্তম স্থান। এ সব স্থানে সাধারণতঃ প্রবীণ লোকই আসিতেন; উদ্যমশীল যুবক ও প্রৌঢ়েরা এদিক্ সেদিক্ বেড়াইতে ও পাঁচ রকম নূতন জিনিস দেখিতে ব্যস্ত থাকিতেন। যাক্, কাশীপ্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস লেখার ভার আমার উপর কোনও সাহিত্যসমাজ দেন নাই। ও সব কথা ছাড়িয়া দিয়া অতঃপর আমার নিজের কাহিনীই বলি।

প্রাতে উঠিয়া যে দিকে দুই চক্ষু চায়, সেই দিকে বাহির হইয়া পড়িতাম। বৈকালেও সেই নিয়ম। সাহিত্যপরিষদের, উদ্যোগে প্রকাশিত 'কাশীপরিক্রমা'খানি সঙ্গেই ছিল; কাশীর অস্থিসন্ধি সম্বন্ধে ইহা হইতে অনেক কথা জানিয়াছিলাম। দেবালয় দেখিবার ইচ্ছা হইলে এখানি ডাইরেক্টরীর কাজ করিত। একদিন অজানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অসিসঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় জগন্নাথদেব ও নৃসিংহদেবের দর্শনলাভ করিলাম। আর একদিন অন্য দিকে যাইতে যাইতে কপির ক্ষেতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছি বলিয়া মনকে আশ্বস্ত করিতেছি, এমন সময় কামাখ্যা, বৈদ্যনাথ ও বটুকভৈরবদর্শনলাভ ঘটিয়া গেল। আর একদিন ঠাকুরদাদা মহাশয়কে লইয়া সাজিয়া গুজিয়া বরুণাসঙ্গম ও আদিকেশবমূর্ত্তি দেখিতে রওনা হইলাম। রাজঘাট ষ্টেশন পর্য্যন্ত একায় গিয়া অবশিষ্ট পথটুকু পদব্রজে যাওয়া গেল। পথও বেশী নহে, প্রোগ্রামের বাহিরে খড়্গবিনায়ক প্রভৃতি আরও দুই একটি দেবদর্শন ঘটিল। ঠাকুরদাদা মহাশয় যদিও কাশীবাসী, তথাপি এ অঞ্চলে তাঁহার বড় গতিবিধি ছিল না; নূতন দেবস্থান দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল, এবং আমার কল্যাণে এই সৌভাগ্য হইল বলিয়া আমাকে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহা ছাড়া বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, কেদারেশ্বর, দুর্গাবাড়ী, সঙ্কট-

মোচন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবদেবী ও দেবালয় দর্শন, বিন্দুমাধব দর্শন ও 'বেণীমাধবের ধ্বজা'য় আরোহণ (বাস্তবিক এইটি মুসলমান সম্রাটদের উপর নির্ম্মিত 'মনুমেণ্ট') ও অন্যান্য বহুদেবতা ও দেবালয় দর্শন নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে গোপালমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথায় দেবতার ব্যবহারের আসবাবগুলি বহুমূল্য ও সুদৃশ্য; দিনের মধ্যে অনেকবার দেবতার আবাহন আরতি প্রভৃতি হয়, সে দৃশ্যও অতি মনোহর; এই পুরীর কোনও না কোনও অংশে হিন্দুপুরাণোক্ত সকলরূপ দেবতারই পীঠস্থান আছে। ইহাতে বারাণসী হিন্দুস্থানের সংক্ষিপ্তসার, সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর কেন্দ্রস্থলীয় তীর্থ, তাহা বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলাম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন পরিচ্ছদের নরনারী দেখিয়াও এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। দেবদর্শনের প্রথমে বিশ্বেশ্বরের আরতির কথা লিখিলাম না দেখিয়া অনেক পাঠকপাঠিকা বিস্মিত হইবেন। পূর্ব্ব-প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলিয়াছি, ঘুষ বা ঘুঁষির সাহায্য ব্যতীত ভিড় ঠেলিয়া এই উদাত্তভাবোদ্দীপক দৃশ্য দেখা অসম্ভব। কাজেই এ মোহন দৃশ্য দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

কাশী হইতে কয়েক মাইল দূরে সারনাথ নামক স্থানে বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও সারনাথেশ্বর নামক শিববিগ্রহ কৌতূহলের সহিত দর্শন করিয়াছি, এবং সন্নিকটবর্ত্তী আধুনিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রগৃহে অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিয়াছি। তবে তাহার বিবরণ দিতে রাজী নহি। প্রত্নতত্ত্বের ধার-করা বিদ্যা জাহির করিয়া বাহাদুরী লইতে চাহি না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া দেবদেবী ও দেবালয়ের কথা বলিলাম। পাঠকপাঠিকা বুঝিয়া না বসেন, লেখক নিতান্ত সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক, প্রত্যহ 'যাত্রা' করাই লেখকের সাধু উদ্দেশ্য। ভাবিলে লেখকের উপর অযথা পক্ষপাত (বা মতান্তরে অযথা দোষারোপ) করা হইবে। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে যে দিন সম্মুখে যাহা পড়িয়াছে, তাহাই দেখিয়াছি; তবে তীর্থক্ষেত্র বারাণসীধামে দেবালয়ের প্রাচুর্য্য, কাজেই সেগুলি দেখা আপনা হইতেই ঘটিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য, এগুলি দেখিলে পুণ্য না হউক, অন্ততঃ কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়াতে পাপসঞ্চয় ও আত্মার অধোগতি হইল, সে বিকট গোঁড়ামি লেখকের নাই। দেবতার নাম-গন্ধ নাই, এরূপ দর্শনযোগ্য স্থান বা জিনিস দেখিতেও কসুর হয় নাই। লেখক যখন ব্যবসায়ী, তখন ভারতহিতৈষিণী ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট প্রতিষ্ঠিত কলেজ-স্কুল-যন্ত্রাগার ছাত্রাবাস ও তৎসহলগ্ন প্রশস্ত ক্রীড়ার মাঠ ও সরকারী কুইন্স কলেজ বার বার করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। কলেজ দুইটির একটী প্রাচীন, অপরটি

আধুনিক। আধুনিক কলেজটি প্রশস্ত, অধিষ্ঠাত্রীর কর্ম্মশীলতা ও ভারতহিতৈষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়; কিন্তু স্থাপত্যশিল্পের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে কুইন্স কলেজ, বিশেষতঃ কলেজের হলঘর অতুলনীয়। ভারতবর্ষের অন্য কুত্রাপি এরূপ সুদৃশ্য কলেজ নাই। বাড়ীটি যেন ছবিখানি। এরূপ স্থানের বাতাসেও যেন বিদ্যাচর্চ্চার সহায়তা করে। হায়! ইহার তুলনায় আমাদের কলিকাতার কলেজগুলি (এমন কি প্রেসিডেন্সি কলেজও বাদ পড়ে না) কি কুৎসিত! বিদ্যার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্যই যেন এ গুলির সৃষ্টি। যাক্, ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া জাতব্যবসার কথা উঠিয়া পড়িল। কলেজ দুইটি ছাড়া আরও দর্শনযোগ্য জিনিস আছে, সে দুইটি কূয়া, নাম 'গৈবী'। এই কূয়ার জল খাইলে না কি পরিপাকশক্তি আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পায়। এই জন্য অনেক অম্লরোগী কলিকাতার বাবু কাশীপ্রবাসকালে প্রত্যহ কলসী ভরিয়া এখানকার জল লইয়া যান, এবং যথেচ্ছ পান করেন। ইহার মধ্যে যেটি বেশী প্রসিদ্ধ, সেটি শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের কলেজ ছাড়াইয়া মাইল খানেক তফাতে; স্থানটি নিরালা ও পাহাড়িয়া; দ্বিতীয়টিও নিরালা জায়গায়, কিন্তু চতুর্দ্দিকের দৃশ্য তত সুন্দর নহে। উভয় স্থানে কুস্তির আখ্‌ড়া আছে, সাধু-সন্ন্যাসীও থাকে। কূয়ার নিকট জুতা-পায়ে যাইতে নিষেধ, তথায় গেলেই সাধুর চেলারা জল তুলিয়া আল্‌গোছে মুখে ঢালিয়া দেয়, যত ইচ্ছা পান করিতে পার। হাল ফ্যাশনের লোকের পক্ষে এটা বড় ঝকমারি; সঙ্গে ঘটী-গেলাস লইয়া গেলে আর এ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। চেলাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কিছু দিলে তাহা সাধু-সেবায় নিয়োজিত হয় ও দাতার দানও সার্থক হয়। আমরা কয়েক জনে উভয় স্থানে গিয়াছিলাম, এবং উদর পূরিয়া জল পান করিয়াছিলাম; তবে বিশেষ কি উপকার হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। হইতে পারে, ইউরোপে স্থানে স্থানে যেরূপ mineral water আছে, সেইরূপ মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী সীতাকুণ্ডের জলের ন্যায় এই জলেরও উপকারিতা আছে। সকলই ত দ্রব্যগুণ।

হজমী জলের কথা বলিয়া কাশীর খাদ্যসুখের কথা না বলিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। ফুলকপি, কড়াইসুঁটি, মূলা, বেগুন, কুল, পেয়ারা ও রুই, কাতলা, ইলিশের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলের পাঠক-পাঠিকাকে 'খাবারে'র কথা না বলিলে কিছুই বলা হইল না। কেন না, খাবারই তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ। এখানকার ঘৃতপক্ক খাবার অতি সুখাদ্য, কলিকাতার ন্যায় ঘৃতের কাজ অনুকল্পে বাদামের তৈলে সম্পন্ন হয় না; খাবার প্রস্তুত করার কালে ঘৃতের সদ্ধাঘ্রে উদরপরায়ণ ব্যক্তির জিহ্বায় লালাসঞ্চার হয়। বাঙ্গালীটোলায় যথেষ্ট খাবারের

দোকান আছে, কিন্তু এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাবার 'কচুরি গলি'তে (সার্থকনামা বলিতে হইবে) পাওয়া যায়। কচুরিগলির মাবড়ি ও মালাই উপাদেয়; ছানার সন্দেশ কেবল বাঙ্গালীটোলায় মিলে। নানরূপ সুখাদ্যের নাম করিলে পাঠক-পাঠিকার অবস্থান্তর ঘটিতে পারে, অতএব আর কথা বাড়াইলাম না। এখানকার 'নান্‌খাতাই' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানশিক্ষার ন্যায় এ সম্বন্ধেও লিখিত উপদেশ অপেক্ষা হাতে মুখে পরখ করাই বিশেষ ফলোপধায়ক। তজ্জন্য বিস্তর লিখিয়া পুঁথি বাড়াইব না। বাস্তবিক কাশী ত্যাগীর পক্ষে যেরূপ উপযুক্ত স্থান, ভোগীর পক্ষেও সেইরূপ উপযুক্ত।

৪

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, আর একদিনের কথা বলিয়া উপসংহার করি। এই দিনের প্রোগ্রাম কাশীর অপরপারস্থিত রাজনগর (কাশীনরেশের রাজধানী) দেখা, এবং সুবিধা ও সম্ভব হইলে ব্যাসকাশী পর্য্যন্ত যাওয়া। ঠাকুরদাদা মহাশয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, অপর এক জন আত্মীয় ও পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ের চাকর ও পাচক, সবশুদ্ধ আধ ডজন লোক হইল; ফাউস্বরূপ পূর্ব্বোল্লিখিত আত্মীয়ের একটি পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রকে হাওয়া খাওয়াইতে লওয়া হইল। বালকটি অনেক দিন রোগে ভুগিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আনীত হইয়াছে, এখন শরীর সারিয়া উঠিতেছে। মধ্যাহ্নভোজন ও দিবানিদ্রার পর বেলা তিনবার সময় দশাশ্বমেধঘাটে গিয়া এক-খানি নৌকা যাতায়াতের জন্য ভাড়া করা গেল, এবং নৌকায় উঠিয়া যথাসময়ে পরপারে পৌছান গেল। রাজবাড়ীর সজ্জিত ঘরগুলি ও বহুমূল্য আসবাব দেখিতে বড় বিলম্ব হইল না। ম্যানেজার বাবুর উপর এক জন কাশীস্থ উকীল বন্ধু চিঠি দিয়াছিলেন, সেই খাতিরে তিনি এক জন আর্দ্দালিকে ঘরগুলি দেখাইবার জন্য মোতায়েন করিয়া দিলেন, তাহার সাহায্যেই কার্য্য সহজেই নিষ্পন্ন হইল। পারিশ্রমিকস্বরূপ আর্দ্দালিকে কিঞ্চিৎ দিয়া হাসিমুখে বিদায়গ্রহণ করি-লাম। ঠাকুরদাদা মহাশয় ক্ষীণজীবী মানুষ, বয়সও হইয়াছে, এইটুকুতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আর আমাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন না, ফিরিয়া গিয়া নৌকায় আশ্রয় লইলেন; এবং আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে বলিয়া আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন অপরাহ্ণ।

রাজবাটী হইতে আমরা রামনগরের দুর্গামন্দির দেখিতে রওনা হইলাম, এবং খানিক পথ সহরের ভিতর দিয়া ও খানিক পথ মেঠো রাস্তা দিয়া গিয়া মন্দিরে

উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি সুন্দর, ইহার উচ্চচূড়া অনেক দূর হইতে দেখা যায়, কাশী হইতে ইহা সুস্পষ্ট দেখা যায়, মোগলসরাই ছাড়াইয়া ট্রেনে আসিতে আসিতেও ইহা দূর হইতে লক্ষ্য হয়। কাশীতে রামনগরের রাজার একটি কালীমন্দির আছে। (গোধূলিবা নামক মহল্লার নিকট)। উভয় মন্দিরের গঠনপ্রণালী ও কারু-কার্য্য একই প্রকারের। দরজাগুলি কাষ্ঠের খোদাই-কার্য্য সুশোভিত, মন্দিরগাত্রে নানারূপ দেবদেবী ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতিকৃতি কোদিত। বোধ হয়, দেবলোকের কোন ও সঙ্গীত-মহোৎসব সূচিত হইয়াছে। মন্দির দেখিয়া, এতটা পথ হাঁটিয়া আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলাম। তৃষ্ণার্ত্ত হওয়াতে পূজকদিগের নিকট চাহিয়া শীতল জল পান করা গেল। মন্দিরের সন্নিকটে চারি দিকে বাঁধান প্রশস্ত পুষ্করিণী ও তাহার পার্শ্বে বিশ্রামবাটিকা। ইহার লাগাও একখানি ফলের বাগান, আয়তনে প্রকাণ্ড। অকুতোভয়ে বাগানে প্রবেশ করা গেল, এবং সমস্ত বাগান তন্ন তন্ন করিয়া দেখা গেল। কোথাও আমের বাগান, কোথাও পেয়ারার বাগান, কোথাও অনেক দূর জুড়িয়া সারি সারি কমলা (বা নারাঙ্গ) লেবুর গাছ, কোথাও কণ্টকাকীর্ণ কুলগাছ জঙ্গল করিয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে লেবু গাছেরই বাহার বেশী, স্বর্ণবর্ণ লেবু থরে থরে গাছে ঝুলিতেছে, ঘন পল্লবের মধ্য হইতে প্রদোষকালের আবছায়া অন্ধকারে যেন স্বর্ণদীপের ন্যায় জ্বলিতেছে দেখিয়া নয়ন-মনের তৃপ্তি হইল, এবং association of ideas নামক নিয়মের প্রভাবে অন্য আর একটি ভোগলিপ্সা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এক জন সুধী বহু সাধ্যসাধনায় মালীদিগের নিকট হইতে এই মধুর অম্লরস-পূরিত ফল একটি পাইবার চেষ্টা করিলেন, এবং তজ্জন্য ন্যায্য মূল্য দিতেও প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তাহারা নিতান্তই নারাজ। অবশেষে তিনি ক্রয় ও যাচ্ঞা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভের আরও যে একটা তৃতীয় পন্থা আছে, তাহাই অবলম্বনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তবে তাহার তত সুবিধা পাইলেন না বলিয়াই হউক (কেন না, প্রহরী বড় সতর্ক) অথবা মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হওয়াতেই হউক, সে কার্য্যসাধনে অবশেষে নিরস্ত হইলেন। উদ্যানসংলগ্ন সুদৃশ্য ও সুপরিসর প্রাসাদে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নির্গত হইলাম, এবং ব্যাসকাশীর উদ্দেশে লঘু-পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অপরিচিত পথ, তাহা আবার মাঠের ভিতর দিয়া, প্রতিপদে লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইতে হইল; কাজেই বহুবিলম্ব ঘটিতে লাগিল। স্থানটিও অন্ততঃ ৪।৫ মাইল দূরে। ইহা ছাড়া পথে নানারূপ প্রতিবন্ধক ঘটিতে লাগিল। কুলগাছ দেখিলেই সঙ্গীরা আর স্থির থাকিতে পারেন না,

স্বভাবের নিয়মে ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য গাছে চড়িয়া বসেন ; ইক্ষুক্ষেত্র দেখিলেই স্বাদু ইক্ষুদণ্ড-সংগ্রহে ব্যস্ত। ভাগ্যে সঙ্গের বালকটি সুবোধ, এবং বুদ্ধি করিয়া মিছরি, বাতাসা, বিস্কুট প্রভৃতি রোগীর খাদ্য পকেট বোঝাই করিয়া আনা হইয়াছিল, নতুবা নানারূপ কুপথ্যভোজনে তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনিত হইয়া পড়িত। এইরূপে অগ্রসর হইয়া অবশেষে বহুদূর আসিয়া পড়া গেল ; যেখানেই মানুষ দেখা যাইতেছিল, সেখানেই 'ব্যাসকাশী আর কত দূর' ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করা হইতেছিল ; শেষে এক স্থানে আসিয়া শুনা গেল, ব্যাসকাশী পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি ! কথাবার্ত্তার স্ফূর্ত্তিতে যথাসময়ে স্থানটি লক্ষ্য করা হয় নাই। আবার সেখান হইতে পিছু হাঁটিতে আরম্ভ করা গেল। এবার ইন্দ্রিয়গ্রাম খুব সজাগ রাখা গেল, পাছে আবার স্থানটি ফেলিয়া বেশী দূর চলিয়া যাই। অল্পক্ষণ পরেই অভীষ্ট স্থানে পঁহুছিলাম। কিন্তু স্থানটি দেখিয়া হরিভক্তি উড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র একটি ইষ্টকময় গৃহে ব্যাসেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজমান, আশে পাশে দুই একটা দোকান-ঘরের মাটীর দেয়ালের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, দেখিবার কিছুই নাই। বুঝিলাম, এ স্থলে মরিলে কেন, এ স্থানে আসিলেও গর্দ্দভজন্মলাভের ভাবী সম্ভাবনা বিলক্ষণ ; কেন না, এরূপ কদর্য্যস্থানে আসার চেষ্টাই নির্ব্বুদ্ধিতা। শুনিলাম, এখানে একদিন মেলা উপলক্ষে লোকসমাগম হয়। অবশিষ্ট সময় ভোঁ ভোঁ। যাহা হউক, পথ অল্প হাঁটা হয় নাই, ফিরিবার তাড়া থাকিলেও তথায় একটু বেশীক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া উঠিতে পারা গেল না।

এইবার ফিরিবার পালা। নূতন স্থান দেখার কৌতূহলে যেরূপ দ্রুত আসা গিয়াছিল, যাইবার সময় ততটা বেগ রহিল না ; আর তখন অন্ধকারও বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে ; অপরিচিত স্থান, তবে নিকটে ঝোপ-জঙ্গল না থাকাতে হিংস্রজন্তুর ভয় ছিল না। ফাঁকা মাঠ, পৌষমাসের হাওয়া, পথ হাঁটিয়া বেশ স্ফূর্ত্তিবোধ হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে এক আখের 'বানে' পঁহুছান গেল। সঙ্গীদের অমনি টাটকা ইক্ষুরস পান করিবার প্রবৃত্তি চাগিয়া উঠিল। আমিও বড় গররাজী নহি, কাজেই তথায় ডেরাডাণ্ডা ফেলা গেল। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কৃষকগৃহস্থের নিকট ঝক্‌ঝকে একটি ষারম্যান-সিল্‌ভারের গ্লাস (কাশীতে এই মিশ্রধাতুর বাসন যথেষ্টপরিমাণে নির্ম্মিত হয়) লওয়া গেল, এবং অল্প পয়সায় বিলক্ষণ আরাম করা গেল ; বোধ হয়, নেশাখোরদের স্ফূর্ত্তিও ইহা অপেক্ষা বেশী জমে না। সরল কৃষকের সঙ্গে দু' একটা মিষ্টালাপের পর উঠিবার উদ্যোগ করা যাইতেছে, এমন সময় লক্ষ্য হইল যে, পাচক ব্রাহ্মণটির হাতের ছাতাটি নাই। লোকটি কিছু বোকা রকমের, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়াও তাহার স্মৃতি-

শক্তি উদ্ভূত করা গেল না। আমাদের সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্যাগকাশাতে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশ্রাম করা হইয়াছে, তথায়ই সম্ভবতঃ ছাতাটি ফেলিয়া আসিয়াছে। তবে সেটি এখনও তথায় আছে কি না, অথবা কোনও কুলতলায় বা আখের ক্ষেতে পড়িয়াছে কি না, তাহার কোনও মীমাংসা করা অসম্ভব। আবার ফিরিয়া ব্যাগ-কাশী যাওয়া যাইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক উঠিল। এমন স্ফূর্ত্তির ভ্রমণে ছাতা হারাইয়া বোকা আনা সুখের অঙ্গহানি হইবে, ইহা বরদাস্ত হইল না; 'ছাতুর দেশে ছাতা হারাইয়া বোকা বনিয়া যাওয়া নিতান্ত কাপুরুষের লক্ষণ, ইত্যাদি বিবেচনায় নষ্ট-ছত্র উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাসকাশী-অভিমুখে ফেরাই স্থির হইল। পথে আখের ক্ষেতে ও কুলতলায়, অন্ধকারে যতটা সম্ভব পাঁতি পাঁতি করিয়া সন্ধান করা গেল। অবশেষে ব্যাসেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দিরে উপনীত হইয়া সবিস্ময়ে ও সহর্ষে দেখা গেল, মন্দিরের 'রকে'—যেখানে আমরা বিশ্রাম করিয়াছিলাম,—ছাতাটি পড়িয়া যেন সঙ্গীহারা হইয়া বিমর্ষভাবে ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। অতি সমাদরে ছাতাটি ধূলা ঝাড়িয়া কুড়াইয়া লওয়া হইল; কবিসুলভ কল্পনা ও সুকুমার মনো-বৃত্তি পাইলে আমরা বোধ হয় হারানিধিকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদিও করিতে ছাড়িতাম না। অন্ধকারে ইহা অপর কাহারও নয়নগোচর হয় নাই বলিয়াই হউক, অথবা ব্যাসেশ্বর 'জাগ্রত' দেবতা বলিয়াই হউক, ছাতাটি অক্ষত-শরীরে পাইয়া আমাদের স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণ হইতে চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়াইল; ক্ষণিক উদ্বেগ দূর হইয়া আনন্দের স্থায়িভাব হৃদয় অধিকার করিল। মহাস্ফূর্ত্তিতে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করা গেল।

এবার কিন্তু বড় মুস্কিল। একে ত অচেনা পথ, তাহাতে নিবিড় অন্ধকার। পথ হারাইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তবে ভরসা, আমরা দলে পুরু আছি, আর সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ মজুত, নল রাজা বিনা ইন্ধনে পাক করিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে আমাদের পাচকপ্রবরও কি বিনা উপকরণে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিতে পারি-বেন না? এক জন সঙ্গী-পথিপার্শ্বস্থ কৃষককুটীর হইতে বাঁটের মুখের খাঁটী দুধ সংগ্রহ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সঙ্গে কোনওরূপ পত্র না থাকাতে সে সাধু ইচ্ছা উষায় 'দি' লীন হইল। দুর্গা-মন্দিরের উচ্চচূড়া লক্ষ্য করিয়া ডেলা ঠেলিয়া চষা-ভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। কলিকাতার ন্যায় কাশী-তেও মাটী কিনিতে হয়, এই প্রসঙ্গ উঠাতে কাশীর আত্মীয়টি পাচক ঠাকুরকে কয়েকটি ডেলা বাঁধিয়া লইতে বলিলেন। নির্ব্বোধ লোকটি উপহাস না বুঝিয়া সত্য সত্যই তাহা করিল যাহা হউক, বিলক্ষণ আয়াসের পর ক্রমশঃ দুর্গামন্দিরে ও তৎপরে রামনগরে পৌঁছান গেল। রামনগরে পৌঁছিয়া কাশীর আত্মীয়টি চলন্ত

অবস্থাতেই আমাদিগকে নানারূপ উদ্ভট খাদ্য কিনিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রহরেক হইলে রামনগরের ঘাটে নৌকায় আসিয়া জমা গেল। অসঙ্গত বিলম্বে মাঝীদিগের বকাবকি পাঠক-পাঠিকা অনুমান করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু ঠাকুর-দাদা মহাশয়ের তিরস্কার আরও সাংঘাতিক, তাহা অবর্ণনীয় ও অননুধাবনীয়। পৌষের দুরন্ত শীতে রাত্রিকালে নদীবক্ষে অনাচ্ছাদিত নৌকায় বৃদ্ধ ক্ষীণজীবী ঠাকুরদাদা মহাশয় নিরবলম্ব হইয়া বালাপোষ মুড়ি দিয়া বসিয়া আছেন, ঘণ্টার উপর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে, আমাদের প্রত্যাগমনের কোনও লক্ষণ নাই, হয় ত কোন অনিশ্চিত বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া গৃহকর্ত্তার অভ্যস্ত উৎকণ্ঠায় মন অবসন্ন, তাহার উপর আবার 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ' আফিঙের কৌটাটি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা ফিরিতেই আমাদের উপর খুব এক চোট লইলেন, বোধ হয়, তাহাতে আফিঙের অভাব কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইল। আমরা অবশ্য ন্যাকা সাজিয়া পথহারা হইয়াছিলাম, তাহাতেই এত বিলম্ব, এই অজুহাত দিলাম। প্রতি-পক্ষ শান্ত হইলে নৌকা ছাড়িয়া দিল, এবং ঘণ্টাখানেক পরে দশাশ্বমেধঘাটে পৌঁছিলাম। মাঝীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া গৃহাভিমুখীন হইলাম। বালকটি সুষুপ্ত অবস্থায় চাকরের স্কন্ধে বাহিত হইল। আপাতমনোরম পরিণামবিষম নৈশবিহারে হিমভোগ করিয়া হয় ত সকলেই অসুস্থ হইয়া পড়িব। বিশেষতঃ বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা মহাশয় ও সদ্যোরোগমুক্ত বালকটি-সম্বন্ধে বিলক্ষণ আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, পরদিন প্রাতে কাহারও সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশিত হইল না। বাঙ্গালা দেশের আব-হাওয়ার সঙ্গে কি আশ্চর্য্য প্রভেদ!

এই দিনকার সুখস্মৃতি অনেক দিন মনে থাকিবে, এবং কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অব-সাদমুহূর্ত্তে সেই স্ফূর্ত্তির কথা মনে পড়িলেও আবার নূতন করিয়া স্ফূর্ত্তিবোধ হইবে। এই দিনটিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধের শীর্ষে 'সুখের প্রবাস' কথা কয়টি বসাইতে সাহসী হইয়াছি। পাঠকপাঠিকার দু-দণ্ডের জন্য আনন্দলাভ হইলেই এই অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-কাহিনী বিবৃত করিবার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গবাসিনীর প্রতি।

[বরণস্ হইতে অনূদিত।]

১

নিশা অবসান-প্রায়,
দীপ্তিহীন ক্ষীণকায়,
তবু তুমি শুকতারা! ভাসি' নভপ'রে
জেগে আছ প্রভাতের সম্ভাষণ তরে!
আজিকে তোমারি সনে
শ্মশান পাষাণ প্রাণে
অতীত সে প্রিয়া মোর এসেছে আবার—
হৃদয়ের ছিন্নলতা মালতী আমার!

২

আয় আয় প্রাণপ্রিয়ে!
কেমনে কঠিন হিয়ে
কোথা কোন সুখ-স্বর্গে ভ্রমিছ এখন—
কোথা পুন রচিয়াছ শান্তি-নিকেতন?
লুণ্ঠিত মৃত্তিকা'পরে
বেদনা-ব্যথিত স্বরে
হেথায় প্রেমিক তব করে হাহাকার,—
সে রোদন শ্রবণে কি পশিছে তোমার?

৩

উল্লাসে অবশ-কায়,
সে সুখ-মুহূর্ত্ত হায়!
আমি কি রে এ জীবনে ভুলিব কখন?
সেই পবিত্রতাময় প্রেম-কুঞ্জবন?
যথা স্রোতস্বিনী-পাশে
মিলে দোঁহে সুখ-আশে
যাপিয়াছি প্রণয়ের বিদায়ের কাল,—
কখনো কি ছিঁড়িবে রে সেই স্মৃতিজাল?

৪

জীবন হইতে লীন,
তবু সে সুখের দিন
এ মোর হৃদয় হ'তে হবে না বিলয়,—
সে প্রেম-সঙ্গীত-কথা ভুলিবার নয়!
সেই শান্তি অভিনব,
সে সুখ-মুরতি তব,
সেই সে কোমল স্পর্শ, স্নেহ-আলিঙ্গন!
আহা, কে জানিত আর হবে না তেমন?

৫

খণ্ডিত উপলময়,
সেই বেলা-ভূমিচয়,
চুম্বি' সবে কুলু কুলু নদী বহি' যায়,
শির'পরি বিতানিত লতায় পাতায়!
সোহাগে হিঁজোল তরু,
স্বর্ণলতা সরু সরু
জড়াজড়ি করি দোঁহে ছিল দাঁড়াইয়া,—
উল্লাস-আবেশ-ভরে উলসিত-হিয়া!

৬

কোমল কুসুমগুলি
কচি শাখে দুলি' দুলি'
ফুটে ফুটে উঠেছিল সুধীর বাতাসে,
প্রণয়ের অতি গাঢ় পরশন-আশে!
প্রতি শাখে ব'সে থাকি,
গেয়েছিল প্রেম-পাখী,
অবশেষে কে জানে রে দিবসের প্রাণ
অত শীঘ্র কেন হায়! হ'ল অবসান!

৭

সেই দৃশ্য, সেই গীতি,
ভরিয়া রয়েছে স্মৃতি,

তারি মাঝে প্রাণ শুধু ভাসিয়া বেড়ায়,
বিম্বোপরি রূপণের বাসনার প্রায়!
যেমতি তটিনী-কায়
প্রবাহে বাড়িয়া যায়,
তেমতি সে সুখ-স্মৃতি হৃদয়-নিহিত,
কালে শুধু দৃঢ়তর হতেছে অঙ্কিত!

৮

অয়ি অয়ি প্রাণপ্রিয়ে!
কেমনে কঠিন-হিয়ে
কোথা কোন্ সুখ-স্বর্গে ভ্রমিছ এখন?
কোথা পুন রচিয়াছ শান্তি-নিকেতন?
লুণ্ঠিত মৃত্তিকা'পরে
বেদনা-ব্যথিতস্বরে
হেথায় প্রেমিক তব করে হাহাকার,—
সে রোদন শ্রবণে কি পশে না তোমার?

৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৺ প্রাচীন ভারত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের পর।]৩

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৩২ সালে টায়র যখন আলেক্‌জান্দারের কুক্ষিগত হইয়াছিল, তখন ভারতের পণ্যই টায়রের সমৃদ্ধি ঘোষণা করিত। ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া লোহিতসাগরের পথে ভারতের পণ্য-সম্ভার এজিয়ন্‌গাবের (Ezi ngaber) নামক নগরে আনীত হইত; তথা হইতে রাইনোকরুরা মরুভূমির ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরে ও পেলেস্তাইন ও মিশরের সীমান্তে বাহিত হইয়া পৃথিবী-মধ্যে প্রচারিত হইত। সে কালে পেলেস্তাইন ও মিশর গ্রীকদিগের অধীন ছিল। ভারতীয় পণ্য লইয়া সেকালে টায়রের এত গৌরব ছিল, টায়র সে সমুদয় রাইনোকরুরা হইতে গ্রহণ করিত।

আলেক্‌জান্দার টায়রের খ্যাতি ও সমৃদ্ধি সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া টায়র জয় করিয়াছিলেন, এবং টায়র হইতে বাণিজ্যের স্রোত ফিরাইয়া দিবার জন্য আলেক্‌জান্দ্রিয়া নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়া ভারত-বাণিজ্যের পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ গমনপথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিয়াছিলেন। টলেমিদিগের যত্নে ও অধ্যবসায়ে শেষে আলেক্‌জান্দ্রিয়াই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বাণিজ্যের সঙ্গমস্থল হইয়াছিল।

আলেক্‌জান্দারের বিশাল সাম্রাজ্য যখন টলেমিদিগের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, তখন তাঁহারাই মিশরের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। আলেক্‌জান্দ্রিয়া সেই সময় হইতেই সৌভাগ্যের শৈলশিখরে আরোহণ করিতেছিল। টলেমি ফিলাডেলফাস্ তৎকালে বর্ত্তমান সুয়েজের নিকটে একটি দীর্ঘ প্রণালী খনন করিয়া নীল নদীর সহিত সুয়েজের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং লোহিতসাগরে বাণিজ্যতরণীর নানা বিপদ্ ও অসুবিধা দেখিয়া বেরেনিস নামক ইতিহাস-বিখ্যাত নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন বেরেনিস হইতে থিবেই (Thibais) মরুভূমির ভিতর দিয়া নীলনদীর তীরবর্ত্তী কপ্‌টাস নগরে, এবং তথা হইতে নীলনদীর স্রোতে ভাসিয়া আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় ভারতীয় পণ্য গমন করিত। প্রাচীন ইতিহাসপাঠে ইহাই অনুমান হয় যে, মিশরীয় বাণিজ্যতরণী ভাগীরথীর মধ্যেও বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করিত।

প্লিনির সময়েও বেরেনিস রোমকদিগের প্রাচ্যবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। প্লিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে ভারতবর্ষে আগমনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এ কথাও কহিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ভারতের পণ্যসম্ভার ইউরোপের সমুদয় অর্থ শোষণ করিয়া লইত! *

বেরেনিস হইতে বাবেলমণ্ডেল প্রণালীর অন্তর্গত গেলা নামক বন্দর ৩০ দিনের পথ বলিয়া পরিচিত ছিল। গেলা হইতে প্রতীচ্য তরণী ৪০ দিনে ভারতবর্ষের মুজিরিস্ (Muziris) বন্দরে আসিয়া উপনীত হইত। প্রথমতঃ আরবের উত্তপ্ত বেলাভূমির পার্শ্ব দিয়া রসালগেট অন্তরীপে, এবং তথা হইতে পারস্যের নিকট দিয়া সিন্ধুনদের মুখে ও সিন্ধুনদের পথেই ভারতবর্ষের মধ্যে

* It was a *complaint* even in his (pliny) time, *that the trade to India drained Europe of its riches*. Pliny says, that it costs fifty millions of sesterces every year ; and *yet the trade is not described as being extended to every part of India* * * the above number of sesterces will produce above £440,000 according to the medium value of selver in the present age.

Intro : Rennell's Memoirs. XXXVI.

প্রবিষ্ট হইয়া প্রতীচ্য বাণিজ্য-তরণী ভারতের স্বল্পসম্ভার আহরণ করিত। বহুবৎসর পর এই দীর্ঘ ও বিপজ্জনক বাণিজ্যপথ পরিহার করিয়া প্রতীচ্য বাণিজ্যতরণীসমূহ রসালগেট অন্তরীপ হইতে একেবারেই ভারতবর্ষের জিজেরাস (Zizerus) বন্দরে আসিয়া উপনীত হইত। ভৌগোলিক রেনেল কহেন যে, জিজেরাস্ বন্দর মালাবারের উত্তরভাগে অবস্থিত ছিল। জিজেরাস বন্দরে তৎকালে জাহাজ ভিড়িতে পারিত না বলিয়া বন্দর হইতে ক্ষুদ্র তরণী আনয়ন করিয়া পণ্যবহন করিতে হইত। দস্যুভীতিও সেই প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই বণিক্‌গণ অবশেষে জিজেরাস্ বন্দর পরিত্যাগ করিয়া কানাড়ার নিকটবর্ত্তী বারেস বন্দরে জাহাজ লাগাইত। বারেস ও মুজিরিস বন্দরদ্বয়ের স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে বিজ্ঞ ভৌগোলিকদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। ভূগোলবিৎ রেনেল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উক্ত বন্দরদ্বয় গোয়া ও টেলিচারির মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। *

রোমকগণ কখনও যে বঙ্গ-উপসাগরে আগমন করিয়াছিল, প্লিনির গ্রন্থে তাহার কোনও পরিচয় নাই। খ্রীষ্টাব্দে প্লিনির পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক। তিনি বলেন যে, তৎকালে প্রতীচ্যতরণী পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। প্লিনির ষষ্টিবর্ষ পরে টলেমি তাঁহার ভূগোলবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে রোমকগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ-আবিষ্কারের প্রমাণ পাওয়া যায়। টলেমির গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির উল্লেখ আছে ;—

(১) সিংহল ও ভারতবর্ষের মধ্যে মুক্তা-আহরণ।

(২) সম্বলপুরে নদীতীরে হীরক-সংগ্রহ।

(৩) করমণ্ডলের রাজধানী আরকাটির উল্লেখ।

(৪) মস্‌লিপত্তন যাহার অন্যতম প্রধান নগর, মেসোলিয়া নামে সেই জনপদের উল্লেখ ও কাবেরী নদীর বর্ণনা।

মহাবীর আলেক্‌জান্দারের সহিত প্রাচীন প্রাচ্য বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার পরবর্ত্তিগণের মধ্যে সেলিউকস ভারতীয় বাণিজ্যের মূল্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই যখন মহাগৌরবশালী চন্দ্রগুপ্ত গঙ্গাতীরে সুবিস্তৃত রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত সেলিউকসের সেনাকুল ভীমবেগে প্রধাবিত হইয়াছিল। প্লিনির গ্রন্থ হইতে

* I conceive the trading ports meant by pliny, were situated between Goa amd Tellichery.

Ibid. XXXVIII.

জানিতে পারা যায় যে, আলেক্‌জান্দার ভারতবর্ষে আসিয়া যত দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়াছিলেন, সেলিউকস তদপেক্ষা অনেক অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিপাশা হইতে শতদ্রু, তথা হইতে পালিবোথ্রা, এবং অবশেষে ভাগীরথীর মুখ পর্য্যন্ত সেলিউকসের বাহিনী বিপুলবিক্রমে আগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পালিবোথ্রার স্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে যদিও বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও সুধীসমাজ একমত হইতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক রেনেল প্রধানতঃ দুই কারণে পালিবোথ্রাকে পাটলিপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন;—

(১) বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে পাটলিপুত্র নামে একটি নগর ছিল। পাটলিপুত্র ও পালিবোথ্রা, এই দুইটি শব্দের মধ্যে উচ্চারণগত সাদৃশ্য বর্ত্তমান। কথিত হয় যে, পালিবোথ্রা দুইটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। যদিও এখন পাটনার নিকটে তেমন কোনও নদীসঙ্গমের চিহ্ন বর্ত্তমান নাই, তবুও রেনেল বলেন যে, শোণ ও গঙ্গা এককালে পাটনার নিকটেই ছিল, অধুনা দূরে সরিয়া গিয়াছে।

(২) প্লিনি-কথিত দূরত্বের হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াও রেনেল পাটলিপুত্রকে পালিবোথ্রা বলিতে চাহেন। কিন্তু নানা কারণে প্লিনি-নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের হিসাব অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

কোনও কোনও লেখক পালিবোথ্রাকে বর্ত্তমান এলাহাবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন পালিবোথ্রা ভাগীরথী ও অন্য একটি নদীর সঙ্গমস্থলে বর্ত্তমান ছিল। এরিয়ান্ কহেন, গঙ্গা ও হিরণ্যবহা (Erron a boas) নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে পালিবোথ্রা অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, হিরণ্যবহা নদী গঙ্গা ও সিন্ধুনদ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বটে, তথাপি ভারতের অন্যান্য নদী অপেক্ষা বৃহৎ। সুতরাং হিরণ্যবহা বর্ত্তমান যমুনা বলিয়া অনুমিত হয়। যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এলাহাবাদ অবস্থিত। এলাহাবাদের প্রাচীন নাম প্রয়াগ; আজিও এলাহাবাদ প্রয়াগ নামেই হিন্দুদিগের নিকট পরিচিত। সম্রাট্ আক্‌বর প্রয়াগকে এলাহাবাদ নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। প্রয়াগের আদিম অধিবাসিগণ এখনও প্রয়াগী নামে পরিচিত। পালিবোথ্রা যে সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, সেকালের ইতিহাস তাহাকে 'প্রাসীঅ' (Prasig) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। এই সকল কারণেই বর্ত্তমান এলাহাবাদকেই পালিবোথ্রা বলিয়াই মনে হয়।

আলেক্‌জান্দার যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত মেগাস্থিনিসও ছিলেন। পরে তিনিই চন্দ্রগুপ্ত রাজার রাজসভায় দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি যখন এ দেশে প্রথম আসিয়াছিলেন, তখন লাহোর পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন। *

লাহোর হইতে এলাহাবাদের পথে মেগাস্থিনিস যে-সকল সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তদ্দেশবাসীদিগের যে সৌভাগ্য ও সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে ভারতকথা-রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। যদিও মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় কল্পনার লীলা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহা হইলেও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনি যে কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এককালে ইয়ুরোপের প্রধান অবলম্বন ছিল। প্রসীজ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যে, তেমন জনপদ আধুনিক ভারতবর্ষে একান্ত বিরল।

মেগাস্থিনিস ও দিয়ামাকাসের (Diamachus) পর হইতেই ভারতবর্ষের সহিত সিরিয়া-সিংহাসনের সম্বন্ধ বোধ হয় শেষ হইয়াছিল। তাহারা যে কিরূপে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে ইতিহাস অন্ধকারের কুক্ষিতলগত—তাহার উদ্ধারের আর সম্ভাবনা নাই। যদিও সিরিয়ার ভারত-প্রতিষ্ঠা এই সময় হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র গ্রীক রাজ্য তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং ভারতের সহিত বাণিজ্য করিত। এই রাজ্য ব্যাক্‌ট্রিয়া (Bactria) বলিয়া পরিচিত। প্রথমে ইহা সেলিউকাসের অধীনে ছিল বটে, কিন্তু পরে স্বাধীন হইয়াছিল।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ নিতান্ত সংক্ষেপে ব্যাক্‌ট্রিয়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বর্ণনা হইতে আমরা শুধু ইহাই জানিতে পাই যে, ব্যাক্‌ট্রিয়ার সহিত ভারতবর্ষের অতি ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। আলেক্‌জান্দার ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ভূমি জয় করিয়াছিলেন, ব্যাক্‌ট্রিয়ানগণ তদপেক্ষা অধিক ভূমি বিজয় করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টজন্মের বড় বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে এক দল তাতার চীন হইতে আগমন করিয়া ব্যাক্‌ট্রিয়ার ধ্বংসসাধন করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এক শত ত্রিশ বৎসরের ব্যাক্‌ট্রিয়ান রাজত্ব যে তাতারের কৃপাণমুখে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছিল, ইহা চৈনিক ঐতিহাসিকের কথা।

* Alexander did not advance farther towards the S. E. than that part of the river Hydraotes or Rauvee, where the modern city of Lahore is situated.

Robertson,

এই সময় হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও ইয়ুরোপীয় জাতিই ভারতবর্ষে আসিয়া স্থানলাভ করিতে পারে নাই। এই সুদীর্ঘ ১৬০০ বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিকগণ কেবল ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার প্রয়াসেই ব্যস্ত ছিল; কারণ, ভারতের অনন্ত রত্নরাজির কথা তাহারা সকলেই প্রবাদের মত শুনিয়াছিল। তাহারা যে কিরূপে সেই ধনরাশি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলি সেই পরিচয় প্রদান করিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

The civilization of ancient Egypt created the first great demand for the embalming spices, dyes, and fine products of the East. * * Homer does not mention the name of India, but he was acquainted with the art-wares of Sidon, a Mediterranean outpost of the eastern trade. It was however in Egypt that the products of the Syrian caravan routes, and the possibly still earlier merchandise of Somali-land and and the African littoral, found their chief market.—W. W. Hunter.

প্রাচীন মিশর বহু বিষয়ে ভারতবর্ষের অনুরূপ ছিল। ভারতের জাতিভেদ-প্রথা এককালে মিশরেও বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জানা যায়। একদিন মিশরের হিন্দুতীর্থ বহু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুকে আহ্বান করিয়াছিল। মিশর যে সমাজে, সংস্কারে, ব্যবহারে, ব্যবস্থায়, নানা ভাবে ভারতবর্ষের মত ছিল, কয়েক মাস পূর্ব্বে "প্রাচীন মিশরের কাহিনী" লিখিয়া "সাহিত্যে" তাহার আলোচনা করিয়াছি।

মিশর যে শুধু ভারতের জ্ঞান ও বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা নহে; এককালে ভারতের অর্থে মিশর সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। মিশর যখন বহুবিস্তৃত জনপদের সম্রাজ্ঞী-স্বরূপ য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তাহার অন্যতম বন্দর ফাইলো-টেরস্ (Philoteras) প্রাচ্য বাণিজ্যের পথপ্রদর্শকস্বরূপ লোহিতসাগরের সিক্ত সৈকতে বিজয়-গৌরবে বর্ত্তমান ছিল। শত সহস্র বাণিজ্য-তরণী তথায় উপনীত হইয়া প্রতিদিন বহুমূল্য ভারতীয় পণ্যসম্ভার প্রদর্শন করিয়া বৈদেশিক বণিক্-দিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত।*

* The Egyptians also derived important advantages from their intercourse with India and Arabia; and the port of *Philoteras*, which, there is reason to believe was constructed at a very remote period, long

সেই অতি প্রাচীনকালেই মিশরীয়গণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল কি না, তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আরবের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, মিশর তাহারই কতক ফলভোগ করিত। আরব হইতেই হউক, অথবা ভারতবর্ষ হইতেই হউক, মিশরে যে সেকালেও ভারতের পণ্য-সম্ভার বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, থিবির বহু মন্দিরে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সলমন যে কিরূপে ভারতের রত্নরাজি আহরণ করিয়াছিলেন, সে কাহিনী ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

কালের চক্র চিরপরিবর্ত্তনশীল। মিশর ও সিরিয়া যখন তাই আপন আপন সুখ ও সৌভাগ্যের নিমিত্ত ভারতীয় পণ্যের উপর অধিকারস্থাপনমানসে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, তখন পাশ্চাত্যগগনের মেঘমালারও উচ্চে শির তুলিয়া আর একটি বিশাল বিরাট জাতি আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়াছিল। সে জাতি বিশ্ববিশ্রুত রোমক জাতি! রোমের অভ্যুত্থান দর্শনে মিশর ও সিরিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল; তাহারা বুঝিয়াছিল যে, রোমের চরণচুম্বন করিবে না, পৃথিবীতে তখন এমন সাম্রাজ্য ছিল না।

রোম দিনে দিনে মাসে মাসে আপনার কলেবর পুষ্ট করিতে লাগিল। ইতালী ও সিসিলি অনতিকালমধ্যেই তাহার চরণে প্রণত হইল। যে কার্থেজ রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া প্রাণান্ত সমরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসী হইয়াছিল, সে কার্থেজ রোমের তাড়নায় বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। মেসিডোনিয়া ও গ্রীস রোমের অধীনতা স্বীকার করিয়া রক্ষা পাইল। সিরিয়া তাহাকে রাজ্ঞী বলিয়া বরণ করিয়া লইল। বিজয়-গৌরবে উল্লসিত রোম তখন মিশরের দিকে রক্তনেত্রে চাহিল। মিশর অবশেষে রুধিরাপ্লুত-দেহে সম্রাট অগষ্টসের নিকট বশ্যতা-স্বীকার করিয়া রোমের অধীন হইয়া গেল। অগষ্টস্ দেখিলেন, মিশরকে সম্পূর্ণরূপে সিংহাসনের আজ্ঞানুবর্ত্তী রাখিতে পারিলেই ভারতের বিপুল ধনরাশি তাঁহার কোষাগার পূর্ণ করিবে।

বিজিত সাম্রাজ্য-সমূহের ধনরাশি-লুণ্ঠনে প্রলুব্ধা য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী রোম তখন চর্ম্ম-বর্ম্ম পরিহার করিয়া বিলাসিনী ও ব্যসনপ্রিয়া হইয়া উঠিতেছিল। নাগরিকগণ তখন দুরূহ কর্ম্মসংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লালসা ও ভোগের দাস হইতেছিল। তাহারা তখন কর্ম্মশূন্য, জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত, পৃথিবীর মধ্যে

---

before the exodus of the Israelites, was probably the emporium of that trade. It was situated on the eastern coast of the Red Sea, in latitude 26—9'. The Anciant Egyptians, Vol I. Page 206.

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহাদিগের পিতৃপিতামহগণ হৃদয়শোণিতপাত করিয়া যে বিপুল অর্থরাশি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছিল, কর্ম্মহীন, চঞ্চল, গর্ব্বস্ফীত রোমকগণ তখন সেই কমলার ভাণ্ডার ধূলিমুষ্টির ন্যায় বৃষ্টি করিয়া, পৃথিবীর যেখানে যাহা ভাল, যেখানে যাহা উপভোগ্য, যেখানে যাহা শোভন ও নয়নাভিরাম ছিল, তাহাই সংগ্রহ করিতে তৎপর হইয়াছিল। প্রতিদিন যে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অধীন সাম্রাজ্যগুলি প্রাণপণে যত্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিত না। সেই দুর্নিবার ভোগাকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে হইত বলিয়াই ভারতবর্ষের পণ্য রোমে সমধিক আদৃত হইয়াছিল।

মিশর হইতে ভারতীয় পণ্য রোমে যাইত। তাহাতে রোমের অভাব পূর্ণ হইত না বলিয়া তাহারা অন্য পথেও সেই সকল দ্রব্যাদি-প্রাপ্তির সুবিধা ঘটাইয়াছিল। বহুপূর্ব্ব হইতেই মেসোপটেমিয়ার সহিত ইউফ্রেটিস নদীতীরবর্ত্তী জনপদসমূহের ও ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী সিরিয়া ও পেলেস্তাইনের অংশবিশেষের বাণিজ্যসম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। বাইবেল গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। *

দুস্তর মরুভূমি এই সকল জনপদকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। পর্য্যটকগণ পথশ্রমে কাতর হইয়া শুষ্ককণ্ঠে বারি অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত তাই মধ্যপথবর্ত্তী কোন একটি সহরে সর্ব্বদাই গমন করিত। যখন বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তখন সেই শান্ত শীতল নগরটি করতলগত রাখিবার জন্য তৎকালের নৃপতিবর্গ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, নৃপতি সলমন যখন তাঁহার প্রজাবর্গকে বাণিজ্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তিনি তখনই সেই নগরটিকে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া স্বাধিকারে রাখিয়াছিলেন। † সিরিয়ানগণ ইহাকে তাদমুর (Tadmore) এবং গ্রীকগণ পাল্‌মিরা (Palmyra) বলিত।

তাদমুরে স্বচ্ছ শীতল বারির অভাব ছিল না। নগরোপান্তে যে সকল উর্ব্বরভূমি ছিল, সে সমুদয় বৃক্ষলতাগুল্মে পরিশোভিত থাকিয়া সেই জনহীন ভীষণ মরুভূমে তৃষিত ও ক্লান্ত বণিক্‌দিগের হৃদয়ে আশা ও আনন্দ আনিয়া দিত। তাদমুর ইউফ্রেটিস নদী হইতে ৮৫ মাইল ও ভূমধ্যসাগর হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া তাদমুরবাসিগণ স্থলপথে ইউফ্রেটিস হইতে ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত; এক বন্দর হইতে অপর বন্দরে পণ্য বহন করিত। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল বহুমূল্য দ্রব্যাদি ইউফ্রেটিস নদীর পথে তথায় যাইয়া উপনীত

* Genesis XI and XII.

† Kings IX. 19 and 2 chron : VIII. 4.

হইত, সে সমুদয়ই আকারে ক্ষুদ্র অথচ অতীব মূল্যবান্ ছিল। সুতরাং মরুপথে সে সমুদয় বহন করিতে অধিক ব্যয় পড়িত না। তাদমুরবাসিগণ তাই স্থলপথে সেই সমুদায় দ্রব্য বহন করিয়া আনিয়া তাদমুরের গৌরব ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

সিরিয় নরপতিদিগের কালেই তাদমুরের প্রতিপত্তি অত্যন্ত প্রবল ও উহার প্রতিষ্ঠা একান্ত দৃঢ় হইয়াছিল। ভারতীয় পণ্যের আমদানীই সেই প্রবল প্রতিপত্তি ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ ছিল। শেষে রোমের অপ্রমেয় শক্তির সম্মুখে যখন সিরিয়া নতজানু হইয়াছিল, তখন হইতে প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত সিরিয়া একটি স্বাধীন জনপদস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া ভারতের পণ্যসম্ভারে গরীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় রোমকগণ ও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পার্থিয়ানগণ পর্য্যন্ত তাদমুরের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত কত না লালায়িত হইয়াছিল! আপিয়ালের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, রোম ও য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশসমূহ তৎকালে তাদমুর হইতেই ভারতের পথ্য গ্রহণ করিত। তাদমুর ধনে ও জনে, সৌভাগ্যে ও সম্পদে এতই শক্তিশালিনী হইয়াছিল যে, মিশর, মেসোপটেমিয়া ও এসিয়ামাইনারের কতকাংশ পর্য্যন্ত তাহার করতলগত হইয়াছিল। ইতিহাস সেই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের রুধির-রঞ্জিত কাহিনী অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু যে ভারতীয় পণ্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়াই তাদমুরের অত গৌরব ও সমৃদ্ধি হইয়াছিল, ঐতিহাসিক সে বিষয়ে একান্ত নীরব! তাদমুরের সৌভাগ্য শেষে নিয়তির বিধানে হতশ্রী হইয়াছিল; নৃপতি আরেলিয়ন যখন তাদমুর জয় করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই উহার বাণিজ্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। যখন মিশর ও সিরিয়া রোমের বিলাসবাসনা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া ভারতের রত্নরাজি আহরণ করিতেছিল, তখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতিও নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহারাও সেই অতুল সৌভাগ্যের অংশভাগী হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল।

গ্রীক ও মিশরীয় আড়কাঠীগণ সমুদ্রপথে ভারতে আগমন করিবার সময় স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, নির্দ্দিষ্ট কালে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে এবং পশ্চিম, হইতে পূর্ব্বে একটি স্থিরবায়ু প্রবাহিত হয়। রোম কর্ত্তৃক মিশর বিজিত হইবার ৮০ বৎসর পরে নাবিক হিপলাস্ ভারতগমনের বক্র পথ পরিহার করিয়া আরবসাগর হইতে একেবারে ভারতের মুসিরিস্ বন্দরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। মুসিরিস্ বন্দরের স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই কহিয়াছি। হিপলাস্ যে স্থির-বায়ুর গতি লক্ষ্য করিয়া ভারত-বাণিজ্যের পথ

সহজ ও পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই শুভদিনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আজিও সেই বাণিজ্য-বায়ু আবিষ্কর্ত্তার নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

In every age, it has been a commerce of luxury rather than of necessity, which has been carried on between Europe and India.—Robertson.

আবহমান কাল হইতে বিলাসলালসাই ভারতীয় পণ্যকে আকর্ষণ করিয়া নানা দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের রেশম, ভারতের হীরক, ভারতের মণিমুক্তা, ভারতের গন্ধদ্রব্য চিরদিনই পৃথিবীর মধ্যে পূজা পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ সকল দ্রব্য মহামূল্য। তাই যখনই যে জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্পদশালী হইয়াছে, সে জাতি তখনই ভারতবর্ষ হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইয়াছে।

যখন খলিফাগণ কুবেরের ভাণ্ডার অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের কক্ষদ্বারে বুটদার রেশমী পর্দ্দা বিলম্বিত থাকিত; সেই সকল পর্দ্দায় কনকতার-বিনির্ম্মিত হস্তী ও সিংহমূর্ত্তি বিরাজ করিত। চারিটি বৃহৎ করী ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের রেশমী আস্তরণে সুশোভিত হইয়া সর্ব্বদাই সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত। তখন বোগ্‌দাদ নগর খলিফাদিগের জেরুজেলম ছিল; ইতিহাসবিশ্রুত বসোরা তখন আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার ন্যায় হরমুজ (Ormuz) ও হিন্দের (Ind) ধনরাশি সংগ্রহ করিয়া প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে প্রেরণ করিত।*

রোম যখন একান্ত সৌভাগ্যশালিনী, তখন রোমকগণ ভারতীয় পণ্যসম্ভারের জন্য অনায়াসে বিপুল অর্থরাশি ব্যয় করিতেছিল। অর্থ হইতে বিলাস, এবং বিলাস হইতে আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে প্রতিদিন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। শেষে পম্পি কর্ত্তৃক এসিয়ার বাণিজ্যপথ বিজিত হইবার পর হইতেই রোমের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। এই বাণিজ্যপথ যে সকল জনপদের ভিতর দিয়া বিস্তৃত ছিল,

* In Bagdad was, from the commercial point of view, the more spacious Jerusalem of the Caliphate. Bussorah was its Alexandria on the Persian gulf, which received from the East, and passed on to the west the wealth of Ormuz and of Ind.

History of British India.—W. W. Hunter.

রোমকগণ সে সমুদয় সম্পূর্ণরূপে স্বাধিকারে রাখিয়াছিল। আজিও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। মরুভূমের আশ্রয় ও গৌরব পাল্‌মিরা বা তাদ্‌মুর,—যাহা একদিন রোম নৃপতিদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান ছিল, একদিন যাহা স্বাধীন জনপদরূপে পৃথিবীর ইতিহাসে সৌভাগ্যের ও সম্পদের লীলাভূমি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে,—সেই তাদমুর রোমের কুক্ষিগত হইয়া রাজকুমার ওডেনেথাস্ (Odenathus) কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল।

দামাস্কাসের দক্ষিণে চারি দিনের পথ দূরে অবস্থিত বাসান জনপদের রাজধানী বষ্ট্রা (Bostra) রোমক আরবের রাজধানীস্বরূপ পরিচিত হইয়াছিল। আরব অভিযানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বষ্ট্রাই সিরিয়া, ইরাক্ ও হেজাজের বিপণি বলিয়া বাণিজ্য-জগতে পরিচিত ছিল। রোমককীর্ত্তিসমন্বিত রাব্বার ধ্বংসাবশেষ আজিও সরল ও প্রশস্ত প্রস্তর সরণির চিহ্ন দেখাইয়া রোমের শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে; কারুকার্য্যসমন্বিত মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ, বিশাল হর্ম্ম্যাবলী ও ক্লিরাট স্তম্ভসমূহ আজিও কহিয়া থাকে যে, রোম প্রাচ্য বাণিজ্যকে চিরদিনের জন্য আপনার অধীন রাখিবার মানসে নানারূপে প্রাচ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

সারাসেনগণ (Saracen) যখন ইস্‌লামের কৃপাণগ্রহণ--পূর্ব্বক ইন্দো-সিরিয় বাণিজ্যপথ অবরোধ করিয়া ভীমভৈরবের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তখন (৬৩২-৬৫১ এ, ডি,) তাহারাও বুঝিয়াছিল যে, সেই পথে ভারতের হীরক-কনক পড়িয়া রহিয়াছে; যে উহা কুড়াইয়া লইতে পারিবে, তাহার মত ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই। তাই ইতিহাস কহিতেছে যে, খলিফাদিগের অধীন থাকিয়া বোগ্‌দাদ ও বসোরা ভারতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সারাসেনগণ খৃঃ পূঃ ৬৩২-৬৫১ অব্দের মধ্যে মিশর, সিরিয়া ও পারস্য জয় করিয়াছিল। খলিফা ওমার খৃঃ পূঃ ৬৩৬-৬৩৮ অব্দে বসোরা নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; আল্‌মন্‌সুর এক শতাব্দীর মধ্যেই (খৃঃ পূঃ ৭৬২) বোগ্‌দাদ নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ভারতের অন্যতম বিপণি সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু সে কালে কোনও জাতি রোমের ন্যায় ভারতীয় পণ্যের পূজা করে নাই। পৃথিবীর কোনও দেশই রোমের তৃপ্তির জন্য ভারতবর্ষের ন্যায় অর্ঘ্য যোগায় নাই। কিন্তু সে কালের বাণিজ্য এ কালের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বাণিজ্য ছিল না। রোম সে কালে আইন করিয়া ভারতীয় রেশমের উপর অসাধারণ শুল্ক সংস্থাপন করে নাই। সে কালের ভারতবর্ষ হইতে যে ধন (Wealth) ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইত, তাহাতে ভারতবর্ষ দরিদ্র না হইয়া বরং অর্থশালীই হইয়াছিল। এ কালের ন্যায় সে কালের ঐতিহাসিককে বলিতে হয় নাই,—

"In other words, the country sent out about ten times what it imports." *

দেবদেবীর লীলাভূমি, ধর্ম্মজগতের জন্মস্থান, আড়ম্বরপূর্ণ পূজাবিধির রচনা-নিকেতন ভারতবর্ষ গন্ধদ্রব্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। মনুষ্যের ভোগলালসা, দেবতার পূজোপচারের দিকে বহুদিন হইতেই বিলাস-কুটিল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছে! গন্ধ ভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা হয় না; তেমনই গন্ধ ভিন্ন মনুষ্যেরও পরিতৃপ্তি ঘটে না। মানুষ তাই দেবতার জন্য ও নিজের জন্য গন্ধ-সংগ্রহে চিরদিন চেষ্টিত।

ভারতের ন্যায় রোমেও সে কালে মৃতদেহ ভস্মীভূত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ধনশালী রোমকগণ মৃতদেহ চিতার উপর তুলিয়া নানাবিধ মশলা ও গন্ধদ্রব্যে উহা আবৃত করিয়া দিত। যিনি এইরূপে মৃতের সৎকার করিতে না পারিতেন, তিনি সমাজের চক্ষে হীন হইয়া পড়িতেন। ভারতবর্ষ সেই সমুদয় মশলা ও গন্ধদ্রব্য যোগাইত। রোমকগণ বহু অর্থ দিয়া উহা ক্রয় করিত। কথিত হয়, শীলার চিতার উপরে দ্বিশতাধিক বস্তা মশলা বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইতিহাস-বিশ্রুত সম্রাট নীরো পাপিয়ার (Pappœa) চিতানলে এত দারুচিনি ও কাসিয়া (Cassia) আহুতি দিয়াছিলেন যে, তত দারুচিনি ও কাসিয়া এক বৎসরে উৎপন্ন হইত না।

প্লিনি তাই কহিয়াছেন যে, "আমরা দেবতার পূজার জন্য এই সকল গন্ধদ্রব্য অতি সামান্যপরিমাণেই ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু মৃতের সৎকারকালে পুঞ্জ পুঞ্জ গন্ধদ্রব্য দগ্ধ করি।" সে কালে যদিও আরব দেশ হইতে গন্ধদ্রব্য ইউরোপে যাইত, কিন্তু ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, আরবগণ ভারতবর্ষ হইতে ঐ সকল দ্রব্য বহুপরিমাণে সংগ্রহ করিয়া স্বদেশের উৎপন্নের সঙ্গে ইউরোপে প্রেরণ করিত। † নরপতি অগষ্টসের সময়ে রোমে প্রাচ্য গন্ধদ্রব্যের একটি স্বতন্ত্র বিপণি ছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

---

* Economic History of British India—R. C. Dutt.

† Some authors (Strabo) assert that the greater part of those purchased in Arabia were not the growth of that country but brought from India.—Robertson.

পূজার অর্ঘ্য।

রৌদ্রতপ্ত, পক্ষিকূজনমুখর, দীপ্ত মধ্যাহ্নে, শ্রান্তদেহে, ধূলিধূসরপদে গৃহে ফিরিয়া শিবদাস ডাকিল, "মোক্ষদা!"

জীর্ণ-মলিনবসনে শীর্ণ-তনুলতা কোনরূপে আবৃত করিয়া মোক্ষদা ঘরের দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বক্ষের উপর এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশু নিদ্রা যাইতেছিল। রমণীর কেশরাশি রুক্ষ; ছিন্নবসনের ছিদ্রপথে মলিন কেশ-ভার আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

স্বামীকে তখনও রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল, "অমন করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিলে কি হইবে?—উপরে এস, মুখ হাত ধোও।"

শিবদাস ম্লানহাস্যে উত্তর করিল, "আমি ভাব্‌ছি, আর কত কাল এমন-ভাবে চলিবে? চালে খড় নাই, পেটে অন্ন নাই, লজ্জানিবারণের বস্ত্রও নাই। তার উপর দেনার ভরা, পাওনাদারের তাগাদা। দু'টি ছোট ছেলে, তাদের মুখেও দু' বেলা দু' মুঠা অন্ন দিবার শক্তি নাই। এমন জীবন কি দুর্ব্বহ! এমন করিয়া কয় দিন বাঁচিব? এত চেষ্টা করিলাম, একটা চাকরী জুটিল না।"

অনেক দুঃখ, বহু-যন্ত্রণা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছে; বিপদের শত প্রবল ঝঞ্ঝাবাত তাহাদিগের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার স্বামীকে সে একদিনও এত বিচলিত, এত অধৈর্য্য হইতে দেখে নাই। এমন কথা একদিনের জন্যও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই। আজ এ কি হইল? মোক্ষদা নিতান্ত ব্যাকুল ও বিস্মিতভাবে শিবদাসের চিন্তাভার-ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিল। তার পর ধীরে ধীরে স্বামীর হাত ধরিয়া দাওয়ার উপর টানিয়া আনিল।

দাওয়ার একপ্রান্তে একটি নগ্নদেহ তিন বৎসরের শিশু একটা ভাঙ্গা মাটীর পুতুল লইয়া খেলা করিতেছিল। ছিদ্রবহুল চালের মধ্য দিয়া মধ্যাহ্নের সূর্য্যরশ্মি তাহার ধূলিমলিন দেহের উপর পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল। পিতা স্নেহ-ব্যাকুল-নয়নে বহুক্ষণ পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল। বক্ষঃপঞ্জর আন্দোলিত করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল। অন্যমনস্কভাবে শিবদাস বলিল, "মোক্ষদা!—"

কথা শেষ হইল না। বাষ্পভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার শীর্ণকপোল বহিয়া শুষ্ক মৃত্তিকার উপর পতিত হইল।

স্বামীর ব্যবহারে মোক্ষদার হৃদয় একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলাশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ ধূম্রপানে চাহিয়া চাহিয়া সহসা শিবদাস পত্নীর হাত চাপিয়া ধরিল; ভগ্নস্বরে বলিল, "ব'স, একটা কথা আছে।"

"কথা পরে হবে, এখন মাথায় একটু তেল দিয়া স্নান করে এস। বেলা যে আর নাই।"

শিবদাস এবার হাসিল। বলিল, "তার পর? ঘরে ত আজ চা'ল বাড়ন্ত।"

মাটীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মোক্ষদা নিম্নস্বরে বলিল, "হরের মা চাট্টি চা'ল ধার দিয়েছে; ভাত রাঁধিয়াছি, যাও, স্নান করে এস।"

শিবদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা তীব্র যন্ত্রণায় তাহার সমস্ত শরীর যেন সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। নীরবে বহুক্ষণ দাওয়ার উপর পাদচারণ করিয়া সে সহসা বলিয়া উঠিল, "না, আর সহ্য হয় না। সেই ভাল, বৃথা মায়ার মুগ্ধ হইয়া অপোগণ্ড শিশুদিগকে কেন মারিয়া ফেলি?"

মোক্ষদা চকিতভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। ভীতকণ্ঠে বলিল,—"তুমি কি বল্‌ছ? আজ হয়েছে কি? তোমার পায়ে পড়ি, যাও, স্নান করে' এস।"

"ভয় নাই, মোক্ষদা আমি পাগল হই নাই। তবে এমন ভাবে চলিলে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? যা বলি, মন দিয়া শোন। আমাদের যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা থেকে উদ্ধারের একটিমাত্র উপায় আছে। কাজটা খুবই গুরুতর, কিন্তু তা না হলে আমাদের কারও নিস্তার নাই। চির-দুর্ভিক্ষের দাবানলে সব ভস্ম হয়ে যাবে। আগেই শিশু দুটি মরিবে।"

মোক্ষদা স্বামীর পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। আজ শিবদাসের বাক্য, ব্যবহার, সকলই যেন রহস্যময়।

শিবদাস বলিল, "মুকুন্দপুরের জমীদার রামতারণ বাবুর নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। তিনি নিঃসন্তান। অগাধ বিষয়-সম্পত্তির কেহ উত্তরাধিকারী নাই। সেই জন্য তিনি কোনও সদ্বংশজ ভদ্রঘরের একটি শিশুকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিতে চান। আমার কাছে প্রস্তাব এসেছে, বুঝেছ? গরীব না হলে ত আর কেউ ছেলে বেচে না। তিনি আমার বড় ছেলেটিকে চান। যদি রাজি হও, নগদ এক হাজার, কিন্তু ছেলেটিকে এ জন্মে, অন্ততঃ রামতারণ বাবু যত দিন বেচে থাকবেন, তত দিন দেখতে পাবে না।"

মোক্ষদার নয়নযুগল বিস্ফারিত হইল। কি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব! বক্ষের ক্ষীর-ধারায় পালিত, অন্তরের স্নেহ-সুধায় লালিত, নাড়ী-ছেঁড়া রত্নকে পরের হাতে জন্মের মত সঁপিয়া দিতে হইবে? ইহজন্মে তাঁহার সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। হা অদৃষ্ট! আজ তাঁহাকে এমন কথাও শুনিতে হইল! পোড়া পেটের জন্য তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটিকে উপাড়িয়া ফেলিতে হইবে! রাক্ষসী ক্ষুধার তৃপ্তির নিমিত্ত সুমহান্, পবিত্র মাতৃত্বের গৌরব সে কেমন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে! না—না! মোক্ষদা এত নিষ্ঠুর, এমন চণ্ডাল হইতে পারিবে না! বরং সে নিজে মরিবে।

শিবদাস পত্নীর মনের অবস্থা বুঝিল। পুত্রস্নেহ কত পবিত্র, কত মধুর, তাহা কি সে জানিত না? প্রাণ ধরিয়া কোন্ পিতামাতা সন্তানকে জন্মের মত বিসর্জ্জন করিতে পারে? কিন্তু উপায় কি? দারিদ্র্য যে তাহাদিগকে প্রতিদিন নানা-রূপে লাঞ্ছিত করিতেছে!

শিবদাস বিষাদ-গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "মোক্ষদা, বড় কঠিন কাজ, তাহা আমি জানি। কিন্তু উপায় নাই। মৃত্যু তিল তিল করিয়া শিশু দু'টিকে গ্রাস করি-তেছে, দেখিতেছ না? দুর্ভিক্ষের কবল হইতে উহাদিগকে বাঁচাইবার আর কোনও পথ নাই। এত চেষ্টা করিলাম, কোথাও একটা সামান্য বেতনেরও চাকরী মিলিল না। দূরে গিয়া যে চেষ্টা করিব, সে সুবিধা ও সুযোগও নাই। তাহার উপর আমার স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তোমাকে এত দিন বলি নাই, কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমার দুনিয়ার লীলা শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। এখন ভাবিয়া দেখ, আমার অবর্ত্তমানে নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল অবস্থায় অপোগণ্ড শিশু দু'টিকে লইয়া তুমি বাঁচিবে কিরূপে? বাড়ীখানিও বন্ধক, মাথা রাখিবারও যে স্থান পাইবে না। যদিও বা কোনরূপে বাঁচিয়া থাক, শিশু দুটি শিক্ষার অভাবে চোর-ডাকাত হইয়া উঠিবে। পেটের জ্বালা ভয়ানক। তার চেয়ে যদি একটির মায়া ত্যাগ কর, সে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিবে, লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে। বিনিময়ে যে টাকা পাইবে, বুঝিয়া চলিলে, ঋণ শোধ দিয়াও ছোট ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে।"

দুই হস্তে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া মোক্ষদা বলিল, "উঃ! থাম, থাম, আর ও কথা বলিও না। এমন কাজ আমি কিছুতেই করিতে পারিব না। সে আমার নাড়ী-ছেঁড়া ধন, বুকের পাঁজরা!"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শিবদাস বলিল, "আচ্ছা, তবে থাক্। দাও, একটু তেল দাও, স্নান করে আসি।"

২

নিস্তব্ধ রজনীর অন্ধকারে, ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া মোক্ষদা আকাশ-পাতাল কি ভাবিতেছিল। সমগ্র বিশ্ব তখন সুপ্তিমগ্ন। বাতাস সমস্তদিন ছুটোছুটির পর তখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মোক্ষদার দুই পাশে তাহার পুত্র দুইটি পরম-নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছিল। তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস-জনিত শব্দ ও স্বামীর নাসিকাগর্জ্জন অন্ধকারময় কুটীরের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। সকলেই সুপ্তিমগ্ন, কিছুক্ষণের জন্য সকলেই সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া একটু শান্তিলাভ করিতেছে, কিন্তু মোক্ষদার অদৃষ্টে আজ সে শান্তিও দুর্লভ। তাহার পোড়াচক্ষে নিদ্রা নাই!

দারিদ্র্য তাহাকে নানারূপে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার অপত্যস্নেহকে এত দিন স্পর্শ করিতে পারে নাই। সহস্র দুঃখ-দৈন্যের শেলাঘাত সে অবিচলিতভাবে সহ্য করিয়াছে, অভাবের সহিত সে প্রতিদিন সংগ্রাম করিয়াছে। অপমানের বেদনা, ক্ষুধার তীব্র জ্বালা তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু পুত্র দুইটির করুণমুখ দেখিলেই, তাহার সমস্ত জ্বালা জুড়াইত। তাহাদিগকে আদর করিয়া সে অনেক সময় তীব্র অসহনীয় ক্ষুধার যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু নির্ম্মম অদৃষ্ট আজ তাহার মাতৃত্বের গৌরব-কেও ক্ষুণ্ণ ও চূর্ণ করিতে উদ্যত! তাহার নয়নের মণি, জীবনের ধ্রুব তারাটিকে তাহার দৃষ্টিপথ হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যগ্র! সে অতি দীন, অতি দরিদ্র, তাহার বিরুদ্ধে অদৃষ্টের এ নিষ্ঠুর চক্রান্ত কেন?

বড় পুত্রটি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মোক্ষদার স্নেহসিন্ধু উছলিয়া উঠিল। সে অতি সন্তর্পণে শিশুটিকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। আঃ, কি স্নিগ্ধ স্পর্শ! বুক জুড়াইয়া যায়! এমন রত্নকে কে পরের হাতে তুলিয়া দিতে পারে? শিশু ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া শেষে মাতার স্নেহাতুর বক্ষের উপর আবার নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা গেল। মাতার বক্ষঃ-স্পন্দনের সহিত পুত্রের বক্ষঃ-স্পন্দন মিলিত হইল।

ওরে যাদু, ওরে সোনা, অঞ্চলের নিধি! কোন্ পাষাণী, কোন্ অভাগী তোর মত রত্নকে অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিতে পারে? দুঃখিনী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া তোদের খাওয়াইবে, তবু তোরা মার কোল আলো করিয়া বসিয়া থাক্। যদি একান্তই মৃত্যু আসে, সকলে এক সঙ্গে মহাযাত্রা করিব। মোক্ষদা কি মৃত্যুকে ভয় করে?

কিন্তু হায়! মৃত্যু যে চির-বিশ্রাম, অনন্ত শান্তি! দরিদ্র ত সে সুখের অধিকারী

নয়। তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে অভাব-জনিত তীব্র যন্ত্রণা, মৃত্যুর কঠোর শেলাঘাত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সে ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা হইতে তাহার উদ্ধার নাই।

যামঘোষ প্রহরের পর প্রহর ঘোষণা করিয়া নীরব হইল। মোক্ষদার হৃদয়ে সমুদ্রমন্থন হইতেছিল, মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল। চিন্তার শেষ নাই। সূত্রের পর সূত্র অবলম্বন করিয়া চিন্তাজাল বিস্তৃত হয়। মোক্ষদা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম চিন্তাজালে বিজড়িত হইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল।

সহসা কে যেন তাহার অন্তরের নিভৃততম স্থানে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া তাহার চিন্তাকে নূতন পথে পরিচালিত করিল। সে এতক্ষণ অন্ধ জননী-স্নেহে মুগ্ধ হইয়া কেবল নিজের কথাই ভাবিতেছিল। পুত্রের শুভাশুভ কি সে একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছে? পুত্রের চির-অদর্শন, ভাবি-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার তীব্রতা অনুভব করিয়াই সে এতক্ষণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। পুত্রের মঙ্গলামঙ্গল সে মোটেই চিন্তা করে নাই। মাতৃস্নেহ নিঃস্বার্থ, মহান্ ও উদার। সে কি সেই উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছে? দারিদ্র্য মনুষ্যত্বলাভের প্রধান অন্তরায়। সেই চির-দারিদ্র্য, সীমাহীন অভাবের মধ্যে থাকিয়া তাহার পুত্র যদি জীবিত থাকে, কিন্তু সে কি কখন মানুষ হইতে পারিবে?—অসম্ভব; যাহার উদরের ক্ষুধা দূর করিবার সামর্থ্য নাই, সে পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবে কিরূপে? সুতরাং স্বামীর কথাই ঠিক। শিক্ষার অভাবে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে তাহার পুত্র, স্নেহের পুত্তলী শেষে পৃথিবীর ঘৃণ্য জীবে পরিণত হইবে। মা হইয়া সন্তানের সে শোচনীয় পরিণাম মোক্ষদা কেমন করিয়া দেখিবে, কিরূপে সহ্য করিবে? তার চেয়ে পরের হাতে সমর্পণ করা কি সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয় নয়? এক দিকে অন্ধস্নেহ, অন্য দিকে পুত্রের মান-সম্ভ্রম, বিদ্যা, অর্থ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ। মোক্ষদা কোন্ দিক্ গ্রহণ করিবে? মানদণ্ড দুলিতেছে, মোক্ষদা! আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র বাছিয়া লও।

অভাগী দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তার পর আগ্রহভরে সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিল। হে শিব, হে সুন্দর, হে শক্তিময়! দুর্ব্বলের বল! তুমি মোক্ষদার হৃদয়ে শান্তি দাও! সে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, নিজের সুখ সে চাহে না। সে পুত্রের উন্নতির অন্তরায় হইবে না। তাহার কল্যাণকল্পে সে আজ মাতৃত্বকে বিসর্জ্জন দিবে। স্নেহ, মায়া, মমতা! তোমরা দূর হও।

প্রভাতে উঠিয়া মোক্ষদা স্বামীকে বলিল, "তোমার কথাই ঠিক। আমাদের কাছে রাখিয়া মারিয়া ফেলা অপেক্ষা পরকে দেওয়া ঢের ভাল।"

শিবদাস দেখিল, পত্নীর নয়নযুগল আরক্ত, ঈষৎ স্ফীত, মুখমণ্ডল বিবর্ণ। দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মলিন উত্তরীয়স্কন্ধে শিবদাস বাহিরে গেল।

৩

পূর্ণিমার সন্ধ্যা। আকাশের বক্ষে আলোকের উচ্ছ্বাস, পল্লীর শ্যাম অঞ্চলে জ্যোতির তরঙ্গ। মুকুন্দপুরের নবীন জমীদার শচীন্দ্রনাথ পাত্র-মিত্র সহ আলোক-চিত্রিত পুষ্পোদ্যানে বসিয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছিল। লক্ষ্মীর বরপুত্র বীণাপাণির নির্ম্মাল্যলাভে বঞ্চিত বলিয়া একটি প্রবাদ আছে; কিন্তু শচীন্দ্রনাথ সে প্রবাদটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। চব্বিশ বৎসর বয়সে সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশের লোকের কাছে বাহবা লাভ করিয়াছিল। রামতারণ রায় জমীদারী ও বংশগৌরব-রক্ষার ভার পালকপুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া আজ এক বৎসর "অজানা রাজ্যে" চলিয়া গিয়াছেন। শচীন্দ্রনাথ এখন বিপুল সম্পত্তির কর্ণধার।

অর্থ মানবের স্থূল উন্নতির মূলমন্ত্র, সেটা ঠিক; কিন্তু সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সহায়তা করে কি? ভোগী বলিবেন, "হাঁ"; ত্যাগী বলিবেন, "না।" তা যাহাই হউক না কেন, অর্থে মানুষের হৃদয় যে অসম্ভবরূপে স্ফীত হয়, মনুষ্যত্বটা যে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে, তাহার প্রমাণাভাব বিরল নহে। আবার তাহার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংযোগ থাকিলে অবস্থাটা কিছু সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়। উচ্চ-শিক্ষালাভে শচীন্দ্রনাথের দৃষ্টিটা কিছু ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিল। ঊর্দ্ধদৃষ্টি সকল সময়ে নিন্দার নহে, অবস্থাবিশেষে তারতম্য ঘটে। রামতারণ বাবু যশঃ বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, নবীন জমীদার তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে তাহার কীর্ত্তি যদি ঘোষিত না হইল, তাহা হইলে সমস্তই মিথ্যা। শুধু গ্রামের লোকের প্রশংসায় তাহার তৃপ্তি হয় না। তাই সে একটা নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। যেখানে যত সভা-সমিতি হইত, সে তাহাতে যোগদান করিত, এবং অযাচিতভাবে চাঁদার খাতায় দানের পরিমাণ শূন্যসংখ্যায় বাড়াইয়া দিত। তাহার এই ত্যাগস্বীকার ব্যর্থ হয় নাই। দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহ তাহার এই বদান্যতার প্রশংসা করিয়া মায় সুদ সমস্তই পরিশোধ করিয়াছিল। চাঁদার খাতার মাহাত্ম্য সামান্য নহে!

পারিষদবর্গ অন্যান্য দিনের ন্যায় আজিও নবীন জমীদারের গুণকীর্ত্তনে সন্ধ্যার বাতাসকে মুখরিত করিতেছিল। আলোকস্নিগ্ধ মধুর সন্ধ্যায় শচীন্দ্রনাথের তাহা মন্দ লাগিতেছিল না। চারি দিকে ফুলের ঘন সুগন্ধ, উপরে চন্দ্রকরধৌত নীল-শূন্য, নীচের কালো জলে হীরকহিল্লোল! এমন মনোরম, স্বপ্নময় সন্ধ্যায় যশোগান কাহার

অন্তরকে না অভিভূত করিয়া ফেলে? বৈঠক বেশ জমিয়া আসিয়াছে, এমন সময় কাছারীগৃহের সম্মুখে একটা গোল উঠিল। বেজায় বদরসিক কে এমন সময় গোল করিতেছে? শচীন্দ্রনাথ বিরক্ত হইল, পারিষদবর্গ চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাড়াইল। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য তখন সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল।

ম্যানেজারকে প্রশ্ন করিয়া শচীন্দ্রনাথ জানিতে পারিল, তাহার ভিটাবাড়ীর প্রজা ভজহরি, সর্ব্বানন্দঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট তৈজসপত্র বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা ধার লয়। যে জিনিস দেখাইয়া ভজহরি টাকা লইয়াছিল, ব্রাহ্মণ সেগুলি ভজহরির কাছেই বিশ্বাস করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। নিজের বাড়ী লইয়া যান নাই। লুব্ধ ভজহরি এ দিকে আর এক জন পোদ্দারের নিকট পুনরায় বাসনাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা লয়। পোদ্দার ব্রাহ্মণের ন্যায় নির্ব্বোধ নহে; সে জিনিসগুলি নিজের হেপাজতে রাখিবে বলিয়া ভজহরির গৃহে উপস্থিত হয়। এ দিকে ব্রাহ্মণ লোকমুখে ভজহরির ব্যবহারের কথা অবগত হইয়া তাহাকে মাল সহ গ্রেপ্তার করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার টাকা শোধ না দিলে একটি জিনিসও ছাড়িবেন না। গোলযোগ পাকিয়া উঠিল। শেষে ব্যাপারটা পুলিস পর্য্যন্ত গড়াইবার উপক্রম হইল। ভজহরি তখন জমীদারের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ম্যানেজার বিষয়টা আপোষ-নিষ্পত্তি করিবেন বলিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন। সর্ব্বানন্দঠাকুর জমীদারের কাছে ন্যায়-বিচার পাইবেন ভাবিয়া সমস্ত দ্রব্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই বিষয়ের মীমাংসা উপলক্ষে এই কলরব।

শচীন্দ্র বলিল, "কি রে ভজা, মিছে গোলমাল কচ্ছিস্ কেন?"

জমীদারকে সম্মুখে পাইয়া ভজহরির সাহস হইল। শচীন্দ্র তাহাকে একটু ভালবাসিত। সে বলিল, "হুজুর, ঠাকুর অন্যায় গোল বাধাচ্ছেন। ওঁর কাছে আমি যে জিনিস বন্ধক রেখেছিলাম, সে সব আমার ঘরে আছে। এ জিনিস আলাদা।"

ব্রাহ্মণ বিরক্তভাবে বলিলেন, "ভজহরি, কেন মিথ্যা কথা বলিস্? তখন তুই ঘরের সব বাসনপত্র না দেখাইলে কি আমি তোকে অত টাকা দিতাম? তোকে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছিল।"

অমাত্যবর্গের মধ্য হইতে এক জন বলিল, "আচ্ছা ভজ, তোর ঘরে এখন অন্য বাসনপত্র আছে?"

"আজ্ঞে, কেন থাকবে না? আমার সঙ্গে পাইক দিন। যদি না নিয়ে আস্‌তে পারি, আমায় দু'দা জুতা মারবেন।"

তখন সকলে সেই প্রস্তাবে সায় দিল। পোদ্দার বলিল, "বাবু, তা হলে আমায় আর কেন কষ্ট দেন, আমার জিনিস নিয়ে চলে যাই?"

ভজহরি বলিল, "পোদ্দার মশায়, তুমি তোমার জিনিস নিয়ে যাও। শুধু শুধু তুমি কেন বসে থাকবে? গোল ত মিটে গেল।"

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, ব্যাপার বড় সুবিধাজনক নহে। সকলেই ভজহরির পক্ষ। তার ঘরে বাসনপত্র বেশী নাই, কেবল মিথ্যা গুজব করিতেছে। ব্যবহারের জন্য যা দুই চারিখানা বাসন আছে, তাহাই দেখাইয়া তাহাকে ফাঁকি দিবে। তাহার টাকা ও জিনিস সমস্তই গেল। তখন সর্ব্বানন্দঠাকুর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খবরদার, ও জিনিসে কেউ হাত দিও না; ভাল হবে না বল্‌ছি। বিচার এখনও শেষ হয় নি।"

ব্রাহ্মণ যে ভাবে কথাটা বলিলেন, শচীন্দ্রনাথ তাহার অর্থ ভিন্নভাবে গ্রহণ করিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের এত বড় স্পর্দ্ধা, তাহার সম্মুখে তাহারই প্রজাকে বড় গলা করিয়া তর্জ্জন করে? জমীদারের তরল রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। সে ভজহরিকে সমস্ত জিনিস তুলিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিল।

সর্ব্বানন্দ বিস্মিত হইলেন। জমীদারের মুখে এই আদেশ? সহস্র সহস্র প্রজা যাহার মুখ চাহিয়া সুবিচারের প্রত্যাশা করে, তাহার এই ব্যবহার? এই বিচারের প্রত্যাশায় তিনি জমীদারের কাছে আসিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "বাবু, তা হলে আমার টাকার উপায়?"

"তা আমি কি জানি? তোমার পাওনা থাকে, আদালত খোলা আছে।"

"এই কি আপনার যোগ্য কথা? এই কি ন্যায়-বিচার?"

"থাম ঠাকুর, বেশী বকিও না। তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমার প্রজার উপর হুকুম চালাও? কি বল্‌ব—তুমি ব্রাহ্মণ, নহিলে উচিত শাস্তি পেতে। এখন মানে মানে চ'লে যাও।"

হত-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ কাতরভাবে সকলের মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার বোধ হইল, সকলেই যেন তাঁহার লাঞ্ছনায় আনন্দ উপভোগ করিতেছে। এই কাছারী-গৃহে, এই স্থানে বসিয়া স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় রামতারণ বাবু ধনী, দরিদ্র, সবল, দুর্ব্বল, সকলের প্রতি ন্যায়-বিচার করিয়াছেন। আজ সেই পবিত্র আসনের উপর দাঁড়াইয়া, তাঁহার পুত্র ন্যায়ের মর্য্যাদাকে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না! আবেগরুদ্ধ-কণ্ঠে সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "আপনার পিতা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে সকলেই সুবিচার পাইত। আপনিও সুশিক্ষিত, আপনার কাছেও ন্যায়-বিচার হইবে, সেই বিশ্বাসে আমি মাল

ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। নহিলে সন্ধ্যানন্দ শর্ম্মাকে ভয় দেখাইয়া বা ঠকাইয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ জিতিয়া যায় নাই। কিন্তু আপনি আজ আমায় ভাল শিক্ষা দিলেন।"

সত্য চিরকালই অপ্রিয়। অপ্রিয় সত্য কথায় শচীন্দ্রনাথের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আরক্ত-মুখে, ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি চ'লে যাও, এখনই যাও। ফের যদি কথা কও, দরোয়ান ধাক্কা দিয়ে তোমায় তাড়িয়ে দেবে।"

আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ লাফাইয়া উঠিলেন। অপমানে, ক্ষোভে, ক্রোধে তাঁহার মস্তকের শিখা কণ্টকিত হইল। তীব্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "শচীন্দ্র বাবু, তুমি আজ আমায় যে কথা বলিলে, যাঁর বিষয়ের এখন তুমি মালিক, তিনিও সে রকম কথা কোনও ব্রাহ্মণকে কখনও বলিতে সাহস করে নাই। আজ যদি তাঁর ঔরস-পুত্র থাকিত, সেও এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না। তুমি কলমের চারা, তোমার কাছে লোকে আর কত প্রত্যাশা করিবে? গরীবের ছেলে, টাকা ত কখন দেখ নাই; সেই অহঙ্কারে তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছ। কিন্তু মনে রেখ, তোমার বাবা টাকা নিয়ে তোমায় বেচেছিল।"

পারিষদবর্গ গর্জ্জিয়া উঠিল। তেওয়ারী, পাঁড়ে, মিছির লাঠী হাতে দৌড়িয়া আসিল। ক্রোধান্ধ শচীন্দ্রনাথের আদেশে ব্রাহ্মণের গলায় জুতার মালা বিলম্বিত হইল। এই অন্যায় অসঙ্গত আচরণের বিরুদ্ধে কেহ একটি কথাও উচ্চারণ করিল না।

সেই রাত্রেই শচীন্দ্রনাথ কলিকাতা-যাত্রার আয়োজন করিল। পল্লীর বাতাস তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে।

৪

সুদূর নগর ও পল্লীপ্রান্ত হইতে সমাগত অসংখ্য ভক্তের মন্ত্রোত্থিত মাতৃ-নাম-গানে সমগ্র কলিকাতা, সহর-তলী পরিপ্লাবিত। দীর্ঘকাল পরে অর্দ্ধোদয়-যোগ আসিয়াছে। তাই ভক্ত হিন্দু পুণ্য-স্নানের আশায় ছুটিয়াছে। বহু বার বহু যোগ বঙ্গদেশে দেখা দিয়াছে, কিন্তু এমন যোগ বুঝি কখনও আসে নাই। বাঙ্গালী যে মানুষ, তাহাদের হৃদয় যে চিরসুপ্তির মায়াজালে আচ্ছন্ন নহে, পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন যে সত্তর, এই অর্দ্ধোদয়-যোগে তাহার কি প্রকৃষ্ট পরিচয়!

পীত-উষ্ণীষধারী, লগুড়-হস্ত, স্বেচ্ছাসেবক যুবকের দল রাজপথের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিল। তাহাদের আনন আনন্দ-কিরণে উদ্ভাসিত, হৃদয়ে অদম্য আশা, বাহুতে শক্তি। তাহাদের পানে চাহিলেই যেন মনে হয়, তাহাদের উজ্জ্বল-নয়ন বলিতেছে, "হে দুর্ব্বল, হে আর্ত্ত, হে পীড়িত! তোমাদের ভয় নাই; আমরা আসি-

যাছি। মাতৃনামের পবিত্র মন্ত্রে আমরা দীক্ষিত। মাতৃযজ্ঞের অর্ঘ্যভার আমরা আহরণ করিতেছি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আশ্বস্ত হও; আমাদের উপর নির্ভর কর। আমরা থাকিতে তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না।"

রাজপথে জয়স্রোত, প্রান্তীর মধ্যে যাত্রিপ্রবাহ, চতুর্দ্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস। স্বেচ্ছা-সেবকগণ যাত্রিভবনের স্বাস্থ্য, লোক-চলাচলের ব্যবস্থা ও যাত্রিবৃন্দের অভাব-অভিযোগের প্রতীকারের নিমিত্ত আগ্রহভরে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিল। আজ দেশের কল্যাণ-কল্পে, সমাগত দেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাহাদের হৃদয়ে কি গভীর ত্যাগ-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে!

শঙ্খধ্বনি-ব্যাকুল, জয়ধ্বনি-মুখর শীতার্ত্ত মাঘের প্রভাতে, বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে কোনও যাত্রি-কুটীরের মলিন শয্যাপ্রান্তে বিসূচিকা-পীড়িত একটি যাত্রী যুবক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। পার্শ্বে বৃদ্ধা মাতা ব্যাকুলভাবে তাহার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। আজ তিন দিন হইল, তীর্থস্নান উপলক্ষে তাহারা কালীঘাটে আসিয়াছে। তাহাদের সহিত তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। এই তাহাদের প্রথম কলিকাতা-দর্শন।

ক্ষীণকণ্ঠে যন্ত্রণাভরে পুত্র বলিল, "জল—প্রাণ যায়, মা!"

বৃদ্ধা অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে পুত্রের মুখে একটু জল দিল। হা ভগবান্, এ কি হইল! তাহার অন্ধের যষ্টি, সংসারের একমাত্র বন্ধন, সেও বুঝি চলিয়া যায়! বিনা চিকিৎসায় সুশ্রূষার অভাবে পুত্র মরিবে? দুঃখিনীর আর যে কেহ নাই। ভগবানের অলঙ্ঘনীয় বিধানবশে আপনার জন পর হইয়াছে। স্বামী কালের আহ্বানে হাজিরা দিতে গিয়াছেন, শেষে অবলম্বন যেটি, সেও শেষে ফাঁকি দিবে?

ওগো, কে কোথায় আছ, একবার এস। একটু সাহায্য কর। বিধবার দুঃখিনীর রত্ন বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। কেহ নাই—কেহ নাই! যাত্রীরা সকলেই যোগস্নানে ব্যস্ত। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া জয়ধ্বনি ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল।

"মা! গেলুম, আর বুঝি বাঁচি না!"

হায়, অক্ষম! হায়, দুর্ব্বল! তোমার মৃত্যু অগ্রে ঘটিল না কেন? মা হইয়া পুত্রের এ যন্ত্রণা কেমন করিয়া নীরবে সহ্য করিবে? বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে বেদনা-দীর্ণ কণ্ঠস্বরে শোকতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে অন্ধকারময় কুটীর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

ও কে? ও কারা? মূর্ত্তিমতী আশার ন্যায়, পীত-উষ্ণীষ-শোভিত কয়েকটি যুবক দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের বক্ষে "বন্দে-মাতরম্"-চিহ্নিত

পবিত্র কবচ দীপ্তি পাইতেছিল। শোক-মুহ্যমানা মাতাকে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে পীড়িতের পার্শ্বে উপবেশন করিল; সুশ্রূষা আরম্ভ হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল; অশ্রুসিক্তনয়নে, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "তোমরা কারা, বাবা?"

"আমরা আপনারই সন্তান। ভয় নাই মা, আপনার ছেলের কোনও ভয় নাই। আপনি কাঁদ্‌বেন না।"

কি স্নিগ্ধ আশাময় কণ্ঠস্বর! কি বিনয়-নম্র ব্যবহার! এই সব দেব-শিশুর জননীরা কি ভাগ্যবতী! বৃদ্ধা মুক্তকণ্ঠে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

স্বেচ্ছা-সেবকদলের এক জন বিচক্ষণ ডাক্তার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "মা, আপনার ছেলেকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব। এখানে ভাল সেবা-শুশ্রূষা হবে না। রোগ বাড়িতে পারে। আপনার ভয় নাই, উনি শীঘ্র সেরে উঠ্‌বেন। কিন্তু আপনাকেও এখান থেকে যেতে হবে। নিকটে কোথাও যদি আপনার কোনও আত্মীয় থাকেন, তবে আপনার সেখানে যাওয়াই উচিত। আমরাই আপনাকে সেখানে রেখে আস্‌ব। তার পর আপনার ছেলে আরাম হ'লে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি কোনও চিন্তা কর্‌বেন না।"

বৃদ্ধা পীড়িত পুত্রকে চক্ষের অন্তরাল করিতে কোনও মতেই সম্মত হইল না। কিন্তু যখন সকলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, স্থানান্তরিত না করিলে রোগীর প্রাণরক্ষার আশা নাই, এবং যেখানে তাহাকে রাখা হইবে, বৃদ্ধার তথায় থাকিবার কোনও সুবিধা নাই, তখন অগত্যা তাঁহাকে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল।

রোগী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মা, তুমি আমার জন্য ভাবিও না। তুমি যাও। আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "আর দেরী করা উচিত নয়। আপনার আত্মীয়ের ঠিকানা ব'লে দিন, সেইখানে রেখে আসি। কোনও চিন্তা নাই। আমি রোজ সেখানে আপনার ছেলের খবর পাঠিয়ে দেব।"

বৃদ্ধা পুত্রের পানে চাহিলেন। পীড়িতের তখন কথা বলিতে কষ্ট বোধ হইতেছিল, তথাপি সে অতিকষ্টে বলিল, "ভবানীপুরে মুকুন্দপুরের এক জন জমীদার আছেন, মাকে সেইখানে পাঠিয়ে দিন।"

"কে, শচীন্দ্রনাথ রায়? তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়! তিনি যে আমাদের দলের এক জন প্রধান পাণ্ডা।"

তৎক্ষণাৎ পাল্‌কী আসিল। রোগীকে পীড়িতদিগের ক্যাম্পে পাঠান হইল। ভলণ্টিয়ার বালকেরা বৃদ্ধাকে জমীদার শচীন্দ্রনাথ রায়ের গৃহে পঁহুছিয়া দিল।

* * *

ওঃ, কতকাল পরে! দীর্ঘ একুশ বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই। সেই তিন বৎসরের শিশু আজ কত বড়ই হইয়াছে! তখন সে মাতার কোলের উপর খেলা করিয়া বেড়াইত। এখন বিশ্ব-জননীর কোল তাহাকে আহ্বান করিতেছে! আজ সে ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে, শিক্ষায়, জ্ঞানে ও মানে লোকপূজ্য, মহামহিমান্বিত! কিন্তু সে ত এই সুখ, এই তৃপ্তির কোনও অংশ পায় নাই। নিজের পেটে ধরিয়াও সে আজ মাতার অধিকার হইতে বঞ্চিত, সে যেন নিতান্ত অপরিচিত, পথের পথিক! নিকটে থাকিয়াও কত দূরে! ধমনীর প্রতি শোণিতবিন্দু, শরীরের প্রত্যেক অস্থি মাতার শরীর হইতে গঠিত, কিন্তু তথাপি আজ পুত্রের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই! সম্বন্ধ কি নাই? রক্তমাংসের সম্পর্ক কি দেহ থাকিতে লুপ্ত হয়? পৃথিবীর কোন্ শাস্ত্রে এ কথা লেখে? তা না থাক্, তাহার পুত্র ত সুখী হইয়াছে। আজ যে যশঃ, যে সম্মান, যে ঐশ্বর্য্যের সে অধিকারী, মোক্ষদা এতখানি ত্যাগ-স্বীকার না করিলে, পুত্রের অদৃষ্টে কি তাহা ঘটিত? অবশ্য জননীর হৃদয় তাহাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে সত্য। দীর্ঘ একুশ বৎসরের মধ্যে এক রাত্রিও সে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, শিশুর সুকুমার শান্ত মধুর মুখখানি তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত; নিমেষের জন্যও সে মূর্ত্তি সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। দীর্ঘ-বিচ্ছেদের পর, আজ সে স্নেহের ধনকে দেখিতে পাইবে। আনন্দ-উচ্ছ্বাস বৃদ্ধার জীর্ণ হৃদয়কে প্লাবিত করিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধার চমক ভাঙ্গিল। তাহার আশঙ্কা হইল, পুত্র ত কখনও মাতৃস্নেহ লাভ করে নাই, তাহাকে দেখে নাই। যদি সে তাহাকে উপেক্ষা করে? তা করুক্, কিন্তু সে ত পুত্রকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে পারিবে।

একটি পরিচারিকা কলতলায় বাসন মাজিতেছিল। সে বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিল, "কোথা থেকে আস্‌ছ গা?"

ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া একটি বর্ষীয়সী বিধবা অঙ্গনে আসিয়া

দাঁড়াইলেন। অপরিচিতা বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিলেন, "কাকে খোঁজ? তোমার বাড়ী কোথায়?"

হা অদৃষ্ট! আজ পুত্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া, ভিখারীর ন্যায় তাহাকে আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিতে হইতেছে? বৃদ্ধার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। অতি কষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া সে উত্তর করিল, "আমাদের বাড়ী পরাণপুর। মুকুন্দপুরের কাছে।"

"পরাণপুরে? তোমরা কারা?"

বৃদ্ধা এবার নয়ন বস্ত্রাবৃত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিধবা মহিলা স্বর্গীয় রামতারণ বাবুর পত্নী। তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধার হাত ধরিয়া তাহাকে একপ্রান্তে লইয়া গেলেন।

কথাটা তখন প্রকাশ পাইল। রামতারণের বিধবা বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করিলেন। শচীন্দ্র ভিতরে আসিলে তাহার কাছে মোক্ষদাকে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিলেন। রমণী-হৃদয়ের বেদনা রমণী অতি সহজেই বুঝিতে পারে?

স্নানান্তে শচীন্দ্রনাথ যখন কেশ-প্রসাধনে নিবিষ্টচিত্ত, সেই সময়ে রামতারণের বিধবা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "শচী, তোর গর্ভধারিণী মা তোকে দেখ্‌বার জন্য এসেছে।"

কে? গর্ভধারিণী! সে আবার কে? শচীন্দ্র এরূপ কোনও ব্যক্তিকে ত চেনে না। সে জানে, তাহার মা নাই। জননীর স্নেহক্রোড় তাহাকে শৈশবেই ফেলিয়া দিয়াছে। অর্থের লোভে যে পিশাচী সন্তান বিক্রয় করিতে পারে, সে ত মা নহে, সে যে রাক্ষসী। শচীন্দ্র তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে।

রামতারণের বিধবা মমতা-মধুর-কণ্ঠে বলিলেন, "আহা, মার প্রাণ! কত কাল দেখেনি; সন্তানের মায়া কি ভোলা যায়! বুড়ীর কি কষ্ট!"

কষ্ট? যে পুত্রস্নেহ পদদলিত করিয়া সন্তানকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে পারে, তার কি হৃদয় আছে যে, কষ্ট হইবে? অন্যে বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু শচীন্দ্র এমন অন্যায় বিশ্বাস করিতে আদৌ প্রস্তুত নহে। কি আশ্চর্য্য! সকল সংস্রব যাহার সহিত চিরদিনের নিমিত্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আজ লজ্জার মাথা খাইয়া সে আবার তাহাকে মুখ দেখাইতে আসে কোন্ অধিকারে? তাহার কি এতটুকু সঙ্কোচ বোধ হইল না? এমনই ইতর, নির্লজ্জ, ঘৃণ্য জীবের উদরে শচীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

শচীন্দ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে ক্রোধ, ঘৃণা ও ক্ষোভজনিত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। এক এক করিয়া সকল কথা

তাহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। ব্রাহ্মণের তীব্র শ্লেষবাণী সে অতিকষ্টে বিস্মৃত হইয়াছিল, আজ ইন্ধন পাইয়া মর্ম্ম-বেদনার জ্বালাময়ী শিখা দ্বিগুণতেজে জ্বলিয়া উঠিল। নিদারুণ ঘৃণা, বিজাতীয় ক্রোধে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।

তীব্রস্বরে শচীন্দ্র বলিল, "এখনি তাকে বিদায় ক'রে দাও। এক মুহূর্ত্তও যেন সে আমার বাড়ীতে না থাকে। তার সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নাই।"

রামতারণ বাবুর পত্নী সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিলেন। "কি বল্‌ছিস্, শচী? কাকে ও কথা বল্‌ছিস্, তা ভেবে দেখেছিস্? সে যে তোর মা—গর্ভধারিণী! দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছিল!"

"তুমি এখনই তাকে তাড়িয়ে দাও। বেশী কথা বলো না। আমি তার মুখ দেখ্‌তে চাইনে। সে রাক্ষসী আমার কেউ নয়।"

মোক্ষদা পুত্রকে দেখিবার আশায় স্পন্দিতহৃদয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শচীন্দ্রের সমস্ত কথাই তাহার কাণে গিয়াছিল। বৃদ্ধা স্তম্ভিত-ভাবে দরজার কবাট ধরিয়া দাঁড়াইল। এই কি তাহার পুত্র? যাহার মঙ্গল-কামনায় সে আপনার হৃৎপিণ্ডকেও উৎপাটিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই স্নেহের ধন, পুত্রের মুখে এই নিদারুণ মর্ম্মভেদী তিরস্কার! দারিদ্র্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণে মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সে যে পুত্রকে পরের হাতে বিসর্জ্জন করিয়াছিল, এই কি তাহার পরিণাম? শিল্পী সারা জীবনের সাধনাফলে হীরক, প্রবাল, মণি-মুক্তায় মণ্ডিত অপূর্ব্ব হিরণ্ময়ী প্রতিমা গঠন করিয়াছে সত্য, কিন্তু হায়! প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

অসহনীয় যন্ত্রণায় মোক্ষদার শোকতাপ-জীর্ণ হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে পৃথিবীর সমস্ত আলোক যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রামতারণ-পত্নী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঐ তোর মা এসেছে, একটু চুপ কর্ বাবা!"

শচীন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তুমি এখানে এসেছ কেন? এখানে কিছু হবে না, এখনই চলে যাও। ভিক্ষার দরকার হয়ে থাকে, অন্য জায়গায় যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে?"

মোক্ষদা! মোক্ষদা! পালাও, আর কেন? দূরে, বহু দূরে, লোকালয়ের শেষ-প্রান্তে পলায়ন কর! অবোধ রমণী! তুমি কেমন করিয়া জানিবে, মাতার স্নেহ-ক্রোড় হইতে যে হতভাগ্য বিচ্যুত, জননীর অনন্ত, অকৃত্রিম স্নেহধারা যাহার হৃদয়কে পবিত্র করে নাই, সে সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, প্রভূত ধন-সম্পদের মধ্যে থাকিয়াও কদাচিৎ মানুষ হইয়া উঠিতে পারে!

রামতারণের বিধবা কাতরভাবে বলিলেন, "ও শচী, তুই করিস্ কি? বুড়ী

যে সারাদিন উপবাসী, তার ছোট ছেলেটি মরণাপন্ন। এমন কাজ করিস্ না। দুপুরবেলা একটা অতিথি এলেও লোক তাকে না খাওয়াইয়া ছেড়ে দেয় না। আর তোর গর্ভধারিণী মাকে এমন সময় তাড়িয়ে দিচ্ছিস্?"

মোক্ষদা মুখের মধ্যে বস্ত্রাঞ্চল চাপিয়া মর্ম্মভেদী চীৎকার রুদ্ধ করিল। চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বহির্গত হইতে চাহিল, প্রাণপণ চেষ্টায় মাতা চক্ষের জল রুদ্ধ করিল। তাহার একটি দীর্ঘশ্বাসে শচীন্দ্রের সমস্ত কল্যাণ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে যে! এক ফোঁটা চোখের জলে পুত্রের সমস্ত সম্পদ্ ভাসিয়া যাইবে! মোক্ষদা কি তা পারে? সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল।

পশ্চাৎ হইতে রামতারণ-পত্নী বলিলেন, "দিদি, যেও না, তোমার পায়ে পড়ি, দাড়াও। ফের, ফের, পাষণ্ডের কথা তুমি ধরিও না। আমার মাথা খাও, ফের। যাঃ! চ'লে গেল? হায়! হায়! এ কি হ'ল!"

মর্ম্মপীড়িতা, উপেক্ষিতা জননী পশ্চাদ্দ্বার দিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন জয়ধ্বজা উড়াইয়া "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে স্বেচ্ছাসেবক যুবকগণ ভিন্নপথে শচীন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিতেছিল।

মুক্তিমুমুক্ষু স্বদেশভক্ত, লাঞ্ছিতা গর্ভধারিণীর মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুজলের ভিত্তির উপর বঙ্গলক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবে, উপেক্ষিতা ক্ষুৎ-পিপাসাতুরা জননীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া বঙ্গ-মাতার পূজার অর্ঘ্য রচনা করিবে! হা দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ!

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

রাজগৃহ।

প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের বর্ত্তমান নাম রাজগীর। জরাসন্ধ ও ক্ষত্রিয় রাজগণ বসুবংশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন ভারত এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুশাম্বজ বসু কর্ত্তৃক গঙ্গা ও শোণ নদের সংযোগস্থলে রাজগৃহ প্রথম নির্ম্মিত হয়। স্থাপতিবিদ্যা-পারদর্শী 'মহাগোবিন্দ' ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যের সহায়তা করেন। মগধের এই পুরাতন রাজধানীর অপর নাম গিরিব্রজ *

* অশোক অপেক্ষা গিরিব্রজের প্রাচীর ২৫০ বৎসরের পুরাতন। প্রাচীরের পরিধি ৩০ মাইল।

(গিরিব্রজ) ও কুশগড়পুর। উক্ত স্থানে প্রচুর কুশ-তৃণ জন্মে; সেই জন্য উহার নাম কুশগড়পুর হইয়াছে। প্রাচীন রাজগৃহ পাঁচটি পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় 'গিরিব্রজ' (পর্ব্বতবেষ্টিত নগরী) নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিম্বিসার-পুত্র অজাতশত্রু প্রাচীন মগধের রাজধানী গিরিব্রজ পরিত্যাগ করিয়া বৈভার ও বিপুলা পর্ব্বতের উত্তরে ও সরস্বতী নদীর পূর্ব্বে রাজগীর নামক স্থানে তাঁহার নূতন রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৫৬০ অব্দে বিম্বিসার কর্ত্তৃক ইহা প্রথম নির্ম্মিত হয়। এই নূতন রাজগৃহ পঞ্চকোণ, পরিধি ৩ মাইল। বুদ্ধদেবের রাজত্বকালে ও তৎপরেও কিছুকাল এই নূতন নগরী সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হইয়াছিল। রাজা অশোক যখন পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন, তখন ব্রাহ্মণগণকে উক্ত রাজগীর দান করিয়া যান। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগরে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। অদ্যাবধি এই স্থানে ব্রাহ্মণ অধিবাসী অধিক। কথিত আছে, প্রাচীন কালে মহারাজ অশোক 'রাজগৃহে' অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দক্ষিণার জন্য ৭৫০০ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞাহুতি-সমাপনান্তে তিনি কতিপয় ব্রাহ্মণকে রাজগৃহের শাসন-ভার অর্পণ করেন। সেই জন্য এ কাল পর্য্যন্ত রাজগৃহে অন্য জাতির উপর ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অধিক দেখা যায়।

জরাসন্ধের রাজত্বকালে গিরিব্রজ নগরী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ও নৈসর্গিক শোভায় অতুলনীয় হইয়াছিল। অভেদ্য গিরিশ্রেণী-পরিবেষ্টিত থাকায় উক্ত নগরী-মধ্যে বহিঃশত্রু-প্রবেশের কোনরূপ আশঙ্কা ছিল না।

মহাভারতে রাজগৃহ।

মহাভারতে বাসুদেবের উক্তি।

"হে পার্থ, ঐ দেখ, মগধের রাজধানী রাজগৃহ তাহার অতুল সৌন্দর্য্য বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি ইহার শস্যশ্যামল প্রান্তরে বিচরণ করিতেছে। কলকণ্ঠ পক্ষিগণের মধুর নিনাদে ইহা সর্ব্বদাই মুখরিত! এ নগরীতে জলকষ্ট নাই। উচ্চ প্রাসাদসকল কিরূপ সুন্দরভাবে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত রহিয়াছে। ইহা দৈন্য ও বিপৎপাত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্য, এই পঞ্চ হরিত বৃক্ষশ্রেণী-পরিশোভিত গিরিমালায় পরিবেষ্টিত থাকাতে 'গিরিব্রজ' অভেদ্য। পর্ব্বতের বক্ষস্থলে সুগন্ধি লোধ্রবৃক্ষ শাখায় শাখায় জড়াইয়া পুষ্পভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে, মধুর গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইতেছে। ঐ পবিত্র স্থানেই সর্ব্বলোক-বিদিত মহা-

মুনির ঔরসে শূদ্রাণী অসিনারার (উশিনরার কন্যা) গর্ভে কক্ষিভাত ও অন্যান্য সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন * * * এবং হে অর্জ্জুন, পুরাকালে এই পবিত্র স্থানে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশের রাজারা মহাত্মা গৌতমের আশ্রমে আগমন করিয়া শান্তিসুখে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া যাইতেন। ঐ দেখ, পার্থ, গৌতমের আশ্রম-পদপ্রান্তে মনোহর পিপ্পলী ও লোধ্রদ্রুম তাহাদের সুগন্ধি শীতল ছায়া বিতরণ করিয়া আশ্রমের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। পুরাকালে এই স্থানে নাগ, অর্ভদ, চক্রবাপীন, অরিকুল-নিসূদন নাগশক্তিকগণ ও মণিনামধেয় অপর অপর নাগগণ বাস করিতেন। স্বয়ং 'মনু'র আদেশে এই নগরীতে জলকষ্ট নাই, এবং কণিক্ক ও মণিমত উভয়ে সর্ব্বদা এই নগরীর উপর আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেছেন। জরাসন্ধ এই অপূর্ব্ব সুন্দর নগরে বাস করিয়াও পরিতৃপ্ত নহেন; অন্যান্য রাজগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার দুর্নিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরিপূরণ-বাসনা কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। যাহা হউক, হে পার্থ, অদ্য আমরা তাঁহার নিধন সাধন করিয়া অহঙ্কার চূর্ণ করিব।"

বৈশম্পায়নের বর্ণনা এইরূপ বলিয়া অমিত-পরাক্রমশালী উক্ত ভ্রাতৃগণ, যদুবংশ-সম্ভূত এক জন এবং দুই জন পাণ্ডব মগধ-রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া তাঁহারা দুর্ভেদ্য গিরিব্রজের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেই স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের অধিবাসীরা সর্ব্বদা প্রফুল্লিতভাবে ও সদানন্দে দিন যাপন করিতেছে। অহরহঃ আনন্দ-কোলাহলে গৃহাঙ্গন সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। * * * * হে ভারত, উক্ত ভ্রাতৃত্রয় স্নাতক ব্রাহ্মণ-বেশে নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। নগরীমধ্যে পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত, রত্নাবলী-শোভিত, ধনৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ বিপণিশ্রেণী দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কৃষ্ণ, ভীম, এবং ধনঞ্জয় এই সকল শোভা দেখিতে দেখিতে রাজবর্ত্ম অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রাচীন গিরিব্রজ নগরী এক সময়ে রাজপ্রাসাদে পরিশোভিত অহরহঃ আনন্দ-উৎসবে পরিপূর্ণ শৌর্য্যবীর্য্যশালী অসংখ্য নাগরিকে পরিবেষ্টিত ছিল, তাহা এক্ষণে ধ্বংসভগ্নস্তূপ ও মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেই মহানগরীর এইরূপ শোকাচ্ছন্ন পরিণাম দেখিলে হৃদয়ে অতীত স্মৃতি জাগরিত হইয়া হৃদয় মুহ্যমান হইয়া যায়।

খ্রীঃ ৪০০ শতাব্দে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতের প্রাচীন মহিমার এই ভগ্নাবশেষ সন্দর্শন করিয়া উক্ত নগরীর নিম্নলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।— পাঁচটী গিরিমালা প্রাকার-রূপে রাজধানী বেষ্টন করিয়া আছে। ইহা বিম্বিসার

রাজার প্রাচীন রাজধানী ছিল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহা পাঁচ ছয় 'লি' ও উত্তর-দক্ষিণে সাত আট 'লি' বিস্তৃত। এই স্থানে সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অশ্বজিতের সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করেন। এই স্থানেই নিগ্রন্থ একটি কূপ খনন করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি রাখিয়া দিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার মানসে বিষ-সংযুক্ত খাদ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অজাতশত্রু একটা কৃষ্ণ হস্তীকে মাদকসেবনে উন্মত্ত করিয়া তদ্দ্বারা বুদ্ধদেবকে নিধন করিবার প্রয়াস পান। এই নগরীর উত্তরাংশে গিরিমালার একটি সঙ্কীর্ণ অধিত্যকায় ভিষকরাজ জীবক অম্বুপালী উদ্যানে একটি বিহার আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধদেব ও তাঁহার ১২৫০ শিষ্য-মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করেন। অদ্যাবধি এই স্থানে অতীত ইতিহাসের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু হায়! সকলই জনহীন ও মরুময়। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও মুসলমান, সকল সম্প্রদায়েরই ইহা পবিত্র তীর্থ। প্রাচীন রাজগিরিতে উক্ত সকল সম্প্রদায়েরই এক সময়ে বিশেষ আধিপত্য ছিল। আমরা নিম্নে পৃথকভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আধিপত্য-কালের বর্ণনা করিতেছি।

১

জৈন প্রাধান্য।

শেষ তীর্থঙ্করের প্রধান শিষ্য বিম্বিসারের রাজত্বকাল হইতেই জৈন আধিপত্যের সূচনা হয়। এই স্থানে 'মহাবীর' সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য এই স্থান জৈনদিগের মহাতীর্থ। পরেশনাথ দেবের প্রস্তর মূর্ত্তি-পদতলে ক্ষোদিত লিপি দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি যে, খৃঃ ৮।৯ শতাব্দীতে বিপুলা পর্ব্বতে জৈনগণের একাধিপত্য ছিল। তৎপরে যখন ব্রাহ্মণগণের ও মুসলমানদিগের অত্যাচার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, জৈনগণ তখন ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তদবধি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত তথায় জৈনদিগের কোনও চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। মুসলমান-রাজত্বের অবসানকালে পুনর্ব্বার জৈনগণ রাজগিরির পার্ব্বত্য প্রদেশে বসবাস করিয়া জৈন দেবালয়সমূহের পুনঃসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই জৈনকীর্ত্তির সংস্কৃত ভগ্নাবশেষ এখনও পরিলক্ষিত হইতেছে।

২

বৌদ্ধ প্রাধান্য।

জৈনগণের সমসাময়িক বৌদ্ধগণও রাজগৃহে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। রাজা বিম্বিসার ও নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের অধিবাসিগণ বুদ্ধ-

দেবের বৈভার পর্ব্বতে অবস্থানকালে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ-মানসে সর্ব্বদা তাঁহার সমীপে আগমন করিতেন। নূতন রাজগৃহে নগরের দক্ষিণে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে দুইটি সঙ্ঘারাম স্থাপিত হইয়াছিল। অশোক কর্ত্তৃক প্রাচীন রাজগৃহ ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠেন। কিন্তু অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পর হইতেই ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য খর্ব্ব হইতে লাগিল। কয়েক শতাব্দী পরে পাটলিপুত্র নগরে সঙ্ঘমিত্ররাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্য পুনঃস্থাপিত হইলে, রাজগৃহবাসী ব্রাহ্মণেরাও তথায় পৌরাণিক ধর্ম্ম পুনঃ-স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে প্রাচীন বুদ্ধ-মন্দির সকল সংস্কারাভাবে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইতে লাগিল, এবং ত্বরায় অনেক হিন্দু তীর্থের অভ্যুদয় হইল। মগধের গুপ্তবংশীয় রাজগণের সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা এবংবিধ পরিবর্ত্তনসাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু খৃঃ ৬ শতাব্দীর প্রারম্ভেই পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের পতন ও বৌদ্ধগণের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণগণের কোন দেবালয় আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কথিত আছে, খৃঃ ৬ শতাব্দীতে কনোজ নগরে যশোবর্ম্মার ও গৌড়ে আদিশূরের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণ * তাঁহাদের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ ব্রাহ্মণ ও তান্ত্রিকগণের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সেই কারণে পুনর্ব্বার দেব-প্রতিমূর্ত্তি, তীর্থস্থান ও দেবালয় সকলের সংস্কার আরব্ধ হইয়াছিল। কালক্রমে যখন হিন্দুরা বৌদ্ধ ও জৈনগণের তীর্থ সকল পবিত্র জ্ঞানে পূজার্হ বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন, তখন হিন্দুগণ ভগ্নাবশিষ্ট বৌদ্ধমন্দির সকল হিন্দু দেব দেবীর মন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন।

৩

মুসলমান প্রাধান্য।

মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বেহার-জয়ের অত্যল্পকাল পরেই অনেক মুসলমান ধর্ম্মযাজক প্রাচীন রাজগৃহ পরম রমণীয় স্থান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত দেখিয়া তথায় অবস্থান করেন। এই সকল মহাত্মগণের মধ্যে বেহারের সুপরিচিত পীর মকদম শা ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ডে বাস করিতেন। তাঁহার সততা ও ধর্ম্মপরায়ণতা গুণে তত্রস্থ সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। বিপুলা পর্ব্বতের পাদদেশে ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ড অবস্থিত। পীর মকদম্ শার

* এই ঘটনা আমি কোনও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই না। 'বিশ্বকোষে'র মত সমর্থন করিয়া আমি লিখিলাম।

নামানুসারে ইহা মকদমকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মকদমকুণ্ড মুসলমানগণের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। অদ্যও মুসলমান সন্ন্যাসীরা পবিত্র জ্ঞানে এই স্থান দেখিতে যান। রাজগৃহে অনেক বৌদ্ধস্তূপের উপর মুসলমান কবর স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থ।

বৈভার, বিপুলাগিরি, বহ্মগিরি, উদয়গিরি ও শোণগিরি, এই পঞ্চগিরিমালা মেখলাকপে গিরিব্রজ নগরীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বৈভার পর্ব্বতের উপর 'সপ্তপর্ণী' গুহা অবস্থিত। খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে উক্ত গুহার সম্মুখভাগে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধ বৈঠকের অধিবেশন হয়। * উক্ত গুহার যথার্থ অবস্থান-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কানিংহাম 'শোনভাণ্ডার' † গুহাকে 'সপ্তপর্ণী' গুহা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে উক্ত দুই গুহা পৃথক্ গুহারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনসমাপনান্তে বুদ্ধদেব শোণভাণ্ডার-গুহার মধ্যে ধ্যাননিরত হইতেন। স্বচক্ষে উক্ত গুহাদ্বয় সন্দর্শন না করিলে কাহারও পক্ষে মত-মীমাংসা অসম্ভব, তজ্জন্য পৃথক্‌ভাবে বিভিন্নমতের বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ানের মত আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। খৃষ্টীয় ৪০০ শতাব্দীতে ইনি উক্ত স্থান পরিদর্শন করেন;—পর্ব্বতের দক্ষিণদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে তিন শত পদ অগ্রসর হইলে পিপ্পলগুহা ‡ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে বুদ্ধদেব মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ধ্যানস্থ হইতেন। পশ্চিমদিকে আরও ৫।৬ লি অগ্রসর হইলে চেতিগুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণমুক্তির পর প্রায় পঞ্চশত 'অর্হত' তাঁহার পবিত্র বাণী সকল সংগ্রহ করিবার মানসে সমবেত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৬৩২ অব্দে দ্বিতীয় চীন পরিব্রাজক হিয়ানসাঙ্গ উক্ত গুহা সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন,—'যে স্থানে বৈঠকের অধিবেশন হয়, উহা একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকা ¶ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' 'বেণুবন'-

---

* মহামুনি কশ্যপ এই সভা আহ্বান করেন। 'বিনয়' ও 'আভিধর্ম্ম'র শিক্ষাপ্রদানই এই সভার মূল উদ্দেশ্য।

† স্বর্ণভাণ্ডার।

‡ কানিংহাম এই স্থানে অজাতশত্রুর বৈঠক হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন।

¶ মহাপ্রাণ কশ্যপ 'ত্রিপিটকে'র নির্ব্বাণমুক্তির পর ৯৯৯ জন 'অর্হত' সমভিব্যাহারে তিনটি 'পিটক' আলোচন করিয়াছিলেন। সপ্তপর্ণী গুহায় বৌদ্ধ সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

হইতে ৫।৬ 'লি' দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা পর্ব্বতের উত্তরাংশে ইহা অবস্থিত, ও বাশ ঝাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। উক্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকার সম্মুখভাগে একটি বহু প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্ন ভিত্তিমূল দৃষ্টিগোচর হয়। কথিত আছে, রাজা অজাতশত্রু 'ধর্ম্মপিটক'-স্থাপন-মানসে সমবেত 'অর্হত'-মণ্ডলীর বাসের জন্য উক্ত অট্টালিকার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

ঐতিহাসিক 'বেগলার' কর্ত্তৃক লিখিত সপ্তপর্ণী গুহার বিবরণ :—"পিপ্পল-গুহা হইতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলে, পর্ব্বতের প্রবেশপথে কুশগড়পুরের পথ পাওয়া যায়, এবং তথা হইতে বৈভার পর্ব্বতের উত্তর-পাদদেশ পরিক্রমণ করিয়া তিনি কতকগুলি সজ্জিত গুহাশ্রেণী দেখিতে পান। গুহা সকলের আয়তন ৪ ফিট হইতে ১০ ফিট।" সকলগুলি পশ্চিমমুখে অবস্থিত। বেগলারের মতে, এই সকল নৈসর্গিক গুহাশ্রেণী সপ্তপর্ণী গুহা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মিঃ ষ্টান বেগলারের উক্ত বিবরণ সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে 'আদিনাথ' মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদয় ভূখণ্ড প্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণী গুহা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বেগলার মহোদয় বলেন যে, কানিংহাম কর্ত্তৃক উল্লিখিত বুদ্ধদেবের পবিত্র গুহা সকল সপ্তপর্ণী গহ্বরে অবস্থিত নহে।

মিঃ বিল কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ :—বৈভার পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে 'শোণ-ভাণ্ডার', এবং উক্ত পার্শ্বে সপ্তপর্ণী অবস্থিত।

'শোণভাণ্ডার' গুহার অবস্থান সম্বন্ধে চীন পরিব্রাজকদিগের সহিত কানিংহামের মতের কোনও প্রভেদ নাই। চীন পরিব্রাজকদিগের পথের অনুসরণ করিয়া কানিংহাম পিপ্পল-গুহার আবিষ্কার করেন। ইহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৪০ ফিট, ও প্রস্থে ৩০ ফিট। তাঁহার মতে, বৈভার পর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব ভূমিতে জরাসন্ধের সভা অবস্থিত। ইহা একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকার প্রকাণ্ড ভিত্তিমূলের ভগ্নাবশেষ। অট্টালিকার আয়তন ৮৫ স্কোয়ার ফিট। কানিংহাম 'শোণভাণ্ডার' গুহাকে সপ্তপর্ণী গুহা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। বৈঠক হইতে 'শোণভাণ্ডার' ৪৫০০ ফিট দূরে অবস্থিত। উক্ত ব্যবধানের মধ্যে বৈভার পর্ব্বত হইতে কিছু দূর অবরোহণ করিলে একটি নির্ঝরিণী দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ঝরিণী অতিক্রম করিয়া কিছু দূর অবরোহণ করিলে 'শোণভাণ্ডার' গুহা-স্থিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির পাদ

---

* আমাদের অধুনাতন যত্নও অনুসন্ধানে বেগলার মহোদয়ের লিখিত বিবরণ সম্পূর্ণ সমাত্মক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

প্রথম বৌদ্ধ বৈঠকের স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৪৭৮ অব্দে ইহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। 'সোণভাণ্ডার' গুহার সম্মুখভাগে শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা দৃষ্টিগোচর হয়, এবং উহার উক্ত অংশে অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র গহ্বর ছিল। ইহার আয়তন 'সোণভাণ্ডারে'র আয়তনে ৩/৪ ভাগের ২ ভাগ। দৈর্ঘ্যে ২২॥ ফিট, প্রস্থে ১৭ ফিট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর দৃষ্টে ইহা সপ্রমাণ হয় যে, উক্ত গুহা সম্মুখভাগে অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গুহার মধ্যে ৫০০ শত ব্যক্তির বাসস্থানের উপযুক্ত স্থান ছিল। বৈভার পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে মগধরাজ অজাতশত্রু এই সভাগৃহের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০ ফিট। উক্ত গুহায় একটি প্রবেশদ্বার ও একটি গবাক্ষ ছিল। অভ্যন্তরস্থিত প্রাচীরে ক্ষোদিত কোনও প্রকার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রবেশদ্বারে ও বহির্দ্দেশে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত বিবরণ দেখা যায়। বহু পরিশ্রমে এই কয়টী অক্ষরের অর্থ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। "পবিত্র গুহা", কারণ, বুদ্ধদেব এই স্থানে ধ্যান করিতেন; উক্ত গুহা ও ইহার পূর্ব্বাংশস্থিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গুহার সম্মুখদেশে একটি প্রস্তরময় অলিন্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তপর্ণী গুহা হইতে ৪৫০০ ফিট দূরে বৈভার পর্ব্বতের উত্তরপূর্ব্ব অংশে জরাসন্ধের সভা অবস্থিত। এই কারণে কানিংহাম এইরূপ প্রশ্ন করেন;—সপ্তপর্ণী গুহা এবং উক্ত বৈঠক সমসাময়িক কি না?

তাঁহার প্রশ্নের উত্তর ‡;—উক্ত গহ্বর সুচারুরূপে ক্ষোদিত হয় নাই, এবং এই স্থান হইতে উক্ত গহ্বর খনন করিবার পর তাহারই অবশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড দ্বারা জরাসন্ধের বৈঠক নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতএব ইহা প্রতীত হইতেছে যে, খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দে বুদ্ধদেবের সময় কিংবা তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে উক্ত গহ্বর নির্ম্মিত হইয়াছিল। অশোক অপেক্ষা ইহা ২৫০ বৎসরের পুরাতন।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-মুক্তির পূর্ব্বে সপ্তপর্ণী গুহার নাম 'ন্যগ্রোধ'—(অশ্বত্থ বৃক্ষ) গুহা ছিল; অতএব ইহা নিশ্চয় প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, গুহার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল।

---

* গুপ্ত রত্নভাণ্ডার লাভ করিবার মানসে একজন জমীদার ইহার মধ্যে বারুদ-সংযোগে গুহাটির ধ্বংস করিয়াছিলেন।

† বেতদেব নামক কোন মুনি এই স্থানে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। খৃঃ ২০০ শতাব্দীতে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়া ছিল।

‡ বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পূর্ব্বে 'সোনভাণ্ডার' গুহা বর্ত্তমান ছিল, এবং সপ্তপর্ণী গুহা তৎসমসাময়িক। অতএব তৎকালীন হিন্দুরা গুহা-নির্ম্মাণ কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন না, এরূপ মত ভ্রান্তিমূলক।

বৈভার গিরির যে অংশ 'উত্তরশাখা' নদী ও 'সরস্বতী' নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত, তাহার কোনও দুরারোহ স্থানে একটি বৃহৎ গহ্বর, এবং উক্ত পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদিকে কিছু অগ্রসর হইলে উহার দক্ষিণ অংশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আর একটি গহ্বরও বিদ্যমান আছে, এরূপ অনুমান হয়।

বৈভার গিরির উপর পাঁচটি অর্ব্বাচীন জৈন মন্দির ও একটি ভগ্নাবশিষ্ট শৈব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শৈব মন্দিরে চারিটি প্রস্তরময় স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে, এবং অদ্যাবধি অবশিষ্ট ৫০টি স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষ অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

বিপুল পর্ব্বতের উপর 'দেবদত্তে'র গুহা অবস্থিত। কানিংহাম এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইহার অবস্থান-সম্বন্ধে ফাহিয়ান লিখিয়াছেন,—পুরাতন নগর অতিক্রম করিয়া ৩ 'লি' উত্তরপূর্ব্ব অভিমুখে গমন করিলে 'দেবদত্তে'র গুহা দৃষ্টিগোচর হয়। গুহা হইতে ৫০ পদ অগ্রসর হইলে একখানি বৃহৎ চতুষ্কোণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ফাহিয়ান বলেন যে, একটি ভিক্ষু কোনও সময়ে উক্ত প্রস্তরখণ্ড পরিক্রমণ করিতে করিতে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মাৎসর্য্য, দারিদ্র্য ও নশ্বরতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এইরূপে স্বীয় জীবন ও চরিত্রের অপবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া তিনি পাপ-জীবন-বিসর্জ্জন-মানসে ছুরিকা উত্তোলন করিলেন। কিন্তু আত্মহত্যা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও জগদীশ্বরের অনভিপ্রেত, এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বহস্তে প্রাণসংহারে নিবৃত্ত হইলেন। পরমুহূর্ত্তেই আবার বিবেচনা করিলেন যে, যদিও ইহা সত্য, কিন্তু তথাপি বিষদগ্ধ তিন জন দস্যুর নিধন-সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। (পাপ অভিলাষ, পরদ্বেষ ও আত্মানভিজ্ঞতা) পরমুহূর্ত্তে তিনি ছুরিকা দ্বারা স্বীয় গলদেশ বিদ্ধ করিলেন। শোণিতের প্রথম উৎসে তিনি মুক্তির প্রথম সোপান "শ্রোতাপণ" প্রাপ্ত হইলেন। ছুরিকা অধিকতর বিদ্ধ করিয়া "অঞ্জামিল" ও জীবনান্তে নির্ব্বাণমুক্তি ও 'অর্হত' লাভ করিয়াছিলেন।

বিপুল পর্ব্বতের উপরিভাগে সমুচ্চ স্তূপের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

'মডারণ রিভিউ' হইতে সঙ্কলিত।

চৈনিক কবিতা।

গান।

['সী কিং' হইতে।]

(তার) রূপ দেখে হায়! ঘরের কোণে মন কি রাখা যায়?
(সে যে) পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার প্রতীক্ষায়;
(সে যে) বৃথাই এসে ফিরে গেল, তাই ভাবি গো হায়!

পথে আনাগোনার মাঝে কতই মানুষ যায়,
(আমি) কখনও চক্ষে অমন রূপ দেখিনি হায়;
(তাঁরে) দেখ্‌তে পেয়েও আজ কেন হায় যাইনি জানালায়।

ওড়নাখানি উড়িয়ে দিব অঙ্গুরোধার' পর,
তোমরা সবাই জেনে থাক আস্‌বে আমার বর,
(আমি) বরের ঘোড়ায় চ'ড়ে যাব করতে পরের ঘর।

ওড়নাখানি উড়্‌ছে আমার বসন্ত-হাওয়ায়,
ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ গো! ঐ দূরে শোনা যায়,
(আমি) পরের ঘর করবো আপন, আমায় দাও বিদায়।

বধূ।

['সী কিং' হইতে।]

ছেলেবেলার কথা ভাবি যখন জ্বলে সাঁজের দীপ;
মনে পড়ে গাঙ্গের ধারে তল্‌তা-বাঁশের দীর্ঘ ছিপ।
বাম দিকে সেই ঝরণা ঝরে, ডাইন দিকে বইছে নদী,
দূরে হলেও তোমরা আমার কাছেই আছ নিরবধি।
আঁখি যেঠাই দেখ্‌তে না পায়, মন ছুটে সেই বাপের ঘরে,
বাপের মায়ের ভায়ের আদর না পেয়ে প্রাণ কেমন করে।

ঝরণা ঝরার ঝঙ্কারে আর নদীর কুলুকুলুর সাথে,
তোমাদের আনন্দ-হাসি শুনি একা সন্ধ্যা রাতে।
কেবল কাঠের নৌকা চ'ড়ে সরল কাঠের দাঁড়টি বেয়ে,
মা গো আমার ইচ্ছা করে তোমার কাছে জুড়াই গিয়ে।

বর্ষাদিনে।

["সী কিং" হইতে।]

ওই গো আবার আকাশ ডাকে,—
আকাশ ডাকে ওই!
এমন সময় বাহিরে থাকে?—
ছুটীই বা তোর কই?
ওগো! তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো,
তোমায় ঘরে দেখে আমি নির্ভাবনা হই।

আবার আকাশ উঠ্‌ছে ডেকে;
কখন্ গেছে সেই;
বাড়্‌ছে বাতাস থেকে থেকে,
ফির্‌তে কি তার নেই?
ওগো! তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো;
তুমি ঘরে থাক্‌লে ত ভয় পাইনে কিছুতেই।

ভেঙ্গে বুঝি পড়্‌লো আকাশ,—
পড়্‌লো বুঝি ওই;
এমন দিনেও নাই অবকাশ
একলা সারা হই!
ওগো! তুমি ফিরে এস, ফিরে এস গো;
তোমার কাছে বসে আমি নির্ভাবনা হই।

মিলন গীত।

["সী কিং" হইতে।]

দক্ষিণ দেশের সরল তরু,—
অঙ্গে লতা লতিয়ে যায়!
ভাগ্যদেবীর আশিষরাশি
কন্যা-বরের সঙ্গে যায়।

দক্ষিণ দেশের নম্র তরু
ভুঞ্জে লতার সোহাগ-সুখ;
কন্যা-বরের হর্ষে জাগে
ভাগ্যদেবীর সহাস মুখ।

দক্ষিণ দেশের ফুল্ল তরু
ভুঞ্জে লতার আলিঙ্গন!
ভাগ্যদেবীর প্রসাদ লভি'
কন্যা-বরের হরিষ মুখ।

নব সপত্নী-সম্ভাষণ।

["সী কিং" হইতে।]

চক্কা-চক্কীর ডাকাডাকি নদীর চরে শোনা যায়,—
তুমি সতীযোগ্যা পতির ভাগ্যবতী তুমি হায়!
আন্ গো তুলে কুমুদমালা যেথানে পাস্ ডাহিন বায়,
এই কুমারীর অন্বেষণে প্রভু মোদের ছিলেন হায়;
অন্বেষিয়া না পেয়ে তায়, মৌনে গেছে দীর্ঘ দিন,
বিষাদভরে কেটেছে রাত শয্যামাঝে নিদ্রাহীন।
আন্ গো তুলে কুমুদফুলে আঁচল ভ'রে নিয়ে আয়,
আজকে বালা মোদের হবে বাঁশী-বীণার ঘোষণায়!

প্রবাসী।

["সী কিং" হইতে।]

হলুদবরণ পাখী, ওরে হলুদবরণ পাখী মোর,
শস্য খুঁটে নিস্‌নে, মোদের শস্য লুটে নিস্‌নে চোর।
বিদেশে বিদেশীর মাঝে পাইনে সাদর সম্ভাষণ;
চল্ রে উড়ে পালাই দেশে, যেথায় আছে আপন জন।

হলুদবরণ পাখী ওরে হলুদবরণ পাখী মোর,
ভুট্টা খুঁটে নিস্‌নে মোদের, নিস্‌নে ওরে ভুট্টা-খোর!
বিদেশে কেউ মন বোঝে না, মিথ্যা মুখের পানে চাই;
চল্ রে ভেসে আপন দেশে আপন জনের কাছে যাই॥

হলুদবরণ পাখী ওরে সোণার বরণ পাখী মোর,
মোদের রুটী নিস্‌নে লুটে পাখী রে পায় ধরি তোর;
বিদেশে বিদেশীর মাঝে থাক্‌তে মোরা পারিনে ভাই,
চল্ রে মোরা সবাই মিলে দেশের কোলে ফিরে যাই॥

প্রোষিত-ভর্তৃকা।

["সী কিং" হইতে।]

প্রভু মম যোদ্ধা তেজীয়ান,
বীরাগ্রণী বীর;
নৃপ আগে রণে তিনি যান
করে ধনু তীর।

যুদ্ধে যবে গেল প্রিয়তম,
সে অবধি কি গ্রীষ্মে কি শীতে,—
রুক্ষ কেশ ওড়ে শণ সম;
বাঁধিব সে?—কাঁহারে তুষিতে?

বৃষ্টি চাই, তবু সূর্য্য ওঠে
নির্মেঘ আকাশে ;
তারি কথা প্রাণে সদা ফোটে,
মনে তবু আসে।

কোথা মিলে বিস্মরণী লতা ?
আমি দ্বারে করিব রোপণ ;
জাগে যে কেবলি তাঁরি কথা,
হায় তাহে কেবলি রোদন !

রাজা ও রাণী।

["সী কিং" হইতে।]

"ওই শোন গো কাক কোকিলে ডাকে,
সভায় তব লোক দেখ না কত !"
"না না কোথায় কাক কোকিলে ডাকে,
শব্দ হ'ল ঝিঁঝির ডাকের মত।"
"ওই দেখ গো ভোরের আলো পেয়ে,
সভা তোমার উঠ্‌ছে যেন হেসে !"
"না না ও নয় দিনের আলো প্রিয়ে,
উদয় চাঁদের রশ্মি ওঠে ভেসে।"
"হায় প্রিয়তম ঝিল্লী-তানের মাঝে
সুখের কত নিদ্রা তব সনে ;—
ভাবনা শুধু—ফির্‌বে সভার লোক,
না জানি কি ভাব্‌বে তারা মনে !"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন ভারত।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

রোমকগণ প্রাচ্য হইতে হীরক, মণি, মুক্তা প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া যাইত। প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে এক জন রাসায়নিক হয় ত কহিবেন যে, কহিনুর অতি তুচ্ছ পদার্থ,—অবস্থার ভেদে কোহিনুর-রূপে পৃথিবীকে চমৎকৃত করিতেছে! কিন্তু পৃথিবীতে তত্ত্বজ্ঞ রাসায়নিক অতি অল্প। তাই তাহারা হীরকের ঔজ্জ্বল্য, আকার ও প্রাপ্তির সুবিধা ও অসুবিধা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়াই উহার মূল্যনিরূপণ করিয়া থাকে। যাহারা ধনশালী, সর্ব্বদাই তাহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রতিযোগিতা ঘটিয়া থাকে। আমার বন্ধুর যাহা আছে, আমার যদি তাহা না থাকিল, তবেই মনে হয়, আমি যেন বন্ধুর চক্ষে একান্ত হীন হইয়া পড়িলাম। এইরূপ ঐশ্বর্য্য-মদ-মত্ততায় রোমে ভারতীয় হীরকাদির মূল্য শত-সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কি প্রকারের মূল্যবান্ ভারতীয় প্রস্তরাদি রোমে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, প্লিনি তাঁহার বিরাটগ্রন্থে (Natural History) উহার তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকা পাঠে ইহাই অনুমিত হয় যে, রোমকগণ মূল্যবান্ প্রস্তরাদি বহুল-পরিমাণে ব্যবহার করিত।

কিন্তু হীরক প্রভৃতি অপেক্ষাও রোমকগণ মুক্তায় সমধিক আদর করিত। মুক্তার দ্বারা খচিত হইত;—বিলাসী রোমকগণ সেই পরি- আপনাকে একান্ত ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিত। শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়, জুলিয়াস সিজার ক্রটাস-জননী সার্ভিলিয়াকে যে মুক্তাটি উপহার দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য ৪৮৪৫৭ পাউণ্ড ছিল। রাণী ক্লিয়োপেট্রার যে মুক্তা-খচিত কর্ণাভরণ (Ear ring) ছিল, তিনি তাহা ১৬১৪৫৮ পৌণ্ড মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন!

মণিমুক্তাদির ন্যায় ভারতের রেশমও রোমে সমধিক প্রচলিত ছিল। রোমকগণ মনে করিতেন যে, রেশম এতই বহুমূল্য ও সূক্ষ্ম যে, উহার দ্বারা পুরুষের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইতে পারে না। রেশম পুরুষের জন্য নহে, রমণীর জন্য। শেষে এমন সময়ও রোমে আসিয়াছিল যে, পুরুষগণও ভারতবর্ষের রেশমে নির্ম্মিত বস্ত্রের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সর্ব্বদা অকুণ্ঠিতচিত্তে রোমক-সমাজে বিচরণ করিত।

রোম যে দিন প্রথমে রেশমের কাহিনী শুনিয়াছিল, তাহার পর প্রায় সার্দ্ধ-দ্বিসহস্রাব্দীর মধ্যে উহার মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। আরেলিয়নের রাজত্ব-কালে রেশম কনকের দরে ওজনে বিক্রীত হইত। খৃষ্টজন্মের ছয় শতাব্দী পর পর্য্যন্ত ইউরোপীয়গণ রেশমের প্রকৃতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। রেশম যে কি, তাহা তাহারা জানিত না। কেহ মনে করিত, রেশম কোনও বিশেষ বৃক্ষপত্রের বা পুষ্পের সহিত সংযুক্ত থাকে; বিক্রেতৃগণ বহু যত্নে তথা হইতে উহা সংগ্রহ করে। কেহ বা মনে করিত, উহা একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম পশম বা কার্পাস। একটি পোকা হইতে যে রেশমের উৎপত্তি, ইহা যাহারা জানিত, তাহারাও সে পোকাটির বিবরণ-সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, শম্বুকাকৃতি একপ্রকার কীট অতি দীর্ঘ সূত্র প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষশাখায় লম্বিত করিয়া দেয়;—সেই সূত্রই রেশম নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—*—

——The Flow'r and choice
Of many provinces from bound to bound,
From Arachasia, from Candaor east,
And Harglana, to the Hyrcanian cliffs
of Caucasus———
From Samarchand by Oxus, Temir's throne,
To Agra and Lahore of Great Mogul,
Down to the Golden Chersonese—
And utmost Indian Isle Taprobane.

Milton.

এরিয়ানই সর্ব্বপ্রথমে প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের নিকট পরিচিত করিয়াছিলেন। মুসিরিস ও বারেশ বন্দরের কথা কহিয়াই তিনি একেবারে কুমারিকা অন্ত-রীপের কথা কহিয়াছেন; তৎপরেই তিনি কল্‌চসের (বর্ত্তমান কিল্‌কার) মুক্তা-ব্যবসায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কল্‌চসের পরেই এরিয়ানের গ্রন্থে (The circum-navigation of the Erythraean Sea) করমণ্ডলতীরের কাহিনী জানিতে পারা

যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য যখনি পাঠে মনে হয় যে, এই সকল স্থানের বিবরণ তিনি চাক্ষুষ জানিতেন না। কারণ তিনি কহিয়া গিয়াছেন যে, এই সকল স্থানের নিকটে রাক্ষসগণ বাস করিত। তাহারা দেখিতে ভয়ানক বীভৎস ও রক্তাক্ত ছিল।

এরিয়ানের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, মিশরের বাণিজ্য-তরণী সিন্ধু-তীরে পাটল নগর পর্য্যন্ত আগমন করিত। তথায় মণি, মুক্তা, রেশমসূত্র, কার্পাস ও রেশম-বস্ত্র, লাল মরিচ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রবাল, সোহাগা, নানাবিধ কাচপাত্র, সামান্যপরিমাণ মূল্যবান্ প্রস্তর, ভারতবর্ষে অপরিজ্ঞাত কোনও কোনও গন্ধদ্রব্য, রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্য, মুদ্রা ও নস্য দিয়া মিশরে প্রস্থান করিত। কিন্তু নর্ম্মদার তীরে বরোচ বন্দরে বাণিজ্যের অধিক সুবিধা ছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে দ্রব্যাদি আসিয়া তথায় জমা হইত। এরিয়ান এই বন্দরকে বারিগজা (Barygaza) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে এখানে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিও আমদানী হইত;—ইতালীয়, গ্রীক ও আরবীয় মদ্য, পিত্তল, টিন, সীসক, নানাবিধ কোমরবন্ধ, শ্বেতবর্ণ কাচ, সিন্দুর, সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। বণিক্‌গণ তথা হইতে ভারতবর্ষের মূল্যবান্ প্রস্তরাদি, করিদন্ত, নানাবিধ কারুকার্য্যহীন ও পত্র-পুষ্প-সুশোভিত কার্পাস-বস্ত্র ও মরিচ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

বরোচের পরেই মুসিরিস্ বন্দর। সেখানেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার দ্রব্যাদির আমদানী ও রপ্তানী হইত। এরিয়ান বলেন যে, মুসিরিস্ বন্দরে বহু পরিমাণে নানাবিধ ও রেশমী বস্ত্র, উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য, কচ্ছপ-পৃষ্ঠ, হীরক, নানাবিধ উজ্জ্বল ও অত্যুৎকৃষ্ট মরিচ পাওয়া যাইত। রোমের রাজবিধি যে সকল ভারতীয় দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করিয়াছিল, সেই তালিকার সহিত এরিয়ান-প্রদত্ত তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এরিয়ানের বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে।

বাঙ্গালীর জাহাজ সমুদ্রপথে গমনাগমন করিতেছে শুনিয়া আমরা কতই আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু এরিয়ান কহিয়া গিয়াছেন, ভারতের জাহাজ (Country) ভাগীরথীমধ্যে ও মালাক্কা রাজ্যে গমনাগমন করিয়া সর্ব্বদা বাণিজ্য করিত। করমণ্ডলতীরবাসী বণিকগণ নিজেদের তরণী লইয়া সমুদ্রপথে মালাক্কাতে বাণিজ্য করিত; মুসিরিস্ বন্দরে যে সর্ব্বদাই ভারতের বহুসংখ্যক তরণী ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি ও গৌরব প্রকাশ করিত, প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ দিয়াছেন। ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, তপ্রোবন (Taprobane) বহিয়া এ দেশীয় অর্ণবযান নানা স্থানে গমনাগমন করিত।

অগষ্টসের শাসনকালে ষ্ট্রাবো তাঁহার ভূতত্ত্বের রচনা করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভেই কহিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার উপায় নাই। সে দেশে প্রতীচ্য বাণিজ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতেও সে দেশের বিশেষ কোনও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। * আলেকজান্দারের কর্ম্মচারিগণ ভারতবর্ষের যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ষ্ট্রাবো তৎসমুদয়ের সাহায্যেই তাঁহার ভূতত্ত্বের রচনা করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবোর ৫০ বৎসর পরে জ্যেষ্ঠ প্লিনির অভ্যুদয় হইয়াছিল। তিনিও আলেকজান্দারের কর্ম্মচারীদিগের লিখিত বিবরণ হইতে তাঁহার গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে প্রধানতঃ দুই তত্ত্বের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। আরব উপসাগর হইতে মালাবার-তীর পর্য্যন্ত গমনাগমনের সমুদ্রপথের বর্ণনা, এবং দ্বিতীয়টি তপ্রোবন (Taprobane) দ্বীপের কাহিনী। কেহ কেহ বলেন যে, তপ্রোবন বর্ত্তমান সুমাত্রা; কিন্তু পণ্ডিত মণ্ডলীর অধিকাংশের মত যে, উহা সিংহল।

প্লিনির ৮০ বৎসর পর টলেমি তাঁহার গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। তিনি পরবর্ত্তী পণ্ডিত হিপারকাসের নক্ষত্রতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া পৃথিবীমধ্যে ভূগোল জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। মানুষ তখন নক্ষত্রের সহিত পৃথিবীর তুলনা করিয়া পৃথিবীকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। টলেমি আরকট্‌কে "পরিয়াটি রেজিয়া" (Arcati Regia), কাবেরী নদীকে "চাবেরিস্" (Chaberis) ও করমণ্ডলকে "সরমণ্ডলম্" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

টলেমি শবর জাতিকে শবরী ও পুলিন্দ জাতিকে পুলিন্দই নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনি শবর জাতিকে শুয়রই ও পুলিন্দ জাতিকে মনিন্দই নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

* * * প্লিনি লিখিয়াছেন যে, পাটনা ও গঙ্গা নদীর দক্ষিণে ওয়ারী জাতি, কলিঙ্গ ও গঙ্গার মধ্যে মণ্ডী ও মল্লী জাতি ও টলেমির গ্রন্থানুসারে গঙ্গার উত্তরে মুরন্দই জাতি ও গঙ্গার দক্ষিণে মণ্ডলি জাতি বাস করে।" † তাঁহারই গ্রন্থে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়।

* He (Strabo) observes, that even commerce had c little towards an accuriate investigation of the country (Ind of the merchants from Egypt and the Arabian gulf had eve far as the Ganges,

† বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত; শ্রীযুত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বহুদিন হইতে ভারতের উত্তরভাগ দিয়া স্থলপথে বাণিজ্য চলিত। ভারতবর্ষ হইতে পারস্যে এবং তথা হইতে জলপথে কস্তুরী হৃদে ভারতের পণ্য নীত হইয়া ইউরোপে প্রচারিত হইত। নৃপতি সেলিউকসের বংশধরগণ যতদিন পর্য্যন্ত প্রাচ্য ভাগের কর্ত্তা ছিলেন, ততদিন তাঁহার প্রজাবর্গ ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হইয়াছিল। রোমকগণ যখন ইউফ্রেতিস নদীতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তখন তাহারা সেলিউকসের বংশধরদিগের সযত্ন-রক্ষিত ভারত-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া উহাকে আরও সুরক্ষিত করিয়াছিল। কিন্তু পারথিয়ানগণ তখন কস্তুরী হইতে চীন-সীমান্তে তাতার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া পূর্য্যাটক বণিক্‌দিগকে ভীত করিত, এবং তাহাদিগের পণ্যসম্ভার লুণ্ঠন করিয়া লইত।

চীনের ঐতিহাসিকগণ কহেন যে, রোমকগণ ভারত-বাণিজ্য-রক্ষার্থ চীন নৃপতির সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিতে একান্ত প্রয়াসী হইয়াছিল।

যে কালে যাঁহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশে পৃথিবীর নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন, তাঁহারাই সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সেই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ভূগোলবিদ্‌গণ অনেক সময়ে পুস্তকাদি রচনা করিতেন। তখন পৃথিবীর যে পরিমাণ অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ তাহার মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। হেরোডোটাস্ প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ এইরূপ মানচিত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। টলেমির পূর্ব্বে যে কখনও মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

৪ঠা কার্ত্তিক।—শিশুটি আমার বিরহে কেমন আছে, কি করিতেছে, কে জানে। আমি ত তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। এক একবার মনে হয়, এই বেলা ত্যাগ করিয়া তাহারই প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করি। কিন্তু অর্থের অভাব মিটাইব, তাই ভাবিয়া নিরস্ত হইতে হয়। আমি কাছে থাকিলে সে কতটা সুস্থ থাকে, অনেক সময় অপর কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারে না, কেবল আমি কোলে লইলেই চুপ করে। আজ হয় ত সে কত কাঁদিয়া কাকে তাঁহাকে শান্ত করিবে, তাই ভাবিতেছি।

এই অনন্ত মানবজীবনটা কি অকারণেই কাটিয়া গেল? এমন নিষ্ফল জন্ম কি আর কেহ কখনও পাইয়াছে কি না, সন্দেহ। চিরদিন কেবল স্মৃতির উত্তপ্ত ভস্মরাশি বক্ষে বহন করিয়া বেড়াইতেছি। যে কাজে, যে উদ্দেশ্যে হাত দিতে যাই, কিছুতেই সফলতা হইতে পারিতেছি না। দেখিতেছি, কত লোক এই সংসারে আসিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য নীরবে সাধন করিয়া, নীরবে জগতের চরণে বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের কাহারও হৃদয়ে আমার ন্যায় এই বিশ্বগ্রাসী দুরাশার উদয় ত কখনও হয় না। আমি যাহা পাই, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না কেন? মাটীর কীট আজীবন মৃত্তিকাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না কেন? হায়! কোথায় তুমি, মহত্ত্ব! কোথায় তুমি, পতিব্রতা! কোথায় তুমি, অনন্ত জীবন!

৮ই কার্ত্তিক।—শ্রাবণ মাসের "পুরোহিত" পত্রে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল দুরাশয়ের "প্রদীপে"র সমালোচনা উপলক্ষে টীকা করিতে গিয়া, সম্পাদক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিতেছেন;—"তাঁহার অনেক কবিতাই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা বহুলাংশে উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।" শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের উপর যথেষ্ট অনুরাগ সত্ত্বেও আমি তাঁহার এই মন্তব্য পাঠ করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি কলমদিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কথাটার বিশেষ কোনও অর্থ উপলব্ধ হইল না। স্বীকার করি, রবীন্দ্রের অনেক কবিতা বড়াল কবির দুই চারিটি কবিতার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু তুলনায় সমালোচনা করিবার এইরূপ প্রথা নহে। বিদ্যানিধি কি বলিতে চান, যে, রবীন্দ্রের সকল কবিতাগুলিকেই বড়াল মহাশয় অতিক্রম করিয়াছেন? তুলনায় তাহাই বলিতে হইলে উভয়েরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লইয়া বিচার করিতে হয়। এইরূপ বিচারে বড়াল-কবিকে রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে দাঁড় করাইতেও সাহসী হন, তিনি নিশ্চয় সমালোচক, সন্দেহ নাই। তাঁহার অসার মন্তব্যের প্রতিবাদ করাই বিচারক। আমি এই ডায়েরীতে হয় ত এরূপ অনেক মূর্খতার পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং, তাহার উপর আর একটা বাড়াইলে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই। কবি এই স্তুতিবন্দে নিজের মস্তিষ্কটা স্থির রাখিতে না পারিলেই সম্ভাবনা।

৯ই কার্ত্তিক।—পঞ্চুরামের জন্য চারি দিনের ঔষধ কিনিয়া [illegible] আজ তাহা ফুরাইবে। সুতরাং অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে গাড়ীতে কলিকাতায় আসিলাম। দেখিলাম, শিউটির অত্যন্ত সর্দ্দি বাটীর আলোকদেরও অবস্থা তদ্রূপ। আমারও নাক দিয়া জল

সময়টা বড়ই খারাপ। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সময়, শীতের প্রারম্ভে একটা বিষম ঘাতাস বহিতেছে; তাহাই বোধ হয়, এই সর্ব্বব্যাপী সর্দ্দির কারণ। মহা ঐক্য গুটিকে বিশেষ সাবধানে রাখিতে বলিয়াছি। জানালা দিয়া ঘরের ভিতর ঠিক প্রবেশ করে, উহা নিবারণের জন্য একজন ছুতার মিস্ত্রীকে পাঠাইলাম। সে কল অসুবিধা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিবে। পাড়ীওয়ালী ব্রাহ্মণী তাঁহার ভ্রাতার পত্নীবিয়োগজনিত ভীষণ ভাবনিষ্ঠতার সহিত যেরূপ সুদক্ষা, মাসকাবার হইতে না হইতে ভাড়ার টাকাটি আদায় বিষয়ে যে আগ্রহান্বিতা, তাঁহার গৃহাধিষ্ঠিত এই গরীব ভদ্রসন্তানের সুবিধাসম্বন্ধে সেরূপ নহেন। বর্ষাকালটা বাড়ীখানায় এক প্রকার ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হইতেছে; কবে এই কবিত্বপূর্ণ মস্তকের উপর নামিয়া আসিয়া উহার সমস্ত ইটপাটকেল রাশি পঞ্চভূতে মিশ্রিত করিয়া দেয়! এমনই গৃহের অবস্থা!

৩ কার্ত্তিক।—ডাক্তার বাবু পঙ্কুরামকে দেখিলেন। [illegible]
পূজা উপলক্ষে তিন দিন অবকাশ আসিতেছে। সুতরাং ঐ তিন দিন [illegible] রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতে পারিব।

জর্জ্জ ইলিয়টের ডানিয়েল ডেরোণ্ডা তাঁহার এক জন নায়িকাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সারগর্ভ।—"Try to care about something in this world besides the gratification of small selfish desires. Try to care about what is best in thought and actions—something that is good and great apart from accidents of your own lot." পুনশ্চ, "It is the curse of so many people that all passion is spent in that narrow round, for want of interests and sympathies to make a larger home for it." উপদেশ অতি সুন্দর বটে, পরন্তু এতদনুসারে জীবনকে নিয়মিত করা ত সহজ নহে। আমি সেই "thought and action"এর জন্য চেষ্টা করিতেছি। সফল হইলাম কই?

আজ ঠিক।—গাড়ীর সময়-পরিবর্ত্তন হওয়াতে শনিবারে কলিকাতা যাইবার না গৌরব [illegible] হইয়াছে। অদ্য দুইটার গাড়ীতে যাত্রা করিয়া সাড়ে তিনটায় [illegible] try ship [illegible] দেখিলাম। [illegible] বাজার হইতে তাহার জন্য একটা টুপী করিত। [illegible] নরাছি। তত ভাল নহে। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ দোকান-সমূহে অনু- বারের [illegible] কয় দিবস ফিরিয়া আসিয়াছি। এখনও শীতের টুপী বাহির হয় অর্ণবর্ষ।

[illegible] চারুচন্দ্র সোমবার আসিয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়াছেন। কাম্ব [illegible] হয় নাই। আমার ইচ্ছা ছিল, তিনি কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া

শিশুটির তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে সম্মত হইবেন না জানিয়া আমি কোনও কথা বলি নাই। ছোট দাদা মহাশয় দেশে গিয়াছিলেন। বাবার শরীর ক্রমশঃ অশক্ত হইয়া পড়িতেছে। বাটীর বালক-বালিকাগণও ভাল নহে। চারিদিকে কেবল ব্যাধি ও বিষাদ। জীবন নিতান্ত দুষ্কর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১২ই কার্ত্তিক। আজ পঞ্চুর জ্বর বাড়িয়াছে। শিশুটি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কৃশ হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানের মনে কি আছে, তিনিই জানেন। আমারও ভাবনার অন্ত নাই। মনের নিমিত্ত আপনাকে প্রস্তুত করিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু শিশুটির ঈষৎ-হাস্য-প্রফুল্ল দন্ত-কৌমুদী-পরিশোভিত মুখটি দেখিয়া আশা না করিয়া থাকিতে পারি না। জগতে মানুষের আয়ত্তাধীন কি আছে? সহিলে এই জীবন পর্য্যন্ত তর্পণ করিতে পারিতাম।

কত উচ্চ আশা-ভরসা লইয়া সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলাম, একটাও ত রীতিমত সফল করিতে পারিলাম না। এখনকার প্রধান অবলম্বন ও একমাত্র উদ্দেশ্য সাহিত্য, তাহাও ত ক্রমশঃ দুরাশায় পরিণত হইতেছে। সাধনা নাই, উৎসাহ নাই। জীবনটা বিষম বৈচিত্র্যহীন। সেই একই প্রকার অবসাদের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। নিজের ভ্রম অনেক দিন বুঝিয়াছি। এখন বুঝিয়াও কোনও ফল নাই। সংশোধন করিবার উৎসাহ কোথায়? ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না হইলে আমার আর উদ্ধার নাই। আমার দাবী-দাওয়া কিছুই নাই। তবে তিনি যোগ্য অযোগ্য সকলকেই তাঁহার স্নেহরশ্মি, করুণা-বারি বিতরণ করেন, এইমাত্র ভরসা।

১৩ই কার্ত্তিক। শিশুটির জ্বর বাড়িয়াছে বই কমে নাই। প্রফুল্লতার হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বে দুই খাইবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিত; কয় দিবস তাহা হইতেও তেমন প্রবৃত্তি নাই। ডাক্তার মহাশয়ের ঔষধ তিনবার করিয়া চলিতেছে। কত ঔষধ যে খাইতেছে, তাহার সীমা নাই। তাহার জন্য যে কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাই না। আমার হস্তপদ যেন একেবারে শিথিল হইয়া আসিতেছে। বন্ধুগণ স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য জিদ করিতেছেন। কোথায় লইয়া যাই, তাহাও ভাবিয়া পাই না। শ্বশ্রূ মধুপুরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি যান, তাঁহাকে একটা বাটীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে বলিব। দেখি, যদি ইহাতেও কোনও উপকার হয়।

অর্থের বিলক্ষণ টানাটানি পড়িয়াছে। গোবার দুধ, চাউল প্রভৃতির অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছে। সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা হইতে কতদিন পারি,

চালাইতে হইবে। তার পর দেবতার উপর নির্ভর। অসীম অকর্ম্মণ্যতা দিন দিন বাড়িতেছে। কত কষ্ট স্বীকার করিয়াও মাসান্তে এক শত টাকার উপর ঘরে আসিতে পারিতেছি না।

১৪ই কার্ত্তিক।—কাল রাত্রি হইতে জ্বর বর্দ্ধিত হইয়া আজ সমস্ত দিবস ভোগ হইতেছে। তবে একটু কমিতেছে বলিয়া মনে হয়। কল্য সকালে ডাক্তার মহাশয়কে আবার দেখাইব। তিনি যে বলিয়াছিলেন, লিভার রোগের চিকিৎসা কিছুই নাই, তাহা ঠিক। মাঝে বেশ ভাল হইয়া আসিতেছিল। আবার একটু সর্দ্দি উপলক্ষ্য করিয়া বাড়িয়া উঠিল।

শিশুটি বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। আমি কোলে করিয়া মাঝে মাঝে রাস্তায় ভ্রমণ করি। কিন্তু যে প্রকার শীতল বাতাস বহিতেছে, তাহাতে বেশীক্ষণ থাকিতেও আশঙ্কা হয়।

বন্ধুবর উ— মজুমদার মহাশয় লাহোরে বদলী হইয়া যাইতেছেন। বিদায় ভোজের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সে দিন মুনীন্দ্র বাবু এক ভোজ দিয়াছিলেন। আমি নিমন্ত্রিত হইতে পারি নাই। আজ সন্ধ্যার পর পল্টু বাবু একটা ভোজ দিলেন। এ সব বিষয়ে আমার তাদৃশ উৎসাহ নাই। কোন্ বিষয়েই বা আছে? সে কথা ধরি না। উ— বাবু লোকটি বড় সুন্দর। বন্ধুদের প্রতি স্নেহ-মমতা যথেষ্ট। তাঁহার অভাবে কলিকাতার আনন্দ অনেকটা কমিয়া যাইবে। তা যাউক, তাঁহার নিজ নিজ উন্নতিই ভাল।

১৫ই কার্ত্তিক।—সকালে সাতটার পর ডাক্তার-বাবু শিশুটিকে দেখিলেন। হে বিশ্বের বিধাতা, জগতের অধিপতি, হৃদয়ের দেবতা! আজ আমি একান্ত ভাবে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়াছি। শান্তির পিপাসায় মন ক্রমশঃ একেবারে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। সংসারে এমন কিছুই পাইলাম না, যাহাকে লইয়া অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে ভুলিতে পারি। তুমি আমার অন্তর-বাহির সর্ব্বদা দেখিতেছ। কি বিষম জ্বর এই তোমার অধম সন্তানকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নহে। এই হীন মানব-জীবনের যাবতীয় পদার্থই পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম,—শান্তির কোথাও মিলিল না। মহাজন-মুখে শুনিয়াছি, একমাত্র তুমিই সকলের প্রেমময়িতা, সর্ব্বব্যাধির অব্যর্থ ধন্বন্তরি। আমি নিতান্ত অবিশ্বাসী, সন্দেহের কলুষপরায়ণ; তথাপি তোমায় চিরদিন ডাকিয়া আসিতেছি। তোমার কৃপায় চরণ-যুগল নীরব নয়ন-জলে অভিষিক্ত করিয়াছি। মনে করিয়াছি, তুমিই কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার সেই সর্ব্বতোমুখিনী ভক্ত

বাণী ত শুনিতে পাইলাম না। আমি এই সর্ব্ব-সন্তাপ-জর্জ্জরিত সংসারের বন্ধন ছেদন করিতে চাই। আমি আকাশ-পাতাল খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি; সুখের সন্ধান কোথাও পাই নাই। আজ তুমি যদি এই অধমের পরিত্রাণ-ভার স্বহস্তে গ্রহণ না কর, তবে ইহার মৃত্যু অনিবার্য্য। স্বপ্নে হউক, জাগরণে হউক, সত্যে হউক, বা কল্পনাতেই হউক, আজ একবার তুমি তোমার প্রসন্ন অভয়মূর্ত্তি ইহার নিকট প্রকাশিত কর।

১৬ই কার্ত্তিক।—হায়! আমার এই পুণ্য-পিপাসা কি কখনও পরিতৃপ্ত হইবে না? আমার জীবনটা কি সর্ব্বপ্রকারেই নিতান্ত বিফল হইয়া যাইবে? কত দিন, কত বৎসর ধরিয়া কেবল আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এই জীবনে একটা না একটা কিছু মহত্ত্ব দেখাইয়া যাইব। কতবার কঠোর প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি আমি পাপের বন্ধন মোচন করিয়া, বাসনার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, এই হৃদয়-মন পবিত্রতার লীলা-ক্ষেত্র করিয়া তুলিব। স্বার্থের কথা আদৌ ভাবিব না, সকল প্রকার পশুত্বের চিহ্ন প্রক্ষালিত করিয়া চারি দিকে দেবত্বের প্রেমমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিব। আজ দেখিতেছি, অতীত জীবনের প্রত্যেক অধ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, আমার নিজেরই ভ্রান্তিবশতঃ সকল প্রতিজ্ঞাই খণ্ড হইয়া গিয়াছে। আর, শুধু ভ্রান্তিই বা বলি কেন? অনেক সময়ে বুঝি কোনও প্রতিকার করিতে পারি নাই। সুতরাং আজ এই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, পুণ্য-জীবনের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক অনুরাগ থাকিলেও, সে অনুরাগে কোনও কাজ হয় না। পুণ্য-পবিত্রতা কে না ভালবাসে? কিন্তু জন সংসারের সকল প্রলোভন অতিক্রম করিয়া উহার অমৃতরসাস্বাদনে সমর্থ হয়? আমার এই হৃদয় নিতান্তই দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের অপেক্ষাও দুর্ব্বল; তাই যে প্রতিজ্ঞারই প্রভাব ইহার উপর স্থায়ী সুফল উৎপাদন করিতে পারে নাই। কেবল আশা করিয়া বসিয়া আছি, কবে ভগবান্ স্বয়ং কৃপা করিয়া এই পাপীর উদ্ধারসাধন করিবেন।

১৭ই কার্ত্তিক।—Daniel Deronda উপন্যাসের পাঠ শেষ হইল। জর্জ্জ ইলিয়টের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হউক, একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠ করিতে করিতে কবির মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। স্থানে স্থানে কবি করুণরস-উদ্দীপনে এত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, মন আপনা হইতেই বিষাদ-মেঘে ঢাকিয়া যায়, এবং নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইয়া আইসে। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে গ্রন্থের নায়ক ডেরোণ্ডা ঐতিহাসিক অতি সুন্দর। স্ত্রী-চরিত্রগুলির ভিতর গ্রন্থ-নায়িকা মিরা ও মে

ঘন কবির অসাধারণ নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্যের পরিচায়ক। আমার বোধ
কবি Middlemarchএর ডরোথি-চরিত্রে আপনার অক্ষুণ্ণকার্য্যতা স্মরণ
াই বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহার গোয়েন্‌ডোলেন্‌কে আঁকিয়াছেন। ডরোথির
আমি আদৌ কোনও প্রকার সহানুভূতি দেখাইতে পারি নাই; কিন্তু গোয়েন-
নের দুর্ব্বলতা ও তাহার পরিণাম দেখিয়া পাষাণের চক্ষেও জল আসে। এই
রিয়া হৃদয়মধ্যে চাহিয়া দেখিলে আমরা সেখানে এই ক্ষীণা, অনুতাপ-
তা, মাতৃপরায়ণা রমণীর বিষাদ-প্রসন্ন প্রতিমূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই।
থ নিরাশ হইয়া বালিকা হয় ত পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে ডেরোণ্ডাকে আপনার
হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়াছিল। বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন। তবুও
চরিত্রশক্তির ক্ষয় দেখিলাম না। সে প্রতিজ্ঞা করিল,—I shall live. I
better.

কার্ত্তিক।—বৃহস্পতিবার রাত্রি হইতে অত্যন্ত বর্ষা নামিয়াছে। অনবরত
তেছে। আজ কিছু ভাল। দুইটার গাড়ীতে কলিকাতায় আসিয়া পশু-
দেখিলাম। শিশুটির জ্বর আর তেমন বুঝিতে পারা যায় না।
তাহাকে বাহিরে লইবার উপায় নাই। সমস্ত দিবস কেবল ঘরের ভিতর
য়া তাহার মনটা কেমন খারাপ হইয়া রহিয়াছে। কেবল খুঁৎ খুঁৎ করি-
সামান্য কারণেই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। আজকাল তাহার রাগে
মার রক্ষা নাই। যাহার কোলে থাকিবে, তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া
বিয়া তুলিবে। যদি বসিয়া থাকে, তবে আরও মুস্কিল। কাহারও
ঠিবে না, কেবল কাঁদিবে। সে দিন আমার গলার কাছে যে দাঁতের
ইয়া দিয়াছে, তাহা এখনও ঘুচে নাই। তবু আমার গায়ে পিরাণ ছিল।
ভর ধার বড় সামান্য নয়। * * * দারিদ্র্যের অশেষ দোষ।
া কেন, সংসারের দোষ অশেষেরও বেশী।

কার্ত্তিক। আজ "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র একটি মাসিক অধিবেশনের
ণ পাইয়াছি। আমিও এ পর্য্যন্ত একবারও উপস্থিত হইতে পারি নাই;
ারিলাম না। আজ তেমন আলোচনার বিষয়ও কিছু ছিল না। আর একটা
মন ভালও লাগে না। সাহিত্য-অনুরাগটা নিতান্ত ছাড়িতে চাহি
মাঝে মাঝে দুই একটা সাধু ইচ্ছা প্রাণে জাগিয়া উঠে। কিন্তু একটাও
রিণত করিতে পারি না। এখন তাই মনে করি, একটা অক্ষমতা ও
র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সংসারে রাখিয়া উহার নিকট বিদায় লইব।

কার্ত্তিক।—দীনবন্ধুর মিত্রের "সধবার একাদশী"র প্রথম কয় পৃষ্ঠা পাঠ

পরিতোষিত হয়। মানবের রসোপকরণ-ক্ষমতায় দীনবন্ধুর ক্ষমতা বেশ ছিল। বিলাতী সাহিত্য হইতে যে সকল কোটেশন্ করিয়া তিনি নিমে দত্তের মুখে বসাইয়াছেন, সেগুলি বড়ই সুন্দর ও নৈপুণ্যের পরিচায়ক। Contrastএর গুণে সহজেই হাস্যের উদ্দীপন করিয়া দেয়।—দীনবন্ধুর রুচি আর একটু মার্জ্জিত হইলে তাঁহার গ্রন্থপাঠে আমরা অধিকতর আনন্দলাভ করিতে পারিতাম। তাহা যে হয় নাই, বড় দুঃখের কথা বলিতে হইবে। তিনি অনেক সময় অশ্লীল রসিকতা বা অনাবশ্যক কথা-কাটাকাটির লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পাঠককে বড়ই বিরক্ত করিয়া তুলেন। স্বীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহচর্য্যে থাকিয়াও, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-গত উচ্চ আদর্শের সাক্ষাৎ পাইয়াও তিনি আপনাকে সংশোধন করিতে পারেন নাই; ইহা আমার নিকট কতকটা বিস্ময়াবহ বলিয়া মনে হয়। দীনবন্ধুর নীল-দর্পণের পেথম পাঠকালে আমি উহার গুণপণা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু দ্বিতীয়-বার পাঠে উহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া ধারণা হইয়াছে। নাটকখানি সর্ব্বাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় আমিও বলি, হাস্য-রসেই দীনবন্ধুর বিশেষত্ব; তিনি আদর্শের বড় ধার ধারেন না। প্রকৃত সৌন্দর্য্যের তেমন সন্ধান পান নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে ভক্ত-সঙ্গে।

[ঠাকুরের নিজমুখে কথিত সাধনা-বিবরণ।]

প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বলরামের বৈঠকখানায় ভক্ত সঙ্গে—বসিয়া আছেন। মিস্টার মাষ্টার, বলরাম, ক্রমে ছোট নরেন, পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুয্যে, ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন ইত্যাদি অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। তাঁহারা চিকের আড়ালে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। মণির পরিচারিকাও আসিয়াছেন,—পুত্র-শোকে উন্মাদিনীর ন্যায়। তিনি ও তাঁহার ন্যায় সন্তপ্ত, অনেকেই আসিয়াছেন,—এই বিশ্বাস যে, ঠাকুরের কাছে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ হইবে।

আজ ১লা বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী ; ১২ই এপ্রেল ; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। বেলা ৪টা। মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন, ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন ও নিজের সাধনা-বিবরণ ও নানা অধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা করিতেছেন। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের প্রতি)। "সে সময়ে (সাধনার সময়ে) ধ্যানে দেখ্‌তে পেতাম, সত্য সত্য এক জন কাছে শূল হাতে ক'রে ব'সে আছে। ভয় দেখাচ্ছে, যদি ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে মন না রাখি, শূলের বাড়ি আমায় মাথায় মারবে। ঠিক মন না হ'লে বুক যাবে।

"কখনও মা এমন অবস্থা করে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে এলো। আবার কখন লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো।

যখন লীলায় মন নেমে আস্‌ত, তখন সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করিতাম। সীতারামের রূপ সর্ব্বদা দর্শন হতো।—রামলালকে নিয়ে সর্ব্বদা বেড়াতাম, কখন নাওয়াতাম, কখন খাওয়াতাম, আবার কখন রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ঐ রূপ সর্ব্বদা দর্শন হতো। পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবে মিলন,—এ অবস্থায় সর্ব্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো।

আবার অবস্থা বদ্‌লে গেল। তখন লীলা ত্যাগ ক'রে নিত্যতে মন উঠে গেল। সজ্‌নে তুলসী সব এক বোধ হতে লাগ্‌ল। ঈশ্বরীয় রূপ আর ভাল লাগ্‌ল না। বল্লাম, কি! তোমাদের বিচ্ছেদ আছে! তবে তাদের তলায় রাখ্‌লাম। ঘরে যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল, সব খুলে ফেল্লাম। কেবল সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, সেই আদি পুরুষকে চিন্তা ক'র্‌তে লাগ্‌লাম। নিজে দাসীভাবে রইলুম;—পুরুষের দাসী।

"আমি সব রকম সাধন করেছি। সাধনা তিন প্রকার,—সাত্ত্বিক, রাজসিক তামসিক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁহাকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে কৃ তাঁহার শুদ্ধ নামটি ক। আর কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। রাজসিক সাধনে নানা রকম তবার পুরশ্চরণ ক'র্‌তে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, পঞ্চতপা ত হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে ইত্যাদি। তামসিক সাধন তমো- আশ্রয় ক'রে সাধন। জয় কালী! কি! তুই দেখা দিবি নি! এই গলায় ছুরি ব, যদি দেখা না দিস্।

(আত্মারাম)

"সে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায়) অদ্ভুত সব দর্শন হতো। প্রত্যক্ষ দেখ্‌লাম,—